্যার গোড়ার কথা

এ, ও বি, কম্, পরীক্ষার্থীর জন্য]

প্রথম খণ্ড

সচ্চিদানন্দ ঘোষ এম্. এ.

টিশ চার্চ কলেজের অর্থবিদ্যার অধ্যাপক

এবং

লজ বাণিজ্য বিভাগের লেক্‌চারার।

ও সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,

াতা ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,

মডার্ণ ই[illegible] গ্রন্থ প্রণেতা।

তীয় সংস্কৃতি প্রকাশনী

কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক : শ্রীমণি সেন্বি
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

মূল্য : চার টাকা

মুদ্রাকর :
২০৯, কর্ন
কলিকাতা-৬

ভূমিকা

বাংলা ভাষার মাধ্যমে অর্থবিদ্যায় পূর্ণাংগ পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা যেমন সুকঠিন, তেমনি গুরু দায়িত্বও বটে। অতি আধুনিক শাস্ত্র হিসাবে অর্থবিদ্যার বিষয়-বস্তু, বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে, ব্যাপক ও আত্যন্তিকভাবে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। নূতন নূতন দৃষ্টিভংগি ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রবর্তনে অর্থবিদ্যা অধিকতর বিজ্ঞান ধর্মী হইয়াছে। ফলে, সীমিত পরিসরের মধ্যে গোটা বিষয়-বস্তু সুসংবদ্ধভাবে, সরস ও সুস্পষ্ট করিয়া সন্নিবেশ করা অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গ্রন্থকারের দায়িত্বের গুরুত্ব আরও বেশী এই কারণে যে, অর্থবিদ্যায় ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দাবলীর বিজ্ঞান সম্মত গঠন ও সুপ্রচলন এযাবৎ বাংলা ভাষার মাধ্যমে বড় বিশেষ একটা হয় নাই। অর্থবিদ্যার তত্ত্ব ও সূত্রগুলি সূক্ষ্ম, প্রাযুক্তিক প্রধান। উহাদের সুসামঞ্জস বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ উপযুক্ত পরিভাষাদ্বারা যথাযথ না করিতে পারিলে, তরুণ পড়ুয়াদের মনে পঠিতব্য বিষয় সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ও স্থায়ী ধারণা জন্মিতে পারে না।

গ্রন্থকারের সুকঠিন ও গুরু দায়িত্ব সম্বন্ধে পূর্ণ সজাগতা লইয়া, অত্যন্ত ভীরু মনে এই পাঠ্যপুস্তক রচনায় ব্রতী হইয়াছি। বিভিন্ন বিদ্যায়তনের বহু সহকর্মীর অকুণ্ঠ সাহায্যে পুস্তকখানিকে বি,এ ও বি, বিকম্, পরিক্ষার্থীদের জন্য সর্বতোভাবে উপযুক্ত ও পূর্ণাংগ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় অর্থবিদ্যার পঠিতব্য বিষয়ে মান উন্নয়নের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। সে দিকে যেমন লক্ষ্য রাখিয়াছি, অন্যদিকে আবার কোমলমতি ছাত্র ছাত্রীগণ যাহাতে বিষয়-বস্তুর অযথা নির্মম নিষ্পেষণে নিজেদের হারাইয়া না ফেলেন, সে জন্য অনাবশ্যক জটিলতা পরিহার করিয়া, আলোচনা সংক্ষিপ্ত, প্রাঞ্জল ও সুখপাঠ্য করিতে চেষ্টা করিয়াছি। পুস্তকখানিকে পূর্ণাংগ ও আধুনিকতম করিবার জন্য 'নয়া অর্থবিদ্যার' (New Economics) চিন্তাধারার সারমর্ম উপযুক্ত স্থানে সন্নিবেশ করিয়াছি।

আমার পরম আরাধ্য শিক্ষক, স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় এবং সিটি কলেজের বাণিজ্য বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অরুণ কুমার সেন মহাশয় এই পুস্তক প্রণয়নে

নানা ভাবে উপদেশ দিয়া আমাকে ঋণী করিয়াছেন। এই অবসরে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি। নিজ ও অন্যান্য শিক্ষায়তনের বহু সহকর্মীর নিকট হইতে এত বিভিন্ন ভাবে উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি যে, ভিন্ন ভাবে স্বীকৃতি প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের বন্ধুত্বের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করিতে চাহি না।

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনীর কর্ণধার বন্ধুবর শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সহিত পুস্তকের প্রুফ সংশোধন ও মুদ্রণ কার্যের সহায়তা করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানাইয়া পারিতেছি না।

পুস্তকখানির ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অসংগতি সম্পর্কে সহকর্মী ও ছাত্রবন্ধুগণ যদি দয়া করিয়া আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তাহা হইলে নিজকে বাধিত মনে করিব।

জন্মাষ্টমী,
২৯শে আগষ্ট, ১৯৫৬,
স্কটিশ চার্চ কলেজ,
আজাদ হিন্দ্ বাগ্,
কলিকাতা—৬।

বিনীত
গ্রন্থকার

উৎসর্গ পত্র

আমার

অগণিত

ছাত্র ছাত্রীর

উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

অর্থবিদ্যার গোড়ার কথা

প্রথম অধ্যায়

পরিচিতি (Introduction)

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু ও উপাদান (Subject-matter of Economics) : প্রকৃতির তাগিদ ও অভাবের তাড়না—এই দুইএ মানুষের সমাজজীবনের গোড়াপত্তন। আবার সমাজজীবী মানুষ বহু স্বার্থ (interest) বিজড়িত। প্রত্যেক স্বার্থ সম্পর্কে তাহার কার্যকলাপও বিভিন্নমুখী। অর্থবিদ্যা মানুষের এই সমাজ-স্বার্থ সম্পর্কীয় বিভিন্নমুখী কার্যকলাপেরই একটী অধ্যায়। সমাজজীবী মানুষের কার্যকলাপের কোন্ বিশেষ অংশ অর্থবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়, তাহাই আমরা আলোচনা করিব।

অর্থবিদ্যার উপাদান

মানুষের সর্ব কর্মপ্রচেষ্টার উৎস অভাবের তাড়না। আমাদের অভাব সীমাহীন—অগণিত। মানব সভ্যতার উৎকর্ষের সংগে সংগে ও জ্ঞানের পরিধির বিস্তৃতিতে অভাবের সংখ্যা বৃদ্ধিই লাভ করে। অভাব যেমন অগণিত, তেমনি বিভিন্ন অভাব আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক। মানুষের খাদ্যসামগ্রীর অভাব, বাসস্থানের অভাব, শিক্ষার অভাব, আমোদ প্রমোদের অভাব—একটা অন্যটার সংগে প্রতিযোগিতা করে পূরতি লাভের জন্য। মানুষের এই সীমাহীন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক অভাব একদিকে,—অন্যদিকে আবার তাহার সীমাবদ্ধ আয়,—দুষ্প্রাপ্য অনটন সম্পদ। মানুষ তাহার সীমাবদ্ধ আয় তথা দুষ্প্রাপ্য অনটন সম্পদদ্বারা অগণিত অভাব অভিযোগ কি ভাবে মিটায়,—সেই কার্যকলাপই অর্থবিদ্যার প্রধান উপাদান।

ইতিহাসের বিবর্তনের সংগে সংগে অর্থশাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়গুলিরও রদবদল হইতে বাধ্য। অতি আধুনিক পঠন শাস্ত্র হিসাবে অর্থবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তুর বহু পরিবর্তন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ঘটিয়াছে। প্রাচীন অর্থনীতিবিদ্‌গণ অর্থশাস্ত্রকে ধন বিজ্ঞান (Science of Wealth) আখ্যা দিয়াছেন। অর্থবিদ্যার জনকরূপে আদম স্মিত (Adam Smith) ইহার এই সংগা দিয়াছেন

যে, ইহার উপজীব্য হইল জাতীয় সম্পদের স্বরূপ ও কারণ উদ্ঘাটন করা। এই মতবাদ উনবিংশ শতাব্দীতে বহু সুসাহিত্যিক ও সুপণ্ডিতের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়া ওঠে। রাস্কিন, কারলাইল (Ruskin, Carlyle) প্রমুখ মনীষী বিদগ্ধগণ অর্থবিদ্যাকে এক স্বার্থান্বেষী, সংকীর্ণ, দুঃখবহ বিজ্ঞানের নামান্তর মাত্র বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে অর্থবিদ্যা হইল ধনকুবেরের ধর্মবাণী স্বরূপ (Gospel of Mammon)। তাঁহারা বলেন: যদি ধন সংগ্রহ ও ধন ব্যয় সম্পর্কীয় কার্যকলাপই অর্থবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়, তাহা হইলে এ শাস্ত্র শুধুমাত্র পার্থিব সম্পদের জয়গান ও প্রচার-ধর্মের উৎকটতায় নিন্দনীয় ও অবজ্ঞাত। কেননা, ধনসম্পদেই মানুষের সকল কর্মপ্রচেষ্টার ও সুখসমৃদ্ধির পরিসমাপ্তি নয়। মানুষের চরম পাওয়া বা সুখ ধনসম্পদে নয়। মানুষের জাগতিক কল্যাণের পথে ইহা সহায়স্বরূপ মাত্র।

প্রাচীন মতবাদ

এই তিক্ত সমালোচনার হাত হইতে অর্থবিদ্যাকে রক্ষা করেন সর্বপ্রথম অধ্যাপক মার্শাল (Marshall)। তিনি ইহার বিষয়বস্তুর পরিবর্ধন করিয়া ইহাকে মানব কল্যাণের সহায়স্বরূপ বলিয়া দাবী করেন। তিনি বলেন: অর্থশাস্ত্রে ধন সম্পদের স্থান আছে বটে, কিন্তু তাহার চাইতে বড় স্থান হইল মানুষ ও তাহার জাগতিক কল্যাণের। অর্থশাস্ত্রের প্রথম ও প্রধান উপজীব্য হইল মানুষ। দ্বিতীয়তঃ, ধনসম্পদ। ধনসম্পদ সকল সময়ই মানুষের জাগতিক কল্যাণ সাধনের যন্ত্রস্বরূপ ব্যবহৃত হইবে। মানুষ কি করিয়া ধন উপার্জন ও ধন ব্যয়দ্বারা তাহার অভাব অভিযোগ মিটায়, তাহাই হইল অর্থবিদ্যার মোদ্দা কথা। অধ্যাপক মার্শালের কথায়: "Economics is the study of man's action in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and with the use of material requisites of well-being." তিনি আরও বলেন: "Economics is, on one side, a study of wealth; and on the other and more important side, a part of the study of man." অধ্যাপক মার্শাল অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু নির্ধারণে মানুষের জাগতিক কল্যাণের দিকটায়ই বেশী করিয়া জোর দিয়াছেন এবং শুধু ধনসম্পদের জয়গান না গাহিয়া, মানুষ ও তাহার কল্যাণের দিকটায়ই বেশী জোর দিয়াছেন।

মার্শালের মতবাদ

ডাঃ ক্যানানও (Cannan) অর্থবিদ্যা সম্বন্ধে ঠিক একই ধরণের মতবাদ পোষণ করেন। তিনি বলেন: অর্থবিদ্যার কাজই হইল জাগতিক কল্যাণের কারণ ও পথ নির্দেশ করা। Economics is a study of the causes of material welfare (Cannan). কিন্তু অধ্যাপক এল্‌, রবীন্‌স (L. Robbins) এই মতবাদের ঘোর বিরোধী। তিনি অভিযোগ করেন যে, ক্যানান অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সংকীর্ণ করিয়া ধার্য করিয়াছেন। অনেক জিনিষ আছে—অনেক কর্মপ্রচেষ্টা আছে, যাহা আমরা দেখিতে পাই না (immaterial or non-material)। যেমন, অধ্যাপকের শিক্ষাদান, সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা। ইহাদের পার্থিব রূপ বা আকৃতি নাই বটে, কিন্তু ইহাদের যোগান সীমাবদ্ধ এবং ইহারা মানুষের অভাব মোচনে সহায়স্বরূপ—মানব কল্যাণপ্রদ। ক্যানান এইরূপ আকৃতিহীন, অদৃশ্যমান কর্মপ্রচেষ্টাকে অর্থবিদ্যার আঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। তিনি শুধু আকৃতিময়, দৃশ্যমান, বাস্তব সামগ্রীকেই অর্থবিদ্যার উপাদান হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। অধ্যাপক রবীন্‌সের মতে আকৃতিময় আর আকৃতিহীন দুই রকম দ্রব্যসামগ্রী ও কর্মপ্রচেষ্টাই অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। **দ্বিতীয়তঃ**, ক্যানান অর্থশাস্ত্র ও কল্যাণের মধ্যে যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও রবীনস্‌ স্বীকার করেন না। ক্যানান বলেনঃ মানুষের যে কার্যাবলী কল্যাণকর, সেইগুলিই আর্থিক কার্যাবলী ও অর্থশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। অপরপক্ষে, রবীনস্‌ বলেন, মানুষের যে কোন কার্যাবলীই আর্থিক কার্যাবলী (economic activities), যদি সেইগুলি মানুষের অভাব মিটাইতে সমর্থ হয়; সেইগুলি কল্যাণধর্মী কিনা সে বিচার একেবারে অগৌণ। মদ তৈয়ারীর কার্য, ক্যানানের মতে, আর্থিক কার্য নয়। কেননা, মদ তৈয়ারী মানুষের পক্ষে কল্যাণকর নয়। কিন্তু রবীন্‌সের মতে ইহা মানুষের পানাভাব মোচন করে। শুধু কল্যাণের কষ্টি পাথরে মানুষের কার্যাবলীর এই বিশ্লেষণকে রবীনস্‌ মান নির্ণয়ের (Value judgment) নামান্তর বলিয়া অর্থবিদ্যার বিষয়-ক্রম হিসাবে অস্বীকার করেন। তিনি বিশ্বাস করেন যে, অর্থনীতি কিছুতেই কোন লক্ষ্য বা আদর্শাশ্রয়ী হইবে না। Economics is entirely neutral between ends (Robbins). It has no ideological bias or leanings. **তৃতীয়তঃ**, কল্যাণের প্রকৃত সংগা নির্দেশ করাও অসম্ভব। কেননা, ইহার স্বরূপ মানুষের মনস্তত্বের ভিত্তির উপর নির্ভর করে অনেকটা। তাহা ছাড়া

ডাঃ ক্যানানের মতবাদ ও রবীন্‌সের বিরুদ্ধ সমালোচনা

কল্যাণ আবার দেশ, কাল ও পাত্র আপেক্ষিক। টাকাকড়ির মাপকাটিতে কল্যাণ সঠিক পরিমাপ করাও অসম্ভব। দুইটি লোক যদি একটি জিনিষের জন্য সমপরিমাণ অর্থও পণ্যমূল্য হিসাবে ব্যয় করে, তাহা হইলেও সেই অর্থমূল্য তাহাদের উভয়ের নিকট সমান পরিমাণ কল্যাণের পরিমাপ নয়। তাহার কারণ এই যে, টাকার মূল্য ধনী ও গরীবের কাছে এক নয়। যেহেতু ধনীর চেয়ে গরীবের কাছে টাকার মূল্য বেশী, সেই হেতু উভয়ে সমপরিমাণ অর্থ-দাম দিলেও জিনিষটি হইতে গরীবব্যক্তি ধনীব্যক্তির চেয়ে বেশী কল্যাণ বা উপযোগ লাভ করিবে।

উপরি উক্ত কারণগুলির জন্য অধ্যাপক রবীনস্ অর্থবিদ্যাকে শুধু মানব কল্যাণধর্মী শাস্ত্র বলিয়া স্বীকার করেন না। অর্থবিদ্যার উপাদান সম্পর্কে তিনি

রবীন্সের সংজ্ঞা

বলেন: মানুষের অভাব বহুল, কিন্তু ধন সম্পদ সীমাবদ্ধ। কি ভাবে সীমাবদ্ধ আয়দ্বারা বহুল অভাব মিটান যায়—সেই কর্মপ্রচেষ্টা হইল অর্থশাস্ত্রের মুখ্য উপাদান। "Economics is the study of human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative ends·········The economic problem is essentially a problem arising from the necessity of choice —choice of the manner in which limited resources with alternative uses are disposed of. It is the problem of the husbandry of scarce resources."

অধ্যাপক রবীন্সের মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক ক্রেয়ার্ণক্রশ্ (Cairncross) বলেন: অর্থশাস্ত্র সেই বিদ্যা, যাহা মানুষের বৈষয়িক

ক্রেয়ার্ণক্রশের সংজ্ঞা

ব্যাপারে অর্থ কি অংশ গ্রহণ করে, তাহাই নিরূপণ করে। অর্থের ব্যবহার তিনটি বিষয় নির্দেশ করে: বিনিময়, টান ও পছন্দ (exchange, scarcity and choice)। আমরা, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী স্ব স্ব কর্মপ্রচেষ্টাদ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থের কোন ব্যবহারই দরকার হয় না। যখনই আমরা নিজ নিজ যাবতীয় প্রয়োজন যোগাইতে পারি না, তখনই কর্ম বিভাগের প্রশ্ন ওঠে। কর্ম বিভাগের নীতি কার্যকরী হইলেই, বিনিময়ের তাগিদ আসে, অর্থের প্রয়োজনও অনিবার্য হইয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, অর্থের মূল্য দেই আমরা তখনই, যখন ইহার যোগান টান হয়। অর্থের এই টান যোগানই আবার মানুষকে অর্থ ব্যয় সম্পর্কে

হুসিয়ার করিয়া তাহাকে মিতব্যয়ী করে। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ বিনিময়ে যে দ্রব্যসম্ভার আমরা লাভ করি উহাদের ব্যবহার বিষয়েও আমরা অবহিত হই। চতুর্থতঃ, যখন বিভিন্ন অভাব পূরণের জন্য আমরা অর্থব্যয় করি, তখন আমাদের বিভিন্ন অভাবের কোন্‌টা মুখ্য, কোন্‌টা গৌণ বাছিয়া পছন্দ করিতে হয়। আমরা টান ধনসম্পদদ্বারা আমাদের বহুল অভাব অভিযোগের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া, কি করিয়া বিনিময়কে প্রভাবান্বিত করি, অর্থবিদ্যার তাহাই পঠন বিষয়। অধ্যাপক ক্রেয়ার্ণক্রশের (Cairncross) কথায়: Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to their wants and how these attempts inter-act through exchange.

রবীনস্‌ ও ক্রেযার্ণক্রশের মতবাদেরও সমালোচনা করা চলে। তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করার অর্থই হইল অর্থবিদ্যাকে মানব কল্যাণকামী শাস্ত্র বলিয়া অস্বীকার করা। অর্থবিদ্যা শুধু মানুষের সূক্ষ্ম চিন্তাধর্মী যন্ত্রমাত্র—জাগতিক দৈনন্দিন কোন সমস্যা সমাধানে ইহা সাহায্য করিবে না—তাহা আমরা চাই না। অধুনা ডারবিন, ফ্রেসার, উটন্‌, বেভারিজ্‌ (Durbin, Fraser, Wooton, Beveridge) প্রমুখ বিশিষ্ট অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ আবার অধ্যাপক মার্শালের মতবাদের পুনঃ প্রচার আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহারা মার্শালের সঙ্গে একমত হইয়া প্রচার করিতেছেন যে, মানুষের ব্যবহারিক জগতের কল্যাণ সংবিধানই অর্থবিদ্যার প্রধান উপজীব্য।

অর্থবিদ্যার ক্ষেত্র (Scope of Economics) : অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আমরা আলোচনা করিয়াছি। অর্থবিদ্যার প্রকৃত ক্ষেত্র নির্ণয় করিতে হইলে, উহার বিষয়বস্তু কি, তাহার অবতারণা করা ছাড়া আরও অনেক বিষয়ের সন্ধান দিতে হইবে। যেমন, অর্থবিদ্যা বিজ্ঞান না কলাশাস্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ; ইহা নৈতিক অনুশাসন (moral judgment) দিতে পারে কি না ; ইহা জাগতিক সমস্যাব সমাধান করিতে পারে কিনা, ইত্যাদি।

অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে আমরা অধ্যাপক মার্শাল ও রবীন্‌সের পরস্পর-বিরোধী মতবাদের সমালোচনা করিয়াছি। ইহার ক্ষেত্র নির্দেশ করিতে যাইয়া আমাদের একথা ভুলিলে চলিবে না যে, অর্থবিদ্যা সমাজ বিজ্ঞানেরই আঙ্গিক স্বরূপ। অর্থবিদ্যার ক্ষেত্র কোন ব্যক্তিবিশেষের বা মুষ্টিমেয় মানুষের

কর্মপ্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠে নাই। সমাজ জীবনের বহির্ভূত কোন নরনারীর কর্মপদ্ধতিও অর্থবিদ্যার আওতার ভিতর আসে না। সমাজজীবী মানুষের ক্রিয়াকলাপের পারস্পরিক ঘাত সংঘাতই অর্থবিদ্যার পঠনক্ষেত্র।

বিলাতের প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করেন যে, অর্থবিদ্যা স্রেফ বিজ্ঞান-গোত্রীয়। অতএব ইহার কার্য হইল, অর্থনৈতিক সমস্যার কারণ সন্ধান করা। কিন্তু ইউরোপীয় অর্থনীতিবিদ্গণ মনে করেন যে, অর্থবিদ্যাকে বিজ্ঞান বলিয়া আখ্যা দেওয়া অর্থই ইহার ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা। তাহারা, অপরপক্ষে, ইহাকে কলাবিদ্যার অঙ্গীভূত বলিয়া মত পোষণ করেন; কেননা, ইহার ব্যবহার উপযোগ যথেষ্ট; মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যা নিরাকরণের অবদানও ইহার অনেক।

অর্থবিদ্যা মানুষের কোন কার্যকলাপের আদর্শ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিবে অথবা নৈতিক অনুশাসন জারি করিবে, সে বিষয়ে মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। একদল আছেন যাঁহারা মনে করেন, অর্থবিদ্যাবিদের কাজ নয় কোন কিছুর নিন্দাবাদ করা বা কিছুরপক্ষে সুপারিশ করা—অপরপক্ষে, তাঁহাদের কাজ অনুসন্ধান করা—মানুষের কার্যকলাপের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যান করা। অধ্যাপক রবীনস্ বলেন—The functions of the economists is to explore and explain and not to advocate and condemn. The role of the economist is more and more conceived of as that of the expert who can say what consequences are likely to follow certain actions but who cannot judge as an economist the desirability of these actions. Economics deals with means, the study of ends lies outside its scope. লর্ড কীনস্ (Keynes)ও ঠিক একই মত পোষণ করেন: The theory of economics does not furnish a body of settled conclusions immediately applicable to policy. It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind and a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions. আর একদল আছেন যাঁহারা বলেন: অর্থবিদ্যা আমাদেরকে এক গোছা ধ্রুব মন্তব্য ও অনুশাসনের নির্দেশ দেয় না বটে, কিন্তু অর্থবিদ্যা বিশ্লেষণের যে উপায় বা যন্ত্রের উদ্ভাবন করিয়াছে, তাহা অনেক কঠিন অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান

নয়। মানুষের ইচ্ছা ও কর্মপ্রচেষ্টা যদি শুধু বিচারবুদ্ধি প্রণোদিতও হইত, তাহা হইলেও উহার সম্পর্কে চিরন্তন নিয়ম ধার্য করা সম্ভব হইত না ; কেননা, বাস্তব মাপকাঠি অর্থ দ্বারা মানুষের মানসিক ইচ্ছা ও বিচারবুদ্ধির সঠিক পরিমাপ করা অসম্ভব। সেইজন্য অর্থনৈতিক নিয়মাবলী অনুমানধর্মী।

কিন্তু অর্থনৈতিক নিয়মাবলী অনুমানধর্মী বলিয়াই যে একেবারে উপযোগ-বিহীন, তাহা বলা চলে না। এক হিসাবে দেখিতে গেলে বৈজ্ঞানিক নিয়মা-বলীও অনুমান ধর্মী। যেমন, মাধ্যাকর্ষণের নিয়মও চিরন্তন সত্য নয়। একটি গোলকের ভূমিতে অবশ্যম্ভাবী পতনও রুদ্ধ হইতে পারে, যদি আবহাওয়ার চাপ অত্যন্ত প্রচণ্ড হয়। তাহা বলিয়া এই নিয়ম উপযোগহীন নয়। বৈজ্ঞানিক নিয়ম অবস্থা বিশেষে সত্য হয়। তবে যে অবস্থা ও শক্তির উপর ভিত্তি করিয়া বৈজ্ঞানিক নিয়ম গঠন করা হয়, উহাদের অনেকের সঠিক পরিমাপ চলে। কিন্তু যে সকল মানসিক ও বাস্তব বিষয়দ্বারা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা প্রভাবান্বিত হয় এবং যাহার ভিত্তিতে অর্থনৈতিক নিয়মাবলী ধার্য করা হয়—তাহাদের সকলের পরিমাপ অসম্ভব। ফলে, অর্থনৈতিক নিয়মাবলী বৈজ্ঞানিক সূত্র হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক অনুমানধর্মী হইতে বাধ্য। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার কি কি ধারা, সে সম্পর্কে, একেবারে সঠিক না হইলেও, একটা মোটামুটি ইংগিত দিয়া অর্থনৈতিক নিয়ম আমাদের বাস্তবজীবনে উপকারে আসে। আবার অনেক অর্থনৈতিক নিয়ম আছে যাহা অবস্থাবিশেষে বৈজ্ঞানিক সূত্রের ন্যায়, কিন্তু মূলতঃ চিরন্তন সত্য হইতেও পারে। যেমন, ক্রমিক উৎপাদন হ্রাসের নিয়ম (law of diminishing returns)। যদিও এই নিয়মের কার্যকারিতা মানুষ বিজ্ঞান ও বুদ্ধিদ্বারা অস্থায়ীভাবে প্রতিরোধ করিতে পারে, তথাপি পরিশেষে মূলতঃ এই আইন বলবৎ হইবেই।

অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Methods of Economic Analysis): অর্থনৈতিক তত্ত্ব অনুসন্ধানের জন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ বিভিন্ন বিশ্লেষণ পদ্ধতির আশ্রয় লইতে পারেন। প্রাচীনপন্থী অর্থশাস্ত্রীগণ যে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাকে অবরোহ প্রণালী (deductive or abstract method) বলা হয়। মানুষের আচরণ ও কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কতিপয় সামান্যীকরণ (generalisations) নির্দেশ করিয়া, অর্থনৈতিক তত্ত্ব আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করা এই পদ্ধতির সারমর্ম। কিন্তু যে সকল সামান্যীকরণের উপর ভিত্তি করিয়া

অবরোহ পদ্ধতি (Abstract or dedutive method)

তত্ত্ব আহরণ করা এই পদ্ধতির নীতি বা উদ্দেশ্য, তাহা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রকৃত কার্যকরী বা প্রযোজ্য নাও হইতে পারে। কেননা, এই সামান্যীকরণগুলি যথেষ্ট তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। বিশ্লেষণের এই প্রণালীর বিরুদ্ধে জার্মানীতে বিশেষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

জার্মানীর একজন ইতিহাসপন্থী অর্থবিদ্যাবিদ অবরোহ পদ্ধতির পরিবর্তে আরোহ প্রণালী (inductive method) প্রয়োগদ্বারা অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ সুরু করেন। মানুষের কর্মপ্রচেষ্টার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া উহা হইতে অর্থনীতির সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব গ্রহণ করা এই প্রণালীর মূল উদ্দেশ্য। মানব ইতিহাসের কোন এক বিশেষ অবস্থায় একই ধরণের কার্য প্রচেষ্টা যদি একই ধরণে প্রতিক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে উহার ভিত্তিতে সর্বকালে প্রযোজ্য অর্থ নৈতিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করা আরোহ বিশ্লেষণ পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। আরোহ পদ্ধতির বিশ্লেষণদ্বারা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় বা যে তত্ত্ব আবিষ্কার করা হয়, তাহা মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা অবলোকন ও পরীক্ষাদ্বারা বিচার করিয়া লওয়া হয়। অধুনা জগতে পরিসংখ্যান সংগ্রহ প্রণালীর উন্নতির সংগে সংগে, মানুষের অর্থ নৈতিক ইতিহাস ও কর্মপ্রচেষ্টার যথেষ্ট ও সঠিক তথ্য আহরণ করা দিন দিনই সুগম হইতেছে; ফলে, আরোহ পদ্ধতিদ্বারা অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ অধিক বিজ্ঞান সম্মত হইতে বাধ্য।

আরোহ পদ্ধতি (inductive method)

অধ্যাপক মার্শাল তাঁহার অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণে অবরোহ ও আরোহ এই দুই প্রকার পদ্ধতির একটা সমন্বয় সাধন করিয়াছেন। অবরোহ প্রণালীর মস্তবড় গুণ এই যে, ইহা দৃঢ়ভাবে প্রচার করে যে, কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যানই বুদ্ধিবৃত্তি ও কল্পনা ব্যতীত (reasons and hypothesis) সম্ভব নয়। অপর পক্ষে, আরোহ পদ্ধতির সুফল এই যে, ইহা কল্পনা ও বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণই যুক্তিযুক্ত মনে করে না, যদি তাহা যথেষ্ট তথ্যদ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত না হয়। কিন্তু একক আরোহ প্রণালী নিছক বর্ণনাভিত্তিক অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণের নামান্তর মাত্র।

একদল অর্থবিদ্যাবিদ গাণিতিক পদ্ধতির (mathematical method) অর্থ নৈতিক বিশ্লেষণ প্রবর্তণ করিয়া অর্থশাস্ত্রকে অবাস্তব ও সূক্ষ্ম মানসিক জ্ঞানালোচনা বিদ্যার পর্যায়ে উন্নীত করিয়াছেন। অবশ্য, এইপদ্ধতির একটা সুবিধা এই যে ইহার প্রয়োগে অবাস্তব সূক্ষ্ম জ্ঞানালোচনা ও মানসিক তর্কবিতর্কের অসংগতি দূর হয়। যে সকল অনুমান বা কল্পনার ভিত্তিতে তত্ত্ব

প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহাদের সম্যক ব্যাখ্যান ও কার্যকলাপের পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝান যায়। কিন্তু নিছক গাণিতিক প্রণালীদ্বারা অর্থ নৈতিক ব্যাখ্যানের মস্ত বড় একটা কুফল এই যে, ইহা অর্থবিদ্যাকে একটি অবাস্তব সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করে: অর্থবিদ্যা ব্যবহারিক জগতের সমস্যা সমাধানের কোন নির্দেশ না দিয়া, শুধু মানসিকবুদ্ধি ও অবাস্তব জ্ঞানালোচনার যন্ত্রস্বরূপ হইয়া পড়ে।

অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সহিত অর্থবিদ্যার সম্বন্ধ (Relation of Economics to other Sciences) : গোটা সমাজ ও উহার কল্যাণের পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের ধন উৎপাদন, বিনিময়, বণ্টন, খাদন প্রভৃতির সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধান করাই অর্থবিদ্যার প্রতিপাদ্য বিষয়। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিতে গেলে অর্থবিদ্যা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাজ বিজ্ঞান। অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সহিত অর্থবিদ্যার অতি নিবিড় ও নিকট সম্পর্ক। অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান যে সকল তথ্য আবিষ্কার বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, সেইগুলিকে উপনয় (premise) স্বরূপ গ্রহণ করিয়া অর্থবিদ্যার বিশ্লেষণ ও তর্কবিতর্ক প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী হইয়া উঠে। অবশ্য, অপরাপর সমাজ বিজ্ঞানের তথ্য বা সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিতে অর্থবিদ্যা একটুও তৎপর নয়; পরন্তু, উহাদের গুরুত্ব স্বীকার করিয়া উহাদেরই ভিত্তির উপর অর্থশাস্ত্র নিজ বিষয়বস্তুর বনিয়াদ গড়িয়া তোলে।

অর্থবিদ্যা ও ইতিহাস (Economics and History) : অর্থবিদ্যার বহু উপাদান ইতিহাস যোগায়, ফলে অর্থবিদ্যাবিদ্ ঐতিহাসিকের নিকট ঋণী। ইউরোপের Roscher, Hilderbrand, List, Malthus প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ অর্থবিদ্যার তত্ত্ব অনুসন্ধান ও তথ্য আবিষ্কার করিতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির (historical method) অনুসরণ ও প্রয়োগ করিয়াছেন। ইতিহাস মানুষের বিগত কর্মকৃত্যের ধারাবাহিক তালিকা। মানুষের ঘটনাবহুল জীবনের কর্মকৃত্যের তালিকা পর্যবেক্ষণ করিয়া অর্থশাস্ত্রবিদ নূতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারেন, চিরাচরিত গতানুগতিক মতবাদের অদলবদল করিতে সক্ষম হন। ম্যালথাস্ তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন দেশের সমসাময়িক অর্থ নৈতিক ইতিহাসের উপর ভিত্তি করিয়াই। দেশের অর্থ নৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া অর্থশাস্ত্রী দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়নের সুপথ সহজেই বাৎলাইতে পারেন।

শুধু যে ইতিহাসই অর্থবিদ্যার উপকারে আসে তাহা নহে; অর্থবিদ্যাও

ইতিহাসকে যথেষ্ট সহায়তা করে। প্রকৃত ইতিহাস কেবল মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের কার্যকলাপের তালিকা নয়। প্রকৃত ইতিহাস দেশের জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার সুস্পষ্ট একটা ছবি অবশ্য তুলিয়া ধরিবে। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের অর্থনৈতক ব্যাখ্যানের দিকে এত ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন যে, নামজাদা ঐতিহাসিকের পক্ষে অর্থবিদ্যায়ও বেশ দখল থাকা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

অর্থবিদ্যা ও রাজনীতি (Economics and Politics): অর্থবিদ্যা ও রাজনীতির সম্পর্কও নিকট। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা রাষ্ট্রদেহের ও সরকারের কার্যসূচীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। দেশের অর্থনীতি যদি শ্রমিকের সুযোগ সুবিধা বা স্বার্থাশ্রয়ী হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের সাধারণ নীতিও কর্মপন্থা শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে উৎসাহ দিবে। বামপন্থী অর্থবিদ্যাবিদগণ বিশ্বাস করেন যে, দেশের ধনউৎপাদন ও ধনবণ্টনের স্বরূপ দেশের রাজনীতিতে প্রতিফলিত হয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায়, ধনউৎপাদন ও ধনবণ্টন মুষ্টিমেয় ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ-কল্যাণে নিয়োজিত হয়; ফলে, এই সমাজে রাষ্ট্র ও সরকার এই শ্রেণীর বিশেষ স্বার্থ কায়েমী রাখিতেই ব্যতিব্যস্ত।

আবার, দেশের অর্থনীতির উপর রাজনীতির প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। রাষ্ট্রের আওতার ভিতর, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রাধীনেই, দেশের অর্থনৈতিক কর্যকলাপ সম্পন্ন হয়। উপযুক্ত পর্যবেক্ষণ ও নিযন্ত্রনদ্বারা রাষ্ট্র দেশের কৃষিশিল্পোন্নয়ন অন্তঃ ও বহির্বাণিজ্য ব্যবস্থা, শ্রমিক কল্যাণ, কর ব্যবস্থা, মুদ্রানীতি, কর্ম সংস্থান প্রভৃতি অর্থনৈতিক বহু পরিস্থিতি প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কোন দেশের যদি রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকে, যদি উহা অন্য কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগপাশে আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে স্বাধীনভাবে অর্থনৈতিক উন্নযন করা ঐ দেশের পক্ষে অসম্ভব। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যতদিন ভারতবর্ষ বৃটিশ শাসনাধীন ছিল, ততদিন এই দেশের কোন স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ননীতি ও কর্মপন্থাই ছিল না। আমাদের অর্থনীতি তখন বৃটিশের কূটরাজনীতিদ্বারা পিষ্ট ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল।

অর্থবিদ্যা ও নীতিশাস্ত্র (Economics and Ethics): মানুষের চিন্তাধারা, ইচ্ছাশক্তি ও কার্যকলাপ কোন্ পথে পরিচালিত হওয়া উচিত, কোন্ পথ মঙ্গলের, কোন্ পথ অন্যায়ের—ইহার সম্যক্ আলোচনা ও বিশ্লেষণ নীতিশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয়। অন্যায়ের পথ পরিহার করিয়া, ন্যায়ের পথ,

ঔচিত্যের পথ, ও কল্যাণের পথের সন্ধান দেওয়া নীতিশাস্ত্রের আসল ধর্ম। অর্থবিদ্যায় মানুষের কার্যকলাপ কল্যাণের মাপকাঠিদ্বারা পরিমাপ ও পরিচালিত হয়। অর্থনৈতিক কর্মপ্রচেষ্টার উদ্দেশ্যই হইল সামাজিক মঙ্গল সাধন। অর্থবিদ্যার পঠন-পাঠনে ধনোৎপাদনের সংগে মানব কল্যাণের যে সম্বন্ধ বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করা হয়, উহা নীতিশাস্ত্রের আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত। অনেকে অর্থশাস্ত্রকে নীতিশাস্ত্রের 'পরিচারিকা' (handmaid) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অধ্যাপক রবীনস্ প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ অবশ্য বিশ্বাস করেন যে, অর্থবিদ্যা কোন বিশেষ আদর্শাশ্রয়ী নয়, কোন উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ইহা একেবারে নির্বিকার। কিন্তু ঐ মতবাদ সাধরণতঃ স্বীকার করা চলে না। মানুষের বাস্তবজীবনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্পর্কে অর্থশাস্ত্র যদি একেবারে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে ইহার পঠন পাঠনের উপকারিতা একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে। মানুষের কোন কার্যক্রম সমাজ-কল্যাণ পরিপন্থী কিনা, অথবা উহা সমাজ-কল্যাণধর্মী, তাহার নির্দেশ অর্থবিদ্যাবিদকেই দিতে হয়। অর্থবিদ্যা প্রধানতঃ মানব কল্যাণের বিষয় লইয়াই মাথা ঘামাইবে এবং মানব কল্যাণ নীতিশাস্ত্রেরই গোড়ার কথা। অতএব ইহা অতি সত্য যে, "What is economically advantageous must in the long run be right and what is correct in Ethics must in the end also be profitable to the business world."

অর্থবিদ্যা ও সমাজ বিজ্ঞান (Economics and Sociology) : সমাজ বিজ্ঞান খুবই সুবিস্তৃত ও ব্যাপক অধ্যয়নশাস্ত্র। ইহা সমাজজীবী মানুষের বিভিন্ন স্বার্থসম্বলিত কার্যকলাপ বিশ্লেষণ ও নির্ধারণ করিয়া থাকে। অর্থবিদ্যা সমাজজীবী মানুষের বিশেষ একটা স্বার্থ ও কার্যকলাপ বিশ্লেষণ করে বলিয়া সুবিস্তৃত সমাজ বিজ্ঞানের একটি শাখা বিশেষ। ইতিহাস, রাজনীতি ও অন্যান্য-সমাজশাস্ত্র ও সমাজবিজ্ঞানের এক একটি অংশবিশেষ। কিন্তু অর্থবিদ্যা সমাজ-বিজ্ঞানের বিশেষ একটি অংশ বলিয়া ইহাকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পঠন-পাঠনের প্রয়োজন আছে। সমাজবিজ্ঞান মানুষের সমাজ জীবনের একটি সাধারণ চিত্র অংকণ করে মাত্র; অপর পক্ষে, অর্থবিদ্যা মানুষের সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ দিক লইয়া সংশ্লিষ্ট,—মানুষ সীমিত ধন-সম্পদদ্বারা তাহার অগণিত অভাব অভিযোগ কি ভাবে পূরণ করে, ইহাই অর্থবিদ্যার বিশেষ পঠিতব্য বিষয়।

অর্থবিদ্যা অধ্যয়নের উপকারিতা—(Importance or Utility of the Study of Economics) : অধুনা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অর্থবিদ্যার পঠন-পাঠন বেশ কদর লাভ করিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে অর্থশাস্ত্রের বিভিন্নমুখী উপকারিতা। কি তত্ত্বের দিক দিয়া, কি ব্যবহারিক দিক দিয়া, কি সংস্কৃতির বা ঐতিহ্যের দিক দিয়া আমরা দেখিনা কেন, মানুষের জীবনে অর্থবিদ্যার অবদান অপরিমেয় ও অনস্বীকার্য।

তত্ত্বীয় দিক হইতে দেখিতে গেলে বলা যায় যে, অর্থবিদ্যা আমাদের মানসিক সূক্ষ্ম বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষ করিয়া বিজ্ঞান-সম্মতভাবে বিচার-বিশ্লেষণ ও তর্কবিতর্কের ক্ষমতা অর্জন করিতে সহায়তা করে। প্রকৃত অর্থবিদ্যা কোন বিশেষ মতবাদ প্রচার করে না, কিংবা কোন বিশেষ আদর্শের পক্ষে ওকালতি করেনা। ইহা মানসিক চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ ও উৎকর্ষ সাধন করে এবং বাস্তব সমস্যা বিশ্লেষণের উৎকৃষ্ট যন্ত্রস্বরূপ পরিগণিত হয়। "It is a method rather than a doctrine, an apparatus of the mind, a technique of thinking which helps its possessor to draw correct conclusions." অর্থবিদ্যার বড় গুণ এই যে, ইহা সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে নিয়মানুবর্তিতামাফিক সুনিয়ন্ত্রিত ধারাবাহিক চিন্তার খোরাক যোগায়।

কিন্তু অর্থবিদ্যা শুধু মানুষের কার্যকলাপ বিশ্লেষণের মানসিক যন্ত্রবিশেষই নয়। মানুষের বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানেও অর্থবিদ্যা একটী গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। মানুষের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কীয় বহু জটিল সামাজিক সমস্যা সমাধান ও নিরাকরণের উপায় নির্দেশ অর্থশাস্ত্রীকে করিতে হয়। Knowledge in Economics is valuable not only in its light-bearing aspect, but in its fruit-bearing aspect as well. অধ্যাপক পিগু অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—"Economics is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastic, nor as a means of winning truth for its own sake, but as a handmaid of Ethics and a servant of practice." নিছক তত্ত্বীয় আলোচনা ও বিশ্লেষণ করিবার পথ প্রদর্শন করিয়াই অর্থবিদ্যার বিষয়বস্তু নিঃশেষ হইয়া যায় না; গোটা সমাজের পরিসম্পৎ (resources) সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য কি উপায়ে সর্ব্বোৎকৃষ্টভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে, তাহার নির্দেশও অর্থবিদ্যাকে দিতে হয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়নকার্যে যাহারা নিযুক্ত—দেশের অর্থসচিব,

শ্রমিক নেতা প্রমুখ ব্যক্তির নিকট অর্থবিদ্যার এই কল্যাণময় ব্যবহারিক দিকটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সাধারণ ব্যবসায়ীর নিকটও অর্থবিদ্যার উপকারিতা নগণ্য নহে। অর্থশাস্ত্র অধ্যয়নদ্বারা সে কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা সম্বন্ধে প্রকৃত ধারণা গঠন করিতে পারে ; ইহা তাহাকে কারবারের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞানদান করে—পরিকল্পনা, উৎপাদন, বিক্রয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল করে এবং ইহাদের পরিপ্রেক্ষিতে তাহার ব্যক্তিগত অর্থ নৈতিক যথাযথ পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ করিয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি প্রশস্ত করে।

পরিশেষে, অর্থবিদ্যার সাংস্কৃতিক প্রভাবও অসামান্য। অধুনা জগতে অর্থবিদ্যার সাধারণ জ্ঞান সঞ্চয় সকল শিক্ষিত নরনারীর পক্ষেই অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। জগৎকে প্রকৃতরূপে জানিতে হইলে, আমাদের আশেপাশে প্রতিনিয়ত যাহা ঘটিতেছে, তাহার রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে, অর্থবিদ্যার মৌলিক নিয়মাবলী সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই থাকা একান্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী

1. What do you study in Economics and why? Define the subject matter of Economics.
2. "Economics is neutral between ends" Discuss the validity of this statement.
3. "Economics studies the part played by money in human affairs." Critically examine the statement.
   (C. U. B. Com. '54)
4. "Economics is what the economists do." What do the economists really discuss? (C.U. B. Com. '52)
5. Economics is a social science studying how people attempt to accomodate scarcity to wants and how these attempts inter-act through exchange.—Elucidate.
   (C.U. B.A. & B.Com. '56)
6. Examine the claim of Economics to be regarded as a science. Discuss the relations of Economics to other important social sciences.
7. Discuss the nature of economic laws.

দ্বিতীয় অধ্যায়

কতিপয় শব্দ-সংজ্ঞা (Some Definitions)

অর্থবিদ্যার আলোচনা ও বিশ্লেষণ প্রসংগে আমরা কতগুলি শব্দের সম্মুখীন হই, যেগুলির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যান ও সংজ্ঞা নির্দেশ গোড়াতেই প্রয়োজন। অবশ্য সেগুলির একটা সম্পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত ও অর্থবিশ্লেষণ করা একই স্থানে সম্ভব নয়। এখানে কতিপয় প্রধান প্রধান শব্দের সংজ্ঞা নির্দেশ করা হইল মাত্র।

সামগ্রী (Goods) : মানুষের অভাব পূরণে সক্ষম যে কোন বাস্তব (material) বা অবাস্তব (immaterial) বস্তুকেই সামগ্রী বলা চলে। খাদ্যবস্তু, পানীয়, আসবাবপত্র, জলবায়ু প্রভৃতি সবই মানুষের অভাব পূরণে সমর্থ। এগুলি সামগ্রী। সামগ্রী দুই রকমের হইতে পারে—প্রাকৃতিক বা স্বয়ংসিদ্ধ (free) ও আর্থিক বা যত্নসাধ্য (economic)। প্রাকৃতিক সামগ্রী প্রকৃতির দান বিশেষ। মানুষের চাহিদার অনুপাতে ইহাদের যোগান সীমিত নয়। আবহাওয়ায় বাতাস, সমুদ্রে জল প্রভৃতি প্রাকৃতিক সামগ্রী। অপরপক্ষে, আর্থিক সামগ্রীর যোগান টান (scarce)। ইহার টান যোগান অর্থ এই যে, মানুষের চাহিদার অনুপাতে ইহার যোগান সীমাবদ্ধ।

প্রাকৃতিক ও আর্থিক সামগ্রীর মধ্যে প্রকৃত পার্থক্য নির্ধারণ করা সহজ নহে। উহাদের তফাৎ চিরন্তনও নয়। এক সময়ে বা এক স্থানে যেগুলি প্রাকৃতিক সামগ্রী, ঠিক ভিন্ন সময়ে বা স্থানে সেইগুলিই আবার আর্থিক সামগ্রী হইতে পারে। আবহাওয়ায় যে বাতাস, উহাকে আমরা প্রাকৃতিক সামগ্রী বলি ; কিন্তু কোন চিত্রগৃহে আতপ নিবারণের জন্যে যে বায়ু কার্যকরী (conditioned) হয়, তাহা আর্থিক সামগ্রী। অধ্যাপক রবীন্সের মতে অর্থ মূল্যের নিরূপেই আমরা শুধু যাচাই করিতে পারি কোন বস্তু বা কর্মকৃত্য (service) আর্থিক কিনা। There is no quality in things taken out of their relation to man which can make them economic goods. Whether a particular thing or a particular service is an economic good depends entirely on its relation to valuation.

উপযোগ (Utility) : জনসাধারণ উপযোগ অর্থে উপকারিতা বা তৃপ্তি বুঝিয়া থাকে। কিন্তু অর্থবিদ্যায় উপকারিতা ও তৃপ্তি,—ইহার প্রত্যেকের এক একটি অর্থ আছে। কোন বস্তুর তৃপ্তিদানের ক্ষমতাকেই উপযোগ বলে।

প্রকৃত পক্ষে, যাহা লাভ করা হয়, তাহাই বস্তুর তৃপ্তি (satisfaction)। বস্তুর যদি উপযোগ থাকে, তাহা হইলেই কেবল মাত্র উহাদ্বারা তৃপ্তি লাভ করা সম্ভব। তৃপ্তিলাভ বস্তুর উপযোগের উপর নির্ভর করে। উপযোগ আবার উপকারিতা হইতেও বিভিন্ন। উপযোগ নৈতিক স্পর্শমুক্ত; কোন বস্তুর গুণ নির্দেশও ইহা করে না। তামাক, মদ্ প্রভৃতি বস্তু ক্ষতিকর; উহাদের উপকারিতা নাই। কিন্তু অর্থবিদ্যায় উহাদের উপযোগ আছে; কেননা, অনেকে উহাদের অভাব বোধ করে এবং অভাব তৃপ্তির জন্য অর্থ মূল্য দিতেও প্রস্তুত। অপ্রীতিকর বা ক্ষতিজনক জিনিষেরও উপযোগ থাকিতে পারে, যদি মানুষের চাহিদার অনুপাতে উহার যোগান টান হয়। এই হিসাবে উপযোগকে একটি মানসিক (subjective) ও আপেক্ষিক (relative) ধারণা (concept) বলা চলে। যিনি ধূমপান করেন না, তাহার কাছে তামাকের উপযোগ নাই; কিন্তু ধূমপায়ীর কাছে তামাকের উপযোগ আছে। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, উপযোগ কথাটি কেবল মাত্র ভোগ্যবস্তু সম্বন্ধেই (consumer's goods) খাটে,—উংপাদক-বস্তুর (producer's goods) বেলায় প্রযোজ্য নয়।

অনেক অর্থবিদ্যাবিদ উপযোগ কথাটির প্রতিশব্দ তৈয়ারী করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আধুনিক অনেকে উপযোগের পারবর্তে পক্ষপাত (preference) কথাটি ব্যবহার করেন।

সম্পদ ও উহার বৈশিষ্ট্য (Wealth and its Characteristics) : অনেকে সম্পদ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তাহাদের মতে যে সকল বস্তু মানুষের অভাব পূরণ করিতে সমর্থ, তাহাকেই সম্পদ বলা চলে। সম্পদের এই ব্যাপক অর্থ ধরিলে সামগ্রীর সংগে ইহার কোন পার্থক্য থাকে না। সেইজন্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ সম্পদকে সীমাবদ্ধ অর্থে ব্যবহার করেন। কোন বস্তুকে সম্পদ অর্থে ব্যবহার করিতে হইলে উহার কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার। **প্রথমতঃ**, বস্তুটির উপযোগ থাকা প্রয়োজন। যদি বস্তুর উপযোগ না থাকে, অর্থাৎ ইহা যদি মানুষের অভাব পূরণে তৃপ্তি দান করিতে না পারে, তাহা হইলে ইহাকে সম্পদ বলা চলে না। বস্তুর যদি তৃপ্তি দান করিবার ক্ষমতা না থাকে, তাহা হইলে উহার বিনিময় মূল্যও থাকিবে না—উহা সম্পদ পদবাচ্যও নয়। **দ্বিতীয়তঃ**, চাহিদার তুলনায় বস্তু যোগান টান হওয়া চাই। যে সকল বস্তু প্রকৃতির দান হিসাবে সরাসরি

সম্পদের বৈশিষ্ট্য—
(ক) উপযোগ
(খ) যোগান টান
(গ) হস্তান্তর যোগ্যতা

পাওয়া যায়, সেগুলিকে সম্পদ বলা চলে না ; কেননা, সেগুলির যোগান অফুরন্ত এবং সেইজন্য বাজার দামও নাই। মানুষের শ্রমার্জিত বা শ্রমলব্ধ জিনিষের যোগানই চাহিদার অনুপাতে সীমিত। অতএব এইরূপ বস্তুই সম্পদ। **তৃতীয়তঃ, বস্তুর হস্তান্তর যোগ্যতা থাকা চাই।** যে বস্তু মানুষের হস্তান্তর যোগ্য নয়, উহার উপযোগগুণ বা যোগান টান থাকিলেও, সম্পদভুক্তি করা চলে না। যেমন, বি, এ, পাশের একখানা ডিপ্লোমা—ইহার উপযোগ গুণ ও যোগান টান,—সম্পদের দুইটি বৈশিষ্ট্যই আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ইহাকে সম্পদ বলা চলে না, কেননা ইহার আইনতঃ হস্তান্তর যোগ্যতা নাই। সেই রকম রেলের টিকেট। কিন্তু ব্যবসার সুনাম (goodwill of a business), কিংবা পুস্তকের মুদ্রণাধিকারসত্ব, (copyright of a book) দুইই সম্পদ। কেননা, ইহাদের বিনিময় মূল্য আছে। ইহাদেরকে বেচা কেনা করা যায়, ইহাদের হস্তান্তর যোগ্যতাও আছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে বস্তু মানুষের আভ্যন্তরীণ, উহা সম্পদবাচ্য নয় ; কেননা, উহার হস্তান্তর যোগ্যতা নাই। যেমন, রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সম্পদ বলা চলে না। মানুষের বহির্বস্তুই কেবল হস্তান্তর যোগ্য ও সম্পদবাচ্য।

সম্পদের যে সকল গুণাবলী ধার্য করা হইল, তাহাদের ভিত্তিতে সংগা নির্দেশ করিতে গেলে উহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইবে। বাস্তব (material) এবং অবাস্তব (non-material) যে কোন বহির্বস্তু (external) মানুষের হস্তান্তর যোগ্য হইলেই সম্পদভুক্তি হইতে পারে। কিন্তু যে সকল বাস্তব সামগ্রীর হস্তান্তর যোগ্যতা নাই, কিংবা যে সকল বস্তু মানুষের অন্তর্নিহিত (internal), উহারা সম্পদভুক্তির অযোগ্য। যেমন, বিশুদ্ধ বায়ু, কারিগরের কার্যকুশলতা প্রভৃতি।

লর্ড কীনস্ কিন্তু উপরি উক্ত সীমাবদ্ধ অর্থে সম্পদ কথাটী ব্যবহার করিতে নারাজ। তাঁহার মতে, যে বস্তুর বিনিময় দাম (value-in-exchange) আছে, তাহাই সম্পদ। তিনি বলেন: **Wealth consists of all potentially exchangeable means of satisfying human needs.** অধ্যাপক রবীনস্ ও সম্পদ কথাটী ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বিনিময় মূল্য সাপেক্ষ বাস্তব ও অবাস্তব বস্তু এবং মানুষের সকল কার্যকৃত্যই (service) তিনি সম্পদ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার নিজের কথায়: **"Wealth is not wealth, because of its substantial qualities. It is wealth, because it is scarce."**

সম্পদ বিভাগ (Classification of Wealth) : সুবিধামত সম্পদকে তিনভাগে ভাগ করা চলে : যেমন, (ক) ব্যক্তিগত সম্পদ, (খ) সমষ্টিগত বা সামাজিক সম্পদ ও (গ) জাতীয় সম্পদ।

ব্যক্তিগত সম্পদ (Individual Wealth) : ব্যক্তিগত সম্পদ বলিলে বাস্তব ও অবাস্তব সকল বস্তু ও সম্পত্তিই বুঝাইবে। ব্যক্তিগত সম্পদের মধ্যে একদিকে যেমন ভূসম্পত্তি, বাড়িঘর, আসবাব, তৈজসপত্র, পোষাক পরিচ্ছদ, ব্যাংকের আমানত প্রভৃতি ধরা হয়, অন্য দিকে ব্যবসার সুনাম, গ্রন্থমুদ্রণাধিকারসত্ব ইত্যাদিও ভুক্ত করা হয়। অবশ্য, ব্যক্তির স্বকীয় গুণাবলী যেমন, জ্ঞান, কার্যকুশলতা প্রভৃতি সম্পদবাচ্য নয়; কেননা, সেগুলি হস্তান্তর যোগ্য নয়, যদিও সেগুলি সম্পদের উৎসস্বরূপ। ব্যক্তিগত সম্পদ পরিমাপ করিতে মানুষের ঋণের সমষ্টি বাদ দিতে হয়।

ব্যক্তিগত সম্পদ

সমষ্টিগত বা সামাজিক সম্পদ (Collective or Social Wealth) : সমষ্টিগত বা সামাজিক সম্পদ বলিতে আমরা সেই সকল বাস্তব ও অবাস্তব বস্তুবিশেষকে বুঝি, যাহা সমাজের সকলেই উপভোগ করে এবং সমাজের সকল বাসিন্দাই যাহার মালিক। রাস্তা ঘাট, জাতীয় রেলপথ, সরকারী অফিস প্রভৃতি সামাজিক সম্পদ।

সামাজিক সম্পদ

জাতীয় সম্পদ—(National Wealth) : দেশের ব্যক্তি ও সামাজিক সম্পদের মোট সমষ্টিকেই জাতীয় সম্পদ বলে। দেশের জাতীয় সম্পদ পরিমাপ কবিতে হইলে বার্ষিক উৎপন্ন মোট দ্রব্য-কৃত্যের অর্থমূল্য ধরিতে হয়। সমগ্র বাস্তব ও অবাস্তব দ্রব্যসামগ্রী ও কার্যকৃত্যই দেশের বার্ষিক মোট উৎপন্ন সমষ্টিভুক্তি হইযা থাকে। অবশ্য ইহার সঙ্গে বিদেশে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ যোগ করা হয়, আবার বৈদেশিক ঋণসমষ্টি বাদ দেওয়া হয়।

জাতীয় সম্পদ

সম্পদ ও কল্যাণ (Wealth and Welfare) : সম্পদ ও কল্যাণের অর্থ এক নয়। সম্পদ সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীকে বুঝায়, যাহার যোগান সীমিত, যাহার মানুষের অভাব পূরণ করিবার মত উপযোগ আছে এবং যাহা হস্তান্তর যোগ্য। কল্যাণ একটী অবাস্তব মানস পদার্থ—যাহা সাধারণভাবে ব্যক্তিগত ও সামাজিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে বুঝায়। কল্যাণ সম্বন্ধে ধারণাও দেশ, কাল, পাত্র ভেদে অস্পষ্ট ও বিভিন্ন। কিন্তু সম্পদ সম্বন্ধে ধারণা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

অর্থবিদ্যায় সম্পদের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। সম্পদ সংগ্রহ ও সম্পদ

ব্যয়—এই দুইটী জিনিষ মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও কর্মপন্থাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। মানুষের ব্যক্তিগত সুখস্বাচ্ছন্দ্য এবং সামাজিক কল্যাণ প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ সম্পদ সংগ্রহের উপর নির্ভর করে। সম্পদ বৃদ্ধিতেই ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণ বৃদ্ধি। কিন্তু ইহা হইতে এই মন্তব্য করা উচিত নয় যে, সম্পদই মানব কল্যাণের একমাত্র চাবিকাঠি।

কল্যাণের সুষ্ঠু পরিচিতি একমাত্র সম্পদে নয়। সম্পদ বলিতে আমরা সেই সকল দ্রব্য সামগ্রীকে বুঝি, যাহাদের অভাব পূরণ করিবার উপযোগ আছে—সে উপযোগ বাঞ্ছনীয়, কি অবাঞ্ছনীয়, তাহার বিচার আমরা করি না। অনেক জিনিষ আছে যাহা অবাঞ্ছনীয় উপযোগ সৃষ্টি করে; উহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু কল্যাণ বৃদ্ধি করে না। যেমন মদ্য তৈয়ারী। কোন দেশের সম্পদ বৃদ্ধিতে ঐ দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ বৃদ্ধি হয় কি না—তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে ঐ দেশের ধনবটনের উপর। সম্পদ বা ধনবণ্টনে যে দেশে অসমতা বিদ্যমান, সেখানে অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি অসম্ভব। এইরূপ আর্থিক অবস্থায় একদিকে যেমন ধনিক শ্রেণীর অভাব পূর্তির উপযোগ প্রচুর, অন্যদিকে দরিদ্রের ভোগ্য উপযোগ পরিমাণ অবাঞ্ছিতভাবে সীমিত। এইরূপ সমাজে দরিদ্রশ্রেণী শুধু যে ভোগ্য উপযোগের অভাবেই পীড়িত তাহা নহে, তাহাদের দৈন্য, অসন্তোষ আরও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পায়, যখন তাহারা ধনিক শ্রেণীর আদব কায়দা ও জীবনযাত্রার মান অনুকরণ করিতে থাকে।

আর্থিক কল্যাণ শুধু ধনবণ্টন ব্যবস্থার উপরই যে নির্ভর করে তাহা নহে, ধনোৎপাদন ও ধনব্যয়েব প্রণালীও সমাজ কল্যাণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। যে উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের স্বাধীন কর্মোৎসাহ ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির কোনই সুযোগ সুবিধা নাই, সেখানে সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু অর্থনৈতিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায় না। সেইরূপ, যদি উৎপন্ন সম্পদ উপযুক্ত ব্যবহারে ব্যয় না করা হয়, তাহা হইলেও সম্পদ বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু দেশের কল্যাণ বৃদ্ধি হইবে না। যেমন, দেশের উৎপন্ন কাগজ যদি কুমার্জিত রুচির কেতাব প্রণয়ণে ব্যবহার করা যায়, তাহা হইলে ব্যক্তিগত সম্পদ বৃদ্ধি পাইতে পারে, কিন্তু দেশের সমষ্টিগত কল্যাণ ক্ষুণ্ণ হইবে।

অতএব, আমরা বলিতে পারি যে, দেশের সম্পদ বৃদ্ধি ও আর্থিক কল্যাণ বৃদ্ধি এক কথা নয়। আর্থিককল্যাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে সম্পদ উৎপাদন, খাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার উপর।

মূল্য (Value): মূল্য কথাটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইতে পারে; (ক) ব্যবহার মূল্য (value-in-use) ও (খ) বিনিময় মূল্য (value in exchange)। কোন জিনিষের ব্যবহার মূল্য অর্থ উহার অভাব পূরণ করিবার ক্ষমতা। বস্তুর উপযোগই (utility) উহার ব্যবহার মূল্য। অপর পক্ষে, কোন বস্তুর বিনিময় মূল্য হইল ঐ বস্তুর পরিবর্তে অপর জিনিষ ক্রয় করিবার ক্ষমতা। যে সকল বস্তুর ব্যবহার মূল্য আছে, সেগুলি মানুষের অভাব পূরণ করিতে পারে বটে, কিন্তু যেহেতু সেগুলির যোগান টান নয়, সেইহেতু সেগুলির বিনিময় মূল্য নাই। বাতাসের ব্যবহার মূল্য অসামান্য; কিন্তু যেহেতু ইহার যোগান সীমাবদ্ধ নয়, সেইজন্য ইহার বিনিময় মূল্যও নাই। অতএব বস্তুর বিনিময় মূল্য তখনই থাকিবে, যখন ইহা মানুষের অভাব পূরণ করে ও ইহার সরবরাহ সীমাবদ্ধ। হীরকের যোগান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ; ইহার ক্রয় ক্ষমতাও বেশী; সেইজন্য হীরকের বিনিময় মূল্যও অধিক। বস্তুর যোগান যতই টান হইবে, উহার বিনিময় মূল্যও তত চড়িবে।

ব্যবহার মূল্য ও বিনিময় মূল্য

অর্থবিদ্যায় মূল্য অর্থ ই বিনিময় মূল্য। একটা বস্তুর বিনিময় মূল্য হইল ইহার অন্য জিনিষ কিনিবার শক্তি। অন্য জিনিষের নিরূপে উক্ত বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয়। ইহা দুই বা ততোধিক বস্তুর তুলনামূলক। যখন একখানি ধুতি ও এক জোড়া জুতার মূল্য এক, তখনই এই দুই সামগ্রী বিনিময় সাপেক্ষ। এই দুইটী সামগ্রীর অনুপাতই ইহাদের বিনিময় মূল্য।

বাজার দাম (Price): বাস্তব জীবনে সামগ্রীর বিনিময় মূল্য প্রকাশ পায় অর্থের মাধ্যমে। আর অর্থের মাধ্যমে বিনিময় মূল্য যখন নির্ধারিত হয়, তখনই তাহা হয় বাজার দাম। বাস্তব জীবনে তাই একটি বস্তুর বিনিময় মূল্য অন্য বস্তুর অনুপাতে আমরা নির্ধারণ করি না; অর্থের মাপকাঠিতে ইহার বাজার দাম স্থির হয়।

বিনিময় মূল্য ও বাজার দামের সম্পর্কে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। সামগ্রী সাধারণের বাজার দাম বাড়তি বা কমতি হইতে পারে কিন্তু উহাদের বিনিময় মূল্যের উঠানামা হয় না। সামগ্রী সাধারণের বাজার দাম দুইটী জিনিষের উপর নির্ভর করে: প্রথমতঃ, অর্থের নিরূপে বিনিময় সাপেক্ষ দ্রব্য-সামগ্রীর পরিমাণ এবং দ্বিতীয়তঃ, চালু অর্থের পরিমাণ। যদি চলতি অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সামগ্রীসাধারণের বাজার দামও চড়া হইবে; আর অর্থের পরিমাণ যদি সংকুচিত হয়, তাহা হইলে বাজার দরের পড়তি হইবে

(অবশ্য যদি অন্য কোন কিছুর রদবদল না হয়)। কিন্তু সামগ্রীসাধারণের বিনিময় মূল্যের উঠা নামা নাই। যদি বলি, আটার বিনিময় মূল্য বাড়িয়াছে—তাহার অর্থ এই যে, আটার মূল্যের অনুপাতে অন্য জিনিষপত্রের মূল্য কমিয়াছে। তাহার অর্থ এই নয় যে, সমস্ত সামগ্রীর সাধারণ বিনিময় মূল্যের হ্রাস হইয়াছে। যখন পণ্যসাধারণের বাজার দাম বাড়ে, তখন অর্থের অনুপাতে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময় মূল্য চড়া হয় বটে, কিন্তু জিনিষপত্রের অনুপাতে অর্থের মূল্যের অধোগতি হয়।

খাদন (**Consumption**): খাদনদ্বারা মানুষের অভাব পূর্তি হয়। খাদন অর্থ বস্তু বা সামগ্রীর উপযোগ ব্যবহার ও উহার ধ্বংস সাধন। যখন আমরা জুতা ব্যবহার করি অথবা খাদ্য ভক্ষণ করি, আমাদের ভোগকরণ জিনিষগুলির উপযোগ বিনষ্ট করিয়া দেয়। খাদনদ্বারা একদিকে যেমন আমাদের অভাব মেটে, অন্য দিকে ইহা ভোগ্য দ্রব্যের তৃপ্তিকারক শক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। অর্থবিদ্যায় খাদন উৎপাদনের বিপরীতার্থক শব্দ। উৎপাদন অর্থ উপযোগ সৃজন, খাদন অর্থ উপযোগ বিনাশ।

খাদন ও উৎপাদনের সম্বন্ধ

উৎপাদনের সংগে খাদনের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। অভাব পূর্তির জন্যই মানুষের দ্রব্য সামগ্রী খাদন প্রয়োজন। খাদনই আবার সকল উৎপাদন প্রচেষ্টার উৎস স্বরূপ। কিন্তু খাদন ও উৎপাদনের এই সম্বন্ধ সব সময় সত্য নয়। কেননা, অনেক সময় উৎপাদন প্রচেষ্টাই মানুষের নূতন অভাবের সৃষ্টি করে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে বাজারে নূতন জিনিষের আমদানী হয়। সেগুলির ব্যবহার পরিচিতির সংগে সংগে মানুষের অভাব সৃষ্টি হয়। মোটর গাড়ী আবিষ্কারের পূর্বে উহার অভাব কেহ বোধ করে নাই, কিন্তু আবিষ্কারের সংগে সংগে মানুষ উহার উপযোগ বুঝিতে পারিয়াছে এবং তাহার অন্য সকল অভাবের মধ্যে মোটর গাড়ীর অভাবও অনুভব করিয়াছে। অতএব খাদনকে উৎপাদনের কারণ নির্দেশ না করিয়া একটা আরেকটার সংগে যে সংশ্লিষ্ট তাহাই বলা ভাল।

অপরিহার্য দ্রব্য, আরাম দ্রব্য, বিলাস দ্রব্য (**Necessaries, Comforts and Luxuries**): মানুষের অভাব পূর্তির জন্য যে দ্রব্য সম্ভার প্রয়োজন সেগুলিকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা চলে।

অপরিহার্য দ্রব্য

নিজের ভরণপোষণ করা ও কর্মক্ষমতা বজায় রাখার জন্য মানুষের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রয়োজন সেইগুলিকেই অপরিহার্য দ্রব্য বলা হয়। এই গুলিকে

আবার তিন শ্রেণীতে ভাগ করা চলে: যথা—(ক) জীবন ধারণের খোরপোষ (necessaries of life), (খ) কার্য দক্ষতার অপরিহার্য দ্রব্য (necessaries for efficiency) এবং (গ) কৃত্রিম আবশ্যকীয় দ্রব্য (conventional necessaries)। জীবন ধারণের খোরপোষ অর্থ সেই সকল সামগ্রী, যাহা না হইলে আমাদের জীবন রক্ষা করাই অচল হইয়া পড়ে। যেমন খাদ্যবস্ত্র, পরিধেয় প্রভৃতি। কার্যদক্ষতার অপরিহার্য দ্রব্য বলিতে জীবন ধারণের খোরপোষ ত বুঝাইবেই, তাহা ছাড়াও সেই সকল দ্রব্যকে বুঝাইবে, যাহার ব্যবহারদ্বারা মানুষের কার্যকুশলতা বৃদ্ধি পায়; যেমন, দুধ, ঘি, মাংস, মাখন ইত্যাদি। কৃত্রিম আবশ্যকীয় দ্রব্য সেইগুলি, যেগুলির ব্যবহার ব্যতিরেকে মানুষের কার্য দক্ষতা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় না, অথচ সেগুলি ব্যবহারে মানুষ এমন অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে, খোরপোষের সমস্ত যোগান ব্যবস্থা সুরাহা করিবার পূর্বেই সেগুলি ক্রয় করিয়া থাকে। যেমন, তামাক, চা, ইত্যাদি।

আরাম দ্রব্য

আরাম দ্রব্য বলিতে সেই সকল দ্রব্য বুঝায় যাহা কৃত্রিম আবশ্যকীয়ও নয় অথবা বিলাসদ্রব্যের তালিকাতেও পড়ে না। এই দুই প্রকার দ্রব্যের মাঝামাঝি, সেই সকল সামগ্রী আরাম দ্রব্য যাহা মানুষের কার্যদক্ষতা বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু খরচের তুলনায় সে দক্ষতার মূল্য কম ছাড়া বেশী নয়।

বিলাস দ্রব্য

বিলাস দ্রব্য অর্থ সেই সকল সামগ্রী, যে গুলির খাদন মানুষের অনাবশ্যক অভাব পূর্তি করে। বিলাস দ্রব্য ব্যবহারে মানুষের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি পাওয়া দূরে থাক, বহু ক্ষেত্রে কর্মপটুতা ক্ষুণ্ণই হয়।

উপরি উক্ত শব্দ কয়টী আপেক্ষিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সকল সামগ্রী এক দেশে অপরিহার্য প্রযোজনীয়, অপর দেশে সেইগুলি আবার বিলাসদ্রব্য বলিযা ব্যবহৃত হইতে পারে। যে বস্তু একজনের কাছে প্রয়োজনীয়, দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে উহা বিলাস সামগ্রী হইতে পারে। কৃত্রিম আবশ্যকীয় জিনিষ-গুলিও বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন দলব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

বিলাস সামগ্রী ব্যবহারের পক্ষে যৌক্তিকতা

বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করা কি যুক্তিযুক্ত? বিলাস সামগ্রী সাধারণতঃ দুই রকম: (ক) ক্ষতিকর এবং (খ) ক্ষতিহীন। ক্ষতিহীন বিলাস সামগ্রী ব্যবহারে মানুষের কার্যপটুতা বৃদ্ধিও হয় না বা ক্ষুণ্ণও হয় না। কিন্তু ক্ষতিকর বিলাস সামগ্রী মানুষের কার্যকুশলতা নষ্ট করে। অতএব, ক্ষতিহীন বিলাস সামগ্রীই কেবল ব্যবহার্য। অনেকে বিলাস সামগ্রী ব্যবহার যুক্তি সংগত মনে করেন, কেননা তাহাতে

শ্রমিকের অতিরিক্ত কর্মসংস্থান হয়। কিন্তু এই যুক্তি ভিত্তিহীন। কেননা, যে অর্থ বিলাসদ্রব্য ক্রয়ে এখন খরচ হয়, তাহা অন্য জিনিষ ক্রয় করিতে খরচ হইত অথবা বিনিয়োগ হইতে পারিত। যাহার ফলে মজুরের চাকরীর আরও সংস্থান হইত। বিলাস দ্রব্য ব্যবহারের পক্ষে আসল যুক্তি হইল এই যে, বিলাসদ্রব্যের লিপ্সা অনেক সময় অনেককে সম্পদ আহরণ করিতে উৎসাহিত করে। এই উৎসাহ বৃদ্ধির সংগে সংগে মানুষের উৎপাদন শক্তিরও উত্তরোত্তর উন্নতি হয়।

উৎপাদন (**Production**): সাধারণতঃ উৎপাদন অর্থ বাস্তব বস্তুর সৃষ্টি। কিন্তু বাস্তব জিনিষ (**matter**) মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না। বাস্তব জিনিষ প্রকৃতির দান। প্রকৃতিদত্ত জিনিষকে মানুষ বিভিন্নরূপ বা আকার মাত্র দিতে পারে। কাঠ মানুষ সৃষ্টি করিতে পারে না বটে, কিন্তু সূত্রধর তাহার পরিশ্রমদ্বারা কাঠ হইতে চেয়ার বা টেবিল তৈয়ার করিতে পারে। কাঠ হইতে যখন চেয়ার বা টেবিল তৈয়ার হয়, তখন উপযোগ সৃষ্টি হয়। এই উপযোগ সৃষ্টিকেই অর্থবিদ্যায় উৎপাদন বলে। মানুষ তাহার শ্রমদ্বারা যখন প্রকৃতিদত্ত জিনিষকে নূতন আকার বা রূপদান করে, তখনই হয় উপযোগ সৃষ্টি এবং এই উপযোগ সৃষ্টিই উৎপাদনের গোড়ার কথা।

উপযোগ সৃষ্টিই উৎপাদন

উপযোগ সৃষ্টি বিভিন্ন প্রকারের হইতে পারে—যেমন, (ক) আকৃতি-গত উপযোগ (form utility) (খ) দেশ-গত উপযোগ (place utility) (গ) কাল-গত উপযোগ (time utility) এবং (ঘ) কৃত্য-গত উপযোগ (service utility)। যখন কোন জিনিষের আকৃতি, বর্ণ, ওজন, গন্ধ বা যে কোন বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং সেই পরিবর্তিত অবস্থায় জিনিষটি মানুষের অভাব পূর্তির ক্ষমতা বেশী পরিমাণে লাভ করে, তখন আমরা জিনিষের আকৃতি-গত উপযোগ সৃষ্টি বলি। অনেক সময় আমরা দেখি, একটা জিনিষের সরবরাহ, একস্থানে প্রচুর, অন্যস্থানে আবার বিরল। এমতাবস্থায় জিনিষটিকে যদি প্রথম স্থান হইতে দ্বিতীয় স্থানে আমদানী করা যায়, তাহা হইলে সেখানে জিনিষটির উপযোগ বৃদ্ধি হইবে। ইহাকে দেশ-গত উপযোগ বলে। তৃতীয়তঃ, জিনিষের যোগান এক ঋতুতে প্রচুর হইতে পারে, আবার অন্য এক ঋতুতে টান হইতে পারে। প্রচুর যোগানের সময় জিনিষটি মজুদ রাখিয়া, উহা যদি টান যোগানের সময় সরবরাহ করা হয়, তাহা হইলে জিনিষটির উপযোগ বৃদ্ধি পায়—উহাকে

আকৃতিগত, দেশ-গত, কাল-গত ও কৃত্য-গত উপযোগ

কাল-গত উপযোগ বলে। পরিশেষে, এক ব্যক্তি যখন আর এক ব্যক্তির জন্ম প্রত্যক্ষ সেবা বা কার্য করে, তাহাতেও উপযোগ সৃষ্টি হয়। উহাকে সেবাকার্য বা কৃত্য-উপযোগ বলে। যেমন, বাড়ীর চাকর, শিক্ষক, সরকারী চাকুরিয়া প্রভৃতির কৃত্য ও সেবাকার্য।

উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রম (Productive and Unproductive Labour): উৎপাদক ও অনুৎপাদক শ্রমের তফাৎ প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদগণ বেশী করিয়া নির্দেশ করিতেন। মার্কেন্টিলিষ্টগণ (Mercantilists) দেশের বহির্বাণিজ্য প্রসারকেই দেশের সকল উৎপাদক শ্রমের শ্রেষ্ঠ অবদান মনে করিতেন। আবার ফিজিওক্রাটগণ (Physiocrats) দেশের কৃষিকার্যকে অর্থনৈতিক চরম বিকাশ ও উৎপাদকশ্রমের পুরস্কারস্বরূপ ভাবিতেন। আদম স্মিতের মতে, যে শ্রম শুধু বাস্তব দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে সমর্থ, উহাই কেবল উৎপাদকশ্রম বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্য। আদম স্মিতের এই সংগা অনুযায়ী অনেকের শ্রমই অনুৎপাদক শ্রম পদবাচ্য। যেমন, শিক্ষক, আইনজীবী, চিকিৎসক, সঙ্গীতজ্ঞ প্রভৃতির শ্রম অনুৎপাদক; ইঁহাদের কাহারও শ্রম বাস্তব সামগ্রী উৎপাদন করিতে পারে না।

আধুনিক অর্থবিদ্যা উৎপাদক ও অনুৎপাদকশ্রমের অনৈসর্গিক বিভেদ অস্বীকার করে। আধুনিকদের মতে, যে কোন শ্রম উৎপাদক শ্রম বলিয়া গ্রহণ করা চলে, যদি উহা মানুষের অভাব পূর্তি করিতে সহায়তা করে। এই অর্থে প্রায় সকল শ্রমই উৎপাদক শ্রম। কেবল যে শ্রম মানুষের আবশ্যকীয় বা চাহিদা মাফিক সামগ্রী তৈয়ারী করে না, সেই শ্রমকেই অনুৎপাদক শ্রম বলা চলে।

উৎপাদনের উপাদান বা কারক (Factors of Production): যে কোন সামগ্রী বা কৃত্য সম্মিলিত উৎপন্ন বিশেষ (joint product)। ইহা সম্মিলিত উৎপন্ন এই অর্থে যে, ইহা বিভিন্ন উৎপাদক কারকের সমবেত কার্যফল। উৎপাদনের এই কারকগুলি কি কি? প্রাচীন অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, উৎপাদনের মাত্র তিনটি কারক: যথা—ভূমি, শ্রম ও মূলধন। ভূমি বলিতে শুধু পৃথিবীর উপরি ভাগের মাটীকেই বুঝায় না; প্রাকৃতিক যে কোন দান, যাহা মানুষকে উৎপাদনে সহায়তা করে, তাহাই অর্থশাস্ত্রে ভূমি। শ্রম অর্থ মানুষের কায়িক বা মানসিক কর্ম্ম প্রচেষ্টা। প্রাকৃতিক সম্পদ সংযোগে মানুষের শ্রম অনেক সময় বাস্তব সামগ্রী তৈয়ারী করে। এই বাস্তব সামগ্রী আবার উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয়। তখন ইহাকে মূলধন বলে। ইহা একদিকে

অতীত শ্রম-উৎপন্ন, অন্যদিকে উৎপাদনের সহায়-স্বরূপ। উৎপাদনক্রমের প্রসার ও জটিলতার সংগে সংগে আর একটি কারকের সহযোগ ও কৃত্য অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা ইহাকেই করিতে হয়। এই সংগঠনকর্তার কার্যাবলী অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। কি করিয়া অত্যন্ত কম খরচের মধ্যে খুব বেশী মুনাফা লাভ সম্ভব—এই লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া তাহাকে উৎপাদন কারক সমূহের বিভিন্ন পরিমাণ নির্ধারণ করিতে হয়; উহাদের সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন ও গোটা উৎপাদন ক্রমের সংগঠন করিতে হয়।

অনুশীলনী

1. Define wealth. Explain its characteristics with illustrations.
2. Discuss the relation between wealth and economic welfare.

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় আয় (National Income)

আধুনিক অর্থবিদ্যায় জাতীয় আয়ের বিশ্লেষণ ও আলোচনা বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বহু অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধান একমাত্র জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের অন্যান্য সমস্যার সংগে পরিচয় ঘটিবার আগেই আমরা জাতীয় আয়ের আলোচনা সুরু করিলাম।

জাতীয় আয় কি, তাহা কী ভাবে পরিমাপ করা যায় প্রভৃতি প্রশ্নের জবাব গোড়াতে না দিয়া, আমরা পূর্বাহ্নে 'আয়' কথাটার প্রকৃত অর্থ কি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

আয়, সম্পদ ও মূলধন

আয় (Income): আয় কথাটার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে হইলে, ইহাকে সম্পদ কথাটি হইতে তফাৎ করিতে হইবে। সম্পদ হইল মানুষের অভাব পূর্তির জন্য জমায়েত সুবিধা (stored up facilities); আর আয় হইল সম্পদ হইতে উদ্ভূত কৃত্য প্রবাহ (flow of services yielded by wealth)। উদাহরণ স্বরূপ বলা চলে, বাসগৃহ সম্পদ,

কিন্তু ইহার আশ্রয় হইল আয়। শুধু সম্পদ-উদ্ভূত কৃত্য প্রবাহের অর্থমূল্যই আয় নয়; আয় বলিতে মানুষের কার্যক্রমের মূল্যও ধরা হয়। যেমন, লেখকের বা অধ্যাপকের কার্যক্রমের মূল্য। মূলধন হইতেও আয়কে তফাৎ করা দরকার। যে সম্পদ আয় উৎপাদন করিতে সমর্থ তাহাকে মূলধন বলে। যে সম্পদ সামান্য ব্যবহারের ফলে নিঃশেষ হইয়া যায় এবং আয় উৎপাদন-কারী নয়, তাহাকে মূলধন বলা চলে না। কারখানা গৃহে কলকব্জা বা কাচামাল আয় উৎপাদনকারী বলিয়া মূলধন পদবাচ্য। কিন্তু সাম্প্রতিক ব্যবহৃত খাদ্যবস্তু মূলধন নয়। যে যে খাদ্যবস্তু ভবিষ্যতে ব্যবহার বা বিক্রয়ের জন্য গুদামজাত করিয়া রাখা হয়, তাহা মূলধন। আয়কে দুই ভাবে দেখা চলে: আর্থিক আয় (money income) এবং প্রকৃত আয় (real income)। কোন এক সময় এককে (unit of time) মানুষ যে অর্থের পরিমাণ রোজগার করে তাহা আর্থিক আয়। প্রকৃত আয় অর্থ সেই সব কৃত্যপ্রবাহ, যাহা কোন সময়ব্যাপী মানুষ উপভোগ করে। আর্থিক আয়ের সংগে সংগে অপর যে সকল সুযোগ সুবিধা উপভোগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত আয়। যেমন, খাজনাবিহীন বাসগৃহের সুবিধা, বিনা ব্যয়ে জল, চাকর বাকরের সুযোগ সুবিধা ইত্যাদি।

জাতীয় আয় (National Income): অর্থবিদ্যাবিদ অধ্যাপক মার্শাল ব্যাপক দৃষ্টিভংগি লইয়া জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতীয় আয় পরিমাণ বাচক (quantitative), অর্থ (monetary) সম্বন্ধীয় নয়। তাঁহার মতে, দেশের বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের পরিমাণ সমষ্টিই মোট জাতীয় আয় (Gross National Income)। মোট জাতীয় আয় হইতে কারখানার কলকব্জা ব্যবহার জনিত বার্ষিক অবচয় (depreciation for wear and tear of capital goods) পরিমাণ বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় (Net National Income) পরিমাপ করা যায়।

জাতীয় আয়ের অর্থ— মার্শালের মতবাদ

মার্শালের পরিমাণ বাচক (quantitative) এই বিশ্লেষণের কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, কোন দেশের বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের সমষ্টি সমজাতীয় নয়। অসমগোত্রীয় উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্য সমূহের পরিমাপ করা অর্থের মাপকাঠি ছাড়া সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, পরিমাণবাচক নিরূপে (in quantitative terms) কারখানা ও কলকব্জা ব্যবহার জনিত বার্ষিক অবচয় বাদ দেওয়া আরও অসম্ভব।

উপরি উক্ত অসুবিধাগুলি দূরীকরণের জন্য অর্থের নিরূপে (in monetary

terms) জাতীয় আয়ের বাখ্যান করা চলে। দেশের বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের সমষ্টিগত অর্থমূল্য হইতে যদি কলকব্জা ব্যবহার জনিত বার্ষিক অবচয়ের অর্থ পরিমাণ বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে নীট জাতীয় আয়ের পরিমাপ সম্ভব হয়। কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, অর্থমূল্যের মাপকাঠিই দেশকল্যাণের সঠিক পরিমাপ নয়। এমন অনেক সামগ্রী বা কৃত্য আছে, যাহা দেশকল্যাণের খুবই অনুকূল অথচ অর্থের মাপকাঠিতে তাহাদের পরিমাপ সম্ভব নয়। যেমন, করমুক্ত সেতুর কৃত্য, কিংবা গৃহিণীর মজুরীবিহীন সেবাকার্য।

অধ্যাপক পিগু কিন্তু সংকীর্ণ দৃষ্টি ভংগি লইয়া জাতীয় আয় বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, জাতীয় আয় সমাজের বৈষয়িক আয় সমষ্টির সেই অংশ যাহা অর্থদ্বারা পরিমাপ করা চলে। এই অর্থে বিদেশাগত আর্থিক আয়ও জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। "That part of the objective income of the community including, of course, income derived from abroad which can be measured in money" (Pigou).

অধ্যাপক পিগুর মতবাদ

অধ্যাপক পিগুর জাতীয় আয়ের সংগাটিরও অসংগতি আছে। যেমন ধরা যাক,—এক ব্যক্তি গৃহস্থালীর কাজের জন্য মজুরী করা এক পরিচারিকা নিযুক্ত করিল। যেহেতু পরিচারিকার কাজ এখানে অর্থমূল্যে বিনিময় হইতেছে, সেইহেতু উহা জাতীয় আয়ে একটা অংশ হিসাবে ভুক্তি হইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি প্রণয়াসক্ত হইয়া ঐ পরিচারিকার পাণিগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ পরিচারিকা-বধূর গৃহস্থালীর কার্য জাতীয় আয় ভুক্তি হইবে না। কেননা, ঘরণী তাহার কাজের জন্য কোন অর্থমজুরী গ্রহণ করেনা।

অধ্যাপক ফিশার জাতীয় আযের আর এক ব্যাখান দিয়াছেন। তাঁহার মতে জাতীয় আয় দেশের বার্ষিক নীট উৎপন্নের সেই অংশ, যাহা বৎসরের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহৃত হয়। 'National dividend is that part of the net product of a year that is directly consumed during a year." তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে ফিশারের মতবাদ সঠিক। তবে মানুষের ব্যবহৃত সামগ্রী ও কৃত্যের বার্ষিক তালিকা রচনা করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার।

অধ্যাপক ফিশারের মতবাদ

জাতীয় আয়ের যে তিনটা সংগা আমরা বিশ্লেষণ করিলাম, তাহার প্রত্যেকটারই কোন না কোন গলদ আছে। তবে প্রত্যেকটার স্বকীয় গুণও আছে।

জাতীয় আয় নির্ধারণের কি উদ্দেশ্য, সেই পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যেকটি সংগার গুণ যাচাই করা চলিতে পারে।

সাধারণভাবে ধরিতে গেলে বর্তিষ্ণু অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়, (stationary economy) মার্শাল ও ফিশারের মতবাদের সমন্বয় করা চলে। স্থির অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় মূলধনের পুঁজিপাটার পরিমাণ একই থাকে—কোন রদবদল হয় না। ফলে, দেশের বার্ষিক উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের পরিমাণ সমষ্টি দেশের বার্ষিক ব্যবহৃত সামগ্রী ও কৃত্যের পরিমাণ সমষ্টির সমান হয়। দেশে বিভিন্ন বৎসরের জীবনযাত্রার মানের তুলনামূলক একটা নিখুঁত ধারণা করিতে হইলে, কিংবা দেশে জনসাধারণের করভা'র বহন করিবার আপেক্ষিক ক্ষমতা নিরূপণ করিতে হইলে, ফিশারের মতবাদের উপর নির্ভর করা খুব যুক্তিযুক্ত। মার্শালের মতবাদ খুবই বাস্তব; দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতির পরিমাপ করিবার পক্ষে তাঁহার মতবাদ অতিশয় প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক যন্ত্র-বিশেষ। অপর পক্ষে, সংখ্যাতত্ত্ব বিষয়ক সূক্ষ্ম গণনার কার্যে পিগুর মতবাদ বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

জাতীয় আয়ের পরিমাপ (Measurement of National Income): জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সাধারণতঃ দুইটী পদ্ধতি আছে: (১) **শেষ-উৎপন্ন সমষ্টি** (Final-Product Total) এবং (২) **কারক-বেতন সমষ্টি** (Factor-Payments Total)।

শেষ-উৎপন্ন সমষ্টির দ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ (Final-Product Total): এই পদ্ধতিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে প্রথমে দেশের মোট বার্ষিক উৎপন্ন সমষ্টি (Gross National Product) নির্ধারণ করিয়া উহার অর্থমূল্য ধরিতে হইবে। এই অর্থমূল্য অবশ্য উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের বৎসরের বাজার দর নিরূপেই ঠিক করিতে হইবে। অতঃপর, মোট জাতীয় বার্ষিক উৎপন্ন সমষ্টির অর্থমূল্য হইতে কারখানা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতির বার্ষিক অবচয় মূল্য (depreciation charges) বাদ দিয়া নীট জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইবে।

শেষ-উৎপন্ন সমষ্টিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ

উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের অর্থমূল্য নিরূপণ করিতে কতগুলি অসুবিধা ও অসংগতি সম্পর্কে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। **প্রথমতঃ**, কেবলমাত্র উৎপন্ন শেষ-সামগ্রী বা কৃত্যের (final goods or services) অর্থমূল্যই গ্রহণ করিতে হইবে। যে সকল সামগ্রী বা কৃত্য উৎপাদনের শেষ অবস্থায় উন্নীত হয় নাই, অর্থাৎ যাহা উৎপাদনের

এই পদ্ধতির অসুবিধা—অসংগতি

মধ্যাবস্থায় (intermediate), উহাদের অর্থমূল্য জাতীয় আয় পরিমাপে ধরা হয় না। যেমন, উৎপন্ন বস্ত্রের অর্থমূল্যই ধরিতে হইবে, বস্ত্র বয়ন করিতে যে তুলার প্রযোজন হইয়াছে, সেই তুলার মূল্য ধরিলে দুইবার গণনা (double counting) করার দোষ হইবে। এখানে উৎপন্ন বস্ত্র হইল শেষ-সামগ্রী (final goods) ও তূলা হইল মধ্যাবস্থার সামগ্রী (intermediate goods)। **দ্বিতীয়তঃ**, জাতীয় উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্য সমষ্টি নির্ধারণ করিতে দেশের রপ্তানী সামগ্রী বাদ দিতে হইবে এবং আমদানী দ্রব্য ও কৃত্যসমষ্টি ধরিতে হইবে। **তৃতীয়তঃ**, উৎপন্ন সামগ্রীর উপর কর ধার্য হইলে সামগ্রীর প্রকৃত বাজার দর নির্ধারণের সময় উহার মধ্যে যে কর প্রবেশ করিয়াছে তাহা বাদ দিতে হইবে। **চতুর্থতঃ**, বিভিন্ন সময়ের উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের তুলনামূলক পরিমাপ করারও অসুবিধা আছে ; কেননা, অর্থের ক্রয় ক্ষমতার রদ-বদল হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে সামগ্রী ও কৃত্যসমূহের সূচক সংখ্যা (index number) নির্ণয়দ্বারা অর্থমূল্যের উঠানামার পরিমাপ করিয়া বিভিন্ন সময়ের জাতীয় আয় নির্ধারণ করিতে হইবে। **পঞ্চমতঃ**, জাতীয় আয় নির্ধারণের আর একটি সমস্যা হইল যে, রাষ্ট্র যে সমস্ত সামগ্রী বা কৃত্য সরবরাহ করে তাহাদের বৈশিষ্ট্য ও বাজার দাম নিরূপণ। রাষ্ট্র যে সমস্ত সামগ্রী বা কৃত্য সরবরাহ করে তাহাদের সবই উৎপন্ন-শেষপণ্য (final products) নয়। মধ্যাবস্থার সরকারী উৎপন্ন (intermediate goods) সামগ্রী বা কৃত্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিলে চলিবে না। রাষ্ট্র উৎপন্ন সামগ্রী ও কৃত্যের অর্থমূল্য নিরূপণ করাও সমস্যার ব্যাপার। যে সকল সামগ্রী বা কৃত্য সরকার বাজারের মারফতে বিক্রয় করে, তাহাদের বাজার দরই তাহাদের অর্থমূল্য। কিন্তু রাষ্ট্র-উৎপন্ন বেশীরভাগ সামগ্রী ও কৃত্যই বাজার দরে বিক্রি হয় না। এই সামগ্রী ও কৃত্যের অর্থমূল্য নির্ণয় করিতে হয় ইহাদের উৎপাদন খরচের নিরূপে।

কারক বেতন সমষ্টিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ (Factor Payments-Total) : এই পদ্ধতিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিতে হইলে উৎপাদক কারক সমূহের উপার্জিত অর্থ-আয়ের মোট যোগফল ধরিতে হইবে। উৎপাদক কারক সমূহের মোট আয় বলিতে জমির নীট খাজনা, সমস্ত ঋণকৃত মূলধন বা দাদনের সুদ, শ্রমের মজুরী ও ভাতা এবং ব্যবসায় সংগঠনের মুনাফাকে বুঝায়। **কিন্তু জাতীয় আয় নির্ণয়ের** সময় মোট কারক বেতন বা আয়কেই ধরা হয় না। **জাতীয় আয়**

উৎপাদক কারক-বেতন সমষ্টিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ

প্রকৃত পক্ষে উৎপাদনের পরিমাপ। সুতরাং যে সমস্ত আয়ের বিনিময়ে কোন পণ্য বা কার্য উৎপন্ন বা সরবরাহ হয় না, সে আয়কে কারক বেতনভুক্ত করা হয় না ও জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরা হয় না। যেমন, সরকারী ত্রাণস্বরূপ বাস্তুহারাদের অর্থসাহায্য ; এই অর্থ আয়ের পরিবর্তে প্রাপকগণ কোন উৎপাদকীয় কার্য করিয়া সরকারকে সাহায্য করে না। এইরূপ অর্থ সাহায্যকে "হস্তান্তর আয়" (transfer payment) বলা হয়। কারক বেতন সমষ্টিদ্বারা জাতীয় আয় পরিমাপ করিবার সময় এইরূপ হস্তান্তর আয় বাদ দিতে হইবে। কিন্তু সরকারী ঋণপত্রের উপার্জিত সুদের আয়কে হস্তান্তর আয় বলা চলে না। উৎপাদকীয় (productive) সরকারী ঋণ দেশের সামগ্রী ও কৃত্য উৎপাদনে সহায়তা করে। এইরকম সরকারী ঋণপত্রদ্বারা উপার্জিত সুদ জাতীয় আয়ের মধ্যে ধরিতে হইবে। কিন্তু ধ্বংসমূলক যুদ্ধ অভিযানের জন্য সরকার যে ঋণ করেন সেই ঋণপত্রের বিনিময়ে দেয় সুদকে হস্তান্তর আয় বলা যায় এবং এই আয়কে জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরা হয় না। আবার, অনেক আয় আছে যাহা কোন কারককেই দেওয়া হয় না। যেমন যৌথকারবারের মোট উপার্জিত আয়ের একটা অংশ সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়, লভ্যাংশ হিসাবে অংশীদারদের মধ্যে বিতবণ করা হয় না। এই অবণ্টিত মুনাফা জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হইবে। কিন্তু যৌথকারবারের মুনাফার যে অংশ কর হিসাবে সরকার গ্রহণ করে, সে অংশ জাতীয় আয় নির্ণয়ে ধরিতে হইবে না। অনেক সময় নিয়োগ কর্তা নিজের সংগঠন কার্য ছাড়াও, নিজে উৎপাদনের জমি বা মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকে। এই জমির খাজনা বা মূলধনের সুদকেও কারক বেতন হিসাবে ধরিয়া জাতীয় আয়ের অংশ বলিতে হইবে। পরিশেষে, সরকারের আদায়ী কর কি জাতীয় আয়ের অংশ হিসাবে ধরিতে হইবে, না বাদ দিতে হইবে, এ বিষয়ে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। অনেকের মতে, দেশের সমস্ত করকে জাতীয় আয়ের অংশ বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। কতকগুলি কর আছে যাহা পরোক্ষ—কোন নির্দিষ্ট কারক বেতন হইতে আদায় হয় না। যেমন, বিক্রয় কর, আবগারী কর ইত্যাদি। কিন্তু যেগুলি প্রত্যক্ষ কর, সেগুলি মানুষের আয়ের একটা অংশ হইতেই সরকারকে দেওয়া হয়। যেমন, আয়কর কারক বেতনের অংশবিশেষ। জাতীয় আয়কে যখন কারকবেতন সমষ্টি ধরা হয়, তখন শুধু প্রত্যক্ষ করকেই ইহার অংশ ভাবিতে হইবে, পরোক্ষ কর জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে ; কেননা, উহা

কারক আয়ের অংশবিশেষ নয়। কিন্তু অধ্যাপক সুপ্ (C.S. Shoup) প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ জাতীয় আয় নির্ধারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মধ্যে এইরূপ বিভেদ করার পক্ষপাতী নন। তাঁহারা মনে করেন যে, আজ পর্যন্ত করের অর্থ-ভার সম্পর্কে (Incidence) মানুষের জ্ঞান সঠিক নয়। কোন্ করের অর্থ-ভার কতটা হস্তান্তর সম্ভব তাহা আমরা সঠিক বলিতে পারি না—এবং কোন্ কর কারক আয়ের অংশ হিসাবে দেওয়া হয় তাহাও সঠিক জানিনা। অতএব, জাতীয় আয়কে কারক আয়ের সমষ্টি হিসাবে ধরিলে সমস্ত প্রদত্ত কর হয় জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে, নতুবা জাতীয় আয়-ভুক্তি করিতে হইবে। যদি সমস্ত কর জাতীয় আয় হইতে বাদ দেওয়া হয়, তাহা হইলে রাষ্ট্রের যোগান সমস্ত উৎপন্ন-শেষ সামগ্রীর (final goods) অর্থমূল্য জাতীয় আয়-ভুক্তি করিতে হইবে। আর যদি কোন করই জাতীয় আয় হইতে বাদ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সরকারদ্বারা ক্রীত মধ্যস্থায়ী দ্রব্যসামগ্রীর (intermediate goods) অর্থমূল্য সমস্ত জাতীয় আয় হইতে বাদ দিতে হইবে।

জাতীয় আয় অধ্যয়নের উপকারিতা (Utility of National Income Studies): দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা করিতে হইলে, জাতীয় আয়ের তথ্য নিরূপণ করা একান্ত প্রয়োজন। জাতীয় আয়ের তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই আমরা অনুধাবন করিতে পারি, দেশের সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থার কতটা আয় খাদনের জন্য ব্যয়িত হইতেছে, আবার কতটা আয়ই বা সঞ্চয়ের খাতে যাইতেছে। অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনও বৈষম্যের উদ্ভব হইয়াছে কিনা, অথবা সাম্য স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারি। দেশের সরকারের কাছে জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যান বিশেষ করিয়া প্রয়োজনীয়। দেশের জাতীয় আয়ের তথ্যের নিরূপেই আর্থিক সম্প্রসারণ (inflation) ও সংকোচনের (deflation) পরিমাপ সরকার নির্ধারণ করিতে পারে এবং উহাদের প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারে। জাতীয় আয়ের তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই সরকার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ গঠিক করে। সরকারের করনীতি, ব্যয় ব্যবস্থা, বা ঋণপত্র গ্রহণ প্রভৃতি কার্য পদ্ধতি দেশের জাতীয় আয়ের উঠানামার সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই পরিকল্পিত ও নিরূপিত হয়। এক কথায়, দেশের সম্পদ সম্প্রসারণ করিবার পক্ষেও, অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা নির্দেশ করিবার পক্ষে, জাতীয় আয় ও উহার আনুসঙ্গিক পরিসংখ্যান

জাতীয় আয় অধ্যয়নের উপকারিতা

বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের মত যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আয়-তথ্য নিরূপণ করা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আয় তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার উহার সহায়ক অনুদানের (grants-in-aid) ব্যবস্থা নির্ধারণ করিতে পারে। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয় তথ্য সংগ্রহ করা বিশেষ প্রয়োজন। কেননা ইহার ভিত্তির উপর নির্ভর করিয়াই বিভিন্ন দেশের স্কন্ধে আন্তর্জাতিক দেয় অর্থভার (international payments) চাপান হইয়া থাকে।

অনুশীলনী

1. How would you define and measure the National Income of a country? (C.U. B.A.—'56)
2. Discuss the different methods of estimating national income of a country. How would you place the items relating to Government revenue and expenditure in such calculations? (C.U. B.A. (Hons.)—'54)

চতুর্থ অধ্যায়

শ্রম (Labour)

শ্রমের অর্থ (Meaning of Labour): অর্থশাস্ত্রে শ্রম অর্থ শুধু কায়িক মেহনতই বুঝায় না। সকল রকম কায়িক ও মানসিক মেহনৎ, যাহাদ্বারা উৎপাদনের সহায়তা হয়, তাহাই অর্থনীতিতে শ্রম বলিয়া অভিহিত হয়। সামান্য দিনমজুর কুলীর কায়িক মেহনৎ যেমন শ্রম, সেইরূপ মানসিক কর্মজীবী উকীল, অধ্যাপক, চিকিৎসকের সেবাকৃত্যও শ্রমপদবাচ্য। তাহা বলিয়া সকল কায়িক ও মানসিক কৃত্যই শ্রম নয়। পীড়াগ্রস্ত সন্তানের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া জননী যে সেবাকার্য করেন তাহা অর্থবিদ্যায় শ্রম নয়। অধ্যাপক যখন বিশেষ ভাবে আমন্ত্রিত হইয়া বিনা পারিশ্রমিকে অন্য বিদ্যায়তনে কোন বিষয়ে বক্তৃতা করেন, তাঁহার সেই মেহনৎ শ্রম নয়। সেই সকল কায়িক ও মানসিক সেবাকৃত্যই শ্রম পদবাচ্য যাহা অর্থমূল্যে বিনিময় হয়। অর্থপুরস্কারের আশায় লব্ধ বা সম্পাদিত সকল কায়িক ও মানসিক মেহনৎ প্রচেষ্টাই শ্রম ভুক্তির যোগ্য।

শ্রমের গতিশীলতা (Mobility of Labour): এক স্থান হইতে অপর স্থানে বা এক পেশা হইতে অন্য পেশাতে শ্রমিকের অবাধ চলাচলকে শ্রমের গতিশীলতা

বলে। এক স্থান হইতে অপর স্থানের চলাচলকে ভৌগলিক গতিশীলতা (Geographical mobility of labour) এবং এক পেশা হইতে অন্য পেশাতে চলাচলকে পেশাগত গতিশীলতা—(Occupational mobility of labour) বলে। পেশাগত গতিশীলতা আবার সমপেশা (Horizontal) এবং ভিন্নপেশা (Vertical) গতিশীলতা হইতে পারে। এক পেশা হইতে সমপর্যায়ের (Same grade) অপর পেশাতে যে চলন তাহাকে সমপেশা-গতিশীলতা বলে। যেমন, একজন টাইপিষ্ট যদি চিনি শিল্পের কোন কারখানা পরিত্যাগ করিয়া লৌহ ইস্পাত শিল্পের কোন কারখানায় একই ধরণের কাজেই যোগ দেয়, তাহা হইলে তাহাকে সমপেশা-শ্রম-গতিশীলতা বলিব। অপরপক্ষে, যদি কোন শ্রমিক একই শিল্পের এক পর্যায় হইতে অপর পর্যায়ে উন্নীত বা অবনীত হয়, তাহা হইলে তাহাকে ভিন্নপেশা-শ্রম-গতিশীলতা বলে। যেমন, কোন চিনি শিল্প কারখানায় নিযুক্ত একজন টাইপিষ্ট যদি ঐ প্রতিষ্ঠানেরই ম্যানেজার বা প্রচার কর্তা পদে উন্নীত হয়, তাহা হইলে উহাকে ভিন্নপেশা-শ্রম-গতিশীলতা বলা চলে।

সমপেশা ও ভিন্নপেশা শ্রমগতিশীলতা

শ্রম-গতিশীলতার প্রতিবন্ধক (Obstacles on Mobility of Labour) : শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার পথে অনেক প্রতিবন্ধক আছে। **প্রথমতঃ,** জলবায়ু, আচার পদ্ধতি, ভাষা, ধর্ম প্রভৃতির বৈষম্যের জন্য শ্রম-গতিশীলতা অবাধ হইতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ,** অনেক দিন এক স্থানে বাস করিলে পারিপার্শ্বিকের উপর শ্রমিকের একটা ভালবাসা বা স্বাভাবিক টান জন্মে, যাহার জন্য তাহার অবাধ গতিশীলতা ক্ষুন্ন হয়। **তৃতীয়তঃ,** আত্মীয় সজন হইতে দূরে নূতন অজানা পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ যাইয়া পড়িতেও শ্রমিক সাধারণতঃ নারাজ। **চতুর্থতঃ,** নিত্যনূতন পেশা শিক্ষা করা বা গ্রহণ করাও শ্রমিকের পক্ষে সম্ভব নয়। সেইজন্য যে পেশা সে একবার শিক্ষা করে, তাহা ধরিয়াই সাধারণতঃ সে থাকিতে চায়। এক পেশাজীবী হইয়া কিছুকাল থাকিলে শ্রমিক উহাতে এতটা রপ্ত হইয়া যায় যে, সহজে উহা ত্যাগ করিয়া অন্য পেশা গ্রহণ করিতে চাহে না। **পঞ্চমতঃ,** জাতীয় ও আঞ্চলিক আইনের প্রতিবন্ধক হেতুও অনেক সময় একদেশের শ্রমিক অন্যদেশে সহজে যাতায়াত ও ভিন্ন পেশা অবলম্বন করিতে পারে না। **ষষ্ঠতঃ,** যাতায়াত বা পরিবহনের অসুবিধা ও ব্যয়ভার অনেক সময় শ্রমিকের গতিশীলতা নষ্ট করে। **পরিশেষে,** অন্যত্র লভ্য সুযোগ সুবিধার খোঁজ খবর সম্বন্ধে শ্রমিকের অজ্ঞতা ও ধারণাহীনতাও

তাহার অবাধ গতিশীলতাকে কম রোধ করে না। শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা এইভাবে বিভিন্ন কারণে ক্ষুণ্ণ হয় বলিয়াই, শ্রমিক বাজার (labour market) বাস্তবতঃ নিখুঁত বা পূর্ণাংগ বাজার হইতে পারে না।

শ্রমিকের প্রগুণতা (Efficiency of Labour) : শ্রমিকের প্রগুণতা বহুবিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ,** শ্রমিকের প্রগুণতা তাহার স্বাস্থ্য ও দৈহিক শক্তির উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। স্বাস্থ্য আবার জাতিগত গুণের উপর নির্ভর করে। আমাদের দেশে শিখসম্প্রদায় জাতিগত গুণের অধিকারী বলিয়াই দীর্ঘকায়, সুগঠিত ও সুসংবদ্ধ। আর কুলোদ্ভব দৈহিক গুণাবলীর জন্যই তাহাদের শ্রমদক্ষতাও বেশী।

জাতিগত গুণাবলী

দ্বিতীয়তঃ, দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর তারতম্যও শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও প্রগুণতাকে কম প্রভাবান্বিত করে না। অতীব উষ্ণ জলবায়ু শ্রমিকের কর্মপটুতার পক্ষে মোটেই অনুকূল নয়। উষ্ণ জলবায়ুতে কায়িক মেহনৎ করিলে শীঘ্রই ক্লান্তি আসে। শ্রমিকের অলস-প্রবণতা বৃদ্ধি করিয়া এই জলবায়ু তাহাকে কঠিন পরিশ্রমে অযোগ্য ও অনিচ্ছুক করিয়া তোলে। অপর পক্ষে, শীতপ্রধান জলবায়ু শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রম শক্তি বাড়াইয়া তাহাকে অধিক কর্মপটু করে।

প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর তারতম্য

তৃতীয়তঃ, উত্তম স্বাস্থ্য ও শ্রমদক্ষতা খাদ্যবস্তুর পরিমাণ ও গুণের উপর বিশেষভাবে নির্ভরশীল। উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু শ্রমিকের স্বাস্থ্য অটুট রাখিতে ও কর্মশক্তি বৃদ্ধি করিতেই যে শুধু সাহায্য করে তাহা নয়—উহা তাহার জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বহুবিধ রোগপীড়ার কবল হইতেও রক্ষা করে।

উপযুক্ত পরিমাণ পুষ্টিকর খাদ্যবস্তু

চতুর্থতঃ, খাদ্যবস্তুর সংগে সংগে বাসগৃহ ও তাহার পরিবেশ, জীবন ধারণের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর সরবরাহ শ্রমিকের প্রগুণতা বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সাহায্য করে। স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান সম্মত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, পরিসর পরিবেশের মধ্যে, প্রচুর আলো বাতাসযুক্ত, সুপ্রশস্ত বাসগৃহ না হইলে শ্রমিকের স্বাস্থ্য-হানি হইয়া প্রগুণতা ক্ষুণ্ণ হয়। বিভিন্ন জলবায়ুর অনুরূপ উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র শ্রমিকের দেহের প্রয়োজনীয় উষ্ণতা বজায় রাখিয়া স্বাস্থ্য অটুট রাখে। উপযুক্ত পরিমাণ অবসর ও চিত্ত বিনোদনের সুযোগ সুবিধাও শ্রমিকের শ্রম ক্লান্তি অপনোদন করিয়া স্বাস্থ্য প্রবণতা ও কর্মোৎফুল্লতা বৃদ্ধি করে।

উপযুক্ত পরিধেয়

বাসগৃহ, পরিধেয় প্রভৃতির প্রভাব

পঞ্চমতঃ, শ্রমিকের প্রগুণতা উপযুক্ত শিক্ষার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। শ্রমিকের বুদ্ধির স্ফুরণ এবং কার্য পটুতা সঞ্চার না হইলে, তাহার কর্মদক্ষতা অর্জন সম্ভবপর নয়। সাধারণ শিক্ষা শ্রমিকের দৃষ্টি ভঙ্গির প্রসার ও নজর বড় করে। ইহাতে তাহার চিন্তাশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির যথাযথ উন্মেষ হয়—হাতের কাজ সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিয়া লইতে সহজ বোধ হয়। একজন শিক্ষাপটু শ্রমিক একটা কাজের কৌশল যত সহজে ধরিতে পারে, অশিক্ষিত শ্রমিক তাহা পারে না। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কারিগরী বা বৃত্তিমূলক শিক্ষারও বিশেষ প্রয়োজন আছে। আধুনিক উৎপাদনে বহু জটিল যন্ত্র ও কলকব্জার ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী। এই সকল যন্ত্র ও কলকব্জাদির সুষ্ঠু ব্যবহার বা প্রয়োগের জন্য শ্রমিকের উপযুক্ত দক্ষতা ও দায়িত্বশীলতার একান্ত প্রয়োজন। তাহার জন্যই চাই শ্রমিকের সুনির্দিষ্ট কারিগরী বৃত্তিমূলক শিক্ষা।

শিক্ষা—সাধারণ ও কারিগরী

ষষ্ঠতঃ, শ্রমিকের প্রগুণতা তাহার উপযুক্ত মজুরী ও পুরস্কার লাভের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। শ্রমিক যদি তাহার মেহনতের জন্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়মিত ভাবে না পায়, যদি শ্রমিকের মজুরী তাহার আবশ্যকীয় প্রয়োজনীয়তা মিটাইতে স্বচ্ছল না হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই তাহার কর্মোদ্যম শিথিল হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে তাহার কর্মকুশলতার লাঘব হইবে। যে বৃত্তিতে পদোন্নতির সম্ভাবনা আছে, পরিপূরক আয় (supplementary earnings) প্রাপ্তির সুযোগ সুবিধা যেখানে প্রচুর, অধিবৃত্তি (bonus) কিংবা আনুতোষিক (gratuity) দিবার প্রচলন যে বৃত্তিতে বর্তমান, সেখানে শ্রমিকের কর্মস্পৃহা স্বতঃই বৃদ্ধি পায় এবং তাহার কার্যকুশলতাও উৎকর্ষ লাভ করে।

উপযুক্ত মজুরী ও পুরস্কার

সপ্তমতঃ, শ্রমিকের নৈতিক কুশলতাও তাহার কর্মদক্ষতার অনুকূল। এই নৈতিক কুশলতা একদিকে যেমন কারখানার স্বাস্থ্যকর পরিবেশের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে তেমনি শ্রমিকের কর্মস্বাধীনতার পরিধির দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। কর্মে নিয়মানুবর্তিতা, ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায় সংযম, আত্মসম্মান বোধ, ভবিষ্যত উন্নতির আকাংখা প্রভৃতি নৈতিক গুণাবলী শ্রমিকের কর্মপ্রগুণতা বৃদ্ধির সহায়ক।

নৈতিক কুশলতা

পরিশেষে, পরিচালকের উৎপাদন ব্যবস্থাপনা ও শ্রমিকের প্রতি তাহার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি ও অনুকম্পাসম্পন্ন সহৃদয় ব্যবহারও শ্রমদক্ষতা বৃদ্ধি করিতে বিশেষভাবে সাহায্য করে। শিল্প পরিচালক যদি উৎপাদন ক্ষেত্রে

উপযুক্ত পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করে, সঠিক কার্যবিভাগদ্বারা উপযুক্ত শ্রমিককে উপযুক্ত বৃত্তিতে নিযুক্ত করে, উৎকৃষ্ট, অতি আধুনিক যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল ব্যবহারের ব্যবস্থা করে, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা অবশ্যই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে এবং উৎপাদনও উন্নতিগামী হইবে। শ্রমিকের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে যদি মালিক বা পরিচালক সর্বদা সচেতন থাকে এবং সেইগুলি মিটাইতে সহানুভূতি সম্পন্ন হয়, যদি শ্রমিকের উপর অস্বাভাবিক, জবরদস্তি, কড়া নিয়ম কানুন চাপাইয়া তাহার স্বাভাবিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করে, তাহা হইলেও শ্রমিকের কর্মোৎসাহ প্রবলতর হইয়া প্রগুণতা বৃদ্ধি পাইবে।

জন সংখ্যা তত্ত্ব (Theory of Population) : দেশের জনসংখ্যাই শ্রমিকের সংখ্যাকে বিশেষ ভাবে সীমিত করে। ইহা অবশ্য সত্য যে, দেশের গোটা জনসমষ্টির সকলেই শ্রমজীবী হইতে পারে না; কেননা, শ্রম করিবার মত উপযুক্ত উৎসাহ ও কর্মক্ষমতা অনেকের থাকে না। তবে সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে যে, জনসংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির সংগে সংগে কর্মোৎসুক শ্রমিকের সংখ্যাও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শ্রমিক সংখ্যা দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা একটা অনুপাত হার বিশেষ। অবশ্য এই হারের পরিবর্তন অনিবার্য।

ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব

বিখ্যাত ইংরাজ অর্থবিদ্যাবিদ্ ম্যাল্থাস্ (Malthus) জনসংখ্যা সম্পর্কে এক তত্ত্ব ব্যাখান করেন। জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যসামগ্রী যোগানের পরিমাণ—এই দুইএর সম্বন্ধের ভিত্তিতে তাঁহার মতবাদের প্রতিষ্ঠা। তাঁহার মতবাদের সারমর্ম এই যে, কোন দেশে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি যে হারে হয়, খাদ্যসামগ্রীর যোগান তাহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প হারে বৃদ্ধি পায়। গণিত শাস্ত্রবিদ ম্যালথাস তাঁহার মতবাদকে গাণিতিক ভাষায় এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন: জনসংখ্যার বৃদ্ধি হয় বর্গীয় ক্রমে, (geometrical progression) আর খাদ্যসামগ্রী যোগানের বৃদ্ধি হয় যৌগিক ক্রমে (arithmetical progression)। বর্গীয় ক্রম হইল যৌগিক ক্রমের বাড়তির চেয়ে দ্রুততর; অতএব লোকসংখ্যার বাড়তি খাদ্যসামগ্রীর বাড়তির চেয়ে বেশী। খাদ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি যদি লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে তাল রাখিতে না পারে, তাহা হইলে অচিরেই দেশে জনসংখ্যার জীবন ধারণের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যসামগ্রীর যোগান টান পড়িবে; ফলে, দেশে জনসংখ্যাধিক্য (over-population) সমস্যা দেখা দিবে। এই সমস্যা যখন চরমে পৌছিবে তখন খাদ্যদুর্ভিক্ষ, মহামারী, যুদ্ধবিবাদ প্রভৃতি এমন সকল

শোচনীয় পরিণতির উদ্ভব হইবে যে, তাহাদ্বারা দেশের কিছু বাড়তি লোক অপসারিত হইবে। এই বাড়তি লোকের অপসারণ যেন অনেকটা প্রতিহিংসা-মূলক প্রাকৃতিক নিয়ন্ত্রণ বিশেষ। বাড়তি জনসংখ্যার এই নিয়ন্ত্রণ পর্ব যে সকল কার্যক্রমদ্বারা সংঘটিত হয়, উহাদিগকে ম্যাল্‌থাস **"ধ্রুব নিশ্চিত বাধা"** অথবা **আপাতিক রোধ বলেন** (Positive checks)। ম্যালথাস মনে করেন, এই বাধাগুলি যাহাতে কার্যকরী না হয় তাহাই শ্রেয়; কেননা, এই বাধাগুলি অমানবোচিত ও অতীব দুঃখবহ। অপর পক্ষে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিতে তিনি **"নিবারক বাধা"** অথবা **প্রাগ্‌-রোধ** (Preventive checks) প্রয়োগ করিবার পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বাস করেন যে, বাল্যবিবাহ পরিহার, নৈতিক সংযম অবলম্বন প্রভৃতিদ্বারা মানুষ সাফল্যের সহিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিয়া খাদ্যসামগ্রীর অভাব-সমস্যা নিরাকরণ করিতে পারে।

ম্যালথাসের মতবাদের সমালোচনা (Criticism of Malthus' Theory) : ম্যাল্‌থাসের লোকসংখ্যা তত্ত্ব সম্পর্কে আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ বহু বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। ম্যালথাস লোকসংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য দেশসমূহে মোটেই ফলে নাই। পৃথিবীর অর্থনৈতিক ইতিহাস যাহারা পর্যালোচনা করেন, তাহারা জানেন, ম্যালথাসের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত, পাশ্চাত্যদেশ সমূহে শিল্প বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের ফলে, উৎপাদনের উৎকর্ষতা এত উচ্চস্তরে উঠিয়াছে যে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইলেও ম্যালথাসের ভবিষ্যৎবাণী কার্যকরী হয় নাই। পাশ্চাত্য দেশ সমূহে, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক সাজসরঞ্জাম ব্যবহারদ্বারা জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রথা দ্রুত প্রচলন হওয়াতে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি লাভ না ঘটিয়া ম্যালথাসের বাণী মিথ্যাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ম্যালথাসের ভবিষ্যৎ বাণী ইতিহাসে ফলে নাই

দ্বিতীয়তঃ, ম্যাল্‌থাস্‌ তাঁহার জনসংখ্যার মতবাদকে যে ক্রমহ্রাসমান আগম (diminishing return) বিধির সঙ্গে সংযুক্ত করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নয়। ম্যালথাস মনে করেন, জনসংখ্যার বৃদ্ধির সংগে সংগে জমির আত্যন্তিক চাষ (Intensive cultivation) অবশ্য বাড়িয়া যায়, কিন্তু সেই অনুপাতে ক্রমিক উৎপাদনের আগম হ্রাস পাইতে থাকে। কিন্তু, কৃষি শিল্পের উৎকর্ষ সাধন ও শ্রমব্যবস্থাপনার উন্নতিদ্বারা যে ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়মকে কিছু কালের জন্য বানচাল বা রোধ করা যায়, ম্যালথাস তাহা ভাবিয়া দেখেন নাই।

ম্যালথাসের মতবাদ ও ক্রমহ্রাসমান আগম বিধি

তৃতীয়তঃ, জনসংখ্যার মতবাদ প্রচার করিতে ম্যালথাস যে গাণিতিক সূত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন তাহাও সঠিক নয়। বাস্তব ক্ষেত্রে, জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও খাদ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধির মধ্যে বাঁধাধরা কোন গাণিতিক অনুপাত নির্দেশ করাই চলে না। জনসংখ্যার বৃদ্ধি বর্গীয় ক্রমের মত বটে, কিন্তু খাদ্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি প্রকৃত পক্ষে যৌগিক ক্রমের হারের চেয়ে বেশী।

ম্যালথাসের গাণিতিক সূত্র অভ্রান্ত নয়

চতুর্থতঃ, ম্যালথাস জনসংখ্যা ও খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও অভ্রান্ত নয়। জনসংখ্যার তত্ত্ব অনুসন্ধানে আসল সম্পর্ক নির্দেশ করিতে হইবে দেশের লোকসংখ্যা এবং সম্পদ উৎপাদনের মধ্যে। কোন দেশের বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার জন্য হয়ত খাদ্যসামগ্রীর যোগান টান হইতে পারে; তাহাতে জনাধিক্য সমস্যা দেখা দেয় না, যদি সেদেশে সম্পদ উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বাধা সৃষ্টি না হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি দেশের সম্পদ উৎপাদনও বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে অনায়াসেই দেশের খাদ্যসামগ্রীর ঘাটতি বিদেশ হইতে আমদানী করিয়া মেটান যায়। লোকসংখ্যা সমস্যার মূল সূত্র দেশের জনসমষ্টির বৃদ্ধিতে নয়, ইহার গূঢ় তত্ত্ব হইল দেশের ধনসম্পদ উৎপাদন পটুতায় এবং উৎপাদিত সম্পদের ন্যায্য বণ্টনে। (The problem of population is not one of mere size, but of efficient production and equitable distribution.)

জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও সম্পদ উৎপাদন

পরিশেষে, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং নৈতিক অনেক বাধানিষেধ আছে, যাহা লোকসংখ্যা বৃদ্ধির পরিপন্থী। ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে জীবনযাত্রার মান উঁচু করিবার আকাঙ্ক্ষা এমন প্রবল যে, ম্যালথাসের নিবারক বাঁধা তাহারা বিশেষ ভাবে কার্যকরী করিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করিয়া থাকে। এমনকি, দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যেও জনসংখ্যা প্রতিরোধ কল্পে বাল্য বিবাহপ্রথা পরিহার করিবার একটা ঐকান্তিকী ইচ্ছা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।

আদর্শ বা বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যার তত্ত্ব (The Optimum Theory of Population) : আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ ম্যালথাসের জনসংখ্যা তত্ত্ব সমর্থন করিতে পারেন নাই। ম্যালথাসের মতবাদ নৈরাশ্যময়,—ইহা জনসংখ্যার সংগে খাদ্যযোগানের তুলনা করিয়া দেশের লোকসংখ্যাধিক্য নির্দেশ করে; অপর পক্ষে, আধুনিকগণ জনসংখ্যার সহিত উহার উৎপাদন দক্ষতার তুলনা করিয়া আদর্শ জনসংখ্যার মতবাদ ধার্য করিয়াছেন। এই

মতবাদ ক্যানান্ (Cannan) প্রমুখ বিলাতের অন্যান্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদগণ পোষণ করেন। এই মতবাদ অনুযায়ী দেশের আদর্শ জনসংখ্যা হইবে সেই বাঞ্ছনীয় সংখ্যা, যাহাদের মাথাপিছু আয় হইবে সর্বোচ্চ। দেশের জনসাধারণের মাথাপিছু আয় হিসাব করিতে হইলে দেশের মোট সম্পদের পরিমাপ করিতে হয়। দেশের জনসমষ্টির উৎপাদন প্রচেষ্টা প্রাকৃতিক সম্পদের সহযোগিতায় দেশের মোট সম্পদ উৎপাদন করে। সেই মোট সম্পদকে যদি দেশের জনসংখ্যার দ্বারা ভাগ করা যায়, তাহা হইলেই মাথাপিছু আয় বাহির হইবে। এই মাথা-পিছু আয়ের নিরিখেই দেশের জনসংখ্যাধিক্য বা জনসংখ্যার ন্যূনতা পরিমাপ করা যায়। দেশের যে জনসংখ্যার উৎপাদন প্রচেষ্টাদ্বারা মাথাপিছু আয় সর্বোচ্চ পরিমাণ হয়, সেই জনসংখ্যাই বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যা। নিম্নোক্ত চিত্রাংকনদ্বারা বাঞ্ছনীয় বা আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্ব বুঝান যায়।
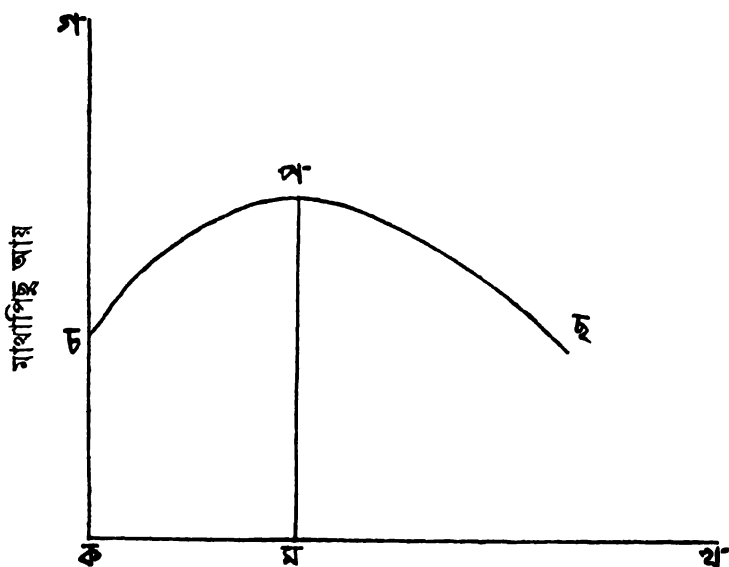
(১ম চিত্র)

ক খ অক্ষ জনসংখ্যা নির্দেশ করিতেছে এবং **ক গ** অক্ষ মাথাপিছু আয় ইংগিত করিতেছে। **চ ছ** মাথাপিছু আয়ের বক্ররেখা। জনসংখ্যা যখন **ম** বিন্দু পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়, মাথাপিছু আয়ও সে পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জনসংখ্যার এই বৃদ্ধি বাঞ্ছনীয়, কেননা, ইহার সংগে সংগে আয় বাড়ে। কিন্তু **ম** বিন্দুর পর জনসংখ্যার যে কোন বৃদ্ধিই মাথাপিছু আয়কে কমাইয়া আনিবে; কেননা, **চ ছ** বক্ররেখায় **প**-ই সর্বোচ্চ বিন্দু। অতএব **ম** হইল আদর্শ জনসংখ্যার বিন্দু।

যখন দেশের জনসংখ্যা **কম**র চেয়ে কম হয়, তখন দেশের জনসংখ্যা আদর্শ সংখ্যার চেয়ে কম হয়; আবার যখন জনসংখ্যা **ক ম** হইতে বেশী হয়, তখন দেশে জনসংখ্যাধিক্য ঘটে।

আদর্শ জনসংখ্যার বিন্দু কিন্তু চিরস্থির নয়। দেশে নূতন আবিষ্কারের ফলে, মূলধনের বৃদ্ধিতে, উৎপাদনের নূতন নূতন সাজসরঞ্জামের প্রচলন ও আমদানীতে ও নূতন পদ্ধতির প্রয়োগে, যখনই **চ ছ** বক্ররেখার স্থান পরিবর্ত্তন হইবে, আদর্শ জনসংখ্যার বিন্দু **ম**ও স্থান পরিবর্ত্তন করিবে। সেদিক হইতে আদর্শ জনসংখ্যার মতবাদকে স্থির (static) মতবাদ বলা চলে। পরিবর্তনশীল অর্থব্যবস্থায় জনসংখ্যা নিয়মিত করিবার কি বাস্তব নীতি হইতে পারে, সে সম্পর্কে এই মতবাদ কোন নির্দেশ দেয় না।

আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বের উপর ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক ডাল্টন (Dalton) তাঁহার জনসংখ্যাধিক্য ও জনসংখ্যা ন্যূনতার সূত্র খাড়া করিয়াছেন। আদর্শ জনসংখ্যা বিন্দু হইতে বিভিন্ন হইলেই জনসংখ্যাধিক্য বা জনসংখ্যা ন্যূনতা হইতে পাবে। এই বিভিন্নতাই আদর্শ জনসংখ্যা ও বাস্তব সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে। ডালটনের সূত্র হইল: $M = \frac{A-O}{O}$; M হইল আদর্শ সংখ্যা ও বাস্তব সংখ্যার মধ্যে পার্থক্য প্রবণতা; A হইল বাস্তব জনসংখ্যা এবং O হইল আদর্শ সংখ্যা। M যখন পজিটিভ (Positive) সংখ্যা হয়, তখন জনসংখাধিক্য ঘটে; আবার উহা যখন (Negative) সংখ্যা হয়, তখন জনসংখ্যান্যূনতা ঘটে।

ডালটনের জনসংখ্যা সূত্র

আদর্শ জনসংখ্যার তত্ত্ব ম্যালথাসের জনসংখ্যা মতবাদের চাইতে অধিক বিজ্ঞান সম্মত ও উন্নত। ম্যালথাসের মতানুযায়ী জনসংখ্যার বৃদ্ধি সর্বৈব অবাঞ্ছনীয়। তিনি দেশের খাদ্য যোগানের নিরূপে সর্বোচ্চ জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারণ করেন। কিন্তু আদর্শ জনসংখ্যার পরিমাণ নির্ধারিত হয় দেশের গোটা অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে।

আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বের বাস্তব উপকারিতা

কিন্তু আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বের প্রধান অসুবিধা হইল, বাস্তবক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয় জনসংখ্যা প্রকৃত পক্ষে কি হইবে তাহা নির্ধারণ করা। জনসাধারণের মাথা পিছু আয়ের উঠানামার পরিমাপ করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহা ব্যতীত দেশের উৎপাদন পদ্ধতির রদ বদল, পুঁজি সঙ্গতির অদল বদল হামেশাই হইয়া থাকে। এদিক দিয়া দেখিতে গেলে, আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বের বাস্তব উপযোগিতা বিশেষ আছে বলিয়া মনে হয় না। পরিবর্তনশীল অর্থনৈতিক পারিপার্শ্বিকে, জনসংখ্যার

বৃদ্ধি প্রবণতা সম্পর্কে সুষ্ঠু নির্দেশ ম্যালথাসের মতবাদেই আমরা বিশেষভাবে পাই। তবে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ যন্ত্র (analytical tool) হিসাবে, আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বের মূল্য আছে। এই মতবাদ ম্যালথাসের নৈতিক উপদেশ প্রচারে উন্মুখ নয়। পরন্তু, ইহা জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানে দেশের উৎপাদন দক্ষতার উপরই বিশেষ জোর দিয়া থাকে। তবে একথা সত্য যে, দেশের উৎপাদন দক্ষতাই কেবল জনসংখ্যা বৃদ্ধির নিয়ামক নয়। জনসংখ্যার বৃদ্ধিপ্রবণতা অনেক বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়: যথা, মানুষের পারিবারিক জীবনানুরাগ, আচার ব্যবহার, শিক্ষা, সভ্যতা, আবহাওয়া, জলবায়ু ইত্যাদি। আদর্শ জনসংখ্যা তত্ত্বে এই সকল বিষয়গুলিকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

নীট পুনরুৎপাদন হার (Net Reproduction Rate): শুধু জন্ম মৃত্যুর হার তুলনাদ্বারাই দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি প্রবণতা পরিমাপ করা যায় না। দেশের জন্মহার যদি মৃত্যু হারের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলেই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, একথা বলা চলে না। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি সুষ্ঠু ভাবে পরিমাপ করিতে হইলে কুক্জীনস্‌কী (Kuczynski) প্রদত্ত নীট পুনরুৎ-পাদন হার তত্ত্ব বুঝিতে হইবে। কুক্জীনস্‌কীর মতবাদের সার মর্ম হইল, কি হারে সন্তান ধারণক্ষম স্ত্রীলোকের বিভিন্ন সময়ে পুনরুৎপাদন হয়। ধরা যাক্, কোন দেশে এক সময় সন্তান ধারণক্ষম (১৫ হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে) স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০০। যদি ঐ দেশে পরবর্তী যুগে একই বয়সী স্ত্রীলোকের সংখ্যা ঐ ১০০ই থাকে, তাহা হইলে পুনরুৎপাদন হার হইবে এক। যদি ১০০ না হইয়া স্ত্রীলোকের সংখ্যা পরবর্তী যুগে ১১০ হয়, তাহা হইলে পুনরুৎপাদন হার হইবে ১·১। অর্থাৎ ঐ যুগে শতকরা জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হইবে দশজন। অপর পক্ষে, স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১০০ না হইয়া যদি ৯০ হয়, তাহা হইলে নীট পুনরুৎপাদন হার হইবে ·৯। ইহার অর্থ, জনসংখ্যা ধীরে ধীরে হ্রাস পাইতেছে।

অনুশীলনী

1. What is mobility of labour ? What are the obstacles on mobility of labour ?

2. On what factors does the efficiency of labour depend ?

3. Discuss the optimum theory of population and point out its main defects.

পঞ্চম অধ্যায়

মূলধন (Capital)

মূলধন কি ? **(Meaning of Capital) :** মূলধন একটি উৎপাদক কারক—যদিও ইহা মূল কারক নহে। মূলধনের প্রকৃত অর্থ ও উপাদান সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে। আবার মূলধন সম্বন্ধে সাধারণ লোকের যাহা ধারণা, অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহাও সঠিক বলিয়া মনে করেন না।

ব্যবসায়ীর নিকট মূলধন হইল, তাহার নীট বিনিয়োগের (net investment) অর্থমূল্য। ব্যবসার বিনিয়োগ কারখানা, কলকব্জা, কাঁচামাল ইত্যাদির আকারে **মূলধনের প্রকৃত অর্থ কি** হইতে পারে। কিন্তু অর্থবিদ্যাবিদগণের দৃষ্টিতে মূলধন বিনিয়োগের অর্থমূল্যরূপে অভিহিত হয় না। তাঁহাদের নিকট মূলধন শব্দের অর্থ হইল, প্রাকৃতিক সঙ্গতি ও শ্রম ব্যতীত বাস্তব উৎপাদনের কারকসমূহ। অর্থশাস্ত্রে মূলধন হইল সম্পদ সম্ভারের সেই অংশ, যাহা ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া আয় উৎপাদনে কার্যকরী হয়। মূলধন মানুষের সম্পদের ন্যায় শ্রমোৎপন্ন বটে, তবে সম্পদের ন্যায় ইহা ভোগ্যবস্তু হিসাবে ব্যবহৃত না হইয়া উৎপাদনের কারক হিসাবে আয় উৎপাদন করে। মূলধনের প্রকৃত অর্থ নৈতিক তাৎপর্য অষ্ট্রীয়ার সুবিখ্যাত অর্থনীতিজ্ঞ বম্ বওয়ার্ক (Bohm-Bawerk) প্রদত্ত সংগায় পরিস্ফুট হইয়াছে। তাঁহার মতে মূলধন হইল : a produced means of further production. একই বস্তু ব্যবহার বিশেষে কখন সম্পদ, কখন বা মূলধন হইয়া থাকে। একজন লোক ভোগ্যবস্তু হিসাবে নিজের ব্যবহারের জন্য যদি একখানা মোটর গাড়ী রাখেন, তাহা হইলে উহা তাহার সম্পদ হইবে। কিন্তু একজন চিকিৎক যদি তাহার রোগী দেখিবার জন্য মোটর গাড়ী ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উহা তাহার মূলধন হইবে। মোটর গাড়ী চিকিৎসককে আয় উৎপাদনে সাহায্য করে বলিয়াই ইহা তাহার মূলধন। সম্পদকে অনেকে আবার ভোগবস্তু ('consumption goods) বলেন, আবার মূলধনকে উৎপাদক বস্তু (capital goods) আখ্যা দেন।

মূলধন ও আয় পরস্পর সম্পর্ক বিশিষ্ট। (Capital is correlative of income.) আয় দুই প্রকারের,—আর্থিক আয় এবং বাস্তব আয়। বাস গৃহের আশ্রয়কে বাস্তব আয় বলা চলে ; আর গৃহ ভাড়া দিয়া যে অর্থ পাওয়া যায়, তাহাকে আর্থিক আয় বলা হয়।

মূলধনের বর্গীকরণ (Classification of Capital) : বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে মূলধন রকমারি হইতে পারে। মূলধন **সামাজিক** (social) হইতে পারে, আবার **ব্যক্তিগতও** (private) হইতে পারে। এক ভূমি ব্যতীত, আয় উৎপাদনকারী আর সমস্ত সামগ্রীই সামাজিক মূলধনভুক্তি হইবার যোগ্য। ব্যবসার জন্য কারখানা, কলকব্জা বা কাঁচা মাল প্রভৃতি যাহা ব্যবহার হয়, অথবা সরকারের মালিকানায় এই ধরণের সকল বস্তু-সামগ্রী সামাজিক মূলধন বলিয়া অভিহিত হয়। অপর পক্ষে, ব্যক্তিগত মূলধন বলা যায় সেই সকল সামগ্রীকে, যাহা হইতে কোন ব্যক্তি বিশেষ আয় উৎপাদনের আশা রাখে। যুদ্ধকালীন রাষ্ট্রীয় ঋণকে ব্যক্তিগত মূলধন বলা যায় ; কেননা, এইরূপ ঋণপত্র হইতে ঋণদাতার নিজস্ব আয় উৎপাদন হয়।

সামাজিক ও ব্যক্তিগত মূলধন

সামাজিক মূলধনকে আবার অনেকে দুইভাগে ভাগ করেন : **ভোগ্য মূলধন** (consumer's, or consumption capital) ও (ii) **উৎপাদক মূলধন** (producer's or production capital)। অধ্যাপক মার্শালের মতে ভোগ্য মূলধন হইল সেই সমস্ত তৈয়ারী মাল (finished goods), যাহা উৎপাদনে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের ভোগ্য। যেমন, একজন ব্যবসায়ী যখন তাহার কর্মচারিদের জন্য খাদ্যের পুঁজি সংগ্রহ করিয়া রাখেন অথবা বাসগৃহ নির্মাণ করেন, সেই খাদ্যপুঁজি বা বাস গৃহকে ভোগ্য মূলধন বলা যায়।

ভোগ্য ও উৎপাদক মূলধন

উৎপাদক মূলধন হইল সেই সকল বস্তু বা সামগ্রী—যথা, কারখানা, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ইত্যাদি—যাহাদ্বারা প্রকৃত উৎপাদন কার্য সম্পন্ন হয়। মূলধনকে অনেকে **সহায়ক** (auxiliary or instrumental) **মূলধন** বা, **ব্যবসায়িক মূলধনও** (trade capital) বলেন।

কেয়ার্ণক্রশ মূলধনের তিন রকম রূপ নির্দেশ করিয়াছেন : যথা বাস্তব মূলধন, (concrete capital) আর্থিক মূলধন (finance or money capital) এবং ঋণ মূলধন (debt capital)।

বাস্তব মূলধন বলিতে সেই সকল দ্রব্য পুঁজিপাটা (stock of goods) বুঝায়, যাহার অর্থমূল্য আছে। বাস্তব মূলধন আবার দুইভাগে বিভক্ত করা চলে : (১) উৎপাদকের হস্তাধীন দ্রব্য পুঁজিপাটা ও (২) খাদকের হস্তাধীন দ্রব্য সম্ভার। উৎপাদকের নিকট বাস্তব মূলধন হইল সেই সকল পরিসম্পৎ (assets) যাহাদ্বারা সে অর্থআয় উপার্জনের আশা রাখে। যেমন, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, কারখানা গৃহ, ভূমি প্রভৃতি। অপর পক্ষে, খাদকের

বাস্তব মূলধন

বাস্তব মূলধন বলিতে তাহার সমস্ত সম্পত্তি—যাহা হইতে সে উপযোগ লাভ করে, বুঝাইয়া থাকে। যথা,বাসগৃহ, আসবাবপত্র, মোটরগাড়ী, রেডিও প্রভৃতি। উৎপাদকের বাস্তব মূলধনকে অধ্যাপক মার্শাল **ব্যবসায়িক মূলধন** (trade capital) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। খাদকের বাস্তব মূলধনকে অধ্যাপক টড (Todd) বলিয়াছেন **ভোগ্য মূলধন** (enjoyment capital)। গোটা সমাজের বা দেশের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে, বাস্তব মূলধন হইল সমস্ত উৎপাদকের পরিসম্পৎ ও সমস্ত খাদকের সম্পত্তির সমষ্টিমাত্র। অতএব ইহা সামাজিক সম্পদের (social wealth) নামান্তর মাত্র।

আর্থিক মূলধন

সাধারণতঃ, মূলধন অর্থমূল্যে পরিমাপ ও প্রকাশ করা হয়। মানুষের সম্পত্তি আমরা অর্থের মাপকাঠিতে পরিমাপ করিয়া থাকি। আমাদের সঞ্চয় (saving) এবং ঋণদান (lending) অর্থের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। যৌথ কারবার যখন গঠিত হয়, তখন প্রথমতঃ ইহা অর্থের পুঁজিপাটা সংগ্রহ করে, যাহাকে শেয়ারের মূলধন (share capital) বলা হয়। কিন্তু অর্থ নিজে সরাসরি-ভাবে উৎপাদন করিতে কিংবা উপযোগ প্রদান করিতে পারে না। দ্রব্য উৎপাদনের বা উপযোগ্য যোগানের পূর্বে অর্থকে বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত করিতে হয়।

ঋণ মূলধন

ঋণ মূলধন (Debt Capital) : পুঁজিপাটা (stock), শেয়ার, সরকারী প্রত্যয়পত্র (government promissory notes) প্রভৃতি সম্পদের স্বত্ব বা মালিকানাকে (titles to wealth) ঋণ মূলধন বলা হয়। পুঁজিপাটা, শেয়ার বা প্রত্যয় পত্রের প্রত্যেকটার স্বত্বকেই বিনিয়োগকৃত তহবিল (invested fund) বুঝায় এবং ইহাদের প্রত্যেকটা অর্থ-আয় উপার্জন করে।

স্থায়ী ও চলতি মূলধন

সামাজিক মূলধন আবার **স্থায়ী** (fixed) অথবা **চলতি** (circulating) হইতে পারে। স্থায়ী মূলধন উৎপাদন কার্যে একবার মাত্র ব্যবহারেই নিঃশেষিত হইয়া যায় না। ইহা বহুকাল অবধি টেকসই অবস্থায় থাকিয়া উৎপাদন কার্যে একাধিকবার ব্যবহৃত হইতে পারে। (It can fulfil its office in production more than once and its utility is not exhausted by a single use). যন্ত্রপাতি কারখানা ইত্যাদিকে স্থায়ী মূলধনভুক্তি করা যায়। চলতি মূলধন সেই সমস্ত পুঁজিসামগ্রী যাহা উৎপাদনে একবার মাত্র ব্যবহৃত হইয়াই আকার বদলাইয়া ফেলে। (Circulating capital fulfils the whole of its office by a single use in production in which it is engaged.) যেমন, কয়লা, পাট, তুলাপ্রভৃতি কাঁচামাল।

ব্যয়িত মূলধন (sunk capital) এবং **ভাসমান মূলধনের** (floating capital) মধ্যে তফাৎ লক্ষ্যনীয়। যে মূলধন শুধু একই কার্যে নিয়োজিত হয়—যাহার অন্য ধরণের কার্যে কোন উপযোগিতা নাই এবং যাহা একবার বিনিয়োগ হইলে সহজে গুটাইয়া লওয়া সম্ভব নয়, উহা ব্যয়িত মূলধন। কোন সুড়ঙ্গ রেলপথ নির্মাণের জন্য যে মূলধনের বিনিয়োগ করা হয়, উহাকে ব্যয়িত মূলধন বলা চলে। অপর পক্ষে, ভাসমান মূলধন কোন বিশেষ কার্যে বিশিষ্টতা লাভ করে না। বিভিন্ন পর্যায়ের উৎপাদন কার্যেই ইহা ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি এক শিল্পে বা উৎপাদন কার্যে ইহার বিনিয়োগ হয়, তাহা হইলে সহজেই গুটাইয়া অন্য শিল্পে বা উৎপাদন কার্যে ভাসমান মূলধনকে বিনিয়োগ করা সম্ভব।

ব্যয়িত ও ভাসমান মূলধন

মূলধন কি মুদ্রা ? (**Is Capital Money** ?) : সাধারণতঃ, আমরা মুদ্রাকে মূলধনভুক্তি করিতে এত অভ্যস্ত যে, মূলধন ও মুদ্রার প্রকৃত পার্থক্য দেখিতে পাই না। মূলধনকে সব সময়ই মুদ্রার মাধ্যমে পরিমাপ করা চলে। যেমন, একজনের সম্পত্তি, পুঁজিপাটা প্রভৃতি মূলধন মুদ্রার নিরূপে আমরা পরিমাপ করিয়া থাকি। কিন্তু মুদ্রার নিরূপে মূলধন পরিমাপ করা, আর মুদ্রা ও মূলধনকে একই জিনিষ ভাবা এক নয়।

যখন আমরা মূলধন বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা অর্থেরপুঁজি বাড়াই। অর্থ আমরা সঞ্চয় করি, বা ঋণ গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করি। কিন্তু অর্থের পুঁজি বৃদ্ধিই মূলধনের পুঁজিবৃদ্ধি করে না। অর্থের পুঁজি বৃদ্ধিতে শুধু অর্থমূল্যের হ্রাসই হয়। ব্যক্তিগত ভাবে অর্থের পুঁজিবৃদ্ধি অবশ্য কাম্য ; কেননা, ব্যক্তি বিশেষের অর্থপুঁজিবৃদ্ধি মানেই, তাহার চলিত সম্পত্তির (liquid assets) বৃদ্ধি ; যাহা, খুশি মত যখন ইচ্ছা সে বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত করিতে পারে। কিন্তু গোটা সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে, অর্থ মূলধন নয় ; কেননা, সমাজ অর্থকে বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত করিতে পারে না ; কাহার কাছে সমাজ অর্থ ব্যয় করিবে ?

অর্থ উৎপাদনের উপাদান নয় ; তবে অর্থ সর্বদাই বাস্তব মূলধনে রূপান্তরিত হইয়া আমাদের গচ্ছিত সম্পত্তির অংশ হিসাবে পরিগণিত হয় ; বাস্তব মূলধন আবার সদা সর্বদাই অর্থে রূপান্তরিত হয়। উৎপাদক যখন অর্থঋণ সংগ্রহ করে, দোকানদার যখন তাহার পণ্য বিক্রয় করে, মানুষ যখন অর্থসঞ্চয় ও বিনিয়োগ করে—ঐসকল কার্যেরই মূল উদ্দেশ্য থাকে কতটা পরিমাণ বাস্তব মূলধনের উৎপন্ন

করা যাইবে। যতক্ষণ পর্যন্ত হাতের অর্থ ব্যয় করিয়া আমরা ভোগের তৃপ্তি পূরণ করিতে পারি, অথবা আমাদের বর্তমান পুঁজিপাটার পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে পারি, ততক্ষণ পর্যন্ত অর্থকে আবার মূলধন (free capital) বলিয়া অভিহিত করা চলে।

আমাদের অর্থ সঞ্চয়ের প্রথম জের হইল বর্তমান খাদন-ব্যয় সংকোচন করা। আর বর্তমান খাদন ব্যয় সংকোচন অর্থই, খাদন দ্রব্যশিল্পের উৎপাদন হ্রাস ও কর্ম সংস্থানের সংকোচন। কিন্তু অর্থ যদি খাদনব্যয়ে নিয়োজিত না হইয়া সঞ্চিত অবস্থায় বিনিয়োগ ব্যয়ে কার্যকরী হয়, তাহা হইলে খাদনদ্রব্য-শিল্পের উৎপাদন ও কর্ম সংকোচন ঘুচিয়া, বিনিযোগ বা উৎপাদনদ্রব্য-শিল্পের প্রসার ও চাকুরীর সম্প্রসারণ হইতে বাধ্য। তাহা হইলে বলা চলে যে, সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যই হইল উৎপাদন শক্তিকে খাদনবস্তু ক্রয়ে নষ্ট না করিয়া, মূলধনের পুঁজিস্বরূপ সম্প্রসারণ করা। অতএব, যে কোন অর্থসঞ্চয় মানে, বাস্তব মূলধনের পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি সাধন। সঞ্চয় একদিকে যেমন আমাদের বর্তমান খাদনদ্রব্যের উপর ব্যয় সংকোচন করিতে উৎসাহিত করে, অন্যদিকে ইহা আবার উৎপাদক ও বাস্তব মূলধনের পুঁজি সম্প্রসারণ করিতেও বিশেষভাবে সহায়তা করে।

মূলধনের কার্যাবলী (Functions of Capital) : মূলধনের ব্যবহার অর্থই উৎপাদন কার্যকে ঘুরান প্রক্রিয়ায় (round-about process) পর্যবসিত করা। কি করিয়া মূলধন নিয়োগ উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং কার্যকালকে সুদীর্ঘ করে, বম্ বওয়ার্ক (Bohm Bawerk) প্রদত্ত একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণের দ্বারা তাহা পরিষ্কার বুঝান যায়। প্রাচীন সমাজে মানুষের যখন মূলধনের সঞ্চয় ছিল না, তখন তৃষ্ণাকুলিত হইয়া সে দৌড়াইত ঝরণার জলে। যখনই তৃষ্ণা পাইত, তখনই ছুটিতে হইত জলের সন্ধানে। মূলধনের অভাবে জলভাণ্ডার ছিল না, যাহাতে তৃষ্ণার জল সঞ্চিত থাকিতে পারে। তৃষ্ণা প্রশমিত করিবার জন্য প্রতিবার ঝরণার পানে ছুটিবার অসুবিধা যখন সে বুঝিল, তখনই জলভাণ্ডার নির্মাণের চিন্তা তাহার মাথায় আসিল। সংগে সংগে জলভাণ্ডার নির্মাণের উপাদান সংগ্রহে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সরাসরি প্রতিবার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ঝরণায় না দৌড়াইয়া, সে হয়ত দিনের চাহিদামাফিক জল একবার মাত্র আনিয়া একটি উপযুক্ত ভাণ্ডে রাখিল। ভাণ্ড তৈয়ারীর মত উপযুক্ত মূলধন ও সময় অবশ্য তাহাকে নিয়োগ করিতে হইল। জল সরবরাহের প্রাচুর্য ও আনুসঙ্গিক সুবিধার কথা যখন তাহার মনে আসিল, তখন সে আরও মূলধন ও সময় নিয়োগ করিয়া হয়ত নল পুঁতিয়া ঝরণা হইতে তাহার বাসগৃহ পর্যন্ত

মূলধনের ব্যবহার উৎপাদন কার্যকে ঘুরান ও দীর্ঘ-মেয়াদী করে

অপর্যাপ্ত নিয়মিত জল যোগানের সুব্যবস্থা করিল। যতই মূলধনের নিয়োগ সম্ভব হইল, ততই উৎপাদন প্রক্রিয়া ঘুরান এবং দীর্ঘকাল মেয়াদী হইতে লাগিল। অবশ্য, অধিক মূলধন বিনিয়োগজনিত দীর্ঘকাল মেয়াদী ঘুরান উৎপাদন প্রক্রিয়া তাহাকে গড়পড়তা কম মূল্যে অধিক জল সরবরাহের সুযোগ করিয়া দিল।

মূলধনের ব্যবহার গোটা উৎপাদন কার্য ঘুরান ও দীর্ঘ-মেয়াদী করে বটে, কিন্তু উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরের কার্যকে স্বল্প-মেয়াদী করে। মূলধনের ব্যবহার প্রাচুর্যের সংগে সংগে, কর্ম বিভাগ যতই প্রসার লাভ করে, ততই গোটা উৎপাদন কার্য বহুলস্তরে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক একটি স্তরের কার্য সম্পাদনে যতই বিশিষ্ট (specialised) শ্রমিক নিয়োজিত হয়, ততই একদিকে যেমন উৎপাদন প্রগুণতার উদ্ভব হয়, অন্যদিকে প্রত্যেক স্তরের উৎপাদন কার্যও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে সম্পন্ন হয়।

মূলধন ব্যবহার উৎপাদনের প্রত্যেকটি স্তরের কার্যকে স্বল্প-মেয়াদী করে

মূলধনের বিনিয়োগ শ্রমিকের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে। শ্রমিকের এই কর্ম দক্ষতার উপর আবার সাধারণ উৎপাদন কার্যের সাফল্য নির্ভর করে। মূলধনের বিনিয়োগ-দৌলতে শ্রমিক বিভিন্ন ধরণের কার্যে বিভিন্ন সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ পায়। ইহাতে একদিকে যেমন তাহার দৈহিক কর্ম-ক্লান্তির চাপ খানিকটা উপশম হয়, অন্যদিকে উৎপাদন কার্যের প্রগুণতা বহুগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আরও এক প্রকারে মূলধনের ব্যবহার শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিতে পারে। আধুনিক উৎপাদন কার্য দীর্ঘকাল-মেয়াদী। উৎপাদন কার্য আরম্ভ এবং তৈয়ারী পণ্য বাজারে বিক্রয়, এই দুইএর মধ্যে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইতে পারে। এই দীর্ঘকাল ব্যাপী শ্রমিকের মজুরী না দিয়া কাজ আদায় করা চলে না। কবে তৈয়ারী মাল বাজারে চালু হইবে ও তাহার বিক্রয় লব্ধ আয় পাওয়া যাইবে ও সেই আয়ের এক অংশ মজুরীরূপে দেওয়া সম্ভব হইবে—ইহার কখনই স্থিরতা নাই। শ্রমিকের উপযুক্ত কর্মদক্ষতা বজায় রাখিয়া, তাহার সহায়তা উৎপাদন কার্যে লাভ করিতে হইলে, তৈয়ারী মাল বাজারে বিক্রি হইবার আগেই অগ্রিম মজুরী দিতে হইবে। এই আগাম মজুরী দেওয়া সম্ভব হয় তখনই, যখন উৎপাদন কার্যে প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ হয়।

মূলধন শ্রমিকের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করে

মূলধনের সাহায্যে মালিক একদিকে যেমন মাল তৈয়ারীর সমস্ত উপাদান ও তৈজসপত্র সংগ্রহ করে, অন্যদিকে পণ্যবিক্রয়ের সুবন্দোবস্ত করা, তৈয়ারী মালের উপযুক্ত প্রচার বা বিজ্ঞপ্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা করাও সম্ভব হয়। মালিকের সমস্যা শুধু উৎপাদন কার্যকে আশ্রয় করিয়া নহে ; কি ভাবে

মূলধন পণ্য-বিক্রয়ের সহায়ক

বাজারে উপযুক্ত মূল্যে তৈয়ারী মালের ব্যাপক চাহিদা হইবে, এ সমস্তাও উৎপাদনের সংগে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিযোগিতা-মূলক বাজারে উৎপাদককে অনেক সময় উৎপাদন কার্য সুরু করিবার পূর্বাহ্নেই প্রচার কার্যের খাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতে হয়। এই প্রচুর অর্থ ব্যয় সম্ভব হয় শুধু সেই উৎপাদকের পক্ষে, যিনি অধিক মূলধনের অধিকারী।

উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতেও মূলধন সহায়তা করে

পরিশেষে, অধিক মূলধন বিনিয়োগ উৎপাদন কার্যকে চালু রাখিতেও সহায়তা করে। স্বল্প মূলধনের মালিক একযোগে উৎপাদন কার্য অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইতে পারে না। মূলধনের অভাবে তাহার কার্যক্রমের গতি কখনও হয়ত স্থিতিশীল অবস্থায় আসিতে পারে; তখন সে তৈয়ারী মাল বিক্রয়লব্ধ অর্থদ্বারা আবার উৎপাদন কার্যের দ্বিতীয় ধারা আরম্ভ করিতে বাধ্য হয়। যে উৎপাদনে ক্রমগতি বা ধারা অব্যাগত নয়, যেখানে কিছুদিন অগ্রসর হওয়ার পর পুঁজির অভাবে হঠাৎ কার্যের গতি কিছুকালের জন্য বন্ধ হইয়া পড়ে, সে ক্ষেত্রে বৃহদায়তন উৎপাদন মুনাফালাভের ব্যাপার হইতে পারে না।

মূলধন বৃদ্ধির কারণ (Causes of Accumulation of Capital) : সঞ্চয় হইতে মূলধনের উৎপত্তি (Capital grows out of savings)। মানুষের সঞ্চয় নির্ভর করে, একদিকে তাহার আয়ের উপর, আর একদিকে, তাহার খাদন ব্যয় বা খরচের উপর (consumption expenditure or outlay)। মানুষের আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে অবশ্য তাহার খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যে অনুপাতে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়, তাহার খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় তাহার চেয়ে কম অনুপাতে। মানুষ যদি তাহার গোটা আয় খাদন ব্যয়ে খরচ করে, তাহা হইলে তাহার আয় যতই হউক না কেন, তাহার কোন সঞ্চয় হইবে না। মানুষ তাহার গোটা আয় ভোগ্যবস্তুর উপরে খরচ করে না; তাহার কারণ এই যে, ভোগ্যবস্তু পাইতে হইলে উৎপাদক সামগ্রী (Capital goods) তৈয়ারীরও প্রয়োজন রহিয়াছে। এই উৎপাদক সামগ্রী তৈয়ারীর জন্য মানুষ তাহার আয়ের একটা অংশ ভোগ্যবস্তু খাদনে ব্যয় না করিয়া রাখিয়া দেয়—ইহাই হইল সঞ্চয়। অবশ্য ভোগ্যবস্তু ক্রয়ে খরচ করা বড়ই লোভনীয়; কেননা, ইহাদ্বারা সাম্প্রতিক উপযোগলাভ অনিবার্য। তবু মানুষ খাদন-ব্যয় সংকোচন করে এই আশায় যে, সঞ্চয়দ্বারা ভবিষ্যতে উৎপাদক সামগ্রী তৈয়ারীর পথ সুগম হইবে, তাহা হইতে নূতন আয় সৃষ্টি হইবে এবং মূলধন বৃদ্ধির সহায়তা

হইবে। যে সঞ্চয় নূতন আয়ের উৎসস্বরূপ, তাহাই শুধু জাতীয় মূলধন উৎপত্তির অনুকূল।

দেশের মূলধনের বৃদ্ধি জাতীয় আয়স্তরের বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। জাতীয় আয়স্তরের বৃদ্ধি আবার সম্ভব হয় তখনই, যখন জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদক সামগ্রী তৈয়ারীতে বিনিয়োগ হয়। ব্যক্তিগত সঞ্চয় নির্ভর করে ব্যক্তির আয়স্তর এবং অন্যান্য আনুসঙ্গিক কারণের উপর। মানুষের আপনজনের প্রতি স্নেহ-প্রবণতা, ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টি, বৃদ্ধকালের আশ্রয় ও অবলম্বনের স্পৃহা, সঞ্চয় স্পৃহা, অর্থ, বিত্ত ও সম্মান ভোগেচ্ছা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রভৃতি অনেক বিষয় অনেক সময় তাহাকে খাদনব্যয় সংকোচনে উৎসাহিত করিয়া সঞ্চয় বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করে। আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় যৌথ কারবারগুলির সঞ্চয় পরিমাণও নগণ্য নহে। এই সঞ্চয় উহারা সাধারণতঃ করে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য—যথা, সঙ্গতি বৃদ্ধি করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতির সম্প্রসারণ ও আধুনিককরণ, মন্দা ও দুর্যোগের মুখে বিধিব্যবস্থা, উৎপাদক দ্রব্য অবচয়ের ব্যযভার বহন ইত্যাদি।

জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, উচ্চ মুনাফাহারের সম্ভাবনা, বিনিয়োগের সুযোগসুবিধা প্রভৃতিও অনেক সময় ব্যক্তিগত সঞ্চয়কে প্রভাবান্বিত করে।

সঞ্চয় ও সুদের হার (Savings and the Rate of Interest) : অধ্যাপক মার্শাল ও তাঁহার সমসাময়িক অনেক অর্থবিদ্যাবিদ সুদের হার এবং সঞ্চয় পরিমাণের মধ্যে একট নিকট সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতানুযাযী সঞ্চয় পরিমাণ যে সমস্ত বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহাদের মধ্যে সুদের হার অন্যতম। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, সুদের হারের তারতম্যানুসারে সঞ্চয় পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

উচ্চ সুদের হার কি সঞ্চয় বর্ধক ?

সুদের হার বৃদ্ধি সঞ্চয়ের ইচ্ছাকে উৎসাহিত করে; আবার সুদের হার হ্রাস সঞ্চয়প্রবণতা ক্ষুণ্ণ করে। কিন্তু লর্ড কীনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ এই মতবাদের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, সুদের হার বৃদ্ধি কোন ক্রমেই সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধির অনুকূল নহে। জাতীয় সঞ্চয় পরিমাণ বৃদ্ধি নির্ভর করে জাতীয় আয়স্তর বৃদ্ধির উপর। এই আয়স্তর বৃদ্ধি আবার সম্ভব হয়, উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির উপর। সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উৎপাদনকার্যে লগ্নীকরণ বা বিনিয়োগ স্বভাবতঃই হ্রাস পাইবে; ফলে, আয়স্তরের কমতি হইবে এবং জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণও হ্রাস পাইবে। সুদের হার বৃদ্ধি ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় বাড়াইতে পারে বটে,

কিন্তু ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয়বৃদ্ধি ও জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি এক নয়। সুদের হারের বাড়্তি হইলে, ব্যক্তিবিশেষের সঞ্চয় বাড়ে এবং তাহাদের সাম্প্রতিক খাদনব্যয় সংকুচিত হয়। এই খাদনব্যয় সংকোচনের অর্থ, ভোগ্যবস্তুর বাজার কাটৃতি কমিয়া যাওয়া। ভোগ্যবস্তুর কাটৃতি হ্রাস পাওয়ার সংগে সংগে উহাদের উৎপাদনেও মন্দা আসিবে এবং ভোগ্যবস্তু উৎপাদনকারীদের অর্থআয়ও কমিতে থাকবে; ফলে, উৎপাদনকারকসমূহের অর্থআয় হ্রাস পাওয়ায় জাতীয় সঞ্চয় বাড়িতে পারিবে না। মোট সঞ্চয় পরিমাণ একদিকে আয়স্তর আর এক-দিকে লোকের খাদনপ্রবণতার উপর নির্ভর করে। নিম্ন আয়স্তরের মানুষের খাদন প্রবণতা খুব বেশী থাকে। ইহাদের আয় বৃদ্ধি সঞ্চয় পরিমাণকে বিশেষ প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। অপর পক্ষে, উচ্চ আয়স্তরের মানুষের বেলায় খাদন প্রবণতা কম, সঞ্চয় প্রবণতা বেশী। উচ্চ আয়স্তরের মানুষের আয় বৃদ্ধি ঘটিলে, সঞ্চয় বৃদ্ধিও ঘটে।

অবশ্য বাস্তব জগতে যে বিজ্ঞ, তাহার সঞ্চয় পরিমাণ সুদের হার বৃদ্ধির সংগে সংগে বাড়িয়া থাকে। কিন্তু সঞ্চয়কার্য শুধু সাংসারিক অভিজ্ঞতা বা জ্ঞানের উপরই নির্ভর করে না। সামাজিক রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, প্রতিবন্ধক প্রভৃতিও পরোক্ষ ভাবে মানুষের সঞ্চয়প্রবণতা প্রভাবান্বিত করে। অধ্যাপক বোল্ডিং (Boulding) বলেন : সঞ্চয় কার্য অনেক সময় আয়ের তারতম্যানুসারে ব্যয়কার্যকে নিয়মিত করে (Savings are often a 'buffer', which adjusts changes in expenditure to changes in income)। মানুষের আয়স্তর যখন বৃদ্ধি পায়, তখন তাহার জীবনযাত্রার মান হঠাৎ বাড়িয়া যায় না, এবং একই অনুপাতে খাদন ব্যয়েরও বাড়্তি হয় না। ফলে, সে সঞ্চয় করিয়া বসে। আবার যখন তাহার আয়স্তর হ্রাস পায়, তখন তাহার জীবনযাত্রার মান হঠাৎ কমানও সম্ভব হয় না; ফলে, সঞ্চয় পরিমাণে ঘাটৃতি অনিবার্য হইয়া পড়ে। অবশ্য দীর্ঘকালীন (long run) সঞ্চয় ব্যাপারে সুদের হারের তারতম্যের প্রভাব অনস্বীকার্য। "When the money income of the consumer is rising, his standard of life will frequently lag behind the rise in the purchasing power of money.....Nevertheless, for problems of the long-run variety, the conclusions of the theory of natural saving are likely to be more valid."

মূলধনের গতিশীলতা (Mobility of Capital) : মূলধনের গতিশীলতা অর্থ

উহা এক কার্য হইতে অন্য কার্যে অথবা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে অবাধ চলাচল করিতে পারে কি না। রকমারি মূলধনের রকমারি গতিশীলতা। কার্যকরী মূলধনের গতিশীলতা খুব অবাধ। আর্থিক মূলধনের চল্তি অবস্থা খুব বেশী—এক উৎপাদন-কার্য হইতে অন্য উৎপাদনকার্যে লগ্নীকরণ খুবই সহজ। কাঁচা মাল এবং অর্ধেক তৈয়ারী মালের গতিশীলতা অপেক্ষাকৃত অল্প। সাধারণ যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম,—যাহা প্রত্যেক শিল্পোৎপাদন কার্যেই ব্যবহার্য,—অবাধ গতিশীল। কিন্তু সকলের চাইতে ব্যয় বহুল মূলধন, অর্থাৎ স্থায়ী উৎপাদন বৃত্তি যথা, কারখানাগৃহ, বৈশিষ্ট্যময় যন্ত্রপাতি প্রভৃতির ভৌগলিক গতিশীলতা (geographical mobility) নাই- এক শিল্প উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইলে উহা ঐ শিল্পেই বিশিষ্টতালাভ করে, অন্য শিল্পোৎপাদনকার্যে উহার বিনিয়োগ চলে না।

অনুশীলনী

1. What are the different senses in which the term capital is used in Economics ?
2. What is capital ? Is money capital ? Justify your answer by appropriate reasoning. (C.U. B.A—'55)
3. Explain the role of capital in production. Discuss the factors on which the accumulation of capital depends. (C.U. B.A—'50)
4. "Capital grows out of savings"—Discuss.

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভূমি (Land)

ভূমি অর্থবিদ্যায় ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, তাহা আমরা দেখিয়াছি। ভূমির উৎপাদনক্ষমতা নির্ভর করে তিনটি বিষয়ের উপর : **প্রথমতঃ**, প্রাকৃতিক সম্পদ। অনুকূল আবহাওয়াও জলবায়ু, জমির উর্বরতা শক্তি, খনিজ সম্পদ, জল সরবরাহ প্রভৃতি যদি প্রচুর পরিমাণে প্রকৃতি দত্ত হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইবে। **দ্বিতীয়তঃ**, মানুষের প্রচেষ্টা ভূমির উৎকর্ষতা সাধনে কম সহায়তা করে না। মানুষ তাহার বুদ্ধি, শক্তি ও শ্রমপ্রচেষ্টাদ্বারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়াছে, জলাজমির জলসেচ করিয়াছে, কৃত্রিম উপায়ে ভূমির

উর্বরতা বৃদ্ধি করিতে রকমারি উপায় উদ্ভাবন করিয়াছে; ফলে, ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। **তৃতীয়তঃ**, আঞ্চলিক পরিবেশও (situational factor) ভূমির উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করে। যে ভূমিখণ্ড পণ্যবাজারের আওতার মধ্যে, উহার উৎকর্ষতা ও অর্থমূল্য নিশ্চয়ই বেশী।

ভূমির বৈশিষ্ট্য (Peculiarities of Land) : অর্থবিদ্যায় ভূমির কতগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ভূমি প্রকৃতির দান এবং সেই হেতু, ইহার যোগান সীমিত। ভূমির গতিশীলতা অবাধ নয়—ইহা স্থানান্তরিত করা যায় না। উর্বরতা ও পরিস্থিতির সুবিধার দিক হইতে ভূমির পর্যায়ও (grade) রকমারি। কতগুলি ভূমি আছে, যাহার উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার মূল্যের চেয়ে উৎপাদন খরচ বেশী পড়ে—এই পর্যায়ের ভূমিগুলিকে **প্রান্তিক-অধম ভূমি** (**sub-marginal land**) বলা চলে। এই ভূমিতে উৎপাদন লোকসানজনক বলিয়া, বাস্তব জগতে এই ধরণের ভূমির চাষ-আবাদ বড় একটা হয় না। অনেক ভূমিখণ্ড আছে, যাহার উৎপাদন খরচ এবং উৎপন্ন দ্রব্য মূল্য সমান—এই পর্যায়ের ভূমিখণ্ডকে **প্রান্তিক ভূমি** (**marginal land**) বলে। এই ভূমির আবাদে উৎপাদকের লাভ বা লোকসান কিছু হয় না। আবার প্রান্তিক ভূমির চেয়ে সেরা পর্যায়ের জমি আছে, উহাকে **প্রান্তিক সেরা ভূমি** (**intra-marginal land**) বলা যাইতে পারে। এই জমির আবাদ স্বভাবতঃই লাভজনক; কেননা, ইহার উৎপাদন খরচ উৎপন্নদ্রব্য-মূল্যের চেয়ে কম। রকমারি পর্যায়ের ভূমির বিভিন্ন একক সমান উর্বরশীল নয় এবং উহাদের মধ্যে অবাধ বিনিময়ও সম্ভব নয়। পরিশেষে, ভূমির যোগান সীমিত বলিয়া ইহার যোগান-দর নাই। ভূমি উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইলে ইহার দরুণ কোন খরচ করিতে হয় না। ভূমির যোগান প্রকৃতির দান হিসাবে প্রাপ্ত বলিয়া, ইহার সরবরাহ সমাজের কাহারও শ্রম বা অপযোগ সাপেক্ষ নয়। সেই হেতু, সামাজের দিক হইতে, ভূমির যোগান কোন বাজার দরের উপর নির্ভর করে না। বাজার দর অধিক হইলে, ভূমির যোগান বাড়ে না, আবার বাজার দর কমিয়া গেলে, ভূমির যোগান হ্রাসও পায় না।

ভূমি ও মূলধনের মধ্যে প্রভেদ (Distinction between Land and Capital) : প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ ভূমির কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ নির্দেশ করিয়া ইহাকে মূলধন হইতে একটি পৃথক উৎপাদককারক হিসাবে গণ্য করিয়াছেন। ভূমি প্রকৃতি প্রদত্ত; সেই জন্য ইহার যোগান সীমাবদ্ধ এবং ইহার গতিশীলতাও অবাধ নয়। অপর পক্ষে, মূলধন মানুষের শ্রমলব্ধ; ইহার যোগান

পরিবর্তনশীল ; ভূমি অপেক্ষা ইহার (মূলধনের) গতিশীলতা বেশী অবাধ। ভূমির রকমারি পর্যায় (Grade) ; এক পর্যায়ের ভূমির সংগে আর এক পর্যায়ের ভূমির উৎপাদকতার বিশেষ মিল নাই। কিন্তু মূলধনের বিভিন্ন একক সমজাতীয়। পরিশেষে, ভূমির কোন যোগান-দর নাই ; ভূমি উৎপাদন কার্যে নিযুক্ত হইলে উহার দরুণ কোন উৎপাদন খরচ হয় না। কিন্তু মূলধনের যোগান-দর আছে। মূলধন বিনিযোগ করিতে উৎপাদককে খরচ বহন করিতে হয়। মূলধন যাহারা যোগায় তাহাদের সাম্প্রতিক খাদন ব্যয় সংকোচন করিয়া অনিশ্চয়তার মধ্যে অপযোগ ঘাড়ে করিতে হয়। দক্ষিণা স্বরূপ যোগান-দর তাহারা যদি না পায়, তাহা হইলে মূলধনের সরবরাহই বন্ধ হইয়া যায় এবং উৎপাদকের বিনিযোগও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ভূমি ও মূলধনের মূলগত কোন পার্থক্য নাই

আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ কিন্তু ভূমি ও মূলধনের পৃথকীকরণের উপর বড় বিশেষ জোর দেন না। তাহারা বলেন যে, প্রাচীনপন্থীরা উপরোক্ত যে সকল আপেক্ষিক বৈশিষ্ট্যের গুণে ভূমি ও মূলধনের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য রেখা টানেন, উহা নিছকই অবাস্তব ও অগৌণ। (The difference between land and capital is not of a kind but of a degree only). ভূমি ও মূলধনের মধ্যে কোন তফাৎ নাই ; পার্থক্য শুধু ক্রমগত। ভূমি প্রকৃতির দান ও সীমাবদ্ধ হইলেও, মানুষ তাহার শ্রম সংযোগে উহার রূপান্তর ঘটাইতে পারে—উহার যোগান বৃদ্ধি ও হ্রাস মানুষের শ্রমায়াসসাপেক্ষ। আবার মূলধনের যোগানও চির পরিবর্তনশীল নয় ; স্বল্প সময় পর্যায়ে (in the short period) মূলধনেরও যোগান টান হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, মূলধন সকল সময়েই সমজাতীয় নয়। এক কারখানার যন্ত্রপাতি অন্য কারখানার যন্ত্রপাতি হইতে আলাদা ধরণের হওয়া অস্বাভাবিক নয়। আবার সমপর্যায়ের ভূমি খণ্ডের সন্ধানও যে বাস্তব জীবনে না মেলে তাহা নয়। **তৃতীয়তঃ**, বলা হয়, ভূমির গতিশীলতা নাই, কিন্তু ভূমি হইতে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহা গতিশীল। ভূমির গতিশীলতা আর এক অর্থে অনুমান করা যায়, যখন একই ভূমি বহুল বিকল্প কার্যে ব্যবহৃত হয়। অপরপক্ষে, মূলধনের অবাধ গতিশীলতা বিভিন্ন দেশের আইনের বৈষম্যে ও মুদ্রাব্যবহারের রকম ফেরে ব্যাহত হয়। **পরিশেষে**, ব্যক্তি বিশেষের দৃষ্টি ভংগিতে দেখা যায়, ভূমিরও মূলধনের মতই যোগান-দর আছে। যখন কোন ব্যক্তি উৎপাদন কার্যে একখণ্ড ভূমি নিযুক্ত করে, তখন ঐ জমির খাজনা বাবদ ব্যয় গোটা উৎপাদন খরচের মধ্যে তাহাকে ধরিতে হইবে।

ভূমি ও মূলধনের মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য না দেখিয়া অধ্যাপক উইক্সেল্ (Wicksell) এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, অর্থনীতিবিদ্গণের মূলধনের অর্থ এমন ব্যাপকভাবে ধরা উচিত যাহাতে ভূমি কথাটি মূলধন ভুক্তি হইতে পারে।

অনুশীলনী

1. What are the characteristics of land as a factor of production ?
2. Is there any fundamental difference between land and capital ? (C. U. B. A. (Hons.), '52

সপ্তম অধ্যায়

সংগঠন (Organisation)

আজিকার পৃথিবীতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অতি জটিল আকার ধারণ করিয়াছে। উৎপাদনের পরিধি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, পদ্ধতিতেও রকমারি জটিলতার সৃষ্টি হইয়াছে। পণ্য-বাজারে প্রতিযোগিতা করিবার জন্য সম্ভাব্য বিক্রি অনুমান করিয়াই উৎপাদন কার্য সুরু করিতে হয়। বৃহদায়তন উৎপাদনে উপযুক্ত ও প্রচুর পরিমাণ কাঁচামালের সমাবেশ করিতে হয়, উপযুক্ত পরিমাণ ও সঠিক অনুপাতে বিভিন্ন উৎপাদক-কারক নিয়োগ করিয়া তাহাদের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বিধান করিতে হয়, যথাযোগ্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার, উপযুক্ত কর্মবিভাগ ও আধুনিকতম উৎপাদন পদ্ধতির প্রয়োগ করিতে হয়। ব্যাপক পরিধির বৃহদায়তন উৎপাদনকার্য স্বভাবতঃ দীর্ঘকালমেয়াদী ও ঘুরান প্রক্রিয়া বিশেষ হইয়া থাকে। উৎপাদনকার্য সুরু ও তৈয়ারী পণ্য বাজারে চালু হওয়া—এই দুই ব্যাপারের মধ্যে যথেষ্ট সময় অতিবাহিত হইতে পারে। প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎপাদনকার্যে প্রতি পদে অনিশ্চয়তা আর ঝুঁকি বর্তমান। উৎপাদনের এই সকল অনিশ্চয়তা স্কন্ধে নেন সংগঠনকর্তা, সকল ঝুঁকি বহন করেন তিনিই। অর্থবিজ্ঞায় তাহাকে entrepreneur বলা হয়।

উৎপাদনের জটিলতার জন্য কে যে প্রকৃত সংগঠনকর্তা তাহা অনেক সময় সঠিক নিরূপন করা কষ্টসাধ্য। যৌথ কারবারে, অংশীদারগণই প্রকৃত ঝুঁকিবাহী

বলিয়া তাহাদের সকলকেই সংগঠনকর্তা বলা যায়। অংশীদারী কারবারে সকল অংশীদারই সংগঠনকর্তা, যদিও তাহাদের কিছুসংখ্যক অংশীদার সক্রিয় এবং কিছু সংখ্যক নিষ্ক্রিয়। এক হিসাবে দেখিতে গেলে ভূমি, শ্রম, মূলধন প্রভৃতি সমস্ত উৎপাদক-কারকই কিছু না কিছু ঝুঁকি বহন করে। কিন্তু ঝুঁকিবাহী সকল কারককেই সংগঠনকর্তা বলা চলে না। যে ঝুঁকির বীমা করা চলে, তাহা প্রকৃত ঝুঁকি নহে। প্রকৃত বা আসল ঝুঁকি যে বা যাহারা বহন করে, তাহাকে বা তাহাদিগকে সংগঠনকর্তা বলা হয়।

সংগঠনকর্তার গুরুত্ব ও কার্যাবলী (Importance and Functions of the Entrepreneur): আধুনিক শিল্পোৎপাদন কার্যে ও ব্যবসায় বাণিজ্যে সংগঠনকর্তার গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনস্বীকার্য।

প্রাচীনপন্থী অর্থনীতিজ্ঞগণ মনে করিতেন যে, সংগঠনকর্তার প্রধান দায়িত্ব ও কার্য হইল পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা (management) করা। উৎপাদনকার্য

ব্যবস্থাপনা

বা ব্যবসায়ের বিভিন্ন দিক তদারগ করিয়া (supervision) উহাকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ (control) করাই সংগঠন কর্তার প্রধান কর্তব্য। কিন্তু আজিকার যুগে যৌথকারবার প্রথা অধিক প্রচলন হওয়াতে, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার কার্য সংগঠনকর্তা আর নিজে করেন না—মজুরীভোগী কর্মাধ্যক্ষের (salaried manager) স্কন্ধে ঐ ভার চাপিয়াছে। কিন্তু মজুরীভোগী ব্যবস্থাপক সংগঠনকর্তা নয়। উৎপাদনকার্যের চরম নিয়ামক (ultimate controller) যিনি, তিনিই উৎপাদনের আসল পরিকল্পনা বা নীতি নির্ধারণ করেন; তিনিই প্রকৃত পক্ষে সংগঠনকর্তা।

আধুনিক সংগঠনকর্তার প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হইল উৎপাদনের গোটা পরিকল্পনা নীতি নির্ধারণ করা (policy determining)। সংগঠনকর্তার এই সিদ্ধান্তের উপরই উৎপাদনের সাফল্য ও ব্যবসায়ের উৎকর্ষতা বহুল পরিমাণে

পরিকল্পনা ও নীতি নির্ণয়

নির্ভর করে। কোন্ সামগ্রী কি পরিমাণ, কি গুণসম্পন্ন ও কোন্ লগ্নে উৎপাদন করিতে হইবে, ইহা তিনি নির্ণয় করিবেন। উৎপাদনের ক্রম ও শিল্পের বা কারখানার স্থান নির্ধারণ তাহারই দায়িত্ব। কোন্ সামগ্রীর কি পরিমাণ উৎপাদন হইবে, কি গুণ সম্পন্ন কি পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহৃত হইবে, কি পদ্ধতিতে, কোন্ যন্ত্রপাতি প্রয়োগে তৈয়ার কার্য অধিক লাভের হইবে, ইহার প্রত্যেকটি বিষয়ে তাহাকেই চরম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হয়। উপযুক্ত কাঁচা মাল কেনা, মূলধন বিনিয়োগ করা, যথাযথ কর্ম বিভাগ করা, তৈয়ারী মালের বাজার

পরিধি বিস্তার করা প্রভৃতি দায়িত্ব তাহাকেই গ্রহণ করিতে হয়। উৎপাদনের বিভিন্ন কারকসমূহ যথোপযুক্ত সংমিশ্রণ করা এবং সঠিক অনুপাতে উহাদের পরস্পর সমন্বয় বিধান করা সংগঠনকর্তার অন্যতম কার্য। যথোপযুক্ত অনুপাতে কারক সংমিশ্রণ ও উহাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য বিধানের উপরই সুষ্ঠু উৎপাদন বিশেষভাবে নির্ভর করে।

সংগঠনকর্তা বিভিন্ন কারক সংমিশ্রণে উৎপাদনকার্য সমাধা করিয়া আয় সৃষ্টির পথ প্রশস্ত করেন। এই আয় আবার সামগ্রী উৎপাদনে নিয়োজিত কারকসমূহ যথা, ভূমি, মূলধন ও শ্রমের মধ্যে উহাদের পারিশ্রমিক হিসাবে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। উৎপাদনে যদি লোকসানও হয়, তাহা হইলেও উৎপাদক কারকগণের প্রাপ্য অংশ সংগঠন কর্তাকে বণ্টন করিয়া দিতেই হইবে। কেননা, ভূমি, শ্রম ও মূলধনের প্রাপ্য পারিশ্রমিক সংগঠনকর্তার লাভ লোকসানের উপর নির্ভর করে না; উহাদের পারিশ্রমিক আগাম চুক্তি হইয়া থাকে, উৎপাদন পর্ব সমাধা হইবার পূর্বাহ্নেই।

কারক-আয় বণ্টন

সংগঠনকর্তার আর একটী দায়িত্বমূলক প্রধান কাজ উৎপাদনের সকলপ্রকার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন করা। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা পদে পদে। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন কার্যে বিভিন্ন উৎপাদক-মালিকের রেষারেষিতে ঝুঁকির বোঝা স্বভাবতঃ বেশী হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভবিষ্যৎ বাজার-চাহিদার সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া যেখানে উৎপাদনের পরিকল্পনা নির্ধারিত হয়, সেখানে অনিশ্চয়তা অনিবার্য। বাজার চাহিদার উপর উৎপাদক মালিকদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নাই বলিয়া কখনও অত্যুৎপাদন (over-production) কখন বা অবউৎপাদন (under-production) হইতে পারে। তৃতীয়তঃ, আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন-ক্রিয়া ঘুরান ও দীর্ঘ মেয়াদী বলিয়াও ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা ইহার সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দীর্ঘ মেয়াদী উৎপাদনের অসুবিধা এই যে, যখন প্রকৃত কার্য আরম্ভ হইল তখন চাহিদার বাজার হয়ত বেশ চড়া; কিন্তু কালক্রমে তৈয়ারী মাল যখন বাজারে ছাড়া হইল, তখন দেখা গেল যে, চাহিদা-বাজারে মন্দা আসিয়া গিয়াছে। উৎপাদন কার্যের এই রকম রকমারি ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার ভার সংগঠনকর্তাকে কাঁধে লইতে হয় এবং তাহার ব্যবস্থাপনা-নৈপুণ্যে ও বাস্তব কর্মকুশলতায় সেই ভার লঘু করিতে হয়।

অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন

অনেক অর্থনীতিজ্ঞ মনে করেন, প্রকৃত সংগঠনকর্তা যিনি, তিনি গতানুগতিক

পথে ও চিরাচরিত পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্য নির্বাহ করেন না। উৎপাদন কার্যে **উৎপাদনের পথিকৃৎ** তিনি হইবেন পথিকৃৎ ; নূতন পথের সন্ধানী, নূতন পদ্ধতির আবিষ্কর্তা। সংগঠন কর্তা উপযুক্ত দূরদৃষ্টি লইয়া উৎপাদনের নূতন পদ্ধতির সন্ধান দিবেন ; উদ্ভাবনীশক্তি ও আবিষ্কারকের গুণ লইয়া বিজ্ঞানসম্মত আধুনিকত কার্যক্রমের নির্দেশ দিবেন তিনি—যাহাতে উৎপাদন কার্যে ন্যূনতম খরচে সর্ব্বাধিক ফল লাভ সম্ভব হয়।

আদর্শ সংগঠন কর্তার গুণাবলী (Qualities required in an Ideal Entrepreneur) : আদর্শ সংগঠনকর্তাকে বহু গুণসমন্বিত হইতে হইবে। তাঁহার প্রখর দূরদৃষ্টি থাকা চাই, যাহার দ্বারা তিনি বাজারের সম্ভাব্য অবস্থা আগে-ভাগে ধারণা করিয়া তদনুসারে উৎপাদন ক্রমের সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারেন। তাঁহার দূরদৃষ্টিদ্বারা তিনি সকল সময় সতর্ক থাকিবেন যেন কোন ক্রমেই অত্যুৎপাদন ঘটিয়া তাঁহার লোকসান না হয়। অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞানের পরিধি সুবিস্তৃত এবং খবরাখবরও সঠিক ও সাম্প্রতিকতম হওয়া প্রয়োজন। শুধু যে কাঁচামাল ক্রয়ের বাজার ও উৎপন্ন পণ্য বিক্রয়-বাজার সম্পর্কেই তাঁহার জ্ঞান ব্যাপক ও নিখুঁত থাকিবে তাহা নহে ; বিজ্ঞান সম্মত আধুনিকতম উৎপাদন প্রণালী সম্বন্ধেও তাঁহাকে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকতে হইবে। তিনি হইবেন অদম্য উৎসাহ ও অপরিমেয় কর্মশক্তির অধিকারী। উৎপাদনের বিভিন্ন বিভাগের উপর তাঁহার দৃষ্টি থাকিবে সজাগ, যাহাতে কোথাও কোন দুর্নীতি বা অমিতাচার প্রশ্রয় না পায়। পরিশেষে, আদর্শ সংগঠনকর্তা হইবেন স্বভাবতঃ নেতৃস্থানীয়। মানুষ চিনিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকিবে প্রখর। কোন্ গুণসম্পন্ন মানুষ কোন্ শ্রমের উপযোগী তাহা তিনি সহজেই নির্ধারণ করিতে পারিবেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন সুমহান্ হইবে যে, শ্রমিকগণ স্বভাবতঃই তাঁহার আজ্ঞাবহরূপে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবে।

সংগঠন কর্তার যোগান (Supply of Entrepreneur Class) : আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়—যেখানে বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যে প্রচুর শ্রম ও মূলধনের বিনিয়োগ অবশ্যম্ভাবী,—সংগঠনকর্তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের নিয়মিত যোগান শিল্পোন্নতি ও ব্যবসায়ের উৎকর্ষের জন্য একান্ত প্রয়োজন। একথা অবশ্য সত্য যে, বড় শিল্পপতিরা জন্মগ্রহণ করেন, তৈয়ারী হন না ; কিন্তু সাধারণ ব্যবসায়বুদ্ধি সম্পন্ন সংগঠনকর্তা-শ্রেণীর লোকের যোগান কতকগুলি অনুকূল পরিস্থিতির দ্বারা বিশেষভাবে

প্রভাবান্বিত হয়। **প্রথমতঃ**, সত্যিকারের আর্থিক স্বাধীনতা যেখানে বিদ্যমান, সেখানে প্রতি ব্যক্তিই স্বকীয় মনোবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে নিজের পছন্দসই ব্যবসায় মনোনয়ন করিয়া নিজের সংগঠন শক্তির চরম বিকাশ করিবার সুযোগ গ্রহণ করে। **দ্বিতীয়তঃ**, সংগঠন শক্তি চরম বিকাশ হয় সেখানে, যেখানে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সুষ্ঠুভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং শ্রেণীগত বৈষম্য উৎকট নয়। **তৃতীয়তঃ**, সংগঠনকর্তাস্থানীয় ব্যক্তির যোগান প্রাচুর্য বিশেষভাবে সম্ভব হয়, যদি কোন শিল্পোৎপাদনে নিয়োজিত শ্রমিককে ব্যবসায়ের খুঁটিনাটি সমস্ত রহস্য অবগতির পূর্ণ সুযোগ দেওয়া হয়। **অবশেষে**, যদি ব্যবসায়-চতুর অথচ পুঁজিহীনকে মূলধনের যোগান ও বিনিয়োগের সুযোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারাও কালক্রমে নামজাদা সংগঠনকর্তার মর্যাদা লাভ করিতে পারে।

অনুশীলনী

1. Discuss the functions of the entrepreneur and his importance in the modern industrial organisation.
(C.U. B.A., '52,' 54)

অষ্টম অধ্যায়

উৎপাদন সংগঠন (Organisation of Production)

প্রাচীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন সংগঠনকার্য অতি সহজ ব্যাপার ছিল। সংগঠনকর্তা নিজেই প্রয়োজনানুরূপ উৎপাদন সামগ্রী যোগাইতেন এবং উৎপাদন পরিধি ও ক্রমও ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু অধুনা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শিল্পোৎপাদনকার্য অতিশয় জটিল ও সমস্যাপূর্ণ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য (Features of Capitalism): প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে।

প্রথমতঃ, আর্থিক স্বাধীনতা এ ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র। সম্পত্তির স্বাধীন ব্যবহার, কার্য বা পেশা নির্ধারণের স্বাধীনতা এবং ব্যবসায় কারবারে অপরের সহিত চুক্তি আবদ্ধ হইবার অবাধ ক্ষমতা, এই তিনটি বিষয় হইল আর্থিক স্বাধীনতার তিনটি রক্ষা-কবচ।

দ্বিতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদনক্রম সুদীর্ঘ ও ঘুরান

প্রক্রিয়া বিশেষ। উৎপাদন কার্যে কর্ম বিভাগ বিশেষ ভাবে কার্যকরী হওয়ায়, কার্যস্তর বহু অংশে বিভক্ত হইয়া দীর্ঘমেয়াদী হইয়াছে। কিন্তু কর্মবিভাগের ফলে কার্যপ্রক্রিয়া বহুল অংশে বিভক্ত হইলেও, বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা কিন্তু পূর্ণমাত্রায়ই বিদ্যমান। বিভিন্ন কার্যস্তরের পারস্পরিক এই সহযোগিতা না থাকিলে গোটা উৎপাদন কার্যের উৎকর্ষতা কিছুতেই সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ, সুবিস্তৃত কর্ম বিভাগ ও সহযোগিতা, একদিকে যেমন অধুনা শিল্পকার্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করিয়াছে, অন্যদিকে তেমনি রকমারি অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার উৎপাদনের পরিমাণ বৃহদায়তন করিতে ও মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

চতুর্থতঃ, প্রতিযোগিতামূলক আর্থিক ব্যবস্থায় আত্যন্তিক কর্মবিভাগ ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দরুণ উৎপাদন কার্যে সুষ্ঠু সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা অনিবার্য হইয়া পড়ে, যাহার ফলে সংগঠনকর্তাকে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

পঞ্চমতঃ, আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থায় খাদকের সার্বভৌমিকতা আর এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য। দেশের উৎপাদন কার্যের গতি ও পরিমাণ নির্ধারিত হয় খাদকের পছন্দক্রম (consumer's preferences) দ্বারা। প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খাদকের পছন্দক্রম চাহিদা দাম বা বাজার দাম নির্দেশক ; আর এই দামস্তরই উৎপাদকের কর্মপ্রচেষ্টা নির্ধারণ করিতে ইংগিত করে।

পরিশেষে, অধুনা শিল্পব্যবস্থা আর দুইটি বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করিয়াছে, যথা—শ্রমিকের বিশেষত্ববিধান ও তাহাদের পারস্পরিক সহযোগিতা (The modern industrial organisation is based upon specialisation as well as co-operation). কর্ম বিভাগের ফলে, একটি উৎপাদন কার্য বহুস্তরে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেকটি কার্যস্তরের জন্য বিশিষ্ট নিপুণতাসম্পন্ন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। কর্ম বিভাগের ফলে বিশেষ গুণসম্পন্ন শ্রমিক বিশেষ কার্যস্তরে নিয়োজিত হয়। তাহার ফলে, একদিকে যেমন শ্রমিকের কর্মদক্ষতার অশেষ বিশেষত্ব বিধান হয়, অন্যদিকে আবার উৎপাদনকার্যের ঝুঁকিও বহু অংশে বিভক্ত ও বণ্টিত হইয়া (উৎপাদনের) অনিশ্চয়তার ভার লঘু করে। কর্মবিভাগের ফলে শুধু যে শ্রমিকের নিপুণতার বিশেষত্ব বিধান হয় তাহা নহে, শিল্পবিশেষের উৎপাদনকার্যেও বিশেষত্ব সাধান লক্ষ্যনীয়। যেমন, ঘড়ি উৎপাদনকারীদের মধ্যে কেহ বা দেওয়াল ঘড়ি, কেহ বা

আবার মণিবন্ধ ঘড়ি তৈয়ারী কার্যে বিশেষত্ব অর্জন করিয়া থাকে। ইহা ছাড়া, ভৌগলিক শ্রমবিভাগের ফলে বিশেষ বিশেষ স্থান বিশেষ বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনেও বিশেষত্বলাভ করিয়া থাকে। যেমন, উত্তর প্রদেশ ও বিহার চিনি শিল্পে, কিংবা পশ্চিম ভারত তুলা বয়ন শিল্পে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। কর্ম বিভাগের ফলে গোটা উৎপাদন কার্য বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হয় বটে, আবার এই বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতেও সহজ হয়। যেমন, অধুনা কারখানায় জুতা তৈয়ারী কার্য বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। এক স্তরে চামড়া মসৃণ করা হয়, আর এক স্তরে জুতার তলা তৈয়ারী করা হয়, ইত্যাদি। এই বিভিন্ন কার্য স্তরের মধ্যে যদি সহযোগিতা না থাকে, তাহা হইলে গোটা উৎপাদন কার্যেরই ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা। যদি চামড়া সুমসৃণ না হয়, যদি জুতার তলা বা গোড়ালি অনিপুণ হস্তে তৈয়ারী হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই উৎকৃষ্ট জুতা তৈয়ারী সম্ভব নয়। অধুনা শিল্পব্যবস্থা শুধু যে শ্রমিকের কার্যস্তরের মধ্যেই সহযোগিতা গড়িয়া তুলিতে সহায়তা করে তাহা নহে ; ইহা উৎপাদক-মালিক, শ্রমিককুল, খাদক, ঋণগ্রহিতা, প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সহযোগিতার বৃদ্ধি সাধন করে।

কর্ম বিভাগ (Division of Labour) : অধুনা শিল্প ব্যবস্থায় কর্মবিভাগ কি ভাবে কার্যকরী হয় তাহা আমরা পূর্বে নির্দেশ করিয়াছি। কর্ম বিভাগ রকমারি হইতে পারে। কর্ম বিভাগের সহজ অবস্থায় শ্রমিক একটি গোটা উৎপাদন কার্য একাই সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইত। যেমন, মুচী বা সূত্রধরের কার্যক্রম। কর্ম বিভাগের জটিল অবস্থায় একটি কার্যপ্রক্রিয়া বহু স্তরে বিভক্ত হয় এবং এক একটি কার্যস্তরে বিশিষ্ট নিপুণতাসম্পন্ন শ্রমিক নিয়োজিত হয়। যেমন, অধুনা জুতা তৈয়ারীর কারখানায় জুতা তৈয়ারীর কাজ বিভিন্ন অংশে বা স্তরে বিভক্ত করা হয়। এক একটি স্তরের কার্য কিন্তু স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত বিশিষ্ট নিপুণতা-সম্পন্ন বিভিন্ন শ্রমিকের পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতিরেকে গোটা জুতা তৈয়ারী কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। পরিশেষে, যানবাহনের উন্নতি ও যাতায়াতের সুযোগ সুবিধার সংগে সংগে, ভৌগলিক কর্মবিভাগের বা স্থানানুসার কর্মবিভাগের প্রসার শিল্পজগতে আর এক নূতন ইতিহাসের সূচনা করিয়াছে। স্থানানুসার কর্মবিভাগের ফলে বিশেষ বিশেষ দেশ বা স্থান বিশেষ বিশেষ দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

কর্ম বিভাগের রকমারি

কর্ম বিভাগের উপকারিতা (Advantages of Division of Labour) : প্রাচীন অর্থনীতিবিদ আদম্ স্মিত্ কর্মবিভাগের উপকারিতা সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা আজিকার দিনেও কার্যতঃ বিশেষভাবে সত্য। তাঁহার মতে, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা, কার্যদক্ষতা ও বিচার শক্তির উৎকর্ষতা কর্মবিভাগের অবদান স্বরূপই আমরা লাভ করি। কর্ম বিভাগের দরুণ যে উৎপাদন সম্প্রসারণ হয় তাহা আদম স্মিত আলপিন নির্মাণ শিল্পের উদাহরণদ্বারা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। একজন শ্রমিক এককভাবে দিনে ২০টির বেশী আলপিন তৈয়ারী করিতে পারে না। কিন্তু দশজন শ্রমিক উপযুক্ত কর্ম বিভাগের দ্বারা দিনে কমপক্ষে ৪৮০০টি আলপিন তৈয়ারী করিতে পারে। কর্ম বিভাগের ফলে উৎপাদন সম্প্রসারিত হয় নানা কারণে।

প্রথমতঃ, কর্ম বিভাগের ফলে উৎপাদন কার্য বহুল অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রত্যেক শ্রমিক নিজ কার্যদক্ষতানুযায়ী কোন একটি বিশেষ অংশ উৎপাদনে নিযুক্ত হয়। ফলে, উপযুক্ত কর্মদক্ষ শ্রমিক উপযুক্ত কার্যাংশেই নিযুক্ত হয় এবং শ্রমিকের বৃথা অপচয় ঘটিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, কর্ম বিভাগ শ্রমিকের কার্যকুশলতা বৃদ্ধি করিয়াও উৎপাদন পরিমাণ সম্প্রসারণ করে। যদি একজন শ্রমিক দীর্ঘ মিয়াদ অবধি একই ধরণের কাজ করিতে থাকে, তাহা হইলে সেই কাজে তাহার নৈপুণ্য স্বভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

তৃতীয়তঃ, যখন শ্রমিক কেবল একই কাজে বহু কাল যাবৎ নিযুক্ত থাকে, তখন সেই দিকে স্বভাবতঃ তাহার উদ্ভাবনীশক্তির স্ফূরণ হয়। ফলে, কোন কিছু নূতন আবিষ্কারের পথও সুগম হওয়া অসম্ভব নয়।

চতুর্থতঃ, কর্ম বিভাগের ফলে উৎপাদন স্বল্প মেয়াদী হয়। কোন শ্রমিকের পক্ষে গোটা উৎপাদনকার্যের চেয়ে তাহার একটি মাত্র অংশ সম্পন্ন করা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে সম্ভব। কর্ম বিভাগ শুধু যে উৎপাদন স্বল্প মেয়াদী করে তাহা নহে, ইহা উৎপাদনে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে উৎসাহিত করে ও মিতব্যয়িতা শিক্ষা দেয়। একই সময়ে বহু শ্রমিক এক দফা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে পারে; একজন শ্রমিককে কোন একটি বিশেষ কার্যাংশই মাত্র সম্পন্ন করিতে হয়, যাহার জন্য তাহার একই সময়ে এক দফা যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় না।

পঞ্চমতঃ, কর্ম বিভাগের ফলে রকমারি কর্মসংস্থান হয়। উৎপাদনকার্য বিভিন্ন অংশে ভাগ হওয়ায় বিভিন্ন ধরণের চাকুরীর সংস্থান হয়।

পরিশেষে, কর্মবিভাগের ফলে কার্যক্রম দীর্ঘতর হয়, গড়পড়তা উৎপাদন খরচ ন্যূনতর হয় এবং পণ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। ইহার ফলে, খাদক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে পারে। কর্মবিভাগ শুধু যে উৎপাদন পরিমাণের সম্প্রসারণই করে তাহা নহে, উৎপন্ন পণ্যের উৎকর্ষতাও বৃদ্ধি করে।

কর্মবিভাগের অপকারিতা (Disadvantages of Division of Labour): শ্রমবিভাগের যেমন উপকারিতা আছে, সংগে সংগে ইহার অপকারিতাও অস্বীকার করা যায় না। কর্মবিভাগের ফলে কাজে একঘেয়েমী আসে, যাহার দরুণ শ্রমিক কাজের উৎসাহ ও আনন্দ হারাইয়া ফেলে। ইহাতে শ্রমিকের কার্যকুশলতা বিশেষভাবে ব্যহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কর্মবিভাগ শ্রমিকের দায়িত্বজ্ঞানকে পঙ্গু করে। যেহেতু প্রত্যেক শ্রমিক মাত্রই একটি বিশেষ কার্যাংশে নিযুক্ত হয়, সেই হেতু গোটা উৎপাদন কার্যের দায়িত্ব তাহাকে বড় স্পর্শ করে না। একই কার্যক্রম শ্রমিক যন্ত্রবৎ করিয়া যায়; তাহাতে তাহার মস্তিষ্ক শক্তির আদৌ স্ফুরণ হয় না, তাহার কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায় না, তাহার চারুশিল্পবোধ সঞ্চারিত হয় না এবং তাহার দৃষ্টিভংগিতে জীবন সম্বন্ধে ধারণাও খুব সীমিত হয়। শ্রমিক কর্মপ্রচেষ্টা ও উৎসাহ হারায়, তাহার আত্মপ্রত্যয় নষ্ট হয়। মানুষের সর্বাংগীন স্ফুরণ ও উৎকর্ষ সাধনের পথে ব্যাপক কর্মবিভাগ এক প্রকাণ্ড বাধা বিশেষ। কর্ম বিভাগ মানুষের মনোবৃত্তির বিশেষ একটি অংশকে স্ফুরণ করিয়া মানুষকে কার্যবিশেষেই সুনিপুণ করিয়া তোলে। মানুষের গোটা মনোবৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন করিয়া তাহাকে পরিপূর্ণভাবে গড়িতে কর্মবিভাগ উৎসাহিত করে না।

তৃতীয়তঃ, অতিরিক্ত কর্মবিভাগের আর একটা কুফল হইল, অনেক সময় শ্রমিকের বেকার হইবার ভয় থাকে। কর্মবিভাগের ফলে শ্রমিক বিশেষ কোন বৃত্তিতে নিপুণতা লাভ করে—গোটা উৎপাদন কার্যের একটি অংশ মাত্র সম্পন্ন করিতে পারে। একখানা চেয়ারের হয়ত পা মাত্র সে তৈয়ার করিতে পারে। যদি পা তৈয়ারের কাজের চাহিদা না থাকে, তাহা হইলেই শ্রমিক বেকার হয়।

পরিশেষে, কর্মবিভাগের ফলে কলকারখানা সংশ্লিষ্ট অনেক রকম সমস্যা ও কুফলের উদ্ভব হয়। লোকের ঘনবসতি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, নৈতিক

আদর্শের বিচ্যুতি প্রভৃতি অনেক অমঙ্গলকর কুফল শ্রমিকের জীবন বিষময় করিয়া তুলে।

কিন্তু, মোটের উপর কর্মবিভাগের ফলে উপকারই বেশী হয় এবং ইহার কুফলগুলিও উপযুক্ত সংস্কার ও শিক্ষা বিস্তারদ্বারা দূর করা সম্ভব।

কর্মবিভাগের বাধা-ব্যত্যয় (Limitations of Division of Labour) : কর্ম বিভাগের ফলে সমাজের বহুল কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা সমাজের উৎপাদন শক্তি বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা সকল উৎপাদন কার্যেই সমানভাবে কার্যকরী নয়। কেবল কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কার্যকরী হইলে কর্ম বিভাগ সুফল প্রসব করে। কর্মবিভাগদ্বারা লাভ করিবার একটা অনুকূল অবস্থা হইল উৎপন্ন সামগ্রীর ব্যাপক চাহিদা। সামগ্রী বিক্রির বাজার যত সুবিস্তৃত হইবে, ব্যাপকভাবে ততবেশী কর্ম বিভাগ কার্যকরী হইবে। কর্ম বিভাগ উৎপাদন বৃহদায়তন হইলেই স্বভাবতঃ কার্যকরী হয়। বৃহদায়তন উৎপাদন আবার ব্যাপক চাহিদার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। সামগ্রীর চাহিদা যদি সীমিত হয়, তাহা হইলে বৃহদায়তন উৎপাদন লোকসানের নামান্তর মাত্র। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কোন উৎপাদকই বিষয়টি এইরূপ ভাবে দেখে না। বর্তমান বাজারের পরিধি অনুমান করিয়া সে তাহার উৎপাদন পরিমাণ নির্ধারণ করে। উৎপাদন পরিমাণ এই ভাবে নির্ধারিত হইলে, নিয়োজিত যন্ত্রপাতি ও শ্রমিক সংখ্যার বৈশিষ্ট্য অনুসারে সে কর্ম বিভাগ করে। সংগঠনকর্তার ব্যবস্থানৈপুণ্য কর্ম বিভাগকে বিশেষ ভাবে নিয়মিত করে।

কর্মবিভাগ বাজার পরিধির উপর নির্ভর করে

বাজার পরিধি কর্ম বিভাগকে একদিকে যেমন নিয়মিত করে, অপর দিকে কর্ম বিভাগও বাজারকে নিয়মিত করে। বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যে কর্ম বিভাগ কার্যকরী হওয়ায় উৎপন্ন সামগ্রী অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যে বাজারে আমদানী হয়। বাজার দর সস্তা হইলে অধিক সংখ্যক ক্রেতা আকৃষ্ট হয় ; ফলে, বাজার পরিধিও বিস্তৃতি লাভ করে। অতএব আমরা দেখি যে, শ্রম বিভাগ ও বাজার পরিধি পারস্পরিক নির্ভরশীল। তবে একথা বেশী সত্য যে, শ্রম বিভাগ বাজার পরিধিদ্বারা নিয়মিত হয়।

কলকব্জার ব্যবহার (Use of Machinery) : আধুনিক বৃহদায়তন উৎপাদন কার্যে কর্ম বিভাগ যেমন আনুসংগিক, কলকব্জার দ্রুত প্রচলন ও ব্যবহারও তেমনি অবশ্যম্ভাবী। কলকব্জা ব্যবহারের সুফল বহুবিধ।

কলকব্জা ব্যবহারের দ্বারা মানুষ প্রকৃতির উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করিতে সফল হইয়াছে। প্রকৃতির প্রভূত সম্পদ ও শক্তি মানুষ কলকব্জার দ্বারা আপন করতলগত করিয়া নিজ সেবাকার্যে নিয়োগ করে।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক ভারী কাজ আছে যাহা শ্রমিকের দৈহিক শক্তিদ্বারা সাধন করা অসম্ভব। কলকব্জাদ্বারা এই সকল কাজ অতি সহজেই করা সম্ভব। কলকব্জা প্রযোগে শ্রমিকের দৈহিক নিপীড়ন অনেকাংশে লাঘব হয়।

তৃতীয়তঃ, কলকব্জা অনেক সময়েই অত্যন্ত দ্রুত কাজ করিতে পারে। কলকব্জার দ্বারা তৈয়ারী প্রত্যেকটি জিনিষ একই আকারের হয়। কলকব্জা ঠিক একই ধরণের কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি করে। কলকব্জার বিভিন্ন অংশ প্রমিত (standardised) বস্তুদ্বারা গঠিত। যদি একটি অংশ অকেজো হয়, তাহা হইলে সহজেই তাহা পরিবর্তন করিয়া তাহার স্থলে ঠিক একই ধরণের আর একটি অংশ সন্নিবেশ করা যায়। কলকব্জার বিভিন্ন অংশের এই পরিবর্তন সম্ভব বলিয়াই কলকব্জার ব্যবহার জনপ্রিয় হইযাছে এবং উৎপাদন বৃদ্ধিলাভ করিয়াছে।

পঞ্চমতঃ, কলকব্জার ব্যবহার শ্রমিকের গতিশীলতা বৃদ্ধি করিয়াছে। কলকব্জার ব্যবহারে বিভিন্ন শিল্পে উৎপাদন পদ্ধতি প্রায় একই ধরণের হওয়ায় শ্রমিকের এক শিল্পে চাকরী গেলে অন্য শিল্পে সহজেই কর্মসংস্থান হইতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, কলকব্জার দৌলতে সস্তায় দ্রব্যসামগ্রী উৎপন্ন করা সম্ভব হইয়াছে এবং যানবাহন ও যোগাযোগের সুযোগ সুবিধা বাড়িযাছে। ইহাতে স্বল্প আয়জীবী সাধারণ খাদক সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে ব্যবহারোপযোগী দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করিতে সমর্থ হইতেছে।

সপ্তমতঃ, কলকব্জার ব্যবহার একদিকে যেমন শ্রমিকের কায়িক শ্রমের লাঘব করিযা তাহার অবসর বাড়াইয়াছে, অন্যদিকে শ্রমিকের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মনৈপুণ্যের উৎকর্ষতা সাধনেও যথেষ্ট সাহায্য করিযাছে। কলকব্জার ব্যবহার আধুনিক শ্রমিককে অধিক কর্মদক্ষ ও দায়িত্বশীল করিয়া তাহার মজুরী বৃদ্ধিরও যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে।

কলকব্জা ব্যবহারের কুফল (Disadvantages of Machinery): কলকব্জার হঠাৎ প্রচলন শ্রমিকের বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে। একটি কাজ হস্তদ্বারা সম্পাদন করিতে বহু সংখ্যক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়। সেই কাজ সম্পন্ন করিতে কলকব্জার আশ্রয় নিলে, বেশ কিছু সংখ্যক শ্রমিককে চাকুরী হইতে সরাইয়া দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, কলকব্জার ব্যবহার কারখানাসংক্রান্ত বহু কুফল আনয়ন করে। অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান, কুরুচিপূর্ণ নৈতিক পরিবেশ, কায়িক ও মানসিক বৃত্তি স্ফুরণের প্রতিকূল আবহাওয়া প্রভৃতি শ্রমিকের জীবনের উপর বিষবৎ ক্রিয়া করে। কলকারখানায় উৎপাদন বিশেষ করিয়া মালিক ও শ্রমিকের সম্বন্ধ বিষাক্ত করিয়াছে। মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক একেবারে লোপ পাইয়াছে এবং শ্রেণীসংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, কলকব্জা ব্যবহারে সুনিপুণ কারিগরের স্বাধীনতাও বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ন হয়। কলকব্জার সংগে প্রতিযোগিতা করিয়া সুনিপুণ কারিগর গৃহে বসিয়া নিজের যন্ত্রপাতিদ্বারা বিভিন্ন রুচিসম্মত সূক্ষ্ম চারু দ্রব্য সৃষ্টি করিতে পারে না। বাধ্য হইয়া তাহাকে কারখানায় চাকুরী গ্রহণ করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, কলকব্জাদ্বারা শুধু প্রমিত (standardised) দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদনই সম্ভব। যন্ত্রযুগে ব্যক্তিগত রুচিমাফিক দ্রব্য উৎপাদন বিরল হইয়া একই ধরণের দ্রব্য সম্ভার বাজার ছাইয়া ফেলিয়াছে। কলকব্জার প্রচলনে রকমারি চারু শিল্পোন্নয়ন বিশেষভাবে ব্যাহত হইয়াছে।

কিন্তু কলকব্জা ব্যবহারের বহু কুফল থাকা সত্ত্বেও, উহার প্রচলন সমাজের যথেষ্ট উপকার করিয়াছে। উপরোক্ত কুফলগুলি কেবলমাত্র কলকব্জা ব্যবহারের ফলেই যে দেখা দিয়াছে তাহা নয়; কিংবা ঐ কুফলগুলি চিরস্থায়ীও নয়। যন্ত্র শিল্পায়নের গোড়ায় বহু অসামঞ্জস্য এবং মালিক সম্প্রদায়ের অর্থ গৃধ্নুতার জন্যই কলকব্জা ব্যবহারের ফল বিশেষভাবে বিষময় হইয়াছে। উপযুক্ত নিবারক ও সংস্কারদ্বারা কলকব্জা ব্যবহারের বহু গলদই আয়ত্তের মধ্যে আনা সম্ভব।

কলকব্জা ও বেকারত্ব (Machinery and Unemployment) : কলকব্জা প্রচলন অর্থই কিছুসংখ্যক শ্রমিকের চাকুরী হইতে বরখাস্ত হওয়া। সাধারণতঃ, প্রত্যেক কলকব্জাই শ্রম-সংকোচন যন্ত্রবিশেষ। হস্তদ্বারা যে কাজ করিতে ৫০ জন শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, সেই কাজ কলকব্জার সাহায্যে ৫ জন শ্রমিক অনায়াসেই করিতে পারে। কলকব্জা ব্যবহারের স্বল্পমেয়াদী প্রত্যক্ষ ফল শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি। এইদিক হইতে দেখিতে গেলে শ্রম ও মূলধনের মধ্যে প্রতিযোগিতা বিদ্যমান।

শ্রম ও মূলধনের প্রতিযোগিতা

কিন্তু কলকব্জা ব্যবহারের চরম প্রত্যক্ষ ফল শ্রমিকের বেকারত্ব ঘুচাইয়া কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা। এই হিসাবে শ্রম ও মূলধন পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক

নয়—বরংচ উহারা পরস্পর নির্ভরশীল ও অনুবদ্ধ (correlative)। আপাত-দৃষ্টিতে কলকব্জার ব্যবহার শ্রমিকের বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি করে বটে, কিন্তু চরমে কলকব্জার ব্যবহার কর্ম সংস্থান বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কলকব্জার ব্যবহারে চাকুরীর বা কর্ম নিয়োগের পরিমাণ নিম্নলিখিতভাবে বৃদ্ধিলাভ করে।

কলকব্জা ব্যবহারে যে সকল দ্রব্যসামগ্রী তৈয়ারী হয়, তাহাদের উৎপন্ন খরচ হ্রাস পাইয়া মূল্যস্তর নিম্নগামী হয়। ফলে, সেই সকল দ্রব্যসামগ্রীর খাদন বৃদ্ধি পায়। খাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে উহাদের উৎপাদন পরিমাণ সম্প্রসারিত হয় এবং তাহার ফলে শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়।

দ্বিতীয়তঃ, কলকব্জা প্রচলনের ফলে উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিকের সাধারণ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রমিকের কর্মনিপুণতার বৃদ্ধি অর্থই তাহাদের অর্থ আয়ের উন্নতি। শ্রমিকের মজুরীর হার বৃদ্ধির সংগে সংগে তাহাদের ভোগ্য সামগ্রীর খাদন পরিমাণও বৃদ্ধি পাইবে। শ্রমিকের খাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে পণ্য উৎপাদনও বাড়িবে ও তাহার ফলে কিছু শ্রমিকের চাকুরীর সংস্থান হইবে।

পরিশেষে, কলকব্জার ব্যবহার যতই জনপ্রিয় হইবে, ততই উহাদের চাহিদাও বাড়িবে। কলকব্জার চাহিদা বাড়িবার সংগে সংগে উহাদের উৎপাদনও বৃদ্ধি পাইবে। কলকব্জার উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে কিছু শ্রমিক কলকব্জা উৎপাদনকার্যে নিযুক্ত হইবে। অবশ্য কলকব্জা প্রচলন বা ব্যবহারের অব্যবহিত পরেই শ্রমিকের চাকুরীর সংস্থান হইবে না। এই কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে হইলে দীর্ঘ মিয়াদের প্রয়োজন। ইহা বিশেষভাবে নির্ভর করে শিল্পপতিদের নূতন পারিপার্শ্বিকের সংগে খাপ খাওয়াইবার ক্ষমতা ও শ্রমিক সাধারণের নূতন বৃত্তি গ্রহণের সামর্থ্যের উপর।

শিল্প স্থানীয়-করণ (**Localisation of Industries**): ভৌগলিক শ্রম বিভাগ যখন কার্যকরী হয় তখনই শিল্পের স্থানীয়করণ বা একদেশতা ঘটে। শ্রমিক যেমন বিভিন্ন কর্মবৃত্তিতে বিশেষত্ব লাভ করিতে পারে, তেমনি দেশ বা স্থান ও সামগ্রী উৎপাদনে বিশেষত্ব লাভ করিতে পারে। যখন কোন বিশেষ স্থানে বিশেষ কোন দ্রব্য উৎপন্ন করিবার জন্য বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি গড়িয়া উঠে, তখনই শিল্পস্থানীয়করণ হয়। যেমন, ক্যালিফোর্ণিয়ায় বহু প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি ফিল্ম শিল্পোৎপাদনে নিযুক্ত আছে; সেখানে ফিল্ম শিল্পের স্থানীয়করণ হইয়াছে। সকল শ্রমিকের যেমন সকল কর্মবৃত্তিতে সমান বিশিষ্টতা লাভ করা সম্ভব নয়, তেমনই সকল স্থানের পক্ষেও সকল শিল্প উৎপাদনে বিশিষ্টতা লাভ

করা অসম্ভব। বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থাকে, যাহার জন্য শিল্প স্থানীয়করণ সম্ভব হয়। বহু কারণে শিল্প স্থানীয়করণ হইতে পারে।

প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক রকমারি সুযোগ সুবিধার জন্য শিল্পের একদেশতা ঘটিতে পারে। এই প্রাকৃতিক সুবিধা আবার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে।

শিল্প স্থানীয়করণের কারণ : (১) প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধা

ভূমির উপযুক্ততা অনেক সময় শিল্প স্থানীয়করণের সহায়তা করে। যেমন দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা তুলা উৎপাদনে বিশেষ উপযোগী। কোন স্থানের সাধারণ জলবায়ু বা আবহাওয়া কোন বিশেষ শিল্প উৎপাদনেব পক্ষে অনুকূল হইতে পারে। যেমন, ক্যালিফোর্ণিয়ার বর্ষব্যাপী উজ্জ্বল সূর্যকিরণ ফিল্ম শিল্পের পক্ষে বিশেষ হিতকর। যে স্থানে সহজে ও অল্প ব্যয়ে চলচ্ছক্তি সরবরাহের সম্ভাবনা আছে সেখানে শিল্প স্থানীয়করণের বিশেষ সুবিধা। জামসেদপুরে লৌহ ও ইস্পাত শিল্প স্থানীয়করণ হইয়াছে, তাহার অন্যতম কারণ এই যে, অতি নিকটেই প্রচুর কয়লা শক্তির যোগান রহিয়াছে। যে স্থানে প্রচুব সস্তা শ্রম সরবরাহের সুবিধা আছে, সেখানেও শিল্প স্থানীযকরণের বিশেষ সুযোগ হয। যেমন, পশ্চিম বঙ্গে ডুয়ার্স অঞ্চলে চা শিল্প স্থানীযকরণ হওযার একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যে, এই অঞ্চলে বিহার ছোটনাগপুরের সস্তা কুলী আমদানী করিবার সুবিধা আছে। কাঁচামালেব সস্তা যোগান এবং সহজ যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উপরেও শিল্পস্থানীয়করণ বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। কলিকাতার আশেপাশে পাট শিল্পের স্থানীযকরণের একটি বিশেষ কাবণ এই যে, কাঁচা পাট পূর্ববঙ্গ হইতে সহজেই আমদানী করিবার সুবিধা। বিক্রয় খরচ হ্রাসের জন্য শিল্প স্থানীয়-করণ অনেক সময় চাহিদা বাজারের সান্নিধ্যের উপর নির্ভর করে। যে স্থান চাহিদা বাজারের কাছাকাছি বা যে স্থান হইতে চাহিদা বাজারে উৎপন্ন পণ্য প্রেরণ করিতে কোনই বেগ পাইতে হয না, সেখানে শিল্পের একদেশতা সহজেই ঘটে।

অর্জিত সুযোগ সুবিধা

প্রাকৃতিক সুবিধা ছাড়া, শিল্প স্থানীয়করণ অর্জিত সুযোগ সুবিধার উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। একটি শিল্প কোন স্থানে উন্মার্গগামী হইলে, বহু সহায়ক শিল্প (subsidiary industries) আশেপাশে গড়িয়া উঠে। ইহার ফলে শিল্পস্থানীয়করণ-প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। কোন স্থানে শিল্পস্থানীয় করণের ফলে, আশেপাশে যোগাযোগ ও পরিবহন শিল্প, ব্যাংক, মজুদ গুদামঘর-প্রভৃতি সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠানের:

প্রতিষ্ঠান এক বাজারে সমস্ত মাল যোগান দেয় না। বিভিন্ন বাজারে মাল
করে বলিয়াও ইহা ঝুঁকি বিকীর্ণ করিতে পারে। ইহা বিভিন্ন বাজারে
যোগান দেয় বলিয়া, যদি এক বাজার মন্দাও হয় তাহা হইলে অন্য বাজারের
অ... মুনাফা ঠিক পোষাইয়া লইতে পারে।

...ক সুযোগ-সুবিধা (External Economies): বাহ্যিক সুযোগ-
প্রতিষ্ঠা... একটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন বৃদ্ধি কিংবা উৎপাদন পরিমাণ
স্থানীয়কর... নির্ভর করে না। কোন শিল্পের সাধারণ উন্নতি..., কিংবা
এত ব্যাপকভাবে... হইলে, অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের যে সুযোগ-সুবিধা ঘটে,
একেবারেই নষ্ট হইয়া পা... কোন শিল্পোয়নে বিবিধ ব্যয়-
করণে সহায়তা করে। অবশ্য অর্জিত সু... সকল প্রতিষ্ঠানই
সময় সাপেক্ষ। ...রণ হয়, কিংবা

অনেকসময়, একই স্থানে বহু শিল্প মূলধন, শ্রমিক, ভূমি উন্নয়ন দেখা
জন্য নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করে। উহাদের মধ্যে যে ...করণ হইবার
কারক বিনিয়োগের জন্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ মূল্য দিতে পারে ...যন্ত্রপাতির
আপেক্ষিক সুবিধা স্থানীয়করণ হয়। ঘনবসতিপূর্ণ সহরে শি...ছ। এই
সাধারণতঃ ঘটে না, কেননা কারখানার খাজনা সেখানে অত্যন্ত ...গ-সুবিধা
সকল শিল্পের রেল ষ্টেসন, বন্দর এবং শ্রমিকের বাসস্থানের কাছে ...ধারণ
অপেক্ষাকৃত লাভের সুবিধার জন্য শুধু সেইগুলির সহরের মধ্যে স্থানী...)
হইবে। যে সকল শিল্পের প্রচুর স্থানাবাস প্রয়োজন উাহারা সহরের উ...ত
গড়িয়া উঠিবে।

শিল্প স্থানীয়করণের সুবিধা (Advantages of Localisation)
প্রাকৃতিক সুযোগ সুবিধার দরুণ শিল্পস্থানীয়করণ হইলে সামগ্রী উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ হ্রাস পায়। কাঁচামাল, শক্তির উৎস ও চাহিদা বাজার যদি স্থানীয়কৃত শিল্পের কাছাকাছি হয়, তাহা হইলে উৎপাদন খরচ অবশ্যই কম হইবে। **দ্বিতীয়তঃ,** শিল্পস্থানীয়করণ সহায়ক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে বিশেষ সাহায্য করে। সহায়ক শিল্পোন্নয়নের ফলে আবার স্থানীয়কৃত শিল্পের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদন খরচও নিম্নগামী হয়। **তৃতীয়তঃ,** শিল্প স্থানীয়করণের ফলে, শ্রমিকের যোগান নিয়মিত ও সহজ সাধ্য হয়। স্থানীয়কৃত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কার্য সংস্থানের লোভে শ্রমিক ক্রমাগত আকৃষ্ট হয়। **চতুর্থতঃ,** শিল্প স্থানীয়করণের ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা ও পরামর্শ করিবার সুযোগ পায়। প্রতিষ্ঠানের একই

হইবে; কেননা, উহা সহজে যন্ত্রপাতির যোগান পাইবে। আবার, যন্ত্রপাতি উৎপাদন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ ঘটে বলিয়াই সস্তায় যন্ত্রপাতি যোগান দেওয়া সম্ভব হয়। অনেক সময় কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক সুযোগ সুবিধালাভের জন্য প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ সংগঠনেরও আমূল পরিবর্তন অনিবার্য হইয়া ওঠে, এবং সংগঠনের এই পরিবর্তনের সংগে সংগে, প্রতিষ্ঠানের কতকগুলি আভ্যন্তরীণ ব্যয়-সংকোচ ও সুবিধালাভও ঘটে। মনে রাখিতে হইবে যে, বাণিজ্যিক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও তদানুসঙ্গিক পরিবর্তনের সংগে সংগে, আভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধালাভের ক্ষেত্র সীমিত হইয়া আসে এবং বাহ্যিক সুযোগ সুবিধালাভের ক্ষেত্র প্রসার লাভ করে। গোটা আর্থিক ব্যবস্থার দিক হইতে দেখিতে গেলে, সমস্ত সুযোগ-সুবিধাই আভ্যন্তরীণ। বন্ধ্যু (stationary) আর্থিক ব্যবস্থায়ও, সমস্ত সুযোগ-সুবিধা আভ্যন্তরীণ; সেখানে শিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণ নাই বলিয়া, বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ ও সুবিধালাভ ঘটে না। এই রকম আর্থিক ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার মধ্যে বিভেদ করার কোনই সার্থকতা নাই।

অধ্যাপক কেয়ার্নক্রশ তিন রকমের বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা নির্দেশ করিয়াছেন,— (১) স্থানীয়করণের সুযোগ-সুবিধা (Economies of Concentration); (২) অবগতির সুযোগ-সুবিধা (Economies of Information) এবং (৩) অসংহতির সুযোগ-সুবিধা (Economies of Disintegration)। শিল্প-স্থানীয়করণের ফলে কি রকম বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা ঘটে তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। বৃহদায়তন শিল্পের পক্ষে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সমাচারপূর্ণ সাময়িক পত্র প্রচার করা বা গবেষণার ফলস্বরূপ নূতন তথ্য ও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা সুবিধাসাপেক্ষ। এই সকল অবগতির সুযোগ-সুবিধা শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট বাহ্যিক ব্যয়-সংকোচ ও সুযোগ-সুবিধা ঘটায়। আবার, শিল্প যখন বৃহদায়তন ধারণ করে, তখন উৎপাদনের কোন কোন স্তরকে বিভক্ত করিয়া উহার কার্যভার বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা শিল্পের হাতে ন্যস্ত করা চলে। ইহার ফলে, বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানের বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধা লাভ হয়। যেমন, কোন সহরে কসাই খানা যদি বিস্তৃতি লাভ করে, তাহা হইলে নিহত পশুর চামড়া, হাড়, লোম প্রভৃতি কাঁচামালদ্বারা স্বাধীন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে পাবে। ইহার ফলে, কসাই শিল্পের বাহ্যিক ব্যয় সংকোচ ও সুবিধা লাভ হইতে বাধ্য। কসাই শিল্পের এই বাহ্যিক

সুযোগ-সুবিধাই আবার আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধায় রূপান্তরিত হইতে পারে, যদি কসাই শিল্প উপরি উক্ত স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলির সংগে সমবায় বা জোট গড়িয়া তোলে।

বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা (**Limits to Large-Scale Production**): বৃহদায়তন উৎপাদনের বহু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, পাশাপাশি ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাও চলিয়াছে। বৃহদায়তন উৎপাদনের অনেক অসুবিধা আছে বলিয়াই, ইহা সম্ভব। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সংগে সংগে যেমন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধা লাভ ঘটে, তেমনি সংগে সংগে অনেক অসুবিধা ও ব্যয়বহুলতার সম্মুখীনও হইতে হয়। **প্রথমতঃ,** কর্মবিভাগ ও বৃহদাকার যন্ত্র ব্যবহারের সুফল সুনিশ্চিত ও সীমাহীন নয়। উৎপাদনের একটা বিশেষ ক্রম অবধি কর্মবিভাগের সুবিধালাভ ও কারিগরি ব্যয় সংকোচ সম্ভব্য হইতে পারে। সেই বিশেষ ক্রম অতিক্রম করিলে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কারিগরি ব্যয়-সংকোচ না ঘটাইয়া ব্যয়বাহুল্যই ঘটাইয়া থাকে।

কর্মবিভাগ ও যন্ত্রপাতি ব্যবহারের অসুবিধা

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারিত হইয়া বৃহদায়তন ধারণ করিলে, সংগঠনকর্তার পক্ষে ব্যবস্থাপনা ও তদারক কার্য সুষ্ঠু ভাবে নির্দেশ করা অসম্ভব ও কঠিন হইয়া পড়ে। বৃহদাকার উৎপাদন ক্রম উৎপাদক কারকবহুল হয় এবং কার্যপরিধি সুবিস্তৃত ও ব্যাপক হয়। সুবিস্তৃত ব্যাপক কার্যপরিধি সুনির্দিষ্ট ভাবে সুষ্ঠু পরিচালন ও তদারক করা এবং কার্যকরী উৎপাদক কারকগণের সমন্বয় সংবিধান করা সংগঠন কর্তার পক্ষে যখন দুঃসাধ্য হইয়া উঠে, তখন বৃহদায়তন উৎপাদনের অসুবিধা উৎকটভাবে দেখা দেয়।

ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের অসুবিধা

তৃতীয়তঃ, পুঁজির অভাব ও আর্থিক অস্বচ্ছলতাও বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ সীমাবদ্ধ করিয়া দেয়। উন্মার্গগামী প্রতিষ্ঠানের পুঁজি ও অর্থসম্পৎ সুপ্রচুর থাকা প্রয়োজন। যৌথ কারবারের পক্ষে যথেষ্ট পুঁজি সংগ্রহের সুবিধা আছে বটে, কিন্তু অনেক উৎপাদক নিজের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন করিয়া যৌথ কারবারের মারফৎ অর্থপুঁজি সংগ্রহ করিতে একেবারে নারাজ। সুপ্রচুর অর্থপুঁজি সংগ্রহ করিতে হইলে উৎপাদককে উপযুক্ত জামিন ও সুদ দিতেও প্রস্তুত থাকিতে হয়—যাহা খুব অল্পসংখ্যক উৎপাদকই ব্যক্তিগতভাবে সক্ষম। **চতুর্থতঃ,** সুবিস্তৃত ও স্থির চাহিদা বাজারের অভাবে অনির্দিষ্ট ভাবে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করা মুনাফাজনক

পুঁজি ও আর্থিক অস্বচ্ছলতার অসুবিধা

নয়। উৎপন্ন পণ্যের চাহিদা সব সময়ই পরিবর্তনশীল। অথচ, বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানের সুবিস্তৃত কার্যপরিধি এবং বিশিষ্ট সংগঠন ব্যবস্থা। ইহার সংগঠনব্যবস্থা ও কার্যপদ্ধতি এমন বিশেষত্ব লাভ করে যে, বাজার-চাহিদার অভিনবত্ব ও পরিবর্তনের সংগে খাপ খাওয়াইয়া ইহা উৎপাদন ব্যবস্থার সহজে অদল বদল করিতে পারে না। ফলে, বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধায় পরিণত হয়। **পরিশেষে,** কোন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে কতকগুলি সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সংগে সংগে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া প্রান্তিক খরচের চাইতে প্রান্তিক আয় বেশী লাভ করা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদনায়তন সম্প্রসারণ লাভজনক। সম্প্রসারণের বাঞ্ছনীয় শেষ সীমা নির্ধারিত হয় সেই পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদনে, যে স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান।

সুবিস্তৃত ও স্থির চাহিদা বাজারের অভাব

সম্প্রসারণের খরচ বৃদ্ধি

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার সুবিধা : (Advantages of Small-Scale Production) : বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার বহু সুবিধা থাকা সত্ত্বেও আমরা দেখি যে, কোন প্রতিষ্ঠানই ইহার উৎপাদন ক্রম অনির্দিষ্টভাবে সম্প্রসারণ করিতে পারে না। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেরই সর্বোচ্চ মুনাফালাভের উৎপাদন ক্রম বা স্তর আছে। ঐ ক্রমের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিলে, প্রতিষ্ঠানকে অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয় এবং প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা উৎপাদন খরচও বাড়িতে থাকে। বৃহদায়তন উৎপাদনের বহু প্রতিবন্ধক ও অসুবিধা আছে বলিয়াই ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা একেবারে উঠিয়া যায় না—উহা বৃহদায়তন উৎপাদনের পাশাপাশি চালু ও সক্রিয় থাকে।

তাহাছাড়া, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার নিজস্ব কতগুলি সুবিধা আছে, যাহার জন্য, অধুনা বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার যুগেও উহা টিকিয়া আছে। ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় উৎপাদক নিজে কাজের খুঁটিনাটি তদারক, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন করিতে পারে। 'The master's eye is everywhere'. যেহেতু উৎপাদক নিজে প্রতিষ্ঠানের একমাত্র স্বত্বাধিকারী, সেইহেতু স্বার্থের খাতিরে সে তাহার সমস্ত কর্মশক্তি স্বতঃই নিয়োগ করিয়া থাকে। উৎপাদনের নীতি নির্ধারণ করিতে অন্যের মতামত লইতে হয় না বলিয়া সে সহজে ও তাড়াতাড়ি কর্মপন্থা স্থির করিতে পারে। তাহার কর্মতৎপরতা ও দায়িত্ববোধ ধারাবাহিক গতানুগতিকতার লাল ফিতার চাপে পিষ্ট হয় না। কর্মচারী ও শ্রমিকের

সহিত নিকট ও মধুর সম্পর্ক স্থাপন করিবার সুযোগ থাকায়, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিক আন্দোলন বা মালিক-শ্রমিক-বিরোধ প্রভৃতি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিবার সম্ভাবনাও খুব কম। তাহাছাড়া, ক্রেতার রুচিমাফিক পণ্য উৎপাদন করিবার অপেক্ষাকৃত বেশী সুযোগ থাকায়, এই ব্যবস্থা প্রচুর মুনাফা লাভের সহায়তা করে।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার নিজস্ব এই সুবিধাগুলি ছাড়াও, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ও পারিপার্শ্বিকে এই ব্যবস্থার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করা যায়। **প্রথমতঃ**, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে খরিদ্দারের ব্যক্তিগত রুচি বা পছন্দ-অপছন্দমাফিক দ্রব্য-সামগ্রী উৎপাদন করিতে হয়, সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থাই প্রকৃষ্ট। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে, দর্জি ও স্বর্ণকারের শিল্পপ্রতিষ্ঠান। **দ্বিতীয়তঃ**, যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা-বাজার স্থানিক (local) ও সীমাবদ্ধ, কিংবা যখন তখন অত্যন্ত ওঠানামা করে, উহাদের উৎপাদন ব্যবস্থা ক্ষুদ্রায়তন হওয়াই সুবিধাজনক। **তৃতীয়তঃ**, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনে সূক্ষ্ম চারু দ্রব্য উৎপন্নের সুবিধা আছে। যে সকল দ্রব্য ফ্যাসনদুরস্ত, তাহা প্রমিত (standardised) হইতে পারে না এবং সেইজন্য বৃহদায়তন কারখানায় তৈয়ারী হইবার অযোগ্য। ক্ষুদ্র উৎপাদক প্রতিটি কাজে ভিন্নভাবে তাহার চারুশিল্প নিপুণতা প্রয়োগ করিয়া উৎপাদনের সৌষ্ঠব বাড়াইয়া তোলে। উৎপাদন ব্যবস্থা যে শিল্পে ধরাবাঁধা গতানুগতিক নয়, সেখানেই ক্ষুদ্র উৎপাদকের বিশেষ করিয়া সুবিধা। **পরিশেষে,** অধুনা উন্মার্গগামী উৎপাদন ব্যবস্থার কিছু কিছু সুফল ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদনেও বিশেষ সহায়তা করিতে পারে। যেমন, ক্ষুদ্রায়তন কার্যে বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োগ বিশেষভাবে ব্যয় সংকোচ করিতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও উহার কারণ (Growth of a Firm and its Causes) : আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন ও উন্মার্গগামী হইতে উন্মুখ। ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ হইতে পারে, হয় কারখানার আকার বৃদ্ধি ও নূতন যন্ত্রপাতির প্রচলনদ্বারা, কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সংগে জোট গড়িয়া। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটে বিভিন্ন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। **প্রথমতঃ,** উৎপাদন ব্যয় সংকোচ করিবার জন্য প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটিতে পারে।

প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের কারণ : (১) ব্যয় সংকোচন

প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন হইলে কর্মবিভাগের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুবিধা অতিমাত্রায় লাভ করা যায়,

যাহার দরুণ ব্যয়-সংকোচ হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য, প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের পথে বাধা বা অসুবিধা যে নাই তাহা নহে। যেমন, প্রচুর পরিমাণে মূলধনের যোগান না পাইলে, কিংবা চাহিদা বাজারের বিস্তৃতি না ঘটিলে, প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কিংবা উৎপাদন বৃদ্ধির পথে বাধার সৃষ্টি হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** বাজারে, একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিবার লোভে অনেক সময় প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ করা হয়। জোট সৃষ্টিদ্বারা যখন প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ঘটে, তখন এই উদ্দেশ্য সাধারণতঃ কার্যকরী হয়। এইরূপ সম্প্রসারণ সাধারণতঃ বাজার মূল্য বৃদ্ধি করার একটি চমৎকার উপায়; কিন্তু ইহা সমাজ কল্যাণকর নহে। অবশ্য, অনেক অবস্থায়, অনেক শিল্পে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের জোট সৃষ্টিদ্বারা সম্প্রসারণ করা যুক্তি সংগত। যেমন, কোন সহরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হাতে বৈদ্যুতিক শক্তির সরবরাহের ভার না দিয়া, যদি একটি জোটের হাতে ঐ শক্তির যোগান ভার দেওয়া যায়, তাহা হইলে এই সম্প্রসারণের ফলে, একদিকে যেমন অযথা প্রতিযোগিতারদরুণ বৃথা অপচয় ঘটিবে না, অন্যদিকে আবার যোগান খরচ হ্রাস পাওয়ায় ভোগকারীর খাদন ব্যাপারে সুবিধা হইবে।

(২) একচেটিয়া মুনাফা লাভের লোভ

তৃতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ক্ষমতালাভের লোভ হইতেও অনেক সময় ঘটিতে পারে। প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের সংগে সংগে যেমন একদিকে মুনাফার অংক বাড়িতে থাকে, অন্যদিকে তেমনি প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক খ্যাতিও বৃদ্ধি পায়। বৃহদায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব উৎপাদকের মনে আত্মাভিমান আনে, তাহার ব্যক্তিত্বের কদর বাড়ায়, তাহাকে ক্ষমতাপিপাসু ও মুনাফাগৃধ্নু করিয়া তোলে—যাহার ফলে অনেক সময় আরও ব্যাপক সম্প্রসারণ সম্ভব হইতে পারে। ক্ষমতার লোভ অনেক সময় ঠিক বিপরীত ভাবে কার্যকরী হইতে পারে। ক্ষমতালোভী উৎপাদক অনেক সময় ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করিয়া জোট সৃষ্টিদ্বারা প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ ও মোটা মুনাফা শিকার করিতে নাও চাহিতে পারে।

(৩) ক্ষমতালাভের লোভ

চতুর্থতঃ, জোট সৃষ্টির পিছনে আর একটি উদ্দেশ্য কার্যকরী হইতে পারে। এইরূপ সম্প্রসারণের সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বাজারে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার ফলে প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই ব্যাংক বা অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। বাজারে সুনাম ছড়াইয়া পড়িবার সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানের শেয়ার বা ডিবেঞ্চার পত্র কিনিবার জন্য জন-

(৪) অর্থসংগ্রহের লোভ

সাধারণ অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে তখন প্রচুর অর্থসংগ্রহ করা অতি সহজ ব্যাপাব হইয়া পড়ে।

অনেক সময় সরকারী আইনের আওতায় পড়িয়াও শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ হইতে পাবে। যদি কোন দেশের সরকার শিল্প প্রতিষ্ঠানের অবণ্টিত মুনাফার (undistributed profits) উপর আয়কর ধার্য না করে, তাহা হইলে সরকারী সুবিধালাভ সে দেশে' সম্প্রসারণ প্রবণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, সম্প্রসারণের দ্বারা মুনাফার অংক বৃদ্ধি করিয়া তাহা অবণ্টিত অবস্থায় রাখিবার প্রচেষ্টাই সেখানে প্রবল হইবে।

অনুশীলনী

1. Explain the various advantages and disadvantages of division of labour. Is division of labour limited by the market ?
2. Show how the modern industrial organisation is based upon specialisation as well as cooperation. (C.U. B.A. '51)
3. Describe how in the present economic organisation different economic activities are related to one another. (C. U. B. A. '54)
4. What are the causes of the localisation of industries ? What are its chief advantages and disadvantages ?
5. Discuss the factors determining the size of business units. (C.U. B.A. '55)
6. What are the conditions under which small-scale units of production may prove more economical than large-scale units. (C.U. B.Com. '54)
7. Distinguish between internal and external economies.
8. Explain and illustrate what do you understand by internal and external economies. (C.U. B.A. '51)

নবম অধ্যায়

রকমারি উৎপাদন পদ্ধতি বা কারবার সংগঠন ব্যবস্থা (Different Methods of Organising Production or Forms of Business Organization) : আইনসম্মতভাবে বিভিন্ন পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থা বা কারবার সংগঠন করা যায়—যথা, এক কর্মকর্তা ব্যবস্থা (single entrepreneur system) অংশীদারী প্রথা (partnership), যৌথ কারবারী প্রতিষ্ঠান (joint-stock company), একচেটিয়া জোট (monopolistic combination), সমবায় প্রথা (co-operation) এবং সরকারী কারবার (government enterprise)।

এক কর্মকর্তা ব্যবস্থা (Single Entrepreneur System) : এই ব্যবস্থায় জনৈক কর্মকর্তা গোটা ব্যবসায়ের একক মালিক। উৎপাদনের সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা তিনি একাই তদারক করেন। একদিকে তিনি যেমন ব্যবসায়ের পরিকল্পনা, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার সমস্ত ভার নিজের স্কন্ধে বহন করেন, অন্য দিকে তেমনি দৈনন্দিন পরিচালনা, ও গতানুগতিক বাঁধাধরা ব্যবস্থাপনার কাজও তিনিই দেখাশোনা করেন। ব্যবসায়ের লাভ লোকসানের সমস্ত দায়িত্বই তাহার। এইরূপ কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রচলিত।

এক কর্মকর্তা ব্যবস্থার সুবিধা

এইরূপ ব্যবস্থার কতকগুলি সুবিধা আছে। কর্তার নিজের গোটা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত স্বার্থ জড়িত বলিয়া, তিনি বিশেষ উৎসাহ সহকারে সংগঠন ও পরিচালনা কার্য সম্পাদন করেন ; তাহাতে উৎপাদনক্ষেত্রে অযথা অপচয় হইতে পারে না এবং ব্যবসায়ও সুদক্ষ হইতে পারে। এক মালিকানার জন্য সংগঠন কর্তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা তদারক করিবার জন্য অন্য কাহারও মুখাপেক্ষী হইতে হয় না বলিয়া, তিনি স্বাধীন স্বকল্পোচিত বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা ব্যবসায়ের নীতি ও কার্য অতি সহজে এবং প্রয়োজনানুরূপ সত্বর নির্ধারণ ও সুস্থির করিতে পারেন। এক কর্তৃত্বাধীনে থাকায়, ব্যবসায়ের গোপনীয় খুঁটিনাটি বিষয়ও আর কেহ জানিতে পারে না। এইরূপ কারবার সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন হওয়ায় বেশী মূলধনের প্রয়োজন হয় না এবং শ্রমিকের সহিত মালিকের ব্যক্তিগতভাবে নিকট ও মধুর সম্পর্ক গড়িয়া তোলাও সহজ। পরিশেষে, এইরূপ কারবারের পক্ষে গ্রাহকের রুচিমাফিক বিশিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করারও সুবিধা।

কিন্তু আধুনিক উন্মার্গগামী শিল্পোৎপাদনে এই সংগঠন ব্যবস্থা একরূপ অচল। বৃহদায়তন শিল্পোন্নয়নে যে প্রচুর পুঁজি বা মূলধনের প্রয়োজন তাঁহা জনৈক কর্মকর্তার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। কোন কর্মকর্তা যদি বা প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ করিতে সক্ষম হন, তথাপি একার পক্ষে এই বিনিয়োগের ঝুঁকি বহন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। একমাত্র প্রচুর পুঁজি সংগ্রহ ও বিনিয়োগের ঝুঁকি বহনেব সমস্যার জন্যই, এক কর্মকর্তা ব্যবস্থার প্রচলন ও কার্যকারিতা দিন দিনই বিরল হইয়া পড়িতেছে। কেবলমাত্র চাষ আবাদ, খুচরা মুদীর দোকান প্রভৃতি কারবারে এই ব্যবসায় প্রথা বিশেষ ভাবে দেখা যায়।

এক কর্মকর্তা ব্যবস্থার অসুবিধা

অংশীদারী প্রথা (Partnership) : দুই বা ততোধিক পরস্পর পরিচিত ব্যক্তি নিজেদের অর্থসম্পৎ ও বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা যে সম্মিলিত ব্যবসায় গড়িয়া তোলে তাহাকে অংশীদারী প্রথা বলে। এই প্রথার আইনগত বৈশিষ্ট্য এই যে, ঋণের জন্য অংশীদারগণ সমষ্টিভাবে ও এককভাবে দায়ী হয়। পাওনাদার ঋণের গোটা টাকা অংশীদারের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে। সাধারণতঃ, ক্ষুদ্রায়তন ব্যবসায়েই অংশীদারী প্রথা প্রচলিত, তবে বহু বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনেও যে এই প্রথার নজির নাই, তাহা নহে।

এক মালিকানা ব্যবসায়ের তুলনায় অংশীদারী প্রথার একটি বড় গুণ এই যে, এই ব্যবসায়ে মূলধন সংগ্রহের আপেক্ষিক সুযোগ ও সুবিধা বেশী। এই প্রথায় ঋণের জন্য অংশীদারগণের দায়িত্ব সীমিত না হওয়ায় উত্তমর্ণের পক্ষ হইতে ঋণ সরবরাহ করার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কম। ফলে, মহাজনের নিকট হইতে অংশীদারগণ সহজেই প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত বুদ্ধি, সংগঠন, ব্যবস্থাপনা ও কর্মতৎপরতার সমন্বয় ও সুসামঞ্জস্য বিধানদ্বারা অংশীদারগণ এক মালিক প্রথার চাইতে উৎপাদনের প্রয়োজনায় অধিক কার্যকুশলতা দেখাইতে পারে।

অংশীদারী প্রথার সুবিধা

এক কর্মকর্তা প্রথার তুলনায় অংশীদারী প্রথার বড় গলদ, অংশীদারগণের মধ্যে সংগঠন, পরিচালন ও ব্যবসায়ের নীতি নির্ধারণ বিষয়ে মতের অমিল হওয়া। এই মতানৈক্যের জন্য এই ব্যবসায় সহজেই ভাঙ্গিয়া যায়। বহু মালিকানা ও বিভক্ত কর্তৃত্বের জন্য এই ব্যবসায়ে কর্মতৎপরতারও যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ আয়ের লোকের পক্ষে অংশীদার হইয়া এ ব্যবসায়ে মূলধন সরবরাহ করাও খুব সহজসাধ্য নয়।

অংশীদারী প্রথার অসুবিধা

ঋণের জন্য অংশীদারগণের অসীমাবদ্ধ দায়িত্ব (unlimited liability) থাকার দরুণ অনেক অর্থবান্ ব্যক্তিও ঝুঁকি লইয়া এই ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগ করিতে গররাজি হন।

যৌথকারবারী প্রতিষ্ঠান (Joint-Stock Company) : কতিপয় ব্যক্তি শেয়ার ক্রযের মাধ্যমে মূলধন যোগান দিয়া যে বিশেষ ব্যবসায় সংগঠন করে তাহাকে যৌথকারবার বলে। প্রথমতঃ, উদ্যোগী অংশীদারগণ কোম্পানীর বিধি-সমূহের (Articles of Association) খসড়া করে। ইহাতে কোম্পানীর নাম-ধাম, উদ্দেশ্য, বিক্রয় যোগ্য মূলধন প্রভৃতির বিবরণ থাকে। এই বিবরণ সরকারের নিকট পেশ করিতে হয়। সরকারের নিগমন প্রমাণ পত্র (Certificate of Incorporation) ছাড় পাইলে কোম্পানী ব্যবসায় স্বরু করে। অংশীদারী প্রথার চেয়ে ইহার বড় গুণ এই যে, কোম্পানীর ঋণের জন্য অংশীদার-গণের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ (limited liability)। প্রত্যেক অংশীদারের দায়িত্ব সাধারণতঃ শেয়ারের মূল্য পরিমাণ মাত্র। যদি কোম্পানী নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে অংশীদারগণের শুধু ব্যক্তিগত শেয়ারের মূল্যই লোকসান হইবে। মহাজন তাহাদের আর কোন ধনসম্পত্তি ঋণের দায়ে স্পর্শ করিতে পারিবে না। কোম্পানীর মূলধন শেযার বিক্রয় করিয়া সংগ্রহ করা হয়। যাহারা শেয়ার ক্রয় করে, তাহারা কোম্পানীর অংশীদার ও মালিক (shareholders)। কোম্পানীর চরম ঝুঁকি বহন তাহাদেরই করিতে হয়। কোম্পানী লাভ করিলে লাভের অংশীদার তাহারাই ; আবার লোকসান করিলে তাহাও তাহাদেরই বহন করিতে হয়। অংশীদারগণ মালিক ও চরম ঝুঁকি বহনকারী হইলেও, আদতে কোম্পানীর প্রত্যক্ষ সংগঠন, পরিচালন, ও কার্যস্থচী নির্ধারণ তাহাদের মনোনীত প্রতিভূ ডিরেক্টরগণ করিয়া থাকেন। কোম্পানীর শেয়ার সাধারণতঃ দুই রকমের হইতে পারে—সাধারণ ও পক্ষপাতমূলক শেয়ার (ordinary and preference shares)। পক্ষপাতমূলক শেয়ার ইস্যু করিবার সময়ই কোম্পানী স্থিরিকৃত হারে উহার উপর লভ্যাংশ (dividend) ঘোষণা করে ; কিন্তু সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ পরিমাণের কোন স্থিরতা নাই। অবশ্য, কোম্পানী কোন লাভ না করিলে পক্ষপাতমূলক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ দেওয়া হয় না ; তবে সাধারণ শেয়ারের উপর লভ্যাংশ ঘোষণা করিবার পূর্বেই পক্ষপাতমূলক শেয়ারের উপর লভ্যাংশ কোম্পানীকে বণ্টন করিতে হয়। কখন কখন কোম্পানী স্তুপীকৃত পক্ষপাতমূলক শেয়ার

যৌথকারবারের বৈশিষ্ট্য

(cumulative preferential share) ইস্যু করিয়া থাকে। কোম্পানীর পক্ষে কোন বৎসর যদি লভ্যাংশ বণ্টন একেবারে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে পক্ষপাতমূলক শেয়ারের উপর কোন লভ্যাংশ দেওয়া হয় না। তবে পর বৎসর কোম্পানীর উপার্জন বেশী হইলেও কিন্তু পক্ষপাতমূলক অংশীদারগণ নির্দিষ্ট হারেই লভ্যাংশ পাইবে—পূর্ববৎসরের প্রাপ্য দাবী করিতে পারে না। কিন্তু স্তূপীকৃত পক্ষপাতমূলক অংশীদারগণ পূর্ব বৎসরের প্রাপ্য লভ্যাংশও যথাযথ পাইয়া থাকে। যৌথ কারবার যদি গুটাইয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে কোম্পানী আগে পক্ষপাত-মূলক অংশীদারগণের মধ্যে লভ্যাংশ বণ্টন করিবে;—আর যাহা উদ্বৃত্ত লভ্যাংশ তাহা সাধারণ অংশীদারগণ পাইবে। অতএব, সাধারণ অংশীদারগণের প্রাপ্য লভ্যাংশ পক্ষপাতমূলক অংশীদারের প্রাপ্য লভ্যাংশ হইতে কম কিংবা বেশী হইতে পারে। যৌথ কারবার ডিবেঞ্চার বা ঋণপত্র ইস্যু করিয়াও মূলধন সংগ্রহ করে। ঋণপত্র ক্রয়কারীগণ কোম্পানীর মহাজন—স্বত্বাধিকারী নয়। তাহারা ঋণপত্রের বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়ে কোম্পানীর নিকট হইতে নির্ধারিত সুদ পাইয়া থাকে—লভ্যাংশের উপর তাহাদের কোন দাবী নাই। কোম্পানীর সংগঠন ও পরিচালনায় তাহারা কোনই অংশগ্রহণ করিতে পারে না। কোম্পানী নীলামে গেলেও ঋণপত্র ক্রয়কারীগণ তাহাদের প্রাপ্য পুরামাত্রায় পাইয়া থাকে। অতএব, দেখা যায় যে, কারবারের অংশীদারের চেয়ে ঋণপত্র ক্রয়কারীকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকি বহন করিতে হয়। কারবার যদি খুব ফাঁপিয়া ওঠে, আর প্রচুর মুনাফালাভ হয়, তাহা হইলে ঋণপত্রক্রয়কারীদের আয় বৃদ্ধির কোনই সম্ভাবনা নাই।

যৌথকারবারের সুবিধা (Advantages of Joint Stock Company): যৌথকারবারের প্রথম ও প্রধান সুবিধা এই যে, ইহা বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনের পক্ষে পরম উপযোগী। উন্মার্গগামী শিল্পায়ন প্রচুর মূলধন বিনিয়োগ সাপেক্ষ। যৌথ কারবারে এই প্রচুর মূলধন সংগ্রহ সহজেই সম্ভব। বহু সংখ্যক শেয়ার বিক্রয় ও ঋণপত্র ইস্যু করিয়া কোম্পানী প্রয়োজনীয় মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে। যৌথ কারবার দেশের সঞ্চয় বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া বিনিয়োগ উৎসাহিত করে। কোম্পানীর স্বল্প অর্থমূল্যের শেয়ার অতি সাধারণ লোকেও খরিদ করিতে পারে। অংশীদারদের সীমাবদ্ধ দায়িত্ব থাকার দরুণ, শেয়ারে টাকা বিনিয়োগের ঝুঁকিও সামান্য। শেয়ারের তারতম্যানুসারে বিনিয়োগের ঝুকিরও তারতম্য হয়। কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর যোগ্য বলিয়া সাধারণ লোকের কাছে

বিনিয়োগ আরও লোভনীয়। নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে অংশীদারেরা বিনিময় বাজারে শেয়ার বিক্রয় করিয়া অর্থমূল্য সংগ্রহ করিতে পারে। আবার, যাহারা শুধু বিনিয়োগ করিতে চায় অথচ ঝুঁকি বহন করিতে নারাজ, তাহারা কোম্পানীর ঋণপত্র ক্রয় করিতে পারে। এইরূপে, যৌথকারবারে সাধারণের সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সুযোগ যত বেশী, আর কোন ব্যবসায়ে তত নহে। বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল সুযোগ সুবিধাগুলিই যৌথকারবারে পাওয়া যায়। অংশীদারের সীমিত দায়িত্বের জন্য একদিকে যেমন কর্মকর্তারা প্রচুর সাহসিকতার সহিত বিনিয়োগ ও কার্যক্রমের ঝুঁকি গ্রহণ করিতে পারে, অন্যদিকে বহুল মূলধন বিনিয়োগদ্বারা বিজ্ঞান সম্মত উৎপাদান প্রণালী ও সুষ্ঠু দৈনন্দিন পরিচালনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে পারে। মূলধনবিহীন অথচ ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকের পক্ষে সংগঠন ও পরিচালন নৈপুণ্য দেখাইবার সুযোগ যৌথকারবারে যথেষ্ট আছে। অংশীদারী কারবারের তুলনায় এই ব্যবসায়ের স্থায়িত্ব ও স্থিরতাও বেশী, কেননা কোন অংশীদারের মৃত্যুতে এই ব্যবসা গুটাইয়া লওয়া হয় না। এমন কি কারবারের সকল অংশীদারের মৃত্যু হইলেও কোম্পানী লাটে ওঠে না—তাহাদের উত্তরাধিকারীরা কোম্পানীর অংশীদার হন। যৌথকারবার একদিকে যেমন উপযুক্ত ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন অথচ মূলধনবিহীন কারবারীর পক্ষে সহায়ক, তেমনি, যাহারা বিনিয়োগ চাহেন অথচ ব্যবসায়বুদ্ধির ধার ধারেন না, তাহাদের পক্ষেও যথেষ্ট অনুকূল।

যৌথকারবারের অসুবিধা (Disadvantages of Joint-Stock Company): মতবাদের দিক হইতে যৌথকারবার গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে পরিচালিত হয়; কেননা, কর্মকর্তাগণ অংশীদারগণের প্রতিভূরূপে ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন কার্য তদারক করেন। কিন্তু, অধুনা যৌথ কারবারের এই গণতান্ত্রিক সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা একরূপ নষ্ট হইতে বসিয়াছে। অধিকাংশ কোম্পানীতেই একটি ক্ষুদ্র পরিচালক সভা আসল কর্তৃত্বগ্রহণ করে। শেয়ার হস্তান্তর করিবার সহজ উপায় থাকায়, শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব মুষ্টিমেয় লোকের হাতে পড়ে। ইহাতে সমাজে ধন বণ্টনের অসাম্য আরও বৃদ্ধি পায়। অংশীদারগণের সাধারণ ঔদাসীন্য ও ক্ষমতাহীনতার সুযোগ লইয়া, অনেক পরিচালকমণ্ডলী সকল সংকোচবোধ বিসর্জন দিয়া ফাটকা-ব্যবসায়ে কোম্পানীর অর্থ বিনিয়োগ করিয়া কোম্পানীর প্রকৃত স্বার্থের হানি করে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকার দরুণ, ডিরেক্টারগণ কখন

কোম্পানীর আসন্ন বিপদ পূর্বাহ্নে অনুমান করিতে পারিলে, তখনই জনসাধারণের কাছে শেয়ার বিক্রয় করে। ফলে, তাহারা অনিবার্য লোকসানের হাত হইতে রেহাই পায়। আবার, যখন তাহারা বোঝে যে, অধিক পরিমাণ লভ্যাংশ বণ্টন করা হইবে, তখনই তাহারা বহুল পরিমাণ শেয়ার কিনিয়া উহা উচ্চমূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে। যৌথ কারবারের আর একটা কুফল এই যে, অংশীদারী প্রথার পারস্পরিক সংযোগবোধ বা মিলনের সুবিধা ইহাতে দেখা যায় না। অংশীদারদের সংখ্যাধিক্য হেতু এবং শেয়ারপত্র প্রায়শঃ হস্তান্তরিত হওয়ার দরুণ, মিলনের যোগসূত্র ও সমষ্টিগত ঐকান্তিকী প্রচেষ্টা যৌথকারবারে বড় একটা দেখা যায় না। ডিরেক্টার ও অংশীদারের মধ্যে নিবিড় ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ না থাকায়, কোম্পানীর কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা বিশেষ স্বার্থের কল্যাণে পরিচালিত হয় না। কোম্পানীর কর্তৃত্ব যাহাদের হাতে, তাহাদের স্বার্থপূরণের উদ্দেশ্যই ব্যবসায়ে প্রবল হয়। ফলে, অংশীদারদের স্বার্থ অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়। অনেক সময় কোম্পানীর পরিচালনায় তাদৃশ দক্ষতা ও নৈপুণ্য দেখা যায় না। স্বত্বাধিকারী অংশীদারগণের হাতে সকল পরিচালনার ভার ও ক্ষমতা না থাকায়, সুষ্ঠু তদারকের যেমন অভাব হয়, আবার অতিমাত্রায় খরচ ও আর্থিক অপচয়ও বেশ ঘটে। বাঁধা মাহিনার ব্যবস্থাপকেরা ব্যবসায়ের অধিক অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহন করিতে যেমন নারাজ, অন্যদিকে উন্নত ধরণের, প্রগতিশীল কার্যপরিক্রমা প্রচলন করিতেও তাহারা উৎসুক হয় না। পরিশেষে, যৌথকারবারে শ্রমিক-মালিক সম্বন্ধও খুব মধুর হয় না। স্বত্বাধিকারী অংশীদারগণ বিকীর্ণ ও ব্যবসায় বিষয়ে উদাসীন থাকে বলিয়া, শ্রমিকের সঙ্গে কোন যোগাযোগই রক্ষা করা সম্ভব হয় না। ফলে, শ্রমিক মালিকে মনোমালিন্য লাগিয়াই থাকে।

একচেটিয়া জোট ব্যবসায় (Monopolistic Combination) : আধুনিক ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, কতকগুলি যৌথকারবার সম্মিলিত হইয়া বৃহৎ এক যৌথকারবারের সৃষ্টি করে। এইরূপ সম্মিলনের উদ্দেশ্য হইল, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করা ও একচেটিয়া মুনাফা লাভ করা। এক চেটিয়া জোট ব্যবসায় রকমারি কারণে ও অবস্থায় গড়িয়া উঠিতে পারে।

বিভিন্ন ধরণের একচেটিয়া ব্যবসায়

প্রথমতঃ, রাষ্ট্রের আইন একচেটিয়া ব্যবসায় গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। পুস্তকের মালিকানা স্বত্ব, কিংবা আবিষ্কারের পেটেণ্ট স্বত্ব রাষ্ট্রের আইন অনুমোদিত একচেটিয়া ব্যবসায়। রাষ্ট্রের নিজেরও অনেক সামগ্রী বা সেবাকার্য সরবরাহের জন্য একচেটিয়া কারবার করার

অধিকার আছে। যেমন, ডাক-বিভাগের ব্যবসায়। সর্বসাধারণের বিশেষ আনুকূল্য সাধনের জন্য এবং অযথা প্রতিযোগিতা ও অপচয় দূর করিবার জন্য, রাষ্ট্র অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শিল্প প্রতিষ্ঠানের একমাত্র মালিক হইয়া থাকে। যেমন, সহরের বিদ্যুৎ প্রবাহ সরবরাহের প্রতিষ্ঠান সরকারের একচেটিয়া কারবার হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** অনেক সময় অনেক দ্রব্য নিছক প্রকৃতিদত্ত হইতে পারে এবং সেই দ্রব্যের উৎসেরও একমাত্র সত্ত্বাধিকারী থাকিতে পারে। যেমন, দক্ষিণ আফ্রিকার 'ডে বিয়ার কোম্পানী' (De Beer Company) হীরকখনির একচেটিয়া স্বত্বাধিকারী। **তৃতীয়তঃ,** অনেক শিল্পোৎপাদনে বহুল স্থায়ী মূলধনের প্রয়োজন। সাধারণ শিল্পপতিগণ উহা যোগাড় করিতে পারে না, এবং উহার বিনিয়োগ-ঝুঁকি বহন করিতে অসমর্থ। যেমন, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প। এই শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলি কতকটা একচেটিয়া ক্ষমতার অধিকারী। নূতন প্রতিযোগী উদ্ভবের ভয় ইহাদের অত্যন্ত কম। **পরিশেষে,** অনেক শিল্প প্রতিষ্ঠান এমন সুপ্রতিষ্ঠিত যে, সুনামের প্রভাবদ্বারা উহারা একচেটিয়া কারবার করিতে সক্ষম। ব্যবসায়ের সুনাম ও বিজ্ঞপ্তির দ্বারা উহারা পণ্যের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে এমন জোরালো ও ব্যাপক ভাবে প্রচার করে যাহাতে ক্রেতাগণ সহজেই উহাদের জিনিষ ক্রয় করিতে আকৃষ্ট হয়। ফলে, অন্য নূতন প্রতিষ্ঠান আর ঐ শিল্পে প্রবেশ করিতেই সাহস করে না।

একচেটিয়া জোট কারবার উৎপত্তির কারণ (Causes of Monopolistic Combination): ধনতন্ত্রের পরিপক্ক অবস্থাতেই একচেটিয়া জোট ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। প্রতিযোগিতার তীব্র ঘাত প্রতিঘাতে এই অবস্থায় অতি অল্পসংখ্যক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানই টিকিয়া থাকে। যাহারা টিকিয়া থাকে, উহাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত মুনাফা অনিশ্চিত হইয়া পড়ে। পাছে নিজেদের মুনাফা একেবারে উবিয়া যায়, সেই স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া নিছক আত্মরক্ষার্থে শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলি সম্মিলিত হইয়া জোট সৃষ্টি করে। প্রতিযোগিতার তীব্র আঘাত হইতে প্রত্যেকের অনিবার্য ধ্বংস প্রতিরোধ করা জোট ব্যবসায় উৎপত্তির সব চেয়ে বড় কারণ।

দ্বিতীয়তঃ, জোট ব্যবসায়-উৎপত্তি অনেক সময়ই হয় সুউচ্চ পণ্যমূল্য ও এক চেটিয়া মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য লইয়া। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া জোট গড়িয়া তুলিলে উহা অনেকটা একচেটিয়া কারবারের আকার ধারণ করে। একচেটিয়া কারবারের পক্ষে বাজারে পণ্য সরবরাহ সংকোচন করিয়া দ্রব্যমূল্য

উচ্চস্তরে ধার্য করা স্বাভাবিক। একচেটিয়া জোটের পক্ষে, একদিকে যেমন অল্পমূল্যে উৎপাদক কারক নিযুক্ত করা সম্ভব, অন্যাদকে তেমনি উচ্চ পণ্যমূল্য নির্ধারণ করিয়া একচেটিয়া মুনাফা লাভ করাও সহজসাধ্য। জোট-ব্যবসায় যখন এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া গঠিত হয়, তখন একদিকে যেমন উৎপাদক কারকগণ তাহাদের ন্যায্য মজুরী হইতে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে তেমনি খাদক সম্প্রদায় চড়ামূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া অত্যন্ত বিপর্যস্ত হয়।

তৃতীয়তঃ, ব্যয় সংকোচের উদ্দেশ্য লইয়াও অনেক সময় একচেটিয়া ব্যবসায়ের উৎপত্তি হইতে পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান এক জোট হইলে বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করা যায়। জোট উৎপত্তির সংগে সংগে লোকসানগ্রস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে একদম গুটাইয়া ফেলা চলে। বৃহদায়তন জোট-কারবারে কর্মবিভাগের সুযোগ-সুবিধাগুলি পূর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করিয়া পরিচালনা ও প্রচার কার্যের বাবদ গড়পড়তা খরচ সংকোচ করা খুবই সহজ হয়।

চতুর্থতঃ, জোট উৎপন্নের আর একটা বড় উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতার ঝুঁকি হ্রাস করা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া যখন জোট সৃষ্টি করে, তখন প্রতিযোগিতা মূলক বাজারে কাঁচা মাল ক্রয় কারবার ঝুঁকি অথবা পণ্য-বাজারের দামদস্তুর সংক্রান্ত ঝুঁকির বোঝা অনেক কমিয়া যায়। জোট প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া দেয়, উৎপন্ন পণ্যের বাজার মূল্য স্থির করে, এবং প্রয়োজন হইলে, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বাজার পৃথকীকরণ করে। ফলে, অতি-উৎপাদন বা অব-উৎপাদন দোষের সৃষ্টি হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, প্রচুর মূলধন সংগ্রহের উদ্দেশ্য হইতেও একচেটিয়া জোট উৎপত্তি হইতে পারে। একচেটিয়া জোটের সৃষ্টি হইলে ব্যবসায়ের সুনাম ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাহার ফলে জোট অতি সহজেই ব্যাংক কিংবা বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্থ কর্জ গ্রহণ করিতে পারে কিংবা শেয়ার বিক্রয় করিয়া অথবা ঋণপত্র ইস্যু করিয়া প্রচুর মূলধন সংগ্রহ করিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, অনেক দেশের আইন জোট সৃষ্টি করিতে বাধ্য করে। জনসাধারণের আনুকূল্যে রাষ্ট্র অনেক শিল্প উৎপাদনে প্রতিযোগিতা রোধ করিয়া জোট সৃষ্টি করিবার জন্য উৎসাহিত করে। যেমন, পরিবহন ও যোগাযোগ শিল্পে।

উপরি উক্ত কারণ ছাড়া, আরও কতকগুলি বাস্তব-বিষয় আছে, যাহা জোট সৃষ্টির বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। **প্রথমতঃ**, প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলি যদি সংখ্যায় কম হয় এবং উহারা যদি একই আকারের হয়, তাহা হইলে উহাদের

সম্মিলিত হইয়া জোট সৃষ্টি করিবার গরজ ও সুবিধা বেশী হইবে। বহু সংখ্যক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও মিলনের টান অত্যন্ত কম হয়। কিংবা, প্রতিষ্ঠানগুলি ছোট, বড়, বিভিন্ন আকারের হইলেও মিলনের সম্ভাবনা কম। **দ্বিতীয়তঃ**, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যদি একই ধরণের বা সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলেও জোট উৎপত্তির পক্ষে অনুকূল। **তৃতীয়তঃ**, শিল্পের স্থানীয়করণও জোট উৎপত্তির সহায়তা করিতে পারে। যদি শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে ভৌগলিক দূরত্ব উহাদের মধ্যে যোগাযোগের বাধা সৃষ্টি করিয়া জোট উৎপত্তির পথে প্রতিবন্ধক হয়। **পরিশেষে**, দেশের সংরক্ষণ নীতিও অনেক সময় জোট উৎপত্তির অনুকূল হইতে পারে। তবে সংরক্ষণ নীতিদ্বারা যদি দেশের আমদানী বন্ধ করাই একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলেই কেবল ঐ নীতি জোট উৎপত্তির অনুকূল। সংরক্ষণ নীতি এমন হইবে যে, আমদানী শুল্কের আধিক্যে একদিকে যেমন বিদেশের দ্রব্য আমদানী একদম বন্ধ হইবে, অন্যদিকে তেমনি দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি উচ্চ মূল্যে একচেটিয়া মুনাফায় পণ্য বিক্রয় করিতে সক্ষম হইবে।

জোটের বিভিন্ন আকার (Different Forms of Combination) : বিভিন্ন জোটের মধ্যে সব চাইতে সহজ ধরণের হইল প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের জোট বা পুল। এই ধরণের জোট উৎপত্তির উদ্দেশ্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতা দূর করা। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ফলে অনেক সময় অনেক প্রতিষ্ঠান অতিমাত্রায় উৎপাদন করিয়া ফেলে। তাহার ফলে মুনাফার হার হ্রাস হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। এই অবস্থার যাহাতে উদ্ভব না হয়, তাহার জন্য একাধিক শিল্প প্রতিষ্ঠান সম্মিলিত হইয়া সঙ্ঘ গঠন করিতে পারে। এই সঙ্ঘই প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের স্থিরতা (stability) নিয়মিত করিতে পারে। অনেক সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের জোট নিছক কতিপয় ব্যাপারের বোঝাপড়া আর দাম চুক্তি ছাড়া কিছুই নহে। যেমন ; আমাদের দেশে পেট্রোলের মূল্য স্থির হয় বর্মা তেল কোম্পানী এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড তেল কোম্পানীর মধ্যে সাধারণ বোঝাপড়াদ্বারা। পুল জাতীয় জোট সাধারণতঃ একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি হয়। এই ধরণের জোটে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অক্ষুন্ন থাকে।

পুল বা প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীগণের জোট

কার্টেল (Cartel) : পুলের সমগোত্রীয় আর এক রকমের জোট হইল কার্টেল। কার্টেলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা আরও নিবিড়।

ইহাতে সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠান মিলিত হইয়া একটি নূতন কারবারের সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সেই কারবারের অংশীদার হয়। যে সকল প্রতিষ্ঠান কার্টেল জোটে মিলিত হয়, উহারা কিন্তু প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান নিজ নিজ কারখানায় দ্রব্য উৎপাদন করে, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন অংশীদার ও বিভিন্ন পরিচালকমণ্ডলীর কোন অদল বদল হয় না। কতিপয় সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কেবল উহারা চুক্তি আবদ্ধ হইয়া জোটের সদস্য হয়। জোট প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ বাধিয়া দেয়, পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে, কিংবা বিক্রয়-বাজার সংগঠন করে। কার্টেল সাময়িক চুক্তি বিশেষ, চুক্তির মিয়াদ শেষ হইলে, প্রতিষ্ঠানগুলি আবার নূতন করিয়া চুক্তি আবদ্ধ হইয়া কার্টেল জোট সৃষ্টি করিতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কার্টেল জোট ব্যবসায় জার্মানীতে খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। আমাদের দেশে এই রকম কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ, Cement Marketing Board ও Indian Sugar Syndicate.

ট্রাষ্ট (Trust) : ট্রাষ্ট হইল পুরাদস্তর ব্যবসায় সংহতি। যে সকল প্রতিষ্ঠান ট্রাষ্ট জোটে মিলিত হয়, উহাদের পূর্ণমাত্রায় নূতন সৃষ্ট এক কারবারভুক্তি ঘটে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যক্তিগত স্থিতি বা স্বাধীনতা একেবারে মুছিয়া যায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণেরও নিজেদের স্বাধীনতা কায়েমী থাকে না; সকল প্রতিষ্ঠানের অংশীদারগণই এক ট্রাষ্ট জোটের অংশীদার হইতে বাধ্য হয় এবং এক কারবারের মত জোটের একই পরিচালকমণ্ডলী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল কারখানাগুলি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে। আমেরিকায় ট্রাষ্ট জোট-কারবারের বিশেষ প্রচলন হইয়াছে। ভারতবর্ষে এই ধরণের কারবারের উদাহরণ : Associated Cement Companies of India Ltd.

কার্টেল ও ট্রাষ্টের আপেক্ষিক গুণাবলী (Comparative Advantages of Cartel and Trust) : জোট হিসাবে ট্রাষ্ট কার্টেল হইতে নিবিড়তর সংহতি। ট্রাষ্ট এক কেন্দ্রিক চিরস্থায়ী জোট; কার্টেল ব্যক্তি-সর্বস্ব স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের মিয়াদী সংঘ বিশেষ। এই রকম জোটের উদ্দেশ্যই একচেটিয়া কারবারের মাধ্যমে উচ্চ পণ্য মূল্য লাভ করা। উভয়েরই ব্যয় সংকোচের সুযোগ সুবিধা আছে। কার্টেলে ব্যয় সংকোচ হয় পরিচালনা ও বহুল বিস্তৃত বিক্রয়ের মাধ্যমে। ট্রাষ্টের ব্যয় সংকোচ হয় অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলির উচ্ছেদ সাধন করিয়া ও বৃহদায়তন উৎপাদন ক্রমের পুরাপুরি সুযোগসুবিধা গ্রহণ করিয়া।

তবে ট্রাষ্টের বিশেষ কতগুলি সুবিধা আছে যাহা কার্টেল জোটে লাভ করা সম্ভব নয়। **প্রথমতঃ,** বৃহদায়তন উৎপাদন ক্রমের সুযোগ সুবিধা যে সকল শিল্পায়নে অধিক, সেখানে কার্টেলের চেয়ে ট্রাষ্ট জোট সৃষ্টি করাই লাভজনক। কার্টেলে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে, প্রতিষ্ঠানের স্বকীয় আয়তনের রদ বদল হয় না—এমনকি, অনিপুণ প্রতিষ্ঠানেরও উচ্ছেদ করা হয় না। কিন্তু ট্রাষ্টে অনিপুণ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া, দক্ষ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত সম্প্রসারণদ্বারা গোটা জোটের নৈপুণ্য বৃদ্ধি ও ব্যয় সংকোচ করা সম্ভব হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** ট্রাষ্টের স্থিরতা (stabilitiy) কার্টেলের চেয়ে বেশী। কার্টেল স্বল্প মেয়াদী অনিবিড় সংহতি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমবেত স্বার্থসিদ্ধির খাতিরেই কার্টেল জোট সৃষ্টি হইয়া থাকে। আবার যখন সেই স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজন ফুরাইযা যায়, তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আবার নিজ নিজ স্বার্থ ও কর্মপন্থা স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করিতে পারে, যাহার ফলে কার্টেল জোট ভাঙ্গিয়া যায়। কিন্তু ট্রাষ্টে একত্রীকরণ হয় নিবিড় ভাবে, সকল প্রতিষ্ঠানের এক কর্মপন্থা ও একক নিয়ন্ত্রণ ট্রাষ্টের স্থিতিস্থাপকতার প্রধান কারণ। **তৃতীয়তঃ,** ট্রাষ্টের আর একটা সুবিধা এই যে, অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন জোট কারবার বলিয়া বাজারে ইহার পরিচিতি অধিক। অপর পক্ষে, কার্টেলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ ক্ষুদ্রায়তন বলিয়া বাজার পরিচিতিও সীমাবদ্ধ। সুবিস্তৃত বাজার পরিচিতির সুযোগ লইয়া ট্রাষ্ট প্রয়োজনানুসারে প্রচুর মূলধন সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে, কিন্তু কার্টেলের পক্ষে ততটা সম্ভব নয়।

ট্রাষ্টের গুণাবলী

তবে কার্টেলের একটি বড় সুবিধা এই যে, ইহাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ থাকে বলিয়া এই জোট কারবারের দ্রব্য যোগান-নম্যতা বেশী। কার্টেলের পক্ষে পরিবর্তনশীল চাহিদামাফিক যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা সহজ। **দ্বিতীয়তঃ,** কার্টেলে শিল্প বিশেষের প্রধান প্রধান প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেরই ভুক্তি ঘটে বলিয়া, ইহার পক্ষে অপেক্ষাকৃত অধিক একচেটিরা মুনাফা লাভ সম্ভব হয়। **তৃতীয়তঃ,** ট্রাষ্টএর তুলনায় কার্টেল সংগঠনের অর্থ খরচও কম। ট্রাষ্ট গোড়াপত্তনের সময় সংগঠন কর্তাদের সম্ভাব্য প্রতিযোগীকে বহু অর্থমূল্যে ক্রয় করিতে হইতে পারে, কিংবা পুরাতন অনিপুণ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধনের জন্য প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইতে পারে। কিন্তু কার্টেলের প্রতিযোগিতামূলক প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া সংগঠনের খরচ অপেক্ষাকৃত কম। **পরিশেষে,** ক্ষমতা-লিপ্সু ট্রাষ্টের আয়তন

কার্টেলের সুবিধা

অনেক সময় এত বৃহৎ হইয়া পড়িতে পারে, যাহার দরুণ বৃহদায়তন শিল্পায়নের সুযোগ সুবিধা বা ব্যয় সংকোচ ইহা আর লাভ করিতে পারে না। কার্টেলে এই পরিণতি অসম্ভব।

হোল্ডিং কোম্পানী (Holding Company) : যখন কোন কোম্পানী অন্য কোন কোম্পানীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শেয়ার পত্র ক্রয় করিয়া ঐ কোম্পানীতে ভূয়িষ্ঠ স্বার্থ নিয়ন্ত্রণের অধিকার লাভ করে, তখন ঐ প্রথমোক্ত কারবারকে হোল্ডিং কোম্পানী বলা হয়। আর দ্বিতীয়োক্ত কারবারকে—অর্থাৎ যেটি নিয়ন্ত্রিত হয়—উহাকে সহায়ক কোম্পানী বলে। যেমন, Punjab National Bank Ltd. হোল্ডিং কোম্পানী আর National Bank of Lahore Ltd. ছিল সহায়ক কোম্পানী। বাহ্যতঃ, দুইটি কোম্পানী কিন্তু পৃথক।

পূর্ণ সংযুক্তি (Merger) : এক বা ততোধিক কোম্পানী আর একটি কোম্পানীর সহিত যদি সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া যায়, তাহা হইলে পূর্ণ সংযুক্তি কারবার গড়িয়া উঠে। যে কোম্পানীটির সংগে সংযুক্তি হয় উহার ব্যক্তিগত স্থিতিশীলতা অব্যাহত থাকে ; শুধু যে বা যে সকল কোম্পানী যুক্ত হয় উহার বা উহাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য একেবারে মুছিয়া যায়।

সমশিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিল্প উর্ধ্বাধোস্তর জোট (Horizontal and Vertical Combinations) : রকমারি পদ্ধতিতে জোট কারবারের উৎপত্তি হইতে পারে। যদি একই শিল্পায়নে নিযুক্ত সম গোত্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরণ হয়, তাহা হইলে সমশিল্প-প্রতিষ্ঠান জোট-কারবারের সৃষ্টি হয়। কোন শিল্পোৎপাদনের বিশেষ স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মিলনকেও এই ধরণের জোট ব্যবসায় বলে। যেমন সিমেণ্ট, চিনি কিংবা কার্পাস বস্ত্র শিল্পের যে কোনটিতে যদি বিভিন্ন সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলির একত্রীকরণ হয়, তাহা হইলে সমশিল্পপ্রতিষ্ঠান-জোটের উৎপত্তি হইবে। এই ধরণের জোট-কারবারের উৎপত্তির মূলে সাধারণতঃ থাকে সংগঠন ও পরিচালনা ব্যয় সংকোচ, তথা দক্ষতা অর্জন, কিংবা প্রতিযোগিতা দূর করিয়া মোটা একচেটিয়া মুনাফা লাভের তাগিদ।

সমশিল্প প্রতিষ্ঠান জোট

আর এক পদ্ধতিতে জোট কারবারের পত্তন হইতে পারে। কোন শিল্প উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যখন সংহতি হয়, তখন উহাকে আমরা শিল্পউর্ধ্বাধোস্তর জোট বলিয়া অভিহিত করি। এই ধরণের জোট-কারবারে এমনও হইতে পারে যে, একটা শিল্প

শিল্প-উর্ধ্বাধোস্তর জোট

উৎপাদনের যতগুলি কার্যস্তর প্রয়োজন হয়,—একেবারে কাঁচামাল সংগ্রহ করা হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্য বাজারে বিক্রয়ের ব্যবস্থা অবধি—সমস্ত স্তরগুলির একত্রীকরণ ও একক নিয়ন্ত্রণও অস্বাভাবিক নয়। এই জোট-কারবারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ Tata Iron Steel Co. Ltd. ইস্পাত তৈয়ারীর যে সকল স্তরের প্রয়োজন উহার প্রায় সকল অংশগুলিই টাটা কোম্পানীর একত্রীকৃত ও একক নিয়ন্ত্রণাধীন।

সমশিল্প প্রতিষ্ঠান জোটের সুফল—কুফল (Advantages and Disadvantages of Horizontal Combination): সমশিল্পপ্রতিষ্ঠান জোট যদি বিভিন্নস্থানে অবস্থিত দুই বা ততোধিক কারখানার মধ্যে হয়, তাহা হইলে একটা সুবিধা এই যে, স্থানীয় চাহিদা খাদকের নিকটতম কারখানা হইতে মিটানো সম্ভব। ইহাতে মাল চলাচলের ভাড়া বাবদ ব্যয় সংকোচ হয়। যেমন, দুইটি প্রতিযোগী কারখানা, একটি নিউ ইয়র্কে আর একটি সিকাগোতে অবস্থিত। এই কারখানা দুইটির যদি জোট সৃষ্টি হয় তাহা হইলে নিউ ইয়র্কে অবস্থিত কারখানার মাল আর সিকাগোতে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই, কিংবা সিকাগোতে অবস্থিত প্রতিষ্ঠানের মাল নিউ ইয়র্কে পাঠানের আবশ্যকতা নাই। **দ্বিতীয়তঃ**, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এক জোট হইলে, একই খরিদ্দারের কাছে দুইজন বিক্রেতার বিজ্ঞপ্তি লইয়া উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হয় না। ইহাতে প্রচার ও বিজ্ঞাপন বাবদ ব্যয় বিশেষ ভাবে সংক্ষেপ হয়। **তৃতীয়তঃ**, এই কারবারে সাধারণতঃ পরিচালনার খরচও সংকোচ করা সম্ভব হয়। বিশেষ করিয়া ব্যয় সংকোচ করা চলে মোটা বেতনের নির্বাহিকবর্গের বেলায়। **পরিশেষে**, সমগোত্রীয় কারখানার জোটের পক্ষে আর একটি সুবিধা এই যে, চাহিদা মন্দার সংগে সংগে কতগুলি কারখানাকে একদম বন্ধ করিয়া দিয়া, ইহা আর কতগুলি প্রতিষ্ঠানকে বাঞ্ছনীয়তম দক্ষতার সহিত কার্যতৎপর রাখিতে পারে; ফলে, উৎপাদন ব্যয়ের সংকোচন হয়।

সমশিল্প প্রতিষ্ঠানের সুবিধা

কিন্তু এইরূপ জোট কারবারের প্রধান অসুবিধাই হয় তখন, যখন উৎপন্ন পণ্য সমগোত্রীয় নয়। যদি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন সামগ্রীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতে হয়, তাহা হইলে বিক্রয় খরচ হ্রাস করা সম্ভব নয়—জোট কারবারের অন্য সুবিধাগুলিও লাভ করা চলে না। জোট কারবারের আর একটা অসুবিধা এই যে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিদের সংখ্যা সংকোচ করিবার সুযোগ খুবই কম।

সমশিল্প প্রতিষ্ঠান জোটের অসুবিধা

শিল্প ঊর্ধ্বাধোস্তর জোটের সুফল-কুফল (Advantages and Disadvantages of Vertical Combination) : কোন শিল্পের বিভিন্ন উৎপাদন স্তরের সংহতি ও একক নিয়ন্ত্রণ ঘটিলে একটা বিশেষ সুবিধা এই হয় যে, ঐ শিল্প উৎপাদনে বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত সকল প্রতিষ্ঠানই কাঁচামাল যোগান বিষয়ে সুনিশ্চিত থাকিতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, এইরূপ জোট ব্যবসায়ে বিভিন্ন স্তরে নিযুক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আলাদা করিয়া বিক্রয় খরচও লাগে না। বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যের দরুণ খরচ শুধু আবশ্যক হয় উৎপাদনের শেষ স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য বিক্রয় উৎসাহিত করিবার জন্য। **তৃতীয়তঃ**, শিল্পের বিভিন্ন উৎপাদন স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের যদি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেককেই অনেক পরিমাণ কাঁচামাল বা দ্রব্যপুঁজি মজুত রাখিতে হয় অনিশ্চিত বাজার-চাহিদা মিটাইবার জন্য। কিন্তু এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগুলির যদি জোট উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে শুধু সেই পরিমাণ কাঁচামাল বা দ্রব্য-পুঁজি মজুত রাখিতে হইবে, যাহা মাত্র পরবর্তী উৎপাদন স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য আবশ্যক। **পরিশেষে**, এই জাতীয় কারবারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কার্য সমন্বয় ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার সৌকার্য সাধনের সুযোগও অনেক বেশী।

শিল্প ঊর্ধ্বাধোস্তর জোটের সুফল

কিন্তু এই ধরণের জোটকারবারের কুফলও আছে। এই রকম ব্যবসায়ে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি স্ব স্ব কার্যস্তরে এতটা বৈশিষ্ট্যলাভ করে যে, সাধারণ বাজারের চাহিদা মিটাইবার পক্ষে উহারা সম্পূর্ণ অযোগ্য হইয়া পড়ে। শিল্প উৎপাদনের সর্বশেষ স্তরে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদাই অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ নিয়মিত করিয়া থাকে। আর একটা অসুবিধা এই যে, আর্থিক মন্দার সময় মূল্য হ্রাসের সংগে সংগে, সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি উৎপন্ন ব্যয় হ্রাসের সুযোগও গ্রহণ করিতে পারে না। আর্থিক মন্দার সময় সাধারণতঃ কাঁচামাল ও অর্ধ উৎপন্ন দ্রব্য-সামগ্রীর বাজার দাম পড়িতে থাকে। স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সময় কম মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিযা সস্তায় পণ্য বিক্রয় করিবার বিশেষ সুযোগ হয়। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংযুক্তি ঘটিলে, এই সুযোগ উহারা পুরামাত্রায় গ্রহণ করিতে পারে না।

শিল্প ঊর্ধ্বাধোস্তর জোটের কুফল

একচেটিয়া কারবার ও জোট ব্যবসায়ের সুবিধা (Advantages of Monopoly and Combination) : একচেটিয়া কারবারের সুফল নির্ভর করে

বিশেষভাবে কি ধরণের ব্যবসায় সংগঠিত হয় তাহার উপর। একচেটিয়া কারবার যদি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়িগণের জোট হয়, কিংবা অনিবিড় ব্যবসায়-সংস্থাবিশেষ হয়, তাহা হইলে প্রতিযোগিতা-মূলক ব্যবসায়ের চেয়ে বড় বেশী সুবিধা লাভ করার আশা থাকে না। কিন্তু একচেটিয়া কারবার যদি পূর্ণ-সংযুক্তি ব্যবসায়ের আকার ধারণ করে, তাহা হইলে উহার পক্ষে বৃহদায়তন উৎপাদনের যাবতীয় সুবিধা লাভ ও ব্যয় সংকোচ সম্ভব হয়। এইরূপ একচেটিয়া জোট কারবারের পক্ষে অনিপুণ প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া প্রযোজনানুরূপ কর্ম বিভাগের বৈশিষ্ট্য প্রবর্তনদ্বারা উৎপাদনের আমূল সংস্কার ও সংগঠন করা সহজ। এইরূপ একচেটিয়া জোট উৎপাদনের কারিগরি সুবিধা পুরামাত্রায় লাভ করে।

দ্বিতীয়তঃ, কারবার একচেটিয়া জোট ব্যবসায়ে পরিণত হইলে বাণিজ্যের কারিগরি বুদ্ধি, ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা প্রভৃতির একত্র সমন্বয় হয়, যাহাদ্বারা সকল সংযুক্ত প্রতিষ্ঠানই ব্যয় সংকোচ ও উৎপাদনের উন্নয়ন করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি বহন ও পুঁজি সংগ্রহ ব্যাপারে বৃহদায়তন উৎপাদন যে সকল সুযোগ সুবিধা লাভ করে, তাহার প্রায় সবগুলিই একচেটিয়া জোট-কারবারে পাওয়া যায়।

চতুর্থতঃ, এই ধরণের জোট-কারবাবে প্রতিযোগিতামূলক বিজ্ঞাপন ও প্রচার কার্যের প্রয়োজন হয় না বলিয়া বিক্রয় খরচও বিশেষ ভাবে সংকোচ করা সম্ভব হয়।

পঞ্চমতঃ, কতকগুলি শিল্পোৎপাদনে সামাজিক প্রয়োজনে একচেটিয়া জোট কারবারেব উৎপত্তি হয়। যেমন, পরিবহন, বৈদ্যুতিক শক্তি সরবরাহ শিল্প প্রভৃতিতে প্রতিযোগিতা থাকিলে, একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের যেমন উৎপাদক বিত্তের অযথা আধিক্য ও অপচয় হয়, অন্যদিকে স্থায়ী মূলধনও প্রত্যেকের অধিক পরিমাণ লাগে। এই সকল শিল্পে সরকারী আইনদ্বারা জোট উৎপাদন অভিপ্রেত।

পরিশেষে, অনেকে বলেন যে, একচেটিয়া জোট কারবার শিল্পের স্থিরতা আনয়ন করে; পণ্য যোগান ও মূল্যস্তর নিয়মিত করিয়া প্রতিযোগিতা হ্রাস করে ও ব্যবসায়ের অনিশ্চয়তা দূর করে। তবে জোট উৎপত্তির যদি মুনাফা শিকার, ফাট্‌কা কারবার পরিচালনা প্রভৃতি উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে মূল্যস্তরের, তথা শিল্পের স্থিরতা আসিতে পারে না।

একচেটিয়া কারবার ও জোটব্যবসায়ের অসুবিধা (Disadvantages of Monopoly and Combination.): একচেটিয়া জোট-কারবার সামাজিক-কল্যাণের পরিপন্থী। যদিও এই ধরণের কারবার বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া ব্যয় সংকোচ করিতে পারে, তথাপি এই সুবিধা খাদক সম্প্রদায় গ্রহণ করিতে পারে না ; কেননা,. এই কারবারে উৎপন্ন পণ্যের মূল্য হ্রাস বিশেষ একটা হয় না। প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের চাইতে একচেটিয়া বাজারের পণ্যমূল্য স্বভাবতঃই উর্ধ্ব থাকে। জোট কারবার অনেক সময় তারতম্যমূলক পণ্যমূল্য নির্ধারণ করিয়া সাধারণ ক্রেতাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া বাজারে পণ্যযোগান পরিমাণ ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের চেয়ে কম হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রতিযোগিতাপূর্ণ উৎপাদন বিনষ্ট করিয়া এবং নূতন প্রতিযোগীর বাজারে উদ্ভব ব্যহত করিয়া, জোট-কারবার সামাজিক প্রযোজন মাফিক পণ্য যোগানের পথে প্রতিবন্ধক-স্বরূপ হয়।

তৃতীয়তঃ, অনেক জোট কারবারে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ রবাদ্দ করা থাকে। ইহার ফলে প্রতিষ্ঠান বেশী পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিযা বাঞ্ছনীয়তম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না এবং ফলে প্রতিষ্ঠানের কর্মশক্তির খানিকটা অযথা অপচয় হয়।

চতুর্থতঃ, একচেটিয়া জোট-ব্যবসায় উচ্চ মূল্যস্তর নির্ধারণদ্বারা সাধারণ খাদক সম্প্রদায়কেই যে শুধু বিপর্যস্ত করে তাহা নহে। জোট কারবার উৎপাদক কারক সমূহের কর্ম সংস্থান সংকোচ করিতে পারে কিংবা উহাদেরকে প্রতিযোগিতা মূলক বাজারের মূল্যের চাইতে কম মূল্যে নিযুক্ত করিতে পারে। দর কষাকষির ক্ষমতা থাকার দরুণ একচেটিয়া কারবার অল্প মূল্যে শ্রমিক নিযুক্ত করিতে পারে। অন্যান্য উৎপাদক কারুকগণের উপরও এই ধরণের শোষণ চলে।

পঞ্চমতঃ, অঢেল মূলধন বিনিয়োগ ও ফাটকা কারবারের আনুসঙ্গিক কুফল জোট-ব্যবসায়ে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। প্রচুর ক্ষমতা ও সংহতির বলে একচেটিয়া কারবার নূতন প্রতিষ্ঠানের বাজার-প্রবেশ সীমিত করিয়া ব্যবসায়িক উদ্যোগ ও সাহস খর্ব করে।

পরিশেষে, আধুনিক একচেটিয়া জোট-কারবারের সম্পদ ও পুঁজিপাটা এত অধিক যে, ইহারা সরকারী কর্মিগোষ্ঠী ও দেশের আইন প্রণয়নকারীদের অর্থ লোভ দেখাইয়া কার্যসিদ্ধি করিয়া লইতে পারে।

ক্ষমতাশালী শিল্প-জোট বজায় রাখিবার প্রতিবন্ধক (Difficulties in the way of maintenance of strong Industrial Combination) : জোট-কারবার গড়িয়া তোলা যত সহজ, উহাকে অবহিত রাখা তত কঠিন। বহু আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণে জোটকারবারের অবস্থিতি সংকটাপন্ন হইতে পারে। জোটের সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই চুক্তি লাভজনক নাও হইতে পারে। সাধারণতঃ, সুদক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলি অনিপুণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্যক্ষম রাখিবার জন্য সামান্য স্বার্থও বলি দিতে নারাজ। ব্যবসায় বাণিজ্যের, উঠানামার সংগে সংগতি রক্ষা করিয়া জোট-কারবারের চুক্তি বজায় রাখা খুবই কঠিন। বাহ্যতঃ, জোট-কারবারের বিপদ হইল সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার চাপ। সর্বদাই কিছু কিছু নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাজারে প্রবেশ করিতে পারে। ইহা ছাড়া, সংযুক্ত-জোট-কারবারে সংগঠন ও পরিচালনার ব্যাপারেও অনেক অসুবিধা হইতে পারে।

একচেটিয়া কারবারের নিয়ন্ত্রণ (Control of Monopolies) : একচেটিয়া কারবার সাধারণতঃ সমাজ কল্যাণের পরিপন্থী বলিয়া উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য কতিপয় ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজনীয়। মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে ট্রাষ্ট জোটকারবারকে নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ১৮৯০ খৃঃ অব্দে Sherman Act এবং ১৯১৪ খৃঃ অব্দে Clayton Anti-Trust আইন পাশ করা হইয়াছে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে অনেক অসাধু প্রথা আছে যেমন, বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা (destructive dumping), অস্বাভাবিকভাবে পণ্য মূল্যের দাম হ্রাস করা প্রভৃতিকে সরকারের শক্তি ও সাহসের সহিত রোধ করা একান্ত প্রয়োজন।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারকে একচেটিয়া কারবারের পণ্য মূল্য ও মুনাফার হারও সমাজ কল্যাণের জন্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে সরকার সর্বোচ্চ পণ্য মূল্য ও সর্বোচ্চ মুনাফার হার বাঁধিয়া দিবে। উংপাদক কারকগণকে যাহাতে এক চেটিয়া কারবার শোষণ না করে, তাহার জন্যও সরকার উংপাদক কারকগণের সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে। অত্যধিক উন্মার্গগামী শিল্পে কারকগণ যাহাতে প্রবেশ না করে, তাহার জন্য সরকার কারকগণের উপর উচ্চ কর ধার্য করিতে পারে এবং অনুন্নত শিল্পে প্রবেশ করিতে যাহাতে উংসাহিত হয় তাহার জন্য সহায়ক বৃত্তি দান করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, জোটকারবারের ক্ষমতার যাহাতে অপব্যবহার না হয় তাহার জন্য নিয়মিত সরকারী পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। কারবারের আভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের বহুল প্রচার সুনিয়ন্ত্রণের একটি প্রকৃষ্ট উপায়।

পরিশেষে, একচেটিয়া জোট-কারবারের অনেক গলদ দূর করা সম্ভব হয় ইহার রাষ্ট্রীয়করণদ্বারা। বিশেষ করিয়া জনহিতকর পণ্য ও কৃত্য যোগানে, কিংবা কার্যক্রম যেখানে গতানুগতিক ও বিক্রয় বাজার যেখানে অনিশ্চিত সেখানে, জোট-কারবারের রাষ্ট্রীয়করণ সর্বৈব অভিপ্রেত।

সমবায় কারবার (Co-operative Enterprise): সমবায় কারবার এমন একটি বিশেষ ধরণের সংগঠন যাহা আর্থিক দুঃস্থ লোকেরা পরস্পরের কল্যাণের ভিত্তিতে স্ব ইচ্ছায় একত্রিত হইয়া গড়িয়া তুলে। সমবায় নীতি ধনতন্ত্রবাদকে একেবারে অস্বীকার করে না। এই কারবার ধনতন্ত্রবাদের শ্রেণী-বৈষম্য ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কুফল দূর করিয়া 'প্রত্যেকে সকলের তরে এবং সকলে প্রত্যেকের তরে' এই নীতির উপর ব্যবসা গড়িয়া তুলিতে যত্নশীল। এই কারবারের মূলসূত্র হইল: ধনিকের উচ্ছেদ সাধন এবং সাম্যের ভিত্তিতে শ্রমিকের সম্মিলিত ব্যবসায়িক উদ্যোগ গড়া। অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সমবায় কারবারের গোড়া পত্তন। কারবারের প্রতিশ্রুত মূলধন শ্রমিক যোগায়, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকর্তা তাহারাই এবং মুনাফার অংশীদার তাহারাই। সংগঠন-কর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ অনিপুণ শ্রমিক সবাই কারবারের মালিক, প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ এই ব্যবসায়ের গণতান্ত্রিকনীতিকে পংকিল করিতে পারে না। সমবায় ব্যবসায়, একদিকে যেমন ধনিকমালিক গোষ্ঠীর উচ্ছেদসাধনে বদ্ধপরিকর, অন্য দিকে তেমনি ফড়িয়া শ্রেণীর বিতাড়নদ্বারা ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রত্যক্ষ নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনে কৃতসংকল্প। ফড়িয়াশ্রেণী বিতাড়নদ্বারা এই ব্যবসায় অল্প মূল্যে ভোগ্য দ্রব্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা ও অধিক মূল্যে পণ্য বিক্রয় সুযোগ গ্রহণ করিয়া থাকে।

রকমারি সমবায় কারবার (Types of Co-operation): অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিকে সমবায়ের নীতি ও আদর্শ কার্যকরী হইতে পারে।

রকমারি সমবায় কারবার: উৎপাদক সমবায় (Producers' Co-operation)

প্রধানতঃ, উৎপাদন ও খাদন বিষয়ে সমবায় প্রথায় কারবার সংগঠিত হয়। সমবায় উৎপাদন কারবারে কতিপয় লোক মিলিত হইয়া উৎপাদন সংগঠন ও পরিচালনা করে। প্রাথমিক মূলধন তাহারাই যোগায় এবং মুনাফালাভের অংশীদার তাহারাই হয়। সমবায় উৎপাদন কারবারে সাফল্য খুব বিরল। সাধারণতঃ, কৃষিকার্য এবং কুটীর ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্পোন্নয়নে সমবায় উৎপাদনের সুফল সুনিশ্চিত, বৃহদায়তন শিল্পোৎপাদনে সমবায় ব্যবস্থায়

তাদৃশ ফল প্রসব করিতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, সমবায় কারবারে সংগঠন কর্তার ভূমিকা একেবারে অস্বীকার করা হইয়া থাকে কিংবা উহার গুরুত্ব খুবই কম দেওয়া হয়। সমবায় উৎপাদন কারবারের পরিচালকমণ্ডলী সাধারণতঃ সুব্যবসায়িক নয় এবং উচ্চ স্তরের বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ও কর্মকুশল নয়। কারবারের স্বত্বাধিকারী শ্রমিকগণের নিয়মানুবর্তিতার অভাব এবং বৈষয়িক নায়কত্ব ও নিয়ন্ত্রণদক্ষতার অভাবই সমবায় উৎপাদনের অসাফল্যের প্রধান কারণ। ইহা ছাড়া, উপযুক্ত পরিমাণ মূলধন সংগ্রহ এবং বিক্রয় বাজারে প্রসারলাভের সমস্যা ত আছেই।

খাদন সমবায় কারবার (Consumers' Co-operation)

সমবায়ের ইতিহাসে খাদন সমবায় কারবারই বিশেষভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছে। খাদক সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে পাইকারী ও খুচরা পণ্যদ্রব্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে যে সংগ গড়িয়া তোলে তাহাকেই খাদন সমবায় কারবার বলে। সমবায় ভোগ্যপণ্য ভাণ্ডার হইতে প্রত্যেক সদস্যের ক্রয়ের পরিমাণ অনুপাতে মুনাফা বণ্টিত হয়; যে কোন স্থান বিশেষের খাদক সম্প্রদায় মিলিত হইয়া নিজেদের আদায়ীকৃত মূলধনদ্বারা একটি সমবায় ভোগ্যপণ্য ভাণ্ডার সংগঠন করিতে পারে। পাইকারী বাজারে মাল কিনিযা এই ভাণ্ডার সকল অংশীদারদের খুচরা মূল্যে ব্যবহার সামগ্রী যোগান দিতে পারে। ভাণ্ডার যাহা মুনাফা লাভ করিবে তাহা সমস্ত অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়; অথবা মুনাফা বণ্টন না করিয়া, তাহার বদলে সদস্যদের নিম্ন মূল্যে পণ্য সরবরাহ করা চলে। এই ধরণের কারবারের বড় বৈশিষ্ট্যই মুনাফাখোর ফড়িয়া শ্রেণীর উচ্ছেদ সাধন। খাদন সমবায় কারবারের সাফল্যের মূলে রহিয়াছে সদস্য-গ্রাহকগণের নিয়মিত চাহিদা, বিজ্ঞপ্তি ও প্রচারকার্য বাবদ খরচের অনাবশ্যকতা এবং সভ্যগণের মুনাফাশিকারের সীমাবদ্ধ গৃধ্নুতা। অনেক খাদন সমবায় ভাণ্ডার এত সাফল্য লাভ করিয়াছে যে, উহারা সভ্যগণকে দ্রব্য সরবরাহ করিবার জন্য নিজেরাই সমবায়ের ভিত্তিতে উৎপাদন ব্যবস্থাও সুরু করিয়াছে। এই ধরণের উদ্দেশ্যবহুল নানার্থক (multi-purpose) সমবায় কারবার আজকাল প্রায় সকল দেশেই জনপ্রিয় হইতেছে।

রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ (State Enterprise): অধুনা অনেক শিল্প ব্যবসায় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নিয়ন্ত্রিত ও সংগঠিত। দেশের কেন্দ্রীয়, রাজ্য বা স্থানীয় শাসন সংস্থা অনেক কারবারের স্বত্বাধিকারী হইয়া উহাদের পরিচালন ও

তদারক করিতে পারে। সাধারণতঃ, জনহিতকর কার্য সরবরাহ ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়-উদ্যোগ বিশেষ সাফল্য লাভ করে। যেমন, প্রায় প্রত্যেক দেশেই যোগাযোগ ও পরিবহন, ডাকবিভাগ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভৃতি ব্যবসায়-উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় মালিকানার নিয়ন্ত্রাধীন। রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের দৈনন্দিন কার্যসূচী ও ব্যবস্থাপনা সাধারণতঃ এক মালিকানা ব্যক্তিগত কারবারের অনুরূপ। তবে বিশেষ তফাৎ এই যে, রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে নিযুক্ত কর্মীগোষ্ঠীর কার্যমিয়াদ, উন্নতি, অবসর প্রভৃতি সকল কিছুই সরকারী আইন কানুনদ্বারা নিয়মিত। দ্বিতীয়তঃ, মুনাফা শিকার এই ধরণ ব্যবসায়ের লক্ষ্য নয়; সমাজ কল্যাণের আদর্শেই রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ের গোড়াপত্তন। ব্যবসায়ের গোটা মুনাফা রাষ্ট্র করায়ত্ব হয় এবং সেই মুনাফার সুবিধা জনসাধারণ লাভ করে কর-ভার হ্রাসের মধ্য দিয়া।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা কারবারের সুফল ও কুফল (Relative Advantages and Disadvantages of State Ownership or Enterprise) : বিংশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রবাদ প্রসারের সংগে সংগে রাষ্ট্রীয় কার্যপরিধি বিশেষভাবে বিস্তৃতিলাভ করিয়াছে। উনবিংশতি শতাব্দীর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ রাষ্ট্রের কার্যাবলী বিশেষভাবে সংকুচিত করিয়া রাখিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর সমাজতান্ত্রিক মতবাদ ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ধুয়া রাষ্ট্রের কার্য তালিকা বিশেষভাবে পুষ্ট করিতে সহায়তা করিয়াছে। আধুনিক রাষ্ট্র পুলিশী ক্ষমতা ভাবাপন্ন নয়; আজকার কল্যাণকামী রাষ্ট্র জনসাধারণের সুখ সমৃদ্ধি বর্ধনের পরিকল্পনা গ্রহণ ও কর্মব্যবস্থা করিতে ব্যস্ত। প্রতিযোগিতাপূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য-বাদের ভিত্তিতে কার্যকরী ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমাজ কল্যাণের বিশেষ পরিপন্থী বলিয়া আধুনিক রাষ্ট্র শিল্পোন্নয়ন ও ব্যবসার উদ্যোগে ব্যাপকভাবে মালিকানাস্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতেছে। শিল্পোন্নয়ন ও সেবাকার্য সরবরাহে রাষ্ট্রের এই মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কতগুলি সুফল প্রসব করে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা কারবারের সুফল

প্রথমতঃ, এমন অনেক শিল্পোৎপাদন আছে যেখানে মূলধন বিনিয়োগ অত্যন্ত অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও মুনাফা লাভের সম্ভাবনাও প্রত্যক্ষ নয়। যেমন, যোগাযোগ ও পরিবহন শিল্প। এই ধরণের উৎপাদন কারবারে রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, অনেক একচেটিয়া জোট-ব্যবসায় এত মুনাফাখোর যে, তাহার উচ্চ

পণ্যমূল্য দাবী করিয়া খাদক সম্প্রদায়ের লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া থাকে; এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ ও পরিচালনা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা একান্ত দরকার।

তৃতীয়তঃ, ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা সুসমঞ্জস ও সুসমন্বিত নয়—অপচয় ও অনিপুণতা ইহার প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। যদি সমাজের উৎপাদক কারক ও সম্পদসমূহ জনসাধারণের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য ব্যবহার করিতে হয়, তাহা হইলে উহাদের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যতিরেকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিবার উপায় নাই। রাষ্ট্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্য সমাজ কল্যাণের পক্ষে সর্বৈব অনুকূল হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্র মালিকানা কারবার মুনাফা-শিকারের ভিত্তিতে সংগঠিত হয় না। সুপরিকল্পিত ও জনকল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বলিয়া রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্য মূল্যের সাধারণ হার নীচু। এই ধরণের উৎপাদনকার্যে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হয় না; প্রচার ও বিজ্ঞপ্তির খরচ নগণ্য এবং জোট-ব্যবসায়ের সমস্ত সুযোগ সুবিধাও পুর্ণ মাত্রায় গ্রহণ করা যায়। ফলে, পণ্যদ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম বাজার দরে বিক্রয় হইতে পারে এবং খাদক সম্প্রদায়ও জীবনযাত্রার মান উঁচু করিতে পারে। রাষ্ট্রয়ত্ত শিল্প ব্যবসায়ের মুনাফা ব্যক্তি বিশেষে পায় না। জনকল্যাণকর কার্যে উহা ব্যয়িত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থায় শ্রমিকের উপর নিপীড়নও অনেক কম, এবং তাহাদের মজুরীর হার ও অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্যও অনেক বেশী।

পরিশেষে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায় সরকারী আয়ের একটা বড় উৎস। এই আয়ের ভিত্তিতে সরকার দেশের ভবিষ্যৎ আর্থিক উন্নয়ন ও সেবা কার্য সম্প্রসারণের ব্যাপক সুপরিকল্পনা ও কর্মসূচী গ্রহণ করিতে পারে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা কারবারের কুফল

রাষ্ট্রীয় মালিকানা কারবারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এই যে, সরকারী পরিচালনাকার্য ব্যক্তিতান্ত্রিক পরিচালনা হইতে নিকৃষ্টতর ও অধিক অনিপুণ। সরকারী পরিচালনায় সংগঠন কর্তার তদারকী ও ব্যয়সংকোচনের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সরকারী পরিচালক গোষ্ঠী ও কর্মচারিগণের কর্মোৎসাহ ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল। কেননা, সরকারী চাকরীর উন্নতি ও দায়িত্ব গতানুগতিক ও সুনিশ্চিত। কিন্তু ব্যক্তিসর্বস্ব কারবারে চাকুরির উন্নতি ও দায়িত্ব নির্ভর করে কর্মচারিগণের উৎসাহ, প্রকাশ ও কর্মদক্ষতা উপর।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারে কার্যপ্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত কম সক্রিয়। গতানুগতিক ধরাবাঁধা পথে দীর্ঘলাল ফিতাকবলিত কার্যপরিক্রমা মন্থর হইতে বাধ্য। যে সকল ব্যবসায়ে কর্মপন্থা সুনির্দিষ্ট নয়, যেখানে পরিচালনা ও সংগঠন নীতি সত্বর নির্ধারণ করা প্রয়োজন, সে সকল উৎপাদন ব্যবস্থা রাষ্ট্রায়ত্ত করা মোটেই সমীচীন নয়।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত কারবারে কর্মচারিদের দরদ ও দায়িত্ব বোধও অপেক্ষাকৃত কম থাকায় তাহারা চরম দক্ষতা ও সততার সংগে বড় একটা কাজ করে না। উৎপাদনের লাভ লোকসানের প্রতি কাহারও বড় একটা নজর থাকে না; কেননা, তাহাদের কর্মদক্ষতার জন্য সরকার যদি লাভবানও হয়, তাহা হইলে তাহারা সেই লাভের অংশীদার হয় না। অপর পক্ষে, সরকারের লোকসান হইলেও তাহা কর্মচারিদের স্পর্শ করে না। লোকসানের বোঝা বাড়্‌তি কর হিসাবে জনসাধারণের ঘাড়ে চাপে।

পরিশেষে, সরকার ভোট সংগ্রহের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক সংঘগুলিকে সব সময়ই তোয়াজ করিয়া থাকে। সুসংবদ্ধ শ্রমিক সংঘ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ মজুরী অথবা স্বল্প কার্য মেয়াদের ব্যবস্থা করে। ইহাতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইয়া পণ্যমূল্য চড়া হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানা কারবারের এই সকল কুফলের জন্যই ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় কেবল বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে এই ধরণের ব্যবসায়ের পত্তন হওয়া উচিত। যে সকল শিল্পোৎপাদনে প্রারম্ভিক ঝুঁকি ও উদ্যোগ বেশী প্রয়োজন, যে সকল ব্যবসায়ে ব্যক্তি সর্বস্ব মালিকানা ও প্রতিযোগিতা শুধু আর্থিক অপচয়ের নামান্তর মাত্র এবং যে সকল কারবারে ব্যক্তিগত মুনাফা সুনিশ্চিত ও সুউচ্চ নয়, রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের যৌক্তিকতা সেই সকল ক্ষেত্রেই প্রবল।

শিল্প সংস্কার সাধন (Rationalisation of Industries) : আমরা সকলেই জানি প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মানীর একদিকে যেমন অঙ্গচ্ছেদ হয়, অন্যদিকে যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের বোঝাও নির্মমভাবে ঘাড়ে চাপে। এই বিপর্যয় অবস্থার মুখে জার্মানী গোটা শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা সংগঠন করিতে বাধ্য হয়। জার্মানীর ইতিহাসে এই অর্থনৈতিক সংগঠনের ধারাকেই শিল্প সংস্কার আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। জার্মানীর শিল্পোন্নয়নের ইতিহাসে এই সংগঠন ধারা এতটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে, অনেকে ইহাকে 'নয়া শিল্প বিপ্লব' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

মূলতঃ, শিল্পোৎপাদনে বুদ্ধিবৃত্তির বা বিবেচনার প্রয়োগকে শিল্পসংস্কার সাধন

বলা চলে। ইহা সেই সংগঠন ব্যবস্থা ও কারিগরি পদ্ধতিকে বুঝায়, যাহাদ্বারা উৎপাদনে কারক-প্রচেষ্টার ও কাঁচামাল ব্যবহারের অপচয় হয় সব চাইতে কম। শিল্প সংস্কার সাধনের আসল উদ্দেশ্যই বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণদ্বারা সকল রকম অপচয় দূর করিয়া উৎপন্ন খরচ সংকোচন এবং শিল্পের সামগ্রিক উন্নয়ন করা। প্রতিযোগিতামূলক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয় উৎপাদক কারকের অবাধ কার্যকারিতার মাধ্যমে; কিন্তু কারকের অবাধ কার্যকারিতা উৎপাদনের তেজী মন্দা ভাব, সাধারণ দামস্তরের উঠানামা প্রভৃতি নানা বিপর্যয় অবস্থারও সৃষ্টি করে। শিল্প সংস্কার সাধনের পৃষ্ঠপোষকগণ মনে করেন যে, বিজ্ঞান সম্মত পরিকল্পনামূলক উৎপাদনব্যবস্থা ও কারিগরি নিয়োগ পদ্ধতিদ্বারা ধনতন্ত্রের অনেক বিপর্যয় অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ব্যাল্‌ফোর (Balfour) বলেন: "It (Rationalisation) really is the method of technique and organisation designed to secure the minimum waste in effort and material, added to that, the scientific organisation of labour ; the standardisation of materials and products and the simplification of processes and physical improvements in the system of transport and marketing."

শিল্পসংস্কার সাধনের অর্থ কি?

শিল্পসংস্কার সাধনের কার্যসূচীতে সাধারণতঃ এই বিষয়গুলি তালিকাভুক্ত করা হয়: (১) কারখানা ও যন্ত্রপাতির আধুনিককরণ (২) অনিপুণ প্রাচীনপন্থী প্রতিষ্ঠানের উচ্ছেদ সাধন করিয়া জোট-ব্যবসায়ের উৎপত্তিসাধন এবং স্থায়ী উৎপাদন খরচ সংকোচন, (৩) উৎপাদন স্তরের সহজীকরণ এবং উৎপন্ন পণ্যের মান নির্ধারণ, (৪) উপজাতদ্রব্যের ব্যবহার (Use of bye-products), (৫) বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রমিকের সংগঠন, (৬) যাতায়াত ও পরিবহন উন্নয়ন এবং পণ্য বিক্রয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি।

শিল্প সংস্কার সাধনের সুফল (Advantages of Rationalisation): শিল্প সংস্কার সাধনের সুফল নানাভাবে পাওয়া যায়। বৃহদায়তন উৎপাদনের সমস্ত সুযোগ সুবিধাই শিল্প সংস্কার সাধনে লাভ করা যায়; যাহার ফলে, একদিকে যেমন ব্যয় সংকোচন হয়, অন্যদিকে তেমনি উৎপাদনের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। কাঁচা মাল ও কর্ম শক্তির বৃথা অপচয় ঘটে না। শিল্প প্রচুর মূলধন সংগ্রহদ্বারা উপযুক্ত গবেষণাদি ও প্রয়োগ কার্যের ব্যবস্থা করিতে পারে, যাহার ফলে উন্নত

ধরণের উৎপাদন কার্য সম্ভব হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, খাদক সম্প্রদায়ের নিকট শিল্প সংস্কার সাধনের সুফল এই যে, তাহারা ভোগ্যদ্রব্য কম বাজার দরে কিনিতে পারে। সাধারণ আবশ্যকীয় দ্রব্য যদি অল্প মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানও উন্নত হয়। **পরিশেষে**, শিল্প সংস্কারের দৌলতে প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের কুফল দূর হয় এবং অনেক সময় জোট-কারবারের উৎপত্তিদ্বারা শিল্পোৎপাদনের স্থিরতা স্থাপিত হয়।

শিল্প সংস্কার সাধনের কুফল (Disadvantages of Rationalisation) : শিল্প সংস্কার সাধনের কুফল প্রধানতঃ দেখা দেয় তখনই, যখন ইহা জোট-কারবারের সৃষ্টি করে। তখন একচেটিয়া মুনাফা-শিকার মূল্যস্তর নির্ধারণের মাপকাঠি হয় এবং ফলে, খাদক সম্প্রদায় উচ্চ মূল্যে ভোগ্যদ্রব্য কিনিয়া বিপর্যস্ত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, শিল্প সংস্কার সাধনের ফলে বৃহদায়তন জোট-কারবার ও সংহতির সৃষ্টি এত বেশী হয় যে, স্বাধীন বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যবসায়ীর পক্ষে কারবার করিবার মত সুযোগ সুবিধা খুব কম থাকে। অতিবড় মেধাসম্পন্ন বিষয়-বুদ্ধিও সাধারণ শ্রমিকের কর্মদক্ষতার চেয়ে বেশী কদর ও উৎসাহ পায় না। ফলে, শিল্প সংস্কার সাধিত উৎপাদন ক্ষেত্রে উপযুক্ত সংগঠন কর্তা ও ব্যবসায়-নায়কের যোগান সীমিত হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, শিল্প সংস্কার সাধনের ফলে শ্রমিকের কর্ম সংকোচন হয়। উন্নত ধরণের উৎপাদন পদ্ধতি ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারে শ্রমিকের বিনিয়োগ বিশেষভাবে হ্রাস করে। শিল্প সংস্কার সাধনের ফলে শ্রমিকের কর্মসংস্থান বিশেষভাবে সংকুচিত হয় ব্যবসায় মন্দার সময়। তখন সাধারণ মূল্য-স্তর নিম্নগামী হয় এবং ব্যবসায়ীগণ ব্যয় সংকোচনের জন্য শ্রমিক ছাটাই করিতে থাকে। অবশ্য এই কর্মসংকোচন শিল্প সংস্কার সাধনের অস্থায়ী কুফল মাত্র। দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ী ফল শুভ : ইহা শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করে। শিল্প সংস্কার সাধনের ফলে, উৎপাদনে মুনাফার অংক বৃদ্ধি পায় এবং এই মুনাফা বৃদ্ধি বিনিয়োগের পরিমাণ সম্প্রসারণ করে। এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শ্রমিকের কর্ম সংস্থানও বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, শিল্প সংস্কার সাধনের ফলে উৎপন্ন খরচ হ্রাস পায় এবং তাহার জন্য পণ্য মূল্যও নিম্নগামী হয়। নিম্নগামী পণ্য মূল্য খাদক সম্প্রদায়ের অর্থ আয় বৃদ্ধি করে। খাদক সম্প্রদায়ের অর্থ আয় বৃদ্ধি পাইলে, ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বাড়ে এবং ভোগ্য দ্রব্য শিল্পের

শিল্প-সংস্কার ও শ্রমিকের কর্ম সংস্থান

বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হইয়া শ্রমিকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। অবশ্য, খাদক সম্প্রদায় যদি ধনিক শ্রেণী হয়, তাহা হইলে পণ্য মূল্যের হ্রাস হেতু তাহাদের যে অর্থ আয় বৃদ্ধি পাইবে, তাহা তাহারা ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে খরচ করিবে না; ফলে, ভোগ্যদ্রব্য-শিল্পোৎপাদনে মন্দা আসিয়া অস্থায়ীভাবে শ্রমিকের কর্মসংস্থান সংকোচন করিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী ফল অন্যরূপ হইবে। শিল্পসংস্কার সাধনের-ফলে, মুনাফা স্ফীতির সংগে সংগে উৎপাদক দ্রব্য শিল্পে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে এবং কর্মসংস্থানেরও সম্প্রসারণ হইবে। অবশ্য, এই ধরণের বিনিয়োগ প্রক্রিয়াদ্বারা কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া দীর্ঘ সময়-সাপেক্ষ।

অনুশীলনী

1. Examine the reasons for the predominance of joint-stock companies over other forms of business. (C.U. B.A. '52)
2. Discuss the various motives which impel different firms to combine. Are all such motives antisocial? (C.U. B.Com.'54, '56 & B.A. '56)
3. Discuss the causes and effects of combination in industry. (C.U.B.A. '52)
4. Discuss the factors favouring the growth of monopolistic combination and examine the view that the existence of a monopoly is always undesirable. (C.U.B.A. Hons. '55)
5. Distinguish between Cartel and Trust. Are they really useful to society? (C. U. B. A. '53)
6. Discuss the relative merits and demerits of Cartel and Trust. (C.U. B.Com. '53)
7. Distinguish between vertical and horizontal combinations and examine their advantages and disadvantages. (C.U. B.Com. '52)
8. What is monopoly? Point out certain industries where competition proves inefficient or wasteful and monopoly proves an economic necessity.
9. Discuss the relative advantages and disadvantages of the ownership of industry by the State (C. U. B. A. Hons. '51)
10. What is rationalisation? Discuss its economic effects.

দশম অধ্যায়

উৎপাদন আগমের নিয়মাবলী (Laws of Returns)

বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া আমরা যখন প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন সম্প্রসারণ করি, তখন তিনটি বিভিন্ন সম্ভাব্য অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। প্রথমতঃ, উৎপন্ন সামগ্রী বিনিয়োগের সমানুপাতের চেয়ে বেশী বৃদ্ধি পাইতে পারে ; দ্বিতীয়তঃ, সামগ্রী সমানুপাতে বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং তৃতীয়তঃ, সামগ্রী বিনিয়োগের সমানুপাতের চেয়ে কম বৃদ্ধি পাইতে পারে। এই তিনটি সম্ভাব্য অবস্থাকে যথাক্রমে **ক্রম হ্রাসমান আগম, সমবর্ধমান আগম** এবং **ক্রমবর্ধমান আগম** বিধি বলে।

ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি (Law of Diminishing Returns) : ক্রম হ্রাসমান আগমের বিধি অর্থবিদ্যার মূল নিয়মাবলীর অন্যতম। দুইটি বিভিন্ন দৃষ্টিভংগি হইতে এই নিয়ম বিশ্লেষণ করা যায় : (১) প্রথমতঃ, ভূমি চাষাবাদে এই নিয়মের প্রয়োগ এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, সাধারণভাবে সকল উৎপাদন ক্ষেত্রে ইহার কার্যকারিতা।

ভূমি চাষাবাদে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি (Law of Diminishing Returns as applied to the cultivation of land) : সাধারণ কৃষক তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে বলিতে পারে যে, একখণ্ড ভূমিতে সে যত শ্রম ও মূলধনই বিনিয়োগ করুক না কেন, উহা হইতে ক্রমাগতভাবে অপরিমিত আগম সে লাভ করিতে পারে না। প্রথমতঃ, ভূমিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতে আগম বৃদ্ধি বেশীও হইতে পারে, অথবা আগমবৃদ্ধি বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমানুপাতিক হইতে পারে। কিন্তু চরমে, আগম বৃদ্ধির অনুপাত বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতের চেয়ে কম হইবেই। কৃষক তাহার সীমিত ভূমিখণ্ডে শ্রম ও মূলধনবাবদ বিনিয়োগ যতই বৃদ্ধি করিয়া যাক না কেন, তাহার সমুদয় আগম অবশ্য বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ; কিন্তু ক্রমিক বিনিয়োগের ফলে, প্রান্তিক আগম (extra yield or marginal return or product) ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকিবে। ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কৃষকের সমুদয় আগম (Total return or product) অবশ্য বৃদ্ধি পাইবে ; কিন্তু উহা হ্রাসমান হারে বৃদ্ধি পাইবে। অধ্যাপক মার্শাল চাষাবাদে কার্যকরী

ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির এই সংগা নির্দেশ করিয়াছেন : "An increase in capital and labour applied in the cultivation of land causes, in general, a less than proportionate increase in the amount of produce raised, unless it happens to coincide with an improvement in the arts of agriculture."

নিম্নোক্ত উদাহরণদ্বারা ক্রম-হ্রাসমান আগমের বিধিটি আরও বিশদভাবে বুঝান যায়।

ভূমি একক	শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ একক	সমুদয় আগম	প্রান্তিক আগম
১	১৩	৫০ মণ	
১	১৪	৫২ মণ	২ মণ
১	১৫	৫৫ মণ	৩ মণ
১	১৬	৫৯ মণ	৪ মণ
১	১৭	৬৩ মণ	৪ মণ
১	১৮	৬৭ মণ	৪ মণ
১	১৯	৭০ মণ	৩ মণ
১	২০	৭২ মণ	২ মণ

উপরের উদাহরণে আমরা দেখি যে, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ বারের বিনিয়োগে প্রান্তিক আগম যথাক্রমে বাড়িয়া ২, ৩ ও ৪ হইতেছে। এই সকল বিনিয়োগে ক্রম বর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হইতেছে। ৫ম ও ৬ষ্ঠ বারের বিনিয়োগে কিন্তু প্রান্তিক আগম একই আছে—এই দুই বারের বিনিয়োগে সম-বর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হইতেছে। কিন্তু সপ্তম ও অষ্টম বারের বিনিয়োগে প্রান্তিক আগম যথাক্রমে হ্রাস পাইতেছে। এই দুইবারের বিনিয়োগে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি ফলপ্রসূ হইতেছে।

ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ প্রান্তিক আগমের বক্র রেখাচিত্র অংকিত করিয়া দেখান যায়।
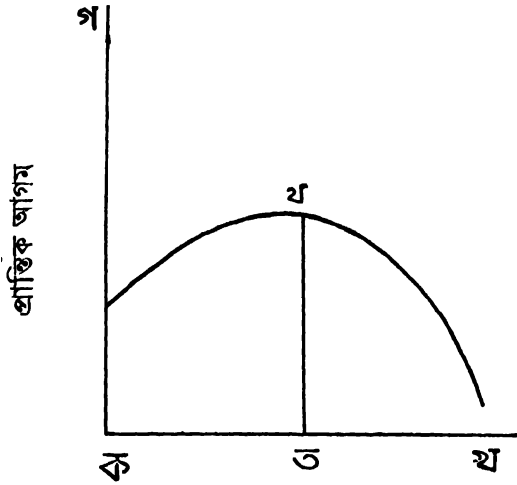
(২য় চিত্র) শ্রম ও মূলধন

ক খ অক্ষ শ্রম ও মূলধনের পরিমাপ এবং **ক গ** অক্ষ প্রান্তিক আগম নির্দেশ করিতেছে। **ক ত** পর্যন্ত যতক্ষণ বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা যায়, ততক্ষণ প্রান্তিক আগম বাড়িতে থাকবে এবং ফলে, ক্রম-বর্ধমান আগমের বিধি কার্যকরী হইবে। **ক ত** র চেয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, প্রান্তিক আগম হ্রাস পাইতে থাকিবে ও ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে।

বিধির ব্যত্যয় (Limitations of the Law) : ক্রম-হ্রাসমান আগমের বিধি বুঝিতে হইলে আমাদের কতগুলি বিষয় অনুমান করিয়া লইতে হইবে। **প্রথমতঃ,** এই নিয়ম উৎপন্ন পণ্যের বাজার মূল্য সম্পর্কে কোন ইংগিত দেয় না ; উৎপাদনের বাস্তব পরিমাণবাচক আগম (physical quantity) সম্বন্ধে আমাদের একটা ধারণা দেয় মাত্র। প্রকৃত পক্ষে, এ নিয়মের প্রয়োগে প্রান্তিক বাস্তব আগম (marginal physical return) হ্রাস পাইতে থাকে—আগমের বাজার দাম নহে। **দ্বিতীয়তঃ,** এই নিয়মের প্রয়োগ যথার্থ হইবে, যদি উৎপাদন পদ্ধতির কোন অদল বদল না হয়। যদি উৎপাদন পদ্ধতির উন্নতি বিধান হয়, যদি নূতন জমি, উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতি, ভাল বীজ, ভাল সার ব্যবহার করা হয় ও প্রচুর জলসেচের ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে এই বিধির কার্যকারিতা প্রতিরোধ করা

যায়। **তৃতীয়তঃ,** ইহা ঐতিহাসিক নিয়ম নয়; কেননা, বিভিন্ন সময়ে আগমের ধারা কি হইবে তাহার নির্দেশ ইহা দেয় না। বিশেষ কোন এক সময়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে উৎপাদনের আগম কি হইবে, সেই সন্ধানই এই নিয়মে পাওয়া যায়। সেইদিক হইতে এই বিধিকে বর্তিষ্ণু অর্থ ব্যবস্থার নিয়ম বলা চলে।

আত্যন্তিক ও ব্যাপক চাষাবাদে এই নিয়মের প্রয়োগ (Application of the Law in Intensive and Extensive Cultivation): আমরা উপরে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির যে ব্যাখ্যান দিয়াছি, তাহা আত্যন্তিক চাষাবাদ সম্পর্কে প্রযোজ্য। যখন একই ভূমিখণ্ডে ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে প্রান্তিক আগম হ্রাস পাইতে থাকে, তখন আত্যন্তিক চাষে এই বিধি কার্যকরী হয়। ব্যাপক চাষেও এই নিয়ম খাটে। কৃষক যদি তাহার চাষাবাদ সম্প্রসারণ করে—যদি প্রথম পর্যায়ের ভূমি চাষের পর দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমি চাষ করে; আবার দ্বিতীয় পর্যায়ের পর তৃতীয় পর্যায়, এইরূপ যথাক্রমে এক পর্যায় হইতে অন্য পর্যায়ের ভূমি চাষাবাদ করিয়া যায়, তাহা হইলেও এই বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে জমির প্রান্তিক আগম হ্রাস পাইবে এবং ক্রম-হ্রাসমান আগমের বিধি ব্যাপক চাষে কার্যকরী হইবে।

অন্যান্য ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ (Application of this Law in other fields of Production): অধ্যাপক মার্শালের অভিমত এই যে, ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম বিশেষ করিয়া চাষাবাদেই খাটে; কেননা, চাষাবাদে প্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। প্রকৃতি ভূমি যোগান ব্যাপারে অত্যন্ত কৃপণ বলিয়া ভূমির যোগান সীমিত এবং সেইজন্য চাষাবাদে এই নিয়ম বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

খনিজ উৎপাদন

চাষাবাদ ছাড়াও ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি অন্যান্য উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। খনিজ উৎপাদনে যদি বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলেও প্রান্তিক আগম হ্রাস পাইয়া এই নিয়ম কার্যকরী হয়।

সহরের জমিতে গৃহ নির্মাণ

সহরের জমিতেও এই নিয়ম বলবৎ হয়। সহরের জমিতে গৃহ নির্মাণের জন্য যদি বিনিয়োগ ক্রমাগত বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে প্রথম দিকে গৃহের তলা বৃদ্ধির ফলে ক্রমবর্ধমান আগম প্রয়োগ হইবে সত্য; কিন্তু বিনিয়োগ বৃদ্ধিদ্বারা তলার উপর তলা ক্রমাগত নির্মাণ করিয়া গেলে, ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইতে বাধ্য হইবে।

মৎস্য উৎপাদন শিল্পেও শ্রম ও মূলধন বাবদ বিনিয়োগ ক্রমাগত বাড়াইয়া গেলেই যে ক্রমবর্ধমান আগম লাভ হইবে তাহা নহে। যেমন ভূমি-যোগানের টান আছে, সেইরূপ নদীতে মৎস্যের যোগানও সীমিত। নদীতে মৎস্য চাষের জন্য ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া গেলেও একটা সময় আসে যখন বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতে মৎস্যের মোট আগমের অনুপাত কম বৃদ্ধি পায়। অবশ্য সামুদ্রিক মৎস্য চাষে এই নিয়ম কার্যকরী হইতে অনেক দেরী লাগে, কেননা সমুদ্রে মৎস্যের যোগান প্রচুর।

মৎস্য উৎপাদন

ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির ব্যাপক বিশ্লেষণ (The law of diminishing returns in general form): অধ্যাপক মার্শালের মতে চাষাবাদ, মৎস্য চাষ, খনিজ শিল্পোৎপাদন প্রভৃতিতে এই নিয়ম বিশেষভাবে প্রযোজ্য; কেননা, এই সকল উৎপাদনে প্রকৃতি প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে। প্রকৃতির দান ভূমির যোগান সীমিত বলিয়া অন্যান্য উৎপাদন কারকের যোগান বৃদ্ধি করিলেও ভূমির প্রান্তিক আগম ক্রমাগত বর্ধমান হইতে পারে না। অপর পক্ষে, সাধারণ শিল্পোৎপাদনে মানুষ প্রধান গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বলিয়া কারক যোগান সীমাবদ্ধ নহে; সেইজন্য তৈয়ারী শিল্পোৎপাদনে (manufacturing industries) সাধারণতঃ ক্রমবর্ধমান আগম বিধির প্রয়োগ দেখা যায়।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ অধ্যাপক মার্শালের এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহারা বলেন, ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম সকল উৎপাদন কার্যেই প্রযোজ্য। উৎপাদনের মূল ও চরম নিয়ম বলিয়া ইহা কৃষিকার্য ও তৈয়ারী শিল্পোৎপাদনের যে কোন ক্ষেত্রে কার্যকরী হইতে পারে। বিশেষ করিয়া কৃষি কার্যেই যে ইহার প্রয়োগ এ মতবাদ সত্য নহে। ক্রমহ্রাসমান আগমের নিয়ম উৎপাদক কারকগণের সংমিশ্রণের নীতি সম্পর্কীয় গলদের অনিবার্য ফল বিশেষ। কারকগণের সংমিশ্রণের যদি সুষ্ঠু সমানুপাত না হয়, তাহা হইলেই এই নিয়ম কার্যকরী হইবে। যদি কারকগণের মধ্যে একটির যোগান সীমিত হয়, অপর গুলির যোগান পরিবর্তনশীল হয়, তাহা হইলে উৎপাদনবৃদ্ধি করিতে হইলে কারকগণের সংমিশ্রণের সুষ্ঠু সমানুপাত ঘটান অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি একটি কারকের যোগান সীমিত ও অন্যান্য কারকের যোগান বর্ধমান হয়, তাহা হইলে দ্রব্য উৎপাদন সম্প্রসারণের সংগে সংগে সীমিত কারকের অবদান মোট

আধুনিক দৃষ্টি ভংগিতে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি

দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষভাবে হ্রাস পায় এবং অন্যান্য ক্রমবর্ধমান কারকের সংগে সমানুপাত রক্ষা করা অসম্ভব হয়। ইহারই ফলে, ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হয়। অতএব, উৎপাদনে কারক সংমিশ্রণের ব্যাপারে যখনই যে কোন একটি কারক যোগান সীমিত হয়, তখনই নিয়মটি প্রযোজ্য হইতে পারে। কেবল মাত্র ভূমির যোগান সীমিত হইলেই যে নিয়মটি কার্যকরী হয় তাহা নহে ; যে কোন উৎপাদক কারকের যোগান সীমিত হইলেই, এই নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে।

এই নিয়মের আর এক ব্যাখ্যান দেওয়া চলে। যদি উৎপাদন কারকগুলির কোনটির যোগানই সীমিত না হয়, যদি উহাদের সকলগুলিই সমানুপাতিকভাবে বাড়ান চলে, তাহা হইলেও ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে। ইহাকে Diminishing Returns to Scale বলে। কোন উৎপাদন ক্রমে সকল কারকগুলির যখন পূর্ণ ব্যবহার হয় (full utilisation) তখন উৎপাদনের গড়পড়তা খরচ হয় সর্বনিম্ন। এই ক্রমে নিযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে বাঞ্ছনীয় (optimum) উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বলা হয়। বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রম যদি সম্প্রসারণ করা হয়, তাহা হইলে গড়পড়তা খরচ আবার বাড়িতে থাকে, এবং ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকারী হয়। ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির এই ব্যাখ্যানকে ক্রম-বর্ধমান খরচের নিয়ম (Law of Increasing Costs) আখ্যাও দেওয়া চলে। নিম্নে অংকিত রেখাচিত্রটি এই নিয়ম সম্বন্ধে আরও সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইবে।

খরচের নিরূপে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির ব্যাখ্যান
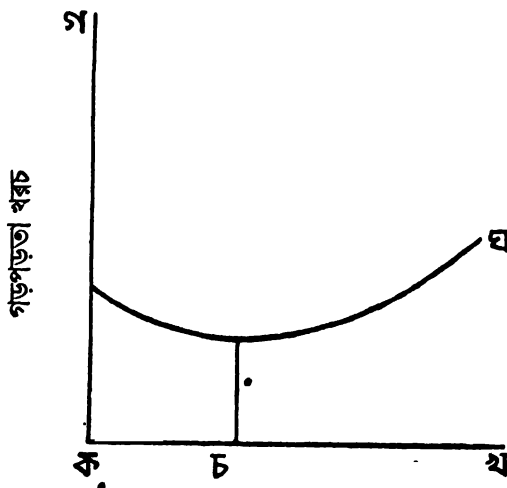
(৩য় চিত্র) উৎপাদনের বিভিন্ন ক্রম

ক খ অক্ষ উৎপাদনের বিভিন্ন ক্রম নির্দেশ করিতেছে এবং **ক গ** অক্ষ গড়পড়তা খরচ বুঝাইতেছে। **ঘ** গড়পড়তা খরচের বক্ররেখা। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রম যখন **ক চ**, তখন ইহার গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন। এই উৎপাদন ক্রমেই প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় হয়। এই অবস্থাতে প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত সমুদয় কারকগণ পূর্ণ মাত্রায় ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রম যদি **ক চ** হইতে বাড়ান যায়, তাহা হইলে গড়পড়তা খরচের বক্ররেখা উর্ধ্বমুখী হইবে, ফলে ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইতে থাকিবে। কিংবা হ্রাসমান খরচের নিয়মের প্রয়োগ হইবে।

ক্রমবর্ধমান আগমের বিধি কিংবা হ্রাসমান খরচের বিধি (Law of Increasing Returns or Decreasing Costs): উৎপাদনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে যদি কোন কারক যোগানের টান না হয় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতে উৎপন্ন আগম বৃদ্ধির অনুপাত অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে। উৎপাদনের একটা বিশেষ ক্রমের সম্প্রসারণ পর্যন্ত সমস্ত কারক যোগান বৃদ্ধি করিলে, উৎপাদনের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়, প্রান্তিক খরচ ক্রমাগত কমিতে থাকে কিংবা গড়পড়তা খরচ হ্রাস পায়। ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে বিভিন্ন কারণে।

ক্রমবর্ধমান আগমের কারণাবলী (Causes of Increasing Returns)

প্রথমতঃ, উৎপাদনের কতকগুলি কারক আছে যাহা ক্ষুদ্র এককে বিভক্ত করা সম্ভব নয় (indivisible units of factors)। উৎপাদনের ক্রম কি হইবে তাহা নির্ধারিত হইবার আগে এই সকল অবিভক্ত কারকের বিনিয়োগ পর্ব সমাধা হয়। যেমন, পণ্য উৎপাদনের গোড়াতেই সংগঠন কর্তার নিয়োগ কিংবা যন্ত্রপাতির সন্নিবেশ হয়। এই সকল অবিভক্ত কারক বিনিয়োগ দরুণ যে স্থায়ী খরচ হয়, তাহা উৎপাদনের ক্রম বৃদ্ধির সংগে সংগে অধিক উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে ভাগ করা সম্ভব হয়। স্থায়ী খরচ যতই অধিক উৎপন্ন সামগ্রীর মধ্যে ভাগ করা সম্ভব হইবে, ততই ঐ গড়পড়তা খরচও হ্রাস পাইবে এবং ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে। অবিভক্ত কারকগুলির পূর্ণ ব্যবহার (full utilisation) বৃহদায়তন উৎপাদনেই সম্ভব। উৎপাদনের ক্রম যদি ক্ষুদ্র হয়, তাহা হইলে একটি যন্ত্রের কিংবা একজন সংগঠন কর্তার কার্যকুশলতা পূর্ণমাত্রায় নিয়োজিত হয় না। উৎপাদনের ক্রম বৃদ্ধির সংগে সংগে যন্ত্র কিংবা সংগঠনকর্তার কিংবা যেন কোন অবিভক্ত কারকের কর্মশক্তির উপযোগ অধিক মাত্রায় পাওয়া

যায়, ফলে গড়পড়তা খরচ কমিতে থাকে এবং ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়মও কার্যকরী হয়।

দ্বিতীয়তঃ, প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্রম বৃদ্ধির সংগে সংগে কতগুলি আভ্যন্তরীণ সুযোগ সুবিধাও (Internal economies) লাভ করা যায়। যেমন, ব্যাপক কর্মবিভাগের সুযোগ-সুবিধা, কারিগরি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা, প্রচুর মূলধন সংগ্রহের সুযোগ-সুবিধা, পরিচালনা ও ঝুঁকি-বহন করিবার সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি। বৃহদায়তন উৎপাদনের এই সকল আভ্যন্তরীণ সুযোগ-সুবিধার জন্যও গড়পড়তা খরচের হ্রাস হইয়া ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হয়।

তৃতীয়তঃ, বাহ্যিক সুযোগ-সুবিধার (External economies) দরুণও এই নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। যদি দেশে কোন শিল্পের সম্প্রসারণ হয়, কিংবা বিশেষ উন্নতি ঘটে, কিংবা কোন বিশেষ আবিষ্কারদ্বারা উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলেও উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যয়-সংকোচ হইয়া ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইতে পারে। নিম্নলিখিত চিত্রদ্বারা ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কিংবা ক্রমহ্রাসমান গড়পড়তা খরচের নিয়মের কার্যকারিতা দেখান চলে।
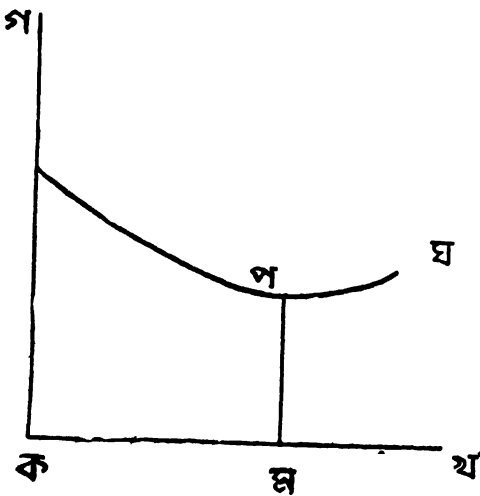
৪র্থ চিত্র

ছবিতে **ক খ** উৎপন্ন পণ্য নির্দেশ করে এবং **ক গ** গড়পড়তা খরচ ইংগিত করে। পণ্য পরিমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া **ক ম** ক্রমে পৌঁছিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত গড়পড়তা খরচ কমিতে থাকিবে এবং ক্রমবর্ধমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে। যখন উৎপন্ন পণ্য **ক ম** হইবে তখনই গড়পড়তা খরচ (**ম প**) নিম্নতম হইবে এবং উৎপাদক কারকগুলির পূর্ণ ব্যবহার হইবে। **ক ম**র চেয়ে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে

গড়পড়তা খরচ আবার বাড়িতে থাকিবে এবং ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইতে থাকিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, ক্রম-বর্ধমান আগমের নিয়ম ক্রমাগতভাবে কার্যকরী হইতে পারে না। কেননা, অবিভক্ত কারকগুলির পূর্ণ ব্যবহার সত্ত্বেও যদি উৎপাদনের ক্রম বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে কারকগুলির অতি মাত্রায় ব্যবহার জনিত অসুবিধা ও কুফল দেখা দিবে। ফলে, গড়পড়তা খরচ বাড়িয়া ক্রম-হ্রাসমান আগমের নিয়ম কার্যকরী হইবে। তাহা ছাড়া, যদি ক্রম-বর্ধমান আগমের নিয়ম অবাধভাবে কার্যকরী হইতে থাকে, তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদনের পরিবর্তে একচেটিয়া কারবারের উদ্ভব হইবে।

সম-বর্ধমান আগম অথবা সম-গড়পড়তা খরচের বিধি (Law of Constant Returns or Uniform Cost): অধ্যাপক মার্শাল বলেন: অনেক শিল্পোৎপাদন আছে যেখানে প্রকৃতি বা মানুষ কেহই গুরুত্বপূর্ণ বা প্রধান অংশ গ্রহণ করে না। যে সকল শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ বৃদ্ধি যে অনুপাত করা যায়, ঠিক একই অনুপাতে যদি আগম বৃদ্ধি হয়, কিংবা প্রান্তিক আগম একই হয়, তাহা হইলে সমবর্ধমান-আগম নিয়ম কার্যকরী হইবে। উৎপাদনের ক্রম বা আয়তন যতই সম্প্রসারণ করা হউক না কেন, যদি গড়পড়তা খরচ একই থাকে, তাহা হইলে এই নিয়ম কার্যকরী হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নিয়মের প্রয়োগ বিরল। সাধারণতঃ, খেলনা, টুপি, গলাবন্ধনী, বিশুদ্ধ পশমের কম্বল প্রভৃতি হস্ত নির্মিত উৎপাদন শিল্পে এই নিয়মের কার্যকারিতা দেখা যায়।

পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি (Law of Variable Proportions): উৎপাদনের সাধারণ নিয়ম হইল পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি। ক্রম-হ্রাসমান আগম, সমবর্ধমান-আগম এবং ক্রম-বর্ধমান আগমের বিধি তিনটি প্রকৃত-পক্ষে পৃথক নিয়ম নয়, উহারা প্রত্যেকটি পরিবর্তনশীল অনুপাতবিধির সাধারণ ও সার্বজনীন প্রয়োগের এক একটা বিশেষ ক্রম বা পর্যায় বিশেষ।

উৎপাদন তত্ত্বের বিশেষ ক্রম হিসাবে, পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধি উৎপাদক কারক পরিমাণ (inputs) এবং উৎপন্ন দ্রব্য পরিমাণের মধ্যে (output) বাস্তব সম্পর্ক নির্দেশ করে। যদি দেশের শিল্প, কারিগরী বিজ্ঞান প্রথার (technology) কোন পরিবর্তন না হয়, যদি এক কিংবা একাধিক উৎপাদক কারক পরিমাণ স্থায়ী অবস্থায় থাকে, এবং ঐ স্থায়ী কারকের সংগে সম্মিলিত অপর কারকের পরিমাণ বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল

কারকের পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপন্ন দ্রব্যের কি আগম হইবে তাহাই এই বিধি বাখ্যান করে। বিভিন্ন কারকের বিশেষ কতিপয় অনুপাত আছে যাহা সংমিশ্রণদ্বারা উৎপাদন করিলে দ্রব্য আগম হইবে সর্বোচ্চ অথবা গড়পড়তা খরচ হইবে সর্বনিম্ন। যদি এক কিংবা একাধিক স্থায়ী বা সীমিত কারকের সহিত পরিবর্তনশীল অন্যান্য কারকের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি করিয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে কারক সংমিশ্রণের আদর্শ অনুপাত নষ্ট হইয়া যাইবে। ফলে, গড়পড়তা খরচ বৃদ্ধি পাইবে এবং মোট দ্রব্যের আগম বৃদ্ধি কারক বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমানুপাতিক -হইবে না। উৎপাদনের এই ক্রমে পরিবর্তনশীল অনুপাতের বিধিকে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি বলা হয়। ইহাই সকল উৎপাদনক্ষেত্রের চরম নিয়ম।

একাদশ অধ্যায়

চাহিদা (Demand)

চাহিদার অর্থ (Meaning of Demand) : অর্থবিদ্যায় 'চাহিদা'র অর্থ কোন দ্রব্য বা সেবাকৃত্যের জন্য নিছক ইচ্ছা বা আকাংখা প্রকাশ নয়। অর্থ-শাস্ত্রে চাহিদা বলিতে যুগপৎ তিনটি বিষয় বুঝায়। প্রথমতঃ, খাদকের কোন দ্রব্য বা কৃত্যের জন্য আকাংখা থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, সেই দ্রব্য বা কৃত্য ক্রয় করিবার জন্য খাদকের উপযুক্ত পরিমাণ অর্থ আয় থাকা চাই। তৃতীয়তঃ, খাদকের দ্রব্য বা কৃত্য ক্রয় করিবার মত অর্থ ব্যয় করিতে আগ্রহ বা ইচ্ছা থাকা চাই।

দ্রব্য বা কৃত্য মূল্যের সহিত চাহিদার সম্বন্ধ রহিয়াছে। দ্রব্য মূল্য বা কৃত্য মূল্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হইয়া কেহই তাহার চাহিদার পরিমাণ নির্ধারণ করে না। সাধারণতঃ, বাজার মূল্য কমতি হইলে, চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ; আবার বাজার মূল্য বাড়তি হইলে, চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পায়। বাজার মূল্যের তারতম্যানুসারে চাহিদার পরিমাণের পরিবর্তন হয়। এইরূপ, কোন এক নির্ধারিত সময়ে বিভিন্ন বাজার মূল্যে দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণের যে চাহিদা হয়, তাহা যদি আমরা লিপিবদ্ধ করি, তাহা হইলে তাহাকে চাহিদা সূচী (Demand Schedule) বলা যায়। মানুষের চাহিদার পরিমাণ শুধু বাজার মূল্যের উপরই নির্ভর করে না।

চাহিদা সূচী (Demand Schedule)

আরও অনেক কারণের জন্য চাহিদার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে; কিন্তু

ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা সূচী (Individual Demand Schedule) ও বাজারের চাহিদা সূচী (Market Demand Schedule)

আমরা যখন কাহারও চাহিদা সূচী ধার্য করি, তখন শুধু দ্রব্য মূল্যের পরিবর্তন চাহিদাকে কতটা প্রভাবান্বিত করে তাহাই ধরিয়া থাকি; অন্য যে সকল কারণ চাহিদাকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে তাহা সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করি। কোন **ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা সূচী** হইল সেই তালিকা যাহা-দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি কোন্ কোন্ বাজার মূল্যে কত কত পরিমাণ দ্রব্য সে ক্রয় করিবে। ব্যক্তি বিশেষের চাহিদা সূচীর একটি নমুনা দেওয়া গেল।

(ব্যক্তিবিশেষের চাহিদা সূচীর নমুনা)

প্রতিমণের বাজার মূল্য	চাহিদার পরিমাণ
২০	৩০ মণ
১৫	৫০ ,,
১০	৬৬ ,,
৫	৭০ ,,

ব্যক্তিবিশেষের চাহিদাসূচী হইতে আমরা **বাজারের চাহিদা সূচী (Market Demand Schedule)** নির্ণয় করিতে পারি। গোটা বাজারের সকল ব্যক্তির চাহিদার সমষ্টিই বাজারের চাহিদাসূচী।

অবশ্য বাজার চাহিদাসূচী নিখুঁতভাবে নির্ণয় করার অসুবিধা আছে। কেননা, বাজারের বিভিন্ন ক্রেতার চাহিদার প্রকৃতি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং বিভিন্ন ব্যক্তির চাহিদাসূচীও বিভিন্নমুখী হইতে বাধ্য। কিন্তু এই অসুবিধা সত্ত্বেও উপরি উক্ত নিয়মানুসারে মোটামুটিভাবে বাজারের চাহিদা সূচী তৈয়ার করা সম্ভব।

মনে রাখিতে হইবে, উপরে যে চাহিদাসূচীর নমুনা আমরা দিলাম উহা কাল্পনিক—বাস্তব নহে। কোন এক বিশেষ সময়ের বাজার মূল্য কি এবং সেই মূল্যে চাহিদার পরিমাণ কতটা হইতে পারে, তাহা আমরা জানিতে পারি; কিন্তু অন্যান্য বিভিন্ন মূল্যে চাহিদার পরিমাণ কি হইবে, তাহা আমরা কল্পনাদ্বারা অনুমান করিতে পারি মাত্র।

চাহিদা-বক্র রেখা (Demand Curve) : চাহিদাসূচীর জ্যামিতিক

প্রতিচ্ছবিই চাহিদা-বক্র রেখা। নিম্নে চাহিদা রেখাদ্বারা উপরের চাহিদা-সূচী নির্দেশ করা গেল।
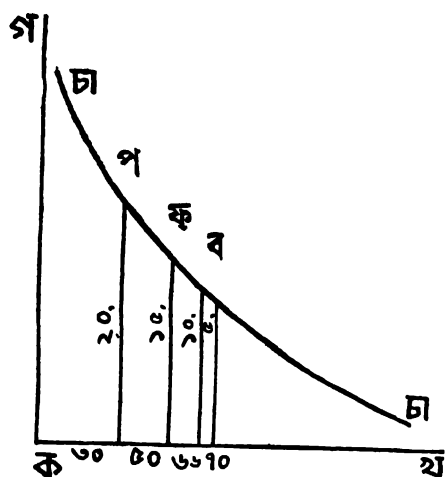
৫ম চিত্র

ক খ অক্ষ চাহিদার বিভিন্ন পরিমাণ (মণ হিসাবে) সূচক। ক গ অক্ষ দ্রব্য মূল্য ইংগিত করে। যখন এক মণ দ্রব্যের মূল্য ২০৲ তখন চাহিদার পরিমাণ ৩০ মণ। যখন মণ প্রতি দ্রব্য মূল্য ১৫৲ তখন চাহিদার পরিমাণ ৫০ মণ। যখন মণপ্রতি মূল্য ১০৲ তখন চাহিদার পরিমাণ ৬৬ মণ। যদি প ফ ব বিন্দু সংযোগ করা যায়, তাহা হইলেই চা চা চাহিদা রেখাচিত্র অংকিত হইল।

চাহিদার নিয়ম (Law of Demand) : খাদকের চাহিদা আমরা দ্রব্য-মূল্যের সম্পর্কে বুঝি। দ্রব্যমূল্য ও চাহিদার সম্পর্ককে ভিত্তি করিয়া অধ্যাপক মার্শাল একটি নিয়ম খাড়া করিয়াছেন। উহাকে আমরা চাহিদার নিয়ম বলি। চাহিদা নিয়মের সারমর্ম এই যে, দ্রব্যমূল্য ও চাহিদা পরিমাণের পরিবর্তন বিপরীতমুখী : যদি অন্য সকল অবস্থার কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে দ্রব্য মূল্যের কম্তির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে ; আবার দ্রব্য মূল্যের বাড়্তির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণ হ্রাস পাইবে। অধ্যাপক মার্শালের কথায় বলা চলে : "Other things being equal, with a fall in the price, the demand for the commodity is extended, and with a rise in the price, the demand is contracted." মনে রাখিতে হইবে যে, চাহিদার নিয়ম দ্রব্যমূল্য ও চাহিদা পরিমাণের **গুণানুসার সম্বন্ধ বুঝায় মাত্র, পরিমাণবাচক সম্বন্ধ বুঝায় না।** (The law of demand states a qualitative relation between the prices prevailing in a market and the amount demanded at each price.)। দ্রব্য মূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে চাহিদা বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস

হয়, চাহিদার নিয়ম তাহাই শুধু বুঝায় ; কিন্তু চাহিদার পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পায় বা কতটা হ্রাস পায় তাহা বুঝায় না।

চাহিদার নিয়ম প্রয়োগ বক্ররেখাদ্বারা দেখান যায়। পূর্বে অংকিত চাহিদা বক্ররেখার চিত্রই আমাদের একটা সুস্পষ্ট ধারণা দেয় যে, কেমন করিয়া দ্রব্যমূল্য কম্‌তির সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। সাধারণতঃ চাহিদা বক্ররেখা ডানদিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়। ইহার কারণ এই যে, দ্রব্য পরিমাণের খাদন বৃদ্ধির সংগে, দ্রব্যের ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পায় এবং ক্রয় দর ক্রমাগত কমিতে থাকে। অবশ্য ক্ষেত্র বিশেষে, চাহিদার রেখা নিম্নগামী ঢালু নাও হইতে পারে। যেমন, খাদক যদি কোন দ্রব্য হইতে পূর্ণ উপযোগ পূর্বেই লাভ করিযা থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের মূল্য হ্রাস হইলেও খাদকের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে না।

চাহিদার নিয়মের কতিপয় অনুমান (Assumptions underlying the Law of Demand) : অধ্যাপক মার্শাল চাহিদার নিয়ম ব্যাখ্যান করিবার সময় বলিয়াছেন যে, যদি অন্য কোন অবস্থার পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলেই দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণও বিপরীতমুখী হইবে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে অন্যান্য অবস্থার পরিবর্তন না হইয়া পারে না। চাহিদার নিয়মটি তাহা হইলে কয়েকটি কল্পনা বা অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে।

প্রথমতঃ, এই নিয়মে অনুমিত হইয়াছে যে, খাদকের আয় স্তর অপরিবর্তনীয় এবং তাহার অর্থ, আয়ের প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility of money) বিভিন্ন পণ্য একক খরিদ করা সত্বেও একই থাকে। খাদকের আয় স্তরের উঠানামা, কিংবা তাহার অর্থ আয়ের উপযোগের হ্রাস-বৃদ্ধি যে তাহার চাহিদা পরিমাণের অদল-বদল করিতে পারে, অধ্যাপক মার্শাল এই বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করিয়াছেন। অধ্যাপক হিকস্ (Hicks), অ্যালেন (Allen) প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের দুইটি প্রভাব (effects) নির্দেশ করিয়াছেন : (১) আয়ের উপর প্রভাব (income effect) এবং (২) পরিবর্তকতার উপর প্রভাব (substitution effect)। প্রথমতঃ, দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে খাদকের সাধারণ আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়। পূর্বের চাইতে অপেক্ষাকৃত কম্‌তি মূল্যে একই দ্রব্য ক্রয় করিবার সুযোগ হওয়ায়, তাহার আয় স্তর বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইলে, খাদক অন্য

অপরিবর্তনীয় আয় স্তর ও অর্থ উপযোগ কল্পনা

সামগ্রীর পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত ঐ সস্তা সামগ্রী পরিবর্তক হিসাবে অধিক পরিমাণে খরিদ করে। দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের এই দুইটী প্রভাব যে খাদকের চাহিদার পরিমাণ প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তাহা চাহিদার নিয়মে অস্বীকার করা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, চাহিদার নিয়মে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, খাদকের আচার ব্যবহার, আদবকায়দা, রুচি, পছন্দক্রমের কোন ব্যতিক্রম হয় না।

তৃতীয়তঃ, যে দ্রব্য সম্পর্কে চাহিদার নিয়ম প্রয়োগ করা হয়, উহার পরিবর্তক (substitute) এবং পরিপূরক (supplementary) সামগ্রীর বাজার দামের কোন অদল-বদল হইবে না; তাহাও মানিয়া লওয়া হইয়াছে। নূতন কোন পরিবর্তক সামগ্রীর বাজারে আর প্রচলন হইবে না, তাহাও এই বিধিতে কল্পনা করা হইয়াছে।

চতুর্থতঃ, আরও অনুমান করা হইয়াছে যে, দ্রব্যমূল্যের আর কোন পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। যদি দ্রব্যমূল্য ক্রমাগত বৃদ্ধিই পাইতে থাকে, তাহা হইলে খাদকগণ শংকাব্যাকুল হইয়া ভবিষ্যতের রসদ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে চড়তি দামেও চাহিদার সম্প্রসারণ করিবে।

পরিশেষে, যে দ্রব্য সম্পর্কে চাহিদার নিয়ম প্রযোজ্য, উহার যে বিশেষ ধরণের একটা ইজ্জত (prestige value) থাকিতে পারে, তাহা অনুমান করা হয় না। যদি কোন দ্রব্যের মূল্য হ্রাসের সংগে সংগে খাদকের কাছে উহার ইজ্জত কমিয়া যায়, অর্থাৎ উহা নিকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সে ক্ষেত্রে চাহিদার নিয়ম প্রযোজ্য হইবে না—দ্রব্যমূল্য কমিলেও চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না।

উপরি উক্ত যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া চাহিদা বিধির ব্যাখ্যান করা হইয়াছে, উহাদের প্রায় সমস্তই অবাস্তব এবং চাহিদা নিয়মের ব্যত্যয় বিশেষ।

চাহিদা নিয়মের ব্যত্যয় (Limitations of law of demand)

বাস্তব ক্ষেত্রে ঐ অনুমানগুলির প্রত্যেকটির অদল-বদল হয় এবং এই অদল-বদলের সংগে সংগে খাদকের চাহিদার পরিবর্তন হয়। চাহিদা একমাত্র বাজার মূল্যের দ্বারাই প্রভাবান্বিত হয় না। আরও অনেক বিষয়দ্বারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধি হইতে পারে।

চাহিদার পরিবর্তন (Changes in Demand): বর্তিষ্ণু (static) অর্থ ব্যবস্থায় দ্রব্যমূল্যের নিরূপে চাহিদার পরিবর্তন বক্ররেখাদ্বারা নির্ধারণ

করা যায় বটে, কিন্তু প্রগতিশীল বাস্তব অবস্থায় চাহিদার পরিবর্তন আরও অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, প্রকৃত আয়ের পরিবর্তন: যদি খাদক সম্প্রদায়ের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সাধারণতঃ তাহাদের চাহিদা বাড়িবে। কিন্তু বাজার মূল্য হ্রাস প্রাপ্তির সংগে যদি কোন দ্রব্য নিকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে খাদকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইলেও ঐ দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে না। **দ্বিতীয়তঃ,** দেশের জনসংখ্যার পরিবর্তনেও চাহিদার পরিমাণ কমবেশী হইতে পারে। **তৃতীয়তঃ,** পরিবর্তক দ্রব্যের (substitutes) বাজার দরের উঠা-নামা ও চাহিদার পরিমাণ নিয়মিত করিতে পারে। যদি রেডিও গ্রামোফোনের পরিবর্তক দ্রব্য হয়, আর রেডিওর বাজার দাম হ্রাস পায়, তাহা হইলে লোকে গ্রামোফোনের পরিবর্তে রেডিও-ই ক্রয় করিবে; ফলে, গ্রামোফোনের চাহিদা কমিয়া যাইবে। **চতুর্থতঃ,** ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি পরিবর্তন এবং উৎপাদন পদ্ধতির অদল-বদলের সংগে সংগে চাহিদার পরিমাণও কম বেশী হইতে পারে। ব্যবসায় বাণিজ্যের অবস্থা যদি স্বচ্ছল হয়, কিংবা উৎপাদন পদ্ধতির উন্নয়ন হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ লোকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পাইবে এবং প্রকৃত আয়ের বৃদ্ধির সংগে সংগে লোকের চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে। অবশ্য ধনিক সম্প্রদায়ের আয় বৃদ্ধির ফলে তাহাদের ভোগ্যদ্রব্যের চাহিদা-পরিমাণ সমানুপাতিকভাবে বাড়ে না। কিন্তু তাহাদের উৎপাদক দ্রব্যের চাহিদা অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। **পঞ্চমতঃ,** চাহিদা লোকের ফ্যাশন্, রুচি ও পছন্দক্রমের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। **পরিশেষে,** দেশের ধন বণ্টনের পরিবর্তনও চাহিদার পরিমাণ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। সুষম ধনবণ্টনদ্বারা যদি আর্থিক বৈষম্য হ্রাস করা যায়, তাহা হইলে জনসাধারণের অর্থ-আয়ের উন্নতি হইয়া খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে; এবং তাহাদের ভোগ্য বস্তুর চাহিদার পরিমাণও বাড়িবে।

দ্রব্য পরিমাণের চাহিদা বৃদ্ধি এবং চাহিদা বৃদ্ধি (An increase in the amount demanded and an increase in demand): দ্রব্য পরিমাণের চাহিদা বৃদ্ধির অর্থ এবং শুধু চাহিদা বৃদ্ধির অর্থ এক নহে। যখন দ্রব্য পরিমাণের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে; দ্রব্যমূল্য হ্রাস হইয়াছে বলিয়াই উহা সম্ভব হইয়াছে। একই চাহিদা বক্ররেখাদ্বারা এই অবস্থা দেখান চলে। কিন্তু যখন চাহিদার বৃদ্ধি পায়, তখন বুঝিতে হইবে যে, উহার

কারণ দ্রব্যমূল্যের হ্রাস নয়। দ্রব্যমূল্য যদি বৃদ্ধিও পায়, তাহা হইলেও অনেক সময় চাহিদা একই থাকে। এই অবস্থাকেও চাহিদা বৃদ্ধি বলে। এই অবস্থা অনেক কারণে হইতে পারে: যেমন, খাদকের আয় বৃদ্ধি, তাহার ফ্যাশন বা রুচির উন্নয়ন, দ্রব্যের বাজারমূল্যের পরিবর্তন প্রভৃতি। খাদকের চাহিদা বৃদ্ধি একই বক্ররেখাদ্বারা দেখান চলে না। এ অবস্থা দেখাইতে হইলে নূতন আর একটি চাহিদা বক্ররেখা অংকিত করিতে হয়—মূল বক্ররেখার উপরে ডানপাশে উহা অবস্থান করিবে।

৬ষ্ঠ চিত্র

৬ষ্ঠ চিত্রে দ্রব্য পরিমাণের চাহিদা বৃদ্ধি একই বক্র-রেখাদ্বারা দেখানো গেল। যখন বাজার মূল্য **ম প**, তখন চাহিদার পরিমাণ **ক ম**। যখন দ্রব্যমূল্য হ্রাস পাইয়া **ম১ প১** হইবে, তখন দ্রব্য পরিমাণের চাহিদাও বৃদ্ধিপাইয়া **ক ম১** হইবে।
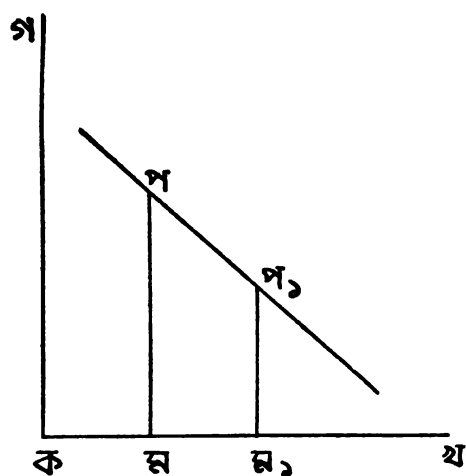
৭ম চিত্রে চাহিদার বৃদ্ধি নূতন আর একটি বক্ররেখা **চ১ চ১** চিত্র অংকন করিয়া দেখান হইল। যখন বাজার মূল্য **ম প**, তখন চাহিদার পরিমাণ **ক ম**। দ্রব্যমূল্য বাড়িয়া যখন **ম প১** হইবে, তখনও চাহিদার পরিমাণ ঠিক **ক ম** হইলে খাদকের চাহিদা বৃদ্ধি হইয়াছে বলা যায়। এই চাহিদা বৃদ্ধি **চ চ** বক্ররেখাদ্বারা দেখান সম্ভব নয়; নূতন বক্ররেখা **চ১ চ১** এই চাহিদা বৃদ্ধি সূচক।
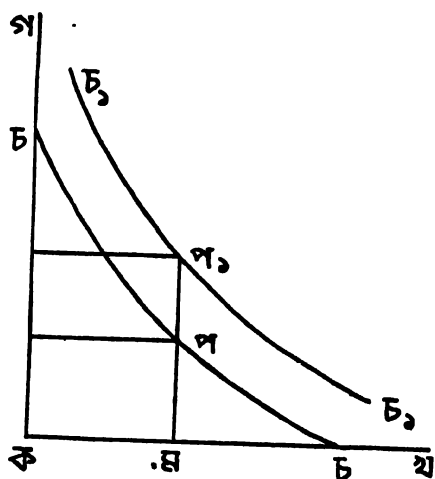
৭ম চিত্র

চাহিদা উঠা-নামার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Demand Changes)।

চাহিদার নম্যতা (Elasticity of Demand): আমরা দেখিয়াছি, দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে চাহিদা পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। কিন্তু চাহিদা পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির হার সকল দ্রব্যের বেলায় বা সকল অবস্থায় এক হয় না। দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে চাহিদা পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি যে হারে হয়, তাহারই পরিমাপ হইল চাহিদা-নম্যতা। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, চাহিদার নিয়ম (law of demand) দ্রব্যমূল্য ও চাহিদা পরিমাণের গুণানুসারে সম্বন্ধ নির্ধারণ করে। কিন্তু দ্রব্যমূল্য ও চাহিদা পরিমাণের পরিমাণ-বাচক (quantitative) সম্বন্ধ নির্ধারণ করে চাহিদা-নম্যতা। (The elasticity of demand expresses a quantitative relation between the changes in prices and changes in the amount of demand.)। দ্রব্য মূল্যের পরিবর্তনের সংগে সংগে দ্রব্যের চাহিদার গতি কোন দিকে যাইবে—ইহা বৃদ্ধি পাইবে না হ্রাস পাইবে—তাহার ইংগিত দেয় চাহিদার নিয়ম। কিন্তু চাহিদার নম্যতাদ্বারা আমরা বুঝি, মূল্যের পরিবর্তনে সঠিক কতটা পরিমাণ দ্রব্যের চাহিদা হ্রাসবৃদ্ধি হইবে।

চাহিদার নিয়ম ও চাহিদার নম্যতা

চাহিদা নম্যতার পরিমাপ (Measurement of Elasticity of Demand): চাহিদা নম্যতার ধারণা সাধারণের কাছে মোটেই সুস্পষ্ট নয়। তাহারা মনে করে যে, সামান্য বাজার দরের পরিবর্তনে চাহিদা পরিমাণের হ্রাসবৃদ্ধি যদি অত্যধিক হয়, তাহা হইলে চাহিদা নম্য হইবে। অপর পক্ষে, বাজার দরের পারবর্তনে, চাহিদা পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি সামান্য হয়, তাহা হইলে চাহিদা অনম্য (inelastic demand) হইবে। কিন্তু এই ভাবে চাহিদার নম্যতা পরিমাপ করা সঠিক হইতে পারে না।

অধ্যাপক মার্শাল চাহিদা-নম্যতা পরিমাপ করিবার জন্য একটি প্রণালী বাতলাইয়াছেন—উহাকে ব্যয়-প্রণালী (outlay method) বলা চলে। খাদকের মোট ব্যয় নির্ধারণ করা হয় দ্রব্য মূল্যকে ক্রীত, দ্রব্য পরিমাণদ্বারা গুণ করিয়া (price per unit × number of units sold)। দ্রব্য মূল্য

পরিবর্তনের সংগে সংগে খাদকের মোট ব্যয় এক থাকিতে পারে, বাড়িতে পারে কিংবা কমিতে পারে। যেমন :

মণ প্রতি বাজার-মূল্য	খরিদ দ্রব্য পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪৲	৪০০ মণ	১৬০০৲
২৲	৮০০ মণ	১৬০০৲
৮৲	২০০ মণ	১৬০০৲

এই উদাহরণে আমরা দেখি, বাজার দামের হ্রাসবৃদ্ধি হইলেও সকল ক্ষেত্রেই মোট ব্যয়ের পরিমাণ সমান হইয়াছে। এইরূপ যদি দ্রব্যমূল্যের পরিবর্তন সত্ত্বেও, খাদকের মোট ব্যয়ের কোনই অদল বদল না হয়, তাহা হইলে উহাকে **চাহিদার একক নম্যতা** (Unit-Elasticity of Demand) বলা যায়। আবার,

মণ প্রতি বাজার মূল্য	খরিদ দ্রব্য পরিমণ	মোট ব্যয়
৪৲	৪০০ মণ	১৬০০৲
২৲	৯০০ মণ	১৮০০৲
৮৲	২৫০ মণ	২০০০৲

এই উদাহরণে আমরা দেখি যে, বাজার মূল্যের কম্‌তি এবং বাড়তি—এই দুই অবস্থাতেই খাদকের মোট ব্যয় মূল ব্যয়ের চেয়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই দুই অবস্থাতেই চাহিদার নম্যতা একক নম্যতার চেয়ে অধিক। চাহিদার এই দুই অবস্থাকেই **চাহিদার নম্যতা** (Elasticity of Demand) বলা যায়।

মণ প্রতি বাজার মূল্য	খরিদ দ্রব্য পরিমাণ	মোট ব্যয়
৪৲	৪০০ মণ	১৬০০৲
২৲	৬৫০ মণ	১৩০০৲
৮৲	১৫০ মণ	১২০০৲

এই উদাহরণে আমরা দেখি, বাজার মূল্যের কি বৃদ্ধি, কি কম্‌তি হোক্, খাদকের মোট ব্যয় তাহার মূল ব্যয়ের চাইতে হ্রাস পাইয়াছে। এই দুই অবস্থাকেই আমরা অনম্য চাহিদা (Inelasticity of Demand) বলিতে পারি।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের অনুপাত ও চাহিদা পরিমাণ পরিবর্তনের অনুপাত দেখিয়া চাহিদার নম্যতা নির্ধারণ করেন। তাঁহাদের মতে

$$\text{চাহিদা নম্যতা} = \frac{\text{চাহিদার পরিমাণ পরিবর্তনের অনুপাত}}{\text{দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের অনুপাত}}$$

যদি দ্রব্যমূল্য ২% হারে বদলায় আর চাহিদাও বদলায় ২% হারে, তাহা হইলে
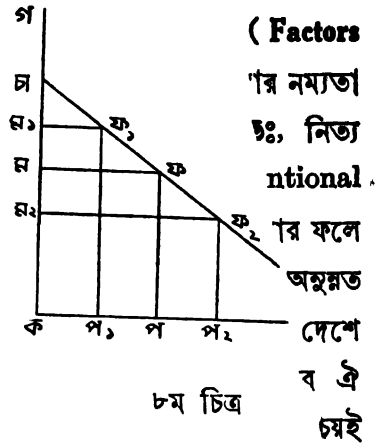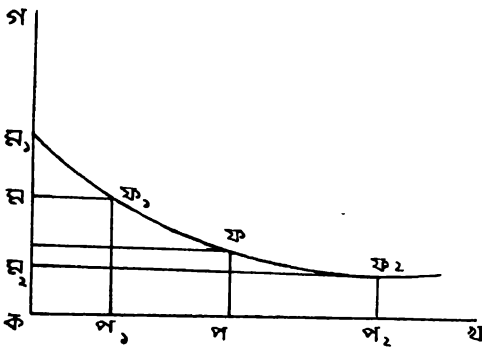
পরিবর্তনে যেমন বিদ্যুৎশক্তি রকমারি কাজে ব্যবহৃত হয়: ইহা আলো জ্বালায়, পাখা চালায়, রন্ধনকার্যের সহায়তা করে ইত্যাদি। এই প্রত্যেকটির ব্যবহারেই বিদ্যুৎ শক্তির পরিবর্তক রহিয়াছে—যেমন রন্ধনকার্যে বিদ্যুৎ শক্তির পরিবর্তে গ্যাস ব্যবহার করা চলে, আলো জ্বালিতে বিদ্যুৎশক্তির পরিবর্তে কেরোসিন তৈল ব্যবহার করা চলে। যদি বিদ্যুৎ শক্তির বাজার দাম কমে, (আর যদি পরিবর্তক দ্রব্যের দাম একই থাকে) তাহা হইলে পরিবর্তকের চাহিদা হ্রাস পাইয়া বিদ্যুৎ শক্তির চাহিদা খুব বৃদ্ধি পাইবে।

পঞ্চমতঃ, যে সকল দ্রব্যের সাম্প্রতিক ব্যবহার স্থগিত রাখা সম্ভব, উহাদের চাহিদা নম্য হয়। যেমন, বাড়ি নির্মাণের মাল মশলার দাম যদি বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে লোকে বাড়ি নির্মাণস্থগিত রাখিবে, তাহার ফলে মাল মশলার চাহিদা অত্যন্ত হ্রাস পাইবে।

ষষ্ঠতঃ, জিনিষের বাজার দাম যদি অত্যন্ত কম হয়, কিংবা অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে উহার চাহিদা অনম্য হইবে। লবণ একটি স্বল্পমূল্য দ্রব্য। উহার বাজার মূল্যের খুব বাড়তি কমতি চাহিদা পরিমাণের বিশেষ অদল বদল করিতে পারে না।

পরিশেষে, ব্যবহার বিশেষে একই দ্রব্যের চাহিদা নম্য অথবা অনম্য হইতে পারে। যেমন জল যখন পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয় তখন উহার চাহিদা অনম্য ; কিন্তু স্নানের জলের চাহিদা নম্য।

চাহিদা নম্যতার বিভিন্নরূপ (**Different forms of elasticity of demand**) : আমরা যে চাহিদার নম্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিলাম উহাকে **মূল্য-নিরিখে চাহিদার নম্যতা বলা হয়** (**Price-elasticity of demand**)। বাজার মূল্য পরিবর্তনের অনুপাতে চাহিদার হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাত হার কি হয়, তাহাই এই প্রকার চাহিদা নম্যতা ইংগিত করে। ইহার গাণিতিক পরিমাপসূত্রঃ

$$\text{মূল্য-নিরিখে চাহিদার নম্যতা} = \frac{\text{চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত}}{\text{মূল্য পরিবর্তনের অনুপাত}}$$

আয়-নিরিখে চাহিদার নম্যতা (**Income-elasticity of demand**) : খাদকের আয়স্তরের উঠানামার সংগে সংগেও তাহার চাহিদা পরিমাণের পরিবর্তন হইতে পারে। খাদকের অর্থআয় যদি বৃদ্ধি পায়, আর দ্রব্যমূল্যের যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ বাড়িবে। অর্থআয়ের উঠানামার অনুপাতে খাদকের চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত হার কি হয়, তাহা

আয় নিরিখে চাহিদার নম্যতা ইংগিত করে। পরিমাপ সূত্র অনুসারে,

$$\textbf{আয়-নিরিখে চাহিদার নম্যতা} = \frac{\textbf{চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত}}{\textbf{আয় পরিবর্তনের অনুপাত}}$$

মনে রাখিতে হইবে, অনেক বিশেষ অবস্থায় আয়ের পরিবর্তনের সংগে সংগে দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি নাও হইতে পারে। আয় বৃদ্ধির ফলে অনেক খাদক উচ্চ আয়স্তরে উন্নীত হয়; তখন অনেক খাদ্যবস্তু তাহাদের কাছে নিকৃষ্ট মনে হইতে পারে, যাহার জন্য উহাদের চাহিদা বৃদ্ধি না হইয়া উৎকৃষ্টতর দ্রব্যের চাহিদা বাড়িতে পারে। যেমন, বিলাতে নিম্ন স্তরের মজুর শ্রেণী সাধারণতঃ রুটীর সঙ্গে মারগারিন (margarine) ব্যবহার করে। যদি তাহাদের আয় বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মারগারিনের চাহিদাই যে অবশ্য বাড়িবে তাহা নহে। শ্রমিকের অর্থ আয় উন্নতির ফলে মারগারিন্ তাহাদের কাছে নিকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া মনে হইতে পারে এবং উহারা মারগারিনের পরিবর্তে মাখন খাইতে আরম্ভ করিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মারগারিনের চাহিদা হ্রাসই পাইবে।

মিথ-চাহিদার নম্যতা (Cross-elasticity of Demand) : একটি দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তনের ফলে অন্য আর একটি দ্রব্যের চাহিদার অদল বদলের যে হার, তাহাকে মিথ চাহিদার নম্যতা বলে। যদি দুইটি দ্রব্য একে অন্যের পরিবর্তক (substitute) হয়, কিংবা যদি দুইটি অনুপূরক (complementary) দ্রব্য হয়, তাহা হইলে উহাদের চাহিদার বেলায় মিথ নম্যতা দৃষ্ট হয়। যেমন, চা ও কফি একে অন্যের পরিবর্তক। যদি বাজারে কফির দাম হ্রাস পায়, (আর চায়ের দামের কোন পরিবর্তন না হয়) তাহা হইলে চায়ের চাহিদা কমিবে। রুটী ও মাখনের চাহিদা সংযুক্ত (joint demand), অর্থাৎ উহারা দুইটি অনুপূরক সামগ্রী। রুটীর বাজার দাম কমিলে, মাখনের চাহিদা বাড়িবে। দুইটি দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তকতার গুরুত্ব যত বেশী হইবে, মিথ-চাহিদার নম্যতাও তত বৃদ্ধি পাইবে। মিথ-চাহিদা-নম্যতার গাণিতিক পরিমাপ সূত্র :

$$\textbf{মিথ-চাহিদার নম্যতা} = \frac{\textbf{চা এর চাহিদা পরিবর্তনের অনুপাত}}{\textbf{কফির মূল্য পরিবর্তনের অনুপাত}}$$

চাহিদা-নম্যতা ধারণার অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা—(Economic Importance of the Concept of Elasticity of Demand) : চাহিদা-নম্যতার ধারণাটি তত্ত্ব ও বাস্তবতার দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **প্রথমতঃ,** বাজার

দর নির্ধারণে এই ধারণাটি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোন দ্রব্যের বাজার দর নির্ণয় কালে বিক্রেতার চাহিদার প্রকৃতি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যাবশ্যক। চাহিদার নম্যতা ও উহার বক্ররেখা দেখিয়া বিক্রেতা দ্রব্যের চাহিদা সম্বন্ধে নির্ভুল ধারণা করিতে পারে। একচেটিয়া কারবারের পণ্য মূল্য নির্ধারণে চাহিদা-নম্যতার গুরুত্ব বিশেষভাবে দেখা যায়। একচেটিয়া কারবারী যখন বাজার মূল্য ধার্য করে, তখন তাহার উদ্দেশ্য থাকে সর্বোচ্চ মুনাফা শিকার। এই সর্বোচ্চ মুনাফা শিকার করিতে হইলে, যে সামগ্রীর চাহিদা নম্য উহার বাজার দর নিম্নস্তরে ধার্য করিতে হয়। নম্য চাহিদাযুক্ত সামগ্রীর বাজার দর যদি উচ্চ স্তরে ধার্য করা হয়, তাহা হইল ঐ দ্রব্যের খাদন অত্যন্ত হ্রাস পাইবে ও কারবারীর সর্বোচ্চ মুনাফা শিকার অসম্ভব হইবে। আবার, যে সামগ্রীর চাহিদা অনম্য, উহার বাজার দর একচেটিয়া কারবারী উচ্চ স্তরে ধার্য করে।

বাজার দর নির্ধারণে এই ধারণার প্রয়োগ

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল সামগ্রীর সংযুক্ত যোগান (joint supply), উহাদের বাজার দর নির্ধারণেও চাহিদা নম্যতার ধারণাটির প্রযোগ করিতে হয়। সংযুক্ত যোগান দ্রব্য একই অর্থ বিনিয়োগ দ্বারা একসংগে উৎপন্ন করা হয়। উহাদেব প্রত্যেটির উৎপন্ন খরচ পৃথকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। যেমন, কার্পাস তূলা ও তূলা বীজ এক সংগে উৎপন্ন হয ; তূলা ও বীজের উৎপন্ন খরচ পৃথক করা সম্ভব নয। এইরূপ স্থলে প্রত্যেকটি দ্রব্যের চাহিদা নম্যতানুসারে উহাদের বাজার দর স্থিরীকৃত হয়।

যে সকল সামগ্রীর সংযুক্ত যোগান উহাদের মূল্য নির্ধারণে এই ধারণার প্রয়োগ

তৃতীয়তঃ, সরকারের কর ব্যবস্থাযও চাহিদা নম্যতার কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের অর্থমন্ত্রী যখন কোন দ্রব্যের উপর কর চাপান, তখন ঐ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যদি ঐ দ্রব্যের চাহিদা নম্য হয়, তাহা হইলে করভার কবলিত উচ্চ মূল্যের ঐ দ্রব্য-ব্যবহার হ্রাস পাইবে। ফলে, ঐ কর হইতে সরকারী আয় আশাপ্রদ হইবে না। অপর পক্ষে, যদি দ্রব্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে উহার উপর নূতন কর ভার চাপাইলে বা কর বৃদ্ধি করিলে সরকারের আয় সংকোচ হইবে না। তবে সমাজ-কল্যাণের দিক হইতে নিত্যব্যবহার্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীয় উপরঃ (উহাদের চাহিদা সাধারণতঃ অনম্য) কর ভার চাপান বা বৃদ্ধি করা সমীচীন নহে।

কর ব্যবস্থার এই ধারণার কার্যকারিতা

অনুশীলনী

1. State and illustrate the law of demand. What are the limitations of the law of demand. ?
2. Analyse the factors causing changes in demand.
3. What is elasticity of demand ? How would you measure it ? Indicate the economic importance of this concept.
4. Show that (a) the law of demand states a (qualitative) relation between the prices prevailing in the market and the amount demanded at each price ; and (b) the elasticity of demand expresses a (quantitative) relation between the change in price and the corresponding change in the amount of demand. (C. U. B. A. '52)
5. Write short notes on : (a) Price-elasticity (b) Income elasticity and (c) Cross-elasticity of demand.

দ্বাদশ অধ্যায়

চাহিদার আরও বিশ্লেষণ (Further Analysis of Demand)

ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি—(Law of Diminishing Utility) : আমরা যখন চাহিদার নিয়ম আলোচনা করি তখন দেখিয়াছি যে, চাহিদার বক্ররেখা ডানদিকে ঢালু ভাবে নীচের দিক নামিয়া থাকে। ইহার কারণ ব্যাখ্যান করা যায় ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধিদ্বারা। এই নিয়মের সারমর্ম এই যে, একটি দ্রব্যের পরিমাণ যতই আমরা পাই, ততই ঐ দ্রব্যের উপযোগ ক্রমাগত আমাদের নিকট কমিতে থাকে। মানুষ প্রথম যখন একটি দ্রব্য ব্যবহার সুরু করে, তখন উহা তাহার অতি প্রয়োজনীয় অভাব পূর্তি করিয়া থাকে—উহা হইতে উপযোগও সে যথেষ্টই লাভ করে। কিন্তু ঐ দ্রব্যের পুঁজি সে যতই বৃদ্ধি করিতে থাকে, (এবং আর কোন অবস্থার যদি পরিবর্তন না হয়) তাহা হইলে দ্রব্যের উপযোগ ক্রমান্বয়ে তাহার কাছে হ্রাস পাইতে থাকিবে। যেমন, দারুণ গ্রীষ্মে এক গ্লাস শীতল পানীয় হইতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যথেষ্ট তৃপ্তি লাভ করিবে। কিন্তু তাহাকে যদি একই রকমের দ্বিতীয় গ্লাস পানীয়

দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহার উপযোগ প্রথম গ্লাসের তুলনায় কম হইবে। এইরূপ গ্লাসের পর গ্লাস একই পানীয় হইতে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তিরও উপযোগ ক্রমাগত হ্রাস পাইবে। অধ্যাপক মার্শালের কথায়: **The additional benefit which a person derives from an increase of his stock of a thing diminishes with every increase in the stock that he already has.**

আমরা দ্রব্য ব্যবহার করিয়া যে উপযোগ লাভ করি, তাহার পরিমাপ হইল সেই অর্থমূল্য যাহা আমরা উহা ক্রয় করিতে ব্যয় করি। কোন দ্রব্যের বিভিন্ন এককের (different units) জন্য সমান অর্থমূল্য দিতে আমরা নারাজ। দ্রব্যের প্রথম এককের জন্য আমরা সর্বোচ্চ অর্থমূল্য দেই, কেননা উহার উপযোগ আমাদের কাছে সর্বাধিক। যতই আমরা দ্রব্যের ক্রমিক একক ক্রয় করিতে থাক, ততই ক্রমিক উপযোগও হ্রাস পাইতে থাকে এবং আমরা অর্থমূল্যও ক্রমাগত কম দিতে থাকি। দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ক্রয়

প্রান্তিক একক
(Marginal unit)

করিতে করিতে শেষে এমন একটি এককে আসিয়া উপস্থিত হই, যখন ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত একক উপযোগবিহীন মনে হয়। যে শেষ একক পর্যন্ত আমরা দ্রব্য ক্রয় করিতে প্রস্তুত, তাহাকে প্রান্তিক একক (marginal unit) বলা হয়, এবং দ্রব্যের ঐ প্রান্তিক একক হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায় তাহাকে প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) বলা হয়। পার্শ্বে চিত্রাংকন দ্বারা ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি প্রদর্শিত হইল। **ক খ** অক্ষটি চাহিদা দ্রব্যের বিভিন্ন একক নির্দেশ করিতেছে। **ক গ** অক্ষ অর্থমূল্য ও উপযোগ ইংগিত করিতেছে। খাদক যখন প্রথম দ্রব্য একক **ক প** খরিদ করে, তখন সে অর্থমূল্য দেয় **প ফ**। যখন দ্বিতীয় একক **প প১** খরিদ করে
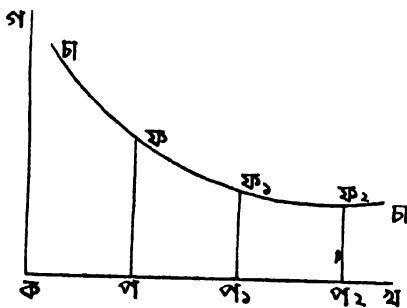
১৩শ চিত্র

তখন অর্থমূল্য দেয় **প১ ফ১**। **প১ ফ১** অর্থমূল্য **প ফ** অর্থমূল্যের চাইতে কম; কেননা, প্রথম এককের চেয়ে দ্বিতীয় একক হইতে খাদক অপেক্ষাকৃত কম উপযোগ লাভ করে। সেইরূপ তৃতীয় একক **প১প২**র জন্য সে আরও কম অর্থমূল্য দিতে রাজী; কেননা, তৃতীয় এককের উপযোগ দ্বিতীয় এককের

চেয়ে কম। ক, ক$_1$ ও ক$_2$ বিন্দু সংযোগ করিয়া যে বক্ররেখা টানা যায় উহাই ক্রমক্ষীয়মান উপযোগ বিধির প্রয়োগ চিত্রিত করে।

ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির অনুমান ও ব্যত্যয় (Assumptions and Limitations of the Law of Diminishing Utility): কতকগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল অনুমান সর্বথা সত্য ও বাস্তব নয় বলিয়া অনেক ক্ষেত্রে এই বিধিব ব্যত্যয় দেখা যায়।

প্রথমতঃ, এই নিয়ম ব্যাখ্যানে অনুমান করা হয় যে, খাদক দ্রব্যের বিভিন্ন একক উপযুক্ত পরিমাণে ব্যবহার করিয়া থাকে। যদি দ্রব্যের বিভিন্ন একক অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণের হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের পুঁজি বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমিক উপযোগ হ্রাস না পাইয়া বাড়িতে থাকে। যেমন, কয়লার বিভিন্ন একক যদি অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিমাণ হয়, তাহা হইলে কয়লার পুঁজি বাড়িলে উহার ক্রমিক উপযোগ হ্রাস না পাইয়া বৃদ্ধিই পাইতে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, খাদক যদি কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রব্যটি ব্যবহার করে, তাহা হইলেই কেবলমাত্র এই বিধিটি প্রযোজ্য হইবে। যদি দিনে কেউ দুইবার মাত্র আহার করে—একবার বেলা ১১টায় আর একবার ৪টায়, তাহা হইলে তাহার কাছে খাদ্যের দ্বিতীয় এককের উপযোগ হ্রাস পাইবে না।

তৃতীয়তঃ, এই নিয়মের আর একটি অনুমান এই যে, খাদকের আচার ব্যবহার, রুচি বা প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন ধরা হয় না। যদি একজন লোক অতিমাত্রায় মদ খায়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক প্রকৃতি বদলায়—তখন গ্লাসে গ্লাসে মদ খাইলেও তাহার ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পাইবে না।

চতুর্থতঃ, এমন অনেক সামগ্রী আছে যথা, প্রাচীন মুদ্রা, বিভিন্ন দেশের ডাক টিকিট প্রভৃতি, যাহার বেলায় এই নিয়মটি খাটে না। প্রাচীন মুদ্রা বা ডাক টিকিট সংগ্রহের পরিমাণ যতই বাড়ান যাক্ না কেন, উহা হইতে ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পাইবে না।

পঞ্চমতঃ, অনেকে বলেন যে, নিয়মটি সঠিক ভিত্তির উপর গঠিত নয়। কোন জিনিষের চাহিদার পরিমাণ ও উপযোগ শুধুমাত্র ঐ জিনিষের বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করে না—ব্যবহার্য অন্যান্য দ্রব্যের পরিমাণ ও উহাদের বাজার মূল্যের উপরও উহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল। একটি দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ শুধু উহার সম্ভাব্য উপযোগ ক্ষমতার দ্বারা নির্ধারিত হয় না। কোন

খাদকই পৃথকভাবে এক একটি দ্রব্য ক্রয় বা ব্যবহার করে না। আমাদের আয় হিসাবে আমরা প্রত্যেকে পারস্পরিক সম্পর্কিত অনুপূরক বিবিধ দ্রব্য ক্রয় ও ব্যবহার করিয়া থাকি। আমরা যদি একটি দ্রব্যই ক্রমাগত ক্রয় করিতে থাকি, তাহা হইলে অন্য দ্রব্য ক্রয় করিতে আমাদের অর্থ আয়ের কমতি হইবে। সীমিত আয়দ্বারা আমাদের বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হয়। একটি বিশেষ দ্রব্য ক্রয়ের জন্য আমরা অনির্দিষ্টভাবে ক্রমাগত অর্থমূল্য দিতে পারি ন'; কেননা, তাহা হইলে আমাদের অন্য ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার মত অর্থমূল্যের টান পড়িবে। কিন্তু এই মতবাদটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। কেননা, দ্রব্যের যদি কোন অর্থমূল্য নাও দিই, তাহা হইলে অনেক সময় আমরা দেখি যে, ঐ দ্রব্যের পুঁজি ব্যবহার যদি ক্রমাগত বাড়াইয়া যাওয়া যায়, তাহা হইলে উহার ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে।

ষষ্ঠতঃ, এই বিধির আর একটি ব্যত্যয় এই যে, উপযোগের পরিমাণ অর্থমূল্য-দ্বারা সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। ইহা অবশ্য সত্য যে, দ্রব্যপুঁজি বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমিক উপযোগ হ্রাস কতটা হয় তাহা আমরা সঠিকভাবে পরিমাপ করিতে পারি না; কিন্তু দ্রব্যপুঁজি বৃদ্ধির ফলে যে, ক্রমিক উপযোগ প্রকৃত কমিতে থাকে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পরিশেষে, এই নিয়মের বিরুদ্ধে আর একটা আপত্তি এই যে, ইহা শুধু নির্দেশ করে কেমন করিয়া পুঁজি বৃদ্ধির ফলে ক্রমিক উপযোগ হ্রাস পায়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, খাদকের কাছে দ্রব্যের উপযোগ হ্রাস-বৃদ্ধি শুধু উহার পুঁজি পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না, অন্য লোকের পুঁজি পরিমাণ-দ্বারাও খাদকের দ্রব্য উপযোগ নির্ধারিত হইয়া থাকে। যেমন, কোন সহরে দুইজন প্রাচীন মুদ্রা সংগ্রাহক প্রতিযোগী আছে। উহাদের দ্বিতীয় ব্যক্তির সংগ্রহ যদি হারাইয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম ব্যক্তির সংগ্রহের ক্রমিক উপযোগ, তাহার নিজের পুঁজি পরিমাণের হ্রাস-বৃদ্ধির অপেক্ষা না রাখিয়া স্বতঃই বৃদ্ধি পাইবে।

ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির প্রয়োজনীয়তা (Importance of the Law of Diminishing Utility): এই নিয়মের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ ও আপত্তি থাকিলেও অর্থনৈতিক আলোচনায় ইহার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রথমতঃ, দ্রব্যমূল্য নিরূপণে ইহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। দ্রব্যমূল্য নির্ণয় চাহিদা ও যোগানের নিয়মের কার্যকারিতার উপর নির্ভর করে। চাহিদা নিয়মের প্রয়োগ ব্যাখ্যান করা যায় আবার ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধিদ্বারা।

দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন উৎপাদক কারকগণের মধ্যে অর্থ আয় বণ্টন ধার্য করিতে ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির গুরুত্ব আছে। প্রত্যেক উৎপাদক কারকের চাহিদার দিক হইতে আয় স্থিরীকৃত হয় উহার প্রান্তিক উপযোগদ্বারা। কারকের প্রান্তিক উপযোগ নির্ধারণ করা হয় আবার ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির উপর ভিত্তি করিয়া।

পরিশেষে, এই নিয়মের প্রয়োগ দেশের করব্যবস্থায়ও প্রযোজ্য। বিধিটি কেবলমাত্র দ্রব্য পুঁজির বেলায় যে খাটে তাহা নহে, অর্থপুঁজি সম্পর্কেও ইহা সমভাবে কার্যকরী। মানুষের অর্থপুঁজি যতই বাড়িতে থাকে, তাহার কাছে অর্থের ক্রমিক উপযোগ ততই হ্রাস পায়। সেইজন্য ধনী ব্যক্তির কাছে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষাকৃত কম, গরীবের কাছে অর্থের প্রান্তিক উপযোগ অপেক্ষাকৃত বেশী। অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ধনী ব্যক্তির কাছে অপেক্ষাকৃত কম বলিয়া ধনী ব্যক্তি গরীবের চাইতে করভার অপেক্ষাকৃত বেশী বহন করিতে পারে। সুতরাং, ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি অনুক্রম করনীতির (Progressive Taxation) সমর্থক।

মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগ (Total Utility and Marginal Utility) : একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ব্যবহারদ্বারা যে বিভিন্ন পরিমাণ উপযোগ লাভ করা যায়, উহার সমষ্টিকে মোট উপযোগ বলে। দ্রব্যের এক একক ব্যবহার বৃদ্ধির ফলে মোট উপযোগের যে টুকু বৃদ্ধি হয়, তাহাকেই প্রান্তিক উপযোগ বলে। প্রান্তিক উপযোগ ভোগ্যদ্রব্যের প্রান্তিক একক ব্যবহারদ্বারা লাভ করা যায়। দ্রব্যের প্রান্তিক একক হইল আবার সেই অংশ যাহার বেশী দ্রব্য-একক খাদক বাজার মূল্যে কিনিতে নারাজ। খাদক যখন একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয় করে, তখন উহার প্রত্যেকটি এককের জন্য সমান পরিমাণ অর্থব্যয় করে না। যতই সে দ্রব্য একক ক্রয় বৃদ্ধি করে, ততই ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ নিয়ম অনুসারে, সে অর্থমূল্যও ক্রমাগত কম দিতে রাজী হয়। এইরূপ ক্রমাগত দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রয়করিতে করিতে সে এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছায়, যখন তাহার কাছে আর ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত একক ক্রয় করা মোটেই যুক্তিযুক্ত মনে হয় না; বরংচ সে অন্য দ্রব্য ক্রয় করার জন্য অর্থব্যয় করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে। দ্রব্যের যে একক ক্রয় করিয়া খাদক আর ঐ দ্রব্যের জন্য অর্থব্যয় করিবে না, তাহাকে প্রান্তিক ক্রয় (Marginal Purchase) বলে। এই

প্রান্তিক ক্রয় (marginal purchase)

প্রান্তিক ক্রয় হইতে যে উপযোগ লাভ করা যায় তাহাই প্রান্তিক উপযোগ। মনে রাখিতে হইবে যে, প্রান্তিক একক ক্রয় করিলে খাদকের লাভও হইবে না, লোকসানও হইবে না ; কেননা, বাজার মূল্য ও দ্রব্যের উপযোগ এই অবস্থায় সমান। নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের সম্বন্ধ বুঝান গেল।

এককের সংখ্যা	মোট উপযোগ (একক সংখ্যায়)	প্রান্তিক উপযোগ (একক সংখ্যায়)
১	২০	২০
২	৩৮	১৮
৩	৫৩	১৫
৪	৬৪	১১
৫	৭০	৬

উপরের উদাহরণে অনুমান করা যাইতেছে যে, খাদক কোন দ্রব্যের ৫ একক ক্রয় করিলে, তাহার প্রান্তিক উপযোগ ৬ এবং মোট উপযোগ (২০+১৮+১৫ +১১+৬)=৭০। মনে রাখিতে হইবে যে, খাদক যতই দ্রব্য একক ক্রয় বৃদ্ধি করিবে, ততই তাহার মোট উপযোগ বাড়িয়া যাইবে ; কিন্তু প্রান্তিক উপযোগ কমিতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, প্রান্তিক উপযোগকে আমরা পরিমাপ করি দ্রব্যমূল্যের দ্বারা ; দ্রব্যপুঁজি আমরা যতই ক্রয় করিতে থাকি, ততই ক্রমিক এককের চাহিদামূল্যও আমাদের কাছে হ্রাস পায় এবং প্রান্তিক উপযোগও কমিতে থাকে। ইহা প্রকাশ থাকে যে, দ্রব্যের মূল্য মোট উপযোগের উপর নির্ভর করে না। আবহাওয়াতে যে বাতাস উহার মোট উপযোগও অপরিমেয় ; কিন্তু উহার প্রান্তিক উপযোগ শূন্য হওয়ায়, বাতাসের কোন বাজার মূল্য নাই। বাজার মূল্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ।

প্রান্তিক উপযোগ ধারণার অর্থনৈতিক গুরুত্ব (Importance of the Concept of Marginal Utility) : অর্থবিদ্যায় প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটির গুরুত্ব যথেষ্ট। দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে এই ধারণার উপযোগিতা বিশেষভাবে দেখা যায়। খাদকের তরফ হইতে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ও বাজারমূল্য সমান। খাদক একটি দ্রব্যের বিভিন্ন একক ক্রমাগত ক্রয় করিতে করিতে এমন এক প্রান্তিক অবস্থায় পৌঁছায়, যেখানে দ্রব্য এককের উপযোগ ও বাজার মূল্য সমান হয়।

মনে রাখিতে হইবে, কোন দ্রব্যের প্রান্তিক একক কিংবা প্রান্তিক উপযোগ ধরাবাঁধা থাকে না—মূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে উহাদের পরিমাণেরও অদল বদল হয়। যদি দ্রব্যমূল্য বাড়তি হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক উপযোগও বেশী হইবে; আবার দ্রব্যমূল হ্রাস পাইলে, প্রান্তিক উপযোগও কমিবে।

অনেকে ভুলক্রমে বলেন যে, প্রান্তিক উপযোগ দ্রব্যমূল্য নির্ণয় করে। প্রকৃত পক্ষে, প্রান্তিক উপযোগ কিন্তু বাজার মূল্যের আসল অবস্থা ব্যাখ্যান করিতে পারে না। একটা আর একটার কারণ নয়। আসলে প্রান্তিক উপযোগ ও বাজারমূল্য উভয়েই দ্রব্য চাহিদা ও দ্রব্য যোগানের সম্বন্ধ ও কার্যকারিতাদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। দ্রব্যের প্রান্তিক একক এমন একটি বিন্দুকে নির্দেশ করে, যাহাদ্বারা মূল্য নির্ধারিত হয় না; কিন্তু প্রান্তিক একক বিন্দুতে মূল্য নির্ণয় হয়। মূল্য নির্ধারিত হয় গোটা চাহিদা ও গোটা যোগানের সাম্যাবস্থার দ্বারা। গোটা চাহিদা আবার নির্ধারিত হয় দ্রব্যের বিভিন্ন এককদ্বারা। এই বিভিন্ন এককের মধ্যে প্রান্তিক একক অন্যতম। চাহিদার দিক হইতে, অন্যান্য একক এবং প্রান্তিক এককের উপযোগ এক সংগে মিলিত হইয়া দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে।

আমরা দেখিয়াছি যে, বাজার মূল্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগের পরিমাপ, মোট উপযোগের নহে। মোট উপযোগ ও প্রান্তিক উপযোগের মধ্যে এই যে তফাৎ, ইহাদ্বারাই আমরা বুঝাইতে পারি কেন বাতাস অথবা জলের বিনিময় মূল্য একরূপ নাই বলিলেই চলে, অপর পক্ষে স্বর্ণের বিনিময় মূল্য এত উচ্চ কেন। বাতাস বা জলের মোট উপযোগ অপরিমিত, কিন্তু উহার প্রান্তিক উপযোগ নাই বলিয়া বিনিময় মূল্যও নাই। কিন্তু অপরপক্ষে, স্বর্ণের প্রান্তিক উপযোগ অধিক বলিয়া উহার বিনিময় মূল্যও উচ্চ।

প্রান্তিক উপযোগ ধারণার অনুমান ও ব্যত্যয় (Assumptions and Limitations of the Concept of Marginal Utility): প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি কতগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ঐ অনুমানগুলি অবাস্তব।

প্রথমতঃ, ধারণাটি অনুমান করে যে, খাদক একটি দ্রব্যের উপযোগ অন্য কোন দ্রব্য উপযোগের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করে না; যেন কোন দ্রব্যের উপযোগ অন্য সকল দ্রব্যের উপযোগের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও অসংলগ্ন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তাহা সত্য নয়। আমরা যখন কোন ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহার

করিয়া উহা হইতে উপযোগলাভ করি, তখন শুধু ঐ একমাত্র দ্রব্যটিই আমরা ব্যবহার করি না। একটি মাত্র দ্রব্যই আমাদের চরম তৃপ্তি দিতে পারে না। আমরা একই সময় নিবিড় সম্বন্ধযুক্ত অনুপূরক বহু দ্রব্য ব্যবহার করিয়া থাকি। সুতরাং একটি দ্রব্যের উপযোগ নির্ধারণ করিতে হইলে, অন্য সকল ভোগ্য দ্রব্যের উপযোগের নিরিখে উহা যাচাই করিতে হয়। কেননা, বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের উপযোগ নিবিড় সম্পর্ক সম্বলিত।

দ্বিতীয়তঃ, প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি আর একটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত এই যে; উপযোগ পরিমাপ যোগ্য এবং উহা পরিমাপ করিবার একমাত্র মাপকাঠি অর্থমূল্য। কিন্তু অর্থের মাপকাঠিতে উপযোগ সঠিকভাবে পরিমাপ করা অসম্ভব, কেননা উপযোগ হইল মানস পদার্থ আর অর্থ হইল পরিমাণবাচক বাস্তব মাপকাঠি মাত্র।

তৃতীয়তঃ, আর একটি অনুমানের উপর উপযোগ ধারণাটি বিশেষভাবে নির্ভর করে: প্রত্যেক দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের অব্যাহত (continuous) বক্ররেখা থাকিবে। ইহার অর্থ এই যে, দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের বিভিন্ন একক অপরিমেয় ক্ষুদ্র হইবে এবং দ্রব্যের বিভিন্ন একক একই সময়ে ব্যবহৃত হইবে; কিন্তু বাস্তব জীবনে এই অনুমান সত্য নহে। বিশেষ করিয়া টেকসই (durable goods) মালের বেলায় (যেমন, বাসগৃহ, কিংবা আসবাব পত্র) প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয়ের কোন প্রশ্নই উঠে না। কেননা, এই সকল দ্রব্য অপরিমেয় ক্ষুদ্র একক সমষ্টি হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ একযোগে গোটাভাবে ক্রয় করা হয়।

চতুর্থতঃ, এই ধারণাটি আরও অনুমান করে যে, খাদকের আয়স্তরের উপর দ্রব্যমূল্য পরিবর্তনের কোনই প্রভাব নাই (there is no income effect of price)। কিন্তু বাস্তবতঃ, দ্রবমূল্য হ্রাস পাইলে, খাদকের আয়স্তর বৃদ্ধি পায়, ফলে খাদকের চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ বাড়িতে থাকে।

পরিশেষে, প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি কল্পনা করে যে, খাদকের কাছে অর্থের উপযোগ সকল অবস্থাতেই এক থাকে। ইহাও বাস্তবতঃ সত্য নয়। দ্রব্য মূল্য হ্রাসের ফলে খাদকের অর্থ আয় যখন বৃদ্ধি পায়, তখন অর্থের প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে কমে। অর্থের প্রান্তিক উপযোগ কমিলে খাদক একই পরিমাণ দ্রব্যের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সক্ষম হয়; ফলে, সেই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে বাড়ে। কিন্তু তাহার

কাছে অন্যান্য দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কমিবে; কেননা, একটি দ্রব্য ক্রয়ে বেশী ব্যয় করিয়া অন্য সকল সামগ্রীর জন্য বেশী অর্থ মূল্য দিতে সে অসমর্থ হইয়া পড়িবে।

উপরি উক্ত অবাস্তব অনুমানগুলিই প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটির ব্যত্যয় বিশেষ। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ এই নিয়মের নানা অসংগতির জন্য ইহার পরিবর্তে **প্রান্তিক পক্ষপাত** (marginal preference) বা **প্রান্তিক পরিবর্তকতা** (marginal substitutability) ধারণাটি ব্যবহার করিয়াছেন। হিকস্, অ্যালেন (Hicks, Allen) প্রমুখ আর্থশাস্ত্রীগণ ধারণাটির নূতন নামাকরণ করিয়াছেন **পরিবর্তনের প্রান্তিক হার** (marginal rate of substitution) বলিয়া। আমরা পরে এই নূতন ধারণাটির বিষয়ে ব্যাপক আলোচনা করিব।

পরিবর্তকতার নিয়ম (Law of Substitution) : অর্থবিদ্যায় পরিবর্তকতার একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আমাদের অগণিত অভাব অভিযোগ একদিকে—আর একদিকে সীমিত অর্থ-আয় ও সম্পদ। কি করিয়া সীমিত অর্থ-আযদ্বারা আমরা অগণিত অভাব অভিযোগ পূরতি করি, সেই প্রশ্নের সমাধানই অর্থশাস্ত্র যোগায়। খাদক যখন ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করে তখন, সে উহার উপযোগ ও অর্থমূল্য তুলনা করিয়া দেখে। সে ততক্ষণ পর্যন্ত একটি দ্রব্য একক ক্রয় করিয়া যাইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উহার উপযোগ তাহার প্রদত্ত অর্থমূল্যের সমান হয়। যে প্রান্তিকে দ্রব্য উপযোগ ও অর্থমূল্য সমান হয়, সেই পর্যন্তই সে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিবে—উহার বেশী ক্রয় করিলে তাহার লোকসান হইবে; কেননা, সে অবস্থায় উপযোগের চেয়ে অর্থমূল্য হইবে বেশী। এই লোকসানের চেয়ে তাহার পক্ষে অর্থ ভিন্ন রকম দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করা অধিক লাভজনক হইবে। যখন সে পূর্ব দ্রব্যটি আর খরিদ করিয়া তাহার অর্থ আর একটি দ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিবে না, তখনই পরিবর্তকতার নিয়ম কার্যকরী হইবে। ভোগ্য দ্রব্য ব্যবহারে যখন এই নিয়মটির প্রয়োগ হয়, তখন উহাকে **সম প্রান্তিক উপযোগ বিধি** (law of equi-marginal utility) বলা হয়।

সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধি (law of equi-marginal utility)

প্রত্যেক বুদ্ধিমান খাদকই বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্য ক্রয়ে অর্থব্যয় এমন ভাবে নির্ধারণ করিতে চেষ্টা করে, যাহাতে তাহার তৃপ্তি হয় সর্বোচ্চ। এই উদ্দেশ্যে সে যে শুধু কোন দ্রব্য বিশেষের উপযোগ ও উহার অর্থমূল্যই তুলনা করিয়া দেখে তাহা নহে। বিভিন্ন দ্রব্য ক্রয়দ্বারা বিভিন্ন

উপযোগ পরিমাণ কি হয়, তাহাও তুলনা করিয়া দেখে। যদি সে দেখে, কোন একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ অপর একটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ হইতে বেশী, তাহা হইলে তাহার পক্ষে দ্বিতীয় দ্রব্যের পরিবর্তে প্রথম দ্রব্যটির বেশী পরিমাণ ক্রয় করা অপেক্ষাকৃত লাভজনক। তখনই প্রথম দ্রব্যটি দ্বিতীয় দ্রব্যের পরিবর্তক হিসাবে খরিদ করা হইয়া থাকে। এইরূপ আবার প্রথম দ্রব্যটি যতই পরিবর্তক হিসাবে খরিদ করা হয়, ততই ক্রমাগত উহার প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পাইতে থাকে; আর দ্বিতীয় দ্রব্যটির ক্রয় পরিমাণ যতই হ্রাস পায় উহার প্রান্তিক উপযোগ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত খাদকের নিকট দুইটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ সমান না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দ্বিতীয় দ্রব্যের পরিবর্তক হিসাবে প্রথম দ্রব্যটির খরিদ ও ব্যবহার-পরিমাণ খাদক বাড়াইতে থাকিবে। যে অবস্থায় ক্রয়দ্বারা সে দুইটি দ্রব্য হইতে সমান পরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিবে, সেই খরিদই তাহাকে সর্বোচ্চ তৃপ্তি দান ' ' ভাবে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য খরিদদ্বারা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করিবে তখনই, যখন বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে সমান হয়। এই সমপ্রান্তিক উপযোগের বিধিকে পরিবর্তকতার নিয়ম বলা হয় এই জন্য যে, এই নিয়মের কার্যকারিতার জন্য আমরা একটা দ্রব্য ব্যবহারের স্থলে অন্য দ্রব্যের ব্যবহার পরিবর্তন করিয়া থাকি। ইহাকে সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ (Doctrine of Maximum Satisfaction) আখ্যাও দেওয়া যায়। কেননা, পরিবর্তকতাবিধির প্রয়োগদ্বারাই আমরা আমাদের সীমিত অর্থ আয় বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে ব্যয় করিয়া সর্বোচ্চ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারি। বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্য হইতে সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন দ্রব্যের উপর ব্যয় বিন্যাস এমনভাবে করিতে হয়, যাহাতে বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ এবং যথাক্রমে তাহাদের বাজার মূল্য সমানুপাতিক হয়। অর্থাৎ

সর্বোচ্চ তৃপ্তির মতবাদ (Doctrine of Maximum Satisfaction)

$$\frac{\text{আমের প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{আমের মূল্য}} = \frac{\text{কলার প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{কলার মূল্য}} = \frac{\text{রুটীর প্রান্তিক উপযোগ}}{\text{রুটীর মূল্য}} = \ldots\ldots$$

পরিবর্তকতা নিয়মের গুরুত্ব ও প্রয়োগ (Importance and Application of the Law of Substitution): অর্থবিদ্যার বিভিন্ন বিভাগে প্রযোজ্য বলিয়া পরিবর্তকতার নিয়মটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ, ভোগ্যবস্তু ব্যবহারে এই নিয়মের যথাযথ প্রয়োগ আমরা

দেখিয়াছি। খাদনে সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করিতে হইলে বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের মধ্যে পরিবর্তন সাধন অবশ্যম্ভাবী। এই পরিবর্তন সাধনের দ্বারাই খাদক বিভিন্ন ভোগ্য দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ ব্যবহার-করিয়া সমান প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিতে পারে।

খাদনে (In Consumption)

দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদন ব্যবস্থাযও নিয়মটি কার্যকরী হয়। খাদক যেমন বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য বিভিন্ন পরিমাণে ক্রয় করে, তেমনি উৎপাদক বিভিন্ন কারকেব বিভিন্ন পরিমাণ সংমিশ্রণ ও বিনিযোগ করে। সে একদিকে যেমন প্রত্যেকটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা (marginal productivity) এবং উহাদের বাজার দাম মিলাইয়া দেখে, অন্যদিকে, বিভিন্ন কারক হইতে যে বিভিন্ন প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা পাওয়া যায় উহাদেরও তুলনামূলক যাচাই করে। যদি উৎপাদকের নিকট কোন একটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অন্য একটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে সে দ্বিতীয় কারকের বিনিময়ে প্রথম কারকটির বিনিয়োগ অধিক পরিমাণে করিতে থাকিবে। এইরূপ দ্বিতীয় কারকটির স্থলে প্রথম কারকটি সে ততক্ষণ পরিবর্তন করিতে থাকিবে, যতক্ষণ না এই দুইটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সমান হয়। সকল কারকের বিভিন্ন পরিমাণ বিনিয়োগ করিলে যখন উহাদের বিভিন্ন প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সমান হইবে, উৎপাদকের পক্ষে সেই অবস্থায় উৎপাদন করাই সর্বোচ্চ লাভজনক। এই রকমভাবে পরিবর্তকতার নিয়ম যখন উৎপাদনকার্যে কার্যকরী হয়, তখন উহাকে **সম-প্রান্তিক আগম-বিধি** (**Law of Euqi-Marginal Returns**) বলা চলে।

উৎপাদন কার্যে (In Production)

পরিবর্তকতার নিযমটি বিনিময কার্যেও প্রযোগ করা চলে। আমরা দ্রব্য-সামগ্রীর জন্য অর্থমূল্য দিয়া থাকি, তাহার কারণ উহাদের যোগান সীমিত। সাধারণতঃ, যে সকল দ্রব্যের যোগান টান অপেক্ষাকৃত অধিক, তাহাদের স্থলে আমরা যে সকল দ্রব্যের যোগান টান অপেক্ষাকৃত কম, সেই সকল দ্রব্য অধিক পরিমাণে ক্রয় করি। ইহার ফলে, অপেক্ষাকৃত অধিক যোগান টান সামগ্রীর সরবরাহ বৃদ্ধি পায় ও উহাদের বাজার মূল্য হ্রাস পায়।

বিনিময় কার্যে (In Exchange)

আয় সঞ্চয় ব্যাপারেও এই নিয়মের কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়। আমাদের অর্থ আয় সাম্প্রতিক খাদন ব্যয়ে ব্যয়িত হইতে পারে কিংবা

ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চিত হইতে পারে। সাধারণতঃ মানুষের কাছে ভোগ্যদ্রব্যের উপর সাম্প্রতিক অর্থব্যয় করাই অধিক আকর্ষণীয়। সঞ্চয় করিতে হইলে তাহাকে ভোগ্যবস্তুর উপর বর্তমান খাদন ব্যয় সংকোচন করিতে হয়। যদি অর্থ সঞ্চয়দ্বারা মানুষ অপেক্ষাকৃত অধিক উপযোগ লাভ করিবে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে খাদনব্যয়ের পরিবর্তক হিসাবে অর্থ সঞ্চয় করিতে থাকিবে, যতক্ষণ পর্যন্ত না তাহার কাছে বর্তমান খাদন ব্যয় এবং ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের প্রান্তিক উপযোগ সমান হয়।

আয় সঞ্চয় কার্যে (In Saving)

পরিশেষে, পরিবর্তকতা নিয়মের কার্যকারিতা কারক-আয় (factor-income) বণ্টন ব্যাপারেও দেখা যায়। কারক আয় বণ্টনদ্বারা বিভিন্ন উৎপাদক কারকের মূল্য, যথা—ভূমির মূল্য খাজনা, মূলধনের মূল্য সুদ, শ্রমিকের মূল্য মজুরী এবং সংগঠন কর্তার মূল্য মুনাফা নির্ধারণ করা হয়। প্রত্যেক কারকের মূল্য বা আয়ের পরিমাণ ধার্য হয় প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সূত্রদ্বারা (principle of marginal productivity)। উৎপাদক বিভিন্ন কারক পরিমাণ ততক্ষণ পর্যন্ত নিয়োগ করিতে থাকে, যতক্ষণ না প্রত্যেকটি নিযুক্ত কারকের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সমান হয়। যাবৎ উহাদের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা সমান না হইবে, তাবৎ বিভিন্ন কারক নিয়োগের ব্যাপারে পরিবর্তকতার নিয়ম কার্যকরী হইতে থাকে।

কারক-আয় বণ্টনে (In Distribution)

প্রান্তিক পক্ষপাতের মতবাদ (Theory of Marginal Preference): আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, কোন দ্রব্যের উপযোগদ্বারা উহার চাহিদার সঠিক পরিমাপ করা চলে না। কেননা, প্রথমতঃ, অর্থের মাপকাঠিতে উপযোগ সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, কোন দ্রব্যের উপযোগ ভিন্নভাবে, ঐ দ্রব্যকে সম্পূর্ণ আলাদা করিয়াও, নির্ধারণ করা যায় না। বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা এমন ভাবে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত যে, একটি দ্রব্যের উপযোগ নির্ণয় অপর দ্রব্যের উপযোগের নিরিখে করিতে হয়।

আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ খাদকের চাহিদা (consumer's demand) নির্ধারণের জন্য প্রান্তিক উপযোগের পরিবর্তে আর একটি মতবাদ খাড়া করিয়াছেন। ইহাই প্রান্তিক পক্ষপাতের মতবাদ। প্রত্যেক খাদককেই বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ের দ্বারা সে তাহার জীবনযাত্রার স্বাভাবিক মান বজায় রাখে। জীবনযাত্রার এই মান বজায় রাখিতে অনেক সময় তাহাকে খাদন ব্যয়ের কাট ছাটও অদল বদল করিতে হয়। যখন সে একদিকে বিশেষ

কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে খরচ বৃদ্ধি করে, তখন সংগে সংগে আর এক দিকে অন্য দ্রব্য খরিদের ব্যয় ছাটাই করিতে হয়। সে যদি খাদ্যদ্রব্যের উপর ব্যয় বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে পোষাক পরিচ্ছদের উপর ব্যয় সংকোচ করিবে। খাদ্যদ্রব্য এবং পোষাক পরিচ্ছদ, এই দুইটি সামগ্রীর উপর খাদকের আপেক্ষিক পক্ষপাতই তাহার চাহিদা নির্ধারণ করিবে। যদি সে পোষাকেয় উপর ১০৲ টাকা কম খরচ করে, আর খাদ্যদ্রব্যের উপর ১০৲ টাকা বেশী খরচ করে, তাহা হইলে আমরা বলিব যে, ১০৲ মূল্যের পোষাক পরিচ্ছদের চেয়ে ১০৲ মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের উপর তাহার অপেক্ষাকৃত অধিক পক্ষপাত। যতক্ষণ পর্যন্ত খাদ্যদ্রব্যের উপর তাহার পক্ষপাত অপেক্ষাকৃত অধিক থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উহার উপর খাদন ব্যয়ও সে বাড়াইবে। পোষাক পরিচ্ছদের স্থলে খাদ্যবস্তু ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধিদ্বারা সে খাদন ব্যয়ের এমন এক অবস্থায় আসিবে যেখানে তাহার কাছে ১০৲ মূল্যের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য ও ১০৲ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত পোষাক পরিচ্ছদ সমান পছন্দসই হইবে। এই অবস্থাতে আসিলে দুইটি সামগ্রীর প্রান্তিক পক্ষপাত জানা যাইবে। পক্ষপাতের প্রান্তিক বিন্দুতে পৌছিলে আর দ্রব্য দুইটির মধ্যে পরিবর্তকতার নিয়ম কার্যকরী হয় না। এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যের প্রান্তিক পক্ষপাতের দ্বারা খাদকের চাহিদা নির্ণয় করা যায়।

পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার (Marginal Rate of Substitution) : .মরা দেখিয়াছি যে, দুইটি দ্রব্যের-খাদ্যবস্তু ও পোষাক পরিচ্ছদের-প্রান্তিক পক্ষপাত কি। প্রান্তিক অবস্থায় এক একক অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু এবং এক একক অতিরিক্ত পোষাক পরিচ্ছদের আপেক্ষিক পক্ষপাত সমান হয়; এই অবস্থাতে আর পরিবর্তকতার নিয়ম কার্যকরী হয় না। এইরূপ যখন দুইটি দ্রব্যের আপেক্ষিক প্রান্তিক পক্ষপাত সমান হয়, তখন খাদ্যদ্রব্য ও পোষাক পরিচ্ছদের মধ্যে যে অনুপাত (ratio) হয় তাহাই পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার।

খাদকের চাহিদার আসল প্রকৃতি এই যে, সে এক দ্রব্যের স্থলে অন্য দ্রব্য পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করিতে পারে। মানুষের খাদন ব্যয় যদি স্থিতিশীল ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দেখা যায় যখন সে এক দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করে, তখন অন্য দ্রব্যের ব্যবহার ছাটাই করিতে বাধ্য হয়। সে এক দ্রব্যের স্থলে অপর পরিবর্তক দ্রব্য ব্যবহার বৃদ্ধি ততক্ষণ পর্যন্ত করিতে থাকে, যতক্ষণ না তাহার তৃপ্তি সর্বোচ্চ হয়। আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, খাদকের কাছে, দশ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত খাদ্যবস্তু এবং দশ টাকা মূল্যের অতিরিক্ত পোষাক

পরিচ্ছদ সমানভাবে পছন্দসই হইতে পারে। যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, এক একক খাদ্যবস্তুর মূল্য ২৲ এবং এক একক পোষাক পরিচ্ছদের মূল্য ৫৲, তাহা হইলে খাদকের কাছে ৫ একক খাদ্যবস্তু এবং ২ একক পোষাক পরিচ্ছদের সমান পক্ষপাত হইবে। এইরূপ অবস্থায় খাদ্যবস্তুর স্থলে পোষাক পরিচ্ছদের পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার হইবে যথাক্রমে পোষাক পরিচ্ছদ ও খাদ্যদ্রব্যের বাজার মূল্যের অনুপাত, অর্থাৎ $\frac{5}{2}$।

পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার ধারণাটি প্রান্তিক উপযোগ ধারণার চাইতে অধিক বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ। এই মতবাদে অর্থদ্বারা দ্রব্যের উপযোগ পরিমাপ করিবার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। উপযোগ মানসিক পদার্থ, অর্থের মাপকাঠিতে উহার পরিমাণ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। পরিবর্তকতার প্রান্তিক হারদ্বারা আমরা বিভিন্ন দ্রব্যের উপযোগ তুলনা করি এবং সেই ভিত্তিতে আমাদের পছন্দক্রম নির্দেশ করি। এক দ্রব্যের কতটা পরিমাণের স্থলে অন্য দ্রব্যের কতটা পরিমাণ পরিবর্তকভাবে ব্যবহার করিব, সেই প্রশ্নের সমাধান এই মতবাদে খুঁজিয়া পাই। এই সম্পর্কে অধ্যাপক হিকসের (Hicks) ব্যাখ্যান বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। "Suppose we start with a given quantity of goods, and then go on increasing the amount of X and diminishing that of Y in such a way that the consumer is left neither better off nor worse off on balance; then the amount of Y which has to be substracted in order to set off a second unit of X will be less than that which has to be subs-tracted in order to set off the first unit. In other words, the more X is substituted for Y, the less will be the marginal rate of X for Y. The marginal rate of substitution of X for Y may be defined as the quantity of Y which would just compensate the consumer for the loss of a marginal unit of X."

ক্রম-হ্রাসমান পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার (Diminishing Marginal Rate of Substitution) : আমরা দেখিয়াছি, হিকস্‌, অ্যালেন (Hicks, Allen) প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ প্রান্তিক উপযোগ ধারণার পরিবর্তে পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার ধারণার প্রবর্তন করিয়া খাদকের চাহিদা নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মতবাদের ভিত্তিতে ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ

স: (১) ইহাদ্বারা ক্রম-ক্ষীয়মান উপযো . . বা

ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তকতার হার ধারণাটি ...

..দকের ব্যক্তিগত চাহিদার নিখুঁত ও বাস্তব বক্ররেখা অংকন ক

(৩) বাজার মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধির ফলাফল খাদকের চাহিদার উপর কি ...স্তার করে, তাহা নির্দেশ করা যায়।

খাদকের পছন্দক্রমের ভিত্তির উপর নিরপেক্ষতার বিশ্লেষণটি প্রতি... ...টি দ্রব্যের স্থলে অন্য একটি দ্রব্যের উপর পক্ষপাত দেখাইয়া খাদক ... পছন্দক্রম প্রকাশ করে। যদি একটা দ্রব্যের স্থলে অন্য একটি দ্রব্য পরিব... হিসাবে ব্যবহার বা খরিদ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে এই দুইটি দ্রব্যের বি... সংমিশ্রণ পরিমাণ (combinations) খাদকের নিকট সমান পছন্দসই হ... পারে। যেমন, পাউরুটি ও মাখনের নিম্নলিখিত বিভিন্ন সংমিশ্রণ গুলিই খাদ... সমান পছন্দসই হইতে পারে।

৬	খানা পাউরুটি	+	১ ছটাক মাখন
৪	খানা পাউরুটি	+	২ ছটাক মাখন
৩	খানা পাউরুটি	+	৩ ছটাক মাখন, ইত্যাদি।

উপরি উক্ত সমান পছন্দসই বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরিমাণ চিত্রাংকনদ্বারা ... ইতে পারে।
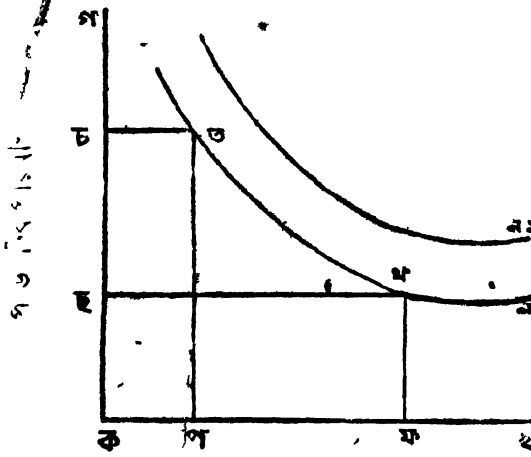
কখ অক্ষ মাখ... বিভিন্ন পরিমাণ ই... করিতেছে এবং ... অক্ষ পাউরুটির পরিমাণ নি... করিতেছে। বক্র... খাদকের (পা... মাখনের জন্য) একটি প... বুঝাইতেছে।

(১৪শ চিত্র) মাখনের পরিমাণ

চ পরিমাণ পাউরুটি+ক প পরিমাণ মাখনের সংমিশ্রণ ... ক ছ ...+ক ফ পরিমাণ মাখনের সংমিশ্রণ সমান পছন্দ করিবে।

... সংমিশ্রণ পরিমাণ একটি ...

বিন্দু হইতে হিসাব করা হইবে, ততক্ষণ বিভিন্ন সংমিশ্রণ খাদকের নিকট সমান পছন্দ হইবে। ফলে, এই সংমিশ্রণের কোন্‌টা সে ক্রয় করিবে সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। অতএব চিত্রের '**ন**' রেখাই নিরপেক্ষতার বক্ররেখা। মনে রাখিতে হইবে, খাদকের বিভিন্ন পছন্দ অনুসারে বহু সংখ্যক নিরপেক্ষতার বক্ররেখা অংকন করা যাইতে পারে। উপরের চিত্রে '**ন১**' বক্ররেখা '**ন**' বক্ররেখার চেয়ে উপরে অধিষ্ঠিত। উপরে অধিষ্ঠিত নিরপেক্ষতার বক্ররেখা '**ন১**' খাদকের পছন্দক্রমের বাড়তি অবস্থাই সূচিত করে। **দ্বিতীয়তঃ**, নিরপেক্ষতার বক্ররেখা ডানদিকে ঢালু অবনত অবস্থায় চিত্রিত করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে,

নিরপেক্ষতা বক্ররেখার বৈশিষ্ট্য ও গুণ (Properties of Indifference Curve)

খাদক যতই একটি দ্রব্যের অধিক পরিমাণ ব্যবহার করিতে থাকিবে, ততই অপর দ্রব্যের খাদন পরিমাণ স্বল্প করিতে হইবে। যেমন, মাখনের পরিমাণ বেশী ব্যবহার করিতে হইলে তাহাকে পাউরুটির খাদন পরিমাণ কিছু কমাইতে হইবে। নিরপেক্ষতা বক্ররেখার ঢালু অবনত অবস্থা নির্ধারিত হয় দুইটি সামগ্রীর পরিবর্তকতার প্রান্তিক হারদ্বারা। খাদক যতই মাখন ব্যবহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকে, এবং পাউরুটি ব্যবহারের পরিমাণ কমাইতে থাকে, ততই তাহার কাছে রুটির স্থলে এক একক মাখনের পরিবর্তকতার প্রান্তিক হার হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে, পাউরুটি ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাসের সংগে সংগে মাখনের তুলনায় পাউরুটির উপর তাহার প্রান্তিক পক্ষপাত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহার ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক পরিবর্তকতা (Law of Diminishing Marginal Substitutability) অথবা পরিবর্তকতার ক্রম-হ্রাসমান প্রান্তিক হার (Law of Diminishing Marginal Rate of Substitution) বিধির প্রয়োগ।

নিরপেক্ষতার বিধিদ্বারা আমরা খাদকের চাহিদা বক্ররেখা ও খরিদের সাম্যাবস্থা (Consumer's equilibrium in a market) নির্ধারণ করিতে

চাহিদার বক্ররেখা ও খরিদের সাম্যাবস্থা নির্ধারণ (Determination of demand curve and consumer's equilibrium in a market)

পারি। নিরপেক্ষতার যে বিশ্লেষণ আমরা উপরে করিয়াছি, তাহাতে দুইটি দ্রব্যের নির্দিষ্ট বাজার মূল্যের কথা আদৌ ধরা হয় নাই। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারে দ্রব্য মূল্যের কোন পরিবর্তন হয় না। খাদক সেই মূল্যে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরিমাণ খরিদ না করিয়া বিশেষ এমন একটি সংমিশ্রণ সে দ্রব্য দুইটি ব্যবহার করিয়া সর্বা...

লাভ করিতে পারে। নিম্নের চিত্রের সাহায্যে খাদকের ক্রয় সাম্যাবস্থা প্রদর্শিত হইল।
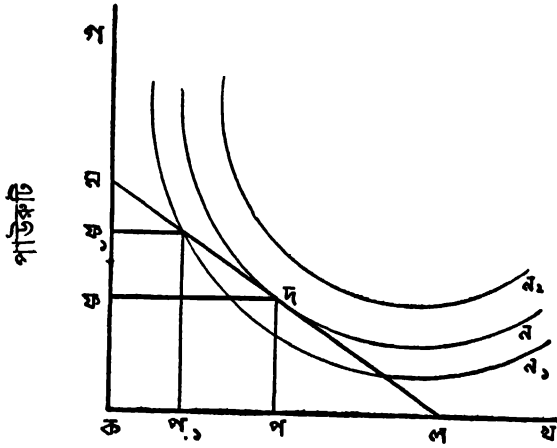
(১৫শ চিত্র) মাখন

ম ল বাজার মূল্য নির্দেশক লাইন ; ইহা পাউরুটি ও মাখনের বাজার দামের সম্পর্ক বুঝাইতেছে। খাদকের নির্দিষ্ট আয়ে হয় **ক ম** পরিমাণ পাউরুটি কিনিতে পারে, কিংবা **ক ল** পরিমাণ মাখন কিনিতে পারে। এক একক পাউরুটির বাজার মূল্য $= \frac{\text{খাদকের আয়}}{\text{ক ম}}$ এবং এক একক মাখনের মূল্য $= \frac{\text{খাদকের আয়}}{\text{ক ল}}$ । খাদকের বিভিন্ন পছন্দক্রম অনুসারে তিনটি বিভিন্ন নিরপেক্ষ বক্ররেখা '**ন**' 'ন_1' ও 'ন_2' অংকন করা হইল। এই বক্ররেখাগুলির মধ্যে '**ন**' রেখাটি বাজার-মূল্যের রেখা (price-line) **ম ল**কে একটি বিন্দু **দ** তে স্পর্শ করিয়াছে, ন_1 রেখাটি দুই বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে এবং ন_2 রেখাটি বাজার মূল্য রেখার উপর ডানপার্শ্বে অবস্থান করিতেছে এবং মোটেই স্পর্শ করিতেছে না। **দ** বিন্দু (যেখানে **ন** বক্ররেখা বাজার মূল্য রেখা **ম ল** কে স্পর্শ করিয়াছে) হইতে হিসাব করিলে দ্রব্য দুইটির যে সংমিশ্রণ পরিমাণ পাওয়া যায়, তাহাই সবচেয়ে পছন্দসই সংমিশ্রণ। দুইটি দ্রব্যের এই সংমিশ্রণ, অর্থাৎ **ক প** পরিমাণ মাখন + **ক ফ** পরিমাণ পাঁউরুটির সংমিশ্রণ খরিদ করিলে খাদক সাম্যাবস্থায় (equilibrium) পৌঁছিবে। কিন্তু **ন** বক্ররেখার চেয়ে নীচে অবস্থিত আর যে কোন নিরপেক্ষতার বক্ররেখা হইতে দুইটি দ্রব্যের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরিমাণ খরিদ করিলে, খাদকের নিকট উহা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পরিতৃপ্তি হইবে না

যেমন, যদি খাদক **ন**$_১$ নিরপেক্ষতার বক্ররেখা হইতে **ক প**$_১$ পরিমাণ মাখন + **ক ফ**$_১$ পরিমাণ পাউরুটি ক্রয় করে, তাহা হইলে সংমিশ্রণ আগের সংমিশ্রণের চেয়ে কম পছন্দসই হইবে এবং সর্বোচ্চ সম্ভাব্য পরিতৃপ্তি দিতে পারিবে না। আবার **ন** বক্ররেখার ডানপাশে উপরে অবস্থিত বিভিন্ন নিরপেক্ষতা বক্ররেখা হইতে (যেমন, **ন**$_২$ বক্ররেখা হইতে) যদি দ্রব্য দুইটির বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরিমাণ খরিদ করা যায় ; তাহা হইলে উহা অবশ্য **ক প** পরিমাণ মাখন + **ক ফ** পরিমাণ পাউরুটির সংমিশ্রণ হইতে অধিক পছন্দসই হইবে ; কিন্তু ঐ সংমিশ্রণ ক্রয় করিতে হইলে খাদকের আয় বৃদ্ধির প্রয়োজন—নির্দিষ্ট আয়ে উচ্চতর পছন্দ-ক্রম **ন**$_২$তে উন্নীত হওয়া যায় না।

বাজার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধির প্রভাব খাদকের চাহিদার উপর কিরূপ হয় এবং সেই ফলাফল চাহিদার বিধি গঠনে কেমন করিয়া সহায়তা করে, তাহার বাস্তব বিশ্লেষণ নিরপেক্ষতার বক্ররেখাদ্বারা নির্দেশ করা যায়।

বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রভাব ও চাহিদার নিয়ম গঠনে নিরপেক্ষতার বক্র-রেখার গুরুত্ব : (Effects of Price changes and explanation of the Law of Demand)

অধ্যাপক হিকস্ (Hicks) বাজার মূল্যের উঠানামার দুইটী প্রভাব নির্দেশ করিয়াছেন : (১) আয়ের উপর প্রভাব (Income Effect) ও (২) দ্রব্য পরিবর্তকতার উপর প্রভাব (Substitution Effect)।

যখন একটি দ্রব্যের বাজার দাম হ্রাস হয়, তখন খাদকের আয় বৃদ্ধি পায়। এই আয় বৃদ্ধির ফলে (income-effect) সে খাদন দ্রব্য (পাউরুটি ও মাখন) অধিক পরিমাণে খরিদ করিবে। দ্রব্য পরিমাণ খরিদ বৃদ্ধির সংগে সংগে খাদক উচ্চতর পছন্দক্রমে উন্নীত হইবে, নিরপেক্ষতার বক্ররেখা উর্ধ্বগামী হইবে (১৬শ চিত্র) এবং খাদক নূতন এক সাম্যাবস্থায় (new equilibrium) পৌছিবে।

১৬শ চিত্র

খাদকের আয় বৃদ্ধির জন্য বাজার মূল্য রেখার অবস্থিতি ... পরিবর্তন
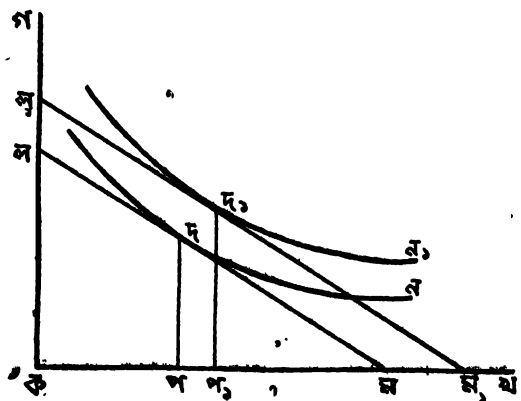
হইয়াছে এবং নূতন নিরপেক্ষতা বক্ররেখার অবস্থিতিও উপরের দিকে সরিয়া **ন** র পরিবর্তে **ন১** হইয়াছে। এই নূতন বক্ররেখা **ন১** দুইটি দ্রব্যের খরিদ পরিমাণ বৃদ্ধি সূচক। নূতন বক্ররেখা **দ১** বিন্দুতে বাজার মূল্য রেখা **ম১ ল১** কে স্পর্শ করিয়াছে। এই **দ১** বিন্দু হইতে নির্ণয় করিলে মাখন ও পাউরুটির সংমিশ্রণের যে বিভিন্ন পরিমাণ হইবে, তাহা ক্রয় করিলে খাদক নূতন সাম্যাবস্থায় পৌছিবে।

বাজার মূল্যের উঠানামার প্রভাব দ্রব্য পরিবর্তকতার উপর (substitution effect) কি ভাবে কার্যকরী হয় তাহা নীচের চিত্রে অংকন করা গেল।
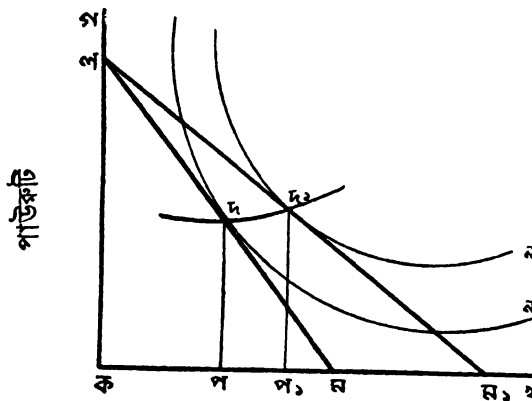
(১৭শ চিত্র) মাখন

যখন মাখনের বাজার মূল্য হ্রাস হয়, তখন এক একক পাউরুটির স্থলে অধিক পরিমাণ মাখন পরিবর্তক হিসাবে খরিদ করা হইবে। পাউরুটির মূল্য একই থাকায়, পাউরুটির খরিদ পরিমাণ একই থাকিবে, কিন্তু মাখনের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় মাখনের খরিদ পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া **ক ম১** হইবে। ফলে বাজার মূল্যের রেখা **ল ম১** মাখন সূচক অক্ষের উপর ডানদিকে অবস্থান করিবে। নূতন নিরপক্ষতার বক্ররেখা **ন১** নূতন বাজার মূল্যের রেখা **ল ম১** কে **দ১** বিন্দুতে স্পর্শ করিবে। **দ** ও **দ১** সংযোগ করিয়া মাখনের চাহিদা বক্ররেখা চিত্রিত করা যায়।

আর একটি চিত্রে (১৮শ চিত্র) বাজার মূল্য পরিবর্তনের দুইটি প্রভাব (income effect and substitution effect) সংযুক্ত ভাবে প্রদর্শিত হইল। যে কোন একটি দ্রব্যের বাজার মূল্য হ্রাস পাইলে খাদকের আয়ত্তর বৃদ্ধি পায়। ফলে, বাজার মূল্যের রেখা **ম ল** উপর দিকে সরিয়া নূতন অবস্থানে **ম১ ল১** হইল এবং নিরপেক্ষতার বক্ররেখা উপরে ডানদিকে সরিয়া যাইয়া নূতন বাজার মূল্যের রেখাকে **দ১** বিন্দুতে স্পর্শ করিল। ইহাই আয়ের উপর মূল্য পরিবর্তনের ভাব। যদি মাখনের বাজার মূল্য হ্রাস পায়, আর পাউরুটির

থাকে, তাহা হইলে খাদক এক একক পাউরুটির তুলনায় অধিক পরিমাণ মাখন পরিবর্তক হিসাবে খরিদ করিবে। ফলে, বাজার মূল্যের রেখা ম ল স্থানান্তরিত হইয়া ডান দিকে উপরে সরিয়া যাইবে। নিরপেক্ষতার রেখাও দ১ হইতে সরিয়া নূতন বিন্দু দ২ তে বাজার মূল্যের রেখাকে স্পর্শ করিবে।
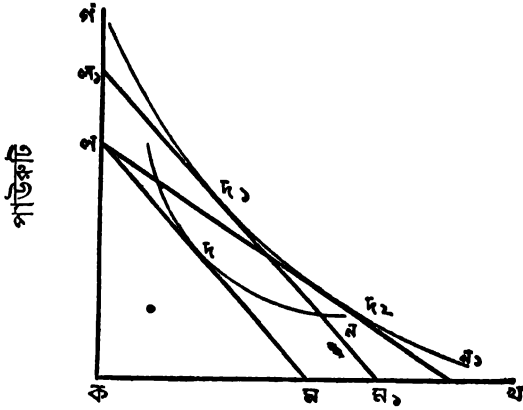
(১৮শ চিত্র) মাখন

শুধু ব্যক্তি বিশেষের চাহিদার বক্ররেখা কেন, বাজারের চাহিদা বক্ররেখাও নিরপেক্ষতার রেখাদ্বারা নির্ধারণ করা যায়। গোটা বাজারের চাহিদা বাজারের সকল খরিদ্দারের চাহিদার সমষ্টি বিশেষ। বাজারের চাহিদার বৈশিষ্ট্য মোটামুটি ভাবে ব্যক্তিগত চাহিদার বৈশিষ্ট্যেরই মত। পাউরুটি ও মাখন এই দুইটি দ্রব্যের মধ্যে যদি মাখনের বাজার মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে খাদক, ব্যক্তিগতভাবে এক একক পাউরুটির স্থলে অধিক পরিমা মাখন পরিবর্তক হিসাবে খরিদ করিবে। গোটা বাজা সকল খরিদ্দারের বেলায়ও মূল্য উঠানামার দরুণ

বাজারের চাহিদা নির্ধারণে নিরপেক্ষতা রেখার প্রয়োগ (Application of indiffeence curve in explaining market demand)

পরিবর্তকতার প্রভাব (substitution effect) একই হইবে। কিন্তু আয়ের দ্রব্য মূল্যের উঠানামার প্রভাব (income effect) ব্যক্তিগত খাদকের এবং বাজারের সকল খাদকের বেলায় এক নাও হইতে পারে। বাজা অনেক ক্রেতা থাকিতে পারে, যাহাদের কাছে কোন দ্রব্যের মূল্য হ্র ঐ দ্রব্য নিকৃষ্ট মনে হইতে পারে এবং তাহারা ঐ দ্রব্য খরিদের পরিম দিতে পারে। এইরূপ স্থলে বাজারের সকল খরিদ্দারের আয়ের উপর প্রভাব সঠিক কতটা হইবে, তাহার নিশ্চয়তা করা যায় না। গো বেলায় দ্রব্য মূল্যের উঠানামার দরুণ পরিবর্তকতার প্রভাবই (effect of price changes) অধিক বলবৎ হয়। বাজার মূ অধিক সংখ্যক খরিদ্দারের কাছে দ্রব্যটি যদি নিকৃষ্ট মনে না হ্

মনে হয়, তাহা হইলে ডানদিকে ঢালু ক্রম-অবনত বক্ররেখাদ্বারা বাজারের চাহিদার প্রকৃতিনির্দেশ করা যায়।

ভোগোদ্বৃত্তের বা ভোক্তার অতিরেক বিধি (Doctrine of Consumer's Surplus) : এমন অনেক দ্রব্য আছে যাহা খরিদ করিয়া খাদক উদ্বৃত্ত তৃপ্তি লাভ করে। ইহার কারণ এই যে, ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে ভোগকারী যে মূল্য দিতে ইচ্ছুক, তাহার তুলনায় অপেক্ষাকৃত কমমূল্যে উহা বাজারে পাওয়া যায়। দ্রব্যের সম্ভাব্য উপযোগ ধারণা করিয়া খাদক যে মূল্য উহার জন্য দিতে প্রস্তুত, উহাকে খরিদ্দারের চাহিদা দাম (demand price) বলা হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে সে যদি চাহিদা দামের চেয়ে কম বাজার মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে, তাহা হইলে সে বাড়তি তৃপ্তি লাভ করিবে। খাদক ভোগকারী হিসাবে

ভোগোদ্বৃত্তের সহিত খাদকের চাহিদা দাম ও বাজার দামের সম্পর্ক (consumer's surplus related to individual [d]emand price [a]nd market [pri]ce)

দ্রব্যের জন্য যে দাম দিতে ইচ্ছুক (demand price) এবং যে বাজার মূল্যে (market price) সে উহা প্রকৃত পক্ষে ক্রয় করিতে পারে—এই দুইএর তফাৎই খাদকের ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ। কোন ব্যক্তি একখানা খবরের কাগজের জন্য ৷৷০আনা মূল্য দিতে প্রস্তুত ; কিন্তু উহার বাজার দাম ৵০ আনা হওয়ায়, সে উহা ৵০ আনাতেই ক্রয় করিতে পারিল। এখানে ।৵০আনা হইল ভোগকারীর উদ্বৃত্ত ভোগের পরিমাপ। অধ্যাপক মার্শাল ভোগোদ্বৃত্তের এই সংগা নির্দেশ করিয়াছেন : The excess of the price which he [co]nsumer) would be willing to pay rather than go without [the] thing, over that which he actually does pay is the [econo]mic measure of this surplus satisfaction. খাদকের [...] চাহিদা দাম অনেক 'বিষয়ের উপর নির্ভর করে। বিশেষ করিয়া [...]প্তির পরিমাণ যদি অধিক মনে হয়, তাহা হইলে খাদকের চাহিদা [...]পায়। অপর পক্ষে, বাজার মূল্য নির্ভর করে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ [...]রচের উপর। যে কোন কারণে চাহিদা দাম বা বাজার-দামের যে [...] পরিবর্তন হইলে ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ কমবেশী হইতে [...]ক্তিগত চাহিদা মূল্য বৃদ্ধি পায় আর বাজার মূল্য একই থাকে, তাহা [...]ধ্যে পার্থক্য বাড়িবে ; এবং খাদকের বাড়তি তৃপ্তিও বাড়িবে। [...]য্য বৃদ্ধি পায়, আর ব্যক্তিগত চাহিদা মূল্য একই থাকে, তাহা

পাওয়ায় ম... রেখা ল ম... নিরপক্ষতার স্পর্শ করিবে। করা যায়। আর একটি (income effect যে কোন একটি দ্র... ফলে, বাজার মূল্যের ... এবং নিরপেক্ষতার ব... মূল্যের রেখাকে দ... বিন্দু ... ভাব। যদি মাপনের

হইলে তাহাদের মধ্যে পার্থক্য কমিবে এবং [illegible] হইলে [illegible] ও বাজার-দামের মধ্যে পার্থক্য [illegible] হইবে [illegible] ভোগোদ্বৃত্তের [illegible] বৃদ্ধি পাইবে [illegible] চাহিদা-দাম ও বাজার-দাম সমান হইলে ভোগকারী কোনই [illegible] করিতে পারিবে না।

ভোগোদ্বৃত্তের ধারণাটি ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি হইতে নির্ণয় করা যায়। খাদক একটি দ্রব্যের ক্রয় পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করিতে থাকিবে, ততই ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ তাহার কাছে কমিতে থাকিবে। যেমন, একটি কমলালেবু হইতে ৵০ আনা মূল্যের উপযোগ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয় একটি কমলালেবু ক্রয় করিলে উহার প্রান্তিক উপযোগ, ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধি অনুসারে, ৵০ আনা মূল্যের চেয়ে কম হইবে। মনে করা যাক, দ্বিতীয় কমলালেবুটি ক্রয় করিয়া খাদক ৴১০ মূল্যের অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিল। তৃতীয় একটি কমলালেবু খরিদ করিয়া ক্রেতার অতিরিক্ত উপযোগ হইল ৴০ মূল্যের।

ক্রম-ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির সহিত ভোগোদ্বৃত্তের সম্পর্ক (Consumer's surplus related with the law of diminishing utility)

সে যদি আর অধিক কমলালেবু ক্রয় না করে, তাহা হইলে তৃতীয় কমলালেবুটি তাহার প্রান্তিক খরিদ বুঝিতে হইবে। এই প্রান্তিক খরিদের পরিমাপ ও বাজার মূল্য সমান। বাজার মূল্য ৴০তে যেমন প্রান্তিক খরিদ তৃতীয় কমলালেবুটি পাওয়া যায়, অপর দুইটি লেবুর প্রত্যেকটির বাজার মূল্যও ৴০ আনা। তিনটি কমলালেবুর মোট ক্রয় মূল্য = ৴০ × ৩ = ৶০ আনা। কিন্তু তিনটি ফলের মোট উপযোগ = ৵০ + ৴১০ + ৴০ = ।১০। অতএব তিনটি কমলালেবু খরিদদ্বারা খাদকের ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ হইবে ।১০ − ৶০ = ৴১০ (ছয় পয়সা)। অধ্যাপক মার্শালের নির্দেশ অনুসারে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের এই সূত্র :

ভোগোদ্বৃত্ত = মোট উপযোগ − প্রান্তিক উপযোগ × ক্রয় করা হইয়াছে এমন দ্রব্য এককের সাকুল্য সংখ্যা।

(Consumer's Surplus = Total Utility − Marginal Utility × number of units purchased)

চিত্র অংকনদ্বারা খাদকের ভোগ উদ্বৃত্ত প্রদর্শিত হইল।

ক খ অক্ষ দ্রব্যের বিভিন্ন একক সূচক এবং **ক গ** অক্ষ বাজার মূল্য ও উপযোগ নির্দেশ করিতেছে। **ক ম** একক দ্রব্যের জন্য খাদক **ম প** মূল্য দিতে প্রস্তুত; উহা হইতে তাহার সম্ভাব্য উপযোগ প্রাপ্তির যাহা পরিমাণ হইবে তাহা **ক ম প ট** চিত্রদ্বারা নির্দেশ করা যায়। দ্বিতীয় একক **ম ম১** র জন্য খাদক **ম১ প১** মূল্য দিতে রাজী; উহা হইতে সে যাহা ভোগ লাভ করিবে,
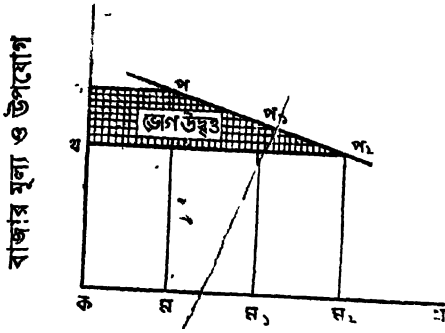
(১৯শ চিত্র) বিভিন্ন একক

তাহার পরিমাণ **ম ম১ প১ প** চিত্রদ্বারা নির্দেশ করা হইল। তৃতীয় একক **ম১ ম২ র** জন্য খাদক **ম২ প২** মূল্য দিতে প্রস্তুত—ইহা ক্রয় দ্বারা সে **ম১ ম২ প২ প১** পরিমাণ উপযোগ প্রাপ্তির আশা করে। সে যদি আর দ্রব্য-একক না ক্রয় করে এবং **ম২ প২** যদি বাজার মূল্য হয়, তাহা হইলে তিনটি একক ক্রয় করিতে তাহার মোট খরচের পরিমাণ হইবে—

ক ম২ × **ম২ প২** = **ক ম২ প২ খ** আয়তক্ষেত্র। খাদকের মোট উপযোগ **ক ম২ প২ ট** হইতে মোট খরচ বাদ দিলে যে **খ প২ প ট** ক্ষেত্র থাকে, উহাই ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ সূচক।

ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার অসুবিধা (Difficulties of measuring Consumer's Surplus): অধ্যাপক মার্শাল ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার যে পদ্ধতি নির্দেশ করিয়াছেন তাহার অনেক গলদ ও অসুবিধা আছে।

প্রথমতঃ, যে তত্ত্বগত অনুমানের উপর ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত উহা অবাস্তব। ধারণাটি অনুমান করে যে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগ খাদকের নিকট সকল অবস্থাতে সমান থাকে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। আমরা

অর্থের প্রান্তিক উপযোগ সকল অবস্থায় এক থাকে না

একটি দ্রব্যের খরিদ পরিমাণ যতই বৃদ্ধি করি, ততই আমাদের অর্থ আয় কমিতে থাকে এবং অর্থের প্রত্যেক এককের প্রান্তিক উপযোগও আমাদের কাছে বাড়িতে থাকে। অর্থের এই প্রান্তিক উপযোগ বৃদ্ধি যদি আমরা হিসাবের মধ্যে না লই,

তাহা হইলে ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাপ সঠিক হয় না। অনেকে অবশ্য বলেন যে, অর্থের প্রান্তিক উপযোগের হ্রাস বৃদ্ধি ধর্তব্যের মধ্যে নহে; কেননা, বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক দ্রব্য ক্রয়ে আমরা আয়ের একটা সামান্য-অংশই ব্যয় করিয়া থাকি।

দ্বিতীয়তঃ, খাদকের যে চাহিদার তালিকা ও চাহিদা মূল্যের ভিত্তিতে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করা হয়, তাহা কাল্পনিক হিসাব মাত্র। দ্রব্যের বিভিন্ন এককের জন্য আমরা কি মূল্য দিতে প্রস্তুত, আমরা তাহা অনেক সময় সঠিক ধারণা করিতে পারি না। যদি একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্যের যোগান হঠাৎ অত্যন্ত টান হইয়া পড়ে, তাহা হইলে উহার জন্য কি মূল্য দিতে রাজী হইব তাহা আমরা নিজেরাই সহজে ঠিক করিতে পারি না। কিন্তু চাহিদা-মূল্যের তালিকা সঠিক না জানিতে পারিলেও সাধারণভাবে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার বাস্তব অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সাধারণতঃ, প্রচলিত বাজার-মূল্যের (customary prices) চেয়ে প্রকৃত বাজার মূল্যের যদি কম-বেশী হয়, তাহা হইলে (কাল্পনিক চাহিদা-দামের হিসাব না রাখিয়াও) খাদকের ভোগোদ্বৃত্তের পরিমাণ যে যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

> **চাহিদার তালিকা ও চাহিদামূল্য কাল্পনিক হিসাব মাত্র : উহাদের ভিত্তিতে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ সঠিক হইতে পারে না।**

তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন, আমরা যখন একটি দ্রব্যের একক পরিমাণের উপর ক্রমাগত ব্যয় বৃদ্ধি করি, তখন পূর্বেকার এককের উপযোগ অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায় এবং এই উপযোগ হ্রাসের ফলে উহাদের চাহিদা-দামও কমিতে থাকে। মার্শাল সাহেব ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে এই বিষয়টির কোন গুরুত্ব দেন নাই। দ্রব্য এককের ক্রমাগত খরিদ বৃদ্ধির ফলে ক্রমাগত যে উপযোগ বৃদ্ধি হয়, উহা গড়পড়তা উপযোগ নয়, মোট বর্ধিত উপযোগ। গড়পড়তা উপযোগ হইলে, ক্রমাগত দ্রব্য একক বৃদ্ধির ফলে পূর্বেকার এককের উপযোগ হ্রাস পাইত।

> **দ্রব্য একক পরিমাণ ক্রয় বৃদ্ধি করিলে পূর্বেকার এককের উপযোগ হ্রাস পায় ও চাহিদা মূল্যও কমে**

চতুর্থতঃ, বাজারের ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করারও অসুবিধা আছে। বাজারের বিভিন্ন খরিদ্দারের আয়স্তর বিভিন্ন; তাহাদের রুচি, আচার-ব্যবহার ও মনোবৃত্তিও বিভিন্ন। ফলে, একই দ্রব্য খরিদ করিতে বিভিন্ন খাদকের চাহিদা-দামও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। অধ্যাপক মার্শাল অবশ্য গড়পড়তার ধারণা দ্বারা (idea of average) এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বাজারে যখন বহুসংখ্যক ধনী ও

> **গোটা বাজারের ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করারও অসুবিধা আছে**

গরীব খরিদ্দার ক্রয় করে, তখন তাহাদের ব্যক্তিগত অবস্থার পার্থক্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়।

পঞ্চমতঃ, জীবন ধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় (necessaries) এবং কৃত্রিম আবশ্যকীয় (conventional necessaries) দ্রব্যের বেলায় ভোগোদ্বৃত্ত অপরিমিত ও অপরিমাপ্য হয়। অনেক সময় এই সকল দ্রব্যের অভাবে ভোগকারীর চাহিদা-মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইতে পারে। অধ্যাপক প্যাটেনের (Patten) মতে, যে সকল ভোগ্য দ্রব্য 'pain economy' পর্যায়ে পড়ে, অর্থাৎ যেগুলি খাদক ক্রয় করে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি জঠরের জ্বালা হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য এবং যেগুলি কোনই আরাম বা ভোগ-তৃপ্তিদায়ক নহে—উহাদের বেলায় খাদকের উদ্বৃত্ত পরিমাপ করা চলে না। শুধু 'pleasure economy' পর্যায়ের সামগ্রী যেগুলি,—অর্থাৎ যেগুলি খাদককে ভোগতৃপ্তি দান করে এবং যেগুলি ভোগকারী সাধারণতঃ খরিদ করে জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করিবার পর—উহাদের বেলায় ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ সম্ভব। অভিজাত দ্রব্য ও পার্থিব সম্মান উদ্দীপক সামগ্রীর বেলাতেও ভোগোদ্বৃত্ত অপরিমেয়।

নিত্য প্রয়োজনীয় ও কৃত্রিম আবশ্যকীয় দ্রব্যের ভোগোদ্বৃত্ত অপরিমিত ও অপরিমাপ্য হয়।

ষষ্ঠতঃ, যে সকল দ্রব্য পারস্পরিক অনুপূরক (Complementary) কিংবা যে সকল দ্রব্য একটা অপরটার পরিবর্তক, উহাদের বেলায়ও ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করার অসুবিধা আছে। চা এর পরিবর্তক যদি কফি হয়, তাহা হইলে চায়ের অভাবে কফির উপযোগ অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবে; আবার কফির অভাবেও চায়ের চাহিদা-দাম অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। এই অসুবিধা দূর করিবার জন্য মার্শাল দুইটি দ্রব্যকে এক দ্রব্য ধরিয়া উহাদের একটি মাত্র চাহিদা দাম ধার্য করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

অনুপূরক ও পরিবর্তক সামগ্রীর বেলায় ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপের অসুবিধা

অধ্যাপক নিকলসন্ (Nicholson), ক্যানান (Cannan), ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটিকে কল্পনা ধর্মী ও অবাস্তব (hypothetical and unreal) বলিয়া তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিকূল সমালোচনা সত্ত্বেও এই বিধিটির বাস্তব গুণ আছে। ইহাদ্বারা আমরা পারিপার্শ্বিক অবস্থার তফাৎ বুঝিতে পারি। কেমন করিয়া একই আয়স্তরের দুই ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্নরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করে, তাহা ভোগোদ্বৃত্ত-ধারণাটির প্রয়োগ

হইতে উপলব্ধি করা যায়। কোন সভ্য দেশে মাত্র দুই আনা খরচ করিয়া একখানা খবরের কাগজ হইতে এক ব্যক্তি যে ভোগোদ্বৃত্ত লাভ করে, আফ্রিকার কোন অসভ্য গহন প্রদেশে কৃষ্ণকায় কোন ব্যক্তি দুই আনার একখানা কাগজ হইতে সম-পরিমাণ ভোগতৃপ্তি কখন লাভ করিতে পারে না।

ভোগোদ্বৃত্ত ধারণাটির নূতন ব্যাখ্যান (New Approach to the Study of Consumer's Surplus) : হিকস্ (Hicks) প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ উপযোগের ভিত্তিতে খাদকের ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিবার পদ্ধতি মোটেই বাস্তব নয় বলিয়া বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিতে মার্শাল সাহেব অর্থের যে প্রান্তিক উপযোগ স্থায়ী অনুমান করিয়াছেন, তাহাও তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছেন। হিকস্ ভোগোদ্বৃত্তকে খাদকের অর্থআয়ের লাভ বৃদ্ধি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ; ইহা শুধু দ্রব্যের বাজার মূল্যের হ্রাস হওয়ার ফলেই তাহার ভাগ্যে জোটে। তাঁহার নিজের কথায় : Consumer's Surplus is a **'compensating variation in income'** whose loss would just offset the fall in price and leave the consumer no better off than before. নিম্ন চিত্রে দেখান হইল, কেমন করিয়া হিকস্ সাহেব নিরপেক্ষতার বক্ররেখার সাহায্যে খাদকের ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ করিয়াছেন।

নিরপেক্ষতার বক্ররেখার সাহায্যে ভোগোদ্বৃত্ত পরিমাপ (measurement of consumer's surplus with the help of Indifference curve)

ক খ অক্ষ খাদকের ভোগ্য দ্রব্য পরিমাণ ও **ক গ** অক্ষ অর্থ আয় নির্দেশ করিতেছে। মোট আয় **ক প** দ্বারা খাদক **ক ম১** পরিমাণ দ্রব্য খরিদ করিতে পারে। অতএব বাজার মূল্যের রেখা হইল **প ম১**। উহা **ট** বিন্দুতে **ন** নিরপেক্ষতার বক্ররেখাকে স্পর্শ করিতেছে। খাদক **ক ম** পরিমাণ দ্রব্য খরিদ করিতে **ট ঠ** পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে। অর্থাৎ
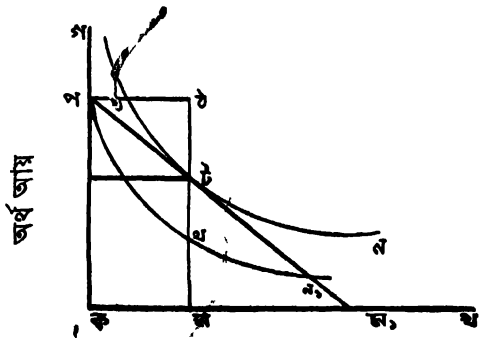
(১৫শ চিত্র) ভোগ্যদ্রব্য

খাদকের কাছে **ক ম** পরিমাণ দ্রব্য+**ট ঠ** পরিমাণ অর্থের সংমিশ্রণ এবং

কেবলমাত্র **ক প** পরিমাণ অর্থ (কোন দ্রব্য নয়) সমান পছন্দ সই। দ্বিতীয় একটি নিরপেক্ষতার বক্ররেখা **প** ও **থ** বিন্দু স্পর্শ করিয়া আঁকা হইল। এখন খাদক **ক ম** পরিমাণ দ্রব্যের বিনিময়ে **ঠ থ** পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে রাজী হইবে। কিন্তু আসলে তাহাকে অর্থ মূল্য দিতে হইতেছে **ঠ ট** পরিমাণ। অতএব তাহার ভোগোদ্‌বৃত্তের আর্থিক পরিমাপ হইবে **ট থ**।

ভোগোদ্বৃত্ত ধারণার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা (Theoretical and Practical Importance of the Doctrine of Consumer's Surplus) : অর্থবিদ্যার তত্ত্বহিসাবে এবং ব্যবহারিক জীবনের উপযোগিতার দিক হইতে ভোগোদ্‌বৃত্ত ধারণাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি জিনিষের ব্যবহার মূল্য (value-in-use) ও উহার বাজার মূল্যের (value-in-exchange) পার্থক্য বিশেষভাবে নির্দেশ করিতে পারে। সকল দ্রব্যের ব্যবহার উপযোগ ও উহাদের বিনিময় মূল্য এক নয়। লবণ, দিয়াশলাই প্রভৃতি জিনিষের উপযোগ ও ব্যবহার মূল্য খুব বেশী, কিন্তু উহাদের বাজার মূল্য অত্যন্ত অল্প। এই সকল দ্রব্য খরিদ করিয়া খাদক খুব বেশী পরিমাণ ভোগোদ্‌বৃত্ত লাভ করে। উদ্বৃত্তের সূত্রদ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা যে বাজার মূল্যে একটা দ্রব্য ক্রয় করি, সে অনুপাতে উহা হইতে ব্যবহার-উপযোগ ও ভোগতৃপ্তি লাভ করি অনেক বেশী।

ভোগোদ্‌বৃত্ত জিনিষের ব্যবহার-মূল্য ও বাজার-মূল্যের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া কারবারীর পণ্যমূল্য নিরূপণে এই সূত্রটির বিশেষ গুরুত্ব রহিয়াছে। যে সকল দ্রব্য খরিদ করিয়া ভোগকারীর উদ্বৃত্তের পরিমাণ অধিক হয়, সেই সকল দ্রব্যের বাজার মূল্যের হার বৃদ্ধি করা একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে বিশেষ সুবিধা। তবে খাদক সম্প্রদায়ের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার পক্ষে বাজার দাম এত উর্ধ্বহারে নির্ধারণ করা উচিত নয়, যাহাতে ভোগকারীর উদ্বৃত্ত লাভ একেবারে উবিয়া যায়।

একচেটিয়া বাজারে পণ্যমূল্য নির্ধারণে প্রয়োগ

তৃতীয়তঃ, রাজস্ব-বিজ্ঞানে (Public Finance) ভোগ উদ্বৃত্ত সূত্রের বিশেষ প্রয়োগ দেখা যায়। সরকারের করব্যবস্থা নির্ধারণের সময় অর্থসচিবকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হয় এই যে, যে সমুদয় সামগ্রীর উপর সরকার কর ধার্য করিতে যাইতেছে উহা হইতে খরিদ্দারের কতটা পরিমাণ ভোগ উদ্বৃত্ত লাভ হয়। যে সকল দ্রব্য বিশেষের

কর ব্যবস্থায় এই বিধির গুরুত্ব

উপ... গণ অধিক অর্থমূল্য ব্যয় করিতে ইচ্ছুক, অর্থাৎ যেগুলি ... বলে ভো... দ্বৃত্ত লাভ অধিক হয় সেইগুলি সাধারণতঃ কর ধার্যের উপযোগী ... কিন্তু তাহা বলিয়া করভার এমন উচ্চহারে ধার্য করা উচিত নয়, ... ঐ দ্রব্যগুলির ভোগোদ্বৃত্ত একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ করব্যবস্থা সম... কল্যাণের পরিপন্থী।

চতুর্থতঃ, দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ খাদকের ভাগ উদ্বৃত্তদ্বারা পরিমাপ করা চলে। আমরা যে সকল দ্রব্য সাধারণতঃ অধিক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রয়োগ

মূল্যে আমদানী করিয়া থাকি, তাহা যদি অপেক্ষাকৃত অল্পদামে খরিদ করিতে পারা যায়, তাহা হইলে আমাদের ভোগোদ্বৃত্ত লাভ হইবে।

পঞ্চমতঃ, কল্যাণ-ধর্মী অর্থবিদ্যায় (Welfare Economics) এই ধারণাটির ব্যবহারিক উপযোগিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। অর্থশাস্ত্রে সমাজে

কল্যাণধর্মী অর্থবিদ্যার ইহার গুরুত্ব

সমষ্টিগত ভোগতৃপ্তি সর্বোচ্চ পরিমাণে সংগ্রহ করিতে আগ্রহশীল। এই ভোগতৃপ্তির উপর সমাজ-কল্যাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। সমাজের উৎপাদক শ্রেণী দ্রব্যযোগান ও পণ্যমূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করিবে যাহাতে খাদক শ্রেণীর ভোগোদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ সংকুচিত হইয়া তাহাদের নিজেদের মুনাফার অংক বৃদ্ধি না পায়। কল্যাণকামী সরকারের ব্যবস্থার মূলনীতি হইবে উৎপাদকের লোকসান বরদাস্ত করিয়াও খাদকের সর্বোচ্চ ভোগোদ্বৃত্ত লাভ কায়েমী করা।

পরিশেষে, ভোগোদ্বৃত্ত তত্ত্বটির বাস্তব প্রয়োজনীয়তা আরও উপলব্ধি করা যায় যখন উহার মাপকাঠিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন যুগের অর্থনৈতিক অবস্থার

তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণে ইহার উপযোগিতা

তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণ করা হয়। যদি কোন দুইটি দেশের শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা তুলনা করিতে হয়, কিংবা ধর, কুড়ি বৎসর পূর্বেকার শ্রমিকের অবস্থার সহিত আজিকার শ্রমিকের অবস্থা তুলনা করিতে হয়, তাহা হইলে এই তুলনা করিবার একটি বড় মাপকাঠি হইবে ঐ দুইটি দেশের শ্রমিকের কিংবা দুই বিভিন্ন সময়ের শ্রমিকের ভোগোদ্বৃত্ত লাভের পরিমাণ পরিমাপ করা। অন্যান্য অবস্থা যদি ... তাহা হইলে যে দেশে বা যে সময়ে শ্রমিক অপেক্ষাকৃত অধিক পরি... লাভ করে, সেই দেশের বা সেই সময়ের শ্রমিকের আর্থিক ... ভাল।

অনুশীলনী

1. State the Law of Diminishing Utility with its limitations. Discuss the economic importance of the concept.

2. State the relation between marginal utility and total utility. Explain the importance and limitations of the concept of marginal utility.

3. Show how a person's expenditure tends to be distributed between the different items of his consumption, so as to secure for him the maximum satisfaction?
(C. U. B. A. '53)

4. "The application of the principle of substitution extends over almost every field of economic enquiry"—Explain.

5. Explain what Marshall means by consumer's surplus. Show how it is related to individual demand price and to market price. (C. U. B. A. '51' & '54)

6. Indicate the theoretical and practical importance of the doctrine of consumer's surplus.

7. Do you agree with the view that the doctrine of consumer's surplus is "a totally useless theoretical tool?"
(C. U. B.A. Hons. '54)

8. How would you explain the demand of a consumer in terms of his preferences? Is this explanation an improvement upon that in terms of utilities?
(C. U. B.A. Hons '51)

9. Explain the concept of 'Indifference Curves.' How are they helpful in explaining the law of consumer's demand?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যোগান ও উৎপাদন খরচ (Supply and Cost of Production)

যোগানের নিয়ম (Law of Supply) : আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কোন কোন দ্রব্যের চাহিদা বাজারমূল্যের সংগে সম্পর্কযুক্ত। সেইরূপ কোন কোন দ্রব্যের যোগানও বাজারমূল্যের সংগে সম্পর্কযুক্ত। দ্রব্যের যোগান বলিলেই আমরা বুঝি কোন বিশেষ এক বাজার দামে জিনিষের সরবরাহ। চাহিদার যেমন সাধারণ নিয়ম আছে, যোগানেরও তেমনি একটি সাধারণ নিয়ম আছে। যোগানের নিয়মের বৈশিষ্ট্য এই যে, দ্রব্যের বাজার মূল্য হ্রাস হইলে উহার যোগান কমিবে ; আবার দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, উহার যোগানও বাড়িবে। বাজার মূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে যোগানের গতি কোন্ দিকে যায়, বাড়ে না কমে, তাহাই যোগানের নিয়ম নির্দেশ করে। অবশ্য, এই সাধারণ নিয়মের বিচ্যুতিও ঘটিতে পারে। এমন অনেক দ্রব্য আছে, যাহার যোগান স্থির ও সীমিত ; যেমন, র‍্যাফেলের (Raphael) অংকিত চিত্র। ইহার যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি বাজার দামের উপর নির্ভর করে না। সাধারণতঃ, বিভিন্ন বাজার দামে যে বিভিন্ন যোগান একক সরবরাহ হয়, তাহার একটি নির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুত করা যায়। এই তালিকাকে যোগান সূচী (Supply Schedule) বলে। এই যোগান সূচী আবার যোগান বক্ররেখা (Supply Curve) দ্বারা চিত্রাংকিত করা যায়।

যোগানের নম্যতা (Elasticity of Supply) : বাজার মূল্য উঠানামার ফলে পণ্য যোগানের পরিবর্তন গতি কোন দিকে হয়, তাহা যোগানের নিয়ম নির্দেশ করে। আর, বাজার মূল্যের পরিবর্তনের ফলে পণ্য যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাণ হার কি হয়, তাহা ধার্য হয় যোগান নম্যতার বিধিদ্বারা। যে অনুপাতে বাজার মূল্যের পরিবর্তন হয়, তাহার চেয়ে অধিক অনুপাতে যদি যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাকে নম্য-যোগান বলা যায় (Elastic Supply)। আর, বাজার মূল্য পরিবর্তনের অনুপাতে দ্রব্য যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধির অনুপাত যদি কম হয়, তাহা হইলে সে অবস্থাকে অনম্য যোগান (Inelastic Supply) বলা চলে। মূল্য পরিবর্তন ও যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি যদি সমানানুপাতিক হয়, তাহা হইলে দ্রব্য যোগানের একক নম্য অবস্থা হইবে

(Unit-Elasticity of Supply)। নিম্নাংকিত চিত্রে নম্য ও অনম্য যোগানের বক্ররেখা দেখান হইল।

নম্য যোগানের বক্ররেখা অনম্য যোগানের বক্ররেখা
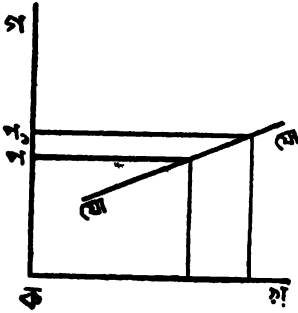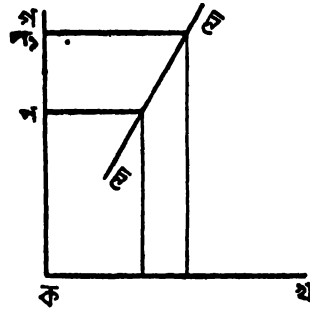
২১শ চিত্র ২২শ চিত্র

যোগানের নম্যতা ও অনম্যতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, দ্রব্যের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুসারে যোগানের রকম ফের হয়। যে সকল বস্তু সাধারণতঃ ক্ষয়িষ্ণু, যেমন, দুগ্ধ, মৎস্য, শাকসব্জী প্রভৃতি, উহাদের যোগান অনম্য। এই সকল দ্রব্য সরস অবস্থায় বেশী দিন গুদামজাত করিয়া রাখা যায় না বলিয়া পচন ধরিবার আগেই অল্প মূল্যেই বিক্রয় করিতে হয়। কিন্তু টেকসই বস্তুর বাজার দাম যদি কম্‌তি হয়, তাহা হইলে উহা বিক্রি না করিয়া ধরিয়া রাখা চলে। অল্প সময়ের মিয়াদে টেকসই বস্তুর যোগান সেই জন্য নম্য হয়।

দ্বিতীয়তঃ, যে সকল বস্তু অল্প খরচে গুদামজাত করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও সম্ভাবনা আছে, উহাদের যোগান নম্য হয়।

তৃতীয়তঃ, যে সকল মাল দীর্ঘমিয়াদে খালাস (delivery) ও অর্পণ করা হয় উহাদের বেলায় যোগান নম্য হয়। যেখানে দীর্ঘকাল পর মাল খালাস করিবার চুক্তি থাকে, সেখানে মাল সরবরাহের পরিমাণ সহজেই হ্রাস-বৃদ্ধি করা চলে।

চতুর্থতঃ, যদি শ্রম ও কাঁচামালের যোগান সীমিত হয়, তাহা হইলে পণ্য যোগান বৃদ্ধি করা সহজ নহে; ফলে যোগান অনম্য হয়।

পঞ্চমতঃ, কোন. শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ক্ষমতা (production capacity) যদি সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ বা বাঞ্ছনীয় স্তর (optimum level) পর্যন্ত উৎপাদনে পণ্য যোগান নম্য হইবে।

ষষ্ঠতঃ, যদি দ্রব্য উৎপাদন পদ্ধতি জটিল না হয়, যদি কারিগরি বিদ্যা ও যন্ত্র ব্যবহারের পরিবর্তন না হয়, অর্থাৎ স্থায়ী মূলধন পরিবর্তন অতি সামান্যই করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের যোগান নম্য হইবে।

সপ্তমতঃ, যদি একটি মুখ্য পণ্য উৎপাদনের সংগে সংগে আর একটি গৌণ পণ্য বা উপজাত দ্রব্য (bye-product) উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে মুখ্য পণ্যটির যোগান অনম্য হইবে। যেমন, গোমাংস মুখ্য পণ্য ও চামড়া উপজাত পণ্য। গরুর মূল্যের সামান্য অংশই চামড়া বিক্রয় করিয়া পাওয়া যায়। সুতরাং চামড়ার বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইলে, মাংসের যোগান বৃদ্ধির জন্য অধিক সংখ্যক গো-জবাই হইবে না।

পরিশেষে, যোগান নম্যতা বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদকের সম্মুখে বিস্তৃত বিকল্প পথ খোলা আছে কিনা (the range of alternatives open to the producers) তাহার উপর। যদি বিক্রেতার সম্মুখে মাল বিক্রয়ের বহু বাজার খোলা থাকে, তাহারা যদি রকমারি দ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে এবং এক দ্রব্য ছাড়িয়া অন্য দ্রব্যের সরবরাহ অতি সহজেই করিতে পারে, তাহা হইলে মালের যোগান নম্য হইবে।

উৎপাদন খরচ (Costs of Production) : ব্যক্তি বিশেষেরই হউক, কিংবা প্রতিষ্ঠানেরই হউক, বিক্রেতার মাল যোগান একদিকে যেমন বাজার মূল্যের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে সেইরূপ উৎপাদন খরচদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। প্রত্যেক বিক্রেতারই লক্ষ্য সেই পরিমাণ পণ্য উৎপাদন ও সরবরাহ করা, যাহার সম্ভাব্য খরচ পড়ে সর্বনিম্ন।

প্রতিষ্ঠানের খরচ বলিতে আমরা বুঝি উহার গোটা অর্থব্যয়, যাহাদ্বারা সংগঠন কর্তা বিভিন্ন উৎপাদক কারকের বিনিয়োগ করিতে পারে। এই অর্থ ব্যয় বলিতে প্রথমতঃ, সমস্ত কারকের ক্রয় মূল্য বুঝায়। কারকের ক্রয় মূল্য অর্থ, (ক) শ্রমিকের মজুরী (খ) কারখানা গৃহের খাজনা (গ) বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ (ঘ) কলকব্জা যন্ত্রপাতি প্রভৃতি স্থায়ী মূলধনের অবচয় বাবদ খরচ (depreciation charges) এবং পরিচালনা খরচ। ইহা ছাড়া কাঁচামাল ক্রয় খরচ, বাজার চালু করিবার জন্য বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার খরচ, সরকারী কর বাবদ খরচ প্রভৃতি মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরা হয়। পরিশেষে, সংগঠন কর্তা নিজেই যদি জমির বা কারখানা গৃহের মালিক হন, কিংবা নিজের

অর্থব্যয় কি ? (What is money cost of production ?)

মূলধন [illegible]র বিনিযোগ করেন কিংবা নিজেই যদি দৈনন্দিন পরিচালনা তদারক করেন, তাহা হইলে সম্ভাব্য বাজার দরে তাহার জমির মূল্য বাবদ খাজনা, মূলধনের জন্য সুদ ও পরিচালনার জন্য মজুরী প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপাদন ব্যয় ভুক্তি করিতে হয়।

পরিবর্তনশীল ও স্থায়ী খরচ (Variable and Fixed Costs) : প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন খরচ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হইতে পারে—পরিবর্তনশীল খরচ ও স্থায়ী খরচ। অধ্যাপক মার্শাল পরিবর্তনশীল খরচকে **প্রাথমিক ব্যয় (Prime Costs)** এবং স্থায়ী খরচকে **পরিপূরক ব্যয় (Supplementary Costs)** বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। সাধারণতঃ, ব্যবসায়ীরা স্থায়ী খরচকে **উপরাঙ্গিক ব্যয় (Overhead Costs)** বলিয়া থাকে।

পরিবর্তনশীল খরচ বলিতে আমরা প্রতিষ্ঠানের সেই সকল অর্থ ব্যয় বুঝি যাহার হ্রাস বৃদ্ধি পণ্য যোগান পরিমাণের অদল বদলের সংগে সংগে ঘটে। প্রতিষ্ঠান যদি কখন নিষ্ক্রিয় অবস্থায় বসিয়া থাকে, কোন পণ্য উৎপাদন না হয়, তাহা হইলে পরিবর্তনশীল খরচের খাতে শূন্য হইবে। সাধারণতঃ কাঁচামালের ক্রয় মূল্য, শ্রমিকের মজুরী বাবদ ব্যয় প্রভৃতি পরিবর্তনশীল খরচভুক্তি করা হয়।

স্থায়ী খরচ বলিতে সেই সকল ব্যয় বুঝায় যাহা সকল অবস্থাতেই প্রতিষ্ঠানকে বহন করিতে হয়। যদি কিছু কালের জন্য উৎপাদন স্থগিতও থাকে তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী খরচ শূণ্য হইতে পারে না। প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী খরচের মধ্যে আমরা সাধারণতঃ কারখানা গৃহের ভাড়া বাবদ খাজনা, দীর্ঘ মিয়াদী মূলধনের সুদ, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, অবচয় বাবদ খরচ, প্রধান প্রধান কর্মকর্তাদের মাহিনা ও অন্যান্য সংস্থা-ব্যয় (establishment charges) প্রভৃতি ধরিয়া থাকি।

স্থায়ী ও পারবর্তনশীল খরচের যে পার্থক্য আমরা করিলাম উহা মূলতঃ ঠিক নয়। **প্রথমতঃ**, এই পার্থক্যটি বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা নীতির উপর। সাধারণতঃ শ্রমিকের মজুরী পরিবর্তনশীল খরচভুক্তি করা হইয়া থাকে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠান যদি নির্দিষ্ট কালের জন্য চুক্তি আবদ্ধ হইয়া শ্রমিক নিয়োগ করে, তাহা হইলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কারণে উৎপাদন স্থগিত থাকিলেও ঐ প্রতিষ্ঠানকে শ্রমিকের মজুরী চুক্তি অনুযায়ী দিতেই হইবে। এ ক্ষেত্রে কিন্তু শ্রমিকের মজুরী স্থায়ী খরচের মধ্যে ধরিতে হয়।

স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল খরচের পার্থক্যের গুরুত্ব
(Importance of the distinction between fixed and variable costs)

দ্বিতীয়তঃ, অল্পকালীন মিয়াদে দ্রব্যমূল্য নির্ধানের স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল খরচের তফাৎ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দীর্ঘকালীন মিয়াদে এই পার্থক্যের কোনই উপযোগিতা নাই। অল্পকালীন অর্থে সেই সময়-মিয়াদ বুঝায়, যাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠানের আকার ও আযতন হ্রাস বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, কিংবা নূতন সাজসরঞ্জাম বা কলকব্জাদ্বারা নূতন পদ্ধতিতে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। এই সময়-মিয়াদে শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যারও কোন হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দীর্ঘকালীন সময়-মিযাদে প্রতিষ্ঠানের আকার আয়তনের পরিবর্তন, উৎপাদন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন এবং শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি সম্ভব হয। অল্পকালীন বাজার দামে কোন প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ (স্থায়ী + পরিবর্তনশীল) না উঠিয়া আসিলেও, প্রতিষ্ঠান পণ্য যোগান বন্ধ করে না। যদি গোটা পরিবর্তনশীল ব্যয় এবং কিছুটা স্থায়ী ব্যয় বাজার মূল্য হইতে উঠিয়া আসে, তাহা হইলেই প্রতিষ্ঠান অল্পকালীন মিয়াদে দ্রব্য যোগান দিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন মিযাদে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের পরিমাণমাফিক সকল স্থাযী উৎপাদক কারকের (fixed factors of production) পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। দীর্ঘ মিয়াদে দ্রব্য উৎপাদনের হ্রাস বৃদ্ধির সংগে সংগে প্রতিষ্ঠানের আকার, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, পরিচালকমণ্ডলী প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন ও সংস্কার অনিবার্য হয়। দীর্ঘকালীন উৎপাদনের উঠা নামার সংগে সংগে সকল স্থাযী কারক বিনিয়োগ বাবদ যে খরচ তাহাও পরিবর্তন হইতে বাধ্য। সেই জন্য দীর্ঘকালীন মিয়াদে সকল উৎপাদন খরচই পরিবর্তনশীল —স্থায়ী খরচ বলিয়া পৃথক কিছু নাই।

দীর্ঘকালীন মিয়াদে উপরাঙ্গিক খরচ কি সত্যিকারের খরচ ? (Are overhead costs true costs in the long period ?)

আমরা দেখিয়াছি যে, অল্পকালীন মিযাদে উপরাঙ্গিক খরচ পণ্য উৎপাদন পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির সংগে সম্পর্কশূণ্য। উৎপাদন যদি কিছু কালের জন্য বন্ধও থাকে, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠানের উপরাঙ্গিক খরচ থাকিবেই। অল্পকালীন মিয়াদে দ্রব্য মূল্য হইতে গোটা উপরাঙ্গিক খরচ নাও উঠিতে পারে ; যদি মোট পরিবর্তনশীল খরচ ও সামান্য উপরাঙ্গিক খরচ উঠিয়া আসে তাহা হইলেই প্রতিষ্ঠান বাজারে মাল যোগান চালু রাখিতে পারে। কিন্তু দীর্ঘকালীন মিয়াদে উপরাঙ্গিক খরচ পরিবর্তনশীল খরচে রূপান্তরিত হয়। এবং এই খরচ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকেই বাজার মূল্য হইতে উশুল করিতেই হয়। দীর্ঘকালীন মিয়াদে গোটা পরিবর্তনশীল

খরচই একমাত্র খরচ, কেননা উহাই পণ্য যোগান ও বাজার মূল্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। উপরাঙ্গিক খরচ পরিবর্তনশীল খরচে রূপান্তরিত হয় বলিয়া দীর্ঘকালীন মিয়াদে উহা সত্যিকারের খরচ।

গড়পড়তা মোট খরচ, গড়পড়তা স্থায়ী খরচ এবং গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ (Average Total Costs, Average Fixed Costs and Average Variable Costs.) : আমরা জানি যে **মোট খরচ = মোট স্থায়ী খরচ + মোট পরিবর্তনশীল খরচ**। মোট খরচ হইতে আবার গড়পড়তা মোট খরচ নির্ণয় করা যায়। **গড়পড়তা মোট খরচ = মোট খরচ ÷ উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ**। যদি মোট খরচ হয় ২৪৲ এবং উৎপন্ন দ্রব্য একক হয় ১২, তাহা হইলে গড়পড়তা খরচ হইবে ২৪৲ ÷ ১২ = ২৲। সেইরূপ **গড়পড়তা স্থায়ী খরচ = মোট স্থায়ী খরচ ÷ উৎপন্ন দ্রব্য পরিমাণ। গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ = মোট পরিবর্তনশীল খরচ ÷ উৎপন্ন দ্রব্য পরিমাণ।** গড়পড়তা মোট খরচ আবার গড়পড়তা স্থায়ী খরচ ও গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচের যোগফলের সমান।

গড়পড়তা স্থায়ী খরচ, গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ ও গড়পড়তা মোট খরচের বৈশিষ্ট্য (Nature of Average Fixed Costs, Average Variable Costs and Average Total Costs.) : গড়পড়তা স্থায়ী খরচ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির সংগে সংগে ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। যেমন, যদি কোন প্রতিষ্ঠানের মোট স্থায়ী খরচ ৫,০০০৲ টাকা হয়, আর উহা যদি ৫০০ মণ দ্রব্য উৎপাদন করে, তাহা হইলে গড়পড়তা স্থায়ী খরচ পড়িবে : ৫,০০০৲ ÷ ৫০০ = ১০৲। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন পরিমাণ যদি বৃদ্ধি করিয়া ১,০০০মণ করা হয়, তাহা হইলে গড়পড়তা স্থায়ী খরচ হইবে : ৫,০০০৲ ÷ ১,০০০ = ৫৲ মাত্র।

গড়পড়তা স্থায়ী খরচ (AFC)

অল্পকালীন মিয়াদে যে সকল কারক বিনিয়োগের খরচ উৎপাদন হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে অদল বদল করা যায়, সেই অর্থব্যয়কে পরিবর্তনশীল খরচ বলে। খুব অল্প পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন হইতে সুরু করিয়া প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক সর্বোচ্চ ক্ষমতার স্তর (Normal capacity level of output) পর্যন্ত যদি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকা যায়, তাহা হইলে গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধির হারের তুলনায় অতি সামান্য হারেই কমিবে। ইহার কারণ এই যে, উৎপাদন দ্রব্য পরিমাণ

গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ (A

বৃদ্ধির সংগে উৎপাদক কারক বিনিয়োগের খরচ অবিচল (constant) থাকিবে। এক্ষেত্রে বাজার চলিত (known price) দামে সমস্ত কারক পাওয়া যাইবে, এই অনুমান আমরা মানিয়া লইয়াছি। তবে উৎপাদনের স্বাভাবিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ স্তর যেখানে, তাহার কাছাকাছি দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ কিছুটা কমিবে। আবার এই স্তরের উৎপাদন পরিমাণ অতিক্রম করিয়া যদি আরও বেশী উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ উচ্চহারে বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। ইহার কারণ এই যে, এই অবস্থাতে উৎপাদক কারকগুলির খুব বেশী রকম খাটিতে হইবে, কারখানা এবং সংগঠনের উপরও অস্বাভাবিক রকম চাপ পড়িবে—ফলে উৎপাদনক্ষমতা নষ্ট হইয়া খরচ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে।

অল্প পরিমাণ উৎপাদন হইতে যদি ক্রমাগত উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় তাহা হইলে অল্পকালীন গড়পড়তা মোট খরচ দ্রুত কমিতে থাকিবে। ইহার কারণ এই, দ্রব্য পরিমাণ যতই বেশী উৎপন্ন হইবে, স্থায়ী খরচও ততই বেশী পরিমাণ দ্রব্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। যতক্ষণ পর্যন্ত গড়পড়তা স্থায়ী খরচের হ্রাসের অনুপাত গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ হ্রাসের অনুপাত হইতে বেশী হইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে, গড়পড়তা মোট খরচ কমিতে থাকিবে। কিন্তু উৎপাদনের যে স্তর হইতে গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ বৃদ্ধির অনুপাত গড়পড়তা স্থায়ী খরচের হ্রাসের অনুপাত হইতে বেশী হইতে সুরু করিবে, সেইস্তর হইতে উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে আবার গড়পড়তা মোট খরচ বাড়িতে থাকিবে। অল্পকালীন মিয়াদে গড়পড়তা মোট খরচ সর্বনিম্নস্তরে পৌছিবে তখনই, যখন প্রতিষ্ঠানের নিযুক্ত স্থায়ী ও পরিবর্তনশীল কারকগুলি যতটা সম্ভব সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয়। অল্পকালী

অল্পকালীন গড়পড়তা মোট খরচ (SATC)
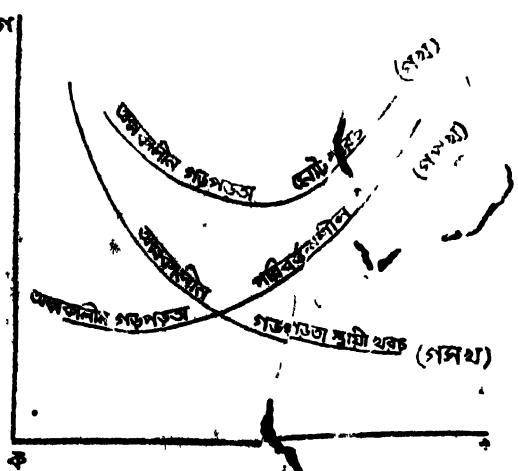
২৩শ চিত্র

মোট খরচের বক্ররেখা চিত্রিত করিলে উহা ইংরাজীতে 'U'র মত আকৃতি বিশিষ্ট হয়। ২৩শ চিত্রে (পৃঃ ১৬৭) বিভিন্ন বক্ররেখাদ্বারা গড়গড়তা স্থায়ী খরচ, গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ ও অল্পকালীন গড়পড়তা মোট খরচের প্রকৃতি বুঝান হইল।

দীর্ঘকালীন গড়পড়তা মোট খরচ (Long-run Average Total Costs) : দীর্ঘকালীন গড়গড়তা মোট খরচের বক্ররেখার আকৃতিও ইংরাজী অক্ষর U'র মতই হইবে—তবে ইহা চ্যাপটা (flat) ধরণের 'U' এর আকৃতি বিশিষ্ট। অল্পকালীন উৎপাদনে গড়পড়তা মোট খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, তাহার কারণ স্বল্প-মিয়াদে প্রত্যেক দ্রব্য এককের স্থায়ী খরচ বেশী পড়ে। কিন্তু দীর্ঘ-মিয়াদে প্রতিষ্ঠানের প্রায় গোটা স্থায়ী খরচই পরিবর্তনশীল খরচে রূপান্তরিত হয়: প্রতিষ্ঠানের সকল স্থায়ী ও অবিভক্ত কারকগুলিরই (indivisible factors) পূর্ণভাবে বিনিয়োগ ও ব্যবহার হয়। দীর্ঘকালীন মিয়াদে প্রতিষ্ঠান উৎপাদনের ক্রম (scale of operations) এমনভাবে নির্ধারিত করিতে পারে, যাহাতে সম্ভাব্য সর্বনিম্ন খরচে পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু অল্পকালীন মিয়াদে উৎপাদনের ক্রম নির্দিষ্ট (fixed) বলিয়া কোন পণ্য সম্ভাব্য সর্বনিম্ন খরচে উৎপাদন করা সম্ভব নয়। তাহাছাড়া অল্পকালীন মিয়াদে গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ যেমন দ্রুত হারে বৃদ্ধি পায়, দীর্ঘকালীন মিয়াদে ঐ খরচের বৃদ্ধির হার অপেক্ষাকৃত মন্থর হয়। দীর্ঘকালে প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক আকার ও সংগঠন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সম্ভব হয় বলিযাই পরিবর্তনশীল খরচ দীর্ঘকালীন মিয়াদে অল্পকালীন মিয়াদের চাইতে অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে বাড়ে। নিম্নাংকিত চিত্রে দীর্ঘকালীন গড়পড়তা মোট খরচের বক্ররেখা যে 'ছড়ানো' ধরণের 'U' আকৃতিবিশিষ্ট হয় তাহাই প্রকাশিত হইল
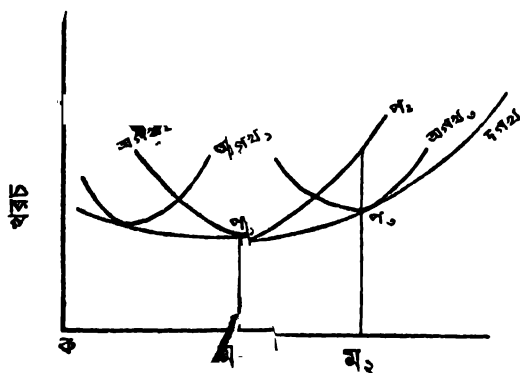
(২৪শ চিত্র) উৎপন্ন পণ্য

অনুমান করা যাক্, প্রতিষ্ঠানের অল্পকালীন গড়পড়তা মোট খরচের বক্ররেখা **অ গ খ২** এবং ইহার বাঞ্ছনীয় উৎপন্ন পণ্য (optimum output) **ক ম১**। যদি এই অল্পকাল মিয়াদে পণ্য উৎপাদন পারমাণ বৃদ্ধি করিয়া

ক ম$_{২}$ করা হয়, তাহা হইলে অল্পকালীন খরচ **ম$_{১}$ প$_{১}$** হইতে বাড়িয়া **ম$_{২}$ প$_{২}$** হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন মিয়াদে উৎপাদনের ক্রম (scale) বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় বলিয়া প্রতিষ্ঠান **ক ম$_{২}$** পরিমাণ দ্রব্য **ম$_{২}$ প$_{২}$** খরচের বদলে **ম$_{২}$ প$_{৩}$** খরচেই তৈয়ারী করিতে পারিবে। **অ গ খ$_{১}$**, **অ গ খ$_{২}$**, **অ গ খ$_{৩}$** এই তিনটি অল্পকালীন গড়পড়তা খরচের বক্ররেখা উৎপাদনের তিনটি বিশেষ ক্রম নির্দেশ করিতেছে। **দ গ খ** বক্ররেখাটি দীর্ঘকালীন গড়পড়তা খরচ সূচক। এই বক্র রেখাটি তিনটি অল্পকালীন বক্ররেখার স্পর্শক। দীর্ঘকালীন গড়পড়তা মোট খরচের বক্ররেখা **দ গ খ**এর আকৃতি চ্যাপ্টা Uর মত।

প্রান্তিক খরচ (Marginal Cost) : এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে, তাহার ফলে মোট খরচ যতটা বৃদ্ধি পাইবে, সেই বৃদ্ধির পরিমাণ হইল প্রান্তিক খরচ। যদি দুই একক দ্রব্য উৎপাদনের মোট খরচ ২০৲ টাকা হয়, এবং ৩ একক দ্রব্য উৎপাদনের মোট খরচ ২২৲ টাকা হয়, তাহা হইলে তৃতীয় এককের প্রান্তিক খরচ হইবে ২৲টাকা। মনে রাখিতে হইবে যে, মোট খরচ কতটা পরিমাণ বৃদ্ধি পায় তাহাই প্রান্তিক খরচ নির্দেশ করে, গড়পড়তা মোট খরচ কিংবা গড়পড়তা স্থায়ী খরচের বৃদ্ধি কতটা হয় তাহা বুঝায় না। দ্রব্য পরিমাণ এক একক বৃদ্ধি করিলে সাধারণতঃ স্থায়ী খরচ বড় একটা বাড়ে না, পরিবর্তনশীল খরচই বাড়িয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া প্রান্তিক খরচ এবং গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ এক নয়। এক একক দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে মোট পরিবর্তনশীল খরচ কতটা বৃদ্ধি পায়, প্রান্তিক খরচ ইহাই পারমাপ করে। কিন্তু গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ নির্ধারণ করা যায় মোট পরিবর্তনশীল খরচকে মোট উৎপাদন পরিমাণদ্বারা ভাগ করিয়া।

গড়পড়তা খরচ ও প্রান্তিক খরচের সম্বন্ধ (Relation **Average Cost and Marginal Cost) :** গড়পড়তা খরচ উৎপাদনের উপর নির্ভর করে। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক খরচ গড়পড়তা খরচের থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া গেলে গড়পড়তা খরচ থাকিবে। যেখানে প্রান্তিক খরচ গড়পড়তা খরচের সমান হ গড়পড়তা খরচের সর্বনিম্ন স্তর। আবার প্রান্তিক খরচ যখন চেয়ে অধিক হয়, তখন উৎপাদন বৃদ্ধি করিলে গড়পড়তা থাকিবে।

২৫শ চিত্রে **ক ম** অবধি দ্রব্য উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে গড়পড়তা খরচ হ্রাস পাইতে থাকিবে; কেননা, ঐ অবধি প্রান্তিক খরচ গড়পড়তা খরচের চেয়ে কম। যখন **ক ম** পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হইবে তখন, গড়পড়তা খরচ হইবে সর্বনিম্ন। এখানেই প্রান্তিক খরচ ও গড়পড়তা খরচ সামান হইবে।
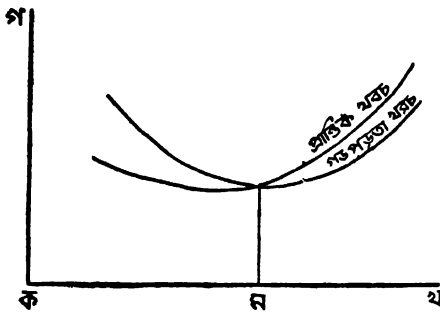
২৫শ চিত্র

ক ম র চেয়ে যদি উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে গড়পড়তা, আবার বাড়িতে সুরু করিবে, কেননা এই অবস্থাতে প্রান্তিক খরচ গড়পড়তা খরচের চেয়ে অধিক।

প্রকৃত খরচ (**Real Costs**): এ যাবৎ যে খরচের বিশ্লেষণ আমরা করিয়াছি উহাকে অর্থ খরচ বা অর্থব্যয় (money cost) বলা হয়। কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে বিভিন্ন কারক বিনিয়োগ করিতে যে খরচ হয় উহাই অর্থব্যয়। কিন্তু বিভিন্ন কারককে পণ্য উৎপাদন করিবার জন্য যে প্রচেষ্টা করিতে হয়, কিংবা যে বিসর্জন ও অপযোগ ঘাড়ে লইতে হয়, তাহার প্রকৃত পরিমাপ করা অর্থ-ব্যয় (money cost) দ্বারা সম্ভব নয়। অল্পকালীন মিয়াদে অনেক সময় দেখা যায়, হয়ত কোন কারকের এমন স্বল্প অর্থ মূল্যে বিনিয়োগ ঘটিতেছে যে, উহা ঐ কারকেব কর্ম প্রচেষ্টার অনুরূপ মূল্য বা পুরস্কার আদৌ নয়। সেই জন্য মার্শাল প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ খরচ বলিতে প্রকৃত খরচ বুঝিয়া থাকেন। এই প্রকৃত খরচ বলিতে সেই অর্থ-ব্যয় বুঝায় যাহা, সকল ... কারক সমূহের প্রচেষ্টার এবং অনিশ্চয়তা-অপযোগ ভোগের পরিমাপ ... প্রত্যেক উৎপাদক কারককেই ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, দৈহিক বা ... শ্রম করিতে হয় কিংবা অপযোগ ভোগ করিতে হয়। প্রকৃত খরচ ... কাঠি দ্বারা কারকগণের মানসিক অপযোগ ভোগ ও ত্যাগ স্বীকারের ... াপ করে। কিন্তু প্রকৃত খরচের এই বিশ্লেষণ মানসিক ধারণা ... ান মোটেও বাস্তব ব্যাখ্যান নয়। কারকগণের ত্যাগ স্বীকার, ... ভূতি মানসিক কার্যক্রম বিশেষ। অর্থের মাপকাঠিতে ... বাস্তব পরিমাপ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন কারকের

(২৪শ

অর্থ-আয়ও সকল সময় তাহাদের কার্যক্রমের উপযুক্ত পুরস্কারস্বরূপ নয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, শ্রমিক বেশী ত্যাগ স্বীকার করিল কিন্তু সেই অনুপাতে তাহার অর্থ-আয় অপেক্ষাকৃত অল্প পাইল।

সুযোগ-খরচ (Opportunity Cost) : প্রকৃত খরচ তত্ত্ব অবাস্তব বলিয়া, আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ সুযোগ-খরচ তত্ত্ব বলিয়া খরচের আর একটি ব্যাখ্যান দিয়াছেন। আমাদের উদ্দেশ্য বহুল, অভাব অফুরন্ত। কিন্তু সেই তুলনায় কারকের যোগান সীমিত। প্রত্যেক কারকেরই বিকল্প কারবারে (alternative occupations) বিনিয়োগ হইতে পারে। যেমন, কোন শ্রমিকের তুলা শিল্পে নিয়োগ হইতে পারে, আবার একই সময়ে পাট শিল্পেও নিয়োগের সম্ভাবনা হইতে পারে। যদি বিভিন্ন কারকের কিছুপরিমাণ এক শিল্পে ও কারবারে বিনিয়োগ হয়, তাহার অর্থই অন্যান্য বিকল্প শিল্প বা কারবার ঐ কারকগুলির কৃত্য হইতে বঞ্চিত হইবে। যখন একটি দ্রব্য উৎপাদন করিতে বিভিন্ন কারকের কিছু পরিমাণ নিয়োজিত হয়, তখন অন্য একটি দ্রব্য তৈয়ার করিতে ঐ পবিমাণ কারকের যোগান কম্‌তি হইবে। প্রথম দ্রব্যটির উৎপাদন খরচ হইবে সেই অর্থ ব্যয়, যাহা বিভিন্ন কারককে বিকল্প দ্রব্য উৎপাদন হইতে ছাড়াইয়া আনিবার মূল্য স্বরূপ প্রথম কারবারকে ব্যয় করিতে হয়। একটি কারবার যখনই একটি দ্রব্য উৎপাদন করে, তখনই বিকল্প কারবারের সামগ্রী উৎপাদনের সম্ভাবনা ও সুযোগ কমিয়া যায়। প্রথম কারবারটির সুযোগ-খরচ হইল সেই ব্যয় যাহাদ্বারা বিকল্প শিল্প কারবারের উৎপাদনের সুযোগ স্থানান্তরিত হয়। 'Cost is the cost of displaced alternatives.' কোন কারবারের মোট খরচের পরিমাণ হইবে ততটা, যতটা অর্থ আয়ে বিভিন্ন কারকগণ ঐ কারবারে নিয়োজিত হয়। কারকগণের এই অর্থ আয়ের পরিমাণ কম পক্ষে এতটা হওয়া চাই, যতটা উহারা বিকল্প কারবারে লাভ করিতে পারিত।

অনুশীলনী

1. What is elasticity of supply ? On what factors does it depend ?
2. Distinguish between prime costs and supplementary costs and examine the bearing of this distinction on the theory of value.

3. Define overhead costs. Is it true that overhead costs are true costs only in the long period ?

(C.U.B.Com. '53)

4. Explain the nature of average total cost both in the short period and in the long period.

5. Bring out clearly the relation between average cost and marginal cost.

6. Write short notes on :

(a) Real Cost and (b) Opportunity Cost.

চতুর্দশ অধ্যায়

বিনিময় (Exchange)

ক্রেতা ও বিক্রেতার ক্রয়বিক্রয়ের কারবারকে বিনিময় বলে। মানব ইতিহাসের প্রথম অধ্যায়ে বিনিময়ের কোন প্রশ্নই উঠে নাই। প্রত্যেক ব্যক্তিরই তখন স্ব স্ব প্রয়োজনীয় সামগ্রী যোগান ব্যাপারে পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। কিন্তু সভ্যতার উৎকর্ষের সংগে সংগে মানুষের অভাব যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং কর্ম বিভাগ যখন অনিবার্য হইয়া উঠিল, তখন দ্রব্য বা কৃত্য বিনিময় আবশ্যক হইয়া পড়িল। প্রথমটায় বস্তু বিনিময়ের প্রবর্তন হইল—বস্তুর বদলে বস্তুর বদলাই হইতে লাগিল। কিন্তু বস্তু বিনিময় প্রথার অসুবিধা ও কুফল যখন উৎকটভাবে দেখা গেল, তখন অর্থের মাধ্যমে বস্তু বিনিময় প্রথার প্রচলন হইল। বিনিময়ের তাগিদেই বাজারের প্রতিষ্ঠা। আজিকার অর্থব্যবস্থায় বিনিময় বাজার যে শুধু কোন বিশেষ দেশের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত তাহা নহে। আজিকার বিনিময় বাজার আন্তর্জাতিক। বিনিময় বাজার যেমন পণ্যদ্রব্য সম্পর্কীয় হইতে পারে, উহা আবার উৎপাদক কৃত্য (productive services) সম্পর্কীয়ও হইতে পারে।

বাজার (Market) : সাধারণ অর্থে বাজার বলিতে আমরা কোন নির্দিষ্ট স্থান বুঝি ; এই স্থানে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণ একত্রিত হইয়া বেচা কেনা করিয়া থাকে। কিন্তু অর্থশাস্ত্রে বাজার কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তিনটি উপাদানের সমষ্টিতে বাজারের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমতঃ, বিনিময় পণ্য বর্তমান

থাকা চাই। দ্বিতীয়তঃ, ঐ পণ্যের ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকা চাই। এবং তৃতীয়তঃ, ক্রেতা বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকা চাই। বিখ্যাত ফরাসী অর্থবিদ্যাবিদ কুরনট্ (Cournot) বাজারের সংগা নির্দেশ করিয়াছেন এইরূপে: 'Economists understand by the term market not any particular market-place in which things are bought and sold, but the whole of any region in which, buyers and sellers are in such free intercourse with one another that, the prices of the same goods tend to equality easily and quickly.'

সকল পণ্যের বাজার এক রকম নহে। আবার একই পণ্যের বাজার বিস্তৃতিরও রকমভেদ হইতে পারে। বাজারের আকার বা বিস্তৃতি বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ**, পণ্যদ্রব্যের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতির উপর বাজারের বিস্তৃতি লাভ বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি পণ্য টেকসই হয়, কিংবা উহা যদি ভালভাবে পর্যায়িত (graded) হইবার যোগ্য হয়, তাহা হইলে উহা সুবিস্তৃত বাজারে চালু হইবার উপযুক্ত হইবে। পচনশীল বস্তু অধিকদিন গুদামজাত করিয়া ধরিয়া রাখা যায় না। যে দ্রব্য পর্যায়িত হইবার অনুপযুক্ত, তাহার গুণাগুণ সম্বন্ধে ক্রেতাগণ নিশ্চিত হইতে পারে না। এই ধরণের পণ্যবস্তুর বাজার সীমিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, যে সকল পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ব্যাপক ও নিয়মিত (regular) উহাদের বাজারও সুবিস্তৃত। যে সকল দ্রব্যের চাহিদা স্থানিক (local) কিংবা যেগুলি পুনঃ উৎপাদনশীল নয় (non-reproducible) উহাদের বেলায় বাজার বিস্তৃতি ঘটে না। **তৃতীয়তঃ**, যে সকল দ্রব্যের অপেক্ষাকৃত অধিক বহন যোগ্যতা (portability) আছে, অর্থাৎ যে সকল সামগ্রীর স্থূলতা কম কিন্তু বাজার দাম বেশী এবং তাড়াতাড়ি স্থানান্তরিত হইবার উপযুক্ত, তাঁহাদের বাজারও সুবিস্তৃত হয়। যেমন, সোণারূপা, মূল্যবান্ ধাতু, আন্তর্জাতিক ঋণপত্র, ইত্যাদি। **চতুর্থতঃ**, বাজার বিস্তৃতি কর্মবিভাগের প্রয়োগের উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি কর্মবিভাগের ব্যাপক প্রয়োগ হয়, তাহা-হইলে পণ্যমূল্য সস্তা হইবে এবং পণ্যমূল্য সস্তার সংগে সংগে বাজারের বিস্তৃতি লাভ ঘটিবে। **পরিশেষে**, দেশের শান্তি, নিরাপত্তা, মুদ্রাব্যবস্থা, দাদন প্রথা, কর ব্যবস্থা প্রভৃতিও বিনিময় বাজার ব্যাপক বা সংকুচিত করিতে সহায়তা করে।

বাজারের বিস্তৃতি (Extent of the market)

বাজারের বর্গীকরণ (Classification of Markets) : বিনিময় বাজার রকমারি হইতে পারে। বাজার স্থানীয় (local), দেশীয় (national) এবং আন্তর্জাতিক (international) হইতে পারে। আবার বাজার অত্যন্ত অল্পকালীন (very short-period), অল্পকালীন (short-period), দীর্ঘকালীন (long period) এবং যৌগিক (secular) হইতে পারে। ইহাছাড়া, বাজার পূর্ণাংগ (perfect) এবং অপূর্ণাংগ (imperfect) হইতে পারে।

পণ্য মূল্যতত্ত্ব বিশ্লেষণে স্থানের তারতম্য অনুসারে বাজারের বর্গীকরণ অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু সময়ের তারতম্য অনুসারে বাজারের বর্গীকরণ মূল্যতত্ত্ব নিরূপণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **অত্যন্ত অল্পকালীন বাজার** বলিতে আমরা বুঝি এমন এক অবস্থা, যখন বিক্রেতার হাতে সময় খুবই অল্প এবং এই সময়ের মধ্যে যোগান হ্রাসবৃদ্ধি করা তাহার পক্ষে অসম্ভব। ক্ষয়িষ্ণু পণ্যদ্রব্যের কোন একদিনের বাজার এই পর্যায়ে পড়ে। অত্যন্ত অল্পকালীন বাজারে দ্রব্য মূল্য নিরূপিত হয় বিশেষভাবে চাহিদার সদা-চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল অবস্থাদ্বারা। **অল্পকালীন-বাজার** বলিতে সেই বাজার বুঝায়, যেখানে বিক্রেতার পণ্য যোগান হ্রাসবৃদ্ধির মত সময় হাতে আছে বটে, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম পরিবর্তন করিয়া চাহিদা মাফিক সম্পূর্ণভাবে যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করিবার মত যথেষ্ট সময় হাতে নাই। অল্পকালীন বাজারের দুইটি বৈশিষ্ট্য আছে : (১) প্রত্যেক উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আকার, সংগঠন, সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদন পদ্ধতির কোনই পরিবর্তন সম্ভব নয়। (২) শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধিও সম্ভব নয়। **দীর্ঘকালীন বাজারে** বিক্রেতার চাহিদার অদলবদল অনুসারে যোগান পরিপূর্ণভাবে হ্রাসবৃদ্ধি করিবার মত প্রচুর সময় হাতে থাকে। দীর্ঘকালীন বাজারে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই ইহার আকার আমূল পরিবর্তন করিবার মত সময় পায়। উহার সংগঠন, সাজসরঞ্জাম, উৎপাদন পদ্ধতিরও হ্রাস বৃদ্ধি বা অদল বদল করিবার সময়ের অভাব হয় না। দ্বিতীয়তঃ, দীর্ঘকালীন বাজারে সময়ের প্রাচুর্য হেতু কোন শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি হইতে কোন অসুবিধাই হয় না। এই বাজারে দ্রব্য যোগান চাহিদানুরূপ সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হইতে পারে বলিয়া অনেকে ইহাকে **স্বাভাবিক বাজার (Normal**

অত্যন্ত অল্পকালীন বাজার (very short-period market)

অল্পকালীন বাজার (short-period market)

দীর্ঘকালীন বাজার (long-period market)

market) বলিয়া থাকেন। যৌগিক বাজারে বিক্রেতার হাতে এত সুদীর্ঘ সময় থাকে যে, সে যে শুধু পণ্য যোগান হ্রাস বৃদ্ধি করিবার মত সুযোগ পায় তাহা নহে, নূতন নূতন আবিষ্কার ও উৎপাদন পদ্ধতির উদ্ভাবনদ্বারা যোগানকে সক্রিয় ও প্রগতিশীল (dynamic) করিয়া তুলিতেও সুযোগ পায়। এই ধরণের বাজারের সময়কাল পঞ্চাশ বৎসর কিংবা তাহারও অধিক কালব্যাপী হইতে পারে।

যৌগিক বাজার (secular market)

পূর্ণাংগ বাজার (Perfect Market) : বলিতে সেই বাজার বুঝায় যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা অবাধ। এই বাজারে ক্রেতা বিক্রতার ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে কোন বাধা নিষেধ থাকে না। পণ্য দ্রব্যের চলাচলের উপরেও কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। পূর্ণাংগ বাজারে কোন এক সময়ে একই ধরণের পণ্যের মূল্য সর্বত্র সমান হইবে। পণ্য বাজার পূর্ণাংগ হইতে হইলে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের বাজার সম্বন্ধে সম্যক ও সঠিক ধারণা থাকা প্রযোজন। সহজ, সুষ্ঠু ও সস্তা যোগাযোগ এবং পরিবহনের সুযোগ সুবিধা পূর্ণাংগ বাজার গড়িয়া তুলিতে খুবই সহায়তা করে। তাহা ছাড়া, এই ধরণের বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতাগণের সংখ্যা এত অধিক থাকে যে, কোন একজন বিশেষ ক্রেতা বা বিক্রেতা যথাক্রমে তাহার খরিদ বা বিক্রয়দ্বারা বাজার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না। স্থাবর সম্পত্তি, বৈদেশিক মুদ্রা প্রভৃতির বাজার সাধারণতঃ পূর্ণাংগ। স্থাবর সম্পত্তির কেনা বেচা সাধারণতঃ এজেন্টগণের মারফতে হয়। কোন স্থানে স্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করিতে হইলে খরিদ্দার উহার স্থানীয় মূল্য, মুনাফা ইত্যাদি বিশেষভাবে যাচাই করিয়া তবে ক্রয় করিয়া থাকে। বৈদেশিক মুদ্রার ক্রয় বিক্রয় ব্যাপারেও মুদ্রা মূল্যের সামান্য হ্রাস বৃদ্ধি পর্যন্ত লক্ষ্য করা হয়।

পূর্ণাংগ বাজার (perfect market)

অপূর্ণাংগ বাজার (Imperfect Market) : অপূর্ণাংগ বাজারে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় কারবার অবাধ নয় এবং তাহাদের মধ্যে প্রতি-যোগিতাও অবাধ নয়। বাজারে বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করে। পণ্য মূল্যও বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন স্তরে ধার্য করে। এই ধরণের বাজারে প্রত্যেক ক্রেতা বা বিক্রেতা যথাক্রমে ক্রয় ও বিক্রয়দ্বারা বাজার মূল্য বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। এই বাজারে ক্রেতাগণ যে কোন বিক্রেতার নিকট হইতে দ্রব্য খরিদ করিতে পারে না। দ্রব্যের মূল্য ও গুণ বুঝিয়া বিশেষ বিশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে মাল ক্রয়

অপূর্ণাংগ বাজার (imperfect market)

করিতে হয়। অপূর্ণাংগ বাজারে প্রতিযোগিতাশীল ও একচেটিয়া কারবার এই দুইএরই কিছু কিছু উপাদান পাশাপাশি বর্তমান। খুচরা মালের বাজার সাধারণতঃ অপূর্ণাংগ হয়। যে সকল দ্রব্যের স্থানিক (local) ব্যবহার বা চাহিদা আছে, কিংবা যে সকল সামগ্রী পচনশীল—যেমন, শাকশব্জী, টাট্কা ফলমূল, মাছ, মাংস প্রভৃতি—উহাদের বাজার অপূর্ণাংগ। পুরাতণ পুস্তকের বাজারও অপূর্ণাংগ হয়, কেননা বিভিন্ন বিক্রেতা একই পুস্তকের মূল্য বিভিন্ন ক্রেতার কাছে বিভিন্ন রকম চাহিয়া থাকে।

সাম্যাবস্থা (Equilibrium) : অর্থশাস্ত্রে সাম্যাবস্থার অর্থ, যে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না।

পণ্য সাম্য (Equilibrium of Output) বা মূল্য সাম্য (Equilibrium of Price) : হইবে তখনই, যখন চাহিদা ও যোগানের বিশেষ অবস্থাতে মূল্য পরিমাণ বা মূল্য স্তরের হ্রাস বৃদ্ধি না ঘটে। **প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা** (Equilibrium of Firm) হইবে তখন, যখন উহার আয়তন পরিবর্তন বা পণ্য উৎপাদন পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধি হওয়ার কোন লক্ষণ না থাকে। সেইরূপ **শিল্পের সাম্যাবস্থা** (Equilibrium of Industry) লাভ ঘটিবে তখন, যখন ঐ শিল্পে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্য-পরিমাণ এবং উহার বাজার মূল্যের কোন পরিবর্তন প্রবণতা থাকে না।

সাম্যাবস্থা স্থির (Stable) হইতে পারে আবার **অস্থির** (Unstable) হইতে পারে। অনেক সময় সামান্য বাধা বিঘ্ন সত্বেও, নানা কারণের সংঘাতে মূল অবস্থা পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাকে **স্থির সাম্য** বলা হয়। যদি বাধা প্রতিবন্ধকতার দরুণ মূল অবস্থার আর প্রতিষ্ঠা না হয়, বরংচ নূতন এক সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে তাহাকে **অস্থির সাম্য** বলা চলে। যদি কোন পণ্যের একটি মাত্র বাজারদর নির্ধারণদ্বারা সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উহাকে **একক সাম্য** (Unique) বলে। আবার কোন সাম্যাবস্থা স্থাপনে যদি বহু বাজার দর কিংবা পণ্য দরকার হয়, তাহাকে **বহুল** (Multiple) **সাম্যাবস্থা** বলে। সাম্যাবস্থা আবার **আংশিক** (Partial) কিংবা **সাধারণ** (General) হইতে পারে। যখন আমরা একটি মাত্র দ্রব্য মূল্যের বা শিল্পের সাম্যাবস্থা নির্ধারণ করি, অথচ অন্যান্য দ্রব্য মূল্য বা শিল্পের পণ্য পরিমাণ স্থায়ী, অপরিবর্তনশীল ধরিয়া লই, তখন সেই অবস্থাকে **আংশিক সাম্যাবস্থা** বলা যায়। এই পুস্তকে আমরা মুখ্যতঃ আংশিক সাম্যাবস্থার বিষয়ই আলোচনা করিব। যখন সকল

দ্রব্য মূল্য ও সকল শিল্পের স্থিতি সাম্য একযোগে নির্ধারণ করা হয়, তখনই হয় সাধারণ সাম্যাবস্থার বিশ্লেষণ। ইহা ছাড়া, পণ্যমূল্য নির্ধারণে সময় মেয়াদের গুরুত্ব অনুসারেও সাম্যাবস্থার বর্গীকরণ সম্ভব। সময়ের মেয়াদ অনুসারে **অত্যন্ত অল্পকালীন সাম্যাবস্থা (very short-run equilibrium), অল্প কালীন সাম্যাবস্থা (short-run equilibrium) ও দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থা** (**long-run equilibrium**) স্থাপিত হইতে পারে। উপযুক্ত স্থানে উহাদের ব্যাপক আলোচনা করা হইবে।

চাহিদা ও যোগানের সাম্যাবস্থা (Equilibrium of Demand and Supply) : কোন দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সূচীর সাহায্যে আমরা চাহিদা যোগানের সাম্যাবস্থা দেখাইতে পারি।

চাহিদা সূচী	বাজার মূল্য	যোগান সূচী
১০,০০০ সের	সের প্রতি ৫৲	৩০,০০০ সের
১৫,০০০ ,,	,, ,, ৪৲	২৫,০০০ ,,
২০,০০০ ,,	,, ,, ৩৲	২০,০০০ ,,
২৫,০০০ ,,	,, ,, ২৲	১৪,০০০ ,,

উপরের চাহিদা ও যোগান সূচী হইতে লক্ষ্য করা যায় যে, যখন বাজার মূল্য সের প্রতি ৩৲, তখন চাহিদা ও যোগানের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। যে বাজার মূল্যে চাহিদা ও যোগানের পরিমাণ সমান হয়, তাহাকে সাম্য মূল্য (equilibrium price) বলে। উপরের উদাহরণে ৩৲ সাম্য মূল্য। যদি বাজার মূল্য ৪৲ হয়, তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণের চেয়ে যোগান পরিমাণ অধিক হইবে ; আবার যদি বাজার মূল্য ২৲ হয়, তাহা হইলে যোগানের চেয়ে চাহিদার পরিমাণ অধিক হইবে।

চাহিদা ও যোগানের বক্ররেখা অংকন করিয়াও আমরা উহাদের সাম্যাবস্থা দেখাইতে পারি।

(২৬শ চিত্র) চাহিদা

চা চা₁ এবং **যো যো₁** যথাক্রমে চাহিদা ও যোগান রেখা। উহারা পরস্পর **প** বিন্দুতে ছেদ করিতেছে। **ম প** সাম্য মূল্য ও **ক-ম** সাম্য পণ্য
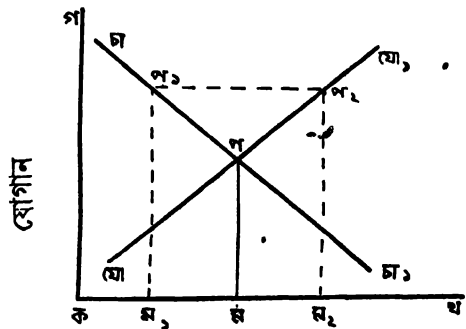
পরিমাণ নির্দেশ করিতেছে। যদি বাজার মূল্য $ম_১ প_১$ হইত, তাহা হইলে চাহিদার পরিমাণ হইত $কম_১$ অথচ যোগান পরিমাণ হইত $কম_২$; অর্থাৎ চাহিদার চেয়ে যোগান বেশী হইত। যোগান অধিক হওয়ার ফলে, বাজার মূল্য কমিয়া আবার সাম্যাবস্থায় আসিতে বাধ্য হয়।

অনুশীলনী

1. Define the term 'Market' and discuss the factors which determine its size.
2. Distinguish (a) between a perfect and an imperfect market and (b) between a short-period and a long-period market.

পঞ্চদশ অধ্যায়

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ণয় (Price Determination under Perfect Competition.)

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণ কি ভাবে হয় তাহার উপযুক্ত ব্যাখ্যান করিবার পূর্বে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার প্রকৃত স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য কি, তাহা জানা আবশ্যক।

নিখুঁত এবং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা (Pure and Perfect Competition.): অধ্যাপক চেম্বারলিন (Prof. H. Chamberlin) নিখুঁত ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়াছেন। তাঁহার মতে, নিখুঁত প্রতিযোগিতার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে।

নিখুঁত প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of pure competition)

প্রথমতঃ, নিখুঁত প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা অগণিত থাকা চাই। উহাদের সংখ্যা এত অগণিত যে, কোন একজন ক্রেতা বা বিক্রেতা যত পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করুক না কেন, উহারা দ্রব্য মূল্যের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় কোন ক্রেতা বা বিক্রেতার মূল্য নির্ধারণ করিবার ক্ষমতা নাই; বাজারের বর্তমান মূল্যে উহারা প্রত্যেকে যথাক্রমে কেবল খরিদ পরিমাণ কিংবা যোগান পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** নিখুঁত

প্রতিযোগিতাতে বাজারের সকল বিক্রেতা বা কোন শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানগুলিই একই জাতীয় (homogeneous) বা প্রমিত (standardised) উৎপাদিত দ্রব্য সরবরাহ করিয়া থাকে। বাজারের সকল বিক্রেতা যখন একই জাতীয় দ্রব্য যোগান দেয়, ঐ দ্রব্যের বাজার মূল্যও সর্বত্র এক হইতে বাধ্য। কোন বিক্রেতা যদি বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য দাবী করে, খরিদ্দারগণ তাহা হইলে অনায়াসে অন্য বিক্রেতার নিকট হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা বাজার মূল্যে পণ্য ক্রয় করিবে। তাহাছাড়া, পণ্য প্রমিত ও একই রকমের হওয়ায়, কোন খরিদ্দারই উহাদের মধ্যে ভাল মন্দ বিচার বা যাচাই করিতে পারে না। ফলে, বাজার মূল্যের তারতম্যের প্রশ্নই ওঠে না। **তৃতীয়তঃ,** নিখুঁত প্রতিযোগিতার আর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রত্যেক বিক্রেতার বা প্রতিষ্ঠানেরই যে কোন শিল্পায়নে অবাধ প্রবেশাধিকার থাকে ও বাজারে মাল যোগানের পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। শিল্পে এইরূপ স্বাধীন ও অবাধ প্রবেশ অধিকার আছে বলিয়াই বিশুদ্ধ প্রতিয়োগিতায় প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অগণিত হইয়া থাকে।

পূর্ণাংগ **প্রতিযোগিতা** বলিতে নিখুঁত প্রতিযোগিতার উপর্যুল্লিখিত তিনটি বৈশিষ্ট্য বুঝাইবেই; তাহা ছাড়া, ইহার আরও দুইটি বিশেষ গুণ থাকা চাই।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of perfect competition)

প্রথমতঃ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অনুমান করে যে, বাজার সম্পর্কে সমস্ত ক্রেতা ও বিক্রেতার পূর্ণজ্ঞান ও সঠিক ধারণা আছে। **দ্বিতীয়তঃ,** এই অবস্থায় বিভিন্ন উৎপাদক কারকগণের শিল্প হইতে শিল্পান্তরে অবাধ গতিশীলতা আছে, ইহাও কল্পনা করা হয়।

অধ্যাপক চেম্বারলিন অবশ্য মনে করেন যে, অর্থবিদ্যাবিদগণ যখন পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার কথা বলেন, তখন তাঁহারা উহাকে নিখুঁত প্রতিযোগিতার অর্থেই ব্যবহার করেন। কেননা, বাস্তবক্ষেত্রে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা কোথাও বিদ্যমান নাই।

মোট আয়, গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয় (Total Revenue, Average Revenue and Marginal Revenue.) : প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই যখন পণ্য যোগান দেয়, তখন লক্ষ্য থাকে কি করিয়া সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করা যায়। প্রতিষ্ঠানের মুনাফা নির্ভর করে বিক্রয়লব্ধ মোট অর্থ আয় এবং মোট উৎপাদন খরচের পার্থক্যের উপর। যদি উৎপাদন খরচের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে মোট অর্থ-আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে মুনাফার অংক বৃদ্ধি পাইবে। অপর

পক্ষে, মোট অর্থ আয়ের যদি অদল বদল না হয়, তাহা হইলে মুনাফা বৃদ্ধি নির্ভর করিবে উৎপাদন খরচের সংকোচনের উপর। আমরা খরচের ব্যাপক বিশ্লেষণ পূর্বেই করিয়াছি। এইবার আযের বিভিন্ন রূপ কি তাহাই আলোচনা করিব। বিক্রয় লব্ধ সমস্ত অর্থকে **মোট আয়** বলা হয়। মোট আয় নির্ণয় করা হয় বাজার মূল্যের সহিত পণ্য বিক্রয় পরিমাণকে গুণ করিয়া। **গড়পড়তা** আয় নির্ণয় করা যায় মোট আয়কে পণ্য বিক্রয় পরিমাণদ্বারা ভাগ করিয়া। আর এক একক দ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি করিলে মোট আয়ের যতটা বৃদ্ধি পায় সেইটুকুই **প্রান্তিক আয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন একটি প্রতিষ্ঠানের** মোট আয়, গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয়ের রূপ কি হয় নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা দেখান গেল।

দ্রব্য একক পরিমাণ	এককের বাজার মূল্য	মোট আয় = মূল্য × দ্রব্য একক	গড়পড়তা আয় = মোট আয় ÷ দ্রব্য একক	প্রান্তিক আয়
১	১০	১০	,,	১০
২	১০	২০	১০	১০
৩	১০	৩০	১০	১০
৪	১০	৪০	১০	১০
৫	১০	৫০	১০	১০

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্যচাহিদার প্রকৃতি (Nature of demand for the output of an individual seller or firm under perfect competition.) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার মধ্যে কোন একজন বিক্রেতার কিংবা কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা হয় পূর্ণাংগ নম্য (perfectly elastic)। এই অবস্থায় পণ্য-একক যোগান যতই বৃদ্ধি করা যাক না কেন, বাজার মূল্য তাহাতে হ্রাস পায় না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় পণ্য বিক্রেতার সংখ্যা এত অগণিত যে, একজন মাত্র বিক্রেতা বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান যত পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করুক না কেন, বাজার মূল্যের উপর উহার কোন প্রভাবই লক্ষ্য করা যায় না। ফলে, এই অবস্থায় চাহিদার রেখা হয় সরল এবং দ্রব্য এককের অক্ষের সংগে সমান্তরাল

(straight and parallel to the output line)। উপরের উদাহরণে লক্ষ্যণীয়—যখন, এক একক মাত্র দ্রব্য সরবরাহ হইতেছে তখন বাজারমূল্য ১০৲, আবার যখন ৫ একক দ্রব্য সরবরাহ হইতেছে তখনও বাজার মূল্য ১০৲টাকা। এই অবস্থায় যত পণ্য এককের সংখ্যা সরবরাহ করা হোক না কেন, গড়পড়তা খরচ একই থাকিবে এবং উহা বাজার মূল্যের সমান হইবে। দ্রব্য একক যত পরিমাণ বৃদ্ধি করা যাক না কেন, প্রান্তিক আয়ও এক হইবে এবং উহা গড়পড়তা আয়ের সমান হইবে। উপরে, উদাহরণে দেখা যায় যে, যখন ২ একক দ্রব্য পরিমাণ সরবরাহ হইতেছে তখন গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয় যাহা, আবার ৫ একক পণ্য যোগানের সময়েও গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয় একই। অতএব, পূর্ণাংগ বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য সরবরাহ করে, তখন চাহিদা হয় নিখুঁত নম্য ; চাহিদা রেখা হয় সরল সমান্তরাল, প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের অর্থাৎ গড়পড়তা আয়ের সমান। গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখাও একই হয়। নিম্নের চিত্রে (২৭শ চিত্র) চাহিদা রেখা, বাজার মূল্য, গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখা নির্দেশ করিতেছে।
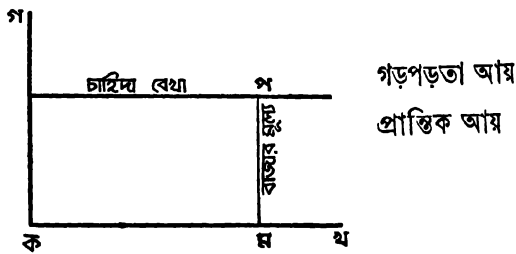
২৭শ চিত্র

নিখুঁত প্রতিযোগিতায় শিল্পপণ্যের চাহিদার প্রকৃতি (Nature of Demand for the output of an Industry under Perfect Competition.) : পূর্ণাংগ বাজারে একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করিয়া বাজার মূল্য প্রভাবান্বিত করিতে পারে না বটে ; কিন্তু একই শিল্পে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান একযোগে পণ্য যোগানদ্বারা বাজার মূল্যের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। চাহিদা যদি বাধাধরা থাকে, আর শিল্পকে যদি অধিক সংখ্যক দ্রব্য একক সরবরাহ করিতে হয়, তাহা হইলে বাজার মূল্য অবশ্য কমাইতে হইবে। বাজার মূল্য না কমাইলে কোন শিল্প অধিক পরিমাণে পণ্য সরবরাহ করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ণাংগ বাজারে শিল্প পণ্যের চাহিদা

নিখুঁত নম্যের চেয়ে কম (less than perfectly elastic) হইবে। এই অবস্থায় চাহিদার বক্ররেখা সরল ও সমান্তরাল হইবে না—চাহিদা রেখা ক্রমাগত ডানদিকে ঢালু হইয়া (downward slope) নামিতে থাকিবে। শিল্প দ্রব্য একক বৃদ্ধি যতই ক্রমাগত করা যাইবে, গড়পড়তা আয়ও ক্রমাগত কমিতে থাকিবে। অতিরিক্ত পণ্য একক সরবরাহ করিলে প্রান্তিক আয় গড়পড়তা আয়ের চেয়ে কম হইবে। ফলে প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখা গড়পড়তা আয়ের বক্ররেখার নীচে অবস্থান করিবে। নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা বিষয়টি আরও বিশদভাবে বুঝান হইল।

পণ্য একক পরিমাণ	পণ্য একক প্রতি বাজার মূল্য	মোট আয়	গড়পড়তা আয়	প্রান্তিক আয়
১	৯৲	৯৲	৯৲	৯৲
২	৮৲	১৬৲	৮৲	৭৲
৩	৭৲	২১৲	৭৲	৫৲
৪	৬৲	২৪৲	৬৲	৩৲
৫	৫৲	২৫৲	৫৲	১৲

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শিল্প পণ্যের চাহিদা রেখা, গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয়ের রেখার প্রকৃতি কি হয় তাহা নিম্ন চিত্রে (২৮শ চিত্র) অংকিত হইল।
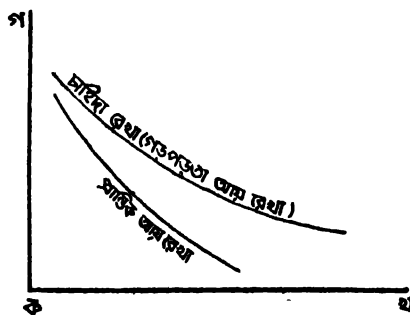
২৮শ চিত্র

মূল্য নির্ণয়ে সময়ের গুরুত্ব (Importance of time element in

price determination) : অধ্যাপক মার্শাল দ্রব্যমূল্য নির্ণয়ে সময়-মিয়াদের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সাধারণভাবে বাজার মূল্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের উপর নির্ভর করিলেও সময় মিয়াদের তারতম্যানুসারে চাহিদা ও যোগানের প্রকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তন লাভ করে এবং দ্রব্য-মূল্যও সেই পরিবর্তনদ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হয়। দ্রব্য মূল্যের উপর চাহিদা ও যোগানের যে প্রভাব তাহা সময় মিয়াদের তারতম্যানুসারে সম্পূর্ণভাবে বিভিন্ন হয়। মূল্য নির্ধারণ যত অল্পকালীন মিয়াদে হইবে, চাহিদার প্রভাবও ততই প্রবল হইবে; আবার মূল্য নির্ধারণ যত দীর্ঘকালীন মিয়াদে হইবে, যোগানের প্রভাবও ততই প্রবল হইবে। অধ্যাপক মার্শালের নিজের কথায়: "As a general rule, the shorter the period which we are considering, the greater must be the share of our attention which is given to the influences of demand on value, and the longer the period, the more important will be the influences of cost of production on value. The actual value at any time, the market value as it is often called, is often more influenced by passing events and by causes whose action is fitful and short-lived than by those which work persistently. But in the long period, those fitful and irregular causes in large measure efface one another's influence; so that in the long run persistent causes dominate value completely."

সময়-মিয়াদের তারতম্যানুসারে অধ্যাপক মার্শাল চার রকম মূল্যের বর্গীকরণ করিয়াছেন—(১) অত্যল্পকালীন মূল্য বা বাজার মূল্য (২) অল্পকালীন মূল্য (৩) দীর্ঘকালীন মূল্য বা স্বাভাবিক মূল্য এবং (৪) যৌগিক (secular) মূল্য। যখন অত্যল্পকালীন মিয়াদে মূল্য নির্ধারণ হয়, তখন পণ্য যোগান পরিমাণ একদম অপরিবর্তনীয় থাকে। সুস্থির, স্থায়ী যোগান অবস্থায়, দ্রব্যমূল্য বিশেষভাবে চাহিদাদ্বারা নির্ধারিত হয়। এই মূল্যকে বাজার মূল্যও বলা হয়। অল্প-কালীন মিয়াদে যোগান পরিমাণ পরিবর্তন সম্ভব হয় বটে, কিন্তু এই যোগান পরিবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংগঠন, সাজসরঞ্জাম, উৎপাদন পদ্ধতির কোন অদল বদল সম্ভব নয়, কিংবা শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করাও সম্ভব নয়। দীর্ঘকালীন মূল্য-নির্ণয়ের মিয়াদ সাধারণতঃ কতিপয়

বৎসর ব্যাপী হইতে পারে। এই সময়ের মধ্যে যেমন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংগঠন ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তন করার সুযোগ হয়, শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধি করাও সম্ভব হয়। পরিশেষে, যৌগিক মূল্য নির্ণয় হয় এত সুদীর্ঘ সময়-মিয়াদে যে, দ্রব্যের যোগান তখন মূলধন সঞ্চয়দ্বারা, নূতন গবেষণা, আবিষ্কারের ফল ও উন্নত ধরণের সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি ব্যবহারদ্বারা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়। মূল্য নির্ণয়ের সময়-কাল যতই দীর্ঘতর হইতে থাকে, ততই উৎপাদন খরচ তথা পণ্য যোগান অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সুরু করে।

বাজার মূল্য (Market Price) : অতি অল্পকালীন মিয়াদে যথা, কোন একদিনে, যখন পণ্য মূল্য নির্ণয় হয় উহাকে বাজার মূল্য কিংবা অত্যল্পকালীন মূল্য বলে। এই মূল্য নির্ধারণে দ্রব্যের চাহিদা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রভাব বিস্তার করে, কেননা এই সংকীর্ণ সময়ে দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় থাকে। সাধারণতঃ, যে সকল দ্রব্য ক্ষয়িষ্ণু বা পচনশীল তাহাদের মূল্য নির্ণয়ই অতি অল্প কাল মিয়াদে হইয়া থাকে। মাছ, টাট্‌কা ফল, শাকসব্জী প্রভৃতি দ্রব্যের দাম উহাদের চাহিদাদ্বারাই বিশেষভাবে নির্ধারিত হয়। ঐ সকল দ্রব্যের বাজার চাহিদা যদি অল্পও হয়, তাহা হইলে মোট যোগান ঐ বাজারে বিক্রয় না করিয়া কিছুটা অন্ততঃ বাধাই করিয়া রাখা সম্ভব হয় না। যেহেতু মোট যোগানই বাজারে বিক্রয় করিতে হইবে, সেইহেতু বাজার মূল্য চাহিদার উপর বিশেষ করিয়া নির্ভর করে। চাহিদা যদি বাড়ে, বাজার মূল্যও বাড়িবে, আবার চাহিদা যদি কমে, বাজার মূল্যও হ্রাস পাইবে। কোন এক বিশেষ দিনে অত্যল্প সময় মিয়াদে যে বাজার মূল্য নির্ণয় হয়, তাহার সাম্যাবস্থা অত্যন্ত অস্থায়ী। বাজার মূল্যের এই অস্থায়ী সাম্যাবস্থার (temporary equilibrium) কারণ এই যে, ইহা প্রধানতঃ অত্যন্ত পরিবর্তনপ্রবণ বাজার চাহিদার উপর নির্ভর করে।

অতি অল্পকালীন বাজারে শুধু যে ক্ষয়িষ্ণু পচনশীল দ্রব্যেরই বেচাকেনা হয় তাহা নহে। আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক সামগ্রী আছে, যাহা বেশ কিছু সময় গুদামজাত করিয়া ধরিয়া রাখা যায়। তাহা ছাড়া, বিজ্ঞানের দৌলতে আজিকার জগতে পচনশীল দ্রব্যও টেকসই, টাট্‌কা অবস্থায় বেশ কিছুদিন বাধাই করিয়া রাখা সম্ভব হইয়াছে। যে সকল দ্রব্য ভবিষ্যতের জন্য বাধাই করিয়া রাখা সম্ভব, উহাদের যোগান অতি অল্পকালীন মিয়াদেও পরিবর্তনশীল। এই সকল দ্রব্যের বেলায় যদি বাজারের চাহিদা নরম হয়, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ

ভবিষ্যৎ বাজারে অধিক মূল্যে বিক্রয় করিবার আশায় কিছু পরিমাণ সামগ্রী বর্তমান বাজার হইতে সরাইয়া বাধাই করিয়া রাখিবে। এই মাল বাধাইএর ফলে, বর্তমান বাজারে মালের যোগান টান পড়িবে এবং ফলে, বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। অপর পক্ষে, বাজার চাহিদা যদি চড়া হয়, তাহা হইলে বিক্রেতাগণ মোট পণ্য-পুঁজি বাজারে ছাড়িয়া দিয়া যোগান বৃদ্ধি করিবে এবং তাহার ফলে বাজার দামও হ্রাস পাইবে।

বিক্রেতার বর্তমান বাজার হইতে পণ্য সরান, কিংবা বাজারে মাল ছাড়া বিশেষভাবে নির্ভর করে সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ পণ্য মূল্যের উপর। সে যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যৎ অল্পকালীন মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক হইবে, তাহা হইলে সে বর্তমান বাজার হইতে মাল সরাইবে এবং তাহার ফলে বর্তমান বাজারে মূল্যও বাড়িবে। অপরপক্ষে, তাহার যদি ধারণা হয় যে, ভবিষ্যৎ পণ্য মূল্য বর্তমান বাজার মূল্যের চেয়ে কম হইবে, তাহা হইলে সে তাহার সমস্ত পুঁজিই বর্তমান বাজারে ছাড়িয়া দিবে এবং ফলে, বর্তমান বাজার মূল্যও হ্রাস পাইবে। নিম্ন চিত্রে অত্যল্পকালীন বাজার মূল্য কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহা দেখান হইল।

চা চা বাজার চাহিদারেখা। পচনশীল দ্রব্যের গোটা পুঁজি **ক ম১**, সমস্ত বিক্রেতা **ম১ প১** বাজার মূল্যে বিক্রয় করিবে। আর যদি পণ্য পুঁজির কিছুটা অংশ বাজারে না ছাড়িয়া সরাইয়া রাখা হয় (২৯শ চিত্রে **ম ম১** পরিমাণ দ্রব্য বাজার হইতে সরান হইয়াছে), তাহা হইলে বাজার যোগান কমিয়া **ক ম** পরিমাণ হইবে। বাজার যোগান টান হওয়ার ফলে মূল্য বাড়িয়া **প ম** হইবে।
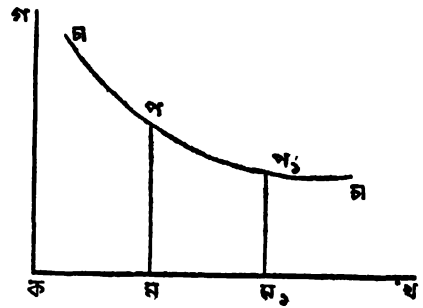
২৯শ চিত্র

সংরক্ষণ মূল্য (Reservation Price): বেশীর ভাগ পণ্য বিক্রির বেলায় বিক্রেতাগণ দিনের বাজারের শেষ সময় পর্যন্ত কিংবা ভবিষ্যৎ কোন সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, তখন যে বাজার মূল্য পাওয়া যায় তাহাতেই মাল সরবরাহ করে। প্রত্যেক বিক্রেতারই পণ্যের একটা সংরক্ষণ মূল্য আছে। ভবিষ্যৎ বাজারের সম্ভাব্য মূল্য হইতে মাল ধরিয়া রাখিবার খরচ বাদ দিলেই

বিক্রেতার সংরক্ষণমূল্য নির্ণয় করা যায়। যদি কোন বিক্রেতা তাহার পণ্যের ভবিষ্যৎ বাজার মূল্য ২০৲ টাকা হইবে ধারণা করে এবং ঐ সময় পর্যন্ত মাল ধরিয়া রাখিবার খরচ ৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ মূল্য ১৫৲ হইবে। বর্তমান বাজার মূল্য এই সংরক্ষণ মূল্যের চেয়ে কম হইলে, সে মাল মজুত রাখিয়া ভবিষ্যৎ বাজারের জন্য অপেক্ষা করিবে—যতদিন না বাজার মূল্য সংরক্ষণ মূল্যের সমান হয়। বিক্রেতার সংরক্ষণ মূল্য কতগুলি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ,** যে সকল দ্রব্য অপেক্ষাকৃত বেশী পচনশীল তাহাদের সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষাকৃত কম। **দ্বিতীয়তঃ,** সংরক্ষণ মূল্য বিশেষভাবে নির্ভর করে বিক্রেতার ভবিষ্যৎ বাজার মূল্য সম্বন্ধে ধারণা কি তাহার উপর। যদি সে ধারণা করে যে, ভবিষ্যৎ বাজারে বিক্রেতাগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইয়া পণ্য যোগানও বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ মূল্য কম হইবে। অথবা যদি সে মনে করে যে, ভবিষ্যৎ বাজারে মালের চাহিদা মন্দা হইবে, তাহা হইলেও তাহার সংরক্ষণ মূল্য হ্রাস পাইবে। **তৃতীয়তঃ,** যদি বিক্রেতার ধারণায় ভবিষ্যৎ বাজার মূল্য খুব বেশী না বাড়ে, অথচ সেই অনুপাতে মাল অধিক দিন ধরিয়া রাখিতে হয় এবং তাহার দরুণ বাধাই খরচ বেশী দিতে হয়, তাহা হইলে তাহার সংরক্ষণ মূল্য কম হইবে। **চতুর্থতঃ,** যদি ভবিষ্যৎ বাজারে মাল যোগান টান হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বিক্রেতার সংরক্ষণ মূল্য বেশী হইবে। **পঞ্চমতঃ,** যোগান যদি একচেটিয়া বিক্রেতার হাতে থাকে, তাহা হইলেও তাহার সংরক্ষণ মূল্য বেশী হইবে। **পরিশেষে,** বিক্রেতার যদি পণ্য বিক্রয় করিয়া নগদ টাকা হাতে করিবার তাড়াতাড়ি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে তাহার পণ্যের সংরক্ষণ মূল্য কম হইবে।

স্বাভাবিক মূল্য (Normal Price) : বাজার মূল্য বলিতে আমরা বুঝি পণ্যের অত্যল্পকালীন দাম। এই অত্যল্পকালীন মূল্য যখন নির্ণয় হয়, তখন পণ্যের যোগান মোটামুটি অপরিবর্তনীয় থাকে—পুঁজি সরবরাহের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। স্বাভাবিক মূল্য বলিতে দীর্ঘকালীন মূল্য বুঝায়। এই মূল্য যখন নির্ণয় হয়, তখন বিক্রেতাগণ চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে পণ্যের যোগান সম্পূর্ণ ভাবে পরিবর্তন করিবার মত যথেষ্ট সময় পায়। চাহিদা ও যোগানের পরিবর্তন যদি অনুমান করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে, দীর্ঘকালীন মিয়াদে যে পণ্যমূল্য বাজারে চালু হইবার সম্ভাবনা তাহাই স্বাভাবিক মূল্য। স্বাভাবিক মূল্য কিন্তু গড়পড়তা মূল্য নয়, কেননা, গড়পড়তা মূল্য নির্ণয় শুধু বিগত ও বর্তমান অবস্থা

সম্পর্কেই সম্ভব। কিন্তু, স্বাভাবিক মূল্য চাহিদা ও যোগানের ভবিষ্যৎ অবস্থার উপরে নির্ভর কর।

বাজার মূল্য বিশেষভাবে পণ্যের চাহিদার উপর নির্ভর করে। অতি অল্প-কালীন চাহিদা বাড়িলে, বাজার দাম বাড়িবে, চাহিদা কমিলে, বাজার দাম কমিবে। বাজার দামের সাম্যাবস্থা অস্থায়ী ; কেননা, সামান্য অস্থায়ী কারণে চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধি হইলেই বাজার মূল্যের পরিবর্তন হয়। কিন্তু স্বাভাবিক মূল্য কোন একটা বিশেষ মান (standard) দ্বারা নির্ধারিত হয়। বিক্রেতার উৎপাদন খরচই এই মান নির্দেশ করে। বিক্রেতা অত্যল্পকালীন বাজারে অস্থায়ীভাবে কম বা বেশী মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিতে পারে বটে কিন্তু যে মূল্যে সে স্থায়ীভাবে মাল সরবরাহ করিবে তাহাতে তাহার গোটা উৎপাদন খরচ উঠিয়া আসা চাই। এই মূল্যই স্বাভাবিক মূল্য ও ইহাই স্থায়ী সাম্য মূল্য (permanent price equilibrium)।

দীর্ঘকালীন বাজারে যখন বহু বিক্রেতা পণ্য সরবরাহ করে, তখন স্বাভাবিক মূল্য কোন্ বিক্রেতার উৎপাদন খরচের সমান হইবে? অধ্যাপক মার্শালের মতে, পণ্য উৎপাদন যদি ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির অধীন হয়, তাহা হইলে প্রান্তিক প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচই (average cost of the marginal firm) স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ করিবে। অপর পক্ষে, পণ্য উৎপাদন যদি ক্রম-বর্ধমান আগম বিধির অধীন হয়, তাহা হইলে স্বাভাবিক মূল্য শিল্পের **প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের (Representative Firm)** প্রান্তিক খরচের সমান হইবে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ ক্রম-হ্রাসমান ও ক্রম-বর্ধমান আগম বিধির প্রয়োগ দেখিয়া এক শিল্প হইতে অন্য শিল্পকে তফাৎ করেন না। তাঁহাদের মতে বাঞ্ছনীয় (optimum) প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচের সহিত স্বাভাবিক মূল্য সমান হইবে। এই বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ আবার প্রান্তিক খরচের সমান।

পরিশেষে, যদিও বাজার মূল্য চাহিদার অস্থায়ী উঠানামার উপর নির্ভর করে, তবু ইহা দীর্ঘকালীন সম্ভাব্য মূল্যের প্রভাব মুক্ত নয়। বিক্রেতা যদি ধারণা করে যে, ভবিষ্যতে স্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, তাহা হইলে সে বর্তমান বাজার হইতে পণ্য-পুঁজির কিছুটা পরিমাণ সরাইয়া রাখিবে—ফলে, বর্তমান বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। আবার যদি সে মনে করে যে, ভবিষ্যতে স্বাভাবিক মূল্য হ্রাস পাইবে, তাহা হইলে সে গোটা পণ্য-পুঁজিই বর্তমান বাজারে সরবরাহ

করিবে—ফলে, বর্তমান বাজার দাম হ্রাস পাইবে। অতএব দেখা যায় যে, বাজার মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের গতিকে অবজ্ঞা করিয়া স্থির হইতে পারে না। বাজার মূল্য স্বাভাবিক মূল্যের চেয়ে বেশী বা কম হইতে পারে, কিন্তু উহার গতি-প্রবণতা সাধারণতঃ স্বাভাবিক মূল্যকে কেন্দ্র করিয়া।

অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ
(Determination of Short-run and Long-run Normal Price)

অল্পকালীন ও দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণের ব্যাপক বিশ্লেষণ করিতে হইলে আমাদের দুইটি দৃষ্টিভংগি হইতে বিষয়টি আলোচনা করিতে হইবে। **প্রথমতঃ**, একটি প্রতিষ্ঠানের মূল্য সাম্য (price equilibrium of one individual firm) কি ভাবে নির্ধারিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, গোটা শিল্পের মূল্য সাম্য (price equilibrium of an industry) কিভাবে স্থির হয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অল্পকালীন মূল্য সাম্য (Short-run Price Equilibrium under Perfect Competition) : আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, 'অল্পকাল' কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অল্পকাল বলিলে দুইটি অনুমান (assumptions) মানিয়া লইতে হইবে : (১) প্রতিষ্ঠান আকার আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি বা সংগঠনের পরিবর্তন করিতে পারিবে না। কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, সাজসরঞ্জাম ও উৎপাদন প্রক্রিয়ার কোনই অদল বদল অল্পকালে সম্ভব নয়। (২) অল্পকালে গোটা শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি ও হ্রাস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রতিষ্ঠানের অল্পকালীন মূল্য সাম্য (Short-run price equilibrium of an individual firm)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কোন প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা হয় তখনই, যখন ইহার আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি হইবার কোন প্রবণতা আর থাকে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় বাজারে কতটা মূল্যে কতকটা পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করিলে একটি প্রতিষ্ঠান সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারে তাহারই আলোচনা করিতেছি। অল্পকালে কোন প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করে, তখন উহা দুইটি বিষয় ভাল ভাবে মিলাইয়া দেখে : পণ্য যোগান বৃদ্ধির ফলে তাহার মোট অর্থ আয় কতটা বৃদ্ধি পাইতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ পণ্য যোগান বৃদ্ধির ফলে তাহার মোট খরচই বা কতটা বাড়িতে পারে। অর্থাৎ, এক একক পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি করিলে তাহার প্রান্তিক আয় কি হইবে এবং প্রান্তিক খরচই বা কি হইবে। যতক্ষণ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ উহার প্রান্তিক আয়ের চেয়ে

কম থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্য একক সরবরাহ বৃদ্ধি করা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে লাভ জনক। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ যখন প্রান্তিক আয়ের চেয়ে অধিক হইয়া যাইবে, সে অবস্থায় পণ্য সরবরাহ করিলে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে। শুধু সেই পরিমাণ দ্রব্য একক সরবরাহ করিলে প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা আসিবে, যে পর্যায়ে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়। এই পর্যায়ের দ্রব্য পরিমাণকে সাম্য পণ্য (equilibrium output) এবং যে বাজার মূল্যে এই সাম্য পণ্য বিক্রয় হয়—তাহাকে সাম্য মূল্য (equilibrium price) বলা হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের সমান হয়। পূর্ণাংগ পূর্ণ প্রতিযোগিতাময় বাজারে যখন অগণ্য বিক্রেতা বা প্রতিষ্ঠান পণ্য সরবরাহ করে, তখন কোন একজন বিক্রেতা বা একটি প্রতিষ্ঠান বাজার মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটাইতে পারে না। প্রতিষ্ঠান যত পরিমাণ যোগান বৃদ্ধিই করুক না কেন, বাজার মূল্য একই থাকিবে। প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা পূর্ণাংগ সাম্য (perfectly elastic) হওয়ার দরুণ, প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের সমান হইবে। সুতরাং পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান যখন সাম্যাবস্থায় পৌছে তখন উহার প্রান্তিক খরচও বাজার মূল্য সমান হইবে। (কেননা, প্রান্তিক খরচ = প্রান্তিক আয় = বাজার মূল্য)।

কিন্তু অল্পকালীন মিয়াদে প্রতিষ্ঠান যখন সাম্যাবস্থায় পৌছে, তখন উহা যে স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবেই তাহার কোন স্থিরতা নাই। প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পরিমাণ পণ্য সরবরাহদ্বারা প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের সমান করিতে পারে। কিন্তু ঐ সকল বিভিন্ন পর্যায়ে পণ্য সরবরাহ করিয়া প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে পারে না। যে অবস্থাতে প্রতিষ্ঠানের পণ্য মূল্য উহার গড়পড়তা খরচের সমান হয়, সেই সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ কারবে। কিন্তু যখন প্রতিষ্ঠানের সাম্যমূল্য উহার গড়পড়তা খরচের চেয়ে অধিক হয়, তখন প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক মুনাফা (abnormal profit) লাভের অধিকারী হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগতায় অল্পকালীন সাম্যাবস্থায় কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করা সম্ভব হইতে পারে এই কারণে যে, অল্পকালীন মিয়াদে নূতন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাজারে প্রবেশ করিয়া দ্রব্য যোগান বৃদ্ধিদ্বারা মূল্যস্তর টানিয়া কমান অসম্ভব। আবার, অল্পকালীন সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠান এমন মূল্যেও পণ্য সরবরাহ করিতে পারে, যাহাতে উহার লোকসানও

হইতে পারে। যদি অল্পকালীন বাজার মূল্যে প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচ নাও পোষায়, তাহা হইলেও প্রতিষ্ঠান বাজার পরিত্যাগ করে না। যদি গড়পড়তা মোট খরচের মধ্যে গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচের সবটা এবং গড়পড়তা স্থায়ী খরচ আংশিকভাবে বাজার মূল্য হইতে উঠিয়া আসে, তাহা হইলেও লোকসান দিয়া প্রতিষ্ঠান অল্পকালীন বাজারে পণ্য সরবরাহ করিতে পারে। কিন্তু অল্পকালীন বাজার মূল্য যদি এমন হয় যে, উহা গড়পড়তা স্থায়ী খরচ পোষাণ দূরে থাক, এমন কি মোট গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচও পোষাইতে অপারগ, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানকে তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে কারবার গুটাইতে হইবে। নিম্নের চিত্রে প্রতিষ্ঠানের অল্পকালীন মূল্য-সাম্য প্রদর্শিত হইল।
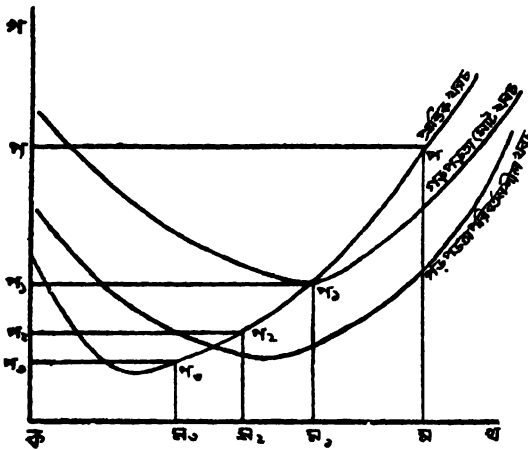
অল্পকালীন স্বাভাবিক মূল্য সেই বিন্দুতে নির্ধারিত হয়, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান। চাহিদার বক্ররেখা যখন **প প**, তখন বাজার মূল্য হয় **প ম**। **ক ম** পরিমাণ পণ্য যোগান দিলে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় **প প** উহার প্রান্তিক খরচ **প ম** র সমান হয়। কিন্তু **প ম** মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিলে প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক মুনাফালাভ হইবে; কেননা পণ্য যোগানের এই স্তরে বাজার মূল্য প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচের চেয়ে অধিক। কিন্তু চাহিদার বক্ররেখা যদি **প১ প১** হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান **প১ ম১** বাজার মূল্যে **ক ম১** পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করিবে। **প১ ম১** বাজার মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিলে প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে; কেননা এই স্তরে প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচ বাজার মূল্যের সমান। গড়পড়তা খরচের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক মুনাফা ধরিয়া লওয়া হয়। কিন্তু চাহিদার বক্ররেখা আরও নামিবার ফলে, পণ্য মূল্য যদি **প২ ম২** তে স্থির হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে, কেননা এই স্তরে বাজার মূল্য গড়পড়তা

৩০শ চিত্র

খরচের চেয়ে কম। কিন্তু এই লোকসান সত্বেও, প্রতিষ্ঠান অল্পকালীন বাজারে মাল সরবরাহ বন্ধ করে না। কেননা, ম$_{২}$ প$_{২}$ বাজার মূল্যে প্রতিষ্ঠানের মোট গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ এবং গড়পড়তা স্থায়ী খরচের কিয়দংশ উঠিয়া আসে। কিন্তু বাজার মূল্য যদি ম$_{৩}$ প$_{৩}$ হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ঐ বাজার ত্যাগ করিবে ; কেননা ম$_{৩}$ প$_{৩}$ বাজার মূল্যে প্রতিষ্ঠানের মোট গড়পড়তা পরিবর্তনশীল খরচ পর্যন্ত পোষায় না।

শিল্পের অল্পকালীন মূল্য সাম্য (Short-run Price Equilibrium of an Industry) : গোটা একটি শিল্প যদি মাল সরবরাহ করে তাহা হইলে পণ্যের চাহিদা পূর্ণাংগ সাম্য হইবে না। গোটা শিল্পের মাল সরবরাহ অর্থই শিল্পে নিযোজিত সকল প্রতিষ্ঠানের একযোগে মাল যোগান দেওয়া। এইরূপ অবস্থায় অধিক পরিমাণ মাল সরবরাহ করিতে হইলেই শিল্পকে পণ্য মূল্য কম করিয়া ধার্য করিতে হইবে। অর্থাৎ, গোটা শিল্প যখন মাল সরবরাহ করে তখন চাহিদার বক্ররেখা ডানদিকে ঢালু ভাবে অবস্থান করে (slopes downward to the right)। অন্যদিকে গোটা শিল্পের খরচ রেখা সকল প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ রেখার সমষ্টিদ্বারা নির্ণয করা হয়। শিল্পের খরচ রেখা ডানদিকে উর্ধ্বগামী ভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ শিল্প যতবেশী পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করিবে, উহার গড়পড়তা খরচও ক্রমাগত বাড়িয়া যাইবে। যে বিন্দুতে শিল্পে-পণ্য চাহিদা রেখা ও খরচ রেখা মিলিত হইবে, যেখান হইতে পণ্য রেখার উপর একটি লম্ব টানিলে উহাই বাজার মূল্য সূচক হইবে।

৩১শ চিত্র

চাহিদা রেখা, যোগান বা খরচ রেখাকে প বিন্দুতে স্পর্শ করিয়াছে। শিল্পের বাজার মূল্য ম প—অর্থাৎ ঐ শিল্পে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ম প মূল্যে মোট ক ম পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিবে।
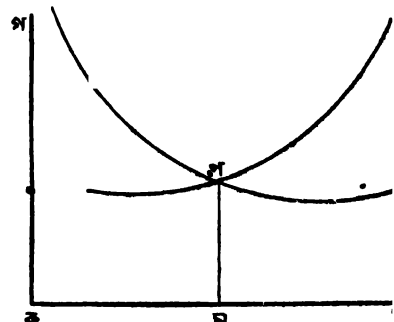
অর্থনীতিবিদ্গণের মতে অল্পকাল মিয়াদে শিল্পের পূর্ণ সাম্যাবস্থা (full industry-equilibrium) ঘটে না। যদিও শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানগুলি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একই বাজার মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে, তথাপি সকল প্রতিষ্ঠানের গড়পড়ত

খরচ সমান হইতে পারে না। শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠান একই ধরণের উৎপাদক কারক একই মূল্যে বিনিয়োগ করে না। যদিও সকল প্রতিষ্ঠান একই ধরণের ভূমি, শ্রম ও মূলধন একই বাজার মূল্যে বিনিয়োগ করিতে পারে অনুমান করা যায়। কিন্তু সকল প্রতিষ্ঠান সমগুণসম্পন্ন সংগঠন কর্তার কর্মকৃত্য কিছুতেই সংগ্রহ করিতে পারে না। ফলে, শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কোন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ বাজার মূল্যের চেয়ে কম হইতে পারে—এই প্রতিষ্ঠান তাহা হইলে অস্বাভাবিক মুনাফার অধিকারী হইবে। কোন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ বাজার মূল্যের সমান হইতে পারে—এই প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। আবার কোন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ বাজার মূল্যের চেয়ে বেশী হইতে পারে—এই ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের লোকসান হইবে। যে হেতু শিল্পের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিতে পারে না, সেই হেতু অল্পকালীন পূর্ণাংগ বাজারে শিল্পের পূর্ণ সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি সহজ নয়।

প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্যসাম্য (Long-run Price Equilibrium of a Firm): কি অল্পকালে, কি দীর্ঘকালে, প্রতিষ্ঠানের পণমূল্য স্থির হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক কার্যকারিতার দ্বারা। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা পূর্ণাংগ সাম্য হয়; চাহিদা রেখা সমান্তরাল সরল হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের সমান হয় এবং প্রান্তিক আয় ও গড়পড়তা আয় সমান হয়। অল্পকালীন সাম্যের মত দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্যও প্রতিষ্ঠানকে সেই পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহ করিতে হয়, যে স্তরে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়। দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য যে কেবল প্রান্তিক খরচের সমান হয় তাহা নহে, স্বাভাবিক মূল্য প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচেরও সমান হয়। অল্পকালীন বাজার মূল্যের মত দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য কিন্তু গড়পড়তা মোট খরচের চেয়ে বেশী বা কম হইতে পারে না। বাজার মূল্য যদি প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচের চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে, প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক মুনাফালাভের অধিকারী হইবে। কিন্তু দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ বাজারে কোন প্রতিষ্ঠানই অস্বাভাবিক মুনাফা শিকার করিতে পারে না। একটি প্রতিষ্ঠান অস্বাভাবিক মুনাফা শিকার করিতেছে দেখিলে, নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প বিনিয়োগে প্রবেশ করিয়া বাজারে মা[illegible]ল যোগান দিতে স্তরু করিবে। ফলে, বাজারে পণ্যের

যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠানের অস্বাভাবিক মুনাফা উবিয়া যাইয়া বাজার মূল্য এবং গড়পড়তা মোট খরচ সমান হইবে। অপরপক্ষে, দীর্ঘকালীন বাজারে যদি কোন প্রতিষ্ঠানের পণ্যমূল্য উহার গড়পড়তা মোট খরচের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র বিনিয়োগের আশায় চলিয়া যাইবে। ফলে, বাজারে পণ্য যোগান হ্রাস পাইবে এবং সংগে সংগে বাজার মূল্য চড়িয়া গড়পড়তা মোট খরচের সমান হইবে। সুতরাং, আমরা এই সিদ্ধান্তে আসিতে পারি যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হয় তখনই, যখন উহার

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ = বাজার মূল্য = গড়পড়তা খরচ।

মনে রাখিতে হইবে যে, দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য যখন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা মোট খরচের সমান হয়, তখন ঐ গড়পড়তা খরচ হয় সর্বনিম্ন। দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন উৎপাদনের সকল সুযোগ সুবিধা (economies of scale) গ্রহণ করিয়া বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠান (optimum firm) বলিয়া পরিগণিত হয়। তখন প্রতিষ্ঠানের মুনাফাও স্বাভাবিক হয়। প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থা নিম্ন চিত্রে প্রদর্শিত হইল।

প্রতিষ্ঠান যখন **ক ম** পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করে, তখন উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়। **ক ম** পরিমাণ পণ্য **ম প** মূল্যে বাজারে
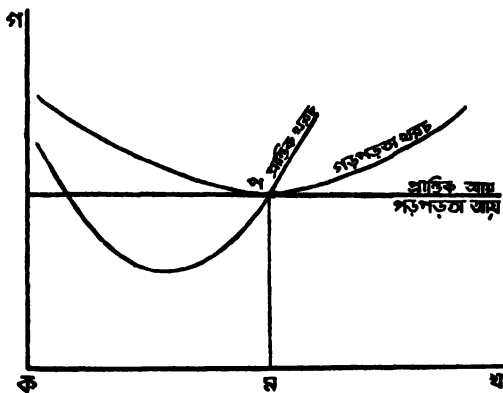
৩২শ চিত্র

সরবরাহ করিলে প্রতিষ্ঠান সাম্যাবস্থায় পৌছিবে। **ম প** দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য। **ম প** যখন গড়পড়তা খরচের সমান, তখন গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্নস্তর **প** বিন্দুতে।

শিল্পের দীর্ঘকালীন মূল্য সাম্য (Long-run Price Equilibrium of an Industry) : কোন শিল্পের পূর্ণ মূল্য সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি হয় তখন, যখন ঐ শিল্পে নিয়োজিত প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সাম্য প্রাপ্তি ঘটে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা আসে আবার সেই স্তরে দ্রব্য সরবরাহ করিলে, যেখানে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় উহার প্রান্তিক খরচের সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘমিয়াদে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এমন সাম্যে পৌছায় যে, উহার গড়পড়তা খরচ, গড়পড়তা আয়, প্রান্তিক খরচ এবং প্রান্তিক আয় পরস্পরের সমান হয়; এবং ইহারা প্রত্যেকটি আবার বাজার মূল্যেরও সমান হয়। সমমূল্যে একই জাতীয় (homogeneous) কারক বিনিয়োগদ্বারা উৎপাদন অনুমিত হয় বলিয়া, শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানেরই গড়পড়তা খরচ সমান হয়। প্রতিষ্ঠানগুলির শিল্পে অবাধ প্রবেশাধিকার ও পূর্ণ গতিশীলতা থাকার দরুণ, বাজার মূল্য ও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ সমান হয়; ফলে, শিল্পের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে। অতএব পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যেখানে একই ধরণের কারক বিনিয়োগদ্বারা পণ্য উৎপাদন সম্পন্ন হয়, সেখানে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান এবং গোটা শিল্প সাম্যাবস্থায় পৌছিবে তখন, যখন প্রতিষ্ঠানের

প্রান্তিক আয় = প্রান্তিক খরচ = গড়পড়তা খরচ = গড়পড়তা আয় (বাজার মূল্য)।

কিন্তু যদি বিভিন্ন গুণসম্পন্ন (heterogeneous) কারক বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদন কার্য সম্পন্ন হয়, কিংবা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সকল কারক সমগুণান্বিত হয়, কেবলমাত্র সংগঠন কর্তাদের নৈপুণ্যের তারতম্য থাকে, তাহা হইলে শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ সমান হইতে পারে না। ফলে, সকল প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফালাভের অধিকারী হয় না। যে সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সুযোগ্য ও নিপুণ সংগঠনকর্তার তদারকে পণ্য সরবরাহ করে, কিংবা যে সকল প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত সুদক্ষ উৎপাদক কারক বিনিয়োগ দ্বারা দ্রব্য যোগান দেয়, উহারা দীর্ঘকালীন বাজারেও অস্বাভাবিক মুনাফালাভ করিতে পারে।

আগম বিধি ও মূল্য নিরূপণ (Laws of Returns and Price Determination) : দীর্ঘকালীন মিয়াদে শিল্পের পণ্য যোগান পরিমাণ পরিবর্তনশীল হয়। বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ হইতে দ্রব্য যোগানের এই পরিবর্তনশীলতা

বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদন খরচের উপর। এই উৎপাদন খরচ আবার উৎপাদন ক্রম (scale of production) ও শিল্পের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। দীর্ঘকালীন বাজারে পণ্য যোগান পরিবর্তনের ফলে গড়পড়তা খরচ এক থাকিতে পারে, কিংবা বৃদ্ধি পাইতে পারে কিংবা হ্রাসও হইতে পারে। উৎপাদনের এই তিনটি বিভিন্ন অবস্থায়, দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়।

সম-আগম বিধি (বা সম গড়পড়তা খরচ) ও মূল্য নির্ণয় [Law of Constant Returns (or, Constant Average Cost) and Price Determination]: যখন বিভিন্ন উৎপাদক কারক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং উৎপন্ন পণ্য পরিমাণ বৃদ্ধি সমানুপাতিক হয়, তখন সম-আগম বিধির প্রয়োগ হয়। এই বিধির কার্যকারিতা সম্ভব হয় তখনই, যখন সকল উৎপাদক কারকের যোগান পূর্ণাংগ সাম্য হয় এবং উৎপাদন ক্রম পরিবর্তন সত্ত্বেও বিভিন্ন কারকের বাজার মূল্যের কোন অদল বদলই হয় না।

যখন সম আগম বিধি প্রয়োগ হয়, তখন উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি সত্ত্বেও শিল্পের গড়পড়তা খরচ সমানই থাকে। এ অবস্থায় যদি চাহিদা বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে পণ্য যোগান বৃদ্ধি করিলেও বাজার মূল্য একই থাকিবে। নিম্নের চিত্রে পণ্য মূল্যের উপর সম-আগম বিধির কি প্রভাব হয় তাহা প্রদর্শিত হইল।

যখন **চা চা** চাহিদা রেখা ও **যো যো** যোগান রেখা, তখন সাম্যমূল্য **ম প**। চাহিদা বৃদ্ধির সংগে নূতন চাহিদা রেখা **চা১ চা১** মূল চাহিদা রেখা হইতে ডান
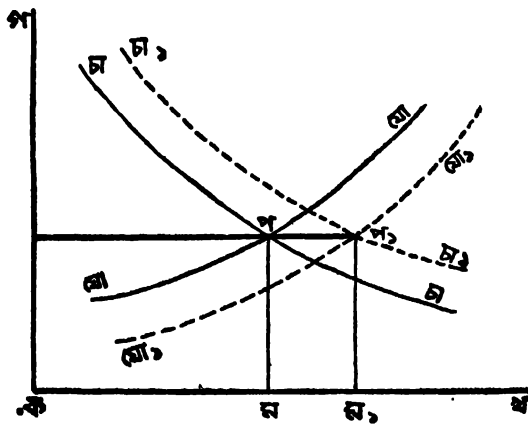
৩৬শ চিত্র:

দিকে উপরে সরিয়া অবস্থান করিবে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যোগানও বাড়িবে।

যো₁ যো₁ নূতন যোগান রেখা সূচক। নূতন চাহিদা রেখা ও নূতন যোগান রেখা প₁ বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করিয়াছে। ম₁ প₁ নূতন সাম্য মূল্য হইবে; কিন্তু, ইহা মূল বাজার মূল্য ম প র সমান। শিল্পের যোগান পরিমাণ ক ম হইতে ক ম₁ তে বৃদ্ধি করিলেও, গড়পড়তা খরচ সমানই থাকিবে।

ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি (বা ক্রম বর্ধমান গড়পড়তা খরচ) ও মূল্য নির্ণয় [Law of Diminishing Returns (or Increasing Cost) and Price Determination]: দীর্ঘকালে উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় তাহার কারণ এই যে, বিভিন্ন কারক সংমিশ্রণের পরিমাণ এই সময়ে সম্পূর্ণ পরিবর্তনশীল। কিন্তু তাহা বলিয়া দীর্ঘকালে সকল কারকের যোগানই যে পূর্ণাংগ নম্য তাহা নহে। এমনও হইতে পারে যে, এক বা একাধিক কারকের যোগান অনম্য। তাহা ছাড়া, কোন কারকের বিভিন্ন একক সমান দক্ষ নাও হইতে পারে। কিংবা সমান অর্থমূল্যে উহাদের বিনিয়োগ করাও সম্ভব না হইতে পারে। এইরূপ অবস্থায় যদি পণ্য যোগান পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে শিল্পের গড়পড়তা খরচ ক্রমাগত বাড়িয়া যাইবে ও উৎপাদনে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি কার্যকরী হইবে। উৎপাদনে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি কার্যকরী হইলে, যোগান রেখা ডানদিকে উর্ধ্বমুখীভাবে অবস্থান করিবে। ফলে, যদি এই অবস্থায় চাহিদা বাড়ে, তাহা হইলে সাম্য মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি সাম্য মূল্যের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে তাহা নিম্ন চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
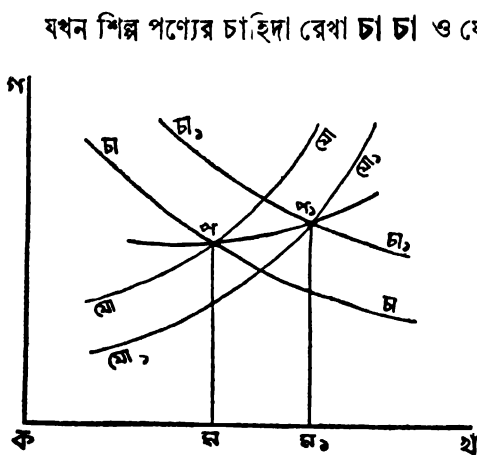
যখন শিল্প পণ্যের চাহিদা রেখা চা চা ও যোগান রেখা যো যো, তখন সাম্য মূল্য ম প। যদি পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে নূতন চাহিদা রেখা উপরে ডানদিকে চা₁ চা₁ রেখা রূপে অবস্থান করিবে। চাহিদা বৃদ্ধির ফলে যোগান ও গড়পড়তা খরচ বাড়িবে। নূতন চাহিদা রেখা চা₁ চা₁ ও নূতন যোগান

৩৪শ চিত্র

রেখা যো₁ যো₁, প₁ বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করিবে, এবং নূতন সাম্য মূল্য হইবে

ম১ প১। পণ্য যোগান পরিমাণ যখন **ক ম** হইতে **ক ম১** তে বৃদ্ধি পায়, তখন দীর্ঘ-কালীন যোগান বক্র রেখা হইবে **প প১** এবং সাম্যমূল্য **ম প** হইতে বৃদ্ধি পাইয়া **ম১ প১** হইবে।

ক্রম-বর্ধমান আগম বিধি (বা ক্রম-হ্রাসমান গড়পড়তা খরচ) ও মূল্য নির্ণয় [Law of Increasing Returns (or Decreasing Cost) and Price Determination]: দীর্ঘকালে পণ্য যোগান বৃদ্ধির ফলে বৃহদায়তন উৎপাদনের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সুযোগ সুবিধা (External and Internal Economies) লাভ করা সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, দীর্ঘকালে উৎপাদন ক্রম বৃদ্ধির সম্ভব হয় বলিয়া, কারকগণের, বিশেষ করিয়া স্থায়ী ও অবিভক্ত কারকগণের (fixed and indivisible factors of production), সুষ্ঠু বিনিয়োগ ও ব্যবহারেরও সুযোগ সুবিধা বেশী হয়। এই সকল সুযোগ সুবিধা যতই গ্রহণ করা যায়, ততই পণ্য যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে গড়পড়তা খরচ কমিতে থাকে। এই অবস্থাতে শিল্পের পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, দীর্ঘকালীন সাম্যমূল্য হ্রাস পাইতে থাকিবে। ক্রমবর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হইলে, উহা সাম্য মূল্যের উপর কি প্রভাব বিস্তার করে, তাহা নীচের চিত্রে প্রদর্শিত হইল।
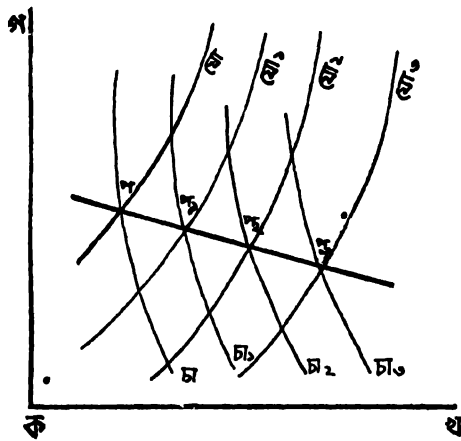
৩৫শ চিত্র

চা, চা১, চা২, ও চা৩ ক্রমিক চাহিদা বক্ররেখা ক্রমাগত শিল্প পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি সূচিত করিতেছে। **যো, যো১, যো২, ও যো৩** ক্রমিক যোগান পরিমাণ বৃদ্ধি ইংগিত করিতেছে। ক্রমিক সাম্যমূল্য **প, প১, প২, ও প৩** ক্রমাগত হ্রাস পাইতেছে। **প প১ প২ ও প৩** সরলরেখা ক্রম হ্রাসমান গড়পড়তা খরচ সূচক।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ণয়ে প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব (Importance of the Representative Firm in the Determination of Long-run Normal Price under Perfect Competition) : অধ্যাপক মার্শালের মতে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উৎপাদন যখন ক্রম বর্ধমান আগম বিধির অধীনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তখন দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণে প্রান্তিক খরচের ধারণাটি একেবারে উপযোগহীন হইয়া পড়ে। কেননা, এই অবস্থাতে শিল্পে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানগুলির উৎপাদন ক্রম ও উন্নয়নের পর্যায় বিভিন্ন থাকে। কতকগুলি প্রতিষ্ঠান হয়ত সম্পূর্ণ শিশু অবস্থায় বাজার পণ্য সরবরাহ করে; কতকগুলি উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়া স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে; আবার কতকগুলি বা বাজার হইতে গুটাইবার জন্য প্রস্তুত হয়। এইরূপ অবস্থাতে স্বাভাবিক মূল্য শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচের সমান হইতে পাবে না, কিংবা সর্ব নিকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচের সমান হইতে পারে না। যদি স্বাভাবিক মূল্য সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচের সমান হয়, তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজার হইতে বিদায় লইতে হইবে; কেননা উহাদের গড়পড়তা খরচ অপেক্ষাকৃত বেশী ও উহারা স্বাভাবিক মুনাফা লাভের অধিকারী হইবে না। স্বাভাবিক মূল্য নিকৃষ্টতম প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচেরও সমান হইতে পারে না, কেননা এই প্রতিষ্ঠান হয়ত কোন মুনাফা লাভেরই অধিকারী নয়। এইরূপ অবস্থায় মূল্য তত্ত্ব ব্যাখ্যানে অধ্যাপক মার্শাল **প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান** ধারণাটির প্রবর্তন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উৎপাদন যখন ক্রম বর্দ্ধমান বিধি প্রভাবিত, তখন দীর্ঘকালীন স্বাভাবিক মূল্য পণ্য যোগানের তরফ হইতে প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচের সমান হইবে। যখন স্বাভাবিক মূল্য প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচের সমান হয়, তখন গোটা শিল্প সাম্য স্থাপিত হইবে। অধ্যাপক মার্শালের 'প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান' বলিতে শিল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বনিকৃষ্ট প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় না। প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান শিল্পে নিয়োজিত সবগুলি প্রতিষ্ঠানের সকল বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি স্বরূপ। ইহা যেন গোটা শিল্পের যোগান বক্ররেখা সূচক প্রতিবিম্ব বিশেষ। মার্শালের নিজের কথায় প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান এমন একটি ব্যবসায় কারবার **"which has had fairly long life and fair success, which is managed with normal ability and which has normal access to**

উৎপাদনে ক্রম বর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হইলে, স্বাভাবিক মূল্য নির্ণয়ের সমস্যা

the economies, external and internal, which belong to the aggregate volume of production."

কিন্তু রবীন্স্, স্রাফা (Sraffa) প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ মার্শালের প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান ধারণাটির তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, দীর্ঘকালীন শিল্প সাম্যাবস্থায় শিল্পে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে।

প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান ধারণাটির বিরুদ্ধ সমালোচনা

দীর্ঘকালীন মিয়াদের যদি কোন শিল্পে কোন প্রতিষ্ঠান মুনাফা লাভ না করিতে পারে, তাহা হইলে উহা ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিয়া অন্য শিল্পে চলিয়া যাইবে। কিন্তু মার্শাল দীর্ঘকালীন মূল্য সাম্যাবস্থায় গোটা শিল্পের সাম্যাবস্থা ভিন্ন করিয়া ভাবিবার প্রয়োজন মনে করেন নাই। শিল্পের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির জন্য যে উহার প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তির প্রয়োজন আছে, মার্শাল তাহা তলাইয়া দেখেন নাই। তাঁহার মতে, যখন শিল্পের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে, তখন কোন কোন প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন কেবল সুরু হইতে পারে, আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের অবনতির দশাও দেখা দিতে পারে। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মন্তব্য এই যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে যখন ক্রম বর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হয়, তখন শিল্পের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান উহার পণ্য উৎপাদন এমন ভাবে বৃদ্ধি করিতে থাকে যে, উহা বাঞ্ছনীয় (optimum) অবস্থায় পৌছায়। এই অবস্থাতে উহাদের গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন হইবে এবং উহারা স্বাভাবিক মুনাফা লাভের অধিকারী হইবে। স্বাভাবিক মূল্য প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচের সমান হইবে। শিল্পের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যখন এই অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তখনই শিল্পের পূর্ণ সাম্য প্রতিষ্ঠা হইবে।

প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান ধারণাটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে মুখ্য অভিযোগ এই যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও ক্রম বর্ধমান আগম বিধির মধ্যে বিরুদ্ধতা (incompatibility) ও অসংগতি আছে।

ক্রম বর্দ্ধমান আগম বিধির প্রয়োগে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা টিকিতে পারে না। ফলে, প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের ধারণাটি উপযোগহীন হয়

যদি দীর্ঘকালীন উৎপাদান ক্রম বর্ধমান আগম বিধির প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন পণ্যের পরিমাণ এত বৃদ্ধি পাইতে পারে যে, গোটা শিল্প পণ্যের মোট যোগানের বেশ মোটা একটা অংশ ঐ একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান বাজারে সরবরাহ করিতে পারে। যদি শিল্পের ক্রম বর্ধমান আগম বিধির সুযোগ গ্রহণ করিয়া কোন একটি প্রতিষ্ঠান কেবলই উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি

করিতে থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলি প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে বাজার হইতে বিদায় লইবে। ফলে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা আর থাকিবে না, এক চেটিয়া কারবারের পত্তন হইবে। আবার ক্রম-বর্ধমান আগম বিধির সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিয়া মুষ্টিমেয় কতিপয় প্রতিষ্ঠানও মোট শিল্পপণ্য বাজারে সরবরাহ করিতে পারে। তখনও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা নষ্ট হইয়া যাইবে। অতএব, বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, যদি ক্রম-বর্ধমান আগম বিধি বা ক্রম-হ্রাসমান গড়পড়তা খরচের নিয়ম কার্যকরী হয়, তাহা হইলে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বাজারে আর থাকে না। আর পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অনুমান করা অসম্ভব হইলে, দীর্ঘ কালীন শিল্প-পণ্য মূল্য নির্ধারণে প্রতিভূ প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ উপযোগবিহীন হইয়া পড়ে।

ক্রম বর্ধমান আগাম বিধি ও প্রতিযোগিতা (Law of Increasing Returns and Perfect Competition): আমরা প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ সংম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছি যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও ক্রম বর্ধমান আগম বিধির মধ্যে বিরুদ্ধ সম্পর্ক (incompatibility) বর্তমান। ক্রম-বর্ধমান আগমবিধি কিংবা ক্রম-হ্রাসমান গড়পড়তা খরচ স্থিতিস্থাপকতা আনিতে পারে না (the state of decreasing cost is in fact an unstable one)। যদি শিল্পোৎপাদনে দীর্ঘকালীন গড়পড়তা খরচ ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে পণ্য বাজার পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাপূর্ণ থাকিতে পারে না। উৎপাদন ক্রমের বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি গড়পড়তা খরচও ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে, তাহা হইলে শিল্পের একটি বা একাধিক প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া অন্যান্য প্রতিযোগী প্রতিষ্ঠানগুলিকে বাজার হইতে বিতাড়িত করিয়া দিবে। ফলে, বাজারে একচেটিয়া কারবার বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পত্তন হইবে। আসলে, ক্রম হ্রাসমান গড়পড়তা খরচের বিধি স্থায়ী নিয়ম নহে; উৎপাদনের মূল ও স্থায়ী বিধি হইল ক্রম বর্দ্ধমান গড়পড়তা খরচ বা ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান যতক্ষণ পর্যন্ত উৎপাদন ক্রম বৃদ্ধি করিতে করিতে বাঞ্ছনীয় (optimum) স্তরে পৌঁছিবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা ক্রম বর্ধমান আগমের বা ক্রম হ্রাসমান গড়পড়তা খরচের সুবিধা গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় অবস্থা অতিক্রম করিয়া যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে আবার ক্রম হ্রাসমান আগম বা ক্রম বর্ধমান গড়পড়তা খরচের বিধি কার্যকরী হইতে থাকবে। অতএব, ইহা সুস্পষ্ট

যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে ক্রম বর্ধমান আগম বিধি প্রয়োগের একটা সীমারেখা আছে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between market price and normal price. Point out the dominant influences that determine them. (C.U.B.A. '54)
2. What is reservation price? On what factors does it depend?
3. Analyse carefully the conditions of the individual firm equilibrium under perfect competition in the short and long periods. (C.U.Hons. '55)
4. Discuss the problem of competitive price under increasing and decreasing returns. (C.U.B. Com. '56)
5. Show how competitive prices are determined under conditions of decreasing costs.
   "The state of decreasing costs is in fact an unstable one." Explain. (C.U.B.A. '53)
6. Can there be competitive equilibrium in any industry that is subject to the law of increasing returns?
7. Write a note on the concept of the Representative Firm.

ষোড়শ অধ্যায়

একচেটিয়া মূল্য তত্ত্ব (Monopoly Price Theory)

একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Monopoly Market) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা যেমন বাজারের চরম অবস্থা (extreme situation), তেমনি একচেটিয়া বাজারও আর এক চরম অবস্থা। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ঠিক বিপরীত অবস্থাই একচেটিয়া অবস্থা। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় অনুমান করা হয় যে, বিক্রেতাগণ বা ক্রেতাগণ কেহই ব্যক্তিগতভাবে পণ্যমূল্য নির্ধারণ করিতে পারে না—বর্তমান বাজার মূল্যে পণ্যের যোগান বা চাহিদা

পরিমাণ ধার্য করিতে পারে মাত্র। একচেটিয়া অবস্থায় বিক্রেতা বা ক্রেতা যথাক্রমে তাহার পণ্য যোগান বা চাহিদার নিয়ন্ত্রণদ্বারা বাজার মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। যখন একজন মাত্র ক্রেতার চাহিদার উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার স্থাপিত হয়, সে অবস্থাকেও একচেটিয়া ব্যবস্থা (monopoly) বলা যায়। কিন্তু খাদন বাজারে এইরূপ একচেটিয়া অবস্থা সাধারণতঃ বিরল। সুতরাং একচেটিয়া শব্দটির সাধারণ অর্থ এমন এক আর্থিক অবস্থা, যেখানে বহু খরিদ্দার এবং একজন মাত্র বিক্রেতা বর্তমান। গোটা বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা যে পণ্য সরবরাহ করে, ঐ দ্রব্যের পুরাপুরি পরিবর্তক সামগ্রীর (close substitutes) যোগান একচেটিয়া ব্যবস্থায় একদম বন্ধ, এবং ফলে, নূতন কোন বিক্রেতা বাজারে প্রবেশ করিতে পারে না।

একচেটিয়া মূল্য (Monopoly Price) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণের বিশ্লেষণে প্রতিষ্ঠান ও শিল্পের মূল্য সাম্যের পৃথকীকরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু একচেটিয়া মূল্য নির্ণয়ে এই পার্থক্যের কোন গুরুত্ব নাই। কেননা, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য সরবরাহ করে, তখন উহা শিল্পের সমস্ত গুণ ও বৈশিষ্ট্যই প্রাপ্ত হয়।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় পণ্য বিক্রেতার চাইতে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের সুবিধা বেশী। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা কেবল পণ্য বিক্রয়ের পরিমাণই ধার্য করিতে পারে, কিন্তু বাজার মূল্য নির্ধারণ করিতে পারে না। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিমাণ ধার্য অথবা মূল্য নির্ধারণ দুই-ই করিতে পারে। প্রতিষ্ঠান বাজারে কতটা পরিমাণ পণ্য ছাড়িবে সেটা একবার ধার্য হইল, একচেটিয়া পণ্য মূল্য পূর্ণাংগ বাজার মূল্যের মতই চাহিদা ও যোগানের কার্যকারিতাদ্বারা নির্ধারিত হইবে। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান একটি মূল্যস্তর ধার্য করিয়া, সেই মূল্যে কিন্তু অপরিমেয় দ্রব্য-পরিমাণ বিক্রয় করিতে পারে না। প্রতিষ্ঠান যদি পণ্য এককের মূল্য ১৲ টাকায় ধার্য করে, তাহা হইলে এই দামে উহা ২,০০০ একক দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু ১৲ টাকা একক প্রতি বাজার মূল্যে প্রতিষ্ঠান ৩,০০০ একক পরিমাণ দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে না। ১,০০০ একক দ্রব্য বেশী বিক্রয় করিতে হইলে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানকে বাজার মূল্য কমাইতে হইবে। ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, একচেটিয়া বিক্রেতার পণ্য চাহিদার বৈশিষ্ট্য প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজারের বিক্রেতার পণ্য চাহিদা-বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ নহে।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদার বক্ররেখা হয় সমান্তরাল সরলরেখা। এই রেখা এই ইংগিত করে যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একটি প্রতিষ্ঠান যত একক পণ্য সরবরাহ করুক না কেন, বাজার মূল্যের কোনই হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু একচেটিয়া বাজারে চাহিদার বক্ররেখা হইবে ডানদিকে ঢালু। এই ধরণের বক্ররেখার বৈশিষ্ট্য এই যে, একচেটিয়া বিক্রেতাকে অতিরিক্ত পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে হইলেই বাজার মূল্য কমাইতে হইবে। নিম্নে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় পণ্য চাহিদা এবং একচেটিয়া বাজারের পণ্য চাহিদার বক্ররেখার তুলনামূলক চিত্র অংকিত করা হইল।
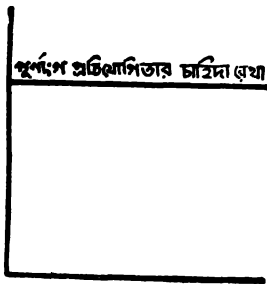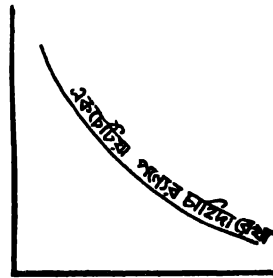
৩৬শ চিত্র ৩৭শ চিত্র

একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা আয় (চাহিদা বক্ররেখা) ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে সম্পর্ক পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় উহাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহার চেয়ে তফাৎ। নিখুঁত প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠান বা বিক্রেতার গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয় সমান; একই বক্ররেখাদ্বারা এই দুই আয় চিত্রায়িত করা যায়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় গড়পড়তা আয়ের চেয়ে কম হয়; ফলে প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখা গড়পড়তা আয়ের রেখার চেয়ে নীচে অবস্থান করে। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যখন অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে চায়, তখন উহাকে বাজার মূল্য কমাইতে হয়। এক একক পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করিবার জন্য যখন উহাকে বাজার মূল্য কম করিতে হয়, তখন এই বাজার মূল্য হ্রাসের ফলে পূর্বেকার এককগুলিও কমতি মূল্যে বিক্রয় করিতে হয় এবং ফলে, সমস্ত দ্রব্য একক বিক্রয় জনিত মোট আয়েরও অদল বদল হয়। নিখুঁত বাজারে যেমন এক একক পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করিলে বিক্রেতার মোট আয়ের বৃদ্ধি পায় অতিরিক্ত এক একক পণ্যমূল্য যোগদ্বারা, একচেটিয়া বিক্রেতার মোট আয় বৃদ্ধি কিন্তু সেরূপভাবে হয় না। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যখন এক একক পণ্য সরবরাহ বৃদ্ধি

করে, তখন উহার মোট আয়ের সংগে ঐ অতিরিক্ত এককের বাজার মূল্যের সম্পূর্ণ টাই কিন্তু যোগ হয় না। এক একক পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি করিলে বিক্রেতার মোট আয়ের সংগে ঐ এক একক পণ্যের বাজার মূল্য যোগ করিয়া, উহা হইতে আবার পূর্বেকার এককগুলি কম্‌তি মূল্যে বিক্রয় করিবার দরুণ যে লোকসান হয় সেটা বাদ দিতে হয়। ফলে, অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় করিলেও একচেটিয়া কারবারীর প্রান্তিক আয় গড়পড়তা আয়ের সংগে সমান হয় না ; প্রান্তিক আয় গড়পড়তা আয়ের অর্থাৎ বাজার মূল্যের চেয়ে কম হয়। নিম্নলিখিত উদাহরণদ্বারা বিষয়টি আরো বিশদভাবে বুঝান গেল।

পণ্য একক (Unit of Output)	পণ্য একক মূল্য (Price per Unit)	মোট আয় (Total Revenue)	গড়পড়তা আয় (Average Revenue)	প্রান্তিক আয় (Marginal Revenue)
১	৫·০৫	৫·০৫	৫·০৫	৫·০৫
২	৪·৯৫	৯·৯০	৪·৯৫	৪·৮৫
৩	৪·৮৫	১৪·৫৫	৪·৮৫	৪·৬৫
৪	৪·৭৫	১৯·০০	৪·৭৫	৪·৪৫

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় পণ্য যোগান ব্যাপারে বিক্রেতা যে উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হয়, একচেটিয়া পণ্য বাজারেও ঠিক একই লক্ষ্য বিক্রেতাকে উৎসাহিত করে। একচেটিয়া কারবারীর উদ্দেশ্যই থাকে উচ্চতম সম্ভাব্য মুনাফা শিকার। বাজারে যখনই সে অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহ করে, তখনই সে তাহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ মিলাইয়া দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার প্রান্তিক আয় প্রান্তিক খরচের চাইতে বেশী হইবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার পক্ষে পণ্য যোগান পরিমাণ বৃদ্ধি করা লাভজনক। যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করিলে বিক্রেতার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হইবে, সেই স্তরে দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা একচেটিয়া কারবারী সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের অধিকারী হইবে। এই স্তরের বাজার মূল্যই একচেটিয়া বাজার মূল্য। এই মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিলে কারবারী সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে। চিত্রদ্বারা ২০৫ পৃষ্ঠায় (৩৮শ চিত্র) একচেটিয়া মূল্য সাম্য প্রদর্শিত হইল।

একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের চাহিদা বক্ররেখা বা গড়পড়তা আয়ের বক্ররেখা

চা চা; প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখা উহার নিম্নে অবস্থান করিতেছে। প্রান্তিক আয়ও প্রান্তিক খরচ **ব** বিন্দুতে সমান। **ক ম** পরিমাণ দ্রব্য প্রতিষ্ঠানের সাম্য পণ্য (equilibrium output)। ইহা **ম প** মূল্যে বিক্রয় করিলে একচেটিয়া কারবারী সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু **ম প** মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিয়া প্রতিষ্ঠান একচেটিয়া মুনাফা (monopoly profit) লাভের অধিকারী হয়; কেননা,
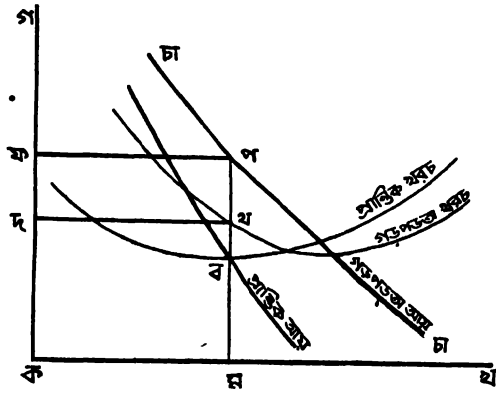
৩৮শ চিত্র

বাজার মূল্য বিক্রেতার গড়পড়তা খরচের চেয়ে বেশী। এই স্তরে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের মুনাফার পরিমাণ পরিমাপ করিতে হইলে মোট আয় হইতে মোট খরচ বাদ দিতে হইবে: চিত্রে মোট আয় হইবে পণ্য পরিমাণ × বাজার মূল্য = **কম** × **মপ** = আয়ত ক্ষেত্র **কমপফ**। মোট খরচ হইবে: পণ্য পরিমাণ × গড়পড়তা খরচ = **কম** × **মথ** = আয়ত ক্ষেত্র **দথমক**। মুনাফার পরিমাণ: আয়তক্ষেত্র **কমপফ** – আয়তক্ষেত্র **দথমক** = আয়তক্ষেত্র **দথপফ**। মনে রাখিতে হইবে যে, একচেটিয়া মুনাফা লাভ শুধু দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থায় সম্ভব; অল্পকালীন একচেটিয়া সাম্যে প্রতিষ্ঠানের পণ্য মূল্য ও গড়পড়তা খরচ সমান হইতেও পারে এবং প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভের অধিকারী হইতে পারে।

আর একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে এই যে, দীর্ঘকালীন একচেটিয়া মূল্য সাম্য যখন স্থাপিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন সাম্য প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচের ন্যায় সর্বনিম্ন হয় না। ফলে, একচেটিয়া-সাম্য প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় (optimum firm) প্রতিষ্ঠান হয় না।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মূল্যসাম্য ও একচেটিয়া মূল্যসাম্যের তফাৎ (Difference between Competitive Price Equilibrium and Monopoly Price Equilibrium): সাধারণতঃ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিক্রেতা পণ্য সরবারহ করে, একচেটিয়া কারবারীও মাল

যোগান দিতে ঠিক একই উদ্দেশ্যদ্বারা উৎসাহিত হয়। উভয়েরই লক্ষ্য থাকে কেমন করিয়া সর্বোচ্চ সম্ভাব্য মুনাফা শিকার করা যায়। উভয়েরই মূল্যসাম্য স্থাপিত হয় তখন, যখন উভয়ের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়। কিন্তু এই সকল মিল থাকিলেও প্রতিযোগী ও একচেটিয়া বিক্রেতার মধ্যে মৌলিক তফাৎ বিদ্যমান এবং উভয়ের মূল্যসাম্যাবস্থাও এক নয়।

প্রথমতঃ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদার অনুরূপ নয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় চাহিদা নিখুঁত সাম্য (absolutely elastic) হয়; চাহিদা রেখা হয় সমান্তরাল সরলরেখা। এইরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান বাজারে যত পরিমাণ পণ্যই সরবরাহ করুক না কেন, বাজার মূল্যের উপর কোন প্রভাবই ইহা বিস্তার করিতে পারে না। প্রতিষ্ঠান একই বাজার মূল্যে বিভিন্ন একক পণ্য বিক্রয় করিতে পারে। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা নিখুঁত সাম্য নয়। বাজারের মোট যোগানের উপর এই প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অধিকার থাকার দরুণ, অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানকে বাজার মূল্য হ্রাস করিতে হয়। ফলে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদার বক্ররেখা ডানদিকে ঢালুভাবে অবস্থান করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা আয়ও প্রান্তিক আয় রেখা-দুই সমান্তরাল সরল রেখা ও উহারা পরস্পর সমান। প্রতিষ্ঠান অতিরিক্ত পণ্য যোগান বৃদ্ধি করিলে উহার প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা আয় ও প্রান্তিক আয় সমান নহে; প্রান্তিক আয় গড়পড়তা আয়ের চেয়ে কম হয়—প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখা গড়পড়তা আয়ের বক্ররেখার চেয়ে নীচে অবস্থান করে। একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান যখন অতিরিক্ত পণ্য সরবরাহ করে, তখন উহার প্রান্তিক আয় বাজার মূল্যের চেয়ে কম হয়।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যখন প্রতিষ্ঠানের মূল্য সাম্য স্থাপিত হয়, তখন প্রান্তিক খরচের বক্ররেখা নীচ হইতে উঠিয়া প্রান্তিক আয়ের রেখাকে ছেদ করিবে। যেহেতু প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখা সমান্তরাল সরলরেখা, সেইজন্য প্রান্তিক খরচের রেখা পণ্য সাম্যের বিন্দুতে কিংবা উহার কাছাকাছি নীচের দিকে নামিতে পারে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক খরচের বক্ররেখা যদি ক্রমাগত নীচের দিকে নামিতে থাকে, তাহা হইলে সমান্তরাল প্রান্তিক আয়ের বক্ররেখাকে সাম্যাবস্থায় নীচ হইতে উঠিয়া কেমন করিয়া ভেদ করিবে?

কিন্তু একচেটিয়া মূল্যসাম্য যখন স্থাপিত হয়, তখন প্রান্তিক খরচের রেখা ঊর্ধ্ব দিকে উঠিতে পারে, নীচের দিক নাগিতে পারে কিংবা পণ্য অক্ষের সমান্তরাল সরলরেখা হইতে পারে। তবে প্রান্তিক খরচ বৃদ্ধি হইক, কি হ্রাস হউক, কি সমান থাকুক,—সকল সম্ভাব্য একচেটিয়া মূল্য সাম্যাবস্থায় প্রান্তিক খরচের রেখা নীচ হইতে উঠিয়া প্রান্তিক আয়ের রেখাকে ছেদ করিবে। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, যদি প্রান্তিক খরচের রেখা নীচের দিকে নামিতে থাকে, তাহা হইলে সেই নামার হার যেন প্রান্তিক আয়ের নীচের দিকে নামার হারের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক না হয়।

চতুর্থতঃ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন মূল্য সাম্যে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয় এবং পণ্য মূল্য ও গড়পড়তা খরচ সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া মূল্য সাম্যে প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয় বটে; কিন্তু একচেটিয়া পণ্য মূল্য ও গড়পড়তা খরচ সমান হয় না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে শিল্পের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করে; কেননা, প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ ও পণ্য মূল্য সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থায় অস্বাভাবিক রকম একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিয়া থাকে। বাজারে অন্য কোন বিক্রেতা প্রতিযোগিতা করে না বলিয়া এই প্রতিষ্ঠানের পণ্য মূল্য গড়পড়তা খরচের চেয়ে অধিক হয়। অল্পকালীন বাজারে অনেক সময় অবশ্য একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানও কেবলমাত্র স্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিয়া থাকে।

পরিশেষে, দীর্ঘকালীন পূর্ণাংগ বাজারে মূল্য সাম্যাবস্থায় প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই বাঞ্ছনীয় (optimum) প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হয়। পণ্য মূল্য প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচের সমান হয়। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের মূল্যসাম্য যখন স্থাপিত হয়, তখন প্রতিষ্ঠান সর্বনিম্ন গড়পড়তা খরচে পণ্য সরবরাহ করে না। অর্থাৎ একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠান নয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দীর্ঘকালীন সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠান যে মূল্যে যে পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করে, তাহার তুলনায় একচেটিয়া সাম্যাবস্থায় প্রতিষ্ঠান অপেক্ষাকৃত বেশী মূল্যে কম পরিমাণ পণ্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

মূল্য নির্ধারণে একচেটিয়া বিক্রেতার অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক (Limits to the Power of a Monopolist) : একচেটিয়া বিক্রেতার বাজারে কোন প্রতিযোগী না থাকায়, গোটা পণ্য যোগান তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু

তাহা বলিয়া, সে নিজের ইচ্ছানুরূপ বাজার মূল্য দাবী করিতে পারে না। বহু অসুবিধা ও প্রতিবন্ধকের মধ্যে তাহাকে পণ্য সরবরাহ করিতে হয়। পণ্য মূল্য নির্ধারণে ঐ সকল অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

প্রথমতঃ, একচেটিয়া মূল্য নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধক হয় পণ্য চাহিদার প্রকৃতি। যদি একচেটিয়া বাজার পূর্ণাংগ হয়, তাহা হইলে পণ্যের চাহিদা অনম্য হইবে; কেননা, বাজারে তখন পরিবর্তক সামগ্রী বলিয়া কিছু থাকিবে কল্পনা করা যায় না। অবশ্য বাস্তব একচেটিয়া বাজার পূর্ণাংগ নয়; ফলে, একচেটিয়া বিক্রেতা যে পণ্য সরবরাহ করে উহার পরিবর্তক অভাব হয় না। বাজারে যত বেশী নিখুঁত পরিবর্তক পাওয়া যাইবে, ততই একচেটিয়া বিক্রেতার পণ্য চাহিদা নম্য হইবে। বিক্রেতার পণ্য চাহিদা যত বেশী নম্য হইবে, ততই বাজার মূল্য ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে তফাং কম হইবে; আবার পণ্য চাহিদা যত অনম্য হয়, তত বিক্রেতার বাজার মূল্য ও প্রান্তিক আয়ের মধ্যে তফাং বৃদ্ধি পায়। অতএব, আমরা দেখি যে, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠানের বাজার মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হয় তখন, যখন উহার পণ্য চাহিদা অনম্য হয়; আবার পণ্য চাহিদা যখন নম্য হয়, তখন বাজার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হয়। একচেটিয়া বিক্রেতা যখন বিভিন্ন মূল্যে বিভিন্ন বাজারে মাল সরবরাহ করে, তখনও এই চাহিদা-নম্যতা ও চাহিদা-অনম্যতার তারতম্যানুসারেই যথাক্রমে বিভিন্ন বাজারে কম বেশী মূল্য ধার্য করে।

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া বাজার বাস্তবতঃ নিখুঁত না হওয়ায়, বাজারে পরিবর্তক সামগ্রীর যোগান সকল সময়ই সম্ভব। যদি একচেটিয়া পণ্যমূল্য উচ্চস্তরে ধার্য হয়, তাহা হইলে খরিদ্দার স্বভাবতঃ অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের পরিবর্তক সামগ্রী ক্রয় করিতে উৎসাহ প্রকাশ করিবে। ফলে, একচেটিয়া কারবারের অক্ষুণ্ণতা নষ্ট হইয়া যাইবে।

তৃতীয়তঃ, কেবল যে পরিবর্তক সামগ্রীর প্রচলন সম্ভাবনাই একচেটিয়া বিক্রেতার ভয়ের কারণ, তাহা নহে। সে যদি বাজার মূল্য উচ্চস্তরে ধার্য করে, তাহা হইলে একই পণ্য উৎপাদনে নূতন প্রতিযোগীর উদ্ভব হওয়ার খুবই সম্ভাবনা। নূতন প্রতিযোগী যাহাতে বাজারে প্রবেশ করিয়া একই ধরণের মাল সরবরাহ করিতে না পারে, সে জন্য একচেটিয়া কারবারীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত পণ্যমূল্য ধার্য করিতে হয়।

চতুর্থতঃ, একচেটিয়া কারবারী মূল্য নির্ধারণের ব্যাপারে বিভিন্ন আগম বিধি

দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। যদি একচেটিয়া কারবারীর পণ্য উৎপাদনে সম আগম বিধি কার্যকরী হয়, তাহা হইলে বিক্রেতার পণ্য যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি নির্ভর করিবে দ্রব্যের চাহিদা বৈশিষ্ট্যের উপর। উৎপাদনে যখন সম আগম বিধি কার্যকরী হয়, তখন গড়পড়তা খরচের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। এইরূপ অবস্থায় যদি পণ্য চাহিদা নম্য হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে যোগান পরিমাণ বৃদ্ধি করা ও পণ্যমূল্য হ্রাস করা লাভজনক। অপর পক্ষে, যদি পণ্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে পণ্য যোগান পরিমাণ হ্রাস করিয়া একচেটিয়া বাজার মূল্য বৃদ্ধিকরা কারবারীর পক্ষে লাভজনক।

একচেটিয়া কারবারের পণ্য উৎপাদনে যদি ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি কার্যকরী হয়, তাহা হইলে পণ্য যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে গড়পড়তা খরচও বৃদ্ধি পায়। এইরূপ অবস্থায় দ্রব্য যোগান হ্রাস করিয়া বাজার মূল্য উচ্চস্তরে ধার্য করা একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে লাভজনক। যখন পণ্য উৎপাদনে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি কার্যকরী হয়, এবং দ্রব্যের চাহিদাও হয় অনম্য, তখন একচেটিয়া কারবারীর পণ্য যোগানের পরিমাণ হইবে ক্ষুদ্রতম।

যদি উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হয়, তাহা হইলে একচেটিয়া বিক্রেতার গড়পড়তা খরচ পণ্য যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে হ্রাস পাইতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় পণ্য যোগান বৃদ্ধি করিয়া একচেটিয়া বাজার মূল্য হ্রাস করা কারবারীর পক্ষে লাভজনক। উৎপাদনে যখন ক্রম-বর্ধমান আগম বিধি কার্যকরী হয় এবং পণ্যের চাহিদাও হয় নম্য, তখন একচেটিয়া কারবারীর পণ্য যোগানের পরিমাণ হইবে বৃহত্তম।

পঞ্চমতঃ, বাজারমূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে একচেটিয়া কারবারী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণকে একটা বড় প্রতিবন্ধক মনে করিয়া থাকে। একচেটিয়া বিক্রেতা বাজার মূল্য উচ্চ স্তরে ধার্য করিতে সাধারণতঃ ভয় পায়, পাছে রাষ্ট্র জনসাধারণের কল্যাণ ও স্বার্থ রক্ষার্থে বাজার মূল্য বা মুনাফা বাঁধিয়া দিয়া একচেটিয়া কারবারকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে বাধ্য করে।

পরিশেষে, একচেটিয়া বিক্রেতা বাজার মূল্য উচ্চ স্তরে ধার্য করিয়া খাদক শ্রেণীর ভোগোদ্বৃত্তের গোটা পরিমাণ নিজে আত্মসাৎ করিতে সাহস করে না; কেননা, তাহা হইলে জনমত বিশেষ ভাবে ক্ষুণ্ণ হইবে। গণতান্ত্রিক যুগে খাদকশ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া জনমত অবজ্ঞা করা কোন কারবারীর পক্ষেই দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।

কিন্তু পণ্য মূল্য নির্ধারণ ব্যাপারে একচেটিয়া কারবারীর উপরি উক্ত বহু অসুবিধা ও প্রতিবন্ধক থাকা সত্ত্বেও, সে যে বাজার মূল্যে পণ্য বিক্রয় করে তাহা সাধারণতঃ পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় বাজার মূল্যের চেয়ে চড়া।

পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্য (Discriminating Monopoly Price) : আমরা এ যাবৎ যে সরল একচেটিয়া মূল্যতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছি, তাহাতে বিক্রেতা তাহার একচেটিয়া পণ্যের জন্য বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন ক্রেতার নিকট একই মূল্য দাবী করিয়া থাকে। কিন্তু বাস্তব বাজারে আমরা দেখি যে, একচেটিয়া কারবারী একই পণ্য বিভিন্ন বাজারে বা বিভিন্ন খরিদারের নিকট বিভিন্ন দামে বিক্রয় করিয়া থাকে। এইরূপ বিভিন্ন ক্রেতার কাছে একচেটিয়া কারবারী যখন বিভিন্ন বাজার মূল্য দাবী করে তখন তাহাকে একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণ বলা হয়। গোটা পণ্য যোগান তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার দরুণ, একচেটিয়া বিক্রেতা খাদক সম্প্রদায়কে তাহাদের ব্যাক্তগত আয় ও পছন্দক্রম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণী ভুক্তি করিতে পারে। ফলে, এক এক শ্রেণীর খাদক এক একটি পৃথক চাহিদা-বাজার সৃষ্টি করে। তখন পৃথক পৃথক বাজারে মূল্য পৃথগীকরণও সম্ভব হয়।

একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণ কেবল যে বিভিন্ন বাজার সম্পর্কেই সম্ভব তাহা নহে। বিভিন্ন ক্রেতার নিকটেও ব্যক্তিগত ভাবে পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্য দাবী করা চলে। বিভিন্ন খরিদ্দারের চাহিদা ও অর্থ আয়ের অবস্থা বুঝিয়া একচেটিয়া কারবারী তাহাদের নিকট একই পণ্যের বিভিন্ন মূল্য দাবী করিতে পারে। ইহাকে **ব্যক্তিগত মূল্য পৃথগীকরণ** (Personal Price Discrimination) বলা হয়। কোন গ্রামে যদি একমাত্র ডাক্তার থাকেন, তাহা হইলে তাহার পক্ষে ব্যক্তিগত পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্য ধার্য করা সম্ভব হয়। একই চিকিৎসা কৃত্যের জন্য তিনি ধনী ব্যক্তির নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক দর্শনী-মূল্য দাবী করিতে পারেন এবং গরীব ব্যাক্তর নিকট নামমাত্র দর্শনী আদায় করিতে পারেন।

মূল্য পৃথগীকরণের বিভিন্ন রূপ (Forms of price discrimination)

একচেটিয়া কারবারী একই দ্রব্যের জন্য পৃথক পৃথক স্থানেও আবার পৃথক পৃথক মূল্য দাবী করিতে পারে। ইহাকে **স্থানিক মূল্য পৃথগীকরণ** বলা হয় (Local Price Discrimination)। বিক্রেতা যখন বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালে, আর স্বদেশে সেই একই মাল অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে বিক্রয় করে

(dumping), তখন উহাকে স্থানক পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্যের উদাহরণ বলা যায়।

একচেটিয়া কারবারী আবার অনেক সময় ব্যবসায়ী ক্রেতার কাছে এক মূল্য এবং সাধারণ খাদকের কাছে পৃথক মূল্য দাবী করিয়া থাকে। যেমন, কোন সহরের বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ সংস্থা শিল্প কারখানার নিকট অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে চলৎশক্তি বিক্রয় করে, কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের নিকট অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে শক্তি সরবরাহ করিয়া থাকে। ইহাকে **ব্যবসায়িক মূল্য পৃথগীকরণ** (Trade Price Discrimination) বলা হয়।

অনেক সময় আবার ইহাও দেখা যায় যে, বিক্রেতা একই খরিদ্দারের কাছে পণ্যের বিভিন্ন এককের জন্য বিভিন্ন মূল্য দাবী করিয়া থাকে। যেমন, পণ্যের প্রথম ১০০ মণের জন্য সে যে মূল্য দাবী করে, দ্বিতীয় ১০০ মণের জন্য তাহার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম মূল্য, এবং তৃতীয় ১০০ মণের জন্য দ্বিতীয় ১০০ মণের চেয়েও অপেক্ষাকৃত কম মূল্য ধার্য করে। এইরূপ মূল্যের পৃথগীকরণকে **নিখুঁত পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্য** (Perfectly Discriminating Monopoly Price) বলা হয়।

কেবলমাত্র পৃথক পৃথক মূল্য নির্ধারণদ্বারাই যে পৃথক কারক একচেটিয়া কারবারের পত্তন হয় তাহা নহে। একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণের আরও অনেক উপায় ও কৌশল আছে। দীর্ঘদিনের জন্য ধার (credit), ভাড়া মাশুল (freight), ছাড়ধরা (rebate), দস্তুরি (commission) প্রভৃতি সুযোগ-সুবিধার প্রলোভন বিভিন্ন খরিদ্দারকে বিভিন্ন প্রকারে দেখাইয়া, কারবারী অনেক সময় পৃথক কারক একচেটিয়া ব্যবসায় ও মূল্য পৃথগীকরণ কায়েমী রাখিতে পারে।

একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণের সাফল্য দুইটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ**, বিভিন্ন বিক্রয় বাজার এমনভাবে পৃথক হওয়া প্রয়োজন যে, কোন নির্দিষ্ট বাজারে যে পণ্য একক যোগান দেওয়া হইয়াছে, উহা অন্য কোন পৃথক বাজারে আবার সরবরাহ না হয়। যদি অল্প মূল্যের বাজার হইতে অধিক মূল্যের বাজারে পণ্য স্থানান্তরিত হইয়া পুনঃ বিক্রয়ের জন্য স্থাপিত হয়, তাহা হইলে কারবারীর পক্ষে সেই পণ্যের মূল্য পৃথগীকরণদ্বারা লাভ করা সম্ভব নয়। মূল্য পৃথগীকরণের এই অনুকূল অবস্থা

মূল্য পৃথগীকরণের অনুকূল অবস্থা (Conditions for successful price discrimination)

সাধারণতঃ দেখা যায় তখনই, যখন কারবারী খরিদ্দারকে সরাসরিভাবে পণ্য অথবা সেবাকৃত্য বিক্রয় করিয়া থাকে। ডাক্তার যখন তাহার চিকিৎসা কৃত্য সরাসরিভাবে ধনী ও গরীব ব্যক্তিকে বিক্রয় করিয়া থাকেন, তখন ধনী ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত অল্প দর্শনীতে রোগ দেখাইবার জন্য গরীব সাজিতে পারে না। যে সেবাকৃত্য অপেক্ষাকৃত অল্প দর্শনী-মূল্যে গরীবের নিকট বিক্রয় হয়, তাহা ধনীর নিকট পুনঃ বিক্রীত (re-sold) হইতে পারে না। সেই রকম রেলওয়ে পরিবহন শিল্প যখন বিভিন্ন দ্রব্যের উপর কিংবা বিভিন্ন যাত্রীর উপর বিভিন্ন ভাড়ামাশুল আদায় করে, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক মাশুল দিয়া যে দ্রব্য স্থানান্তরিত হয় বা যাত্রী যাতায়াত করে, সেই মাল বা যাত্রী অল্প মাশুলে পরিবহনের সুযোগ গ্রহণ করিতে পারেনা। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া কম বলিয়া প্রথম শ্রেণীর যাত্রী ঐ শ্রেণীতে ভ্রমণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও সম্মান জলাঞ্জলি দিয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করে না।

দ্বিতীয়তঃ, একচেটিয়া মূল্যের পৃথগীকরণ আরও নির্ভর করে খরিদ্দারের চাহিদা প্রকৃতি ও অর্থ আয়ের বৈষম্যের উপর। যদি খরিদ্দারের চাহিদা এমন হয় যে, সে শুধু এক বিশেষ বাজারে পণ্য ক্রয় করে,—ঐ বাজারে পণ্যমূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হইলেও সস্তা বাজারে পণ্য খরিদ করিতে ধাবিত হয় না,—তাহা হইলেও একচেটিয়া কারবারীর পক্ষে মূল্য পৃথগীকরণ সাফল্য যুক্ত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মূল্য পৃথগীকরণদ্বারা সাফল্য লাভের আশায় বিক্রেতা অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যে যে খরিদ্দারের কাছে পণ্য বিক্রয় করে তাহার সংগে একটি চুক্তি গোড়াতেই করিয়া লয়, যাহাতে ঐ ক্রেতা সস্তার মাল চড়া বাজারে পুনঃ বিক্রয় না করে। যাহাতে বিভিন্ন বাজারের খরিদ্দারের মধ্যে যোগাযোগ না ঘটে সেদিকে কারবারীকে সকল সময়ই সতর্কতা অবলম্বন করিতে হয়।

মনে রাখিতে হইবে, একচেটিয়া কারবারী বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন মূল্যে পণ্য বিক্রয় করিতে পারে তখনই, যখন বিভিন্ন বাজারের চাহিদা নম্যতা এক না হয়। সাধারণতঃ, যে বাজারে চাহিদা নম্য, সেই বাজারে তাহাকে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে পণ্য যোগান দিতে হয়; আবার যে বাজারে চাহিদা অনম্য, সে বাজারে কারবারী অপেক্ষাকৃত অধিক মূল্যে পণ্য সরবরাহ করিয়া থাকে।

একচেটিয়া বিক্রেতা যখন বিভিন্ন বাজারে পৃথক পণ্যমূল্য দাবী করে, তখনও তাহার উদ্দেশ্য থাকে কি করিয়া মোট বিক্রয় হইতে সর্বোচ্চ পরিমাণ মুনাফা শিকার করা যায়। মূল্য পৃথক কারক একচেটিয়া কারবারীর সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি

ঘটে দুটি পৃথক সর্ত পূরণ করিলেঃ প্রথমতঃ, যে সকল পৃথক পৃথক বাজারে বিক্রেতা মাল সরবরাহ করে, তাহার প্রত্যেকটিতে প্রান্তিক আয় (marginal revenue) পরস্পর সমান হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি বাজারের প্রান্তিক আয় বিক্রেতার মোট পণ্য উৎপাদনের প্রান্তিক খরচের সমান হইবে। প্রত্যেকটি বাজারে মাল যোগানদ্বারা প্রান্তিক আয় সমান হইলেও, প্রত্যেকটি বাজারের পণ্যমূল্য কিন্তু সমান হইবে না। প্রত্যেকটি বাজারের পণ্য মূল্য নির্ভর করিবে চাহিদা বৈশিষ্ট্যের উপর। যে বাজারে চাহিদা নম্য, সে বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্য দাবী করিতে হয়, আর যে বাজারে চাহিদা অনম্য, সেখানে একচেটিয়া বিক্রেতা অপেক্ষাকৃত চড়া মূল্য ধার্য করে। পৃথক কারক একচেটিয়া মূল্য সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই, যখন বিক্রেতা এমনভাবে বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন মূল্যস্তর ধার্য করে যে, প্রত্যেক বাজারের প্রান্তিক আয়ের সহিত তাহার মোট পণ্য উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ সমান হয়।

পৃথক-কারক একচেটিয়া মূল্য সাম্য (Discriminating Monopoly Price Equilibrium)

পৃথক কারক মূল্য নির্ধারণদ্বারা কেবল যে একচেটিয়া বিক্রতার মুনাফার অংকই উচ্চ হয় তাহা নহে, অনেক সময় উহা সমাজ কল্যাণের সহায়তা করিয়া থাকে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় মানুষের অর্থ আয়ের বৈষম্য রহিয়াছে। যদি কোন পণ্যের একই মূল্য ধার্য করা হয়, তাহা হইলে উহা সমাজের সকল খরিদ্দারের পক্ষে অনুকূল নাও হইতে পারে। কেবল মাত্র ধনী খাদক শ্রেণীর পক্ষে ঐ মূল্যে পণ্য ক্রয় সম্ভব হইতে পারে, গরীব শ্রেণীর পক্ষে ঐ পণ্য একরকম নাগালের বাহিরে। এমত ক্ষেত্রে বিক্রেতার মোট বিক্রয়লব্ধ আয় এত সংকীর্ণ হইয়া পড়িতে পারে যে, তাহার মোট খরচ নাও উঠিতে পারে। অপরপক্ষে, কারবারী যদি বিভিন্ন খাদক শ্রেণীর নিকট বিভিন্ন বাজার মূল্য দাবী করে—যদি ধনী খরিদ্দারের কাছে অপেক্ষাকৃত চড়া দামে পণ্য বিক্রয় করে, আর গরীব খাদকশ্রেণীকে অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যে মাল যোগান দেয়—তাহা হইলে একদিকে যেমন বিক্রেতার বিক্রয়লব্ধ আয় বৃদ্ধি পাইয়া তাহার মোট খরচ উঠিয়া আসিবে, অন্যদিকে তেমনি খাদক সম্প্রদায়েরও সুবিধা হইবে। ধনী খাদক শ্রেণী তাহাদের অপেক্ষাকৃত উচ্চ আয়দ্বারা চড়াদামের পণ্য ক্রয় করিতে সমর্থ হইবে; আর গরীব খরিদ্দারগণ তাহাদের সীমিত আয়দ্বারা অপেক্ষাকৃত সস্তা

একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণ কি সমাজ কল্যাণের অনুকূল? (Is price discrimination beneficial to society?)

মূল্যের মাল ক্রয় করিতে সক্ষম হইবে। এই ধরণের একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণ শুধু যে সমাজের বিভিন্ন খাদকশ্রেণীর ভোগোদ্‌বৃত্ত লাভেরই অনুকূল তাহা নহে, ইহা সাধারণের অর্থ আয়ের বৈষম্য দূর করিয়া গোটা সমাজের বণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধন করে।

বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা (Dumping): আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা, আর স্বদেশে চড়া মূল্যে মাল চালান, স্থানিক মূল্য পৃথগীকরণের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। উৎপাদন খরচের চাইতেও কম অর্থমূল্যে বিদেশে মাল ঢালাকে সাধারণতঃ লোকে dumping বলিয়া থাকে। কিন্তু বিক্রেতা গড়পড়তা খরচের চেয়ে কম বাজার মূল্যে বিদেশে মাল ঢালিলেও, স্বদেশের বাজারে পণ্যমূল্য গড়পড়তা খরচের চেয়ে বেশ উর্ধ্বে ধার্য করে।

বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালার উদ্দেশ্য (Purposes of Dumping)

একচেটিয়া বিক্রেতা বিভিন্ন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালিতে পারে। **প্রথমতঃ**, বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে অনেক কারবারী বিদেশে অতি সস্তায় মাল ঢালে। স্বদেশের বাজার সীমিত বলিয়া, বিক্রেতা যদি উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া স্থানিক বাজারে পণ্য যোগান বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে উহার বাজার মূল্য স্বভাবতই নামিয়া আসিবে। স্থানিক বাজারে মাল সরবরাহ বৃদ্ধি করিয়া কোন একচেটিয়া কারবারী মুনাফা নষ্ট করিতে রাজী নহে। যোগান বৃদ্ধিদ্বারা বৃহদায়তন উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে হইলে বিক্রেতাকে উদ্‌বৃত্ত পণ্য বিদেশের বাজারে অপেক্ষাকৃত সস্তা মূল্যে চালু করিতে হয়। **দ্বিতীয়তঃ**, যখন কোন বিক্রেতার পণ্য-পুঁজি প্রচুর পরিমাণে জমিয়া যায়, এবং স্বদেশের বাজারে আর উহার কাটতি সম্ভব হয় না, তখন নামমাত্র বাজার দরে বিদেশে ঐ মাল ঢালা হইয়া থাকে। **তৃতীয়তঃ**, বিদেশের বাজারে নূতন ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা সুনাম কিনিবার জন্য বিদেশের জাতীয় শিল্প নষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে, কিংবা বিদেশের বাজার হইতে প্রতিযোগতা একদম দূর করিয়া একচেটিয়া ব্যবসায় কায়েমী করিবার উদ্দেশ্যেও অনেক সময় অতি সস্তায় বিদেশে মাল ঢালা হইয়া থাকে।

কিন্তু অতি সস্তায় বিদেশে মাল ঢালার পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন, কোন দেশের বিক্রেতা এই ব্যবস্থা চিরস্থায়ী ভাবে গ্রহণ করিতে বা

চালাইয়া যাইতে পারে না। অবশ্য ব্যবস্থাটি যদি চিরস্থায়ী হইত, তাহা হইলে যে দেশে অতি সস্তায় মাল ঢালা হইত, সেখানকার খাদক শ্রেণীর স্বার্থানুকূল হইত বটে, কিন্তু ঐ দেশের জাতীয় শিল্প ব্যবসার অধোগতি ও ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পাড়িত। Dumpingএর এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিভিন্ন প্রতিরোধক উপায় অবলম্বন করা হয়।

প্রথমতঃ, যে সকল দ্রব্য অতি সস্তায় বিদেশে ঢালা হয়, উহার আমদানী ঐ দেশে একদম বন্ধ করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। অবশ্য এই উপায় অবলম্বন করিলে অনেক সময় ঐ দেশের খাদক সম্প্রদায়েব স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** ঐ দেশ সংরক্ষণ নীতি প্রবর্তন করিয়া অতিসস্তা মালের আমদানী বন্ধ করিয়া বৈদেশিক প্রতিযোগিতা হইতে জাতীয় শিল্প ব্যবসায় রক্ষা করিতে পারে। **তৃতীয়তঃ,** অতি সস্তায় বিদেশে মাল ঢালার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ণ ও প্রবর্তন দ্বারাও জাতীয় সরকার Dumping গোত্রীয় স্থানিক একচেটিয়া মূল্য পৃথগীকরণের অনিবার্য কুফল রোধ করিতে পারে। পৃথিবীর অনেক দেশেই এইরূপ আইন প্রবর্তন করা হইয়াছে। মনে থাকিতে পারে, অতি সস্তা জাপানী মাল আমদানীর বিরুদ্ধে ভারতবর্ষেও ১৯৩৩ সালে অনুরূপ আইন পাশ করা হইয়াছিল।

অনুশীলনী

1. On what principles does the monopolist fix the price of his products ? Can he charge any price he likes ?
(C.U. B.A. '56)
2. What are the limits to the power of a monopolist to charge any price he likes ? Do you think that prices under monopoly must always be higher than under competition ? (C.U. B.Com. '54)
3 Define monopoly. Explain the price policies followed by the monopolist to maximise profits.
4. Show how a monopoly price is affected by (i) elasticity of demand ; (ii) substitutes ; (iii) potential competition and (iv) risk of legal interference.
5. Examine the conditions which are necessary in order to enable a monopolist to practise price discrimination successfully. Can snch discrimination ever prove successful ? (C.U. B.A Hons. '55)

সপ্তদশ অধ্যায়

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও মূল্য নির্ণয়

(Imperfect Competition and Price-determination)

আমরা এ যাবৎ যথাক্রমে পূর্ণাংগ বাজার ও একচেটিয়া বাজারের পণ্য মূল্য তত্ত্ব ও উহাদের আনুসঙ্গিক সমস্যা বিশ্লেষণ করিয়াছি। কিন্তু পূর্ণাংগ বাজার ও একচেটিয়া বাজার দুই-ই অবাস্তব চরম অর্থনৈতিক অবস্থা। উহারা অর্থবিদ্যাবিদগণের মানস কল্পনা মাত্র। বাস্তব বাজার একদম নিখুঁতও নয়, একচেটিয়াও নয়। বাস্তব বাজারে কিছু পরিমাণ প্রতিযোগিতাও থাকে ; আবার পাশাপাশি একচেটিয়া ব্যবস্থার কিছু উপাদানও বিদ্যমান। এইরূপ বাস্তব অবস্থাকে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলে। মোটামুটি ভাবে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বলিতে আমরা বুঝি নিখুঁত প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া ব্যবস্থা,—এই দুই চরম অবস্থার মাঝামাঝি গোটা অর্থব্যবস্থাকে।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভবের কারণ (Characteristics of Imperfect Competition and the Causes of its Emergence) : পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যেমন পণ্য উৎপাদক কারকগণের শিল্প হইতে শিল্পান্তরে অবাধ গতিশীলতা আছে, অপর পক্ষে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারকগণের এক বৃত্তি হইতে বৃত্ত্যান্তর গ্রহণের পথে বহু বাধা ও প্রতিবন্ধক থাকে। ফলে বিভিন্ন শিল্পে নিয়োজিত কারকগণের অর্থ আয়ও সমান হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ক্রেতা বিক্রেতার সংখ্যার চাইতে অল্প হয়। ফলে, প্রত্যেক ক্রেতা বা বিক্রেতা যথাক্রমে নিজের খরিদ বা বিক্রয়দ্বারা পণ্য মূল্য প্রভাবান্বিত করিতে পারে। "There is neither a single individual who controls the bulk of the amount demanded and supplied, nor are there so many that their individual shares are negligible in relation to the total. We find a number of people (buyers and sellers) who are each able to influence in some measure the terms of exchange."

তৃতীয়তঃ, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বাজার পণ্য ও মূল্যান্তর সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতার খোঁজ খবর ও ধারণাও সীমাবদ্ধ থাকে। ইহার জন্য ক্রেতাগণ

পছন্দসই উৎকৃষ্ট পণ্য সম্ভাব্য নিম্নতম মূল্যে খরিদ করিতে পারে না। আর ইহার জন্য বিক্রেতাগণও হয়ত সম জাতীয় পণ্য বিভিন্ন বাজার মূল্যে বিক্রয় করে; কিংবা একই পণ্যের বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট 'brand' বিভিন্ন মূল্যে বিক্রয় করে। এই বাজারের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হইল বিভিন্ন বিক্রেতার পণ্য বিভেদন (product differentiation)। অনেক সময় প্রকৃত গুণের দিক দিয়া পণ্য বিভেদন নাও হইতে পারে। পণ্য বিভেদন খরিদ্দারের নিছক কল্পনা প্রসূত হইতে পারে। যেমন, বাজারে মটর গাড়ী হয়ত দশটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান একযোগে যোগান দেয়। কলকব্জা, যন্ত্রপাতির দিক দিয়া উহাদের প্রকৃত কোন পার্থক্য নাও থাকিতে পারে। কিন্তু প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের গাড়ীর রং, বসিবার আসন, বাহিরের চেহারার জৌলুস প্রভৃতিতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে, যাহার জন্য বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানের গাড়ী খরিদ্দারের চোখে সম্পূর্ণ পৃথক ঠেকে।

বিক্রেতার পণ্য বিভেদন

চতুর্থতঃ, অপূর্ণাংগ বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতাই চেষ্টা করে তাহার নিজের পণ্যের প্রকৃষ্ঠতা গ্রাহকগণের সামনে বিশেষভাবে তুলিয়া ধরিতে ও প্রমাণ করিতে। প্রত্যেক বিক্রেতারই সমস্যা কি করিয়া তাহার পণ্য বিক্রি দ্রুত বাড়ান যায়। তাহার জন্য বিক্রেতার প্রয়োজন হয় জোর বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার কার্য চালান। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতার মোট উৎপাদন ব্যয়ের একটা বেশ মোটা অংশ হইল বিক্রয় খরচ (selling costs)। কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় বিক্রেতার বাজারে মাল চালু করিবার সমস্যা নাই; বিজ্ঞপ্তি বা প্রচার কার্যের কোন বালাই নাই—বিক্রয় খরচ বলিয়া উৎপাদন ব্যয়ের কোন আঙ্গিক নাই। অপূর্ণাংগ প্রাতযোগিতায় বিক্রেতার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হওয়ার দরুণ, এবং (তাহাদের বাজার-যোগান) পণ্য বিভেদন হেতু, প্রত্যেক বিক্রেতা প্রত্যেকের পণ্য বিক্রয়ের জন্য খরিদ্দারের পছন্দক্রম অনুসারে একটি একটি পৃথক ছোটখাটো বাজারের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক বিক্রেতা তাহার সৃষ্ট বাজারে অনেকটা একচেটিয়া কারবারীর মত মূল্য ধার্য করে। কিন্তু এই মূল্য নির্ধারণ সম্পূর্ণ একচেটিয়া কারবারীর মূল্য নির্ধারণের অনুরূপ নহে। কেননা, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক বিক্রেতাই সকল সময় তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণের মূল্যনীতি সম্পর্কে খুব সজাগ থাকে।

বিক্রেতার পণ্য বিক্রয় সমস্যা

পরিশেষে, শুধু যে পণ্য বিভেদনের জোরেই খরিদ্দারগণ বিশেষ বিশেষ মূল্য দিয়া বিশেষ বিশেষ বিক্রেতার নিকট পণ্য ক্রয় করিতে আকৃষ্ট হয়, তাহা নহে।

আরও অনেক সুযোগ সুবিধালাভের লোভে তাহারা বিশেষ বিশেষ বিক্রেতার নিকট হইতে মাল খরিদ করিতে পছন্দ করে। ফলে, পণ্য মূল্য বৈষম্য ও অপূর্ণাংগ বাজারের পত্তন অনিবার্য হইয়া উঠে। অনেক সময় পরিবহন খরচ বৃদ্ধি হওয়ার ভয়ে মাল এক বাজার হইতে অন্য বাজারে চালু হয় না। খরিদ্দারগণ সাধারণতঃ নিকটতম বাজার হইতে মাল ক্রয় করিয়া থাকে। খরিদ্দারগণ অনেক সময় কোন বিশেষ বিক্রেতার নিকট ধারে পণ্য ক্রয় করিবার সুবিধা লাভ করিয়া থাকে, যাহার জন্য তাহারা অন্যত্র পণ্য ক্রয় করিতে আকৃষ্ট হয় না। অনেক বিক্রয় প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও বিক্রয়-কন্যাদের ভদ্র ও মিষ্ট ব্যবহারে কিছু খরিদ্দার সেখানে আকৃষ্ট হয়; অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, যেখানে এক জায়গায় বসিয়া রকমারি দ্রব্য ক্রয় করিবার সুবিধা আছে, বিভিন্ন দ্রব্যের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ঘুরিতে হয় না। অনেক সময় আবার কোন কোন প্রতিষ্ঠানের খ্যাতি ও বাজার নামের বহর একশ্রেণী ক্রেতাকে এমনভাবে আকৃষ্ট করে যে, ঐ সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য অধিকতর চড়া মূল্যে ক্রয় করিতে তাহারা সম্মান বোধ করে।

অপূর্ণাংগ বাজার উদ্ভবের অন্যান্য কারণ

একচেটিয়া প্রতিযোগিতা (Monopolistic Competition) : অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার একটি বিশেষ অবস্থাকে অধ্যাপক চেম্বারলিন (Chamberlin) একচেটিয়া প্রতিযোগিতা আখ্যা দিয়াছেন। একচেটিয়া প্রতিযোগিতার তিনটি বৈশিষ্ট্য আছে : **প্রথমতঃ,** এইরূপ বাজারে বহু বিক্রেতা মাল সরবরাহ করে। **দ্বিতীয়তঃ,** বিভিন্ন বিক্রেতা বাজারে যে মাল বিক্রয় করে তাহা মোটামুটি খরিদ্দারের চক্ষে একই জাতীয় (homogeneous) মনে হয়; যদিও আসলে পণ্য বিভেদন থাকিয়াই যায়। (The sellers supply similar goods, but not identical goods)। **তৃতীয়তঃ,** এই অবস্থায় মূল্য নির্ধারণ নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন বিক্রেতার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বড় একটা দেখা যায় না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় নিজেদের অজ্ঞতার জন্যই হউক, বা অন্য কারণের জন্যই হউক, খরিদ্দারগণ বিভিন্ন বাজার মূল্যে একই জাতীয় পণ্য ক্রয় করিয়া থাকে। কোন বিশেষ বিক্রেতা যদি তাহার নিজের বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন, বিশেষ মার্কাযুক্ত মালের বাজার মূল্য চড়া করিয়া ধার্য করে, তাহা হইলে ঐ মালের সাধারণ গ্রাহকগণ ঐ বিক্রেতার কাছে মাল খরিদ করা ছাড়িয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত সস্তায় অন্য বিক্রেতার কাছে মাল খরিদ করিতে যায় না।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Monopolistic Competition)

অথবা, কোন বিশেষ বিক্রেতা যদি তাহার পণ্য মূল্য হ্রাস করে, তাহা হইলেও বাজারের সমস্ত খরিদ্দার অন্য সকল বিক্রেতাকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাছে অপেক্ষাকৃত সস্তায় মাল কিনিতে ছুটিয়া আসিবে না। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতা তাহার পণ্যের বাজারমূল্য কমাইলে প্রতিক্রিয়া হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণও যে তাহাদের পণ্যের বাজার মূল্য কমাইবে তাহা সত্য নহে; কিংবা একজন খরিদ্দার তাহার পণ্যের বাজারমূল্য চড়া হাঁকিলে, অন্য সকল প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণ যে বাজার মূল্য চড়া হাঁকিবে, তাহাও সত্য নয়।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বিক্রেতা যেহেতু কিছুটা মাত্রায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার অধিকারী, সেই হেতু অধিক পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করিতে হইলে তাহাকে বাজার মূল্য হ্রাস করিতে হয়। অপর পক্ষে, যদি সে বাজার মূল্য উচ্চস্তরেও ধার্য করে, তাহা হইলে বাজারের সকল গ্রাহককে হারায় না। এ বিষয়ে সে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার পণ্য বিক্রেতার চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা; কেননা, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন বিক্রেতা যদি বাজারের বর্তমান মূল্য হইতে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে সে সকল গ্রাহককেই হারাইবে। অর্থাৎ, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা রেখা হয় সরল সমান্তরাল, কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানের পণ্য চাহিদা রেখা বাম হইতে ডানদিকে ঢালুভাবে অবস্থান করে। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় চাহিদা রেখা অনেকটা নিখুঁত একচেটিয়া বিক্রেতার পণ্যচাহিদা রেখার অনুরূপ। সাধারণতঃ, ইহা একচেটিয়া পণ্যের চাহিদা রেখার চেয়ে অধিক নম্য হইয়া থাকে; কেননা, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার পক্ষে বাজারে মাল সরবরাহ বৃদ্ধি করা সহজ এবং নিকটতম পরিবর্তক সামগ্রীর (close substitutes) যোগান মেলাও দুষ্কর নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় পণ্য মূল্য কি নীতিদ্বারা নির্ধারিত হয় এবং সাম্যাবস্থাই বা কি ভাবে স্থাপিত হয়, তাহা ৩৯শ চিত্রের (পৃঃ ২২০) সাহায্যে বিশদভাবে আলোচনা করা হইল।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় পণ্যমূল্য নির্ধারণ
(Price determination under Monopolistic Competition)

চিত্রটি একচেটিয়া সাম্যাবস্থা (monopoly equilibrium) ইংগিত করিতেছে। এই চিত্রের সাহায্যে বিক্রেতা সর্ব প্রথম বাজারে মাল বিক্রয় করিতে নামিয়া যে একচেটিয়া কারবারীর অনুরূপ সুযোগ সুবিধা পাইতেছে তাহা নির্দেশ করা হইয়াছে। বিক্রেতার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয়

তখন, যখন সে **কম** পরিমাণ পণ্য বিক্রয় করে। প্রতিযোগিতার উদ্ভব হইবার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত সে **দ খ প ফ** পরিমাণ উদবৃত্ত মুনাফা লাভ করিবে। কিন্তু একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় যখন একজন বিক্রেতা উদবৃত্ত মুনাফা লাভ করে, তখন অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীও পণ্য যোগান দিয়া প্রতিযোগিতা করিতে স্বরু করিবে; ফলে মূল বিক্রেতার কিছু গ্রাহক হাত ছাড়া হইয়া যাইবে। তাহার পণ্যের চাহিদাও হ্রাস পাইবে এবং চাহিদা রেখা বাম দিকে সরিয়া আসিবে। প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতাগণ বাজারে প্রবেশ করিয়া প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিলে, মূল বিক্রেতার পরিণতি কি হইবে নিম্নের চিত্রে তাহা অংকন করা গেল।
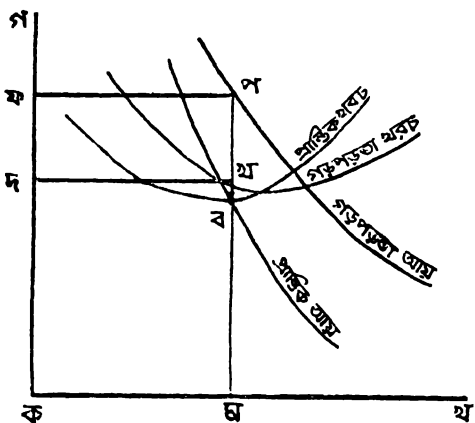
৩৯শ চিত্র

পাশের চিত্রে (৪০শ চিত্র) মূল বিক্রেতার পণ্য চাহিদা রেখা বামদিকে নামিয়া আসিয়া গড়পড়তা খরচ রেখার সংগে **প** বিন্দুতে স্পর্শক হইয়াছে। ৩৯শ চিত্রে বিক্রেতার যে উদ্‌বৃত্ত মুনাফা ছিল, ৪০শ চিত্রে তাহা উবিয়া গিয়াছে এবং বাজার মূল্য গড়পড়তা খরচের সমান হইয়াছে। মূল বিক্রেতার পণ্যচাহিদা যদি আরও হ্রাস পায়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে বাজারে মাল যোগান দেওয়া অসম্ভব হইবে; কেননা, সে ক্ষেত্রে বিক্রেতার খরচ বাজার মূল্যের চেয়ে অধিক হইবে। যতক্ষণ অবধি চাহিদা ও খরচের অবস্থা দ্বিতীয় চিত্রে অংকিত রেখার অনুরূপ থাকিবে, ততক্ষণ বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায় করিয়া যাইবে এবং শিল্পও সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।
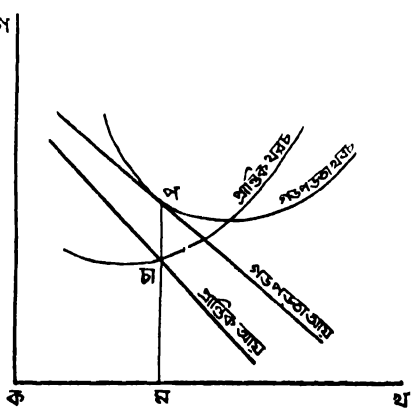
৪০শ চিত্র

উপরে যে বিশ্লেষণ আমরা করিলাম, তাহা পণ্য বিভেদন দরুণ প্রতিযোগিতা একচেটিয়া সত্ত্বেও নিখুঁত, প্রতিযোগিতা যেখানে সেই অর্থব্যবস্থার সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রতিযোগিতা পূর্ণাংগ ও একচেটিয়া হইলে, মূলবিক্রেতার পণ্য বক্ররেখা ৪০শ চিত্রে অংকিত চাহিদা রেখার ন্যায় অতটা বাম দিকে নামিয়া আসিবে না। অর্থাৎ চাহিদা রেখা গড়পড়তা খরচ রেখার স্পর্শক হইবে না; এবং বাজারের আদি বিক্রেতা কিছু পরিমাণ একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিবে।

একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় পণ্যমূল্য নির্ধারণের কয়েকটি বিশেষ তাৎপর্য্য (implications) লক্ষ্যনীয়। **প্রথমতঃ**, যতক্ষণ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার বাজারে প্রবেশ করার পথে কোন বাঁধা বিপত্তি না থাকিবে, ততক্ষণ বিক্রেতা মাল বিক্রয় করিয়া একচেটিয়া মুনাফা লাভ করিতে পারিবে না। এই অবস্থায় বিক্রেতার পণ্য এককের নীট আগম নিখুঁত প্রতিযোগিতায় পণ্য আগমের চাইতে অধিক নয়। অবশ্য, বাস্তব ক্ষেত্রে এই চরম অবস্থা উদ্ভব বড় একটা হয় না। কেননা, প্রতিদ্বন্দ্বী বিক্রেতার বাজারে অবাধ প্রবেশের পথে বহু বাধা বিঘ্ন থাকে, যাহার জন্য প্রতিযোগিতা হয় অপূর্ণাংগ ও একচেটিয়া। ফলে, বিক্রেতার খরচের উপর উদবৃত্ত মুনাফা লাভ একেবারে উবিয়া যায় না। **দ্বিতীয়তঃ**, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় যখন শিল্প সাম্য স্থাপিত হয়, তখন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলি বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠানের গৌরব অধিকার করিতে পারে না; কেননা, মূল্য সাম্যাবস্থায় উহাদের গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়া আসে না। **তৃতীয়তঃ**, মূল্যসাম্যাবস্থায় গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন না হওয়ায়, একচেটিয়া প্রতিযোগিতায় বাজার মূল্য পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার সাম্য মূল্যের চেয়ে অপেক্ষাকৃত চড়া হয়। ইহার কারণ এই যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় শিল্প সাম্যাবস্থায় সকল বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান বাঞ্ছনীয় প্রতিষ্ঠানের গৌরব লাভ করে, উহাদের গড়পড়তা খরচ সর্বনিম্ন স্তরে আসে এবং বাজার মূল্য গড়পড়তা খরচের সমান হয়।

Oligopoly : আর এক রকমের অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা আছে যাহাকে ইংরেজীতে Oligopoly বলা হয়। মোটামুটি ভাবে ইহা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারেরই মাঝামাঝি অবস্থা। ইহার বৈশিষ্ট্য এই যে, একচেটিয়া প্রতিযোগিতার মত ইহাতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা তত অগণিত নহে। বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা কতিপয় হওয়ার দরুণ, এই অবস্থাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মূল্য নির্ধারণ নীতি সংস্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হয়। বাজারে যখন

Oligopolyর বৈশিষ্ট্য

মূল্য নীতি সম্পর্কে বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছে। এ অবস্থাতে বিভিন্ন বিক্রেতাদের মধ্যে মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকে না ; বৃহত্তম প্রতিষ্ঠানটি যে মূল্য ধার্য করে, তাহাই অন্য বিক্রেতাগণ নিজেদের পণ্যমূল্য বলিয়া মানিয়া লয়। Oligopolyতে যখন এইরূপ মূল্য নেতৃত্ব (Price Leadership) স্থাপিত হয়, তখন বাজার মূল্য সাধারণতঃ একচেটিয়া পণ্যমূল্যের সমগোত্রীয় হয়।

মনে রাখিতে হইবে, oligopolyতে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অবস্থা পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানের অবস্থার চাইতে পৃথক্ হয়। বাজারের মোট যোগানের বেশ একটা মোটা অংশ প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সরবরাহ করিয়া থাকে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যখন পণ্য যোগান বৃদ্ধি করে, বাজার মূল্য তখন হ্রাস পাইতে থাকে এবং প্রান্তিক আয়েরও পরিবর্তন হয়। একচেটিয়া বাজারের মত oligopolyতেও প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান পণ্য পরিমাণ সেই পর্যায়ে সরবরাহ করিবে যেখানে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান।

আমরা এ যাবৎ যে oligopolyর মূল্য নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করিলাম উহাতে সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্যই এক জাতীয়। কিন্তু oligopolyতে পণ্য বিভেদনও হইতে পারে। এ অবস্থাতে কিন্তু বিভিন্ন বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলি পণ্য মূল্য নীতি সম্পর্কে পারস্পরিক প্রতিক্রিয়াশীল নয়। এ অবস্থাতে, যেহেতু বিভিন্ন বিক্রেতা বিভিন্ন ধরনের পণ্য বিক্রয় করে, সেই হেতু প্রত্যেকে একটি পৃথক্ বিক্রয় বাজার সৃষ্টি করিতে পারে। এ অবস্থাতে যতটি বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান, ততটি পৃথক বাজার এবং ততটি বিভিন্ন মূল্যস্তর। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি নির্ভর করে উহার প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হওয়ার উপর। তবে নিখুঁত oligopolyর মত এ অবস্থাতেও সাম্যমূল্য অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির। শিল্পের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পণ্য যোগানের পরিমাণ ও পণ্য মূল্য পরিবর্তন সর্বদাই করিতে হয়, যাহাতে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক আয় ও প্রান্তিক খরচ সমান হয় এবং প্রত্যেকে উচ্চতম সম্ভাব্য মুনাফা লাভের অধিকারী হয়।

Monopsony এবং **Oligopsony :** অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা আরও রকমারী হইতে পারে। যখন পণ্য বাজারের ক্রেতা অগণিত নয়—একমাত্র ক্রেতা বা মুষ্টিমেয় ক্রেতা যখন বহু বিক্রেতা বা কতিপয় বিক্রেতার নিকট হইতে পণ্য খরিদ করে তখনও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার উদ্ভব হয়। বাজারে যখন একমাত্র ক্রেতা

মাল খরিদ করে, সে অবস্থাকে **Monopsony** বলা হয় ; আর যখন কতিপয় ক্রেতা মাল ক্রয় করে, সে অবস্থাকে **Oligopsony** বলা হয়। Monopsony কিংবা Oligopsony—এই দুই অবস্থাতেই ক্রেতা বাজারে স্থাপিত মোট পণ্যের বেশ একটা মোটা অংশ খরিদ করে ; কেননা, বাজারে খরিদ্দার মাত্র একজন, কিংবা কতিপয় মাত্র। ফলে, এই অবস্থাতে ক্রেতা নিজ খরিদদ্বারা পণ্যমূল্য প্রভাবান্বিত করিতে পারে। সাধারণতঃ, খাদন দ্রব্য বা ভোগ্যবস্তুর বাজারে অগণিত খরিদ্দার দেখা যায়। জনৈক ক্রেতা কিংবা মুষ্টিমেয় কতিপয় ক্রেতা দেখা যায়, অনেক কাঁচা মালের বাজারে কিংবা শ্রমের বাজারে।

বাজারে যদি একজন মাত্র খরিদ্দার কিংবা কতিপয় খরিদ্দার থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেক খরিদ্দার যতই দ্রব্য বা সেবাকৃত্য (service) ক্রয় করিবে, ততই তাহাকে উহাদের জন্য চড়া মূল্য দিতে হইবে। অল্পকালীন Monopsony কিংবা Oligopsony বাজারে অধিক পণ্য বা কৃত্য ক্রয় করা মানেই অধিক যোগান দর দেওয়া। দীর্ঘকালীন পণ্যবাজারে শিল্পোৎপাদন যেখানে ক্রম হ্রাসমান আগমবিধির প্রভাবগ্রস্ত, সেখানে অধিক পণ্য ক্রয় করিতে হইলে, কিংবা বাজারে অধিক শ্রম খরিদ করিতে হইলে, প্রত্যেক খরিদ্দারকে অধিক বাজার মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকতে হয়।

কাঁচামালের বাজারে কিংবা শ্রম বাজারে খরিদ্দার যখনই আত্যন্তিক পরিমাণ দ্রব্য বা শ্রম ক্রয় করে, তখনই তাহার ক্রয় খরচ অতিরিক্ত হয়। এক একক কাঁচামাল, কিংবা শ্রম ক্রয় করিতে খরিদ্দারের মোট ক্রয় খরচ যতটুকু বৃদ্ধি পায়, সেইটুকুই তাহার প্রান্তিক ক্রয় খরচ (marginal purchase cost)। খরিদ্দার যখন অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচামাল কিংবা শ্রম ক্রয় করিয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, তখন তাহার মোট উৎপন্ন পণ্য কিছুটা পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এই অতিরিক্ত পণ্য বিক্রয়দ্বারা তাহার মোট আয়ের পরিমাণ কিছুটা বৃদ্ধি পায়—অর্থাৎ, অতিরিক্ত পরিমাণ কাঁচামাল কিংবা শ্রম বিনিয়োগদ্বারা খরিদ্দারের প্রান্তিক আয় (marginal revenue) বৃদ্ধি পায়। বাজারে খরিদ্দার যতবেশী পরিমাণ কাঁচামাল বা শ্রম ক্রয় করিতে থাকবে, ততই তাহার প্রান্তিক ক্রয় খরচ বৃদ্ধি পাইবে ও প্রান্তিক আয় হ্রাস পাইবে। Monopsony কিংবা Oligopsony বাজারের সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন, যখন খরিদ্দারের কাঁচামালের বা শ্রম ক্রয় জনিত প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় পরস্পর সমান হইবে। ৪২শ চিত্র (২২৬ পৃঃ) হইতে Monopsony

কিংবা Oligopsony বাজারের মূল্য নির্ধারণ সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হইবে।

চিত্রে যোগানরেখা ঊর্ধ্বগামী। ঊর্ধ্বগামী যোগানরেখা এই ইংগিত করিতেছে যে, Monopsony কিংবা Oligopsony বাজারে খরিদ্দার যত বেশী পণ্য বা শ্রম ক্রয় করে, ততবেশী যোগান মূল্য তাহাকে দিতে হয়। প্রান্তিক ক্রয়
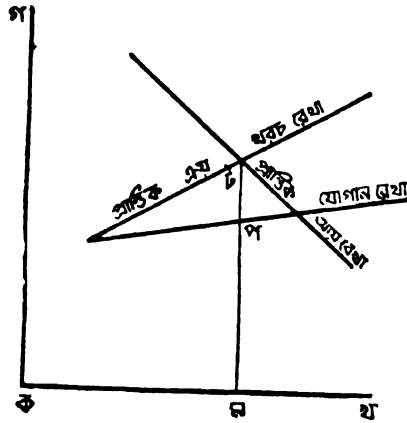
৪২শ চিত্র

খরচ রেখা যোগান রেখার চেয়ে উপরে অবস্থান করিতেছে এবং ইহা যোগান রেখার তুলনায় অধিকতর হারে ঊর্ধ্বগামী। প্রান্তিক ক্রয় খরচ রেখা **ট** বিন্দুতে প্রান্তিক আয়ের রেখাকে ছেদ করিতেছে। অতএব, খরিদ্দার **ক ম** পরিমাণ মাল কিংবা শ্রম, **ম প** মূল্যে ক্রয় করিবে।

অনুশীলনী

1. When and why does competition become "imperfect"?
   (C. U. B. Com. '55)

2. Explain the concept of Monopolistic Competition. How is price determined under Monopolistic Competition ?

3. Explain how prices are fixed under Oligopoly.
   (C. U. B. A. Hons. '52)

4. How does price determination under Imperfect Competition differ from that under Perfect Competition ?

অষ্টাদশ অধ্যায়

সম্পর্কযুক্ত পণ্যমূল্য (Inter-related Prices)

আমরা এ যাবৎ যে বিভিন্ন অবস্থায় পণ্যমূল্য সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছি, উহার সকল ক্ষেত্রেই এই অনুমান করিয়া লওয়া হইয়াছে যে, একটি দ্রব্যের বাজার মূল্য অপর সকল পণ্যের বাজারমূল্য হইতে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন। কিন্তু, বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখি যে, বিভিন্ন সামগ্রীমূল্য পারস্পরিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সম্পর্ক সম্বলিত। প্রায় প্রতিটি পণ্যের মূল্যই অপর একটি বা একাধিক পণ্যমূল্যদ্বারা প্রভাবান্বিত। এই সম্পর্ক-যুক্ত পণ্যমূল্যের ব্যাপক বিশ্লেষণই আমরা এই অধ্যাযে করিতেছি।

সাধারণতঃ, অনুপূরক সামগ্রীর (complementary goods) বেলায় সম্পর্কযুক্ত পণ্যমূল্য নির্ধারণের সমস্যা দেখা যায়। অনুপূরক সামগ্রী বলিতে সেই সকল দ্রব্য বুঝায়—যাহাদের চাহিদা সংযুক্ত (joint demand), কিংবা যোগান সংযুক্ত (joint supply)।

সংযুক্ত চাহিদা (Joint Demand) : যখন কোন অভাব পূরণের জন্য, কিংবা কোন পণ্য উৎপাদনের জন্য দুই বা ততোধিক দ্রব্য বা কৃত্য একযোগে ব্যবহৃত হয়, তখন উহারা অনুপূরক সামগ্রী বা কৃত্য বলিয়া পরিগণিত হয়,—উহাদের চাহিদাও হয় সংযুক্ত। যেমন, পাউরুটি ও মাখনের চাহিদা, কিংবা দোয়াত, কলম, কাগজ এবং কালীর চাহিদা সংযুক্ত। সমস্ত উৎপাদক কারকের চাহিদাও সংযুক্ত ; কেননা, কোন দ্রব্য উৎপাদন করিতে ভূমি, শ্রম, মূলধন ও সংগঠন একযোগে ব্যবহৃত হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদনের জন্য যখন বিভিন্ন কারক একযোগে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাদের চাহিদাকে **উদ্ভূত চাহিদা** বলে (Direct Demand) ; অপর পক্ষে, যে সামগ্রী উৎপাদনের জন্য (যেমন রাস্তা নির্মাণ) কারকগুলি ব্যবহৃত হয়, উহার চাহিদাকে **প্রত্যক্ষ চাহিদা** (Direct Demand) বলে। যে সকল দ্রব্য অনুপূরক বা যে সকল দ্রব্যের সংযুক্ত চাহিদা, উহার একটির বাজার মূল্যের সহিত অপরটির বাজার মূল্য সম্পর্কযুক্ত। যেমন, পাউরুটির বাজার মূল্যের সহিত মাখনের বাজার মূল্যের সম্বন্ধ আছে। পাউরুটির বাজার মূল্য যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে উহার চাহিদা হ্রাস পাইবে। পাউরুটির চাহিদা হ্রাস পাইলে, মাখনের চাহিদাও হইবে কম এবং সেই কারণে মাখনের বাজার মূল্য হ্রাস পাইবে। অপর পক্ষে, পাউরুটির বাজার মূল্য হ্রাস হইলে, উহার চাহিদা বাড়িবে। পাউরুটির চাহিদাবৃদ্ধি পাইলে,

মাখনের চাহিদাও বাড়িবে এবং সেই কারণে, মাখনের বাজার মূল্যও বৃদ্ধি পাইবে। অবশ্য, সম্পর্কযুক্ত পণ্য মূল্যের এই গতি দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে। প্রথমতঃ, পাউরুটির চাহিদা ও মাখনের যোগানের নম্যতার উপর। দ্বিতীয়তঃ, ব্যবহৃত দ্রব্যের অনুপাত কতটা অদল বদল করা সম্ভব তাহার উপর।

সংযুক্ত চাহিদা ও পণ্যমূল্য নির্ধারণ (Joint Demand and Price Determination): যে সকল সামগ্রীর সংযুক্ত-চাহিদা, উহাদের মূল্য নির্ধারণ কি ভাবে হয়, তাহাই এখন অলোচনা করা যাক্।

সাধারণ ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য যেমন প্রান্তিক উপযোগ ও প্রান্তিক খরচদ্বারা নির্ধারিত হয়, সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রেও মূল্য তত্ত্বের ঐ মূল নিয়ম কিছু অদল বদল করিয়া প্রয়োগ করিতে হয়। সংযুক্ত চাহিদার ক্ষেত্রে অনুপূরক দুই বা ততোধিক সামগ্রীর পৃথক পৃথক প্রান্তিক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করার কোনই অসুবিধা নাই; কেননা, উহাদের প্রত্যেকটি দ্রব্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া পৃথক। যেমন, পাউরুটি ও মাখনের পৃথক পৃথক উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করার কোনই সমস্যা নাই; কেননা, উহারা একযোগে উৎপন্ন হয় না। সমস্যা হইল, চাহিদার দিক হইতে বিভিন্ন অনুপূরক সামগ্রীর পৃথক পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা। যেহেতু পাউরুটি ও মাখন একযোগে ব্যবহৃত হয়, সেইহেতু কোন্ সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

সংযুক্ত চাহিদা ক্ষেত্রে দুইটি দ্রব্যের পৃথক পৃথক প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করিতে হইলে, একটি দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া, আর একটি দ্রব্যের চাহিদা পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়। দ্বিতীয় দ্রব্যটির চাহিদা পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে খাদক যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করিবে, উহাই ঐ সামগ্রীর প্রান্তিক উপযোগ। যদি পাউরুটির প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে মাখনের চাহিদা পরিমাণের কোন হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া, পাউরুটির চাহিদা একক বৃদ্ধি করিতে হইবে। পাউরুটির চাহিদা এক একক বৃদ্ধির ফলে, যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করা যায়, উহাই পাউরুটির প্রান্তিক উপযোগ। এইরূপ ভাবে আবার, পাউরুটির পরিমাণ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া, যদি মাখনের চাহিদা পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে মাখনের প্রান্তিক উপযোগ নির্ণয় করা সম্ভব হইবে। পাউরুটির বাজার মূল্য নির্ধারিত হইবে পাউরুটির প্রান্তিক উপযোগ ও উহার প্রান্তিক খরচদ্বারা। সেইরূপ, মাখনের বাজার মূল্য নিরূপিত হইবে মাখনের প্রান্তিক উপযোগ ও উহার প্রান্তিক খরচদ্বারা। বিভিন্ন উৎপাদক

কারকের (উহাদের চাহিদাও সংযুক্ত) বাজার মূল্যও এই একই নীতিদ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন, শ্রমের অর্থ মজুরী নির্ধারিত হয় শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতা ও শ্রমের প্রান্তিক খরচদ্বারা।

যখন বিভিন্ন কারক কোন পণ্য উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একযোগে ব্যবহৃত হয়, তখন উহাদের মধ্যে একটি কারক বিশেষ কোন কোন অবস্থাতে উহার বাজার মূল্য বা অর্থ-আয় বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়। যেমন, গৃহ নির্মাণ কাজে অন্যান্য কারকের সহিত একযোগে রাজমিস্ত্রীর শ্রমও ব্যবহৃত হয়। বিশেষ কোন্ কোন্ অবস্থাতে রাজমিস্ত্রীর শ্রমের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে?

কোন কারকের অর্থ-আয় বৃদ্ধির অনুকূল অবস্থা (Conditions favouring a rise in the price of a factor.)

প্রথমতঃ, রাজমিস্ত্রীর মজুরী বৃদ্ধি পাইতে পারে তখনই, যখন রাজমিস্ত্রীর শ্রমের চাহিদা একান্ত আবশ্যকীয় ও অনম্য হয়। গৃহ নির্মাণে যদি রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন না থাকে, কিংবা রাজমিস্ত্রীর পরিবর্তক (substitutes) হিসাবে অন্য কোন শ্রমিক, কিংবা কোন যন্ত্রপাতি সহজ লভ্য হয়, তাহা হইলে রাজমিস্ত্রী তাহার শ্রমের জন্য উচ্চ অর্থ মূল্য লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যে সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শ্রম বিনিয়োগ ও ব্যবহৃত হয়, উহার চাহিদাও অনম্য হওয়া প্রয়োজন। যে সকল গৃহ নির্মাণে রাজমিস্ত্রী নিয়োগ করা হয়, উহাদের চাহিদা যদি অনম্য হয়, তাহা হইলেই রাজমিস্ত্রী বেশী মজুরী হাঁকিতে পারে। বাড়ীর চাহিদা অনম্য বলিয়া, অধিক মূল্যে বাড়ীভাড়া দেওয়া সম্ভব হয়। রাজমিস্ত্রীর উচ্চ মজুরী বাড়ীভাড়ার চড়ামূল্যের মধ্যে প্রতিফলিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, রাজমিস্ত্রীর যোগান মূল্য বৃদ্ধির আর একটা সর্ত এই যে, রাজমিস্ত্রীর মজুরী গোটা উৎপাদন খরচের অতি সামান্য অংশমাত্র হওয়া চাই। মজুরী যদি গোটা খরচের অতি নগণ্য অংশমাত্র হয়, তাহা হইলে শ্রমিক উচ্চ হারে মজুরী দাবী করিলেও, মোট খরচ অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি পাইবে না। শ্রমিকের উচ্চতর মজুরীর দাবী মিটাইবার জন্য মোট খরচ যদি অস্বাভাবিক রকম বৃদ্ধি করিতে না হয়, তাহা হইলে কোন বুদ্ধিমান উৎপাদক শ্রমিককে কম মজুরী দিয়া অসন্তুষ্ট করিয়া রাখিবে না।

চতুর্থতঃ, যদি এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে, অন্যান্য কারকগণ অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থমূল্য গ্রহণ করিতেও রাজী, তাহা হইলেও শ্রমিকের মজুরী বৃদ্ধি

পাইতে পারে। যেমন, গৃহ নির্মাণ কাজে রাজমিস্ত্রীরা যদি ধর্মঘট করে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে গৃহ নির্মাণে নিয়োজিত অন্যান্য ধরণের মজুর বিকল্প কর্ম সংস্থান না হওয়ায়, অপেক্ষাকৃত অল্প মজুরীতেই কাজ করিতে স্বীকার করিবে। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য মজুরকে অল্প মজুরী দিয়া, রাজমিস্ত্রীর মজুরী বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হয়।

সংযুক্ত যোগান (Joint Supply) : যোগান সংযুক্ত হয় তখনই, যখন একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগদ্বারা দুই বা ততোধিক দ্রব্য বা সেবা কৃত্য একযোগে উৎপাদন করা সম্ভব হয়। যে সকল পণ্য বা সেবা কৃত্যের যোগান সংযুক্ত, উহারাও অনুপূরক (complementary); ঐ সকল পণ্যের বা কৃত্যের বাজার মূল্যও সম্পর্কযুক্ত। যে সকল দ্রব্যের যোগান সংযুক্ত, ঐগুলিকে সম্মিলিত উৎপত্তিও (joint products) বলা যায়। একই খরচদ্বারা সংযুক্তভাবে উৎপন্ন হয় বলিয়া, অনেকে আবার উহাদিগকে সংযুক্ত উৎপন্ন খরচ মাল (joint cost goods) বলিয়া থাকেন। সংযুক্ত যোগান মালের উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তুলা ও তুলা বীজ, পশম ও মাংস, গ্যাস ও কয়লা, ধান ও খর ইত্যাদি। সংযুক্ত যোগানের বিশেষ লক্ষণ এই যে, একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগদ্বারা এবং একই উৎপাদন প্রক্রিয়াদ্বারা দুই বা ততোধিক সামগ্রী বা কৃত্য একযোগে উৎপন্ন হওয়া চাই। সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের মধ্যে, মূলতঃ যে সামগ্রী উৎপাদনের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা হয়, উহাকে **মুখ্য পণ্য** বলে; আর যে সামগ্রীটি অনিবার্যভাবে মূল পণ্যের সংগে সংগে উৎপন্ন হয়, উহাকে **উপজাত দ্রব্য বা গৌণ পণ্য** (**bye-product**) বলা হয়।

সংযুক্ত যোগান পণ্যের মূল্য-সম্পর্ক

যে সকল পণ্যের যোগান সংযুক্ত, উহাদের বাজার মূল্যের কি সম্পর্ক? তুলা ও তুলা বীজের সংযুক্ত যোগান; যদি তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সংগে তুলার বাজার দর বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে বীজের বাজার মূল্যের গতি কি হইবে? তুলার চাহিদা বৃদ্ধির সংগে যখন তুলার বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন স্বভাবতঃই অধিক মুনাফা লাভের আশায় তুলা উৎপাদন বাড়িতে থাকে। তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সংগে, বীজের যোগানও বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু বীজের বাজার চাহিদা একই থাকায়, বীজের বাজার মূল্য হ্রাস পাইবে। অতএব, সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রে যখন মুখ্য পণ্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন গৌণ পণ্যের বাজার মূল্য হ্রাস পাইবে; অপর পক্ষে, মুখ্য পণ্যের মূল্য হ্রাস হইলে, গৌণ পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে।

সংযুক্ত যোগান ও মূল্য নির্ধারণ (Joint Supply and Price Determination) : সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য নির্ধারণের বেলায়ও চাহিদা ও যোগানের মূলসূত্র প্রয়োগ করিতে হয়। তবে সাধারণ অবস্থায় স্বতন্ত্রভাবে একটি পণ্যের মূল্য নির্ণয় করিতে এই সূত্রের যেরূপ প্রয়োগ হয়, সংযুক্ত যোগানক্ষেত্রে উহার প্রয়োগের একটু তারতম্য আছে। সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামগ্রীর মোট সম্মিলিত খরচ নির্ণয় করা সহজ, কিন্তু বিভিন্ন সামগ্রীর পৃথক পৃথক উৎপাদন খরচ নির্ধারণ করা সহজ নহে।

দুই প্রকার সংযুক্ত যোগান দ্রব্য

মূল্য নির্ধারণের সুবিধার জন্য সংযুক্ত যোগান দ্রব্য দুইভাগে বর্গীকরণ করা চলে। **প্রথমতঃ,** কতগুলি সংযুক্ত যোগান সামগ্রী আছে, যাহাদের আপেক্ষিক অনুপাতের (relative proportions) অদল বদল বা পরিবর্তন করা চলে। যেমন, পশম ও মাংস। ইচ্ছা করিলে মানুষ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে দো-আঁসলা জাতের এমন মেষ উৎপন্ন করিতে পারে, যাহাতে মাংসের আপেক্ষিক অনুপাত পশমের আপেক্ষিক অনুপাতের চাইতে বেশী হইতে পারে। কিংবা, পশমের আপেক্ষিক অনুপাত মাংসের আপেক্ষিক অনুপাতের চাইতে বেশী হইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ,** আর এক প্রকারের সংযুক্ত যোগান দ্রব্য আছে, যাহাদের আপেক্ষিক অনুপাত প্রকৃতি দ্বারা স্থিরীকৃত—মানুষ উহার অদলবদল করিতে পারে না। তুলা ও তুলা বীজ ; ধান ও খর প্রভৃতি এই শ্রেণীর সংযুক্ত যোগান মাল।

আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্তনশীল, সংযুক্ত যোগান দ্রব্যমূল্য নির্ণয়

প্রথম শ্রেণীর সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের প্রত্যেকটির প্রান্তিক উৎপাদন খরচ পৃথক পৃথকভাবে নির্ণয় করা যায়। বিভিন্ন রকমের দো-আঁসলা জাতের মেষ উৎপাদনদ্বারা মাংসের বা পশমের আপেক্ষিক অনুপাত পরিবর্তন করা সম্ভব হয় বলিয়া, পশম ও মাংসের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব। মনে করা যাক, বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রণালীদ্বারা **'ক'** ও **'খ'**, এই দুই জাতের মেষ উৎপন্ন করা হইয়াছে। **'ক'** জাতের মেষ হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক অনুপাতে মাংস পাওয়া যায় ; আর **'খ'** জাতের মেষ হইতে পশমের আপেক্ষিক অনুপাত হয় অধিক। এই উভয় জাতের এক একটি মেষ প্রতিপালন করিবার খরচ ধরা যাক্ ১০০৲ টাকা।

মনে কর :

'ক' জাতের একটি মেষ হইতে ১০ একক মাংস এবং ৮ একক পশম পাওয়া যায়, উহার প্রতিপালন খরচ—১০০৲।

সেইরূপ, '**খ**' জাতের একটা মেষ হইতে ৭ একক মাংস এবং ১০ একক পশম পাওয়া যায়—উহার প্রতিপালন খরচ—১০০৲।

যদি '**ক**' জাতের ৭টি মেষ প্রতিপালন করা যায়, তাহা হইলে উহাদের মাংসের আগম হইবে ৭০ একক এবং পশমের আগম হইবে ৫৬ একক—৭টি মেষের প্রতিপালন খরচ হইবে ৭০০৲টাকা।

আবার '**খ**' জাতের ১০টি মেষের প্রতিপালন খরচ হইবে ১০০০৲টাকা; উহাদের মাংসের আগম হইবে ৭০ একক এবং পশমের আগম হইবে ১০০ একক।

অতএব, এই দুই জাতের মেষ প্রতিপালন করিয়া অতিরিক্ত ৪৪ একক পশম আমরা অতিরিক্ত ৩০০৲টাকা খরচে পাই। সুতরাং পশমের প্রান্তিক খরচ হইবে $\frac{৩০০}{৪৪}$ টাকা অর্থাৎ ৬$\frac{৯}{১১}$ টাকা।

ঠিক একই রীতিতে মাংসের পৃথক প্রান্তিক খরচও নির্ণয় করা যায়। পশমের বাজার মূল্য উহার প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান। সেইরূপ মাংসের বাজার মূল্যও মাংসের প্রান্তিক খরচের সমান। নিম্নের চিত্রদ্বারা সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রের পণ্যমূল্য নির্ধারণ আরও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল।

'**খ**' দ্রব্যটির যোগান অপরিবর্তনীয় অনুমান করিয়া, '**ক**' দ্রব্যের প্রান্তিক খরচ রেখা **প খ১** অংকিত করা হইল। আবার '**ক**' দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় অনুমান করিয়া, '**খ**' দ্রব্যের প্রান্তিক খরচ রেখা **প খ২** আঁকা হইল। '**ক**' দ্রব্যের বাজার মূল্য **ক প১ খ১** ও যোগান পরিমাণ **ক ম খ১**। '**খ**' দ্রব্যের বাজার মূল্য **ক প২ খ২** ও যোগান পরিমাণ **ক ম১খ২**। যদি '**খ**' দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি
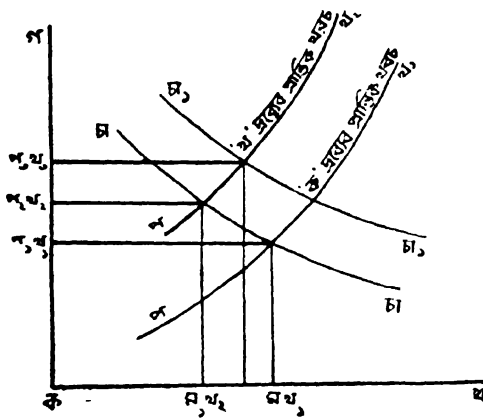
৪৩শ চিত্র

পায় তাহা হইলে '**ক**' দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি পাইবে, যতক্ষণ না উহার প্রান্তিক খরচ নূতন চাহিদা রেখা **চা১ চা১**কে স্পর্শ করে। '**খ**' দ্রব্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া **ক প৩ খ৩** হইবে, যখন '**ক**' দ্রব্যের যোগান অপরিবর্তনীয় থাকিবে।

কিন্তু সংযুক্ত যোগান সামগ্রী যদি দ্বিতীয় শ্রেণীর হয়—অর্থাৎ উহাদের আপেক্ষিক অনুপাত যদি পরিবর্তন করা না যায়, তাহা হইলে সামগ্রীর প্রান্তিক খরচ বিশ্লেষণ অচল হইবে। যেমন, তুলা ও তুলা বীজের আপেক্ষিক অনুপাত প্রকৃতি নির্দিষ্ট ও অপরিবর্তনীয়। উহাদের আপেক্ষিক অনুপাত অদল বদল করা সম্ভব নয় বলিয়া, উহাদের পৃথক পৃথক প্রান্তিক খরচ নির্ণয় করাও সম্ভব নয়। আমরা উহাদের সম্মিলিত উপাদান খরচই কেবল নির্ধারণ করিতে সক্ষম। এইরূপ সংযুক্ত যোগানক্ষেত্রে মূল্য নিরূপণ ব্যাপারে দুইটি সূত্র সাধারণতঃ কার্যকরী হয়। প্রথমতঃ, তুলা ও তুলাবীজ—এই দুইটি সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর সম্মিলিত উৎপাদন খরচ মোট বিক্রয় আয়দ্বারা (total sale proceeds) উসুল হওয়া চাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেকটি দ্রব্যের মূল্য নির্ধারিত হয়—খাদকের নিকট যথাক্রমে প্রত্যেকটি দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ কতটা তাহাদ্বারা। তুলার মূল্য পৃথকভাবে ধার্য হইবে, তুলার বাজার চাহিদা কি তাহাদ্বারা ; তুলা বীজের মূল্য নিরূপিত হইবে, বীজের কি বাজার চাহিদা, তাহাদ্বারা। মূল্য নির্ধারণের এই নিয়মকে "principle of what the traffic will bear" বলা হয়।

আপেক্ষিক অনুপাত অপরিবর্তনীয় হইলে, সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের মূল্য নির্ণয়

মনে রাখিতে হইবে যে, সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সামগ্রী উৎপাদনের একটি পৃথক প্রাথমিক খরচ (Prime Cost) আছে। প্রত্যেকটি দ্রব্যের বাজার মূল্য এমন ভাবে ধার্য হওয়া চাই যে, উহাদ্বারা ন্যূনপক্ষে দ্রব্যের এই প্রাথমিক খরচ উসুল হয়।

নিম্নের চিত্রদ্বারা এই সংযুক্ত যোগান দ্রব্যের মূল্য সাম্য নির্দেশ করা গেল।

যো যো সংযুক্ত যোগান দ্রব্য 'ক' ও 'খ'র যোগান রেখা সূচক। **চা** হইল 'ক' দ্রব্যের চাহিদা রেখা, **চা চা** 'ক' ও 'খ' দ্রব্যের মোট চাহিদা রেখা। যখন 'ক' ও 'খ' দ্রব্যের সম্মিলিত যোগান পরিমাণ **ক ম**, তখন ঐ দুইটি সামগ্রীর সম্মিলিত বাজার মূল্য **মখ**। **মপ১** 'ক' দ্রব্যের চাহিদা মূল্য ; **প১প২** 'খ' দ্রব্যের চাহিদা মূল্য। **মপ২**
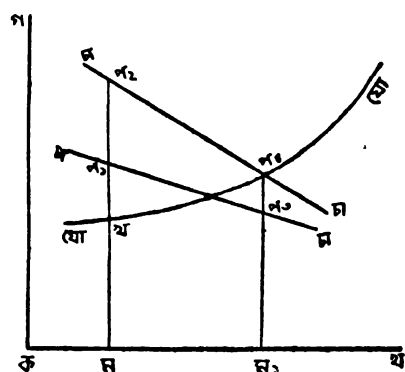
৪৪শ চিত্র

হইল **'ক'** ও **'খ'** সামগ্রীর সম্মিলিত চাহিদা মূল্য। মোট চাহিদা রেখা ও মোট যোগান রেখা পরস্পর **$প_৪$** বিন্দুতে ছেদ করে। **'ক'** ও **'খ'** দ্রব্যের সম্মিলিত সাম্য যোগান **$কম_১$** ; **$ম_১প_৩$** **'ক'** দ্রব্যের সাম্য মূল্য এবং **$প_৩প_৪$** **'খ'** সামগ্রীর সাম্যমূল্য।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় সংযুক্ত যোগান ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য নির্ধারণ কি প্রক্রিয়ায় হয়, উহার ব্যাপক অলোচনা আমরা এযাবং করিলাম। একচেটিয়া বাজারে কিংবা অপূর্ণাংগ বাজারে সংযুক্ত যোগান সামগ্রীর মূল্যসাম্য কি ভাবে ধার্য হয়, নিম্নের চিত্রদ্বারা তাহা নির্দেশ করা গেল।

যখন **'ক'** ও **'খ'** দ্রব্যের সম্মিলিত বাজার যোগান পরিমাণ **ক ম**, তখন **ম খ** হইল সম্মিলিত প্রান্তিক খরচ। **'ক'** দ্রব্যের প্রান্তিক আয় **$মপ_১$** এবং **'খ'**
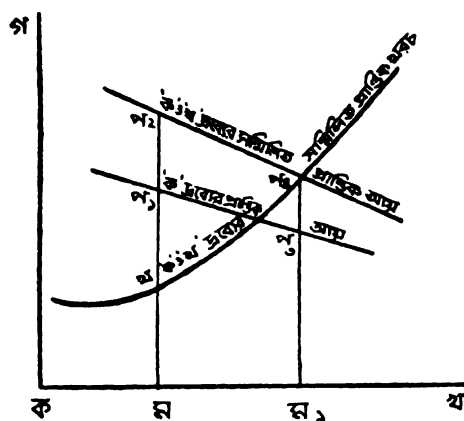
৪৫শ চিত্র

দ্রব্যের প্রান্তিক আয় **$প_১প_২$**। সম্মিলিত প্রান্তিক আয় রেখা ও সম্মিলিত প্রান্তিক খরচ রেখা **$প_৪$** বিন্দুতে পরস্পর ছেদ করে। **'ক'** ও **'খ'** দ্রব্যের সম্মিলিত সাম্য যোগান **$কম_১$**। **'ক'** দ্রব্যের সাম্যমূল্য **$ম_১প_৩$** এবং **'খ'** দ্রব্যের সাম্যমূল্য **$প_৩প_৪$**।

রেলওয়ে পরিবহন শিল্প কি সংযুক্ত যোগান? (Is Railway Transport Industry a case of Joint Supply ?) : রেলওয়ে পরিবহন শিল্প কি সংযুক্ত যোগানের উদাহরণ? রেলওয়ে পরিবহন যোগানে কি সংযুক্ত খরচের উপাদান বর্তমান? অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে এ বিষয়ে মতানৈক্য আছে।

বিখ্যাত মার্কিন অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক টসিগ্ (Taussig) নিম্নলিখিত ব্যাখ্যানদ্বারা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, রেলওয়ের সেবাকৃত্য সংযুক্ত

যোগানের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। **প্রথমতঃ,** রেল পরিবহন শিল্প একই অর্থ বিনিয়োগদ্বারা বিভিন্ন বাজারে কৃত্য যোগান দিয়া থাকে ; একই সংযুক্ত খরচে ইহা একাধারে যাত্রী পরিবহন কৃত্য সরবরাহ করে এবং মালও স্থানান্তরিত করে। যে বিভিন্ন বাজারে রেলওয়ে শিল্প কৃত্য সরবরাহ করে, সেগুলি সম্পূর্ণ পৃথক। **দ্বিতীয়তঃ,** এই পরিবহন শিল্প যে পৃথক পৃথক বাজারে কৃত্য সরবরাহ করে, উহার পৃথক পৃথক খরচ নির্ধারণ করাও অসম্ভব। যাত্রী পরিবহন কৃত্যের পৃথক খরচ কি, অথবা মাল স্থানান্তরিত করার পৃথক খরচই বা কি, উহা রেলের মোট সম্মিলিত খরচ হইতে নির্ণয় করা যায় না।

ইংরাজ অর্থবিদ্যাবিদ (Pigou) পিগুর অভিমত কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি মনে করেন যে, রেলওয়ে পরিবহন শিল্পের সংযুক্ত যোগান হিসাবে কোন বৈশিষ্ট্যই নাই। তাঁহার মতে, কোন শিল্প সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক বাজারে কৃত্য যোগান দিলেই যে উহা সংযুক্ত যোগান শিল্প বলিয়া অভিহিত হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। রেলওয়ে শিল্প কয়লা স্থানান্তরিত করে, আবার লৌহও স্থানান্তরিত করে। কয়লা ব্যবসায়ী ও লৌহ ব্যবসায়ীকে একাধারে সেবাকৃত্য যোগান দেয় বলিয়াই রেলওয়ে পরিবহন শিল্প সংযুক্ত উৎপত্তি নয়। কোন শিল্প সংযুক্ত যোগানের উদাহরণ হইবে তখন, কিংবা কোন শিল্পে সংযুক্ত খরচ নির্দেশ করা যায় তখন, যখন কোন দ্রব্য বা কৃত্য উৎপাদনের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিলে, সংগে সংগে আর একটি বা ততোধিক দ্রব্য বা কৃত্য ঐ একই বিনিয়োগের ফলে অনিবার্যভাবে উৎপন্ন হয়। যেমন, তুলা উৎপাদনের জন্য কোন অর্থ বিনিয়োগ করিলে, উহাদ্বারাই তুলাবীজ উৎপন্ন হয়। তুলাবীজ উৎপাদন করিবার জন্য আর নূতন অর্থ বিনিয়োগের প্রযোজন হয় না। কিন্তু রেলওয়ে পরিবহন শিল্পের বেলায় সংযুক্ত খরচের এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। যে অর্থ বিনিয়োগদ্বারা যাত্রীবাহী রেলওয়ে পরিবহন শিল্প চালু হয়, ঐ একই পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগদ্বারা সংযুক্ত ভাবে মালবাহী পরিবহন কৃত্য সরবরাহ করা রেলওয়ের পক্ষে সম্ভব হয় না। একখানা যাত্রীবাহী রেলওয়ে ট্রেনকে যদি সংগে সংগে মালও টানিতে হয়, তাহা হইলে উহার মূল অর্থ বিনিয়োগ বৃদ্ধি অবশ্য করিতে হইবে।

অধ্যাপক পিগু অবশ্য এক বিশেষ ক্ষেত্রে রেলওযে পরিবহন শিল্পেও সংযুক্ত খরচের উপাদান লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি দুইটি ষ্টেশন 'ক' ও 'খ'এর মধ্যে যাত্রীবাহী রেলগাড়ী যাতায়াত করে এবং একই সংযুক্ত অর্থ বিনিয়োগদ্বারা ট্রেন একবার 'ক' হইতে 'খ'তে চলে, আবার 'খ' হইতে 'ক'তে প্রত্যাবর্তন

করে, তাহা হইলে ঐ রেলওয়ে পরিবহন সংযুক্ত যোগান শিল্প হইবে। কেননা, এক্ষেত্রে একই অর্থ বিনিয়োগদ্বারা ট্রেনের পক্ষে একবার গমন আবার প্রত্যাবর্তন —এই দুই কৃত্য সরবরাহ করা সম্ভব হয়।

রেলের ভাড়া মাশুল নির্ধারণ (Determination of Railway Rates) : রেলের ভাড়ামাশুল নির্ধারণে সংযুক্ত খরচ ধারণাটির প্রয়োগ দেখা যায়। রেলওয়ে পরিবহন শিল্প যে বিভিন্ন কৃত্য যোগান দেয়, উহার পৃথক পৃথক খরচ নির্ণয় করা সম্ভব নয়।

রেল পরিবহন শিল্পকে ভাড়ামাশুল ধার্য করিবার কালে দেখিতে হয় যে, উহার মোট সংযুক্ত খরচ মোট আয়দ্বারা উসুল হয় কিনা। যেহেতু রেলওয়ে পরিবহন শিল্প সংযুক্ত যোগানের উদাহরণ বিশেষ, সেইহেতু উহা যে বিভিন্ন ভাড়ামাশুল নির্ধারণ করে, তাহা প্রতিযোগিতামূলক কৃত্য খরচ তত্ত্বদ্বারা (cost of service principle) স্থির হয় না। প্রতিযোগিতা মূলক তত্ত্বদ্বারা ভাড়ামাশুল স্থির করিলে, মাশুলের হার বিভিন্ন বাজারে কৃত্য যোগানের বেলায় সমান হইবে। এই তত্ত্ব অনুসারে একমণ কয়লার উপরে মাশুলের যে হার হইবে, এক মণ লৌহেরও একই হারে মাশুল দিতে হইবে। কিন্তু বাস্তব-ক্ষেত্রে এই মাশুল নীতি ন্যায় সংগত নহে। কেননা, সকল সামগ্রীর মাশুল বহিবার শক্তি সমান নয়। যে সকল সামগ্রী আয়তনে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ, অথচ মূল্যের দিক হইতে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট—উহাদের মাশুল বহিবার ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত কম। সেইজন্য একমণ কয়লার একমণ লৌহের চেয়ে মাশুল বহিবার ক্ষমতা কম। বাস্তবক্ষেত্রে, সেই জন্য রেলওয়ের ভাড়ামাশুল একচেটিয়া কৃত্য মূল্য-নীতি দ্বারা (value of service principle) স্থির হয়।

এই নীতির অর্থ এই যে, বিভিন্ন সামগ্রীর পরিবহন, চাহিদা নম্যতানুসারে পর্যায়িত করিয়া (graded), উহাদের উপর পৃথক পৃথক ভাড়ামাশুল ধার্য করা হয়। পরিবহন ভোগকারীর ক্ষমতার তারতম্যানুসারে রেলওয়ে মাশুল স্থির হয়। রেলওয়ের মাশুল নির্ধারণের এই কৃত্যমূল্য নীতিকে (value of service principle) ইংরেজীতে 'principle of charging what the traffic will bear" বলা হয়।

সম্মিলিত চাহিদা (Composite Demand) : কোন দ্রব্যের বা কৃত্যের সম্মিলিত চাহিদা হয় তখন, যখন একটিমাত্র দ্রব্য বা কৃত্য একাধিক অভাব পূরণে ব্যবহৃত হয়, কিংবা একাধিক পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত হয়। যেমন, বিদ্যুৎ

যাহা একাধারে আলো, উত্তাপ, কিংবা শিল্পচলৎশক্তি সৃষ্টি হইতে পারে, অথবা শ্রম দেশের বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ হইতে পারে। বিদ্যুৎ ও শ্রমের চাহিদা সম্মিলিত। সম্মিলিত চাহিদা ক্ষেত্রে কোন একটি অভাব পূরণের জন্য যখন একটি দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তখন ঐ দ্রব্যের বাজার মূল্য অন্যান্য যে কোন ব্যবহার ক্ষেত্রেই (in all uses) বৃদ্ধি পাইবে। মনে রাখিতে হইবে, যে সকল দ্রব্যের চাহিদা সম্মিলিত, উহারা বিভিন্ন বাজারমূল্যে মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক (competitive) চাহিদা মেটায়। ঐ বিভিন্ন বাজারমূল্য আবার পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

সম্মিলিত যোগান (Composite Supply) : যখন বিভিন্ন সামগ্রী মানুষের একই অভাব পূরণ করিয়া থাকে, তখন উহাদের যোগান সম্মিলিত হয়। যেমন, আলো তৈল হইতে, কিংবা গ্যাস হইতে, কিংবা বিদ্যুৎশক্তি হইতে পাওয়া যায়। তৈল, গ্যাস ও বিদ্যুৎ শক্তির যোগান সম্মিলিত। যে সকল সামগ্রীর সম্মিলিত যোগান, উহারা একে অন্যের পরিবর্তক (substitutes)। যেমন, চা ও কফি, কিংবা মোটর বাস ও ট্রাম গাড়ী। উহাদের বাজার মূল্যের গতি একই দিকে। যদি মোটর বাসের ভাড়ামাশুল হ্রাস পায়, তাহা হইলে লোকে ট্রাম গাড়ীতে যাতায়াত কম করিবে, ফলে ট্রামের ভাড়া হ্রাস পাইবে। অতএব লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে সকল দ্রব্যের যোগান সম্মিলিত, অর্থাৎ যে সকল দ্রব্য একে অন্যের পবিবর্তক, উহাদের বাজার দরও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

অনুশীলনী

1. State briefly :
   (a) The relation between the prices of competing goods.
   (b) The relation between the prices of complementary goods.
   (c) The relation between the prices of joint cost goods.
   (C.U. B.A. '52)
2. Discuss the principles which determine the values of commodities which are (a) jointly demanded and (b) jointly supplied. (C.U. B. Com. '54)
3. Discuss, the principles which govern the values of joint products. (C.U. Hons. '53 & C. U. B. Com. '56)

4. Show how the price of railway services are fixed for transport. How do the principles conform to the theory of value ? (C. U. B. A. '53.)
5. Discuss the applicability of the principle of joint cost to the case of railway rates. (C. U. B. A. Hons. '52.)

ঊনবিংশ অধ্যায়

মূল্যতত্ত্বের অন্যান্য সমস্যা (Other Problems of Pricing)

মূল্যের ক্রিয়া (Functions of Prices) : আমরা দেখিয়াছি যে, মূল্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দ্রব্যের চাহিদা ও যোগান সাম্য স্থাপিত হয়। পণ্যমূল্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের গতি নিয়মিত করে। মূল্যের ঊর্ধ্বগতি দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস করে, এবং বিক্রেতার যোগান বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত করে। আবার, মূল্যের নিম্নগতি পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি করে এবং বিক্রেতার যোগান হ্রাস করে। উঠা নামার ভিতর দিয়া মূল্য এমন এক অবস্থাতে আসে যেখানে পণ্যের চাহিদা ও যোগান সমান হয়। এই অবস্থাকে মূল্যের ভার-সাম্য বা মূল্য-সাম্য (price equilibrium) বলা হয়।

মূল্যের ক্রিয়া বহুবিধ। **প্রথমতঃ,** মূল্য দ্রব্যের চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করিয়া উহাদের সমতা সৃষ্টি করে। **দ্বিতীয়তঃ,** কোন দ্রব্যের চাহিদার তীব্রতা মূল্যের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। মূল্যই ভোগকারীর পছন্দক্রম নির্দেশক। পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ভোগকারীর পছন্দক্রম সংকোচন করিয়া পণ্য চাহিদা হ্রাস করে। আবার মূল্যের নিম্নগতি খাদকের পছন্দক্রম বিস্তৃত করিয়া পণ্য চাহিদা বৃদ্ধি করে। **তৃতীয়তঃ,** ভোগকারীর ব্যবহার্য দ্রব্যের উৎপাদন খরচ ও বাজার মূল্যই নির্দেশ করিয়া থাকে। বাজার মূল্যের যদি ঊর্ধ্বগতি হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত উৎপাদন খরচ দিয়াও পণ্য যোগান দিতে কোন প্রতিষ্ঠান নিরুৎসাহ হয় না। **চতুর্থতঃ,** মূল্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উৎপাদক কারকের অর্থআয় নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন কারক উৎপাদনে যে কৃত্য সরবরাহ করিয়া থাকে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ অর্থ আয় পাইয়া থাকে। অর্থ আয়ই উহাদের কৃত্য-মূল্য (pricing of services)।

পরিশেষে, বিনিয়োগ ও ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পদ বা উৎপাদক কারকগুলির কি ভাবে বণ্টন ও সামঞ্জস্য বিধান (allocation) হয়, তাহা মূল্য প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রত্যেক দ্রব্য বা উৎপাদক কারকের বিকল্প চাহিদা আছে। প্রত্যেক দ্রব্য বা কারক বিকল্প বিনিয়োগ বা ব্যবহারে কার্যকরী হইতে পারে। দ্রব্য বা কারকের সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বা ব্যবহার মূল্যক্রিয়ার মাধ্যমেই ধার্য হয়। কোন দ্রব্য বা কারকের বিনিয়োগ কিংবা ব্যবহার সর্বোৎকৃষ্ট হইবে তখনই, যখন ঐ দ্রব্য বা কারকের উপযোগ ঐ দ্রব্য বা কারকের বাজার মূল্যের সমান হইবে।

কিন্তু মূল্যের উপরি উক্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্রিয়াগুলি থাকা সত্ত্বেও, মূল্য প্রক্রিয়া যথাযথ নির্ভুল নয়। যেমন, ভোগকারীর চাহিদার তীব্রতাই নিছক কোন দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি করে না। দ্রব্য নিছক পছন্দসই হওয়াতেই যে খাদক অধিক মূল্যে উহা খরিদ করে তাহা নহে। অনেক সময় বাজার সম্পর্কে তাহার অজ্ঞতার দরুণ, কিংবা জোর প্রচার কার্য বা বিজ্ঞপ্তির দরুণ অধিক মূল্যে সে পণ্য ক্রয় করিতে আকৃষ্ট হয়। আবার, পণ্য মূল্যের যোগান দর বৃদ্ধি শুধু উৎপাদন খরচ বৃদ্ধির পরিণাম স্বরূপ নয়। যেমন, একচেটিয়া বাজারে কিংবা অপূর্ণাংগ বাজারে পণ্য যোগান মূল্যের বৃদ্ধি হয় মূলতঃ লাভোদ্দেশক অভিসন্ধি (profit motive) হইতে। পরিশেষে, দ্রব্যের বা কৃত্যের সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ বা ব্যবহারও শুধু দ্রব্যমূল্য বা কৃত্যমূল্যের মাধ্যমে ধার্য হয় না। ভোগকারী বা উৎপাদনকারী যে দ্রব্যমূল্য বা কৃত্য মূল্য দিতে রাজী, তাহা সকল সময় ঐ দ্রব্য বা কৃত্য উপযোগের সঠিক পরিমাপ নহে। অনেক খাদক দ্রব্যের উপযোগের তুলনায় অধিক অর্থ ব্যয় করিয়া পণ্য ক্রয় করিতে পারে। আবার অনেক উৎপাদক বাজার দরের চেয়ে কম অর্থ মূল্যে কৃত্য বিনিয়োগ করিতে পারে। ফলে, মূল্যপ্রক্রিয়াদ্বারা বিভিন্ন ভোগকারী বা উৎপাদনকারীর মধ্যে সম্পদ বৈষম্য ঘটে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ তত্ত্ব (Theory of Price Control) : যখন কোন আবশ্যকীয় পণ্যের যোগান টান পড়ে, তখন উহার বাজার দর উর্ধ্বগামী হয়। উচ্চ বাজার দরের সুবিধা লইয়া ঐ পণ্যের উৎপাদক, বিক্রেতা ও আড়তদার প্রভৃতি মোটা মুনাফা শিকার করিয়া থাকে। ফলে, সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর- বিশেষ করিয়া খাদক শ্রেণীর, কষ্টের চূড়ান্ত হয়। পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি হেতু, গরীব নিম্ন-আয় শ্রেণী অনেক সময় তাহাদের খাদন পরিমাণ সংকোচন করিতে বাধ্য হয়। পণ্য

যদি খাদ্যবস্তু বা অন্য কোন নিত্যব্যবহার্য দ্রব্য হয়, তাহা হইলে উহার উচ্চ বাজার মূল্য ভোগকারীর জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া থাকে। জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি হইলে ভোগকারী, বিশেষ করিয়া শ্রমিক শ্রেণী, বাধ্য হইয়া উচ্চতর মজুরীর জন্য দাবী পেশ করে; ফলে, শ্রমিক বিক্ষোভ, মালিক শ্রমিকের মনোমালিন্য প্রভৃতি সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি পর্যন্ত হইতে পারে। আবার, পণ্য যদি উৎপাদক সামগ্রী হয় (producer's goods), তাহা হইলে উহার বাজার দর বৃদ্ধি দেশের গোটা উৎপাদন ব্যহত ও সংকুচিত করিয়া থাকে। পণ্যমূল্য বৃদ্ধির এই সকল অশুভ পরিণাম বা ফলাফল যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্যই রাষ্ট্র চরম ব্যবস্থা মূল্য নিয়ন্ত্রন প্রবর্তন করিয়া থাকে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজন

খাদ্যবস্তু কিংবা নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আবশ্যকতা থাকিলেও, এই ব্যবস্থার অনেক গলদ ও অসুবিধা আছে। **প্রথমতঃ,** রাষ্ট্রের প্রধান অসুবিধা ভোগ করিতে হয় দ্রব্যের চরম মূল্য নির্ধারণ (fixation of the maximum or ceiling price) সম্পর্কে। যে সকল পণ্য দেশে উৎপন্ন হয়, উহাদের চরম মূল্য সাধারণতঃ ধার্য করা হয় উহাদের উৎপাদন খরচ ও সম্ভাব্য স্বাভাবিক মুনাফার যোগফল সমষ্টির ভিত্তিতে। কিন্তু অসুবিধা এই যে, উৎপাদন খরচ সঠিক নির্ণয় করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া পড়ে। উৎপাদন খরচ স্বভাবতঃই পরিবর্তনশীল। উৎপাদক কারকের বাজার মূল্যের উঠানামার সংগে সংগে, উৎপাদন খরচের হ্রাসবৃদ্ধি অনিবার্য হইয়া পড়ে। আবার উৎপাদন খরচের পরিবর্তনের সংগে সংগে চরম নিয়ন্ত্রণ মূল্য অদল বদল করিতে হয়। যে সকল দ্রব্য বিদেশ হইতে আমদানী করা হয়, উহাদের নিয়ন্ত্রণ মূল্য ধার্য করা হয়, উহাদের দেশে পৌছা পর্যন্ত মোট খরচ (landed cost) ধরিয়া ; অর্থাৎ, পরিবহন খরচ ও সম্ভাব্য স্বাভাবিক মুনাফার যোগফল সমষ্টির ভিত্তিতে।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গলদ ও অসুবিধা

দ্বিতীয়তঃ, মূল্য নিয়ন্ত্রণের আর একটি অসুবিধা, নির্ধারিত চরম মূল্য ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করা। এই ব্যবস্থা প্রবর্তনে অনেক সময় কালো বাজারের (black-market) সৃষ্টি হয় এবং ফলে, মূল্য নিয়ন্ত্রিত দ্রব্য হয়ত বাজার হইতে একেবারে উড়িয়া যায়, কিংবা উহার যোগান অস্বাভাবিকভাবে সীমিত ও টান হয়। রাষ্ট্রের কার্যকরী ব্যবস্থাও শাসনযন্ত্র যদি সৎ, সুদক্ষ ও কর্মকুশল না হয়, তাহা হইলে মূল্য নিয়ন্ত্রণের সকল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।

পরিণামও হয় অত্যন্ত শোচনীয়। গ্রেট বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, সরকারী মূল্য নিয়ন্ত্রণবিধি এবং কার্যকরী শাসনযন্ত্র শক্তিশালী ও প্রগুণ হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে কালো বাজারে চোরা কারবার অবাধে চলিয়াছিল। আবার, যেখানে কালো বাজারের সমস্যা নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ব্যহত করে নাই, সেখানে সমস্যা উঠিয়াছে খাদক শ্রেণীর মধ্যে নিয়ন্ত্রিত পণ্যের বণ্টন বৈষম্য লইয়া। প্রয়োজন যাহাদের বেশী তাহাদের ভাগ্যে উপযুক্ত দ্রব্য যোগান জোটে নাই। দ্রব্যের যোগান সাধারণতঃ তাহারাই পাইয়াছে যথাযথ, কিংবা প্রয়োজনেরও অধিক, যাহাদের রাষ্ট্রের দরবারে সহি সুপারিশ ছিল, কিংবা আমানতকারী বা আড়তদারদের সংগে দহরম মহরম ছিল, কিংবা কালো কারবার ছিল।

মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার গলদ দূর করিয়া সুষ্ঠুভাবে উহাকে কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে, সরকার অনেক সময় উহার অনুসিদ্ধান্ত (corollary) হিসাবে বরাদ্দ প্রথার (ration system) প্রবর্তন করিয়া থাকে। এই প্রথাদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তির খাদন পরিমাণ সরকার আইনদ্বারা স্থির করিয়া দেয়। সাধারণতঃ, মাথা প্রতি খাদন পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় দেশের মোট দ্রব্যের যোগান পরিমাণকে খরিদ্দার সংখ্যাদ্বারা ভাগ করিয়া। বরাদ্দ প্রথাদ্বারা বিভিন্ন খাদকের মধ্যে ন্যায্য দ্রব্য বণ্টন সম্ভব হয় এবং রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত মূল্য স্তরও কায়েমী রাখা সম্ভব হয়। তবে এ ক্ষেত্রেও বিভিন্ন খাদকের দ্রব্য বরাদ্দ ন্যায়তঃ ধার্য করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র সৎ ও সুদক্ষ না হইলে বরাদ্দ প্রথারও ভয়াবহ ফলাফল দেখা যায়।

অনুশীলনী

1. Explain the economics of price control.
2. Under what conditions would you justify price control? What are the difficulties of price fixation by the Government?
3. Economics is very largely a study of how prices are formed and of the functions which they fulfil"—Discuss.

বিংশ অধ্যায়

মূল্য নির্ধারণের কতিপয় প্রাচীন মতবাদ

(Some Older Theories of Pricing)

আমরা মূল্যনির্ধারণের আধুনিক চলতি মতবাদ বিশ্লেষণ করিয়াছি। এই অধ্যায়ে আমরা মূল্য নিরূপণের কতিপয় প্রাচীন মতবাদের আলোচনা করিব। এই সকল মতবাদের বহু গলদ আছে: কোনটাই মূল্য নিরূপণের ব্যাপক বা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান নয়; কিন্তু তাহা সত্বেও অর্থবিদ্যার পঠন পাঠনে উহাদের গুরুত্ব ও উপকারিতা অস্বীকার করা যায় না।

শ্রমতত্ত্বদ্বারা মূল্যের ব্যাখ্যান (Labour Theory of Value): শ্রমতত্ত্বই মূল্যের প্রাচীনতম ব্যাখ্যান। আডম্ স্মিত্, রিকার্ডো, কার্ল মার্ক্স প্রমুখ পণ্ডিতগণ এই তত্ত্বের পৃষ্ঠ-পোষক। তাঁহাদের মতে দ্রব্য মূল্যের একমাত্র উৎসই হইল শ্রম। কোন দ্রব্য উৎপাদনে যে পরিমাণ শ্রম প্রয়োজন হয়, বা প্রকৃত ব্যয়িত হয়—উহাই পণ্যমূল্য নির্ধারণ করে। বিভিন্ন দ্রব্য মূল্যের যে পার্থক্য দেখা যায় তাহারও কারণ এই যে, বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে বিভিন্ন পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করা হইয়া থাকে। আধুনিক সাম্যতন্ত্রের জনক কার্ল মার্ক্স শ্রমতত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যানের উপর ভিত্তি করিয়াই, ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থা ও উহার আয় বণ্টনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন।

কার্ল মার্ক্সের শ্রমতত্ত্বের মূল সূত্র এই যে, যে পরিমাণ শ্রম দ্রব্য উৎপাদনে ব্যয়িত হয়—তাহাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে। "The value of a commodity is determined by the quantity of labour expended during its production." কার্ল মার্ক্সের এই শ্রমতত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত (corollary) এই যে, যদি শ্রমই মূল্যের উৎস হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের গোটা মূল্যই মজুরী হিসাবে শ্রমিকের প্রাপ্য। কিন্তু ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকের মজুরী বাস্তবতঃ দ্রব্য মূল্যের চাইতে সর্বদাই কম। প্রকৃত পণ্যমূল্য ও শ্রমিকের মজুরীর মধ্যে যে অর্থ ব্যবধানের পরিমাণ এই ব্যবস্থায় দৃষ্ট হয়, উহা হইতে শ্রমিক শ্রেণী একেবারে বঞ্চিত। উহা ধনিক শ্রেণী জোরজবরদস্তি করিয়া খাজনা, সুদ, মুনাফা প্রভৃতি রূপে উপভোগ করে। এই ভাবে শ্রমিক শ্রেণীর ন্যায্য পাওনা কাড়িয়া লওয়া ধনিকশ্রেণীর পক্ষে চৌর্যকার্যের সামিল।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ শ্রমতত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিকূল সমালোচনা করিয়াছেন। **প্রথমতঃ,** শ্রম কথাটির আসল স্বরূপ নির্ধারণ

করাই অসম্ভব। শ্রম রকমারি হইতে পারে। উহার পর্যায় বা ক্রমও (grade) বহু। শ্রমের পরিমাণ আবার প্রগুণতা (efficiency) বা কাজের গুরুত্বের উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন প্রগুণতা সম্পন্ন বা পর্যায়ের শ্রম পরিমাপ করিবার সাধারণ কোন মাপকাঠি না থাকায়, কোন্ দ্রব্য উৎপাদনে কতটা পরিমাণ শ্রম আবশ্যক, তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় না। তাহা ছাড়া, একটি দ্রব্য উৎপাদনে কতটা পরিমাণ শ্রমের আবশ্যক, তাহা দ্রব্যের চাহিদার উপরেও বিশেষভাবে নির্ভর করে।

এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা

দ্বিতীয়তঃ, যদি শ্রমকেই দ্রব্য মূল্যের একমাত্র উৎসস্বরূপ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে দ্রব্যের মূল্য সব সময়ই সংগতি রাখিয়া চলিবে, কতটা পরিমাণ শ্রম উহা উৎপাদনে নিয়োজিত হইয়াছে তাহার সংগে। কিন্তু, বাস্তবতঃ দেখা যায় যে, দ্রব্য উৎপাদনে শ্রম বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি না করিলেও, পণ্য মূল্য উঠানামা করে।

তৃতীয়তঃ, শ্রমতত্ত্বদ্বারা ব্যাখ্যান করা যায় না, কেন বাজারে দুইটি সামগ্রীর বিভিন্ন দর, যদিও উহারা সম পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগদ্বারাই উৎপন্ন।

চতুর্থতঃ, এই মতবাদের অসারত্ব আরও বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হয় তখন, যখন শ্রমের ভুল বিনিযোগের ফলে এমন একটি সামগ্রী উৎপন্ন হয়, যাহার কোন বাজার দরই পাওয়া যায় না। যেমন, একজন মুচি তাহার শ্রমদ্বারা একজোড়া জুতা তৈয়ারী করিল; কিন্তু, বাজারে যদি সেই জুতা কোন খরিদ্দারের পায়ের মাপ মত ঠিক না হয়, তাহা হইলে উহার কোনই বাজার দর থাকিবে না। জুতার বাজার দরের সহিত শ্রমের বিনিয়োগ পরিমাণের কোনই সংগতি এখানে বজায় থাকে না।

পঞ্চমতঃ, যে সকল দ্রব্যের পুনরুৎপাদন হয় না (non-reproducible goods), উহাদের বাজার মূল্য নির্ধারণেও শ্রমতত্ত্ব অপ্রযোজ্য। এই সকল দ্রব্য উৎপাদনের বেলায় মূলতঃ যে শ্রম বিনিয়োগ করা হয়, উহা স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় থাকে; কিন্তু এই সকল দ্রব্যের বাজার দর চাহিদার পরিবর্তনের সংগে সংগে বিশেষ ভাবে উঠানামা করে।

পরিশেষে, বলা যায় যে, এই মতবাদ মূল্য নির্ণয়ের সম্পূর্ণ ব্যখ্যান নয়— আংশিক বিশ্লেষণ মাত্র। দ্রব্যের যোগান ও বাজার মূল্য শুধু শ্রমের পরিমাণ ও শ্রম-ব্যয়ের উপর নির্ভর করে না। উৎপাদকের পুঁজি সঞ্চয়, ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বহন এবং দ্রব্য যোগানও বাজার মূল্যকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে।

কিন্তু এই সকল বিরুদ্ধ সমালোচনা সত্ত্বেও শ্রমতত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যান একেবারে উপযোগহীন নয়। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় শ্রমিকশ্রেণী তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য মজুরী হইতে যে বঞ্চিত, সেই নগ্ন সত্যটি এই মতবাদ বিশেষ করিয়া আমাদের চোখের সামনে তুলিয়া ধরে।

উৎপাদন খরচ তত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যান (Cost of Production Theory of Value): শ্রমতত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যান সেই সময়ে স্বীকৃতি পাইয়াছিল, যখন শ্রমই উৎপাদনের প্রধান কারক বলিয়া পরিগণিত হইত। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের সংগে সংগে যখন যন্ত্রপাতি ও কলকব্জার ব্যবহার বহুল প্রচলন হইল এবং উৎপাদন পদ্ধতি জটিলতর হইতে লাগিল, তখন উৎপাদনে শ্রমিকের প্রাধান্য ধীরে ধীরে হ্রাস পাইয়া পুঁজিপতি ও সংগঠন কর্তার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে, শ্রম দ্রব্য উৎপাদনের একমাত্র কারক না হইয়া, অন্যতম কারক হিসাবে গৃহীত হইল। উৎপাদনের এই জটিল অবস্থায় শ্রমতত্ত্বের পরিবর্তে উৎপাদন খরচতত্ত্ব মূল্য বিশ্লেষণের জনপ্রিয় ব্যাখ্যান বলিয়া স্বীকৃতি পাইতে থাকে।

মিল্ (Mill) খরচ তত্ত্ব ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন দ্রব্যের মূল্য উহার উৎপাদন খরচদ্বারা নির্ধারিত হয়। এই উৎপাদন খরচ বলিতে শ্রমের প্রাপ্য অর্থআয় একমাত্র মজুরী বুঝায় না। কাঁচা মাল ক্রয় খরচ, চল্তি মূলধনের বিনিয়োগ বাবদ সুদ, স্থায়ী মূলধনের অপচয় খরচ (depreciation charges of capital goods), সংগঠনকর্তার স্বাভাবিক মুনাফা প্রভৃতিও উৎপাদন খরচ ভুক্তি করা হয়। মিল্ বলেন যে, প্রকৃত বাজার মূল্য উৎপাদন খরচকে কেন্দ্র করিয়া উঠা নামা করে; কিন্তু দীর্ঘকালীন বাজার মূল্য ও উৎপাদন খরচ সমান হইবেই। যদি কখন বাজার মূল্য উৎপাদন খরচের চেয়ে অধিকও হয়, তাহা হইলেও ঐ অবস্থা বেশী সময় তিষ্ঠিতে পারে না। কেননা, বাজারদর বাড়তির সংগে সংগে দ্রব্য যোগান বৃদ্ধি পাইবে; এবং দ্রব্য যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে বাজার দর হ্রাস পাইয়া উৎপাদন খরচের সংগে সমতা রক্ষা করিবে। অপরপক্ষে, বাজার মূল্য যদি কখনও উৎপাদন খরচের চাইতে কম হয়, তাহা হইলে পণ্য যোগান হ্রাস পাইবে। পণ্য যোগান হ্রাসের সংগে সংগে বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদন খরচের সমান হইবে।

উৎপাদন খরচ তত্ত্বের বিরুদ্ধে বহু প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। এই মতবাদের প্রথম ও প্রধান গলদ এই যে, ইহা মূল্য নির্ণয়ের ব্যাপক ও সম্পূর্ণ

তত্ত্ব নহে। মূল্য নির্ধারণে উৎপাদন খরচের প্রভাব অবশ্য অনস্বীকার্য কিন্তু উৎপাদন খরচই মূল্যের একমাত্র নির্ধারক নহে। মূল্য নির্ধারণে দ্রব্যের চাহিদারও যে বিশেষ প্রভাব ও গুরুত্ব আছে, তাহা এই তত্ত্বে সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হইয়াছে। একটি দ্রব্য উৎপাদনে প্রচুর খরচ হইলেই যে ঐ দ্রব্যের মূল্য সুউচ্চ হইবে তাহা সকল অবস্থাতে সত্য নহে। ভোক্তা বা খরিদ্দারের কাছে ঐ দ্রব্য যদি সম্পূর্ণ উপযোগহীন হয়, তাহা হইলে উহার কোনই বাজার দর থাকিবে না। তাহা ছাড়া, খরচ উৎপাদন পরিমাণের উপরও নির্ভর করে। উৎপাদন পরিমাণ আবার নির্ধারিত হয় চাহিদাদ্বারা। সুতরাং উৎপাদন খরচ পণ্য চাহিদার উপরও নির্ভর করে। **দ্বিতীয়তঃ,** অনেক সময় দেখা যায় যে, পণ্য উৎপাদন খরচ অপরিবর্তনীয় ও স্থায়ী থাকা সত্ত্বেও বাজার দর উঠানামা করে। ইহাও প্রমাণ করে যে, উৎপাদন খরচই বাজার মূল্যের একমাত্র নির্ধারক নহে। **তৃতীয়তঃ,** খরচ তত্ত্বের গলদ ও অসম্পূর্ণতা বিশেষভাবে দেখা যায় সেই সকল দ্রব্যের বেলায়, যাহাদের পুনরুৎপাদন সম্ভব নয় (non-reproducible), কিংবা যাহাদের যোগান সংযুক্ত (joint supply)। যে সকল দ্রব্যের পুনরুৎপাদন সম্ভব নয়, (যেমন, সুন্দর চিত্রালেখ্য) উহাদের বাজার মূল্য নির্ধারিত হয় বিশেষভাবে ক্রেতার পছন্দক্রমের দ্বারা। যে সকল দ্রব্যের যোগান সংযুক্ত, উহাদের পৃথক পৃথক উৎপাদন খরচ নির্ণয় করা অসম্ভব। উহাদের মূল্য নির্ধারণেও চাহিদার প্রভাব সুস্পষ্ট। **চতুর্থতঃ,** অল্পকালীন (short period) বাজারে, কিংবা একচেটিয়া ব্যবস্থায়, কিংবা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মূল্য নির্ধারণের বেলায়ও খরচতত্ত্ব পণ্যমূল্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান দিতে পারে না। কেননা, এই রকম যে কোন অবস্থায় বাজারদর হয় উৎপাদন খরচের চাইতে অধিক, কিংবা কম। **পরিশেষে,** বলা যায় যে, উৎপাদন খরচই কেবলমাত্র মূল্যের নির্ধারক নহে; বাজার মূল্যও পণ্য যোগান এবং উৎপাদন খরচকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। বাজার মূল্যও উৎপাদন খরচ পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত—একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে।

উৎপাদন খরচ তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা

উপযোগ তত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যান (Utility Theory of Value): এই তত্ত্বের সারমর্ম এই যে, বাজার মূল্য দ্রব্যের উপযোগদ্বারা নির্ধারিত হয়। এই তত্ত্ব অনুসারে, যে দ্রব্যের উপযোগ অধিক, উহার বাজারদরও চড়া, আবার যে দ্রব্যের উপযোগ কম, উহার বাজারদর মন্দা হইবে। জেভন্‌স্ (Jevons),

মেন্জার (Menger) প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ উপযোগ তত্ত্বের খানিকটা পরিমার্জন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, মূল্য নির্ধারিত হয় দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ (marginal utility) দ্বারা। ভোগকারী কোন দ্রব্যের শেষ একক খরিদ করিয়া যে উপযোগ লাভ করে, উহাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ।

কিন্তু উপযোগ তত্ত্বদ্বারা মূল্য ব্যাখ্যানেরও বহু অসংগতি ও গলদ আছে। বাজার মূল্যের উপর দ্রব্য উপযোগের প্রভাব আছে সত্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া বাজার মূল্য একক দ্রব্য উপযোগদ্বারা নির্ধারিত হয় না। উপযোগ যদি একমাত্র মূল্য নির্ধারক হইত, তাহা হইলে আবহাওয়ার যে বাতাস, উহার মূল্য হইত খুবই বেশী। কিন্তু আবহাওয়ার বাতাসের কোন বাজার মূল্যই নাই। বাজার মূল্য শুধু দ্রব্যের উপযোগ থাকিলেই পাওয়া যায় না, সংগে সংগে উহার যোগান সীমিত থাকাও দরকার। এই তত্ত্বের বড় গলদ এই যে, মূল্য নির্ধারণে ইহা শুধু দ্রব্য উপযোগ বা চাহিদার উপরই গুরুত্ব দেয়—মূল্যের উপর যোগানের যে প্রভাব আছে, তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে। মূল্য একদিকে দ্রব্য উপযোগ, আর একদিকে দ্রব যোগান বা দ্রব্য টানের উপর নির্ভর করে। তাহা ছাড়া, উপযোগ আবার নিজেই বাজার মূল্যদ্বারা নির্ধারিত হয়। যদি বাজার দর হ্রাস পায়, তাহা হইলে ভোক্তার কাছে দ্রব্যের উপযোগও হ্রাস পাইবে। অতএব, একদিকে মূল্য যেমন দ্রব্য উপযোগদ্বারা নির্ধারিত হয়, অপরদিকে উপযোগও বাজার মূল্যদ্বারা ধার্য হয়। মূল্য ও উপযোগ পরস্পর একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে।

উপযোগ তত্ত্বের অসংগতি ও গলদ

উপযোগ তত্ত্বের নিখুঁত ও সুষ্ঠু প্রয়োগ দেখা যায়, বিশেষভাবে অত্যল্পকালীন মূল্য নির্ধারণে এবং যে সকল দ্রব্যের পুনরুৎপাদন হয় না, উহাদের মূল্য নির্ণয়ে। এই দুই ক্ষেত্রে দ্রব্যের যোগান মোটামুটি সীমিত ও অপরিবর্তনীয় থাকে ; এইরূপ যোগানের অবস্থায় বাজার মূল্য বিশেষ করিয়া দ্রব্যের উপযোগ বা চাহিদা দ্বারা স্থির হয়।

অনুশীলনী

1. Critically examine the labour theory of value.

(C. U. B. Com. '39.)

2. Write short notes on :

(a) Cost of Production Theory of Value.

(b) Utility Theory of Value.

অর্থবিদ্যার গোড়ার কথা

[বি, এ, ও বি, কম্, পরীক্ষার্থীর জন্য]

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীসচ্চিদানন্দ ঘোষ এম্, এ,

কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজের অর্থবিদ্যার অধ্যাপক

এবং

সিটি কলেজ বাণিজ্য বিভাগের লেক্‌চারার।

সুরেন্দ্রনাথ কলেজ ও সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,

কলিকাতা ও গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক,

এবং 'মডার্ন ইকনমিক থিওরী' গ্রন্থ প্রণেতা।

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী

২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

প্রকাশক : শ্রীমণি সেন্থি
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী
২০৯ কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬।

মূল্য ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর : গোবর্ধন প্রেস
২০৯, কর্নওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬।

সূচীপত্র

একবিংশ অধ্যায়

ফাট্‌কা (Speculation)

ফাট্‌কার অর্থ কি ? (Meaning of Speculation) : ভবিষ্য সম্ভাব্য ঘটনা স্রোতের নিরিখে বর্তমান কার্যপরিক্রম নির্ধারণকেই সহজ কথায় ফাট্‌কা বলে। ভবিষ্যৎ মূল্যস্তরের সম্ভাব্য গতি অনুধাবন করিয়া মুনাফা শিকারের আশায় যে সাম্প্রতিক কেনা বেচা চলে, তাহাই ফাট্‌কা কারবার। বর্তমানে দ্রব্যের চাহিদা বা যোগানের যাহা গতি, ভবিষ্যতে সেই গতি নাও থাকিতে পারে। চাহিদা-যোগানের গতি যদি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে এক না থাকে, তাহা হইলে দ্রব্যমূল্যও বর্তমানে ও ভবিষ্যতে তফাৎ হইতে বাধ্য। ফাট্‌কাবাজের (Speculator) কাজ ভবিষ্যতে পণ্য মূল্যের গতি কোন্ দিকে যাইবে তাহা সঠিকভাবে অনুমান করা। সেই অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া সে বর্তমানে বেচা কেনা করে এবং ঐ কারবারের মাধ্যমে মুনাফালাভ করে। ফাট্‌কা-বাজ যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য চড়া হইবে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাম্প্রতিক বাজারে মাল খরিদ আরম্ভ করিবে। এই খরিদ মাল সে ভবিষ্যতের চড়া বাজারে বিক্রয় করিয়া মুনাফা লাভ করিবে। অপরপক্ষে, সে যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্যের মন্দা আসিবে, তাহা হইলে সে বর্তমান বাজারেই তৎক্ষণাৎ মাল বিক্রয় করিয়া দিয়া ভবিষ্যতে লোকসানের হাত হইতে রেহাই পাইতে চেষ্টা করিবে। এইরূপ কেনা-বেচাকে সময়-ভিত্তিক ফাট্‌কা কারবার বলে (Time Speculation)।

প্রাচীন কালে যখন যাতায়াত ও পরিবহনের সুযোগ সুবিধা ছিল না, তখন স্থান-ভিত্তিক ফাট্‌কা কারবারেরও (Place Speculation) বেশ প্রচলন ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক জগতে দ্রুত সমাযোজন (Communication) ও ব্যাপক পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন হওয়ায়, দ্রব্যের মূল্য বিভিন্ন দেশে প্রায় সমান স্তরে দেখা যায় ; ফলে, স্থান-ভিত্তিক ফাট্‌কা কারবারের গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পাইয়াছে।

ফাট্‌কা কারবার জুয়া খেলা নয় (Speculation is not gambling) : অনেকের বিশ্বাস যে, ফাট্‌কা কারবার জুয়া খেলারই সামিল। তাহারা মনে

করেন যে, জুয়ারী ফাট্‌কা-বাজের মতই ঘটনা বা ফলাফল সম্পর্কে পূর্বানুমান করে এবং তাহার নিরিখে সাম্প্রতিক কার্যক্রম সমাধা করিয়া মুনাফা লাভের চেষ্টা করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা সত্য নহে। কেননা, জুয়ারী ভবিষ্যৎ ঘটনা বা ফলাফল পূর্বানুমান করিয়া তাহার কারবার বা ব্যবসায় ক্ষেত্রে যে ঝুঁকি বহন করে, তাহা সামাজিক দিক হইতে অনাবশ্যক ঝুঁক। জুয়ারী যে ঝুঁকি কাঁধে নেয়, তাহাতে সমাজে উৎপাদনের অনিশ্চয়তা দূর হয় না। যেমন, জুয়ারী যদি কোন খেলার ফলাফল সম্বন্ধে পূর্বানুমান করিয়া বাজী রাখে, তাহা হইলে তাহার এই ঝুঁকি গ্রহণ সামাজিক উৎপাদন বা কল্যাণের দিক হইতে একেবারেই অনাবশ্যক হইবে। সে এইরূপ বাজী রাখিয়া ঝুঁক বহন না করিলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ফাট্‌কাবাজ যে ঝুঁকি গ্রহণ করে তাহা অত্যাবশ্যক। ফাট্‌কাবাজ যেমন একদিকে ঝুঁকি গ্রহণদ্বারা নিজে মুনাফা শিকার করে, সংগে সংগে কারবারের মাধ্যমে সে দ্রব্য মূল্যের উঠা নামার গতি সীমিত করিয়া মূল্য সাম্য স্থাপিত করিতেও সাহায্য করে। ফাট্‌কা-বাজ ঝুঁকি বহনদ্বারা মূল্যের স্থিরতা আনয়ন করে বলিয়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফাট্‌কা কারবার উৎপাদনের অনুকূল, তথা সমাজকল্যাণপ্রদ।

ফাট্‌কা বাজারের অনুকূল অবস্থা (Conditions favouring Speculative Market): সাধারণভাবে বলা যায় যে, যে সকল দ্রব্যের ভবিষ্যৎ চাহিদা ও যোগান অনিশ্চয়তাপূর্ণ, তাহাদের বেলাতেই ফাট্‌কা কারবার চলিতে পারে। কৃষি বা শিল্প উৎপন্ন সামগ্রী, শেয়ার কিংবা জামিন (security) প্রভৃতির বেশ বিস্তৃত ফাট্‌কা বাজার আছে। সামগ্রীর কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকিলেই সুবিস্তৃত ফাট্‌কা বাজার গড়িয়া উঠে। **প্রথমতঃ,** কোন সামগ্রী যদি দেশের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন শস্য বা খাদ্য হয় এবং উহার যদি নিয়মিত ও ব্যাপক চাহিদা থাকে, তাহা হইলে ঐ দ্রব্যের বেলায় সুবিস্তৃত ফাট্‌কা কারবার চলিতে পারে। যেমন, ধান, গম প্রভৃতি খাদ্যবস্তু, তুলা, পশম প্রভৃতি শিল্পের কাঁচা মাল। **দ্বিতীয়তঃ,** সামগ্রী প্রমিত (standardised) না হইলে, বিস্তৃত ফাট্‌কা কারবারের পক্ষে উপযুক্ত নয়। গুণানুসারে যে সকল সামগ্রীর বিভিন্ন পর্যায়ে বর্গীকরণ সম্ভব নয়, উহাদের চাহিদা ব্যাপক ও অনিশ্চয়তাপূর্ণ হইতে পারে। **তৃতীয়তঃ,** যে সকল দ্রব্যের সহজ পরিচিতি (cognisability) আছে,—যাহা সহজে চেনা যায় বা পরিমাপ করা যায়, উহারা বিস্তৃত ফাট্‌কা বাজারের অনুকূল। ষ্টক্ (stock), জামিন (security) প্রভৃতির এই গুণটি বিশেষভাবে

থাকার দরুণ, উহাদের ফাট্‌কা বাজার সুসংবদ্ধ ও সুবিস্তৃত। **পরিশেষে,** সুবিস্তৃত ফাটকা কারবার গড়িয়া উঠিবার আর একটি অনুকূল অবস্থা এই যে, দ্রব্যের যোগান খুব অনিশ্চয়তাপূর্ণ ও অনিয়মিত হওয়া আবশ্যক। যে সকল সামগ্রী বিশেষভাবে প্রকৃতিদত্ত,—মানুষের হাতের বাইরে,—উহাদের যোগান সাধারণতঃ অনিশ্চিত হয়। অনিশ্চিত যোগানের দরুণ উহাদের বাজার মূল্যও অত্যধিক উঠানামা করে। এই সকল সামগ্রীর মূল্য-স্থিরতা প্রতিষ্ঠার জন্য সুবিস্তৃত ফাট্‌কা বাজার সংগঠন অনিবার্য হইয়া উঠে।

ফাট্‌কা কারবারের ক্রিয়া (Functions of Speculation) : ফাট্‌কা কারবারের সব চাইতে প্রধান ক্রিয়া ও সুফল এই যে, ইহা পণ্যের চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সাম্য স্থাপন করিয়া মূল্যের স্থিরতা (price stability) আনয়নে সহায়তা করে। ফাট্‌কাবাজ যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে দ্রব্য যোগানটান হেতু বাজার দর চড়া হইবে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সাম্প্রতিক বাজারে ক্রয় সুরু করিবে। তাহার দৃষ্টান্তে আরও অনেকে বর্তমান বাজারে দ্রব্য খরিদ আরম্ভ করিবে। ফলে, বর্তমান বাজারদর বৃদ্ধি পাইবে ও বর্তমান খাদন সংকুচিত হইবে। খাদন সংকোচনের সংগে সংগে বর্তমান বাজার হইতে কিছুটা পরিমাণ দ্রব্যের প্রতিগ্রহ (withdrawal) হইবে। এই মাল আবার যখন ভবিষ্যৎ বাজারে ঢালা হইবে, তখন পণ্য যোগান বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে ভবিষ্যৎ বাজারে অনুমিত সম্ভাব্য মূল্য বৃদ্ধি ততটা প্রকট হইবে না। অপর পক্ষে, ফাট্‌কাবাজ যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যত বাজারে পণ্য যোগান বৃদ্ধি হেতু মূল্য হ্রাস হইবে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ বর্তমান বাজারে মাল বিক্রয় করিবে। ইহার ফলে, বর্তমান বাজারে মালের যোগান বৃদ্ধি পাইয়া বাজার মূল্য হ্রাস হইবে। মূল্য হ্রাস হওয়ায় বর্তমান চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে এবং উহাতে ভবিষ্যৎ বাজারে দ্রব্য যোগান হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে ঐ বাজারে মন্দা ততটা প্রবল হইবে না। বর্তমান বাজারে পণ্য ক্রয় ও বিক্রয়দ্বারা ফাট্‌কাবাজ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাজারের মূল্যের মধ্যে পার্থক্য কমাইয়া সাম্যাবস্থা সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে। ফাট্‌কা কারবারীর দৌলতে যে মূল্য-স্থিরতা ও সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়, তাহা উৎপাদক শ্রেণীর পক্ষে খুবই অনুকূল।

(১) পণ্যমূল্যের স্থিরতা প্রতিষ্ঠা

ফাট্‌কাবাজ উৎপাদনে আর এক ভাবে সহায়তা করিতে পারে। উৎপাদনের ঝুঁকি বহন ও ঝুঁকি সংকোচনদ্বারা সে উৎপাদকের অনিশ্চয়তা-বহুল

পরিমাণে দূর করিতে পারে। ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যই এই যে, চঞ্চল, পরিবর্তনশীল ভবিষ্যৎ চাহিদার উদ্দেশ্যে পণ্য উৎপাদন নির্ধারিত হয়। ফলে, অনেক সময়ই দ্রব্য-চাহিদা ও দ্রব্য-যোগানের মধ্যে কোনই সংগতি থাকে না। উৎপাদকের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আরও বেশী হয়, কাঁচামালের বাজার-দর চঞ্চলতার জন্য। ফাট্‌কাবাজ উৎপাদককে উপযুক্ত সময়ে স্থিরীকৃত মূল্যে কাঁচামাল যোগান দিবার ভার গ্রহণ করিয়া এবং উৎপন্ন পণ্য খরিদ করিবার অঙ্গীকার করিয়া, তাহার অনিশ্চয়তা ও ঝুঁকি বহনের ভার বহুল পরিমাণে লাঘব করে।

(২) উৎপাদনের সুবিধা সৃষ্টি

ফাট্‌কাবাজ মূল্য স্থিরতা প্রতিষ্ঠাদ্বারা পণ্য বিনিময়ের সুবিধা সৃষ্টি করে ও সাধারণ খাদক শ্রেণীর যথেষ্ট উপকার করে। যখন পণ্য চাহিদা ও যোগানের মধ্যে ভার সাম্য স্থাপিত হয়, সেই অবস্থাতে দ্রব্য ক্রয় করিলে, ভোক্তা চরম তৃপ্তি লাভ করিবে। ফাট্‌কাবাজ তাহার ক্রিয়াকলাপ দ্বারা অনেক সময় ভবিষ্যতে পণ্য যোগান টানের প্রতি ভোগকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। তাহারাও ভবিষ্যৎ বাজারের মূল্য বৃদ্ধির আভাস পাইয়া, সাম্প্রতিক খাদন সংকোচন করে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সঞ্চয় করে।

(৩) ভোগকারীর সুবিধা সৃষ্টি

ফাট্‌কা কারবার ষ্টক্, শেয়ার ও সিকিউরিটি বাজারে মূলধন বিনিয়োগের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করে। ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ বা শেয়ার বাজারে কেনা বেচা ও লেন দেন করিয়া ফট্‌কাবাজগণ বিভিন্ন জামিন পত্রের মূল্য স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করে। উহাদের দ্বারা ষ্টকের বাজারে মূল্য স্থিরতা স্থাপিত হওয়ায়, সাধারণ পুঁজিপতি বিনিয়োগ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হওয়া সত্বেও উপরি উক্ত বিভিন্ন জামিন পত্র ক্রয় করিয়া মূলধন বিনিয়োগ করিতে আকৃষ্ট হয়।

(৪) মূলধন বিনিয়োগের সুবিধা সৃষ্টি

পরিশেষে, ফাট্‌কাবাজগণ তাহাদের কারবারের মাধ্যমে শুধু যে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দ্রব্যের সুবটন ব্যবস্থা করে তাহা নহে। বিভিন্ন স্থানের মধ্যে সামগ্রীর কি ভাবে সুবণ্টন ব্যবস্থা হইতে পারে, ফাট্‌কা কারবার তাহারও সহায়তা করে। যাহাতে এক স্থানে সামগ্রীর যোগান টান হওয়ায় মূল্য বৃদ্ধি না হয়, এবং অপর এক স্থানে দ্রব্য যোগান প্রচুর হওয়ায় মূল্য হ্রাস না হয়, বৈধ ফাট্‌কা কারবার সে বিষয়েও সহায়তা করে।

ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange): ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ বলিতে সেই বিনিময়

বাজার বা কেন্দ্র বুঝায় যেখানে পুরাণ ষ্টক্, শেয়ার, ও সরকারী সিকিউরিটি কেনা বেচা হয়। ষ্টকের বাজারে নূতন ইস্যুকৃত (new issues) শেয়ার ও জামিন পত্রের কোন লেনদেন হয় না। এই বাজার এমন ভাবে সুসংগঠিত যে কেবল ক্ষমতা প্রাপ্ত সভ্যরাই এখানে কারবার করিতে পারে।

শেয়ার ও জামিন পত্রের বাজার ফাট্‌কা কারবারের পক্ষে খুবই অনুকূল। এই বাজারে প্রকৃত ফাট্‌কাবাজ হইল দালালরা (Jobbers)। যখন তাহারা অনুমান করে যে, ষ্টক্ বা শেয়ার পত্রের মূল্য অদূর ভবিষ্যতে হ্রাস পাইবে, তৎক্ষণাৎ তাহারা উহা বিক্রয় আরম্ভ করে; ইহাকে **'মন্দী কারবার'** (**bearish activity**) বলে। যে ফট্‌কাবাজ ষ্টক্ বা শেয়ার পত্রের ভবিষ্যৎ মূল্য হ্রাস অনুমান করিয়া, বর্তমান বাজারে বিক্রয় সুরু করে তাহাকে **'মন্দীওয়ালা'** (**bear**) বলা হয়। অপর পক্ষে, ষ্টকের বাজার **'অবস্থাপন্ন'** (**bullish**) হয় তখন, যখন শেয়ার বা জামিন পত্রের ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধি অনুমান করিয়া ফাট্‌কাবাজগণ তাড়াতাড়ি ঐ সকল বিনিয়োগ পত্র খরিদ করে। যে ফাট্‌কাবাজ শেয়ার বা ষ্টকের ভবিষ্যৎ মূল্য বৃদ্ধি অনুমান করিয়া, মুনাফা শিকারের আশায় বর্তমান বাজারে ঐ সকল জামিন পত্র ক্রয় করে তাহাকে **'তেজীওয়ালা'** (**bull**) বলা হয়। ফাট্‌কাবাজ যদি অনুমান করে যে, ভবিষ্যতে ষ্টকের মূল্য হ্রাস পাইবে, তাহা হইলে সে বর্তমান বাজারে ঐ জামিনপত্র বিক্রয় করিবে এবং ভবিষ্যতে মাল (যে মাল তাহার কাছে নাই) ডেলিভারি দিতে অগ্রিম চুক্তি আবদ্ধ হইবে। যখন এই চুক্তির মেয়াদ পূর্তি হইবে, তখন যদি বাজার দর চুক্তির দরের (contract price) চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে এই দুই দরের তফাৎ যে অর্থ পরিমাণ উহাই ফাট্‌কাবাজের মুনাফা লাভ হইবে। অনেক সময় এই চুক্তির ঝুঁকি আবার hedging বা covering contract দ্বারা বীমা করিয়া অন্য সওদাগরের কাঁধে চাপান হয়। এই চুক্তিদ্বারা সময় মত অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্যের মাল ডেলিভারির ব্যবস্থা করা হয়। এইরূপ চুক্তির সাহায্যে ফাট্‌কা কারবার উৎপাদক শ্রেণীর কাঁচামাল যোগান দিতে বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। চুক্তি পত্র স্বাক্ষরের দিন ও চুক্তির মেয়াদ পূর্তির দিনের মধ্যে যদি খুব অধিক সময় অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে উহাকে ভাবি বা **আউতি সওদা** (**forward contract**) অথবা শুধু **'future'** বলা হয়। আর যদি চুক্তিতে তাড়াতাড়ি মাল ডেলিভারি দিবার প্রতিশ্রুতি থাকে, তাহা হইলে উহাকে সাম্প্রতিক বা **স্থানিক সওদা** (**spot contract**) বলা হয়।

ষ্টক এক্সচেঞ্জের সুফল (Advantages of Stock Exchange): দেশের অর্থনৈতিক জীবনে ষ্টকের বিনিময় বাজার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। যদিও এই বাজারে নূতন শেয়ার পত্রের লেন দেন হয় না, তথাপি ইহা পুরাণ শেয়ার বা জামিনপত্র ক্রয় বিক্রযের সুযোগ দিয়া ব্যবসায়ের ঝুঁকি বহনে অনিচ্ছুক পুঁজিপতির মূলধন বিনিয়োগের সহায়তা করে। এমনকি, জনসাধারণও পরোক্ষভাবে মূলধন বিনিয়োগের উৎসাহ পায়; কেননা, তাহারা জানে যে, নগদ টাকার প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় তাহারা জামিনপত্র ষ্টকবাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে পারে। ষ্টক বিনিময় বাজারের এই সুবিধা না থাকিলে, অতি অল্প সংখ্যক লোকই শেয়ার পত্রে তাহাদের অর্থপুঁজি আটকাইয়া রাখিতে প্রস্তুত হইত। **দ্বিতীয়তঃ,** ষ্টক-বিনিময় বাজার অবস্থানের জন্যই জনসাধারণ জামিন পত্র প্রকৃত মূল্যে (true price) ক্রয় বিক্রয় করিতে সক্ষম হয়। শেয়ার বা অন্যান্য জামিন পত্রের প্রকৃত মূল্য হইল, ষ্টক বাজারে উহাদের যে বর্তমান মূল্য। **তৃতীয়তঃ,** ষ্টকের বাজারে বিভিন্ন কোম্পানীর শেয়ার পত্রের বাজার দর উদ্ধৃত (quoted) হয়। ঐ উদ্ধৃত বাজার দর দেখিয়া পুঁজিপতি ও শেয়ার ক্রেতাগণ কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্বন্ধে সম্যক্ ধারণা করিতে পারে। যদি কোন কোম্পানীর শেয়ারের মূল্য হ্রাস পায়, তাহা হইলে ফাটকাবাজেরা ঐ কোম্পানীর লভ্যাংশ কমিবে অনুমান করে—এবং জনসাধারণও ঐ কোম্পানীর শেয়ার পত্র ক্রয় করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। **পরিশেষে,** বলা যায় যে ষ্টকের বাজার যেন ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ঘটনার দিকদর্শক মূর্তি বিশেষ (weather cock)। ষ্টক বাজারের তেজী অবস্থাই শিল্পবাণিজ্য উন্নয়নের সূচনা করে; আবার মন্দী অবস্থা শিল্প বাণিজ্যের নিম্নগতি নির্দেশ করে।

উৎপন্ন বিনিময় বাজার (Produce Exchange Market): উৎপন্ন বিনিময় বাজারে কৃষিজ উৎপন্ন সামগ্রীর ভাবী লেনদেন হইয়া থাকে। ষ্টক বাজারের মত এই বাজারও অত্যন্ত সুসংগঠিত; কেবল মাত্র সভ্য (arhatias) ও দালালগণ (brokers) এই বাজারের চৌহদ্দির মধ্যে কারবার করিতে পারে। সভ্যরা কেবল মাত্র নিজেদের হিসাব মত কেনা বেচা করে, কিংবা জনসাধারণের কমিশন এজেন্টভাবে কাজ করে। আর দালালরা সভ্য ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে।

ভবিষ্যৎ বাজারে কোন বিশেষ দরে কোন পণ্য ক্রয় বা খরিদ

করিবার উদ্দেশ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিকে **আগাম-সওদা** (**forward contract** অথবা **futures**) বলা হয়। এই ধরণের চুক্তি ফাট্‌কাবাজ করে মুনাফা শিকারের লোভে আর উৎপাদক করে কাঁচা-মালের ভবিষ্যৎ বাজার দর উঠানামার দরুণ অসুবিধার হাত হইতে রেহাই পাইবার উদ্দেশ্যে। বাজারদরের উঠানামার দরুণ ঝুঁকি সাধারণতঃ রোধ করা হইয়া থাকে hedging operations দ্বারা। Hedging বলিতে যুগপৎ একই সময়ে দুইটি চুক্তির মাধ্যমে বাজার সওদা (bargains) বুঝায়— (১) সাম্প্রতিক ক্রয় ও (২) ভাবী বিক্রয়। সাম্প্রতিক ও ভাবী বাজারের মূল্যগতি সাধারণতঃ একদিকেই থাকে এবং উহারা একে অন্যকে প্রভাবান্বিত করে। ফাট্‌কাবাজ ভাবী মূল্য ও সাম্প্রতিক মূল্যের তফাৎটুকুই মুনাফা হিসাবে লাভ করে। উৎপাদক ভাবী বাজারে কাঁচা মালের দর উঠানামার দরুণ ঝুঁকি সামলায় hedging operations দ্বারা। তাহাকে কাঁচামাল ক্রয় করিয়া অনেক সময় উৎপাদনের বিলম্ব হেতু মাসের পর মাস মাল গুদামজাত করিয়া রাখিতে হয়। কাঁচামালের দর কিছুদিন পর যদি হ্রাস পায়, তাহা হইলে উৎপাদকের লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা। আবার মালের দর যদি চড়া হয়, তাহা হইলে উৎপাদকের লাভ নিশ্চিত। এইরূপ লাভ লোকসানের অনিশ্চিয়তার ও ঝুঁকির হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য উৎপাদককে যে মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে হয়, সেই মূল্যেই আবার গোটা মাল বাজারে বিক্রয় করিয়া দিতে হয়। ফাট্‌কা কারবারের দৌলতে, উৎপাদক স্থানিক কারবারের (Spot Transaction) লাভ লোকসানের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারে।

ফাট্‌কা কারবারের কুফল (Evils of Speculation): ফাট্‌কা কারবার যদি বৈধ হয়, তাহা হইলেই উপরি উক্ত সুফলগুলি লাভ করা সম্ভব হয়। কিন্তু অবৈধ (Illegitimate) ফাট্‌কা বা জুয়াখেলা অনেক সময় জুয়ারীর নিজেরও লোকসান করে, সমাজেরও অসামান্য ক্ষতির কারণ হয়। যদি বাজার সম্পর্কে ফাট্‌কাবাজের প্রকৃত খবর ও সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে, যদি সে অবস্থার তাগিদমত উপযুক্তভাবে ক্রয় বিক্রয় না করিতে পারে, তাহা হইলে পণ্যমূল্যের উঠা-নামা রোধ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং সমাজের প্রভূত অকল্যাণ হয়। অনেক সময় ফাট্‌কা কারবার এমন অবৈধ হইতে পারে, যাহাতে ফাট্‌কাবাজদের ক্রিয়া কৌশলে বাজারের গোটা পণ্য যোগান একায়ত্তি (Cornered) হয়। অবশ্য বাজারের পণ্য যোগান নিয়ন্ত্রণ অনেক সময় খাদক

শ্রেণীর পক্ষে কল্যাণকর হইতে পারে; কেননা, ঐ একায়ত্তি ও নিয়ন্ত্রণদ্বারা বাজার দরের হঠাৎ ও প্রবল হ্রাস বৃদ্ধি রোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দ্রব্যের একায়ত্তি ফাট্‌কাবাজকে একচেটিয়া কারবারীর সামিল করিয়া তোলে। ফলে, খাদক শ্রেণীকে অত্যন্ত উচ্চ মূল্যে পণ্য খরিদ করিয়া বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হইতে হয়।

অবৈধ ফাট্‌কা কারবার সমাজ কল্যাণ বিরোধী বলিয়া উপযুক্ত ব্যবস্থাদ্বারা উহা সুনিয়ন্ত্রিত করা একান্ত প্রয়োজন। নিয়ন্ত্রণের প্রথম ও প্রধান উপায়ই হইল ব্যবসায় ক্ষেত্রে নৈতিক আদর্শের মান উন্নয়ন করা। জুয়া কারবার অবজ্ঞা ও প্রতিরোধ করিবার পক্ষে জোর সুপারিশ করিয়া এই ধরণের কারবারের বিরুদ্ধে দেশের জনমত সুসংবদ্ধভাবে গড়িয়া তোলা একান্ত আবশ্যক। অধ্যাপক টসিগ (Taussig) ষ্টক্ বিনিময় বাজারের গলদ ও কুফল দূর করিবার উদ্দেশ্যে নূতন নূতন আইন প্রণয়ন এবং ফাট্‌কা কারবার সম্পর্কে জনসাধারণে্য অধিকতর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার জন্য বিশেষ ভাবে সুপারিশ করিয়াছেন। অধ্যাপক লারনার (Lerner) মনে করেন যে, ফাট্‌কা কারবার যদি খুব বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উহার বিরুদ্ধে পাল্টা ফাট্‌কা কারবার (Counter-Speculation) চালান একান্ত প্রয়োজন। সরকারের উচিত এমন একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা, যাহার কাজ হইবে পণ্য মূল্যের উপযুক্ত খসড়া প্রস্তুত করা। আসল বাজার মূল্য যাহাতে খসড়াকৃত মূল্যের সংগে হারবদ্ধ (pegged) হয়, তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা সরকারের অবশ্য করণীয়।

ফাট্‌কা কারবার নিয়ন্ত্রণ

অনুশীলনী

1. *Consider the economic functions of speculation with particular reference to speculation on the Stock Exchanges.* (C.U. B.A. Hons. '52)

2. **Discuss the nature of speculation, showing that it is not gambling, but it does, within limits, a necessary economic function.**

3. **Distinguish between legitimate and illegitimate speculation. What means could you suggest to prevent illegitimate speculation?**

4. Do you think that the modern productive organisation would suffer a great loss if all stock and produce exchanges are closed down? (C.U. B.Com. '55)
5. Discuss the nature and necessity of speculation in a modern community. (C.U. B.Com. '53)
6. Discuss the functions of Stock Exchanges indicating, in particular, how they promote the investment of capital. (C.U. B.A. '56)

দ্বাবিংশ অধ্যায়

উৎপাদক কারকের অর্থ আয় নির্ণয়

(Pricing of Productive Factors)

জাতীয় আয় বণ্টন (**Distribution**): আমরা জানি যে, বিভিন্ন উৎপাদক কারক তাহাদের কৃত্য যোগানদ্বারা সম্মিলিতভাবে জাতীয় আয় উৎপাদন করে। এই জাতীয় আয় কারকসমূহের মধ্যে কৃত্য যোগানের পুরস্কার স্বরূপ বণ্টিত হয়। বিভিন্ন উৎপাদক কারকের মধ্যে জাতীয় আয়ের এই ভাগাভাগিকে বণ্টন বা *Distribution* বলে। জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যা এক হিসাবে দ্রব্য বিনিময় মূল্যের সমস্যারই অনুরূপ। জাতীয় আয় বণ্টনের সমস্যা হইল, বিভিন্ন উৎপাদক কারক তাহাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কৃত্য যোগানের জন্য যে অর্থ মূল্য পায়, তাহার সমস্যা। ভূমি উহার খাজনাস্বরূপ যে অর্থ আয় লাভ করে, পুঁজিপতি তাহার মূলধন বিনিয়োগের জন্য সুদ হিসাবে যে অর্থ আয় লাভ করে, শ্রমিক তাহার নিজের শ্রমের জন্য যে মজুরী পায় এবং সংগঠনকর্তা তাহার ব্যবস্থাপনা ও ঝুঁকি গ্রহণের মূল্যস্বরূপ যে মুনাফালাভ করে—এই সকল অর্থ আয় নির্ধারণই কারক বাজারে (factor market) মূল্য নির্ণয়ের সমস্যা ও জাতীয় আয় বণ্টনের বিষয় বস্তু। আমরা দেখিয়াছি, পণ্য বাজারে সামগ্রী মূল্য নির্ধারিত হয়, চাহিদা ও যোগানের মূল বিধি প্রয়োগদ্বারা। কারক বাজারে যখন জাতীয় আয় বণ্টনদ্বারা বিভিন্ন কারক মূল্য (factor price) স্থির হয়, তখনও মোটামুটিভাবে চাহিদা ও যোগানের মূলসূত্র কার্যকরী হয়।

কারক চাহিদা (Demand for Factors): কোন দ্রব্য বা কৃত্য উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে কারক বিনিয়োগ করিতে হয়। দ্রব্যের চাহিদা যেমন প্রত্যক্ষ, কারকের চাহিদা কিন্তু উদ্ভূত (derived demand)। ভোক্তাগণ তাহাদের অভাব পূর্তির জন্য প্রত্যক্ষভাবে উৎপাদক কারক চাহে না; প্রতিষ্ঠান-মালিক কারক চাহে বিনিয়োগের জন্য, পণ্য উৎপাদন দ্বারা ভোগকারীর চাহিদা মিটাইবার জন্য। সেইজন্য কারকের চাহিদা পরনির্ভর চাহিদা—উহা অপ্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে ভোগকারীর পণ্য চাহিদা পরিমাণের উপর। ভোগকারীর পণ্য চাহিদা পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়াই প্রতিষ্ঠানকে উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন কারক বিনিযোগ করিতে হয়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব (Theory of Marginal Productivity): অধ্যাপক মার্শাল ও তাঁহার শিষ্যস্থানীয় সমসাময়িক অর্থবিদ্যাবিদগণ প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বকে জাতীয় আয় বণ্টনের মূলসূত্র বলিয়া অভিহিত করিযাছেন। তাঁহাদের মতে কারক বাজারে (factor market) যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে চাহিদার দিক হইতে প্রত্যেক কারকের অর্থ আয় যথাক্রমে উহাদের প্রত্যেকের প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান হইবে।

যখন কোন প্রতিষ্ঠান কারক বিনিযোগ করে, তখন উহাকে দুইটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থা লক্ষ্য করিতে হয়। প্রথমতঃ, উহাকে লক্ষ্য করিতে হয় যে, যে পণ্য বাজারের উদ্দেশ্যে উহা বিভিন্ন কারক বিনিয়োগ করিতেছে, সেখানে পণ্য-মূল্যের কি অবস্থা। দ্বিতীয়তঃ, উহাকে লক্ষ্য করিতে হয়, বিভিন্ন কারক বাজারে কারক মূল্যের অবস্থাই বা কি। প্রথম বাজারে পণ্য বিক্রয় করিয়া যে মূল্য প্রতিষ্ঠান পাইবে এবং দ্বিতীয় বাজারে বিভিন্ন কারকের অর্থমূল্য দিয়া প্রতিষ্ঠানকে যে উৎপাদন খরচ পোহাইতে হইবে—এই দুইএর সম্পর্কের উপর প্রতিষ্ঠানের লাভ লোকসান নির্ভর করে। বাজার মূল্য ও উৎপাদন খরচের মধ্যে তফাৎ যত অধিক হয় সেই লক্ষ্যই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী নীতি হইয়া থাকে।

প্রান্তিক উৎপাদকতা মতবাদ অনুসারে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় বাজারে কোন কারকের আয় সাম্য (price equilibrium) স্থাপিত হয় তখন, যখন উহার বাজার মূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদকতা সমান হয়। পণ্য বাজারে খরিদ্দারের কাছে যেমন দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ আছে, সেইরূপ কারক বাজারে প্রতিষ্ঠানের কিংবা উৎপাদক মালিকের কাছেও কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা নির্ণয়করা যায়। কোন দ্রব্যের

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের ব্যাখ্যান

প্রান্তিক উপযোগ খরিদ্দার লাভ করে ঐ দ্রব্যের শেষ একক ক্রয় করিয়া। দ্রব্য ক্রয়ের শেষ একক হইতে যে উপযোগ খাদক লাভ করে, তাহা দ্রব্যের এক একক বাজার মূল্যের সমান হয়। এক একক দ্রব্য বেশী ক্রয় করিলে, খাদকের কাছে দ্রব্যের মোট উপযোগ যতটুকু বৃদ্ধি পায়, উহাই দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ। কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতাও ঠিক একইভাবে নির্ণয় করা চলে। মালিক কিংবা প্রতিষ্ঠান যদি কোন কারকের অতিরিক্ত এক একক নিয়োগ করে, এবং অন্যান্য কারকের বিনিয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে মোট উৎপত্তি (total product) অতিরিক্ত যে পরিমাণ বাড়িবে, সেইটুকুই ঐ কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা। এই মোট উৎপত্তির অতিরিক্ত বাড়তি অর্থের দ্বারা পরিমাপ করিতে হয়। অন্যান্য কারকের বিনিয়োগ স্থির রাখিয়া, কোন প্রতিষ্ঠান যদি একটি কারকের অতিরিক্ত এক একক বিনিয়োগ করে, তাহা হইলে যেটুকু উৎপত্তি বাড়ে, তাহাকে **প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ** (marginal physical productivity) বলে। কারকের প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণকে যদি দ্রব্যের বাজার মূল্য দিয়া গুণ করা যায়, তাহা হইলে প্রান্তিক উৎপাদকতার অর্থমূল্য ধার্য করা যায়।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, খাদকের কাছে দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ধারণাটি ক্রম ক্ষীয়মান উপযোগ বিধির (law of diminishing utility) অনুসিদ্ধান্ত (corollary) হিসাবে স্বীকার করা হয়। ঠিক একই ভাবে প্রান্তিক উৎপাদকতার তত্ত্বটিও ক্রম হ্রাসমান আগম বিধির (law of Diminishing Returns) একটি অনুসিদ্ধান্তরূপে ব্যাখ্যান করা চলে। অন্যান্য কারক বিনিয়োগ স্থির রাখিয়া, মালিক-প্রতিষ্ঠান যদি শুধু মাত্র একটি কারকের অতিরিক্ত পরিমাণ নিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে প্রথম দিকে তাহার মোট উৎপত্তি বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতে অধিক বাড়িতে থাকিবে। কিন্তু তাহা বলিয়া, মালিক একটি কারকের অতিরিক্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি যে কোন পরিমাণ করিয়া যাইতে পারে না। একটি কারক বিনিয়োগ যতই বৃদ্ধি করা যায়, ততই উহার প্রান্তিক উৎপাদকতা হ্রাস পাইতে থাকে, যদি অবশ্য অন্যান্য কারক বিনিয়োগ পরিবর্তন করা না হয়। শুধু একটি কারকের বিনিয়োগ অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলে এবং অন্যান্য কারক বিনিয়োগ অপরিবর্তনীয় রাখিলে, উৎপাদন-ক্ষেত্রে আদর্শ অনুপাত মাফিক কারক সংমিশ্রণের ব্যাঘাত হয়। ইহার ফলেই, ক্রম হ্রাসমান আগম বা উৎপত্তি বিধির প্রয়োগ হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠান

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব ব্যাখ্যানে ক্রম-হ্রাসমান বিধির প্রয়োগ

মালিক একটি কারক বিনিয়োগের পরিমাণ ততক্ষণ বাড়াইয়া যাইবে, যতক্ষণ কারকের বাজার মূল্যের চাইতে উহার প্রান্তিক উৎপাদকতা অধিক হয়। কারক বিনিয়োগের সাম্যাবস্থায় মালিক পৌছিবে তখন, যখন কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা ও উহার বাজার মূল্য সমান হয়।

আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় বাজারে কোন মালিক প্রতিষ্ঠানই কোন কারকের বাজার মূল্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। পূর্ণাংগ বাজারে অগণিত প্রতিষ্ঠান কারক বিনিয়োগ করে বলিয়া কোন একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান কারকমূল্য ধার্য বা প্রভাবান্বিত করিতে পারে না। কারক সমূহের বর্তমান বাজার মূল্য প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানকে মানিয়া লইতে হয়। সাম্প্রতিক বাজার দরে কতটা পরিমাণ কারক বিনিয়োগ করিবে, তাহা অবশ্য প্রতিষ্ঠান স্থির করে কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতাদ্বারা। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মালিক একটিমাত্র কারক বিনিযোগদ্বারা উৎপাদন করিতে পারে না। বিভিন্ন কারক সংমিশ্রণদ্বারা তাহাকে উৎপাদন ব্যবস্থা এমনভাবে সংগঠন করিতে হয় যে, তাহার খরচ হয় অবম (minimum), আর মুনাফা হয় চরম (maximum)। সে বিভিন্ন কারক পরিমাণ এমনভাবে সংমিশ্রণ করিবে যে, প্রত্যেকটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা ও বাজার মূল্য সমান হয়। দ্বিতীয়তঃ, সে কারক সংমিশ্রণের এমন ব্যবস্থা করিবে যে, প্রত্যেকটি কারক বিনিয়োগ হইতে যে প্রান্তিক উৎপাদকতা পাওয়া যাইবে তাহাও যেন পরস্পর সমান হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অতিরিক্ত এক একক শ্রম বিনিয়োগের ফলে যদি প্রান্তিক উৎপাদকতা শ্রমের মূল্যের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে মালিক ঐ কারক বিনিয়োগের পরিমাণ তখনই হ্রাস করিবে এবং শ্রমের পরিবর্তক হিসাবে হয়ত এক একক মূলধন বিনিযোগ করিবে—যদি অবশ্য ঐ অতিরিক্ত মূলধন বিনিয়োগের প্রান্তিক উৎপাদকতা মূলধনের বাজার দরের চেয়ে অধিক হয়। কারক বিনিয়োগে ও উহাদের অর্থমূল্য নিরূপণে পরিবর্তকতার নিয়ম (law of substitution) এমনভাবে প্রয়োগ হয় যে, মালিক প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থায় প্রত্যেকটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা পরস্পর সমান হয়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বব্যাখ্যানে পরিবর্তকতার নিয়মের প্রয়োগ

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের অনুমান ও ব্যত্যয় (Assumptions and Limitations of the Theory of Marginal Productivity): প্রান্তিক

উৎপাদকতা ধারণাটি কতগুলি অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনুমানগুলি অবাস্তব বলিয়া এই তত্ত্বটির বহুবিধ ব্যত্যয় দেখা যায় এবং তাহার জন্য এই মতবাদটি আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের তীব্র সমালোচনার বিষয় হইয়াছে।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের অনুমান

মোটামুটিভাবে তিনটি প্রধান অনুমানের উপর প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠিতঃ (ক) **প্রথমতঃ**, এই তত্ত্ব অনুমান করে যে, কারক বাজারে (factor market) ও পণ্য বাজারে (product market) পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান ; (খ) **দ্বিতীয়তঃ**, উৎপাদক কারকের পূর্ণ কর্মসংস্থান অথবা পূর্ণ নিয়োগের (full employment) অবস্থিতি কল্পনা করা হয়, এবং (গ) **তৃতীয়তঃ**, কারকের বিভিন্ন একক সমূহের সমজাতিত্ব (homogeneity) এবং উহাদের পারস্পরিক অবাধ পরিবর্তকতাও (indiscriminate substitution) এ তত্ত্বে অনুমিত হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় অনুমানটি সত্যিকারের বাস্তব অবস্থাই নয়। বাস্তব আর্থিক বাজার—উহা কারক বাজারই হউক কিংবা পণ্য বাজারই হউক, সত্যিকারের অপূর্ণাংগ বাজার (imperfect market)। সেই অপূর্ণাংগ বাজারে বাস্তব কারকমূল্য সাধারণতঃ স্বাভাবিক কারকমূল্যের চেয়ে কম হয়। ঠিক সেইরূপ বাস্তব অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণ নিয়োগও দেখা যায় না ; হয় কর্মসংস্থানেরই অভাব (unemployment) কিংবা অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরীতে নিয়োগ হইয়া থাকে (under employment)। বাস্তব অর্থব্যবস্থায় পূর্ণ কর্ম সংস্থান না থাকায়, কারকগণের অনেকে বেকার থাকে, আবার অনেকে হয়ত এমন অর্থ মূল্য পাইয়া থাকে, যাহা উহাদের প্রান্তিক উৎপাদকতার চেয়ে কম। তৃতীয় অনুমানটি সম্পর্কে বলা যায় যে, বিভিন্ন কারক এককের মধ্যে পরিবর্তকতা নিখুঁত নম্য (infinitely elastic) নয়। কোন কারকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক বিনিয়োগদ্বারা উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন যদৃচ্ছাক্রমে চলিতে পারে না। যদি কোন কারকের একক বিভক্ত করা অসম্ভব হয়, সে ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক বিনিয়োগ পরিবর্তন করা অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সাধারণতঃ, স্থায়ী মূলধন, কিংবা টেকসই উৎপাদক কারকের বেলায় এই অচল অবস্থা দেখা যায়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের আর একটি প্রধান গলদ এই যে, ইহা অনুমান করে যে, অন্য সকল কারক বিনিয়োগ যদি সম্পূর্ণ

অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইলে উৎপাদনের সাম্প্রতিক কারিগরি প্রক্রিয়া অবজ্ঞা করিয়াও, একটি কারকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একক বিনিয়োগ পরিমাণ যদৃচ্ছাক্রমে পরিবর্তন করা সম্ভব। কিন্তু এই অনুমানও বাস্তবতঃ সত্য নহে; কেননা, একটি কারক বিনিয়োগ পরিবর্তনের সংগে সংগে অন্যান্য কারক বিনিয়োগের পরিবর্তন হইতে বাধ্য। বিভিন্ন কারকের অনুপাত সংমিশ্রণে যে সম্মিলিত বিনিয়োগ করা হয়, উহা আবার মুখ্যতঃ শিল্পোৎপাদনের সাম্প্রতিক কারিগরি প্রক্রিয়াদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের অন্যান্য ব্যত্যয়

অধ্যাপক টসিগ্ (Taussig) ও ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) এই তত্ত্বের সমালোচনা প্রসংগে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন কারকেরই নিজস্ব একক পৃথক কোন উৎপাদকতা নাই। তাঁহাদের মতে, প্রত্যেক সামগ্রীই সকল কারকের সমবেত কর্মপ্রচেষ্টার ফলস্বরূপ সম্মিলিত উৎপত্তি (joint product)। সম্মিলিত উৎপত্তি হইতে কোন একটি বিশেষ কারকের বিশেষ উৎপাদকতা পৃথক করা যায় না। একটি কারকের অতিরিক্ত বিনিয়োগ দরুণ যে অতিরিক্ত উৎপাদকতা লাভ করা যায়, উহা কেবল ঐ কারকের একার কর্মচেষ্টার ফল নহে। ঐ অতিরিক্ত উৎপাদকতা উৎপাদন করিতে ঐ কারককে অন্যান্য কারকের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়।

অধ্যাপক হব্‌সন্ (Hobson) এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা ঐ কারক কৃত্যের (services) সঠিক পরিমাপ নহে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, এক একক সংগঠন (one unit of organisation) বৃদ্ধি করিলে, কোন প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপত্তি যতটা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, এক একক সংগঠন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাঁটাই করিলে, মোট উৎপত্তি হ্রাস পাইবে তাহার চেয়ে অনেক বেশী। এক একক সংগঠন প্রতিষ্ঠান হইতে ছাঁটাই করিলে প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সংগঠনকার্য একদম বেগোছাল হইয়া যাইতে পারে। ফলে, ঐ প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপত্তি, এক একক সংগঠন বৃদ্ধি করিলে যে পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে, এক একক সংগঠন ছাঁটাই করিলে, প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপত্তি কমিবে অনেক বেশী।

শ্রীমতী জোয়ান্ রবীন্‌সন্ (Mrs. Joan Robinson) প্রান্তিক উৎপাদকতা পরিমাপ করিবার আর একটি অসুবিধার কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি বলেন: উৎপাদনে যখন ক্রম বর্ধমান আগমবিধি কার্যকরী হয়, তখন একটি কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে যাহা হইবে, একটা গোটা শিল্পের কাছে হইবে তাহার চেয়ে বেশী। ইহার কারণ এই যে, কোন শিল্পে যখন একটি কারকের অতিরিক্ত একক বিনিয়োগ করা হয়, তখন কর্মবিভাগের সুযোগ সুবিধা ঐ শিল্প একটি প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশী পরিমাণ লাভ করিয়া থাকে।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্বের আর একটি গলদ এই যে, ইহা বিভিন্ন কারকের অর্থ আয় (pricings) ব্যাখ্যানের একতরফা অসম্পূর্ণ বিশ্লেষণ। ইহা শুধু বিভিন্ন কারকের চাহিদা দর কেমন করিয়া স্থির হয়, তাহাই নির্দেশ করে। কারকের যোগান মূল্য কেমন করিয়া ধার্য হয়, তাহা এই মতবাদে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করা হইয়াছে। কোন কারকের যোগানই স্থায়ী, অপরিবর্তনীয় নহে ; উহাদের মূল্য নিরূপণ বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে, ইহার মধ্যে প্রান্তিক উৎপাদকতা অন্যতম।

কারক যোগান-মূল্য (Supply Price of a Factor): প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব প্রযোগদ্বারা কারক চাহিদা মূল্য কেমন করিয়া নির্ধারিত হয়, তাহার আলোচনা আমরা করিযাছি। আমরা এখন কারক যোগানমূল্য কেমন করিয়া স্থির হয়, তাহা বিশ্লেষণ করিব।

কারকের অর্থ আয় শুধু উৎপাদনে উহার যে পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় তাহার পুরস্কার মূল্য নয়। অর্থ আয় এমন হওয়া সমীচীন যাহাতে বিভিন্ন কারক কৃত্য সরবরাহ করিতে উপযুক্ত উৎসাহ পায়।

কারকের যোগান মূল্য উহার সুযোগ-খরচ (opportunity cost) দ্বারা স্থির হয়। কোন প্রতিষ্ঠানে কোন কারকের এক একক নিযুক্ত হইলে, উহা ওখানে কমপক্ষে এতটা অর্থ আয় রোজগার করিবে, যাহা উহা অন্য বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠানে রোজগাব করিতে পারিত।

কোন কারক-একককে প্রান্তিক শিল্পান্তর বা কর্মান্তর স্তরে (marginal transference) নিযুক্ত রাখিতে প্রতিষ্ঠানের যে খরচ হয়, উহাই ঐ কারক-এককের প্রকৃত অর্থ মূল্য। কারক একক প্রান্তিক শিল্পান্তর স্তরে পৌঁছে তখন, যখন কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে উহা এতটা অর্থমূল্য রোজগার করে যে, তাহাতে উহার বিকল্প শিল্পান্তরে গিযা কর্ম গ্রহণ বন্ধ হইয়া যায়।

মনে রাখিতে হইবে যে, যদিও পণ্যমূল্য নির্ধারণের সাধারণ নীতিই কারক-

মূল্য নির্ণয়ে প্রযোজ্য, তথাপি উহা একেবারে সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। পণ্যমূল্য নির্ধারণের সাধারণ তত্ত্ব প্রয়োগের অসংগতি দেখা দেয় কারকের যোগানমূল্য নির্ণয়ের বেলায়। দীর্ঘ কালীন পণ্যমূল্য সামগ্রীর প্রান্তিক উৎপাদন খরচের সমান হয়। কিন্তু কারকের অর্থমূল্য নির্ণয়ের বেলায় এই সাধারণ নিয়ম খাটে না। কারকের প্রান্তিক উৎপাদন খরচ সঠিক নির্ধারণ করা সহজ নহে। তাহা ছাড়া, পণ্য যোগান যেমন চাহিদা-পরিবর্তনের সংগে সংগেই সহজে হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়, কারকের যোগান চাহিদা মাফিক অত সহজে অদল বদল করা যায় না। কারক যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও বিবিধ সামাজিক কারণ দ্বারা নিয়মিত হয়। কারকমূল্য নির্ধারণে এই সকল কারণের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারক মূল্য নিরূপণ (Pricings of Productive Factors under Imperfect Competition): আমরা পূর্বে দেখিয়াছি যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারকমূল্য উহার প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান হয়। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় ইহা কতটা সত্য এবং এইরূপ বাজারে কারকমূল্য সাম্য কি ভাবে নির্ধারিত হয় তাহাই এখন আলোচনা করিব।

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কোন প্রতিষ্ঠান যখন এক একক কারক বিনিয়োগ করে তখন উহার চিন্তা থাকে ঐ বিনিয়োগদ্বারা প্রতিষ্ঠান কতটা প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা (marginal revenue productivity) লাভ করিবে। পূর্ব বিনিয়োগের সহিত অতিরিক্ত এক একক কারক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে, উৎপাদন হইতে যে অতিরিক্ত মোট আয় পাওয়া যায়, উহাই **প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা**। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার **প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা = প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ × পণ্যমূল্য** (marginal physical product × price)। ইহার কারণ এই যে, এই অবস্থায় কারকের চাহিদা থাকে নিখুঁত নম্য। এই অবস্থায় কারক বিনিয়োগ করিয়া প্রতিষ্ঠান সাম্য অবস্থায় পৌছিবে তখন, যখন কারকের প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা উহার প্রান্তিক খরচের সমান হয়। সাম্য অবস্থায় কারকের প্রান্তিক খরচ (marginal cost of the factor) আবার কারকের গড়পড়তা খরচের (average cost of the factor) সমান। কারকের গড়পড়তা নীট আয় উৎপাদকতা (average net revenue productivity) কারক মূল্যের সমান। মোট

পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা

আয়কে বিনিয়োগ কৃত কারক একক সংখ্যাদ্বারা ভাগ করিলেই কারকের গড়পড়তা নীট আয় উৎপাদকতা নির্ণয় করা যায়।

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যখন কারক মূল্য স্থির হয়, তখনও প্রতিষ্ঠানের সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয় কারকের প্রান্তক আয় উৎপাদকতার সহিত উহার প্রান্তিক খরচ সমান হইলে। কিন্তু এ অবস্থাতে অনেক পার্থক্যও দ্রষ্টব্য। **প্রথমতঃ,** অনিখুঁত প্রতিযোগিতায় পণ্যের চাহিদা বক্ররেখা সরল না হইয়া ডানদিকে ঢালু হওয়ায় প্রতিষ্ঠানের সামগ্রী যোগান বৃদ্ধির সংগে সংগে পণ্যমূল্যের ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে। এই অবস্থাতে প্রতিষ্ঠান যদি কোন কারকের বিনিয়োগ এক• একক বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে উহার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা বৃদ্ধি পাইবে বটে, কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যতটা বৃদ্ধি পায় ততটা পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারকের প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা = প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ × উৎপন্ন পণ্যের মূল্য। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা নির্ণয করিতে পণ্যমূল্য হ্রাসের (অতিরিক্ত কারক বিনিয়োগ হেতু সামগ্রী যোগান বৃদ্ধির ফলে) দরুণ যে লোকসান হয়, তাহা বাদ দিতে হইবে। ফলে, এই অবস্থায় কারকের **প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা = প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ × উৎপন্ন পণ্য মূল্য – (পণ্য মূল্য হ্রাস হেতু পূর্বেকার দ্রব্য একক বিক্রয় জনিত যে লোকসান পরিমাণ)।**

অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা

দ্বিতীয়তঃ, অপূর্ণাংগ বাজারে কারক বিনিয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি করিলে কারকের প্রান্তিক খরচ নিখুঁত বাজারের ন্যায় এক থাকে না। কারকের গড়পড়তা খরচ অর্থাৎ উহার অর্থমূল্য উহাব প্রান্তিক খরচের চেয়ে কম। আবার, কারকের প্রান্তিক আয় উৎপাদকতাও যে মূল্যে কারকের প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ বিক্রয় হয তাহার চাইতে কম। কারকের গড়পড়তা নীট উৎপাদকতাও এক্ষেত্রে কারক মূল্যের চেয়ে অধিক। অতএব, আমরা মন্তব্য করিতে পারি যে, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় কারক মূল্য উহার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার চেয়ে কম। এইরূপ অবস্থায় প্রতিষ্ঠান পণ্য ও কারক—এই দুই বাজারেই যুগপৎ লাভ করিতে পারে। পণ্য বাজারে লাভ করে পণ্য মূল্য বৃদ্ধি করিয়া, আর কারক বাজারে লাভ করে কারকমূল্য হ্রাস করিয়া কিংবা কারক পরিমাণ কম বিনিয়োগ করিয়া।

আয়-বৈষম্য (Inequality of Incomes): ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থার একটি অন্যতম প্রধান কুফল ইহার আয়-বৈষম্য। এই আয়-বৈষম্যের সাধারণ পরিণাম ও ফলাফল অত্যন্ত ভয়াবহ। ইহা সমাজের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ সৃষ্টি করিয়া ধনীকে আরও অধিক ধনী করে এবং গরীবকে আরও গরীব করে। ধন-বৈষম্যের ফলে উৎপাদনের সম্পদগুলি (resources) কতিপয় ব্যক্তির মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। ভাল জায়গা-জমি ধনীর করতলগত হয়; মূলধন সঞ্চয়ও তাহাদের হাতেই জমে বেশী। ফলে, উৎপাদনের চাবিকাঠিও তাহাদের হাতেই আসিয়া পড়ে। উৎপাদনও হয় প্রধানতঃ মালিক শ্রেণীর মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্য লইয়া। এই ব্যবস্থায় খাদক শ্রেণীর পছন্দক্রম অনুসারে উপযুক্ত পরিমাণ ও প্রমিত গুণসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন হয় না। ফলে সাধারণের জীবন যাত্রার মান নামিযা যায় এবং সামাজিক অসন্তুষ্টি চরমে পৌছে।

ধনতন্ত্রবাদের এই আয় বৈষম্য ঘটে বিভিন্ন কারণের জন্য। মানুষের জন্মগত গুণাবলী ও মস্তিষ্কশক্তি বিভিন্ন। যাহারা জন্মগতভাবে অধিক গুণাবলী বা মস্তিষ্কশক্তির অধিকারী, তাহারা সাধারণতঃ অধিকতর আয় ও সম্পত্তি অর্জন করিতে পারে।

আয় বৈষম্যের কারণ

দ্বিতীয়তঃ, ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় একদিকে যেমন ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারকে স্বীকার করা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি সম্পত্তির উত্তরাধিকার (inheritance) প্রথাও কায়েমী হইয়াছে; ইহার ফলেও ধন বৈষম্য সমস্যা জটিল আকার ধারণ করে। উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক কৃতি পুরুষের গচ্ছিত সম্পত্তি ও ধনদৌলত ভবিষ্যৎ বংশধরের হাতে পড়ে, যাহার জন্য সমাজে ব্যক্তিগত আয়ের তফাৎ হয় আরও প্রকট। **তৃতীয়তঃ,** অনুকূল পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধার তফাতের জন্যও ব্যক্তিগত আয় বৈষম্য উৎকট আকার ধারণ করিতে পারে। যাহারা সাধারণতঃ ধনী কিংবা উত্তরাধিকার সত্ত্বে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের পরিবেশ অনুকূল হওয়ায়, শিক্ষার সুযোগ ও জীবনযুদ্ধে দাঁড়াইবার সুবিধাও বেশী। তাহারা স্বভাবতঃই উচ্চ অর্থ আয় উপার্জন করিয়া থাকে।

আয় বৈষম্যের ভয়াবহ পরিণাম দেখিয়া ও ফলাফলের কথা চিন্তা করিয়া আধুনিক রাষ্ট্রগুলি আয়ের তফাৎ দূর করিবার জন্য রকমারি ব্যবস্থা করিয়া থাকে। ধনিক শ্রেণীর অর্থ আয় হ্রাস করিবার জন্য সরকার সাধারণতঃ কতকগুলি প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিতে পারে। আয়কর, মৃত্যুকর প্রভৃতি

উচ্চ হারে ধার্য করিয়া, সরকার ধনীদের অর্থ আয় ও সম্পত্তির পরিমাণ হ্রাস-দ্বারা সমাজের আয় বৈষম্য দূর করিতে পারে। এই সকল কর হইতে আদায়ীকৃত অর্থআয় সরকারের এমনভাবে ব্যয় করা উচিত যাহাতে উহার সুফল বিশেষভাবে গরীব শ্রেণী ভোগ করিতে পারে। রাষ্ট্র গরীব শ্রেণীর অবস্থা উন্নয়ন কল্পে বৃদ্ধ বয়স্কদের জন্য মাসোহারা ও জীবন বীমার সকল রকম সুবিধা দান এবং অসুস্থ, বেকার প্রভৃতি ব্যক্তির জন্য উপযুক্ত অর্থ সাহায্য ব্যবস্থা করিয়া দেশের ধনবৈষম্য অনেকটা হ্রাস করিতে সাহায্য করিতে পারে। শ্রমিকের নিম্নতম (minimum) বেতন ধার্য করিয়া দিয়া এবং উহারা যাহাতে উপযুক্ত প্রকৃত আয় লাভের পরিপূর্ণ সুযোগ পায়, সেজন্য বিভিন্ন কারখানা-আইন জারী করিয়া, রাষ্ট্র উহাদের আয়-স্তর ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করিতে পারে। ধনিক শ্রেণীর অর্থ আয় যাহাতে অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্য একচেটিয়া কারবার ও উচ্চ মুনাফা শিকার নিয়ন্ত্রণ করাও রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। অনেকে উত্তরাধিকার প্রথাই একেবারে তুলিয়া দিবার পক্ষপাতী। এই বিপ্লবাত্মক সংস্কারের একটি বড় অসুবিধা এই যে, ইহা সম্পদ সঞ্চয়ের পরিপন্থী। সেইজন্য অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মন্তব্য করেন যে, উত্তরাধিকারসূত্রে যে সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়, উহার উপর প্রত্যেকবার হাত বদলাইবার সময় কর চাপাইতে হয় এবং ধীরে ধীরে কতিপয় বংশ পরম্পরা ধরিয়া কর আদায়ের মারফৎ গোটা সম্পত্তি রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া লইতে হয়।

আয় বৈষম্য দূরীকরণের ব্যবস্থা

অনুশীলনী

1. Explain the application of the marginal productivity theory to distribution.

2. Explain fully the assumptions necessary for establishing the marginal productivity theory of factor pricing.
(C.U. B.A. Hons. '54)

3 What are the special features of the pricings of the factors of production ?

4. What are the causes of inequality of incomes ? How would you reduce this inequality ?

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়

খাজনা (Rent)

খাজনার অর্থ কি ? **(Meaning of Rent) :** প্রতিদিনকার কথাবার্তায় 'খাজনা' কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যে কোন স্থায়ী, টেকসই মালের নির্দিষ্ট সময়ে ব্যবহার বাবদ ভাড়া হিসাবে যে অর্থমূল্য দেওয়া হয়, তাহাই খাজনা। এই অর্থে বাড়ীঘর, কলকব্জা, বা যানবাহন প্রভৃতির ভাড়ার মূল্যই খাজনা। সাধারণ কথায়, বসতবাটী বা কারখানা গৃহের ব্যবহার দরুণ যে অর্থমূল্য মালিককে দেওয়া হয়, তাহাকে আমরা খাজনা বলি। কিন্তু আর্থিক খাজনা বলিতে আমরা বুঝি কেবল মাত্র জমি বা প্রাকৃত সম্পদের (natural resources) কৃত্যমূল্য। বসতবাটী বা কারখানা গৃহের ভাড়ার মূল্য আর্থিক খাজনা নয়। কেননা, উহারা মানুষের শ্রমোৎপন্ন সম্পত্তি ; উহাদের ভাড়ার মূল্য উহাদের নির্মাণ বাবদ বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদের মত। কিন্তু স্বয়ংসিদ্ধ দ্রব্য (free goods) ভূমি বা প্রাকৃত সম্পদ মানুষের শ্রম বা মূলধন বিনিয়োগের অপেক্ষা না রাখিয়া উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে। এই উৎপাদন কাজের পুরস্কারস্বরূপ যে অর্থমূল্য ভূমি বা প্রাকৃত সম্পদ লাভ করে তাহার মধ্যে বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ ধরা হয় না ; ইহাই **প্রকৃত নীট্** বা **আর্থিক খাজনা**।

নীট্ বা আর্থিক খাজনার বৈশিষ্ট্য

ভাড়াটিয়া বসতবাটীর ভাড়া বাবদ যে মাসিক অর্থমূল্য গৃহস্বামীকে দিয়া থাকে তাহা প্রকৃত খাজনা (real or economic rent) নয় ; তাহাকে **মোট খাজনা** (gross rent) বলা হয়। এই মোট খাজনার মধ্যে ভূমির কৃত্যমূল্য আর্থিক বা প্রকৃত অথবা নীট খাজনা ভুক্তি ত হয়ই, ইহা ছাড়া, আর অনেক উপাদানও ধরা হয়। মালিক জমিতে গৃহ নির্মাণের বাবদ যে ঝুঁকি গ্রহণ করে, ঐ ঝুঁকির সম্ভাব্য মূল্য ধরা হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** ভূমিতে যে মূলধন বিনিয়োগ করা হয়, তাহার বাবদ সুদ ধরা হয়। **তৃতীয়তঃ,** বাড়ী নির্মাণের তদারক ও দেখাশোনার বাবদ খরচ প্রভৃতিও মোট খাজনা ভুক্ত করা হইয়া থাকে।

প্রকৃত বা নীট খাজনা ও মোট খাজনা

আর্থিক খাজনার বৈশিষ্ট্য আরও সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যদি ইহাকে **চুক্তি খাজনা** **(contract rent)** হইতে পৃথক করা হয়। চুক্তি খাজনা বলিতে

আমরা সেই অর্থমূল্য বুঝি, যাহা প্রজা বা রায়ত ভাড়াটিয়া জমি বা প্রাকৃত সম্পদের কৃত্যমূল্যস্বরূপ মালিককে দিতে অঙ্গীকার করে। এই মূল্য আর্থিক খাজনার সমানও হইতে পারে, কিংবা কম বেশীও হইতে পারে। ভূমির চাহিদার উপরে চুক্তি খাজনার পরিমাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। এই চুক্তি খাজনার মধ্যে ভূমির আসল কৃত্যমূল্য ত ভুক্তি হয়ই, ইহা ছাড়া, ভূমিতে বিনিয়োগকৃত মূলধনের অর্থমূল্য সুদও ধরা হয়। আর্থিক খাজনা বলিতে কিন্তু আমরা তেমন অর্থমূল্য বুঝি না, যাহা এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে দিবে বলিয়া চুক্তি আবদ্ধ হয়।

আর্থিক খাজনা ও চুক্তি খাজনা

কৃষক যদি নিজেই জমির মালিক হয়, তাহা হইলে চুক্তি খাজনার কোন প্রশ্নই উঠে না; তাহার নিজের জমি সে নিজে চাষ করে। কিন্তু এই জমির আর্থিক খাজনা অবশ্য থাকিবে, যদি উহা চাষাবাদ করিয়া গোটা খরচের উপর চাষী একটা উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ করে। আর্থিক খাজনার প্রধান বৈশিষ্ট্য উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ। এই উদ্‌বৃত্ত পাওনা ভূমির উর্বরতা ও অবস্থিতির উপর নির্ভর করে। দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক খাজনা কেবল মাত্র ভূমি ব্যবহারের জন্য যে অর্থ মূল্য দেওয়া হয় তাহাই; ভূমির উপর মূলধন বিনিয়োগ করিলে ঐ মূলধনের আয় বাবদ যে সুদ পাওয়া যায়, তাহা আর্থিক খাজনা ভুক্ত করা হয় না।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব (Ricardian Theory of Rent): খাজনা তত্ত্বের প্রাচীন ও ব্যাপক বিশ্লেষণ আমরা পাই বৃটিশ অর্থবিদ্যাবিদ্ ড্যাভিড্ রিকার্ডোর (David Ricardo) লেখায়। উত্তর কালে অধ্যাপক মার্শাল রিকার্ডোর মতবাদেরই পুনরুল্লেখ করেন। আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের কিছু কিছু অদল বদল করিয়াছেন বটে; কিন্তু মূলতঃ, খাজনা সম্পর্কে তাহার ব্যাখ্যান ও মতবাদ অস্বীকার করা চলে না।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, যে সকল অনুমানের (assumptions) উপর ভিত্তি করিয়া উহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা জানা প্রয়োজন। ভূমি যোগানের যে সকল বৈশিষ্ট্য আছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি খাজনা সম্পর্কে আলোচনা ও নিজ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। **প্রথমতঃ,** তিনি কল্পনা করিয়াছেন, ভূমির যোগান সীমিত এবং উহার কোন যোগানমূল্য নাই। **দ্বিতীয়তঃ,** অনুমান করা হইয়াছে যে, উৎপাদকতার দিক হইতে সকল জমি সমপর্যায়ের নয়। **তৃতীয়তঃ,** ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, ভূমিতে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি বিশেষভাবে প্রযোজ্য। **চতুর্থতঃ,**

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অনুমান

রিকার্ডোর তত্ত্ব আরও অনুমান করে যে, যাহারা ভূমি চাষাবাদ করে তাহাদের মধ্যে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান।

উপরি উক্ত অনুমানগুলিকে ভিত্তি করিয়া রিকার্ডো খাজনার এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন যে, ইহা ভূমির উৎপত্তির সেই অংশ যাহা জমির মূল ও অবিনাশী শক্তির জন্য ভূস্বামীর প্রাপ্য। তাঁহার নিজের কথায়: Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil.

খাজনাকে রিকার্ডো **উৎপাদকের উদ্বৃত্ত** (producer's surplus) **আয়** বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই উদ্বৃত্ত লাভ তখনই সম্ভব হয়, যখন পণ্য মূল্যের চেয়ে পণ্য উৎপাদন খরচ হয় কম। খাজনা হইল অনুপার্জিত আয়, যাহা ভোগ করিবার জন্য ভূস্বামী কিছুই বিনিয়োগ করে না। খাজনা যদি নাও পাওয়া যায়, তাহা হইলেও ভূমির যোগান বন্ধ হয় না। এই অর্থে জমির যোগান-মূল্য শূন্য; যদি কোন ভূমিখণ্ড কিছুমাত্র আয় লাভ করে, উহাই উৎপাদকের উদ্বৃত্ত আয়, উহাই আর্থিক খাজনা।

খাজনা উৎপত্তির কারণ

আর্থিক খাজনার উৎপত্তি ব্যাখ্যান করিতে রিকার্ডো নূতন এবং একদম বসতিহীন ভূমির উদাহরণ দিয়াছেন। নূতন, বসতিহীন দেশে যখন প্রথম বসতি ও চাষাবাদ স্থরু হয়, তখন কৃষিকার্যের জন্য উর্বর ও সু-অবস্থিত প্রথম পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট ভূমির যোগান অভাব হয় না। এই অবস্থাতে ভূমির চাষাবাদ এতটা পর্যন্ত চলে যে, বাজার মূল্য ও পণ্যের উৎপাদন খরচ সমান হয়। এ ক্ষেত্রে পণ্যমূল্য ও উৎপাদন খরচের কোন তারতম্য না থাকায় উৎপাদকের উদ্বৃত্ত লাভ সম্ভব হয় না—ভূমির আর্থিক খাজনাও মেলে না। কিন্তু যদি লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং প্রথম পর্যায়ের সর্বোৎকৃষ্ট **'ক'** শ্রেণীর মোট জমি আবাদ হইয়া যায়, তাহা হইলে লোকে হয় নিকৃষ্টতর **'খ'** শ্রেণীর জমি চাষাবাদ করিবে অর্থাৎ ব্যাপক কৃষিকার্য (extensive cultivation) আরম্ভ করিবে; নতুবা **'ক'** শ্রেণীর জমিতেই আত্যন্তিক চাষ (intensive cultivation) চালাইবে। এই দুই বিকল্প প্রক্রিয়ার ফলাফল একই হইবে। **'খ'** শ্রেণীর জমিতে যদি একই পরিমাণ শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে **'ক'** শ্রেণীর জমির আগমের তুলনায় **'খ'** শ্রেণীর জমিতে অপেক্ষাকৃত

কম আগম লাভ হইবে। আবার 'ক' শ্রেণীর জমিতে যদি শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগের একক বৃদ্ধি করা যায়, তাহা হইলে জমির আগম প্রথম একক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগদ্বারা যে পরিমাণ আগম লাভ হইয়াছে, তাহার অনুপাতে অপেক্ষাকৃত কম হইবে। অর্থাৎ ব্যাপক কৃষিকার্য হউক কিংবা আত্যন্তিক চাষাবাদই হউক, জমিতে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধি প্রয়োগ হইবেই। মনে কর, দুইখণ্ড বিভিন্ন উর্বরাশক্তিসম্পন্ন জমি 'ক' ও 'খ' প্রত্যেকে ৩০ মণ কবিয়া গম উৎপন্ন করে। 'ক' শ্রেণী জমির মণ প্রতি উৎপাদন খরচ ১০৲; 'খ' শ্রেণী জমির মণ প্রতি উৎপাদন খরচ ১৫৲। যখন গমের বাজার মূল্য মণ প্রতি ১০৲ তখন 'ক' শ্রেণীর জমি কোন খাজনা পাইবে না ; কেননা, এক্ষেত্রে জমির মোট উৎপাদন খরচ ও মোট বিক্রয় মূল্য সমান। কিন্তু যদি গমের চাহিদা বৃদ্ধি পায় ও উহার বাজার মূল্য চড়িয়া মণ প্রতি ১৫৲ হয়, তাহা হইলে 'খ' শ্রেণীর জমিরও চাষাবাদ হইবে ; এবং 'ক' শ্রেণীর জমি উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয়স্বরূপ খাজনা লাভ করিবে। 'ক' শ্রেণী জমির মোট উৎপাদন খরচ ৩০০৲ (১০৲ × ৩০) টাকাই থাকিবে, কিন্তু বাজার মূল্য ১৫৲ মণ হওয়ায়, মোট বিক্রয় আয় হইবে (১৫৲ × ৩০) = ৪৫০৲ টাকা। 'ক' শ্রেণীর ভূমি ১৫০৲ টাকার উদ্‌বৃত্ত আয় অর্থাৎ আর্থিক খাজনা লাভ করিবে। গমের চাহিদা বৃদ্ধি পাইলে, লোকে আত্যন্তিক চাষকার্যও করিতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রেও ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ হেতু উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত লাভ ঘটিবে ; মনে কর শ্রম ও মূলধন বাবদ প্রথমবার জমিতে ১০৲ পরিমাণ বিনিয়োগ করা গেল, এবং ঐ বিনিযোগের ফলে গমের আগম হইল ১ মণ। ঐ জমিতে আর ১ মণ আগম বৃদ্ধি করিতে আরও ১৫৲ পরিমাণ বিনিয়োগের প্রয়োজন। যদি গমের বাজার মূল্য ১০৲ হইতে ১৫৲ হয় তাহা হইলেই দ্বিতীয়বার বিনিয়োগ করা সম্ভব। দ্বিতীয়বার জমির এই বিনিয়োগ হইলে প্রথমবারের (১০৲ টাকার) বিনিয়োগ হইতে ৫৲ টাকা উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ হইবে—উহাই এ ক্ষেত্রে আর্থিক খাজনা।

রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় হিসাবে বুঝিতে গেলে **'প্রান্তিক জমির'** (marginal land) ধারণাটি সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে হইবে।

খাজনা ও প্রান্তিক জমি

প্রান্তিক জমির পণ্যমূল্য ও উৎপাদন খরচ পরস্পর সমান। এই জমিতে চাষাবাদ করিয়া কোন উদ্‌বৃত্ত লাভ হয় না। প্রান্তিক জমির খাজনা নাই (no-rent land)। প্রান্তিক জমির চাইতে উৎকৃষ্টতর জমি কেবল আর্থিক খাজনা লাভ করে। প্রান্তিক

উত্তমতর জমি (super-marginal) ও প্রান্তিক জমির অর্থ আয়ের মধ্যে যে তফাৎ তাহাই আর্থিক খাজনা (Rent is the difference between incomes of the super-marginal land and marginal land)। প্রান্তিক-উত্তমতর ও প্রান্তিক জমির আয়ের এই তফাৎ জমির উর্বরতার কিংবা অনুকূল অবস্থিতির উপরে নির্ভর করে।

রিকার্ডোর মতানুযায়ী, খাজনাকে উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাঁহার খাজনা তত্ত্বের এই অনুসিদ্ধান্ত (corollary) গ্রহণ করা যায় যে, খাজনা পণ্যমূল্য ভুক্তি হয় না। খাজনা জমির উদ্‌বৃত্ত আয়। জমির যোগান

খাজনা পণ্যমূল্য ভুক্তি হয় না।

স্থির ও অনম্য, খাজনা জমির উৎপন্ন পণ্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি করিতে পারে না। অপরপক্ষে, কৃষি পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হয় প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচদ্বারা। কিন্তু, প্রান্তিক জমি কোন খাজনা পায় না। সুতরাং প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচের মধ্যে জমির খাজনা ভুক্তি হয় না ; ফলে, খাজনা পণ্যমূল্যের উপাদানও নয়। খাজনা যদি উচ্চ হয়, তাহা হইলে পণ্য মূল্য উচ্চ হইবে না ; পণ্যমূল্য উচ্চ হইলেই খাজনা বাড়িয়া যাইবে। রিকার্ডোর মতানুযায়ী 'খাজনাই পণ্যমূল্যদ্বারা নির্ধারিত হয়, পণ্যমূল্য নিরূপণে খাজনা কোন অংশ গ্রহণ করে না।' Rent is price determined and not price determining.

মনে প্রশ্ন জাগিতে পারে যে, যদি সকল জমিই সমান উর্বর হয়, তাহা হইলে জমির খাজনা লাভ সম্ভব হইবে কিনা। সকল জমি সমান উর্বর হইলে, জমির

সকল জমি সমান উর্বর হইলে খাজনা লাভ হইবে কি ?

তারতম্য ও উৎপাদন খরচের পার্থক্য নির্দেশ করা কঠিন। কিন্তু জমিতে যদি আত্যন্তিক চাষাবাদ হয়, তাহা হইলে উৎপাদন খরচের পার্থক্য দেখা যায় এবং তাহা হইলে সমান উর্বর জমির বেলাতেও খাজনা লাভ সম্ভব হয়। আত্যন্তিক চাষের ফলে জমিতে ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ হইবে। জমিতে শ্রম ও মূলধনের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে উৎপাদন কার্য এক সময় এমন অবস্থায় পৌঁছিবে, যখন চাষের খরচ ও পণ্যমূল্য সমান হইবে। এই স্তরের বিনিয়োগ চাষীর প্রান্তিক বিনিয়োগ—এই বিনিয়োগের দ্বারা জমির কোন উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ হইবে না। ইহার আগেকার বিভিন্ন বিনিয়োগ হইতে জমির উদ্‌বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ হইবে ; কেননা, সেই সকল বিনিয়োগে উৎপাদন খরচের চেয়ে পণ্যমূল্য অধিক হইবে। দ্বিতীয়তঃ; অবস্থানের তারতম্যের জন্য চাহিদার

অনুরূপ জমির যোগান দুষ্প্রাপ্যতা হেতু অনেক সময় সম উর্বর জমির বেলাতেও উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত লাভ ঘটিতে পারে।

রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা (Criticism of Ricardian Theory of Rent): রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বকে কেন্দ্র করিয়া অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে।

প্রথমতঃ, খাজনা মাটির আদিম ও অবিনাশী শক্তির অর্থ মূল্য, রিকার্ডোর-এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে স্বীকার করা যায় না। মাটির শক্তি সম্পূর্ণ আদিম ও অবিনাশী নয়। মাটির আদিম শক্তি কতটা, আর কতটা উপার্জিত শক্তি, তাহা পৃথক করা সহজ নহে; বিশেষতঃ, প্রাচীন দেশে ত নয়ই। তাহা ছাড়া, উপর্যুপরি কৃষিকার্যের ফলে মাটির আদিম শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জমির খাজনা শুধু মাটির আদিম শক্তির অর্থমূল্যাই নয়, উহা জমির অবস্থিতি, পণ্য পরিবহন খরচ ইত্যাদির উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে।

দ্বিতীয়তঃ, মার্কিন অর্থশাস্ত্রীগণ, বিশেষ করিয়া ক্যারে (Carey), রিকার্ডো চাষাবাদের যে ঐতিহাসিক ধারা (historical order of cultivation) নির্দেশ করিয়াছেন, তাহাও অস্বীকার করেন। রিকার্ডোর অভিমত এই যে, উর্বরতম জমিই সর্বপ্রথম চাষাবাদ হয়, তাহার পর যথাক্রমে দ্বিতীয় শ্রেণী, তৃতীয় শ্রেণী, চতুর্থ শ্রেণীর জমি চাষকার্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, চাষ কার্যের এই ঐতিহাসিক ধারা সত্য নহে। চাষাবাদের ধারা শুধু জমির উর্বরতাদ্বারা নির্ধারিত হয় না, জমির অনুকূল অবস্থানের উপরও উহা বিশেষভাবে নির্ভর করে।

তৃতীয়তঃ, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অনুসিদ্ধান্ত এই যে, খাজনা পণ্যমূল্য ভুক্ত হয় না, সামাজিক দিক হইতে ইহা সত্য; কিন্তু ব্যক্তি বিশেষের দিক হইতে ঠিক নহে। সমাজের দিক হইতে দেখিতে গেলে, জমির কোন যোগান মূল্য নাই, ইহার যোগান অনম্য। সামগ্রিকভাবে জমির মোট যোগান যখন সমাজের, তখন জমি বাবদ কোন বিনিয়োগ খরচ নাই। সুতরাং জমি খাজনারূপে যে অর্থ আয় লাভ করে, উহাই উদ্‌বৃত্ত লাভ; এই উদ্‌বৃত্তলাভ উৎপাদন খরচ ভুক্ত কিংবা পণ্য মূল্য ভুক্ত হয় না। কিন্তু ব্যক্তি বিশেষ যখন উৎপাদনে জমি বিনিয়োগ করে, তখন অন্যান্য খরচের মত জমির খাজনাও তাহাকে উৎপাদন খরচের মধ্যে ধরিতে হয়। এক্ষেত্রে জমির খাজনা পণ্যমূল্য ভুক্ত হয়।

রিকার্ডোর অনুসিদ্ধান্তটি সত্য হয় তখন, যখন আমরা অনুমান করি যে একখণ্ড জমি কেবল মাত্র এক রকম শস্য উৎপাদনেই ব্যবহৃত হইতে পারে। একখণ্ড জমির বাস্তবতঃ যে বিকল্প ব্যবহার (alternative uses) থাকিতে পারে, এই সত্য যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহা হইলে খাজনা উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় বিশেষ নহে; উহা উৎপাদন খরচ ও পণ্যমূল্যের অংশ বিশেষ।

পরিশেষে, প্রান্তিক জমিরও খাজনা লাভ হইতে পারে, যদি অবশ্য পণ্য চাহিদার প্রবল তাগিদে ঐ জমিতে আত্যন্তিক চাষাবাদ হয়। ধরা যাক্, কোন প্রান্তিক জমিতে ১০৲ টাকা বিনিয়োগ করিয়া ১ মণ গম উৎপাদন করা হইল। গমের বাজার মূল্য যদি মণ প্রতি ১০৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ঐ জমির কোন খাজনা লাভ হইবে না। কিন্তু গমের চাহিদা যদি বৃদ্ধি পায় ও উহার বাজার মূল্য মণ প্রতি ১৫৲ টাকা হয়, তাহা হইলে ঐ প্রান্তিক জমিতে আত্যন্তিক চাষকার্য হইবে। দ্বিতীয় মণ গম উৎপাদনের জন্য ঐ জমিতে ১৫৲ বিনিয়োগ করা হইল। এক্ষেত্রে ঐ জমির প্রথম বিনিয়োগ হইতে ৫৲ টাকা খাজনা বা উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ হইবে।

খাজনা তত্ত্ব ব্যাখ্যানে অধ্যাপক মার্শালের মতামত (Marshall's Analysis of Rent): অধ্যাপক মার্শাল চাহিদা ও যোগানের সাধারণ নিয়ম প্রয়োগদ্বারা জমির আয় ব্যাখ্যান করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন ভূমি খণ্ডের খাজনা নির্ভর করে উহার উৎপাদকতার পরিমাণ ও চাষাবাদের প্রান্তিক অবস্থার উপর। উহারা উভয়ে আবার নির্ভর করে জমির চাহিদা ও যোগানের সাধারণ অবস্থার উপর। জমির চাহিদা আবার নির্ধারিত হয় দেশের জনসংখ্যা ও তাহাদের অর্থ আয়দ্বারা। জমির যোগান নির্ভর করে, চাষের উপযুক্ত জমির অবস্থিতি ও আনুসঙ্গিক শ্রম ও মূলধন বিনিয়োগ পরিমাণদ্বারা। মার্শালের মন্তব্য এই যে, "The cost of production, eagerness of demand, margin of production and price of the produce mutually govern one another. The theory of rent of land is no isolated economic doctrine but merely one of the chief applications of particular corollary from the general theory of demand and supply."

দুষ্প্রাপ্য খাজনা (Scarcity Rent)

জমির মূল্যরূপে খাজনা চাহিদা ও যোগানদ্বারা কেমন করিয়া নির্ধারিত হয়, তাহা নিম্নের চিত্রাংকনদ্বারা প্রদর্শিত হইল।
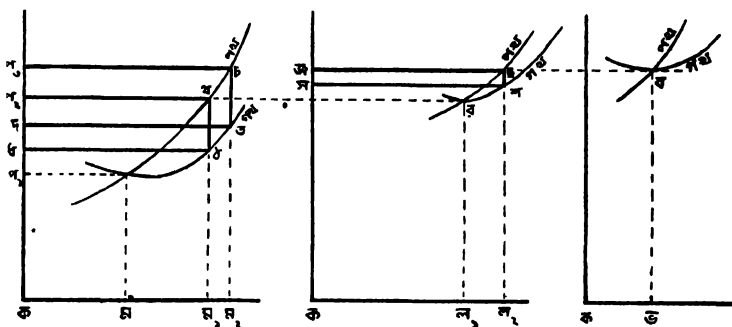
'ক' শ্রেণীর জমি 'খ' শ্রেণীর জমি 'গ' শ্রেণীর জমি

৪৬শ চিত্র

অনুমান করা যাক্, তিনখণ্ড বিভিন্ন শ্রেণীর জমি একই শস্য গম উৎপাদন করে। **'ক'** শ্রেণীর জমিখানি উৎপাদকতার দিক দিয়া সর্বোত্তম; **'খ'** শ্রেণীর জমি তাহার চেয়ে নিকৃষ্ট। আর **'গ'** শ্রেণীর জমি সর্বনিকৃষ্ট। প্রত্যেকটি চিত্রে **গ খ ও প খ** যথাক্রমে দীর্ঘকালীন গড়পড়তা খরচ ও প্রান্তিক খরচের রেখা ইংগিত করিতেছে। এই গড়পড়তা ও প্রান্তিক খরচের মধ্যে অবশ্য খাজনা ভুক্ত হয় নাই। মনে কর, দেশের লোক সংখ্যা যদি কম হয় ও কৃষি পণ্য চাহিদাও কম হয়, তাহা হইলে শুধু **'ক'** শ্রেণীর জমির চাষাবাদ হইল। এই জমি যখন **ক ম** পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করে, তখন ইহার প্রান্তিক ও গড়পড়তা খরচ সমান হয়; এবং উহারা উভয়ে পণ্য মূল্য **কপ১**এর সমানও বটে। এই জমি কোন খাজনা লাভ করিবে না।

এখন যদি লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পায় ও তাহার ফলে লোকের কৃষি পণ্য চাহিদাও বাড়ে, তাহা হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। মনে কর, পণ্যমূল্য বাড়িয়া **কপ২** হইল। ইহাতে **'ক'** শ্রেণীর জমিখণ্ডের আত্যন্তিক চাষাবাদ হইবে। **কপ২** মূল্যে ঐ জমি হইতে **কম১** পরিমাণ পণ্য যোগান হইবে এবং যোগানের এই স্তরে জমির প্রান্তিক খরচ ও প্রান্তিক আয় সমান হইবে। এই আত্যন্তিক চাষের ফলে জমির প্রান্তিক খরচ **থম১**, জমির গড়পড়তা খরচ **ঠম১**এর চেয়ে অধিক হইল; অতএব এই ভূমি খণ্ডের মোট খাজনা **থ ঠ ধ প২** ক্ষেত্র পরিমাণ হইবে। কৃষি পণ্যের চাহিদা ও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সংগে **'খ'** শ্রেণীর ভূমিখণ্ড চাষাবাদে

বিনিয়োগ হইবে। এই ভূমি **কল১** পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে **রল১** গড়পড়তা খরচে। গড়পড়তা খরচ **রল১** পণ্যমূল্য **কপ২**র সহিত সমান হওয়ায় এই ভূমি প্রান্তিক ভূমি হইবে ও কোন খাজনা লাভ করিবে না।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া পণ্য মূল্য যদি **কপ৩** হয়, তাহা হইলে **১ম** শ্রেণীর ভূমি **কম২** পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করিবে। প্রান্তিক খরচ **চ ম২** ও গড়পড়তা খরচ **ত ম২** এর মধ্যে পার্থক্য আরও বৃদ্ধি পাইবে ; ফলে, **১ম** শ্রেণীর ভূমির মোট খাজনা বাড়িয়া হইবে **চ ত দ প৩** ক্ষেত্র পরিমাণ। **২য়** শ্রেণীর ভূমিরও আত্যন্তিক চাষ হওয়ার ফলে, **কল২** পরিমাণ পণ্য উৎপন্ন হইবে ও গড়পড়তা খরচ পড়িবে **শল২**। এই ভূমিতে মোট খাজনা লাভ হইবে **ছ শ স জ** ক্ষেত্র পরিমাণ। এই অবস্থাতে **৩য়** শ্রেণীর ভূমি চাষাবাদ করা লাভ জনক ; কেননা, ইহার গড়পড়তা খরচ পণ্য মূল্যের সমান ; ইহা প্রান্তিক ভূমি বলিয়া খাজনা পাইবে না।

খাজনা তত্ত্বের আধুনিক ব্যাখ্যান (Modern Analysis of Rent) : যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া রিকার্ডোর খাজনাতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ তাহা অবাস্তব বলিয়া নির্দেশ করেন। খাজনাতত্ত্ব বিশ্লেষণে ভূমিকে উর্বরতার তারতম্যানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করার কোনই প্রয়োজন নাই। রিকার্ডো খাজনাকে উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় বলিয়া যে মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা শুধু বিভিন্ন জমির খাজনার হারের তারতম্য হয় কেন, তাহাই নির্দেশ করিতে পারে, খাজনার উদ্ভব হয় কেন, তাহার ব্যাখ্যান করিতে পারে না। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, খাজনা উদ্ভবের মূল কারণ ভূমির যোগানের দুষ্প্রাপ্যতা চাহিদার অনুপাতে ভূমির যোগান সীমিত। ইহাদের মতে জমির সকল খাজনাই **দুষ্প্রাপ্যতা-খাজনা (scarcity rent)**। দেশের সকল জমি একই রকম উর্বর হইলেও, চাহিদার অনুপাতে যোগান টান হইলেই, উহারা খাজনা লাভ করিবে। বস্তুতঃ, জমির দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই উহার উর্বরতার তারতম্য, ক্রম হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ প্রভৃতি দেখা যায়। রিকার্ডোর উদ্‌বৃত্ত আয় কিংবা বৈষম্য-খাজনা (differential rent) দুষ্প্রাপ্যতা-খাজনা হইতে পৃথক নয়। খাজনার এই আধুনিক বিশ্লেষণ যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ইহা অন্যান্য কারকের অর্থমূল্যের মতই ; ইহা বিশেষ ধরণের অর্থ আয় নয়।

দুষ্প্রাপ্যতা খাজনা

দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্ব ব্যাখ্যানে এক খণ্ড জমির যে একমাত্র ব্যবহারই সম্ভব হইতে পারে এবং প্রান্তিক জমির যে খাজনা নাই অনুমান করা হয়, তাহার গুরুত্বও আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ দিতে চাহেন না। আধুনিক জগতে একখণ্ড ভূমির বহু বিকল্প ব্যবহার বা বিনিয়োগ সম্ভব। যে জমিতে ধান্য উৎপাদন করা যায়, সে জমি আবার পাট উৎপাদন করিতেও নিযুক্ত করা যাইতে পারে। এক খণ্ড জমির বিকল্প ব্যবহার থাকার দরুণ এক ব্যবহারে যে জমি প্রান্তিক হয়, অন্য ব্যবহারে উহা প্রান্তিক-উত্তম (super-marginal) হইতে পারে। জমির একমাত্র ব্যবহার, কিংবা খাজনাবিহীন প্রান্তিক জমির ধারণা,—যাহার উপর ভিত্তি করিয়া রিকার্ডো খাজনাকে উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, উহা খাজনা তত্ত্বের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান নয়। খাজনার প্রকৃত ব্যাখ্যান করিতে হইবে জমির যোগান দুষ্প্রাপ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে। জমির দুষ্প্রাপ্যতাই উহার উৎপাদকতা নির্দেশ করে। খাজনা জমির প্রান্তিক উৎপাদকতার অর্থমূল্য।

খাজনা ও পণ্যমূল্যের সম্বন্ধ (Relation between Rent and Price) : রিকার্ডোর খাজনা তত্ত্বের অন্তসিদ্ধান্ত হিসাবে আমরা দেখিয়াছি যে, খাজনা উৎপাদন খরচের কোন অংশ বা উপাদান নয়, উহা পণ্যমূল্যের মধ্যেও প্রবেশ করে না। পণ্যমূল্য প্রান্তিক জমির উৎপাদন খরচের সমান। কিন্তু প্রান্তিক জমি কোন খাজনা লাভ করে না। খাজনা উৎপাদকের ভোগোদ্‌বৃত্ত আয় হিসাবে উৎপাদন খরচ তথা পণ্যমূল্যের উপাদান নয়। জমির উচ্চ খাজনা পণ্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ নয় ; অপর পক্ষে, উচ্চ পণ্যমূল্যই খাজনা বৃদ্ধির কারণ। "Corn is not high because a rent is paid, but rent is paid because corn is high."

সমাজের দিক হইতে মোট জমির যোগানের কথা ভাবিলে, রিকার্ডো খাজনা ও পণ্যমূল্যের যে সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। মোট জমি যখন প্রকৃতির দান, তখন উহার যোগানের জন্য সমাজের কাহাকেও অপযোগ বা দুঃখ ভোগ করিতে হয় না, কিংবা কিছু ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না। বাজার মূল্য বা খাজনা না পাইলেও, সমাজের দিক হইতে জমির যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। সেইজন্য জমির যোগান মূল্য নাই। জমি খাজনারূপে যে অর্থ আয় লাভ করে, তাহা উৎপাদন খরচের অংশ নয়, তাহা উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয়।

কিন্তু, যদি একজন উৎপাদক বা একটি প্রতিষ্ঠানের দিক হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কিন্তু খাজনা উৎপাদন খরচেরই অংশ বিশেষ, এবং সেই হেতু পণ্য মূল্যের মধ্যে প্রবেশও করে। "A shopkeeper in a fashionable street charges high prices for his goods, because he has to pay high rent for his premises." পণ্যের বাজার মুল্য যোগানের দিক হইতে উৎপাদন খরচদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইলে, বাজার মূল্যও চড়া হয়, যদি অবশ্য অন্য সকল বিষয়ে কোন পরিবর্তন না হয়। উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি যে কোন কারক বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি হেতু ঘটিতে পারে। কোন বিক্রেতা কিংবা প্রতিষ্ঠানকে যদি ভূমি বিনিয়োগের দরুণ বেশী খাজনা দিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের খরচ বাড়িবে, পণ্যও চড়া মূল্যে বিক্রয় করিতে হইবে।

খাজনার আধুনিক ব্যাখ্যান আমরা যদি গ্রহণ করি, তাহা হইলেও খাজনাকে উৎপাদন খরচের উপাদান হিসাবে ধরা যায়, তথা পণ্যমূল্য ভুক্ত করা যায়। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ খাজনাকে **হস্তান্তর অর্থ আয়ের** (**transfer earnings**) পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে কোন ভূমিখণ্ডেরই কেবল মাত্র একক বিশেষনির্দিষ্ট (specific) ব্যবহার থাকিতে পারে না। যে ভূমিতে ধান্য রোপণ চলে, সেই ভূমিতে পাট উৎপাদনও চলিতে পারে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের বহু বিকল্প ব্যবহার আছে (alternative uses)। কোন শস্য, বা শিল্প উৎপাদনে ভূমি নিযুক্ত হইলে, উহার দরুণ যে ব্যয় হইবে তাহা নির্ভর করিবে ঐ জমি বিকল্প শস্য বা শিল্প উৎপাদনে কি অর্থমূল্য (খাজনা) পাইত, অর্থাৎ উহার সুযোগ খরচ বা হস্তান্তর খরচ কি হইত, তাহার উপর। যে ভূমিকে ধান্যোৎপাদনে নিযুক্ত করা হইয়াছে, উহা যদি পাট উৎপাদনে নিয়োগ হইয়া বেশী অর্থমূল্য লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে ঐ ভূমি ধান্য রোপণে নিযুক্ত না হইয়া পাট উৎপাদনেই নিযুক্ত হইবে। বিকল্প উৎপাদনে উচ্চতর অর্থ আয় লাভের আশায়ই জমির শস্যান্তর উৎপাদন কিংবা শিল্পান্তরে নিযুক্ত হওয়ার কারণ। কোন শস্য উৎপাদনে বা শিল্পে জমির হস্তান্তর অর্থ আয় হইবে সেই খরচ যাহাদ্বারা জমি ঐ শস্য চাষে বা শিল্প বিনিয়োগেই নিযুক্ত হইয়া থাকে —অন্য শস্য চাষাবাদে বা শিল্পান্তরে নিযুক্ত হয় না। বেন্‌হামের (Benham) কথায়: " The amount of money which any particular unit could earn in its best paid alternative use is sometimes called its transfer earnings." শ্রীমতী রবীন্‌সন্

হস্তান্তর অর্থ আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে খাজনা

(Mrs. Robinson) বলেন : "The price which is necessary to retain a given unit of a factor in a certain industry may be called its transfer earnings or transfer price, since reduction of the payment made for it below this price, would cause it to be transferred elsewhere." জমির হস্তান্তর অর্থ আয় উৎপাদন খরচের অংশ বিশেষ—উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় নহে। হস্তান্তর অর্থ আয়ের চেয়ে জমির বাস্তব আয় যদি বেশী হয়, তাহা হইলেই উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত লাভ ঘটিতে পারে। "In general, the excess of what any unit gets over its transfer earnings is of the nature of rent."

সহুরে জমির খাজনা (Urban Site Rent) : সহুরে জমির খাজনা প্রায়ই নির্ভর করে বিভিন্ন জমির আপেক্ষিক অনুকূল অবস্থিতির উপর। এই খাজনাকে সেই জন্য **অবস্থিতি খাজনা** (Situation Rent) বলা হয়। চাষাবাদের জমির খাজনার মত অবস্থিতি খাজনাও উৎপাদকের উদবৃত্ত আয়। কোন জমির অবস্থান অন্য জমির তুলনায় অধিক অনুকূল হওয়ায়, এই উদবৃত্ত আয় লাভ হয়। সহরের জমি, হয় বাসগৃহ নির্মাণ কবিয়া ভাড়া খাটান হয়, বা কারখানা, দোকানঘর হিসাবে ভাড়া দেওয়া হয়। যে সকল জমিতে বাসগৃহ নির্মাণ করিয়া ভাড়া খাটান হয়,উহাদের অবস্থিতির সুযোগ সুবিধার মধ্যে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করা হয—কাছাকাছি খোলা মাঠ বা পার্ক আছে কিনা, স্কুল, কলেজ, বাজার, রেল স্টেসন কাছাকাছি কিনা, স্বাস্থ্যকর ও রুচি সম্পন্ন পরিবেশ কিনা, যাতায়াতের ও পরিবহনের সুযোগ সুবিধা আছে কিনা, ইত্যাদি। অপরপক্ষে, সহরের জমিতে যখন বাড়ী নির্মাণ করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের জন্য দোকান ঘর ভাড়া দেওযা হয়, কিংবা কারখানা গৃহ হিসাবে ইজারা দেওয়া হয়, তখন প্রধান ধর্তব্যের বিষয় হয়, কোন্ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে বা কোন্ বিশেষ শিল্পোৎপাদনের জন্য গৃহ ভাড়া দেওয়া হইবে, উহাদের কি ধরণের গৃহ চাই ইত্যাদি।

অবস্থিতি খাজনা

চাষাবাদের জমিতে যেমন ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ হয়, সহুরে জমির বিনিয়োগেও ঐ বিধি একই রকমে প্রযোজ্য। ঐ বিধির প্রয়োগের ফলে সহুরে জমিতেও ব্যাপক ও আত্যন্তিক (extensive and intensive) বিনিয়োগের প্রান্তিক অবস্থা নির্ণয় করা যায়। সহরের কোন বাড়ীর বিভিন্ন তলার (storey) একই খাজনা বা কর হইতে পারে না। বিনিয়োগ বৃদ্ধি

দ্বারা তলার উপর তলা বাড়াইয়া যদি গৃহ নির্মাণ করা যায়, তাহা হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন আর একতলা অতিরিক্ত বৃদ্ধি করিলে উহার যাহা ভাড়া পাওয়া যাইবে, তাহা ঐ তলার নির্মাণ খরচের সমান। এই প্রান্তিক তলা নির্মাণ করিয়া গৃহস্বামী কোন উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ করিবে না। প্রান্তিক-উত্তম তলাগুলির ভাড়া ও প্রান্তিক তলার ভাড়ার যে তফাৎ তাহাই গৃহস্বামীর খাজনা।

ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, সহুরে জমির অনেক সময় **অনুপার্জিত মূল্য বৃদ্ধি** (**Unearned Increment**) হইয়া থাকে। সহরের সাধারণ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দরুণ, জমির বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায় ; ফলে, খাজনার হারও চড়া হয়। জমির মূল্য বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত আয় গৃহস্বামী লাভ করে, উহা তাহার নিজের প্রচেষ্টা ও শ্রমোপার্জিত নয়। জমির এই অতিরিক্ত আয়কে অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি বলে। চাষের জমির বেলায়ও অনেক সময় এই অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। যদি কোন সহরের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়, তাহা হইলে উহার উপকণ্ঠে চাষাবাদের জমিরও মূল্য বৃদ্ধি পাইবে ; ফলে, ঐ সকল জমির মালিক অতিরিক্ত আয় লাভ করিবে।

অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধি

সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীগণ দাবী করেন যে, জমির এই অনুপার্জিত মূল্যবৃদ্ধির উপর করভার চাপান একান্ত প্রয়োজন। যেহেতু, জমির এই ধরণের অতিরিক্ত আয় লাভ সমাজ উন্নয়নের ফল স্বরূপ এবং কোন ব্যক্তিগত শ্রমোপার্জিত নয়, সেইহেতু, ইহা একান্ত:যুক্তিযুক্ত যে, সরকার ঐ অর্জিত আয়ের খানিকটা অবশ্য কররূপে আদায় করিয়া লইবে।

খনির খাজনা (Rent of Mines) : খনিজ সম্পদ ব্যবহারের জন্য মালিক ইজারাদারের নিকট হইতে অর্থ আয় পাইয়া থাকে। অধ্যাপক মার্শালের মতে, এই ধরণের মোট প্রাপ্য আয় আর্থিক খাজনা নয়। ইজারাদার আর্থিক খাজনা ছাড়াও, খনির মালিককে খনিজ সম্পদ ক্ষয়প্রাপ্তির ক্ষতিপূরণস্বরূপ অতিরিক্ত মূল্য দিয়া থাকে। এই অতিরিক্ত মূল্যকে রয়্যালটি (royalty) বলা হয়। রয়্যালটি সকল ইজরাদারকেই দিতে হয়—নিকৃষ্টতম খনি ব্যবহারের জন্যও ইহা না দিয়া উপায় নাই। কিন্তু আর্থিক খাজনা লাভ করিতে পারে শুধু প্রান্তিক খনির চাইতে উৎকৃষ্টতর খনিগুলি।

অধ্যাপক টসিগ্ কিন্তু খনির খাজনা ও রয়্যালটির মধ্যে কোনই তফাৎ করেন নাই। তিনি রয়্যালটিকে খাজনার অংশ বিশেষ বলিয়াই মনে করেন। নিকৃষ্টতম খনি ব্যবহারের ক্ষতিপূরণ হিসাবেও যে ইজারাদারকে রয়্যালটি দিতে

হইবে, তাহা তিনি অস্বীকার করেন। নিকৃষ্টতম খনির কোন খাজনা বা রয়্যালটি দিতে হয় না; কেননা, ঐ ধরণের খনিগুলি প্রান্তিক বিনিয়োগের অবস্থায় থাকে ও কোন উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ করিতে পারে না।

আর্থিক উন্নতি ও খাজনা (Economic Progress and Rent): দেশের আর্থিক উন্নতির সংগে সংগে খাজনাস্তর বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস পায়, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আর্থিক উন্নতি বলিতে কি বুঝায়, তাহা এক কথায় বুঝান মুস্কিল। কতকগুলি বিশেষ সংকেতদ্বারা আর্থিক উন্নতির স্বরূপ ধারণা করা হয়।

প্রথমতঃ, কৃষি উৎপাদন পদ্ধতির উৎকর্ষতা আর্থিক উন্নতির একটি বড় সংকেত। যদি দেশের সকল চাষের জমি আধুনিকতম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিতে ও বিজ্ঞান সম্মত উৎপাদন প্রক্রিয়ার সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে উৎপন্ন শস্যের বাজার দর হ্রাস পাইবে। পূর্বে যাহা প্রান্তিক জমি ছিল, তাহার এখন চাষাবাদ হইবে না; প্রান্তিক উত্তম ও প্রান্তিক জমির আয়ের মধ্যে পার্থক্যটা কমিয়া আসিবে এবং ফলে, খাজনার হার হ্রাস পাইবে। কিন্তু, কৃষি উন্নয়নের সুযোগ সুবিধাগুলি যদি কেবল মাত্র উৎকৃষ্ট জমিই লাভ করে, তাহা হইলে কিন্তু উৎকৃষ্ট জমিগুলি অধিক খাজনা লাভ করিবে। উৎকৃষ্ট জমিগুলির উৎপাদকতা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উহাদের আয়ের মধ্যে এবং প্রান্তিক জমির আয়ের মধ্যে পার্থক্যটা বাড়িয়া যাইবে।

কৃষি উন্নয়ন ও খাজনা।

আর্থিক উন্নতির আর একটি সংকেত যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা ও পরিবহন উন্নয়ন। যোগাযোগের সুবিধা ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের দ্বারা জমির অবস্থিতি সম্পর্কে যে অসুবিধা থাকে তাহা দূর হয়। অনেক দূরের জমিও বাজারের কাছাকাছি অবস্থিতির যে সুযোগ সুবিধা, তাহা গ্রহণ করিতে পারে। যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা হেতু যদি কোন দেশের বা স্থানের রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ঐখানে ঐ পণ্যের দুষ্প্রাপ্যতা বাড়িবে ও পণ্য মূল্য চড়া হইবে। এই পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য খাজনার হারও বৃদ্ধি পাইবে। অপরপক্ষে, যানবাহনের সুব্যবস্থার ফলে যদি দেশে পণ্য আমদানী বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে পণ্যের বাজার মূল্য কমিবে ও খাজনার হারও হ্রাস পাইবে।

যোগাযোগ ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং খাজনা।

পরিশেষে, বলা যায় যে, লোকের অর্থআয় ও জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিও

আর্থিক উন্নতির আর একটি সংকেত। যে অনুপাতে লোকের আয় ও জীবনযাত্রার মান বাড়ে, লোকের খাদন ব্যয় বাড়ে তাহার চেয়ে কম। বিশেষ করিয়া লোকের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি হইলে, কৃষিজ খাদ্যবস্তুর উপর খাদন ব্যয় বড় একটা বৃদ্ধি পায় না। ফলে, শিল্পজাত দ্রব্যের তুলনায়, খাদ্যবস্তুর বাজার মূল্য হ্রাস পায় বেশী এবং খাজনার হারও কমিয়া থাকে।

জীবনযাত্রার মান ও খাজনা

অন্যান্য কারক আয়ের মধ্যে খাজনার উপাদান (Rent Element in other Factor Incomes) : রিকার্ডো আর্থিক খাজনার যে ব্যাখ্যান দিয়াছেন, তাহা অন্যান্য কারক আয় ব্যাখ্যানেও কিছুটা প্রযোগ করা চলে। আর্থিক খাজনা উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় ; প্রান্তিক উত্তম জমির আয় ও প্রান্তিক জমির আয়ের পার্থক্যই খাজনার পরিমাপ। জমির যোগান স্থায়ীভাবে অনম্য ও সীমিত বলিয়া, খাজনা উৎপাদন খরচের উপরি পাওনা উদ্‌বৃত্ত আয়। খাজনার এই তত্ত্ব,—শ্রমের মূল্য মজুরী, মূলধনের আয় সুদ এবং সংগঠন ও ব্যবস্থাপনার আয় মুনাফা,—সকল কারক মূল্য বাখ্যানেই মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য।

সকল শ্রমিকের কায়িক কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্ম প্রগুণতা এক নয়। যে সকল শ্রমিকের কষ্টসহিষ্ণুতা ও কর্মদক্ষতা অন্যান্য শ্রমিকের চেয়ে অধিক তাহারা খাজনার ন্যায় উদ্‌বৃত্ত অর্থ আয় লাভ করে। অনেক মজুর আছে যাহাদের পণ্য উৎপাদনের বাবদ খরচ ও ঐ পণ্যের বাজার মূল্য সমান। এই সকল মজুরকে প্রান্তিক মজুর বলা যায়। ইহারা যে মজুরী পায় তাহা খাজনার ন্যায় উদ্‌বৃত্ত আয় নয়। যে সকল মজুর প্রান্তিক মজুরদের চাইতে অধিক কর্মপ্রগুণতাসম্পন্ন, তাহারাই কেবল খাজনার ন্যায় উদবৃত্ত আয়ের অধিকারী।

খাজনা তত্ত্বদ্বারা মজুরী ব্যাখ্যান

মূলধনের যে অর্থ আয় সুদ তাহার মধ্যেও খাজনার উপাদান দেখা যায়। সকল পুঁজিপতি একই সুদের হারে মূলধন বিনিয়োগ করে না। অনেক পুঁজিপতি আছে যাহারা বর্তমান সুদের হারেই মূলধন বিনিয়োগ করে। তাহাদের বিনিয়োগের খরচ ও মূলধনের বাজার দর সমান। এই পুঁজিপতিদের প্রান্তিক পুঁজিপতি বলা যায়। ইহাদের চাইতে শাঁসালো পুঁজিপতি যাহারা, অর্থাৎ যাহাদের বিনিয়োগ খরচ অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার দরুণ, কম সুদের হারে মূলধন বিনিয়োগ করিতে পারে, তাহারা খাজনার ন্যায় উদবৃত্ত অর্থ আয় লাভ করে।

খাজনা তত্ত্ব দ্বারা সুদ ব্যাখ্যান

পরিশেষে, সংগঠনের অর্থ আয় মুনাফার ব্যাখ্যানেও খাজনা তত্ত্ব প্রয়োগ করা চলে। সকল সংগঠনকর্তা সমান দূরদৃষ্টি ও পরিচালনাশক্তির অধিকারী নয়। একদল সংগঠন কর্তা আছে, যাহারা গতানুগতিক উৎপাদন প্রক্রিয়া অনুসরণ করিয়া যায়; তাহাদের উৎপাদনের খরচ পণ্য মূল্যের সমান হয়। এই শ্রেণীর সংগঠন কর্তাদের প্রান্তিক উৎপাদক বলা যায়। আবার, আরেক দল আছে, যাহারা নূতন পথের সন্ধান করিয়া, দূরদৃষ্টি ও তৎপরতার সহিত আধুনিকতম পদ্ধতিতে উৎপাদন কার্য সম্পন্ন করে। এই শ্রেণীর উৎপাদক অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে পণ্য উৎপাদন করিতে পারে। ফলে, ইহারা যে মুনাফা লাভ করে, তাহা খাজনার ন্যায় উদবৃত্ত আয়। এই উদবৃত্ত আয়ের পরিমাণ পরিমাপ করা যায় ইহাদের অর্থ আয় ও প্রান্তিক সংগঠন কর্তাদের অর্থ আয়ের পার্থক্য করিয়া।

খাজনা তত্ত্বদ্বারা মুনাফা ব্যাখ্যান

খাজনা তত্ত্বদ্বারা এইরূপ সকল কারক আয় ব্যাখ্যান করা যায় বলিয়া, অনেকে বলেন যে, খাজনা, মজুরী, সুদ ও মুনাফার মধ্যে মূলতঃ কোন তফাৎ নাই। The difference between rent, wages,interest and profit is one of degree only. সেইজন্য অধ্যাপক মার্শাল মন্তব্য করিয়াছেন: The rent of land is seen not as a thing by itself but as the leading species of a large genus.

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, খাজনাতত্ত্বদ্বারা অন্যান্য কারক-মূল্যের ব্যাখ্যান বেশীদূর অবধি টানা যায় না। অল্পকালীন অর্থ আয় (short-period factor pricing) বিশ্লেষণে খাজনাতত্ত্ব প্রয়োগ চলে; কেননা, স্বল্প মিয়াদে অন্যান্য কারকের যোগান, জমির যোগানের ন্যায়, অনম্য ও সীমিত থাকিতে পারে। দীর্ঘকালে কারক যোগান নম্য হয়; তখন উহাদের অর্থ আয়কে খাজনার মত উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। দীর্ঘকালে অন্যান্য কারক-আয় উৎপাদন খরচের উপাদান বিশেষ।

খাজনার অনুরূপ (Quasi-Rent): রিকার্ডোর মতে উৎপাদকের উদবৃত্ত আয় লাভ কেবল জমির ভাগ্যেই ঘটে। কিন্তু তাহা সত্য নহে। মানুষের তৈয়ারী উৎপাদক বস্তু, যথা কারখানা গৃহ, কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, যান পরিবহন প্রভৃতিও উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ করিতে পারে। উৎপাদক বস্তুর উদবৃত্ত আয়কে অধ্যাপক মার্শাল খাজনার অনুরূপ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। জমি ছাড়া টেক্‌সই যে কোন উৎপাদক বস্তুর আয়কে খাজনার অনুরূপ বলা যায়। সহজ কথায়, যে সকল

স্থায়ী মূলধনের যোগান অল্পকালের জন্য সীমিত ও অনম্য, মানুষের তৈয়ারী সেই সকল উৎপাদক বস্তুর অর্থ আয়ই খাজনার অনুরূপ। ইহাদের অর্থ আয়কে খাজনার অনুরূপ বলা হয় এই অর্থে যে, আর্থিক খাজনার সহিত ইহার কতিপয় সাদৃশ্য আছে, আবার আর্থিক খাজনা হইতে ইহার বৈষম্যও আছে।

আর্থিক খাজনার সহিত খাজনার অনুরূপের সাদৃশ্য

আর্থিক খাজনা ও খাজনার অনুরূপ দুইই উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয়। দুইএরই উদ্ভব হয় কারক যোগান সীমিত বা অনম্য হওয়ার দরুণ। জমির যোগান সীমিত ও অনম্যতা হেতু খাজনার উৎপত্তি; উৎপাদক বস্তু বা স্থায়ী মূলধনের যোগান অনম্যের ফলে খাজনার অনুরূপের উদ্ভব। উহাদের যোগানের উপর পণ্যমূল্যের কোন প্রভাব নাই। খাজনা উৎপাদন খরচের উপাদান নয় এবং উহা পণ্যমূল্যেও প্রবেশ করে না; খাজনার অনুরূপও উৎপাদন খরচের অংশ নয় এবং উহাও পণ্যমূল্যে প্রবেশ করে না।

খাজনা ও খাজনার অনুরূপের তফাৎ

কিন্তু খাজনার সহিত খাজনার অনুরূপের এই সাদৃশ্য কেবলমাত্র অল্প মিয়াদব্যাপী। দীর্ঘমিয়াদে এই সকল সাদৃশ্য আর দেখা যায় না। দীর্ঘকালে উহাদের বৈষম্যই বিশেষ ভাবে প্রকটিত হয়। জমির যোগান সীমিত ও অনম্য শুধু অল্পকালে নহে, দীর্ঘকালেও বটে। কিন্তু, উৎপাদক বস্তুর যোগান অল্পকালে সীমিত ও অনম্য হইলেও, দীর্ঘকালে অবশ্য নম্য হয়। দীর্ঘকালে চাহিদানুরূপ উৎপাদক বস্তুর যোগান হ্রাসবৃদ্ধি করা যায়। দীর্ঘকালে খাজনার অনুরূপ আর্থিক খাজনার ন্যায়, উৎপাদকের উদ্‌বৃত্ত আয় নহে; ইহা উৎপাদন খরচের একটি অংশ বিশেষ এবং পণ্য মূল্যে প্রবেশ করে। অল্পকালে যোগান অভাবে উৎপাদক বস্তুর আয় খাজনা সদৃশ হইতে পারে এবং তখন উৎপাদন খরচের সংগে ইহার কোন সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু দীর্ঘকালে খাজনার অনুরূপ এবং আসল আর্থিক খাজনা এক নহে।

অনুশীলনী

1. How does the rent of land arise? Will there be any rent if all plots of land were equally fertile and equally favourably situated? (C. U. B. Com. '55)
2. Explain how the economic rent of land is determined.

Discuss the relation between rent and price of agricultural products. (C.U B. Com. '56)

3 Explain how marginal productivity influences rent. (C. U. B. A. '53, '56)

4. Analyse the factors that give rise to rent and show how a rent element may appear in all factor incomes. (C. U. B. A. Hons. '55)

5. Does the rent of land enter into the price of the product ? (C. U. B. A. Hons. '53)

6. Why do rents rise and fall ? Explain the relation between rent and economic progress. (C. U. B. A. '55)

7. Explain the concept of 'Transfer Earnings.' Point out the bearing of this concept on the theory of economic rent.

8. Write a short note on 'Quasi-rent.'

চতুর্বিংশ অধ্যায়

সুদ (Interest)

সুদের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য (Nature and Characteristics of Interest) : ঋণকৃত পুঁজির অর্থমূল্যই সুদ। কর্জের (loan) পুরস্কার মূল্যই সুদ হিসাবে ধরা হয়। যখন এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে অর্থ কর্জ দেয়, কিছুকাল পরে সে শুধু ঐ কর্জের অর্থ পরিমাণই ফিরিযা পায না—উহার সহিত আবং কিছুটা অর্থ আয়ও সে লাভ করে। কর্জের বাবদ তাহার এই অতিরিক্ত পাওনা আয়কেই সুদ বলে। সুদ সাধারণতঃ বিনিয়োগকৃত কর্জের টাকার শতকরা একটা অনুপাত হার বলিয়া নির্দিষ্ট হয।

নীট, প্রকৃত বা আর্থিক সুদ (Net, Pure or Economic Interest) : কিন্তু প্রকৃত সুদ বিনিয়োগকৃত কর্জের মোট পাওনা অর্থমূল্য নয়। কর্জের জন্য যে মোট অর্থমূল্য আদায় করা হয়, তাহাকে মোট সুদ (Gross Interest) বলে। নীট, প্রকৃত বা আর্থিক সুদ বলিতে আমরা সেই অর্থমূল্য বুঝি, যাহা নিছক কর্জ-কৃত্যের পারিশ্রমিক রূপে (pure service of loan) আদায় করা হয়।

কর্জের আনুসঙ্গিক যে ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা আছে, তাহার মূল্য স্বরূপ কোন অর্থ দাবী বা আয় নীট বা আর্থিক সুদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় না। বাস্তবতঃ, নীট সুদ বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ সুদ বলি, তাহা মোট সুদ। এই মোট সুদ বলিতে আমরা ঋণকৃতঅর্থ পুঁজির গোটা আদায়ী মূল্য বুঝিয়া থাকি। ইহার মধ্যে নীট সুদ ভুক্ত করা ত হয়ই, ইহা ছাড়া, আরও অনেক উপাদানও ধরা হইয়া থাকে। যেমন, প্রত্যেক কর্জেরই কিছু না কিছু ঝুঁকি থাকে। এই ঝুঁকির বীমা স্বরূপ ঋণদাতা কর্জের জন্য নীট সুদ ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ আয় দাবী করে। **দ্বিতীয়তঃ**, ঋণদাতাকে কর্জের জন্য অনেক অসুবিধা ও অশান্তি ভোগ করিতে হয়। ঋণের টাকা হয়ত অধমর্ণের হাতে অনেকদিন আটক থাকিতে পারে, হয়ত বা সহজে ঋণ শোধের কোনই সম্ভাবনা না থাকিতে পারে, কিংবা ঋণ এমন সময় পরিশোধ হইতে পারে, যখন পুঁজিপতির পক্ষে নূতন বিনিয়োগ করা একেবারে অসম্ভব। এই ধরণের বিভিন্ন অসুবিধা ও অশান্তির মুখে ঋণদাতা কর্জের উচিৎ অর্থ আয়ের উপরেও অতিরিক্ত মূল্য দাবী করিয়া থাকে। **তৃতীয়তঃ**, ঋণ তদারক করার জন্যও ঋণ দাতার উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হয়। ঋণদাতাকে উপযুক্ত কাগজ পত্র হিসাবে রাখিতে হয়, যথাযথ সময়ে খাতকের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়। এই সকল কার্য সময়-সাপেক্ষ, ব্যয়-সাপেক্ষও বটে। ঋণদাতা নীট্ সুদের সংগে সংগে বিনিয়োগকৃত ঋণের তদারক খরচ বাবদ অতিরিক্ত অর্থমূল্য আদায় করে। ঋণের এই তদারক খরচও মোট সুদের একটা অংশ বিশেষ।

নীট সুদ ও মোট সুদ

সুদের তত্ত্ব (Theories of Interest) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ সুদের রকমারি ব্যাখ্যান দিয়াছেন। প্রায় সকল ব্যাখ্যানগুলিই অসম্পূর্ণ। কেননা, প্রত্যেকটি ব্যাখ্যানই সুদের কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের উপর জোর দিয়াছে। আমরা নিম্নে কতিপয় প্রধান প্রধান ব্যাখ্যান আলোচনা করিলাম।

উৎপাদকতা তত্ত্ব (Productivity Theory): এই তত্ত্ব অনুসারে সুদ পুঁজিবস্তুর (capital goods) উৎপাদকতার উপর নির্ভর করে। পুঁজি বা মূলধনের উৎপাদকতার উদ্ভব হয় তখন, যখন উহা শ্রমের সংগে সহযোগিতা করে। মূলধনের এই উৎপাদকতার অর্থ এই যে, ইহার বিনিয়োগ উৎপাদন প্রক্রিয়াকে ঘুরানো ও দীর্ঘ মেয়াদী করে। অন্যান্য কারক যোগান স্থির রাখিয়া,

মালিক প্রতিষ্ঠান যদি মূলধনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার মোট উৎপন্ন আয় বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, কিন্তু প্রান্তিক উৎপাদকতা কমিতে থাকিবে। সে মূলধনের বিনিয়োগবৃদ্ধি করিবে পণ্য উৎপাদনের সেই স্তর পর্যন্ত, যে পর্যায়ে মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদকতা ও স্থদের বাজার হার (মূলধনের বাজার মূল্য) সমান হয়।

উৎপাদকতা তত্ত্ব স্থদের আঙ্গিক ব্যাখ্যান। ইহা মূলধনের চাহিদা মূল্য বিশ্লেষণ করিবার দাবী করে। কিন্তু চাহিদার দিক হইতেও ইহা নির্দেশ করিতে পারে না, মূলধনের মোট চাহিদা কিভাবে নির্ধারিত হয়। খাদন ব্যয়ের জন্য যে পুঁজি কর্জ করা হয় তাহার স্থদ কেমন করিয়া স্থির হয়, তাহা উৎপাদকতার তত্ত্ব বাখ্যান করিতে পারে না। **দ্বিতীয়তঃ,** কর্জের যোগানমূল্য কোন্ বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহাও এই তত্ত্ব নির্দেশ করিতে পারে না। ইহা অবশ্য সত্য যে, স্থদ কর্জের প্রান্তিক উৎপাদকতা আয়ের সমান। কিন্তু কর্জের প্রান্তিক উৎপাদকতা আবার নির্ভর করে দাদন (investment) যোগানের উপর। অতএব, দাদন যোগান-মূল্যের বিশ্লেষণ না করিলে স্থদের পূর্ণাংগ বাখ্যান সম্ভব নয়। **তৃতীয়তঃ,** উৎপাদকতা তত্ত্ব যে সকল অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, উহারাও অবাস্তব। এই তত্ত্ব যে অনুমান করে, যে, কারক বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা ও পূর্ণ কর্মসংস্থান বর্তমান, তাহা ব্যবহারিক জগতে সত্য নয়।

উৎপাদকতা তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচনা

ভোগবিরতি অথবা অপেক্ষা তত্ত্ব (Abstinence or Waiting Theory) : অধ্যাপক সিনিয়র ও কেয়ার্নস্ (Senior and Cairnes) স্থদের এমন এক ব্যাখ্যান দিয়াছেন, যাহাতে মূলধনের যোগান দুষ্প্রাপ্যতা অনুমতি হইয়াছে। ইহাকে ভোগবিরতি (Abstinence) তত্ত্ব বলে। মানুষ তাহার গোটা আয় বর্তমান খাদনে ব্যয় করিতে পারে, কিংবা কিছুটা সঞ্চয় করিতে পারে। যখন তাহাকে সঞ্চয় করিতে হয়, তখন সাম্প্রতিক খাদনের পরিমাণ সংকোচন করিতে হয়। এই ভোগ বিরতির অর্থ, সঞ্চয়কারীর অপযোগ ভোগের একশেষ। সঞ্চয়কারীর এই ভোগ বিরতির ও অপযোগ ভোগের ক্ষতিপূরণ মূল্যই স্থদ।

কিন্তু এই তত্ত্বের বিরুদ্ধ সমালোচন করা যায় এই বলিয়া যে, সকল রকম মূলধন সঞ্চয় করিতেই সঞ্চয়কারীর ভোগ বিরতি বা অপযোগ ভোগের আবশ্যক হয় না। অধ্যাপক মার্শাল স্থদের এই ভোগবিরতি তত্ত্ব কিছুটা পরিমার্জিত করিয়া অপেক্ষা তত্ত্বদ্বারা স্থদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সঞ্চয় অর্থই

অপেক্ষা। মানুষ যখন সঞ্চয় করে, তখন সে সাম্প্রতিক খাদন একেবারে স্থায়ীভাবে ত্যাগ করে না; কিছুকালের জন্য স্থগিত রাখে মাত্র। এই খাদন স্থগিত রাখার উৎসাহ সকল সঞ্চয়কারীর পক্ষে সমান নয়। অনেক সঞ্চয়কারী আছে, যাহাদের সঞ্চয় করার উৎসাহ কোন স্থদ পাওয়ার উপর নির্ভর করে না। স্থদ যদি নাও মেলে, তাহা হইলেও তাহারা সঞ্চয় করিয়া থাকে। আবার, অনেকে আছে, যাহারা উপযুক্ত পরিমাণ স্থদ না মিলিলে সঞ্চয়ই করে না। আবার, একদল সঞ্চয়কারী আছে যাহারা কোন বিশেষ অবস্থায় সঞ্চয় করিতে সব চাইতে কম ইচ্ছুক। ইহাদের প্রান্তিক সঞ্চয়কারী বলে। স্থদের হার এমন হওয়া উচিত যাহাতে প্রান্তিক সঞ্চয়কারীর দাদনও বাজারে সরবরাহ হয়।

স্থদ ব্যাখ্যানের এ তত্ত্ব পূর্ণাংগ নয়; ইহা কেবল মাত্র স্থদের যোগান মূল্য বিশ্লেষণ করে, মূলধনের চাহিদা মূল্য কি ভাবে স্থির হয় সে সম্পর্কে এই তত্ত্ব মাথা ঘামায় না। অধ্যাপক ক্যানান মন্তব্য করিয়াছেন যে, অপেক্ষাদ্বারা শুধু অলসতাই জন্মে, এবং এই অলসতা সঞ্চয়কারীর মূলধন যোগান বৃদ্ধির পরিপন্থী।

সময় পক্ষপাত-তত্ত্ব (Time-preference Theory) : অষ্ট্রীয়ার প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ বহম্ বওয়ার্ক (Bohm Bawerk) সময়-পক্ষপাত তত্ত্বদ্বারা স্থদ বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, একই রকম গুণসম্পন্ন দ্রব্যের প্রতি লোকের ভবিষ্যতের চেয়ে সাম্প্রতিক পক্ষপাত বেশী। লোকে ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানই অধিক পছন্দ করে; কেননা, বর্তমান নিশ্চিত, আর ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।

বহম্ বওয়ার্কের সময়-পক্ষপাত তত্ত্ব

ভোগ্যবস্তু খাদনদ্বারা যে তৃপ্তি লাভ করা যায়, তাহাও ভবিষ্যতের চেয়ে বর্তমানেই অধিক। একই পরিমানে ও গুণসম্পন্ন দ্রব্যের বর্তমান সমাদর ভবিষ্যৎ সমাদরের চেয়ে অধিক। স্থদ বর্তমান এই সমাদরের পারিতোষিক মূল্য বিশেষ। বহম্ বওয়ার্ক বর্তমানের প্রতি এই পক্ষপাতিত্বের তিনটি কারণ নির্দেশ করিয়াছেন: (১) **প্রথমতঃ**, বর্তমানের চেয়ে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে লোকের ধারণা কম (the perspective under-estimate of the future)। (২) **দ্বিতীয়তঃ**, ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমান দ্রব্য যোগান অধিকতর দুষ্প্রাপ্য। বর্তমান ভবিষ্যতের চেয়ে অধিকতর নিশ্চিত বলিয়া বর্তমান খাদন অধিক; ফলে, দ্রব্য যোগান টানও অধিক। (৩) **তৃতীয়তঃ**, ঘুরান উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎপাদকতা হেতু, বর্তমান দ্রব্য ভবিষ্যৎ দ্রব্যের চাইতে উৎকৃষ্টতর।

কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, শুধু উৎপাদন মেয়াদ ও প্রক্রিয়া বিস্তৃত করিলেই অনির্দিষ্ট ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না। ঘুরান উৎপাদন প্রক্রিয়ারও আদর্শ স্তর (optimum process) আছে এবং এই আদর্শ-স্তর ও উৎপাদনের কারিগরী অবস্থা সুদের হার দ্বারা নির্ধারিত হয়। সুদের উচ্চতর হার দীর্ঘমেয়াদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার চেয়ে স্বল্পমেয়াদী উৎপাদন প্রক্রিয়ার পক্ষে অধিক হিতকর হইতে পারে। অতএব, ঘুরান প্রক্রিয়ার উৎপাদকতা সুদের হার নির্ধারণ করে না বলিয়া ইহা মন্তব্য করা যায় যে, উৎপাদন প্রক্রিয়াই সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। অধ্যাপক ফিশার (Fisher) নির্দেশ করিয়াছেন যে, ঘুরান উৎপাদন প্রক্রিয়ার উৎপাদকতা শুধু একরকম ভাবে সুদের হার প্রভাবান্বিত করিতে পারে। ভবিষ্যতের উপর অধিক গুরুত্ব অর্পণ করিয়া যদি বর্তমান উৎপাদক সম্পদ (resources) ভবিষ্যৎ ব্যবহারের জন্য বর্তমান বিনিয়োগ হইতে অপসৃত করা (diverted) হয়, তাহা হইলে বর্তমান দ্রব্যের যোগান টান পড়িবে এবং ভবিষ্যৎ দ্রব্যের তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হইবে।

অধ্যাপক ফিশারও সুদের এক সময়-পক্ষপাত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। উহা মূলতঃ বহম্ বওয়ার্কের মতবাদেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। তাঁহার মতে, সুদ বর্তমান ও ভবিষ্যৎ দ্রব্যের মধ্যে বিনিময় মূল্য হিসাবে কাজ করে। সাধারণতঃ, মানুষ তাহার আয় সাম্প্রতিক খাদন ব্যয়ে খরচ করিতে ব্যস্ত। ইহার কারণ এই যে, ভবিষ্যৎ তৃপ্তির চেয়ে সাম্প্রতিক তৃপ্তির উপর তাহার পক্ষপাত বেশী। সুদ সেই অর্থমূল্য, যাহাদ্বারা মানুষের ভবিষ্যতের তুলনায় বর্তমান ভোগতৃপ্তির উপর যে পক্ষপাত, তাহা দূর করা যায়। মানুষের বর্তমান এই পক্ষপাতের হার অনেক বিষয়ের উপর নির্ভর করে। **প্রথমতঃ**, তাহার আয়ের পরিমাণ সময়-পক্ষপাতকে বিশেষ করিয়া প্রভাবান্বিত করে। আয় যতই কম হইবে, মানুষের সময়-পক্ষপাতও ততই কম হইবে। **দ্বিতীয়তঃ**, বিভিন্ন সময়ের মধ্যে মানুষের আয় কি ভাবে বণ্টিত হয়, তাহার উপরও তাহার সময়-পক্ষপাত নির্ভর করে। যদি তাহার আয় ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে বর্তমান খাদন ও তৃপ্তি লাভের উপর তাহার পক্ষপাত বেশী হইবে। **তৃতীয়তঃ**, মানুষের আয়ের বিভিন্ন উপাদান কি, কিংবা ভবিষ্যতে তাহার আয় ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে কিনা—এ সকল বিষয়ও তাহার সময়-পক্ষপাতকে

ফিশারের সময়-পক্ষপাত তত্ত্ব

নিয়মিত করে। ভবিষ্যতের আয় সম্পর্কে যদি অনিশ্চয়তা থাকে, তাহা হইলে তাহার বর্তমান পক্ষপাত বাড়িবে। **পরিশেষে,** মানুষের সময়-পক্ষপাত তাহার আপন প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের উপরও নির্ভরশীল। তাহার দূরদর্শিতা, আত্মসংযম, আচার ব্যবহার, জীবনের লক্ষ্য ও সম্ভাবনা, অপরের জীবন সম্পর্কে উৎসাহ প্রকাশ ও ত্যাগ স্বীকার প্রভৃতি বিষয়ও তাহার সময়-পক্ষপাতকে প্রভাবান্বিত করে।

সাম্যাবস্থায় সুদের হার প্রান্তিক সময়-পক্ষপাত হারের (marginal rate of time preference) সমান হয়। যখন প্রান্তিক সময় পক্ষপাতের হার সুদের হারের চেয়ে কম, তখন পুঁজিপতি বাজারে কর্জ যোগান দিবে। অপরপক্ষে, যদি প্রান্তিক সময় পক্ষপাতের হার সুদের হারের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে সে বাজার হইতে ধার করিবে। কর্জ দিয়া অথবা কর্জ করিয়া মানুষ যথাক্রমে তাহার সময়-পক্ষপাত বৃদ্ধি ও অথবা হ্রাস করিয়া থাকে, যাহাতে উহা সুদের হারের সমান হয়।

তরল মুদ্রা বা চল্‌তি অর্থ পছন্দনীয়তা তত্ত্ব (Liquidity Preference Theory) : বিলাতের প্রখ্যাত অর্থবিদ্যাবিদ লর্ড কীনস্ (Keynes) সুদের এক নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন, যাহা মোটামুটি ভাবে আধুনিক জগতে স্বীকৃতি পাইয়াছে। সুদের এই নূতন ব্যাখ্যান তরল মুদ্রা বা চল্‌তি অর্থ পছন্দনীয়তা তত্ত্ব বলিয়া পরিচিত। কীনস্ সুদ সম্পর্কীয় প্রাচীন ও প্রচলিত সকল মতবাদের অসারত্ব দেখাইয়া ব্যক্তিগত অভিমত প্রচার করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রীগণ স্থায়ী ও প্রকৃত মূলধনের আয় (earnings of real capital) ও অর্থ-মূলধনের আয়ের (earnings of money income) মধ্যে কোন বিভেদের রেখা টানেন নাই। তিনি মন্তব্য করেন : সুদ শুধু অর্থ-মূলধনেরই প্রাপ্য আয়, প্রকৃত মূলধনের আয় নহে। **দ্বিতীয়তঃ,** প্রাচীনপন্থীরা বিশ্বাস করেন যে, সুদ নির্ধারিত হয় একদিকে মূলধনের চাহিদা আর একদিকে উহার সঞ্চয়দ্বারা। সুদ হইল সেই অর্থমূল্য যাহার মাধ্যমে বিনিয়োগের চাহিদা (demand for investment) এবং সঞ্চয়ের ইচ্ছা সাম্যাবস্থায় পৌছে। (The rate of interest is the factor which brings the demand for investment and willingness to save into equilibrium.) কীনস্ এই মতবাদ গ্রহণ করেন না। তাঁহার মতে,

প্রাচীনপন্থী মতবাদের সম্পর্কে কীনসের বিরুদ্ধ সমালোচনা : (১) সকল মূলধনের আয় সুদ নহে

সুদের হারের মাধ্যমে বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমতা রক্ষা হয় না। বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমতা স্থাপিত হয় আয়স্তরের উঠা-নামার মাধ্যমে। সুদের হার যাহাই হউক না কেন, বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের মধ্যে সাম্য সর্বদা আয়স্তরের পরিবর্তনদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। সঞ্চয়কে আয়স্তরের প্রভাবমুক্ত ভাবা চলে না। খাদন প্রবণতার যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে আয়ের বৃদ্ধির সংগে সংগে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাইবে, আবার আয়ের হ্রাসের সংগে সংগে সঞ্চয়ও হ্রাস পাইবে। প্রাচীনপন্থীদের চিন্তাধারায় বড় গলদ এই যে, তাহারা আয়কে স্থায়ী অপরিবর্তনীয় (constant) অনুমান করিয়া সুদ তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রাচীন মতবাদে অনুমান করা হইয়াছে যে, সুদের হার চড়িলে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি হয়, আর সুদের হার কমিলে সঞ্চয় হ্রাস পায়। ইহাও কীনস্‌ সঠিক বলিয়া গ্রহণ করেন না। কেননা, যখন সুদের হার বাড়ে, তখন বিনিয়োগ হ্রাস পায় এবং যখন সুদের হার কমে, তখন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। বিনিয়োগ হ্রাস পাইলে, অর্থ আয়ও কমে, এবং ফলে, সঞ্চয় বাড়িতে পারে না। আবার বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে, অর্থ আয় বাড়ে এবং সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। অতএব আমরা দেখি, সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে, সামগ্রিক সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস পায় ; আর সুদের হার হ্রাস পাইলে, সঞ্চয়ের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়।

(২) বিনিয়োগ ও সঞ্চয়ের সমতা সুদের মাধ্যমে স্থাপিত হয় না

(৩) সঞ্চয়ের হ্রাসবৃদ্ধি সুদের হারের তারতম্যের উপর নির্ভরশীল নহে

কীন্‌স সাহেবের সুদের তত্ত্ব পুরোপুরি আর্থিক ব্যাখ্যান। তাঁহার মতে, সুদ নির্ধারিত হয় অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান দ্বারা। (Interest is a purely monetary phenomenon. It is determined by the demand for and supply of money)। আবার, অর্থের চাহিদা নির্ভর করে মানুষের তরল টাকার বা চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তার (Liquidity Preference) উপর। অর্থের যোগান নির্ভর করে বাজারে চলিত টাকার পরিমাণ ও ব্যাংক সমূহের ধার নীতির (credit policy) উপর।

কীন্‌সের সুদতত্ত্ব

মানুষ তাহার আয়ের একটা অংশ বর্তমান খাদন ব্যয়ে খরচ করে। তাহার আয়ের কতটা পরিমাণ সে সাম্প্রতিক খাদনে খরচ করিবে তাহা নির্ধারিত হয় তাহার খাদন প্রবণতাদ্বারা (propensity to consume)। এই খাদন প্রবণতা আবার বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। তাহার মধ্যে খাদকের বর্তমান জীবনযাত্রার মান অন্যতম।

অর্থের চাহিদা : চল্‌তি বা তরল মুদ্রারপছন্দনীয়তা

খাদন ব্যয়ের পর মানুষের আয়ের যে উদ্‌বৃত্ত অর্থ থাকে, তাহার কি সুব্যবস্থা হইতে পারে, তাহাও তাহাকে নির্ধারণ করিতে হয়। সে ঐ মোট উদ্‌বৃত্ত অংশই সঞ্চয় করিবে ও সেই উদ্দেশ্যে দীর্ঘমিয়াদে বাজারে ধার দিবে, না উহার কিছুটা চল্‌তি তরল অবস্থায় (liquid form) রাখিবে, (যাহাতে উহা সহজে নগদ মুদ্রায় পরিণত করা চলে) তাহাও সাব্যস্ত করিতে হয়। তাহার সঞ্চয়ের ইচ্ছা যত কম হইবে, তাহার চল্‌তি তরল টাকার পছন্দনীয়তা (liquidity preference) তত বেশী হইবে। আবার সঞ্চয়ের ইচ্ছা যত বেশী প্রবল হইবে, চল্‌তি তরল টাকার পছন্দনীয়তা তত কম হইবে। মানুষ তাহার সাম্প্রতিক খাদন ব্যয় মিটাইয়া আয়ের যে অবশিষ্ট অংশ বক্রি থাকে, তাহার মোট অংকটা সঞ্চয় না করিয়া কিছুটা পরিমাণ চল্‌তি তরল অবস্থায় কেন ধরিয়া রাখে? সে যদি মোট অংকটা সঞ্চয় করিত, তাহা হইলে মোটা সুদের অংক পাইতে পারিত। কিন্তু তাহা না করিয়া কিছুটা অর্থ মানুষ চলতি তরল অবস্থাতে রাখে, যাহাতে প্রযোজন হইলেই উহা নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা চলে। মানুষ স্বল্পমেয়াদী যে আমানত (deposits) ব্যাংকে রাখে, উহা চলতি তরল অর্থ; যে কোন সময় উহা চেকদ্বারা তুলিয়া সে নগদ টাকা হাতে করিতে পারে। মানুষের এই চল্‌তি তরল মুদ্রার পছন্দনীয়তা তিনটী বিভিন্ন উদ্দেশ্যদ্বারা প্রণোদিত হয়।

প্রথমতঃ, দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য (Transaction-motive) কিছুটা মুদ্রা প্রায় সকলেই তরল চলতি অবস্থায় রাখিতে ব্যস্ত। এই দৈনন্দিন ব্যয় আবার দুই রকমের হইতে পারে। এক, ব্যক্তিগত ব্যয়; আর এক, প্রয়োজনের তাগিদ বশতঃ ব্যয় (income motive and business motive)। বেশীর ভাগ মানুষই তাহার আয়ের টাকা দৈনিক, সপ্তাহ বা মাস হিসাবে পাইয়া থাকে; কিন্তু ব্যয় তাহাকে প্রতিদিনই প্রায় করিতে হয়। Individuals hold cash balances or liquid money to bridge the interval between the receipt of income and its expenditure. ইহা ছাড়া, কারবারী ও ব্যবসায়ীরাও কিছু পরিমাণ চল্‌তি মুদ্রা হাতে রাখে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার জন্য।

চল্‌তি তরল মুদ্রার পছন্দনীয়তার বিভিন্ন কারণ:

[১] দৈনন্দিন ব্যয় (transaction motive)

দ্বিতীয়তঃ, কিছু পরিমাণ অর্থ তরল চলতি অবস্থায় রাখা হয় ভবিষ্যতের

সতর্কতার জন্য। কি ব্যক্তিগতভাবে, কি বাণিজ্যের প্রয়োজন বশতঃ, ভবিষ্যতের বিপদ আপদের দিকে চাহিয়া কিছু তরল চলতি মুদ্রা ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠান সময় সময় ধরিয়া রাখে।

[২]
ভবিষ্যতের সতর্কতা অবলম্বন
(Precautionary motive)

তৃতীয়তঃ, ফাটকা কারবারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ এবং মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্যেও কিছু পরিমাণ অর্থ চল্‌তি অবস্থায় ধরিয়া রাখা হয়। যদি তমসুকের (bond) বাজার মূল্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ যদি সুদের হার হ্রাস হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ব্যবসায়ী কারবারীরা ভবিষ্যতে উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে তমসুক পত্র ক্রয় করিবে। অপর পক্ষে, যদি ভবিষ্যতে তমসুকের মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা হয়, (অর্থাৎ সুদের হার বৃদ্ধি পাইবার ইংগিত পাওয়া যায়) তাহা হইলে ব্যবসায়ীরা লোকসানের হাত লইতে রক্ষা পাইবার জন্য তমসুক পত্র বিক্রয় করিবে। এইরূপ ফাট্‌কা কারবারের সুযোগ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে অর্থ তরল অবস্থায় রাখা হয়, উহাকে কীনস্‌ সক্রিয় চলতি অর্থ (active balances) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে সক্রিয় চলতি অর্থ বলা হয় এই অর্থে যে, ইহা একান্তভাবে সুদের হারের উপর নির্ভরশীল। সুদের বাজার হার যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে তরল চল্‌তি অর্থের পছন্দনীয়তা হ্রাস পাইবে। আবার সুদের বাজার হার যদি মন্দা হয়, তাহা হইলে চলতি অর্থের পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু দৈনন্দিন ব্যয় নির্বাহের জন্য (transaction motive) কিংবা ভবিষ্যতের সতর্কতার জন্য (precautionary motive) যে চলতি অর্থ ধরিয়া রাখা হয়, তাহাকে কীনস্‌ নিষ্ক্রিয় চলতি মুদ্রা (inactive balances) বলিয়াছেন। ইহা বিশিষ্ট ভাবে নির্ভর করে ব্যক্তি বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে আয়ের উপর।

[৩]
ফাটকা কারবারের, সুযোগ সুবিধা গ্রহণ
(Speculative motive)

সহজ করিয়া বলিতে গেলে, সক্রিয় চলতি অর্থ এবং নিষ্ক্রিয় চলতি অর্থের সমষ্টিই মোট তরল চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার পরিমাণ এবং ইহাই অর্থের চাহিদা স্থির করে। সুদ মানুষের চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তা পরিহার করিবার আকর্ষণ স্বরূপ পুরস্কার বিশেষ। কীনসের নিজের কথায়ঃ Interest is the reward for parting with liquidity for a specified period.

আমরা দেখিয়াছি, অর্থের চাহিদা চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার উপর নির্ভর করে। কিন্তু চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তা সুদের হারের উঠা নামার সংগে সংগে বিভিন্ন হইতে বাধ্য। সুদের বিভিন্ন হারে চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তা যে বিভিন্ন

পরিমাণ হয়, আমরা তাহার একটি তালিকা তৈয়ারী করিতে পারি। চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার এই সূচীর (liquidity preference schedule) যদি কোন অদল বদল না হয়, তাহা হইলে সুদের হার স্থির হইবে অর্থ যোগানদ্বারা। দেশের অর্থ যোগান বৃদ্ধি পাইলে, সুদের হার হ্রাস পাইবে। আর অর্থ যোগান হ্রাস হইলে, সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। অর্থের যোগান নির্ভর করে বাজারে চালু অর্থের পরিমাণ, এবং কেন্দ্রীয় ও অন্যান্য ব্যাংকের দাদন নীতির উপর। সুদের হার হইবে সেই অর্থমূল্য যাহা চলতি মুদ্রার চাহিদা পরিমাণ ও যোগান পরিমাণকে সমান করে। সাম্যাবস্থায় সুদের হার সেই স্তরে অবস্থান করিবে, যেখানে অর্থের যোগান পরিমাণ ও অর্থের চাহিদা পরিমান সমান হয়।

অর্থের যোগান ও সুদ

কীনসের তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা (Criticism of Keynes' Theory) : কীনসের তত্ত্বের প্রধান গলদ এই যে, বিনিয়োগ তহবিলের (investment funds) চাহিদা যে সুদের হার প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তাহা তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। ব্যবসায়ীদের চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তা বিশেষ করিয়া নির্ভর করে বিনিয়োগ মূলধনের চাহিদার উপর। বিনিয়োগ মূলধন আবার মূলধনের উৎপাদকতার উপর নির্ভরশীল। অতএব, সুদের হারের মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতার বা উৎপাদকতার উপর নির্ভর না করিয়া উপায় নাই। কীনস্ মনে করেন যে, বর্তমান বিনিয়োগ সুদের হারকে খুব কমই প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কেননা, উহা মোট বর্তমান মূলধনের একটি সামান্য অংশ মাত্র। দ্বিতীয়তঃ, অর্থতত্ত্বের নিরিখে তাঁহার সুদের বিশ্লেষণও অপূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যান। সুদ যে অর্থের চাহিদা ও যোগান ছাড়া আরও অনেক বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতে পারে, তিনি তাহা মানিয়া লন নাই। তৃতীয়তঃ, কীনসের মতবাদের আর একটি অসুবিধা এই যে, অর্থ বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহার সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের দেন নি। অর্থকে তিনি ব্যাংকের আমানত ধরিয়াছেন। কিন্তু, তিনি আবার দাদন অর্থকে এই পর্য্যায়ভুক্ত না করিবার জন্য সাধারণের নিকট সুপারিশও করিয়াছেন।

চাহিদা ও যোগান নিয়মের প্রয়োগদ্বারা সুদ নির্ণয় (**Determination of Interest by the Application of Demand and Supply) :** সুদের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যান করিতে হইলে চাহিদা ও যোগানের মূল নিয়ম প্রয়োগ করা ছাড়া গত্যন্তর নাই।

চাহিদার দিক হইতে আমরা দেখি যে, ঋণ করা হয় দাদন ব্যয়ের জন্য ও

বিনিয়োগ ব্যয়ের (উৎপাদন) জন্য। খাদন ব্যায়ের জন্য যে ঋণ করা হয়, তাহার চাহিদা নির্ভর করে সময়-পক্ষপাতের উপর (time-preference)। মানুষের ভবিষ্যতের ভোগতৃপ্তির তুলনায় যদি সাম্প্রতিক ভোগতৃপ্তি অধিক পছন্দনীয় বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে সে উচ্চ সুদে কর্জ করিতে ইচ্ছুক হইবে।

কিন্তু খাদন ব্যয়ের তুলনায় বিনিয়োগ ব্যয়ের (উৎপাদনের) জন্যই ঋণ করা হইয়া থাকে অধিক। উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যে কর্জ করা হয়, তাহার জন্য দেয় সুদ নির্ভর করিবে উৎপাদকের সম্ভাব্য মুনাফা লাভের উপর। এই মুনফা লাভ আবার নির্ভর করে প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার উপর (marginal revenue productivity)। ব্যক্তিগতভাবে কোন উৎপাদকের পক্ষ হইতে দেখিতে গেলে, সে উৎপাদনের জন্য অতিরিক্ত কর্জ করিতে থাকিবে সেই স্তর পর্যন্ত, যেখানে তাহার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা ও বাজারের বর্তমান সুদের হার সমান হয়। মনে রাখিতে হইবে, ব্যক্তিগতভাবে কোন একজন উৎপাদকই তাহার কর্জ দ্বারা সুদের হার নির্দেশ বা স্থির করিতে পারে না। মোট কর্জের চাহিদা ও মোট ঋণের যোগান সাম্য স্থাপিত হইলেই সুদের বাজার-হার নির্ধারিত হয়। এই হার নির্দিষ্ট হয় প্রান্তিক দাদনকারী ও প্রান্তিক উত্তমর্ণদের ক্রিয়ার মাধ্যমে।

যোগানের দিক হইতে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, মোট দাদন যোগান নির্ভর করে ঋণ প্রদানকারীর সময় ও চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার উপর। যদি সুদের বাজার-হার উত্তমর্ণের সময়-পক্ষপাত ও চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে উহারা বাজার হইতে আর ধার করিবে না, নিজেদের অর্থই ব্যবসায় বিনিয়োগ করিবে। অপরপক্ষে, সুদের বাজার-হার যদি উত্তমর্ণের সময় পক্ষপাত ও চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে উহারা বাজার হইতে ধার করিবে।

দীর্ঘকালে দাদন যোগান বৃদ্ধি নির্ভর করে সঞ্চয়ের উপর। সঞ্চয় আবার নির্ভর করে সুদের হারের উপর। যদিও বিভিন্ন সুদের হারের উপর বিভিন্ন পরিমাণ সঞ্চয় যোগান নির্ভর করে, তথাপি মোটামুটি ভাবে বলা যায় যে, সুদের উচ্চ হার যদি দীর্ঘমেয়াদ ব্যাপী স্থায়ী হয়, তাহা হইলে সঞ্চয় যোগান বৃদ্ধি পাইবে। তাহার ফলে মূলধনের যোগানও বৃদ্ধি পাইবে, মূলধনের প্রান্তিক উৎপাদকতা হ্রাস পাইবে এবং সুদের হার কমিয়া যাইবে।

পরিশেষে, স্মরণ রাখিতে হইবে যে, দাদন-মূলধন যোগান শুধু ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর নির্ভর করে না। দেশের দাদন যোগানের মোটা অংকই পাওয়া

যায় ব্যাংকের নিকট হইতে। বিভিন্ন ব্যাংকের দাদন যোগান আবার উহাদের চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তার উপর নির্ভর করে। আর নির্ভর করে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন নিয়ন্ত্রণ নীতির উপর।

সুদের হারের পার্থক্য (Differences in Interest Rates): সুদের হারের পার্থক্য হয় মূলতঃ দাদন-মূলধনের চাহিদা ও যোগানের হ্রাস বৃদ্ধির সংগে সংগে। যদি চাহিদার তুলনায় দাদন যোগান টান হয়, তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে। আবার যোগানের তুলনায় যদি দাদন চাহিদা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সুদের হার বৃদ্ধি পাইবে।

সুদের হারের পার্থক্যতার কারণ : (১) মূলধনের চাহিদা-যোগান তারতম্য

সুদের হারের পার্থক্যের আর একটা প্রধান কারণ এই যে, সকল রকম ঋণ বা দাদনের একরূপ ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা থাকে না। আমাদের দেশে কৃষি ঋণের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা অপেক্ষাকৃত বেশী; কেননা, চাষীরা যে কৃষি কার্য হইতে আয় উপার্জন করে তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তাপূর্ণ। তাহারা ঋণের উপযুক্ত জামিনও রাখিতে পারে না। এইরূপ ঋণের সুদের হার উচ্চ হইতে বাধ্য। যে ঋণ আদায় করিতে ঝামেলা ও অসুবিধা পোহাইতে হয়, যে ঋণের জন্য বার বার তাগিদ দিতে হয়, কিংবা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়-বহুল হিসাব পত্র রাখিতে হয়, উহার সুদ ও অপেক্ষাকৃত উচ্চ হয়।

(২) দাদনের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার তারতম্য

সুদের হারের তারতম্য হয় দাদন বাজারের অপূর্ণাংগতা বশতঃ, কিংবা বিভিন্ন দাদন বাজারের মধ্যে নিখুঁত প্রতিযোগিতার অভাব হেতুও। যদি এক বাজার হইতে অন্য বাজারে মূলধনের অবাধ গতিশীলতা না থাকে, তাহা হইলে সুদের হারের পার্থক্য অনিবার্য। এই কারণেই আমাদের দেশে গ্রামীন ব্যাংক, যৌথ কারবারী ব্যাংক, বিদেশীয় বিনিময় ব্যাংক প্রভৃতি যে সকল ঋণ দেয় উহাদের সুদের হার বিভিন্ন।

(৩) অপূর্ণাংগ মূলধন বাজার

পরিশেষে, সুদের হারের পার্থক্য ঋণের মেয়াদের উপরও নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায় যে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সুদ স্বল্প মেয়াদী ঋণের সুদের চাইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ। ইহার প্রধান কারণ এই যে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা বেশী। তবে অনেক সময় দেখা যায় যে, যদি বিনিয়োগকারীর ভবিষ্যৎ আর্থিক অবস্থার উপর সম্পূর্ণ আস্থা থাকে, তাহা হইলে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণেরও অপেক্ষাকৃত অল্প

(৪) ঋণের মেয়াদ তারতম্য

সুদ ধার্য করা হয়। এই জন্যই ব্যাংকের নিকট হইতে জমার অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ (overdraft) করিলে তাহার যে সুদ হয়, তাহা হইতে তমসুক (bond) পত্রের সুদ অপেক্ষাকৃত কম। তমসুক দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পত্র। Overdraft স্বল্প মেয়াদী ঋণ। কিন্তু তমসুক পত্রের ঋণ আদায়ের জন্য কোন ঝামেলা পোহাইতে হয় না; কিংবা এই ধরণের দাদনপত্রের পুনঃবিনিয়োগের অসুবিধা ভোগ করিতে হয় না। সেই জন্য তমসুক পত্রের সুদ অপেক্ষাকৃত কম।

আর্থিক উন্নতি ও সুদ (Economic Progress and Interest) : আর্থিক উন্নতির ফলে দেশে সুদের হাব বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস পায়, তাহা নির্ভর করে দাদন-মূলধনের চাহিদা ও যোগানের অবস্থার উপর।

দেশে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন (scientific inventions), উৎপাদন পদ্ধতির আবিষ্কার ও সাধারণ উন্নয়ন হইলে দাদন-মূলধনের ভবিষ্যৎ চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে।

বৈজ্ঞানিক অবিষ্কার-উদ্ভাবন ও সুদের হারের বৃদ্ধি ও হ্রাস

সাধারণ আর্থিক উন্নতি ও নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী, ঘুরান এবং কর্মবিভাগ ব্যাপক হইতে বাধ্য। উৎপাদনের ঐ অবস্থায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য দাদন চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। ফলে সুদের হারও বৃদ্ধি পাইবে। অন্যদিকে, অনেকে আবার বলেন যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে ও নূতন আধুনিকতম কলকজা যন্ত্রপাতি প্রয়োগে শিল্পায়নে সাধারণ উৎপাদকতা বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগকৃত কারকগণের অর্থ-আয়ও বাড়ে। এই অর্থ-আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় বৃদ্ধি পায়। ফলে, দাদন যোগান বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হারও হ্রাস পায়।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং সাধারণ আর্থিক উন্নতির দুই বিপরিত-মুখী পরিণাম আমরা উপরে নির্দেশ করিলাম। সুদের হারের উপর আর্থিক

আর্থিক উন্নতিতে সুদের হারের হ্রাস

উন্নতির চরম ফলাফল কি, তাহা উপরি উক্ত দুই বিপরীতমুখী পরিণামদ্বারা ধার্য হয়। সাধারণভাবে বলা যায় যে, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এবং আর্থিক উন্নতির ফলে সুদের হার নিম্নগামী হয়। ইহার কারণ এই যে, উন্নত দেশগুলিতে জন সংখ্যা মোটামুটি স্থির থাকে কিংবা হ্রাস পায়। ফলে, দ্রব্য চাহিদাও স্থায়ী হয়, কিংবা নিম্নগামী হয়; বৃদ্ধির কোন লক্ষণই দেখা যায় না। সেই কারণে, দাদনের চাহিদা হ্রাস পাইয়া সুদের হার কমিতে থাকে। ইহা ছাড়া, আর্থিক উন্নতিশীল দেশে লোকের আয়স্তর বৃদ্ধির সংগে সংগে খাদন প্রবণতা (propensity to

consume) হ্রাস পায়। সাম্প্রতিক খাদন ব্যয় হ্রাসের ফলে, দাদন মূলধনেরও চাহিদা কমে ও সুদের হার হ্রাস পায়।

কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা অনুমান করিতে পারি না যে, সুদের হার হ্রাস পাইতে পাইতে একেবারে শূন্য হইয়া যাইবে। সুদের হার শূন্য হওয়ার অর্থ দাদন মূলধনের কোন প্রান্তিক উৎপাদকতাই নাই ; অর্থাৎ মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়াও মোট আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়, যেন আমরা আমাদের সকল অভাব পূরণ করিয়া ফেলিয়াছি। বর্তিষ্ণু (static) আর্থিক অবস্থায়ই ইহা কেবল কল্পনা করা যায়। দাদন যোগানের দিক হইতেও বলা যায় যে, সুদের হার শূন্য হইতে পারে না। কেননা, পুরস্কার স্বরূপ কোন অর্থমূল্যের আকর্ষণ না থাকিলে দাদন যোগান বাজারে পাওয়া সম্ভব হইবে না।

সুদের হার শূন্য হইতে পারে না

সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায় সুদের অবস্থা (Position of Interest in Socialist Economy) : সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থায়, যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং কারক ও যন্ত্রসমূহ সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হইয়াছে, মূলধনের অর্থমূল্য সুদ বলিয়া কিছু নাই, ইহাই সাধারণের ধারণা। সেখানে রাষ্ট্র সমস্ত সম্পদ ও মূলধনের মালিক বলিয়া দাদন ও সুদের প্রশ্ন উঠে না।

কিন্তু এই সাধারণ ধারণা সত্য নহে। কেন না, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে যে সকল পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্য সমাধা করিতে হয়, তাহার জন্য প্রচুর মূলধনের প্রয়োজন। এই মূলধন শিল্পোৎপাদন ও ব্যবসায় সম্পত্তির আয় হইতে রাষ্ট্র সংগ্রহ করিতে পারে না। টাকার বাজার (money market) হইতে উপযুক্ত হারে সুদ দিয়া উহাকে ঋণ গ্রহণ করিতে হয়। এমন কি, যদি প্রয়োজনানুরূপ সমস্ত মূলধনের মালিকই রাষ্ট্র হয় ও উহাকে বাহিরের টাকার বাজার হইতে কিছু মাত্র ঋণ গ্রহণ করিতে নাও হয়, তাহা হইলেও সুদের গুরুত্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বিনিয়োগকৃত মূলধনের আগম হিসাবে সুদের হার রাষ্ট্রীয়পুঁজির যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে ইংগিত ও নির্দেশ দিয়া থাকে। যে বিনিয়োগ হইতে আগম অপেক্ষাকৃত অধিক লাভ হয়, মূলধনের পরিমাণ রাষ্ট্র সেই ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যবহার করে ; রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যই দেখা যে, পুঁজি সম্পদের যাহাতে বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে আদর্শ বিনিয়োগ হয়। সুদের হার এ বিষয়ে রাষ্ট্রের পথ নির্দেশক।

অনুশীলনী

1. Discuss the nature of interest and explain the necessity of paying it. (B. A. & B. Com '52).
2. Explain how marginal productivity influences interest. (B. A. '53, '56).
3. Discuss the statement that the rate of interest is determined by demand for and supply of money. (B.Com.'55).
4. Explain Keynes' liquidity preference theory of interest. (B. A. '56).
5. Discuss the influence of the desire to save on the rate of interest. (B. A. Hons. '53).
6. Account for the differences in the rates of interest on loans of different kinds, with special reference to the long term and short term rates of interest. (B. A. Hons. '56).

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

মজুরি (Wages)

শ্রমের মূল্যকে মজুরি বলে। সুদের যেমন প্রকৃত হার আছে, মজুরির সেরূপ কোন প্রকৃত হার নাই। সুদের প্রকৃত হার কোন এক কর্জ বাজারে সর্বত্র সমান হয়; কিন্তু মজুরির হার বাজারের সর্বত্র এক নয়। মজুরি আবার এক ক্ষেত্রে বিশেষ করিয়া খাজনা হইতেও পৃথক। বিভিন্ন পর্যায়ের জমির খাজনার মধ্যে পার্থক্য যত বেশী দেখা যায়, বিভিন্ন শ্রেণীর শ্রমিকের মজুরি-পার্থক্য তত বেশী হয় না। তাহা ছাড়া, খাজনার কোন সাধারণ হার নাই; কিন্তু মজুরির একটা সাধারণ হার আছে। পণ্যমূল্যের স্তরের মতই মজুরির সাধারণ হারের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে, আর তাহা আমরা পরিমাপ করি অর্থের নিরূপে।

শ্রমিককে মজুরি সাধারণতঃ দুই রকম ভাবে দেওয়া হয়:—

(ক) শ্রমিক কতটা কাজ করিয়াছে, তাহার ভিত্তিতে এবং (খ) শ্রমিক কতটা সময় খাটিয়াছে, তাহার ভিত্তিতে। প্রথম পদ্ধতিকে **কাজানুসার-মজুরি**

(piece wages) ও দ্বিতীয় পদ্ধতিকে **সময়ানুসার-মজুরি** (time wages) বলা হয়। শ্রমিকের কাজ যখন পরিমাপ করা যায়, এবং মালিক যখন উৎপন্ন বৃদ্ধি করিতে ইচ্ছুক, তখন কাজানুসার-মজুরি অধিকতর পছন্দনীয়। অপরপক্ষে, শ্রমিকের কাজ যদি পরিমাপ করা সম্ভব না হয়, আর গুণানুসার উৎপাদন যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, তাহা হইলে সময়ানুসার-মজুরিই অধিকতর অভিপ্রেত। এই দুই পদ্ধতি ছাড়া, অনেক সময় মজুরির হার রাষ্ট্রের আইনদ্বারাও বাঁধিয়া দেওয়া হয়।

মজুরির রকম ফের : কাজানুসার ও সময়ানুসার-মজুরি

শ্রমের মজুরি বলিতে শুধু **অর্থ কিংবা নামীয় মজুরি** (**money or nominal wages**) বুঝায় না; **বাস্তব মজুরিকেও** (real wages) শ্রমিকের আয় ভুক্ত করা হয়। নামীয় মজুরি বলিতে শ্রমিকের সেই অর্থ-আয় বুঝায়, যাহা সে দিন হিসাবে, সপ্তাহ হিসাবে, কিংবা মাস হিসাবে তাহার শ্রমের পুরস্কার মূল্য হিসাবে পায়। অপরপক্ষে, কাজ বা ব্যক্তির আনুসংগিক যে সকল সুযোগ সুবিধা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য শ্রমিক অর্থ-মজুরি ছাড়া অতিরিক্তভাবে ভোগ করে, তাহাকে বাস্তব মজুরি বলা হয়। The real wages of labour may be said to consist in the quantity of necessaries and conveniences of life that are given for it, its nominal wages is the quantity of money.

অর্থ বা নামীয় মজুরি ও বাস্তব মজুরি

শ্রমিকের বাস্তব মজুরি অর্থ মজুরি ছাড়া নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর নির্ভরশীল :

প্রথমতঃ, দেশের মূল্য স্তর যদি বৃদ্ধি পায় এবং সেই হেতু অর্থের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পায়, তাহা হইলে শ্রমিকের অর্থমজুরি অধিক হইলেও প্রকৃত সুখ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ততটা পরিমাণ ঘটে না।

দ্বিতীয়তঃ, বৃত্তির স্থায়ীত্ব ও অস্থায়ীত্ব : শ্রমিকের বৃত্তি যদি দীর্ঘ স্থায়ী হয়, তাহা হইলে অর্থ-মজুরি ম পাইলেও, অস্থায়ী কাজের তুলনায় বাস্তব মজুরি বেশী পাইবে।

তৃতীয়তঃ, বাস্তব মজুরি নির্ণয় করিতে কাজের পরিবেশ, শ্রমভার, সম্মান বোধ প্রভৃতিও যাচাই করা হয়।

চতুর্থতঃ, অতিরিক্ত বা অনুপূরক আয়ের সম্ভাবনা, কিংবা অদূর ভবিষ্যতে পদোন্নতির আশা প্রভৃতি শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে।

পরিশেষে, শ্রমিকের মজুরি, মালিকের দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যবহারের উপরও বিশেষ নির্ভর করে। মালিক যদি সহানুভূতি সম্পন্ন হইয়া শ্রমিকের অভাব অভিযোগ দূর করিতে যত্নশীল হয়, তাহা হইলে শ্রমিক অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে কাজ করিতে স্বীকার করে।

অর্থ-মজুরি ও বাস্তব মজুরির পার্থক্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পার্থক্য দেখিয়াই আমরা বিভিন্ন দেশের কিংবা বিভিন্ন সময়কার শ্রমিকের আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক ধারণা করিতে পারি। **The labourer is rich or poor, is well or ill rewarded, in proportion to the real not the nominal wages of labour.** অন্যান্য বিষয়ের যদি কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে অর্থ আয় বৃদ্ধি এবং জীবন যাত্রার ব্যয়ের কম্‌তির সংগে সংগে বাস্তব মজুরি বৃদ্ধি পাইবে।

মজুরি তত্ত্ব (Theories of Wages)

মজুরি ব্যাখ্যানের বহু মতবাদ বহু অর্থবিদ্যাবিদ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। একক ভাবে দেখিতে গেলে, এই সকল মতবাদের কোনটাই মজুরির পূর্ণাংগ বিশ্লেষণ নয়। তবে প্রত্যেকটি মতবাদের মধ্যেই যে মজুরি নির্ধারণের কিছু কিছু সত্য উপাদান আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সেইদিক হইতে বিভিন্ন মতবাদগুলি প্রণিধান যোগ্য। আমরা প্রধান প্রধান কয়েকটি মতবাদ এখানে অলোচনা করিলাম।

জীবন নির্বাহের তত্ত্ব (Subsistence Theory) : এই তত্ত্বের সারমর্ম এই যে, স্বাভাবিক মজুরির হার জীবন নির্বাহ স্তরের সমান হয়। জীবন নির্বাহ স্তর নির্ধারিত হয় সেই সকল উপাদানদ্বারা, যাহা শ্রমিকের পরিবারকে ও নিজেকে ভরণ-পোষণ করিতে পারে। মজুরির হার যদি জীবন নির্বাহ স্তরের চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত মজুরি শ্রমিকের পরিবারের জন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত করিবে। আবার, মজুরির হার যদি জীবন নির্বাহ স্তরের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে শ্রমিক ভবিষ্যতে তাহার পরিবারের লোক সংখ্যা নিরোধ করিতে যত্নবান হইবে। ফলে, শ্রমের যোগান হ্রাস পাইবে ও মজুরির স্তর ঊর্ধ্বগামী হইবে।

জীবন নির্বাহ তত্ত্বের বড় গলদ এই যে, ইহা অধুনা বর্জিত ম্যালথাসের জনসংখ্যা মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ম্যালথাসের অনুমান যে, মজুরির হার

বৃদ্ধি পাইলেই সংগে সংগে লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইবে, ইহা সত্য নহে। বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে বলা যায় যে, মজুরি বৃদ্ধির সংগে মানুষের জীবন-যাত্রার মান উন্নীত হয় এবং তাহার ফলে, জনসংখ্যা নিরোধ অনিবার্য হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব মজুরি পার্থক্যের প্রকৃত কারণ নির্দেশ করিতে পারে না। সকল শ্রেণীর শ্রমিকের বেলায়ই জীবননির্বাহের স্তর মোটামুটি সমান। কিন্তু শ্রমিক সমজাতীয় নহে; শ্রমিকের যোগান শুধুমাত্র জীবন নির্বাহের তথাকথিত সমান স্তরদ্বারা নির্ধারিত হয় না, জীবন-যাত্রার মানের উপরেও উহা বিশেষভাবে নির্ভরশীল।

পরিশেষে, জীবন নির্বাহ তত্ত্ব মজুরির আংশিক বিশ্লেষণ মাত্র। মজুরি নির্ধারণের পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যান ইহা করিতে পারে না। মজুর যোগানের বিভিন্ন নির্ধারকের মধ্যে উহা একটি মাত্র নির্ধারকের কথা উল্লেখ করে। শ্রমিকের চাহিদা কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহা এই তত্ত্বে একেবারে বাদ দেওয়া হইয়াছে।

মজুরি তহবিল তত্ত্ব (Wages Fund Theory) : এই তত্ত্বের মর্ম এই যে, মজুরি জনসংখ্যা ও মূলধনের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। "Wages depend on the proportion between population and capital." 'জনসংখ্যা' বলিতে বুঝায় শ্রমিকের সেই সংখ্যাকে যাহারা মজুরি লইয়া কাজ করে; আর মূলধন বলিতে চলতি মূলধনের সেই অংশকে বুঝায়, যাহা শ্রম ক্রয় করিতে সরাসরি ব্যয় হয়।

মজুরি তহবিল তত্ত্বটির সুসংবদ্ধ বিশ্লেষণ আমরা পাই জে, এস্, মিলের (J. S. Mill) নিকট হইতে। এই তত্ত্ব সম্পর্কে মিলের মন্তব্য এই : শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে মূলধনের সহায়তার উপর। মূলধন উৎপত্তি হয় পূর্বের সঞ্চয় দ্বারা। মূলধনের যে অংশটা সরাসরি শ্রমিক বিনিয়োগ করিতে ব্যয়িত হয়, উহা স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয়। এই অংশটাকে মজুরি তহবিল বলে। শ্রমিকের চাহিদা বলিতে এই মজুরি তহবিলকেই বুঝায়। মজুরির গড়পড়তা হার নির্ণয় হয় মজুরি তহবিলকে শ্রমিকের সংখ্যাদ্বারা ভাগ.করিয়া। মজুরির হার বৃদ্ধি হইবে, হয় মজুরি তহবিল বৃদ্ধি করিয়া, কিংবা শ্রমিকের সংখ্যা সংকোচন করিয়া। কিন্তু মজুরি তহবিলের বৃদ্ধি খুব তাড়াতাড়ি ঘটিতে পারে না; কেননা, সঞ্চয় বৃদ্ধি হয় ধীর প্রক্রিয়াদ্বারা। অতএব অনুসিদ্ধান্ত হিসাবে বলা যায় যে,

শ্রমিক যদি তাহার অর্থ-মজুরি বৃদ্ধি করিতে চাহে, তাহা হইলে তাহাকে সন্তান-সন্ততির জন্ম নিয়ন্ত্রণ অবশ্য করিতে হইবে। যদি মজুর তহবিলের সম্প্রসারণ না হয়, কিংবা জন্ম নিরোধও না করা হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের সাধারণ মজুরি বৃদ্ধি অসম্ভব।

মজুরি তহবিল তত্ত্বের প্রধান গলদ এই যে, ইহা যে অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত, তাহা সত্য নহে। ইহা অনুমান করে যে, যে মূলধনের দ্বারা মজুরি তহবিল গঠিত হয়, উহা স্থির। কিন্তু ইহা বাস্তব সত্য নহে। মূলধনের যোগান নম্য ; ব্যবসায় বাণিজ্য বৃদ্ধির সংগে সংগে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, মজুরি মূলধনের তহবিল হইতে দেওয়া হয় না, ইহা দেওয়া হয় জাতীয় আয় হইতে। জাতীয় আয় একটি তহবিল নয়, ইহা আয় প্রবাহ। এই আয় প্রবাহ হইতে শ্রমিক তাহার মজুরি হিসাবে যাহা পাইবে, তাহা নির্ভর করে একদিকে শ্রমিকের উৎপাদকতার উপর, অন্যদিকে মালিকদের মধ্যে বর্তমান প্রতিযোগিতার উপর।

পরিশেষে, এই তত্ত্বের আর একটি গলদ এই যে, ইহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করে যে, শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধি অনেক সময় মোট উৎপন্ন আয় দ্বারা বৃদ্ধি ঘটিতে পারে এবং তাহাদ্বারা বণ্টিত মজুরির হার উর্ধ্বগামী হইতে পারে।

অবশিষ্ট স্বত্বার্থী (বা দাবিদার) তত্ত্ব (Residual Claimant Theory) : মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ ওয়াকার (Walker) মনে করেন যে, খাজনা, সুদ ও মুনাফা প্রভৃতি কারকমূল্য নির্দিষ্ট বিধিদ্বারা নির্ধারিত হয়। অন্যান্য কারকগণ তাহাদের অর্থ-আয় লাভ করিবার পর যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাহাই মজুরি হিসাবে শ্রমিক পাইয়া থাকে। এই তত্ত্ব স্বীকার করে যে, শ্রমিকের প্রগুণতা বৃদ্ধি মজুরি বৃদ্ধির সহায়ক।

মজুরি নির্ধারণের সেরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই

এই তত্ত্বের অনেক গলদ আছে। প্রথমতঃ শ্রমিকের যোগানের উঠা-নামা যে মজুরির হারকে প্রভাবান্বিত করিতে পারে, তাহা এই তত্ত্ব অস্বীকার করে। দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক সংঘ কেমন করিয়া মজুরির হার বৃদ্ধি করিতে সক্ষম হয়, তাহা এই তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে নাই। তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বের বিরুদ্ধে বলা যায় যে, প্রকৃত অবশিষ্ট দাবিদার সংগঠন-কর্তা, শ্রমিক নয়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব (Marginal Productivity Theory) : জাতীয় আয় বণ্টনের সাধারণ নিয়ম প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব প্রয়োগদ্বারাও মজুরির

ব্যাখ্যান করা যায়। যাহারা এই মতবাদের পৃষ্ঠপোষক তাঁহারা মনে করেন যে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান হয়।

শ্রমিকের চাহিদা প্রত্যক্ষ নয়। যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে শ্রম নিয়োগ করা হয়, তাহার চাহিদাই শ্রমের চাহিদা নিয়মিত করে। দ্রব্যের চাহিদা যদি নম্য হয়, তাহা হইলে শ্রমের চাহিদাও নম্য হইবে। মালিক যখন শ্রম নিয়োগ করে, তখন দ্রব্যের চাহিদাই তাহার একমাত্র লক্ষ্যনীয় বিষয় নয়। শ্রমিকের উৎপাদকতা কি এবং উহার দরুণ বাজার দামই বা কি দিতে হইবে, তাহাও মালিকদের বিশেষ ভাবিবার বিষয়। অন্যান্য কারক বিনিয়োগ স্থির রাখিয়া, মালিক যদি শ্রমের বিনিয়োগ পরিমাণ কেবলই বৃদ্ধি করিতে থাকে, তাহা হইলে মোট উৎপত্তি বৃদ্ধি পাইবে সত্য, কিন্তু কিছুকালের মধ্যে শ্রমের বিনিয়োগ বৃদ্ধির অনুপাতে মোট উৎপত্তির অনুপাত বৃদ্ধি হইবে অপেক্ষাকৃত কম। অর্থাৎ ক্রম হ্রাসমান উৎপাদকতা বিধি (law of diminishing productivity) কার্যকরী হইবে। মালিক অতিরিক্ত বিনিয়োগ উৎপাদনের সেই স্তরে আসিয়া বন্ধ করিবে, যেখানে এক একক শ্রম নিয়োগ করার খরচ অতিরিক্ত মোট উৎপত্তি মূল্যের (প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার) সমান হইবে। অর্থাৎ শ্রমিককে সেই মজুরি দেওয়া হইবে, যাহা উহার প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান এবং প্রান্তিক শ্রমিক যে মজুরি পাইবে অন্যান্য শ্রমিকের হারও তাহাই হইবে, কেননা এই তত্ত্বে সকল শ্রমিককে একই জাতীয় অনুমান করা হইয়াছে।

মনে রাখিতে হইবে যে, পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতায় কোন একজন মালিক ব্যক্তিগত-ভাবে মজুরি নির্ধারণ করিতে পারে না। শ্রমের বর্তমান বাজার মূল্য প্রত্যেক মালিককে মানিয়া লইয়া, প্রত্যেকে সেই পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে, যাহাতে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতা বাজারের বর্তমান মজুরির হারের সংগে সমান হয়।

প্রান্তিক উৎপাদকতা মজুরি তত্ত্বের বহু গলদ ও ব্যত্যয় আছে। জাতীয় আয় বণ্টনে এই তত্ত্বের প্রয়োগ সম্পর্কে আমরা এই গলদ ও ব্যত্যয়গুলির বিশদ আলোচনা করিয়াছি।

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বে অনুমানগুলি অবাস্তব। পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতা, পূর্ণ কর্মনিয়োগ, এক বৃত্তি হইতে অপর বৃত্তিতে শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা, সকল রকম শ্রমিকের সমজাতিত্ব এবং শ্রম ছাড়া অন্যান্য কারক বিনিয়োগ অপরিবর্তনীয় অনুমান করা, এক বর্তিষ্ণু অর্থব্যবস্থায়ই সম্ভব। প্রগতিশীল বাস্তব জগতে এই অনুমানের কোনটাই সত্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব শ্রমিকের চাহিদার দিকটা আংশিক ভাবে আলোচনা করে, শ্রমিক যোগান কোন্ কোন্ বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহার কোন গুরুত্ব এই তত্ত্বে দেওয়া হয় নাই।

তৃতীয়তঃ, কোন একটি কারকের বিশেষ করিয়া নিজের একক উৎপাদকতা নাই; বিভিন্ন কারকের উৎপাদকতা একমাত্র তখনই দৃষ্ট হয়, যখন উহারা সম্মিলিত ভাবে পণ্য উৎপাদন করে। কোন উৎপন্ন পণ্য হইতে একটি কারকের উৎপাদকতা পৃথকভাবে তফাৎ করা যায় না। ফলে, ইহার প্রান্তিক উৎপাদকতা নির্ণয় করাও অসম্ভব হয়।

চতুর্থতঃ, এই তত্ত্বের অনুমান যে, মালিক অন্যান্য কারক বিনিয়োগ অপরিবর্তনীয় রাখিয়া, যদৃচ্ছাক্রমে অল্প পরিমাণে শ্রম বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া যাইতে পারে তাহাও সর্বৈব সত্য নয়। বিভিন্ন কারক-এককের সংমিশ্রিত বিনিয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে উৎপাদনের সাম্প্রতিক কারিগরি অবস্থার উপর, মালিকের খুসীর উপর নহে।

বাট্টাকৃত প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব (Discounted Marginal Productivity of Labour): বাট্টাকৃত প্রান্তিক উৎপাদকতা তত্ত্ব প্রান্তিক উৎপাদকতা মজুরি তত্ত্বের পরিমার্জিত সংস্করণ। মার্কিন অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক টসিগ্ (Taussig) এই তত্ত্বের আবিষ্কর্তা। তিনি বলেন, মজুরি শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান নয়; কেননা, শ্রমের নিজের কোন পৃথক উৎপাদকতা নাই। শ্রম মূলধনের সংগে সহযোগিতা করিয়া দ্রব্য উৎপাদন করে। সম্মিলিত উৎপত্তি (joint product) হইতে শ্রম কিংবা মূলধনের প্রত্যেকের পৃথক উৎপাদকতা নির্ধারণ করা যায় না। তাছাড়া, টসিগের মতে মূলধন একটি পৃথক উৎপাদক কারকই নয়। মূলধন চুরি করা শ্রম (stolen labour) ছাড়া আর কিছু নহে। টসিগ্ সংগঠনকেও একটি পৃথক উৎপাদক কারক বলিয়া অস্বীকার করেন। সংগঠনের পুরস্কার-মূল্য, তাঁহার নিকট মজুরির সামিল।

টসিগ্ মনে করেন, শ্রমিক প্রান্তিক উৎপত্তির (marginal output) মোট মূল্যই মজুরি হিসাবে পায় না। (প্রান্তিক উৎপত্তি বলিতে তিনি বুঝেন, প্রান্তিক জমিতে শ্রমিকের মোট উৎপত্তি।) ইহার কারণ এই যে, উৎপাদন দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া বিশেষ। শ্রমিকের পণ্য উৎপাদন সমাধা করিতে প্রচুর সময় লাগে। এই সময় তাহাদের কার্যে নিযুক্ত রাখিতে অগ্রিম অর্থ দিতে হয়। মালিক কিন্তু তাহা বলিয়া শ্রমিকের সম্ভাব্য প্রান্তিক উৎপত্তি

মূল্য পুরোপুরি ভাবেই অগ্রিম দেয় না। অগ্রিম দেওয়ার জন্য যে ঝুঁকি সে ঘাড়ে নেয়, তাহার জন্য শতকরা কিছুটা অর্থ বর্তমান স্বদের হারে সম্ভাব্য উৎপত্তি হইতে কাটিয়া রাখে। সুতরাং, প্রান্তিক জমিতে শ্রমের মোট উৎপন্ন মূল্য হইতে শ্রমিকদের অগ্রিম দেওয়ার ঝুঁকি বাবদ বাট্টা কাটিয়া রাখিলে, বাকী যাহা থাকে, মজুরি হয় তাহার সমান।

কিন্তু অধ্যাপক টসিগের মতবাদ ঘোরালো ভুল তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত। তত্ত্ব ব্যাখ্যানে তিনি অনুমান করিয়াছেন যে, মজুরির হার স্থির করিবার পূর্বে সুদের হার জানা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মূলধনের যে প্রান্তিক উৎপাদকতা সুদের হার নির্ধারণ করে, তাহা মজুরি স্থির করিবার আগে জানিতে পারা যায় না। টসিগের মতবাদ যে—মজুরির হার এবং সুদের হার অগ্রিম দেওয়ার একই প্রক্রিয়াদ্বারা স্থির করা যায়—উহা একটি বৃত্তাকারে ঘোরালো তর্ক বিশেষ। টসিগের তত্ত্বের আর একটি গলদ এই যে, ইহা অনুমান করে যে, শ্রমের যোগান স্থির এবং প্রান্তিক উৎপত্তি পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, টসিগের মজুরির তত্ত্ব অবশিষ্ট দাবিদার তত্ত্বেরই নামান্তর মাত্র। আসলে তাঁহার তত্ত্বের ইংগিত এই যে, খাজনা, সুদ ও মুনাফা মোট উৎপত্তি হইতে কাটিয়া রাখিলে, অবশিষ্টাংশ যাহা থাকে, তাহাই মজুরি। অবশিষ্ট দাবিদার মজুরি তত্ত্বের সকল গলদ ও অসংগতিগুলিই টসিগের ব্যাখ্যান সম্পর্কে প্রযোজ্য।

চাহিদা ও যোগানের নিয়ম প্রয়োগদ্বারা মজুরি নির্ধারণ (Determination of Wages by the Application of the Law of Demand and Supply) : পণ্যমূল্য নির্ধারণের মূল নীতি চাহিদা ও যোগান বিধিদ্বারা আধুনিকেরা মজুরির ব্যাখ্যান করিয়া থাকেন।

শ্রমের চাহিদা প্রত্যক্ষ নয়, উদ্‌ভূত বা পরনির্ভর চাহিদা। শ্রমের চাহিদা নির্ভর করে, যে দ্রব্য উৎপাদনে উহা বিনিয়োগ করা হয়, উহার চাহিদার উপর। শ্রমের মূল্যও নির্ভর করে, যে দ্রব্য উহা উৎপাদন করে, উহার বাজার মূল্যের উপর। মালিক প্রতিষ্ঠান যখন শ্রম নিয়োগ করে, তখন দুইটি বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে তাহার উদ্বেগ থাকে—পণ্য-বাজার ও কারক-বাজার। তাহার লক্ষ্য এই দুই বাজারেই চরম (maximum) মুনাফা শিকার করা। পণ্য-বাজারে যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বিরাজ করে, তাহা হইলে মালিক-প্রতিষ্ঠান চরম মুনাফা লাভ করিবে সেই পরিমাণ পণ্য-যোগান দিয়া, যাহাতে

উহার প্রান্তিক আয় (marginal revenue) ও প্রান্তিক খরচ (marginal cost) সমান হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় কারক বাজারে কোন মালিক যখন শ্রম নিয়োগ করে, তখন এককভাবে শ্রমের মূল্য (মজুরি) নির্ধারণ করিতে সে পারে না। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায়, বাজারে অগণিত মালিক প্রতিষ্ঠান বর্তমান থাকায়, একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান এককভাবে শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণ করিতে পারে না। শ্রমের বর্তমান বাজার মূল্যে (prevailing rate of wages) কতটা পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করা চলে, তাহাই মাত্র মালিক প্রতিষ্ঠান ধার্য করিতে পারে। বর্তমান মজুরির হারে কতটা পরিমাণ শ্রম নিয়োগ করিবে, উহা নির্ধারণ করিবে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতাদ্বারা। মালিক যখন প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রম বিনিয়োগ করে, তখন তাহার লক্ষ্য থাকে ঐ অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে প্রতিষ্ঠানের আয় (revenue) উৎপাদকতা কতটা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ তাহার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা (marginal revenue productivity) লাভ কতটা হয়। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রান্তিক উৎপত্তির পরিমাণের সহিত উৎপন্ন পণ্যের বাজার-মূল্য গুণ করিলেই প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা নির্ণয় করা যায়। (marginal revenue productivity = marginal physical productivity × price). শ্রমের চাহিদা এই প্রান্তিক আয় উৎপাদকতাদ্বারাই ধার্য হয়। ৪৭নং চিত্রে (৩০৬ পৃঃ) লক্ষ্য করা যায় যে, প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার বক্র রেখাই মালিকের শ্রম চাহিদা রেখা; অবশ্য, অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রম নিয়োগের কালে, মালিক এই প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার সহিত শ্রমের নিয়োগ খরচ তুলনা করিয়া দেখে।

মালিক প্রতিষ্ঠান শ্রম বিনিয়োগের সময় আর একটি জিনিষ দেখে। অতিরিক্ত শ্রম নিয়োগের ফলে শ্রমের গড়পড়তা আয় উৎপাদকতা (average revenue productivity) কতটা হয়। কোন বিনিয়োগে শ্রমের গড়পড়তা আয় উৎপাদকতা নির্ণয় করা যায়, প্রতিষ্ঠানের মোট আয়কে বিনিয়োগকৃত শ্রমিকের সংখ্যাদ্বারা ভাগ করিয়া। (average revenue productivity of labour = total revenue ÷ number of men employed). পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালে সাম্যাবস্থায় প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা ও গড়পড়তা আয় উৎপাদকতা সমান হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা গড়পড়তা আয় উৎপাদকতার চেয়ে অধিক থাকে, ততক্ষণ মালিক অতিরিক্ত শ্রমিক নিয়োগ করিতে থাকিবে।

আবার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা যদি গড়পড়তা আয় উৎপাদকতার চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে মালিক শ্রমিক ছাটাই করিবে।

শ্রমের যোগান আবার বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমের যোগান নির্ভর করে, ঐ শ্রমের মজুরির হারের উপর। বাজারে মজুরির হার বৃদ্ধি পাইলে ঐ শ্রেণীর শ্রমের যোগান বৃদ্ধি হইবে। আর মজুরির হার কমিলে ঐ শ্রেণীর যোগানও কমবে। সমষ্টিগতভাবে শ্রমের যোগান নির্ভর করে, দেশের জনসংখ্যার উপর; তাহাদের মধ্যে কি সংখ্যক শ্রম করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক, শ্রমিকের সাধারণ জীবনযাত্রার মান কি, প্রভৃতি বিষয়ের উপর।

আমরা জানি, পণ্য যোগানের সময় বিক্রেতার তরফ হইতে দ্রব্যের প্রান্তিক ও গড়পড়তা খরচের বিশেষ গুরুত্ব আছে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় প্রত্যেক শ্রমিক যখন শ্রম যোগায়, তখন শ্রমের যোগান বক্র রেখা হয় সমান্তরাল (আনুভৌমিক) সরল রেখা। এই যোগান বক্র রেখাই শ্রমের গড়পড়তা খরচ (average cost of labour) এবং শ্রমের প্রান্তিক খরচ (marginal cost of labour) সূচিত করে। মালিক প্রতিষ্ঠান শ্রম নিয়োগ করিয়া সাম্যাবস্থায় পৌছিবে সেই স্তরে, যেখানে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা শ্রমের প্রান্তিক খরচের (বা প্রান্তিক মজুরির) সমান হয়। পূর্ণ প্রতিযোগিতা বলিয়া, শ্রমের গড়পড়তা খরচ (বা গড়পড়তা মজুরি) উহার প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার সমান হইবে। আবার, গড়পড়তা আয় উৎপাদকতাও প্রান্তিক আয় উৎপাদকতার সমান হওয়ায় গড়পড়তা মজুরির সমান। পার্শ্বে চিত্রাংকন দ্বারা বিষয়টি পরিষ্কার করিয়া বুঝান গেল।
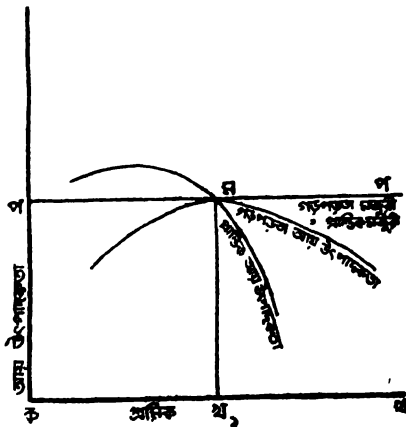
৪৭শ চিত্র

যখন প্রতিষ্ঠান ক খ১ সংখ্যক শ্রমিক নিযুক্ত করে, তখন ইহার সাম্যাবস্থা প্রাপ্তি ঘটে। কেননা, বিনিয়োগের এই স্তরে শ্রমের প্রান্তিক আয় উৎপাদকতা শ্রমের প্রান্তিক খরচের (বা প্রান্তিক মজুরিব) সমান হয় এবং গড়পড়তা মজুরিরও সমান হয়। এই স্তরের

মজুরি খ, ম সাম্য মজুরি (equilibrium wages) ; ইহা গড়পড়তা আয় উৎপাদকতার সমান।

বাস্তব শ্রম-বাজারে মজুরির হার কিন্তু আবার তফাৎ হয়। বাস্তব বাজার পূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতাময় বাজার নয়। শ্রম-বাজারে একমাত্র খরিদ্দার মালিক প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, কিংবা শ্রম যোগান শ্রমিক সংঘের নিয়ন্ত্রনাধীন হইতে পারে। আসল শ্রম-বাজার হয় একচেটিয়া কারবার, নয়তো বা অপূর্ণাঙ্গ প্রতিযোগিতার লক্ষণ ভারাক্রান্ত। এইরূপ বাজারে সঠিক মজুরি নির্ণয়ের কোন বিধি নাই—দরদস্তরের ভিত্তিতে (bargaining) মজুরির সাধারণ স্তর স্থির হয়। এইরূপ বাজারে মজুরি শ্রমিকের প্রান্তিক আয উৎপাদকতার চেয়ে কম হইতে পারে কিংবা অধিকও হইতে পারে।

জীবন যাত্রার মান ও মজুরি (Standard of Living and Wages) : প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদগণ জীবন নির্বাহের স্তর ও মজুরির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ দেখিয়াছেন। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এক দল অর্থনীতিজ্ঞ এই সম্বন্ধ অস্বীকার করেন। উহার স্থলে তাঁহারা শ্রমিকের জীবন যাত্রা ও মজুরির মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নির্দেশ করেন। যাঁহারা এই নূতন সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়াছেন তাঁহারা বলেন যে, মজুরি কেবল মাত্র শ্রমিকের জীবন নির্বাহের স্তরের সংগেই সংগতি রক্ষা করে না ; উহা শ্রমিক যে জীবন যাত্রার মানে অভ্যস্ত তাঁহার সংগেও সংগতি রক্ষা করিয়া থাকে। জীবন যাত্রার মান শ্রমিকের মজুরি নির্ধারণে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

প্রথমতঃ, উচ্চ জীবনযাত্রার মান শ্রমিকের প্রগুণতা বৃদ্ধি করে। এই প্রগুণতা বৃদ্ধির সংগে শ্রমিকের উৎপাদকতা বৃদ্ধি পায় এবং মজুরিও বাড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিকগণ তাহাদের স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মান বজায় রাখিতে যাহা খরচ প্রয়োজন তাহার কম মজুরি গ্রহণ করিতে নারাজ। প্রয়োজন হইলে দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়াও তাহারা ঐ মজুরি শ্রম যোগানের মালিকের কাছ হইতে আদায় করে।

তৃতীয়তঃ, উচ্চ জীবন-যাত্রার মান শ্রমিকের পরিবারের লোক সংখ্যা সংকোচন করিতেও উৎসাহিত করে। শ্রমিক যদি তাহার অভ্যস্ত জীবনযাত্রার মান বজায় রাখিবার উপযুক্ত মজুরি না পায়, তাহা হইলে সে বিবাহ করিবে না, কিংবা পরিবারের লোকসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য আবশ্যকীয় উপায় অবলম্বন করিবে। ফলে, শ্রমিকের যোগান সংখ্যা হ্রাস পাইবে ও মজুরির হারও বাড়িবে।

কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, মজুরি জীবনযাত্রার মান প্রত্যক্ষভাবে বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে না; কেননা, উচ্চ জীবন-যাত্রার মান যেমন একদিকে উচ্চ মজুরি লাভ করিতে সাহায্য করে, তেমনি উচ্চ মজুরি না পাইলে শ্রমিকের পক্ষে উন্নত জীবন-যাত্রার মান বজায় রাখাও সম্ভব নয়। মজুরি বহু বিষয়দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহার মধ্যে শ্রমিকের জীবন-যাত্রা অন্যতম। উন্নত জীবনযাত্রা শ্রমিকের প্রগুণতা বৃদ্ধি করিয়া তাহার দরদস্তুর করিবার ক্ষমতা বজায় রাখিতে, এবং অপ্রত্যক্ষভাবে মজুরি-বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে।

জোটবন্দি দরদস্তুর ও মজুরি নির্ণয় (Collective Bargaining and Wages Determination): বাস্তবতঃ মজুরের বাজার প্রতিযোগিতা পূর্ণ নয়। আসলে মজুর-বাজার অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময়—পাশাপাশি প্রতিযোগিতা ও একচেটিয়া বাজারের উপাদান সংমিশ্রিত। সাধারণতঃ একজন মালিক ও একজন শ্রমিকের ব্যক্তিগত দর-দস্তুরের মাধ্যমে মজুরি স্থির হয় না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মালিক-সংঘ ও শ্রমিক-সংঘের মধ্যে দরদস্তুর ও বোঝাপড়ার দ্বারা মজুরির হার নির্ধারিত হয়। মালিকের পক্ষ হইতে যেমন কেন্দ্রীভূত (concentrated) শ্রম বিনিয়োগ হয়, তেমনি শ্রমিকের তরফ হইতেও কেন্দ্রীভূত শ্রম বিক্রয় হয়। ইহাকেই জোটবন্দি দরদস্তুর বলে।

জোটবন্দি দরদস্তুরের মাধ্যমে যখন মজুরি স্থির হয়, তখন শ্রম-বাজারে রকমারি অবস্থা বর্তমান থাকিতে পারে। এই সকল অবস্থার মধ্যে সকলের চেয়ে প্রধানতম হইল দ্বিপার্শ্ব একচেটিয়া বাজার (bilateral monopoly)। যেখানে সকল মালিক এক মালিক-সংঘের মাধ্যমে এবং সকল মানুষ এক শ্রমিক-সংঘের মাধ্যমে জোটবন্দি দরদস্তুর দ্বারা মজুরির হার স্থির করে। দ্বিপার্শ্ব একচেটিয়া শ্রম-বাজারের আবার রকম ফের হইতে পারে। বাজারের এরূপ অবস্থা হইতে পারে যে, জোটবন্দি দরদস্তুর ব্যাপারে মালিক-সংঘের প্রাধান্যই বলবৎ হইতে পারে। এ অবস্থায় মালিক-সংঘ মজুরির হারই যে কেবল শ্রমিকের প্রান্তিক উৎপন্নের চেয়ে কম করিয়া ধার্য করিবে তাহা নহে, ঐ সংঘ শ্রমের চাহিদা সংক্ষেপ করিয়াও শ্রমিকের কর্ম সংস্থান সংকোচন করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বাজারে যদি শ্রমিক সংঘের অপেক্ষাকৃত অধিক প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে অবশ্য মজুরির হার উর্ধ্ব স্তরে ধার্য হওয়ার সুবিধা হইবে।

তৃতীয়তঃ, যদি মালিক-সংঘ ও শ্রমিক-সংঘের প্রাধান্য সমান সমান হয়, তাহা হইলে জোটবন্দি-দামদস্তুর অনেকটা অনিশ্চয়তার মধ্যেই মজুরি নির্ধারণে সহায়তা

করিবে। এ অবস্থায় অনেক সময় সরকারের হস্তক্ষেপ ও মধ্যস্থতা কিংবা জনমত মজুরি নির্ণয়ে প্রভাব বিস্তার করিবে। মোটামুটিভাবে মজুরির হার প্রতিযোগিতা-পূর্ণ বাজারের মজুরি-হারের কাছাকাছি ধার্য হইলেও শ্রমিকের চাহিদা ছাটাই হইতে বাধ্য। মালিক-সংঘ মজুরির হার হ্রাস করিবার জন্য শ্রম নিয়োগ কমাইবে; আবার শ্রমিক-সংঘ ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য শ্রম যোগান হ্রাস কবিবে। ফলে শ্রমিকের কর্ম নিয়োগ ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় মালিক-সংঘ ও শ্রমিক-সংঘের মধ্যে এমনভাবে গুপ্ত বন্দোবস্ত (collusions) হইতে পারে যে, পণ্য বাজারে মহা বিপর্যয় অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে। শ্রমিক-সংঘ ও মালিক-সংঘ পরস্পর এমনভাবে চুক্তি আবদ্ধ হইতে পারে যে, মজুরি এবং পণ্যমূল্যের উচ্চ হার বাঁধিয়া দেওয়াও অসম্ভব নয়। ঐরূপ অবস্থায় কর্ম নিযোগ ও উৎপন্ন পণ্যের যোগান প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার চাইতে হ্রাস পাইবে।

উদ্ভাবন ও মজুরি (Inventions and Wages) : দেশে নূতন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের ফলে মজুরি বৃদ্ধি পায়, না কমে?

যদি নূতন আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকের চাহিদা কমে, তাহা হইলে শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতা হ্রাস পাইবে ও মজুরিও কমিবে। কিন্তু নূতন আবিষ্কারের ফলে শ্রমিকের তুলনায় যদি মূলধনের চাহিদা হ্রাস পায়, তাহা হইলে মজুরি কমিবে না। বাস্তব ক্ষেত্রে নূতন আবিষ্কারের ফলে মূলধনের তুলনায় শ্রমের চাহিদাই হ্রাস পায় বেশী এবং ফলে মজুরির হারও কমে। তবে দীর্ঘকালীন ফল অন্যরূপ হয। দীর্ঘকালে নূতন আবিষ্কারের ফলে, জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবে ও উহার সংগে মজুরিও বাড়িবে।

উচ্চ মজুরির সুবিধা (Economy of High Wages) : দামী মজুর কি সত্যকারের সস্তা মজুর? (Is dear labour really cheap labour?)

উচ্চ মজুরি দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিলে মালিকের উৎপাদন খরচ সাধারণতঃ বেশী পড়ে। কিন্তু অনেক সময় উচ্চ মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিলে মালিকের মজুরি খরচ কমই পড়ে। শ্রমিক দামী, কি সস্তা, উহা নির্ধারিত হয় সে কি পরিমাণ কাজ করে তাহার উপর।

যদি একজন শ্রমিক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আর একজন শ্রমিকের চেয়ে দশগুণ বেশী কাজ করে, আর মজুরি পায় দ্বিতীয় শ্রমিকের চেয়ে আটগুণ বেশী, তাহা হইলে প্রথম শ্রমিককে নিয়োগ করা অপেক্ষাকৃত সস্তা হইবে। উচ্চ

মজুরিতে নিযুক্ত শ্রমিক অপেক্ষাকৃত কর্মদক্ষ হয়; আর নিম্ন বেতনভুক্ মজুর হয় অপেক্ষাকৃত অপটু।

দ্বিতীয়তঃ, অপেক্ষাকৃত অধিক মজুরি দিলে, শ্রমিক সন্তুষ্ট চিত্তে মনঃপ্রাণ দিয়া কাজ করে, এবং কাজে চিরস্থায়ী হয়। প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সেটাও একটা মস্ত লাভ।

তৃতীয়তঃ, মজুরি বেশী পাইলে, শ্রমিক অধিক যত্ন-সহকারে কাজ করে; প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, কলকব্জা প্রভৃতি দরদ দিয়া নিজের জিনিষের মত ব্যবহার করে; ফলে উৎপাদনের অপচয়ও হয কম। ইহা দামী মজুর নিয়োগের আর একটা বড় সুবিধা।

পরিশেষে, উচ্চ মজুবি দিয়া শ্রমিক নিয়োগ করিলে, শ্রমিকের সততা সাধারণতঃ ক্ষুণ্ণ হয় না এবং সেইজন্য পরিচালন ও তদারকের খরচও কম পড়ে। এই সকল কারণেব জন্য অধুনা প্রায সকল উন্নত দেশেই অধিক মজুরি দিয়া সুদক্ষ, কর্মপটু শ্রমিক নিযোগ করা হইয়া থাকে।

মজুরির তফাৎ (Differences in Wages) : বাস্তব জগতের সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, বিভিন্ন বৃত্তির বিভিন্ন মজুরি। কোন কোন বৃত্তির মজুবি অত্যন্ত উচ্চ, আবার কোন কোন বৃত্তির মজুরি অত্যন্ত নিম্ন। আবার উচ্চতম ও নিম্নতম মজুরির মাঝখানে বিভিন্ন বৃত্তির মজুরির হারও বিভিন্ন। এই মজুরি বৈষম্যের কারণ কি?

যদি শ্রমিক-বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা অনুমান করা যায়, সকল শ্রমিক সমজাতীয় ও তাহাদের গতিশীলতা অবাধ কল্পনা করা হয়, তাহা হইলেও বিভিন্ন বৃত্তির ও স্থানের আপেক্ষিক সুবিধা অসুবিধার জন্য মজুরি-বৈষম্য ঘটিতে পারে। নিম্নলিখিত কারণদ্বারা এই মজুরি-বৈষম্যের ব্যাখ্যান করা যায়।

মজুরি-বৈষম্যের কারণ

প্রথমতঃ, সকল বৃত্তি বা কাজ শ্রমিকের নিকট সমান আকর্ষণীয় বা লোভনীয় নয়। যে কাজ করিতে শ্রমিকের কায়িক পরিশ্রম অধিক দরকার হয়, কিংবা যে কাজ সমাজের চোখে হেয় ও অপমান-সূচক, উহা শ্রমিকের নিকট অপেক্ষাকৃত কম আকর্ষণীয়। এইরূপ কাজে মজুরি অপেক্ষাকৃত বেশী না মিলিলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয় না। অপরপক্ষে, যে কাজে দৈহিক ক্লান্তি কম ও সম্মানজনক, তাহার মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হইলেও শ্রমিক আকৃষ্ট হয়। যেমন, শিক্ষকের বেতন।

দ্বিতীয়তঃ, মজুরি বৈষম্য বৃত্তি শিখিবার সুযোগ সুবিধা ও খরচের আপেক্ষিক তারতম্যের উপরও নির্ভর করে। অনেক বৃত্তি আছে, যাহা শিক্ষা করা সময়-সাপেক্ষ ও ব্যয়-সাধ্য। যেমন, ডাক্তারি কিংবা ইন্‌জিনিয়ারিং প্রভৃতি। এই সকল বৃত্তির মজুরি বা মাহিনা অপেক্ষাকৃত উচ্চ হয়।

তৃতীয়তঃ, বৃত্তির স্থায়িত্ব ও সময়ানুবর্তিতা অনেক সময় মজুরি বৈষম্যের কারণ হইয়া থাকে। যে বৃত্তি দীর্ঘকাল-মেয়াদী ও স্থায়ী, তাহার মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়। অল্পদিনের কাজ কিংবা যে কাজ নিয়মিত সারা বৎসর কায়েমী থাকে না, উহার মজুরি অপেক্ষাকৃত অধিক না হইলে শ্রমিক আকৃষ্ট হয় না।

চতুর্থতঃ, কাজের ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনার উপরেও শ্রমিকের মজুরি বিশেষভাবে নির্ভর করে। যে কাজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল, যে কাজ করিলে অদূর ভবিষ্যতে শ্রমিকের পদোন্নতির সম্ভাবনা থাকে, কিংবা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভের সম্ভাবনা থাকে, সে কাজের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়।

পঞ্চমতঃ, যে কাজের পরিপূরক আয় (Supplementary earnings) বেশী,—অর্থমজুরির সংগে সংগে অতিরিক্ত অন্যান্য সুযোগ সুবিধা লাভ করা যায়,—সে কাজের মজুরি অপেক্ষাকৃত অল্প হয়। যেমন, তহশীলদারের মজুরি।

কিন্তু বাস্তব জগতে মজুরি বৈষম্যের প্রধান কারণ, শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার অভাব। বাস্তব শ্রম-বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা নাই।

মজুরি বৈষম্যের মূল কারণ : শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার অভাব

শ্রমিকগণ সমজাতীয় ও সমপ্রগুণতাসম্পন্নও নয় এবং বৃত্তি হইতে বৃত্ত্যান্তরে অবাধ চলাচলও করিতে পারে না। শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার অভাব হয়ত দেখা যায়, শ্রমিকের নিজের চলাচলের ইচ্ছার অভাব হেতু, কিংবা চলাচলের অনৈসর্গিক প্রতিবন্ধকতার জন্য। অজ্ঞতা, অনিশ্চয়তা, দারিদ্র্য, পরিবারের প্রতি টান প্রভৃতি কারণের জন্য শ্রমিক সাধারণতঃ বৃত্ত্যান্তর গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক। ইহা ব্যতীত, জাতি, ধর্ম, ভাষাগত তারতম্য, অভিবাসন আইন-সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ (immigration laws) প্রভৃতি প্রতিবন্ধকগুলি শ্রমিকের স্থানান্তরে যাতায়াত ও বৃত্ত্যান্তর গ্রহণের পথে বাধা স্বরূপ। শ্রমিক যদি বিশেষ কোন বৃত্তি বহুদিন অবলম্বন করিয়া উহাতে বৈশিষ্ট্য (specificity) লাভ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে সহসা ঐ কাজ ছাড়িয়া বৃত্ত্যান্তর গ্রহণ করাও সহজ নহে। শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতার

অভাবের আর একটি বড় কারণ এই যে, ধনতান্ত্রিক সমাজে **বহু প্রতিযোগিতা-বিহীন শ্রমিক সংঘ** (Non-competing labour groups) বিদ্যমান। কোন এক বিশেষ দলের শ্রমিকের অন্য দলে যাইয়া বৃত্ত্যান্তর গ্রহণ করিবার অবাধ গতিশীলতা নাই এবং ফলে, এক দলের শ্রমিক অন্য দলের শ্রমিকের সহিত প্রতিযোগিতাও করিতে পারে না। যেমন, সামান্য কারিগরী বৃত্ত্যাশ্রয়ী শ্রমিকের উচ্চ শ্রেণীর ইন্‌জিনিয়ারিং দলে ঢুকিবার অবাধ গতিশীলতা নাই কিংবা উহা ঐ দলের শ্রমিকের সংগে অবাধ প্রতিযোগিতাও করিতে পারে না। শ্রমিকের সহজ ও অবাধ গতিশীলতার অভাব হেতুই বিভিন্ন স্থানের বা বৃত্তির সুযোগ সুবিধার তারতম্য ঘটে ; আর সেই তারতম্যই মজুরি বৈষম্যের মূল কারণ।

বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে মজুরির বৈষম্য হয়, তাহারও ঐ একই কারণ। বিভিন্ন দেশের ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি, আইন প্রণালী প্রভৃতির তফাৎ হওয়ায় এক দেশ হইতে দেশান্তরে শ্রমিকের অবাধ গতিশীলতা থাকে না ; ফলে, বিভিন্ন দেশে মজুরিরও তফাৎ হয়। বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও জাতীয় গুণের তারতম্যের জন্যও শ্রমিকের উৎপাদকতার তফাৎ হয় ও তাহার জন্যও মজুরি বৈষম্য ঘটে।

শ্রমিকের উৎপাদকতা ও সংখ্যা তারতম্যের জন্যও বিভিন্ন সময়ে মজুরির হার বিভিন্ন হইতে পারে।

স্ত্রী শ্রমিকের মজুরি কম কেন ? (Why Wages of Women Labour are low ?) : মেয়ে শ্রমিকের মজুরি সাধারণতঃ পুরুষের মজুরির চাইতে কম হয়। ইহার একাধিক কারণ নির্দেশ করা যায়।

প্রথমতঃ, মেয়ে শ্রমিকের কর্ম প্রগুণতা অপেক্ষাকৃত কম। বিশেষ করিয়া যে সকল কাজে কায়িক পরিশ্রম খুব অধিক প্রয়োজন, সেখানে মেয়ে শ্রমিক প্রায়ই অপারগ। তাহাছাড়া, মানসিক পরিশ্রমেও মেয়ে শ্রমিক পুরুষের সমকক্ষ কিনা, সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। মেয়ে শ্রমিক সাধারণতঃ পুরুষের চাইতে কম কর্মক্ষম বলিয়া তাহাদের মজুরিও অপেক্ষাকৃত কম।

দ্বিতীয়তঃ, দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার মেয়ে শ্রমিক সাধারণতঃ গ্রহণ করিতে পারেনা। পরিচালকের কাজ (executive work) চালাইতে তাহারা একরূপ অপারগ বলিলেই চলে। ইহার জন্যও তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়।

তৃতীয়তঃ, বেশীর ভাগ মেয়ে শ্রমিকই স্থায়ী কাজ গ্রহণ করিতে পারে না। সাধারণতঃ বিবাহের পর, কিংবা সন্তান সন্ততি হইবার পর, তাহারা মজুরের

কাজ ত্যাগ করিয়া ঘরকন্না সুরু করে। অস্থায়ী ভাবে কাজ করার দরুণ তাহারা দক্ষতা অর্জন করিবার সুযোগ পায় কম; তাহার দরুণও তাহাদের মজুরি অপেক্ষাকৃত কম হয়।

চতুর্থতঃ, মেয়েদের উপযুক্ত কাজ বা বৃত্তিও সীমাবদ্ধ। কতগুলি বৃত্তি আছে সমাজের চোখে অবজ্ঞাত। সে সকল বৃত্তি মেয়েদের কাছে অবরুদ্ধ। মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যার তুলনায় উহাদের উপযুক্ত বৃত্তি সীমিত বলিয়া, স্বভাবতঃই উহাদের মজুরি কম হয়।

পঞ্চমতঃ, মেয়েদের কোন শ্রমিক সংঘ সুগঠিত না হওয়ায়, তাহাদের জোটবন্দি দরদস্তুর (collective bargaining) করার ক্ষমতা সীমিত এবং জোট করিয়া উচ্চ মজুরি আদায় করার শক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ।

অনুশীলনী

1. Discuss the influences that determine wages. Why are wages higher in the U. S. A. and lower in India? (C. U. B. A. '53)
2. Explain how marginal productivity influences wages. (C. U. B A. '53)
3. What is meant by 'economy of high wages.' (C. U. B. Com. '54)
4. How are wages determined? Is there any relation between wages and the standard of living of the worker? (C. U. B Com '52)
5. Account for the differences in wages in different occupations and grades. (C. U. B. A. '50)
6. Show how (a) inventions and (b) the existence of monopoly affect the rate of wages. (C U B A '55)

ষট্‌বিংশ অধ্যায়

শ্রম সমস্যা (Labour Problems)

শ্রমিক সংঘ (Trade Unions) : মজুরের শ্রমের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা ধ্বংস-প্রবণ। শ্রমিকের কোন সংরক্ষণ ক্ষমতা (reserve power) নাই। সে হয় কোন কাজ করিবে, নয়ত বা উপবাসী থাকিবে। শ্রমিকের বেকার বসিয়া থাকার অর্থই তাহার শ্রমশক্তির অপচয়। সীমিত সংরক্ষণ ক্ষমতার জন্য শ্রমিকের ব্যক্তিগতভাবে দামদস্তুর কারবার শক্তিও (bargaining power) অত্যন্ত অল্প। ইহার দরুণ সে মালিকের কাছ হইতে উচ্চ অর্থমজুরি ও চাকরীর অন্যান্য আনুসঙ্গিক সুযোগ সুবিধা উপযুক্ত পরিমাণ আদায় করিতে পারে না। শ্রমিকের দামদস্তুর করিবার শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, বা যাহাতে অর্থ-আয় ও চাকুরির বিভিন্ন সর্ত তাহার অনুকূলে হয়, সেই উদ্দেশ্য লইয়াই শ্রমিক সংঘের গোড়া পত্তন।

শ্রমিক সংঘের কার্যাবলী

সংঘের মাধ্যমে শ্রমিকের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সংঘ সংগঠনের দ্বারা শ্রমিকের জোটবন্দি দাম-দস্তুর করিবার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় ; চাকুরির অনুকূল সর্ত ও উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা দাবী আদায় করিতে পারে এবং জীবন-যাত্রার সাধারণ মান উন্নয়নের পথও সুগম করিতে পারে। শ্রমিক সংঘের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই, উচ্চ অর্থমজুরি আদায় এবং সংগে সংগে শ্রমিকের কাজের সাধারণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির দাবী পেশ করা। কখন কখন গোটা ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উৎখাৎ সাধনের বিপ্লবাত্মক প্রচেষ্টা শ্রমিক সংঘের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। সংঘের অর্থ সাহায্য অনেক সময় বেকার, পীড়িত ও নিঃস্ব শ্রমিকের জীবন-যাত্রার অবলম্বন-স্বরূপ হইয়া থাকে। সুসংগঠিত আদর্শাশ্রয়ী সংঘ উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া শ্রমিকের প্রগুণতা ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করিতেও বিশেষ সহায়তা করে।

শ্রমিক সংঘ ও মজুরি (Trade Unions and Wages) : সম্মিলিত প্রচেষ্টা দ্বারা জোটবন্দি দরদস্তুরের মাধ্যমে চাকুরির সাধারণ সুযোগ সুবিধা আদায় করা শ্রমিক সংঘের অন্যতম কাজ। শ্রম যোগানের দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া সংঘ দেশের উৎপাদন বিপর্যস্ত করিতে পারে। উৎপাদনে বিভিন্ন কারকের সম্মিলিত বিনিয়োগ প্রয়োজন হয়। শ্রমিক সংঘের সম্মিলিত চেষ্টায় যদি শ্রমের যোগান টান ঘটে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই অন্যান্য কারকের চাহিদাও হ্রাস পাইবে

এবং ফলে, উহাদের অর্থ-আয়ও কমিবে। বাধ্য হইয়া মালিক তখন শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধি করিবে। অবশ্য কতকগুলি বিশেষ অবস্থা বর্তমান থাকিলেই, সংঘের সম্মিলিত চেষ্টায় শ্রমিক এইরূপ মজুরির উচ্চ হার আদায় করিতে সক্ষম হয়।

প্রথমতঃ, যে সামগ্রী উৎপাদনের জন্য শ্রম বিনিয়োগ হয়, উহার চাহিদা অনম্য হওয়া প্রয়োজন। সামগ্রীর চাহিদা যদি নম্য হয়, তাহা হইলে শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির সংগে উৎপাদন খরচ তথা দ্রব্য মূল্য বাড়িলেই, সামগ্রীর চাহিদা খুবই কমিয়া যাইবে। আর সামগ্রীর চাহিদা যদি এইভাবে কমিয়া যায়, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্ম-সংস্থান সংকুচিত হইবে ও ফলে, মজুরির হারও হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সংঘ যখন উচ্চ মজুরির দাবী পেশ করিবে, তখন উহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রমের পরিবর্তক হিসাবে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা মালিকের আছে কিনা। যে উৎপাদনে শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রপাতি পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহার করিলে চলে, সেখানে শ্রমিক সংঘের পক্ষে উচ্চ মজুরি আদায় করা খুবই শক্ত।

তৃতীয়তঃ, সংঘের পক্ষে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, শ্রমিকের মজুরি গোটা উৎপাদন খরচের অতি নগণ্য অংশ কিনা। যদি মোট উৎপাদন খরচের বেশ একটা মোটা অংশই শ্রাককের মজুরি বাবদ খরচ করিতে হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ঐ দ্রব্যের বাজার মূল্য চড়া হইবে। এমত ক্ষেত্রে, দ্রব্যের চাহিদা হ্রাস পাইবে ও সংগে সংগে উৎপাদন পরিমাণও কমিবে। উৎপাদন কম্‌তির সংগে কর্মসংস্থান সংকুচিত হইবে ও মজুরির হারও কমিবে।

চতুর্থতঃ, অন্যান্য কারকের উপর চাপ দিয়া যদি তাহাদের অর্থ-আয় হ্রাস করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে মজুরির হার বৃদ্ধি সুগম হইবে। অবশ্য, অন্যান্য কারকের উপর চাপ দিয়া উহাদের মূল্য হ্রাস করা সম্ভব হয় একমাত্র তখনই, যখন উহাদের যোগান অনম্য হয়।

পরিশেষে, শ্রামকের প্রান্তিক উৎপাদকতা বৃদ্ধি করিবার নানারূপ সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াও, শ্রমিক সংঘ পরোক্ষভাবে মজুরি বৃদ্ধির সহায়তা করিতে পারে।

শ্রমিক সংঘের দামদস্তুর করিবার ক্ষমতার ব্যত্যয় ও প্রতিবন্ধক (Limitations on the Bargaining Power of Trade Unions) : জোটবন্দি দামদস্তুরদ্বারা শ্রমিক সংঘ মজুরি বৃদ্ধি কারতে যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে।

কিন্তু সংঘের এই দামদস্তুর করিবার ক্ষমতা সীমিত। অনেক সময় কতিপয় ব্যত্যয় ও প্রতিবন্ধকের দরুণ শ্রমিক সংঘের এই ক্ষমতা কার্যকরী হয় না।

যদি মালিকগণ শ্রম বিনিয়োগ সংকোচন করিয়া বিকল্প কারক বিনিয়োগ করিবার উপযুক্ত সুযোগ পায় ও লাভজনক মনে করে, তাহা হইলে শ্রমিক সংঘ উচ্চ মজুরি দাবী করিলে কোনই ফল লাভ হইবে না। যদি শ্রমের পরিবর্তক হিসাবে মালিক শ্রম-সাশ্রয়কারী (labour-saving) যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে, তাহা হইলে শ্রমিকের মজুরি হ্রাস পাইবে। অনেক সময়, বিশেষ ধরণের এক শ্রমের পরিবর্তে অন্য রকমের শ্রম নিয়োগ করিলেও, প্রথমোক্ত শ্রমের বাজার-মজুরি বাড়িতে পারে না। যদি কোন এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রমিক, সংঘের সম্মিলিত চেষ্টায় উচ্চ মজুরির দাবী পেশ করে, আর মালিক ঐ দাবী না মানিয়া অন্য স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত সস্তা মজুর আমদানী করে, কিংবা সস্তা স্ত্রীমজুর নিয়োগ করে, কিংবা বিভিন্ন বৃত্ত্যাশ্রয়ী মজুর আহ্বান করে, তাহা হইলে সংঘের দামদস্তুর প্রচেষ্টা একেবারে নিষ্ফল হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রমিক সংঘের দামদস্তুরের ক্ষমতা কেবলমাত্র মালিকের পরিবর্তক কারক বিনিয়োগের সুযোগ সুবিধার উপরই নির্ভর করে না; শ্রমের পরিবর্তক হিসাবে অন্যান্য কারক সংগ্রহের সুযোগ সুবিধার উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। পরিবর্তক কারকগুলির যদি যোগান নম্য হয়, তাহা হইলে শ্রমিক সংঘ উচ্চ মজুরি দাবী করিলে মালিক উহা মানিয়া লইবে না। কেননা, মালিক তখন অন্যান্য পরিবর্তক কারক অতি সহজেই বিনিয়োগ করিতে পারিবে। সাধারণতঃ, তেজী বাজারে কিংবা যুদ্ধের সময়, যখন মূলধনের পর্যাপ্ত-পরিমাণ বিনিয়োগ হয় এবং ফলে, শ্রমের পরিবর্তক হিসাবে ব্যবহারের জন্য পুঁজি যোগানের বিশেষ দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয়, তখন সংঘ দামদস্তুর করিয়া উচ্চ মজুরি আদায় করিতে সক্ষম হয়। অপর পক্ষে, সস্তা বাজারে শ্রমের পরিবর্তক কারকগুলির যোগান যখন অত্যন্ত নম্য হয়, তখন শ্রমিক সংঘের দামদস্তুর করিবার ক্ষমতাও অত্যন্ত সীমিত হয়।

তৃতীয়তঃ, শিল্পোৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা যদি নম্য হয়, তাহা হইলেও মালিকগণ মজুরি বৃদ্ধি রোধ করিতে পারে। কেননা, এ অবস্থায় শ্রমিকের উচ্চ মজুরি বাবদ যে খরচ বৃদ্ধি হইবে, তাহা উচ্চ পণ্য-মূল্য ধার্য করিয়া খরিদ্দারের নিকট হইতে তুলিয়া লওয়া সম্ভব হয় না। বিশেষ করিয়া, যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য তীব্র প্রতিযোগিতাপূর্ণ বৈদেশিক বাজারে রপ্তানী করা হয়,

উহাদের বেলায় বাজার মূল্য বৃদ্ধি করিয়া উচ্চ মজুরির দাবী মিটানো একেবারে অসম্ভব। এইরূপ দ্রব্য উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রমিককে যদি শ্রমিক সংঘের নির্দেশ মত উচ্চ মজুরি দিতে হয়, তাহা হইলে মালিককে বৈদেশিক বাজার-হারেই দিতে হইবে।

মুনাফা-বখরা (Profit-Sharing): ধনতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান পরিণাম শ্রমিক-মালিক মনোমালিন্য ও বিরোধ। এই মনোমালিন্য ও বিরোধ প্রশমিত করিবার জন্য বহু উপায় ও ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে। মুনাফা-বখরা উহাদের মধ্যে অন্যতম। এই ব্যবস্থাদ্বারা কোন প্রতিষ্ঠানের মোট খরচ বাদে যে অতিরিক্ত মুনাফা লাভ হয়, তাহা কোন স্বীকৃত স্বত্ব অনুসারে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লওয়া হয়। শ্রমিক যদি তাহার স্বাভাবিক প্রাপ্য মজুরি ছাড়া মুনাফার একটা অংশ পায়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠানের কাজে তাহার উৎসাহ অনেক বাড়িয়া যাইবে এবং সে অধিকতর প্রগুণতার সহিত কাজ করিতে থাকিবে। তাহা ছাড়া, শ্রমিক এবং মালিক-পুঁজিপতির স্বার্থ যদি একই হয়, তাহা হইলে উহাদের মধ্যে পরস্পর বিভেদ ও বিরোধের কারণও থাকিবে না।

কিন্তু, মুনাফা বখরা পরিকল্পনাটি উচ্চ আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও কার্যতঃ উহা বিশেষ একটা সাফল্য লাভ করে না। গোটা পরিকল্পনাটি মালিক ও শ্রমিকের পরস্পর বিশ্বাস ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, এই বিশ্বাস ও সহযোগিতার একান্ত অভাব দেখা যায়। শ্রমিকগণ ও তাহাদের সংঘ অনুযোগ করিয়া থাকে যে, তাহারা তাহাদের প্রাপ্য মুনাফার অংশ সাধারণতঃ পায় না। কেননা, মুনাফা বাটোয়ারা হয় একই সমান হারে। বিভিন্ন শ্রেণীর মজুরদের মধ্যে মুনাফার সুবণ্টন ব্যবস্থা কার্যকরী করারও বহু অসুবিধা আছে। তাহা ছাড়া, মজুর মুনাফার বখরা আদায় করিতে আগ্রহান্বিত কিন্তু উৎপাদনের ঝুঁকি বহনে সম্পূর্ণ নারাজ। মুনাফা-বখরা পরিকল্পনাদ্বারা শ্রমিক-মালিক বিরোধ কমানো একেবারে অসম্ভব, যদি শ্রমিক এই ঝুঁকি গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ গররাজি হয়।

সহচারী মান (Sliding Scale): শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক মধুর করিবার আর একটি উপায় সহচারী মান প্রবর্তন করা। এই পরিকল্পনার সার মর্ম এই যে, পণ্য মূল্যের উঠানামার সংগে সংগতি রক্ষা করিয়া মজুরির হারেরও অদল বদল করিতে হয়। যদি উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়, তাহা

হইলে মজুরিও একটি নির্দিষ্ট হারে বাড়াইতে হইবে। আবার পণ্য-মূল্য হ্রাস পাইলে, মজুরির হারও কমাইতে হইবে। অনেক সময় এই পরিকল্পনায় বাজার-মূল্যের সহিত মজুরির সংগতি রক্ষা না করিয়া, শ্রমিকের জীবনযাত্রার ব্যয়-সূচক সংখ্যার সহিত (cost of living index), কিংবা শিল্পে অর্জিত মুনাফা পরিমাণের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়।

পণ্য মূল্যের সহিত সংগতি রাখিয়া যে সহচারী মান পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাহার একটি মস্ত বড় অসুবিধা এই যে, অনেক সময় এমন সকল কারণের জন্য পণ্য-মূল্য হ্রাস ঘটিতে পারে, যাহাতে শিল্পের মুনাফা হ্রাস পায় না, অথচ, শ্রমিকের মজুরি হ্রাস করিতে হয়। যেমন, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের ফলে, বাজার-মূল্য কমিতে পারে ; তাহাতে শিল্পের মুনাফা হ্রাস পায় না, অথচ, সহচারী মান অনুসারে শ্রমিকের মজুরি ছাটাই করিতে হয়। শ্রমিকের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ইহা আদৌ ন্যায়-সংগত নয়। জীবন-যাত্রার ব্যয়ের সংগে সংগতি রক্ষা করিয়া যে সহচারী মান ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়, তাহারও অনেক গলদ আছে। যে সূচক-সংখ্যার উপর ভিত্তি করিয়া জীবন-যাত্রার ব্যয় নির্ধারণ করিতে হয়, তাহাও সঠিকভাবে নির্ণয় করার পথে বহু প্রতিবন্ধক আছে।

নিম্নতম মজুরি (Minimum Wages) : শ্রমিক-মালিক বিরোধ কমাইবার আর একটি উপায় শ্রমিকের উপযুক্ত মজুরির হার ধার্য করা। রাষ্ট্র আইনদ্বারা নিম্নতম মজুরি ধার্য করিয়া দিতে পারে, যাহার কম বেতনে শ্রমিক নিযুক্ত করিলে দণ্ডনীয় সাব্যস্ত করা হয়। নিম্নতম মজুরি (১) বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট শিল্পে ধার্য করা যাইতে পারে, কিংবা (২) জাতীয় নিম্নতম মজুরি (National minimum wages), হিসাবে অর্থাৎ দেশের সকল শিল্প বা কর্ম নিয়োগেই নিম্নতম মজুরি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা যায়। এই দুই ব্যবস্থার অর্থ নৈতিক ফলাফল বিভিন্ন ভাবে দেখা দেয়।

কতিপয় নির্দিষ্ট শিল্পে নিম্নতম মজুরি-হার ধার্যের ফলাফল

যখন কোন একটি শিল্পে কিংবা কতিপয় নির্দিষ্ট শিল্পে নিম্নতম মজুরি প্রতিযোগিতাপূর্ণ মজুরি-হারের উর্ধ্বে ধার্য করা হয়, তখন তাহার ফল হয় মজুরের ছাটাই। শিল্প-মালিক তখন নির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরি দিতে বাধ্য হয় বলিয়া, সে সকল শ্রমিককে কাজে রাখে না। কিছু শ্রমিকের ছাটাই করিয়া, হয়ত অধিক কর্মদক্ষ ও প্রগুণতাসম্পন্ন শ্রমিক নিয়োগ করা হয়, কিংবা শ্রমিকের

পরিবর্তক হিসাবে কলকব্জা, যন্ত্রপাতির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়। যে সকল শ্রমিকের ছাটাই হয় না, তাহাদের মজুরি বৃদ্ধিরও আর সম্ভাবনা থাকে না, কেননা, মালিক তখন আইন নির্ধারিত নিম্নতম মজুরিকেই শ্রমিকের উচ্চতম প্রাপ্য বলিয়া মনে করে।

অনেকে বলেন, নিম্নতম মজুরি শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি করে না ; কেননা, উচ্চ মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগ করিতে হইলেও, মালিক উচ্চমূল্যে পণ্য বিক্রি করিয়া উহা উশুল করিয়া লইতে পারে। কিন্তু, যে ক্ষেত্রে পণ্যের চাহিদা নম্য কিংবা খাদকের পক্ষে সামগ্রী ব্যবহারের সুযোগ খুব বেশী, সেখানে ইহা সম্ভব নয়।

অনেক সময় আবার বলা হয় যে, আইন নির্দিষ্ট নিম্নতম মজুরি দেওয়ার দরুণ মালিকের যে অধিক ব্যয় হয়, উহা তাহার মুনাফার অংক সংকোচন করে মাত্র, শ্রমিকের কর্মসংস্থান সংকোচন করেনা। কিন্তু ইহার উত্তরে বলা যায় যে, মালিকের মুনাফার অংশ যদি এইরূপ ভাবে দীর্ঘকাল ব্যাপী সংকুচিত হইতে থাকে, তাহা হইলে নূতন মূলধন বিনিয়োগ ও সংগঠন উৎসাহ স্বভাবতঃই হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহাতে শিল্পোৎপাদন বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইয়া, কর্ম সংস্থান সংকুচিত হইতে পারে, কিংবা মজুরি বৃদ্ধির সম্ভাবনা লোপ পাইতে পারে।

অতি অল্প ক্ষেত্রেই নিম্নতম মজুরি ধার্যের ফলে কর্মসংস্থান সংকুচিত হয় না। যেখানে মজুরি বাবদ মালিকের ব্যয় গোটা উৎপাদন খরচের অত্যন্ত সামান্য অংশমাত্র, যেখানে মালিক একচেটিয়া কারবারী, কিংবা যেখানে পণ্যের চাহিদা অনম্য, সেখানে শ্রমিক ছাটাই হইবার সম্ভাবনা সীমিত।

যদি অবশ্য নিম্নতম মজুরি প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার হারের চেয়ে নীচে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে উচ্চ মুনাফা লাভের আশায় শিল্পে মূলধন বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, ইহার ফলে শ্রমিকের চাহিদা বাড়িবে এবং নিম্নতম মজুরি বৃদ্ধি পাইয়া বাজার হারের সমান হইবে।

যেখানে জাতীয় নিম্নতম মজুরি ধার্য করা হয়, সেখানে প্রত্যেক শিল্পেই নির্দিষ্ট নিম্নতম বেতন প্রথা বাধ্যতামূলক। এ ব্যবস্থায় আইননির্দিষ্ট মজুরি হারের চেয়ে নিম্নতর হারে মজুর নিয়োগ করা সম্ভব হয় না বলিয়া, এক শিল্প হইতে মজুর ছাটাই হইলে অন্য শিল্পে উহারা কাজ পায় না। শিল্পকে যে উচ্চ মজুরি দিতে হয়, উহা পণ্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া ভোগকারীর কাছ হইতে আদায় করা

চলে না ; কেননা, জাতীয় নিম্নতম মজুরি স্থায়ী অর্থ-মজুরি নয়, উহাকে প্রকৃত নিম্নতম মজুরি (real minimum wages) হইতে হয়। শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি স্তর সমান রাখিতে হইলে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির সংগে সংগে অর্থ মজুরি বৃদ্ধি করিতে হয়। শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি ও শিল্প উন্নয়ন সংকোচন হওয়ার আরও সম্ভাবনা হয়, যদি কলকব্জা, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফার অংশ কমিয়া যায়।

জাতীয় নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের ফলাফল

কিন্তু তাহা বলিয়া এই মন্তব্য করা যায় না যে, নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ ব্যবস্থা শ্রমিকের পক্ষে সর্বৈব ক্ষতিকর। যে সকল শিল্প বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে (specialised) ও প্রচুর মূলধন বিনিযোগ করিয়াছে, উহাদের বেলায় নিম্নতম মজুরি ধার্য হইলে, অন্ততঃ অল্পকালের মধ্যে শ্রমিকের বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবার ভয় নাই। এই ধরণের শিল্পে মালিক মুনাফার অংক সংকোচন করিয়াও, উচ্চ মজুরি দিতে গররাজি হইবে না। উচ্চ মজুরি লাভের ফলে শ্রমিকের উৎপাদকতা বৃদ্ধি পাইবে এবং দীর্ঘকালে মুনাফার অংকও বেশ স্ফীত হইবে। ফলে, মূলধন বিনিয়োগ হ্রাস ও বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইবার ভয় আর থাকিবে না। জাতীয় নিম্নতম মজুরি ধার্যের সংগে সংগে, সরকার যদি বেকার লোকের সাহায্যের জন্য উপযুক্ত বন্দোবস্ত করে, তাহা হইলে শ্রমিকের কর্মসংস্থানের অভাব আর থাকেনা এবং উহাদের জীবন যাত্রার উচ্চ মান বজায় রাখাও সম্ভব হয়।

অনুশীলনী

1. How far can trade unions influence wages?
2. Point out the limits to the bargaining power of trade unions. (C. U. B. Com. '54 & B. A. '51)
3. What do you mean by minimum wages? Examine the economic effects of minimum wages policy. (C. U. B. A. '56)

সপ্তবিংশ অধ্যায়

মুনাফা (Profits)

মুনাফার প্রকৃতি ও উপাদান (Nature and Elements of Profit) : মুনাফাকে সাধারণতঃ উদ্‌বৃত্ত আয় হিসাবে দেখা হয়। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বিক্রয়-লব্ধ মোট আয় ও মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে যে পার্থক্য, উহাই মুনাফার পরিমাণ। অন্যান্য উৎপাদক কারকের অর্থ-আয় মিটাইয়া দিয়া যাহা বক্রি থাকে, উদ্‌বৃত্ত সেই আয়ই মুনাফা। কিন্তু অর্থবিদ্যাবিদদের দৃষ্টিভঙ্গিতে ইহা প্রকৃত বা নীট মুনাফা নহে। কেননা, এই উদ্‌বৃত্ত আয়ের মধ্যে সংগঠন কর্তার ক্রিয়াব প্রকৃত অর্থমূল্য ছাড়া, আরও অনেক উপাদান মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ইহাকে মোট মুনাফা (gross profits) বলা হয়। ইহা প্রকৃত বা নীট মুনাফা (pure বা net profit) নয়। প্রকৃত বা নীট মুনাফা সেই অর্থ-আয়, যাহা সংগঠন কর্তা কেবল মাত্র সংগঠন কার্যের মূল্য বাবদ পাইয়া থাকেন। অর্থশাস্ত্রীগণের মতে, এই সংগঠন কার্যের অর্থ হইল, উৎপাদনের সকল রকম ঝুঁকি বহন করা। ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার বা মূল্য বাবদ অর্থ-আয়ই প্রকৃত বা নীট মুনাফা। ইহার মধ্যে পরিচালনা কিংবা ব্যবস্থাপনার অর্থমূল্য (earnings of management) ভুক্ত করা হয় না। দৈনন্দিন পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনার কাজ সংগঠন কর্তা নিজে না করিয়া বেতনভুক্ কর্মচারীদ্বারাও সম্পন্ন করাইতে পারেন। এই ধরণের কাজের অর্থমূল্য সাধারণ মজুরির সামিল। ইহা স্বাভাবিক উৎপাদন খরচের অংশ বিশেষ ; উদ্‌বৃত্ত আয় নহে, প্রকৃত মুনাফা নহে।

মোট ও নীট মুনাফা

সাধারণতঃ, লোকে যাহাকে মুনাফা বলে উহা মোট মুনাফা। প্রকৃত বা নীট মুনাফা নির্ণয় করিতে হইলে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মোট বিক্রয় লব্ধ আয় হইতে মোট মুনাফার অন্যান্য উপাদানগুলি বাদ দিতে হয়। মোট নাফার মধ্যে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত উপাদানগুলি ভুক্ত হইয়া থাকে :

মোট মুনাফার উপাদান

প্রথমতঃ, সংগঠনকর্তা যদি নিজে কারবার পরিচালনা, কিংবা তদারক করেন, তাহা হইলে তাহার এই কাজের পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্য যে অর্থমূল্য উহা মোট মুনাফা ভুক্ত হয়। নীট মুনাফা নির্ণয় করিবার সময় পরিচালনার মূল্য বাবদ এই অর্থ মূল্য মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে বাদ দিতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সংগঠন কর্তা যদি নিজেই ভূমির মালিক হন ও সেই ভূমিতে উৎপাদন কার্য সমাধা করেন, তাহা হইলে ঐ ভূমির সম্ভাব্য খাজনা মোট মুনাফা ভুক্ত হয়। ভূমির ঐ খাজনা নীট মুনাফা নির্ধারণে বাদ দিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, সংগঠন কর্তা নিজের মূলধন যদি উৎপাদনে বিনিয়োগ করে, তাহা হইলে, ঐ মূলধনের অর্থ-আয় নীট মুনাফা ভুক্ত করা চলে না। কেননা, ঐ মূলধন সে অন্যত্র বিনিযোগ করিলে উহার সুদ পাইতে পারিত। নীট মুনাফা নির্ণয় করিবার সময় চলতি বাজার-হারে ঐ সুদ ধরিয়া বিক্রয়লব্ধ মোট আয় হইতে বাদ দিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় সংগঠন কর্তা একচেটিয়া লাভ করিয়া মুনাফার অংক বৃদ্ধি করিতে পারে। পণ্য-বাজার যদি একচেটিযা বা অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতাময় হয়, তাহা হইলে সে বাজার দর উচ্চস্তরে ধার্য করিয়া অস্বাভাবিক মুনাফা শিকার করিতে পারে। কারক বাজারে অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকিলেও, সংগঠন-কর্তা অপেক্ষাকৃত নিম্ন হারে কারক মূল্য বাবদ খরচ করিযা মুনাফার অংক অস্বাভাবিক বাড়াইতে পারে। ঐ ধরণের মুনাফা মোট মুনাফার উপাদান বিশেষ। নীট মুনাফা নির্ণয করিতে সংগঠনকর্তার এই অস্বাভাবিক অর্থ-আয় পণ্য-বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে বাদ দিতে হয়।

পরিশেষে, সংগঠন কর্তা অনেক সময বরাতগুণে ও অবস্থার সুযোগে অপ্রত্যাশিত মুনাফা লাভ (windfall) করিতে পারে। দেশে যদি যুদ্ধ-বিগ্রহ সুরু হয়, কিংবা মুদ্রাস্ফীতি হয়, তাহা হইলে সেই অস্বাভাবিক অবস্থার সুযোগ লইয়া সংগঠন কর্তা চলতি হারের উপরে অতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত মুনাফা লাভ করিতে পারে। এই রকম অস্বাভাবিক মুনাফা মোট মুনাফা ভুক্ত হইয়া থাকে এবং নীট মুনাফা নির্ধারণেব সময উহা বাদ দিতে হয।

অতএব, আমরা বলিতে পারি, বাস্তব মুনাফা বহু উপাদানের এক সংমিশ্রিত আয় (composite income)। ইহার মধ্যে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নীট মুনাফা যেমন ধরা হয়, সেইরূপ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মজুরি, অপ্রত্যাশিত ফাল্‌তু আয়, একচেটিয়া ও মুদ্রাস্ফিতি জনিত লাভ প্রভৃতিও ভুক্ত হয়।

মুনাফার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Profit) : মুনাফার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া কেয়ার্ণক্রশ ইহাকে অন্যান্য উৎপাদক কারক-আয় (factor incomes) হইতে তফাৎ করিয়া দেখিয়াছেন।

প্রথমতঃ, অন্যান্য উৎপাদক কারক-মূল্য কখনই ঘাট্‌তি-মূলক আয় (negative) হইতে পারে না; কিন্তু মুনাফা সময় সময় ঘাট্‌তি মূলকও হইতে পারে। শ্রামক যদি তাহার পারিশ্রমিক বা মজুরি না পায়, তাহা হইলে কাজ করিবে না; ভূস্বামী যদি খাজনা না পায়, তাহা হইলে ভূমি সরবরাহ করিবে না এবং পুঁজিপতি যদি সুদ না পায়, তাহা হইলে মূলধন যোগান দিবে না। বিনা অর্থ-মূল্যে বা পারিশ্রমিকে এই সকল কারক উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করে না। কিন্তু, কোন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা লাভ যদি সময়ে নাও হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠান তৎক্ষণাৎ কাজ বন্ধ করে না। অনেক সময় মুনাফা লাভের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানের লোকসানও হইতে পারে। সাময়িক এই লোকসানের জন্য প্রতিষ্ঠান বাজারে পণ্য-যোগান বন্ধ করে না।

অন্যান্য কারক আয় হইতে মুনাফার পার্থক্য :

(১) অন্যান্য আয় ঘাটৃতি-মূলক নয়। মুনাফা ঘাটৃতি-মূলক হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অপরাপর অর্থ-আয়ের তুলনায় মুনাফা অধিক পরিবর্তনশীল। পণ্য-মূল্য পরিবর্তনের সংগে সংগে মুনাফার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। অন্যান্য কারক-মূল্য পণ্য-মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির সংগে খুব সামান্য কম বেশি হয়। ইহাদের আয়ের হার অনম্য; মুনাফার হার অত্যন্ত নম্য। সমৃদ্ধির সময় এই সকল কারক আয়ের যে হার থাকে, মন্দার সময় সেই হারের অধোগতি হয় যৎসামান্য। কিন্তু মুনাফার হার সমৃদ্ধির সময় যাহা থাকে, মন্দার সময় উহা আশ্চর্য রকম হ্রাস পায়। মন্দার সময়, এমন কি, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা লাভ একেবারে নাও ঘটিতে পারে; নিছক লোকসানে পণ্য বিক্রয় করিতে হইতে পারে।

(২) অন্যান্য আয়ের তুলনায় মুনাফা অধিক পরিবর্তনশীল।

তৃতীয়তঃ, মজুরি, সুদ ও খাজনা প্রভৃতি কারক-আয় চুক্তিদ্বারা পণ্য উৎপাদন সুরু হইবার পূর্বেই ধার্য করা হয়। শ্রমিক কি হারে মজুরি পাইবে, পুঁজিপতি কি হারে সুদ পাইবে, এবং ভূস্বামী কি হারে খাজনা পাইবে, সে বিষয় উৎপাদনের আগেভাগে নির্ধারিত হয় বলিয়া, ঐ সকল আয় সুনিশ্চিত। কিন্তু মুনাফা আগাম চুক্তি নির্দিষ্ট নয় বলিয়া, অত্যন্ত অনিশ্চিত আয়। মুনাফা নির্ভর করে, প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় লব্ধ আয় ও উৎপাদন খরচের তারতম্যের উপর। বিক্রয়-লব্ধ আয় কি হয়, তাহা না দেখিয়া প্রতিষ্ঠান মুনাফা সম্বন্ধে

(৩) অন্যান্য আয় চুক্তি নির্দিষ্ট, মুনাফা তাহা নহে।

সুনিশ্চিত হিসাব করিতে পারে। বিক্রয়লব্ধ আয় উৎপাদন খরচের চেয়ে উদ্বৃত্ত হইবে কিনা, ও কতটা পরিমাণ হইবে, তাহা সংগঠন কর্তা পূর্বাহ্নে নির্ধারণ করিতে পারে না। পণ্য বিক্রয়লব্ধ আয় হাতে আসিলে, তবে সে মুনাফা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হইতে পারে।

লর্ড কীন্‌স্ মুনাফাকে সাধারণ আয়ের পর্যায় ভুক্ত করিতে নারাজ। অন্যান্য কারকের প্রাপ্য আয় মিটাইয়া দিয়া যে বক্রি অর্থ নৈতিক অবস্থা অবশিষ্ট থাকে, মুনাফা তাহার ফলবিশেষ। কিন্তু একবার মুনাফার উৎপত্তি হইলে, ইহা পরবর্তী অর্থ নৈতিক ঘটনাবলীর পরিবর্তনের কারণস্বরূপ হয়। মুনাফাব উদ্ভব হইলে, বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। ফলে, কর্ম সংস্থান সম্প্রসারিত হয় ও সাধারণের অর্থ-আয় বৃদ্ধি পায়। আয়স্তরের বৃদ্ধির সংগে আবার পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি হয়। অন্যদিকে, মুনাফা সংকোচনের ফলে, উৎপাদন ও কর্মনিয়োগ হ্রাস পাইয়া জনসাধারণের অর্থ-আয় কমিয়া যায় এবং সংগে সংগে পণ্যমূল্যেরও নিম্নগতি হয়। কীন্‌সের নিজের কথায়: Profits are the effect of the rest of the situation rather than a cause of it .... But profits having once come into existence become a cause of what subsequently causes ; indeed the main-spring of change in the existing economic system.

মুনাফা তত্ত্ব (Theories of Profit):

মুনাফা সংমিশ্রিত আয় বলিয়া ইহার প্রকৃত ও পূর্ণ ব্যাখ্যান অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। বিভিন্ন অর্থবিদ্যাবিদ ইহাকে বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ মতবাদ অনুসারে এক একটি স্বাধীন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহাদের কাহারও তত্ত্বই পৃথকভাবে দেখিতে গেলে স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে ও পূর্ণ বিশ্লেষণের দাবী করিতে পারে না। তবে প্রত্যেকটি তত্ত্বের পৃথক আলোচনার আবশ্যকতা আছে এই কারণে যে, উহারা মুনাফার এক একটি বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্যের উপর আলোক সম্পাত করিয়াছে। আমরা কতিপয় প্রধান প্রধান মুনাফা তত্ত্ব আলোচনা করিব।

মুনাফার খাজনা তত্ত্ব (Rent Theory of Profit): মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ্ ওয়াকার (Walker) খাজনা তত্ত্বদ্বারা মুনাফার ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মুনাফা সংগঠন কর্তার কর্মদক্ষতার জন্য প্রাপ্য

খাজনাবিশেষ (rent of ability)। ভূমি যেমন উর্বরতা ও অনুকূল অবস্থানের দিক দিয়া বিভিন্ন পর্যায়ের হইতে পারে, সংগঠন-কর্তাকেও উদ্যোগ ও দক্ষতার দিক হইতে বিভিন্ন শ্রেণী ভুক্ত করা যায়। প্রান্তিক জমি যেমন উদ্‌বৃত্ত আয় বা খাজনা লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ প্রান্তিক সংগঠন-কর্তাও উদ্‌বৃত্ত আয় বা মুনাফা লাভ করে না। প্রান্তিক সংগঠন কর্তা বলিলে তাহাকে বুঝায়, যাহার কর্মদক্ষতা দ্রব্য বিক্রয়দ্বারা কেবলমাত্র উৎপাদন খরচ তুলিয়া লইবার উপযুক্ত, খরচের উপর উদবৃত্ত লাভ করিতে অপারগ। প্রান্তিক সংগঠন কর্তার চাইতে যাহারা অধিক কর্মদক্ষ ও দূর-দৃষ্টি সম্পন্ন, তাহারাই কেবল খাজনার ন্যায় উদ্‌বৃত্ত আয় অর্থাৎ মুনাফা লাভ করিতে পারে। কেননা, তাহাদের উৎপাদন খরচের চাইতে পণ্য বিক্রয়লব্ধ আয় অধিক। প্রান্তিক-উত্তম সংগঠন-কর্তা প্রান্তিক সংগঠন-কর্তার চাইতে যে অতিরিক্ত উদ্‌বৃত্ত আয় লাভ করে, তাহাই মুনাফার পরিমাপ (Profits are a surplus of the intra-marginal over the marginal producer)।

এই তত্ত্বদ্বারা মুনাফার তারতম্য ব্যাখ্যান করা যায়; কিন্তু মুনাফার প্রকৃত স্বরূপ ব্যাখ্যানে ইহা সম্পূর্ণ অপারগ। দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব সংগঠন-কর্তার পরিচালনার মজুরিকে (earnings of management) মুনাফাভুক্ত করে না। কোন উৎপাদন কার্যে সংগঠন-কর্তা নিয়োজিত হইলে, অন্ততঃ পক্ষে তাহাকে সেই নিম্নতম মজুরি বা বেতন পাইতে হইবে, যাহা সে বিকল্প শিল্পোৎপাদনে উপার্জন করিতে পারিত। সংগঠন-কর্তাকে আকর্ষণ করিতে হইলে তাহার এই বেতনের দরুণ ব্যয় প্রতিষ্ঠানকে করিতেই হইবে, নইলে সে অন্যত্র চলিয়া যাইবে। এই ব্যয় প্রতিষ্ঠানের সাকুল্য খরচের একটা অংশ বিশেষ ও ইহা পণ্যমূল্যের মধ্যে প্রবেশ করে।

মুনাফার ঝুঁকি তত্ত্ব (Risk Theory of Profit): অধ্যাপক হওলে (Hawley) ঝুঁকি তত্ত্বদ্বারা মুনাফা ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মুনাফা হইল উৎপাদনের ঝুঁকি বহনের মজুরি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সংগঠন কর্তাকে বহু রকমের ঝুঁকি বহন করিতে হয়। এই ঝুঁকি বহন মোটেই প্রীতিকর নয়। সংগঠন-কর্তাকে ইহার জন্য যথেষ্ট অপযোগ (disutility) পোহাইতে হয়। ঝুঁকি বহনের ভয়ে অনেকে আবার বিনিয়োগ করিতে নিরুৎসাহ হয়, উৎপাদন কার্যে অগ্রসরই হয় না। যে সংগঠন-কর্তা উৎপাদনের ঝুঁকি কাঁধে লয়, মুনাফা তাহারই প্রাপ্য পুরস্কার।

মুনাফার ঝুঁকি তত্ত্বে কিছুটা যে সত্য নিহিত আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহা বলিয়া সকল রকম মুনাফাই যে ঝুঁকি বহনের পুরস্কার স্বরূপ, তাহা স্বীকার করা যায় না। এই তত্ত্ব যে ইংগিত করে যে, উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি যত বেশী, উহার মুনাফার অংকও তত বেশী—তাহা সর্বতোভাবে মানিয়া লওয়া যায় না। অধ্যাপক নাইট (Knight) মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুনাফা সমস্ত রকম ঝুঁকি বহনের পুরস্কার নয়। অনেক ঝুঁকি আছে যাহা সংগঠন-কর্তার আগেভাগে জানা, কিংবা যাহার সম্পর্কে সে আগে হইতেই যথাযথ ধারণা করিতে পারে। এই সকল ঝুঁকির বোঝা আগেই পরিমাপ করা যায় এবং ইহার উপযুক্ত বীমাকরণ সম্ভব হয়। এই সকল ঝুঁকি বহন করিতে সংগঠন-কর্তার অপযোগ পোহাইতে হয় না। এই সকল ঝুঁকি বহনের পুরস্কার মুনাফা নয়। যে সকল ঝুঁকি সম্পর্কে পূর্ব হইতে ধারণা করা যায় না, যে সকল ঝুঁকি সংগঠন-কর্তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, উহাদের বোঝা ঘাড়ে লইলে তাহাকে অপযোগ ভোগ করিতে হয়; আর এই ধরণের অপযোগ ভোগের মূল্যই মুনাফা। কার্ভার (Carver) বলেন, মুনাফার উৎপত্তি ঝুঁকি বহনের জন্য নয়: সংগঠন-কর্তার কর্মদক্ষতার গুণে ঝুঁকির পরিমাণ হ্রাস পায় বলিয়াই মুনাফার পত্তন।

অনিশ্চয়তা বহন ও মুনাফা (Uncertainty-bearing and Profit): নাইট্, (Knight) কেয়ার্ণক্রশ প্রভৃতি আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ মুনাফা ও অনিশ্চয়তা বহনের মধ্যে একটি সম্পর্ক নির্দেশ করিয়াছেন। নাইট **অনিশ্চয়তা** ও **ঝুঁকির** মধ্যে পার্থক্য করিয়াছেন। ঝুঁকি সম্পর্কে আগে ভাগে ধারণা করা যায় ও উহাদের উপযুক্ত বীমা করা সম্ভব হয়। যে সকল ঝুঁকি সম্বন্ধে সংগঠন-কর্তা পূর্ব হইতে কোনই ধারণা করিতে পারে না, কিংবা যে সকল ঝুঁকি পরিমাপ করা সম্ভব নয়, উহাকেই **অনিশ্চয়তা** বলে। অনিশ্চয়তা বহন অর্থই অপযোগ ভোগ করা। অনিশ্চয়তা বহনের জন্য সংগঠন-কর্তা যে অপযোগ ভোগ করে, উহার পুরস্কার মুনাফা। কেয়ার্ণক্রশ বলেন, পরিবর্তনশীল জগতে নিখুঁত দূরদৃষ্টির অভাবে মালিকগণের দায়িত্ব অনিশ্চয়তাপূর্ণ। যদি সব কিছুই গতানুগতিক, ধরাবাঁধা নিয়মমাফিক ঘটিত, যদি ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুল ভবিষ্যদ্‌বাণী করা যাইত, তাহা হইলে সংগঠন-কর্তার কোন অনিশ্চয়তা বহনই আবশ্যক হইত না এবং মুনাফারও উৎপত্তি হইত না। কিন্তু বাস্তব জগতে অর্থব্যবস্থা এত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে, কর্মবিভাগ এত ব্যাপক ও

বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে এবং ভবিষ্যৎ পরিবর্তনশীল ও অনিশ্চয়তা-পূর্ণ বাজারের উৎপাদন প্রক্রিয়া এত ঝুঁকিবহুল হইয়াছে যে, সংগঠন-কর্তাকে অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয় পদে পদে। সংগঠন-কর্তার এই অনিশ্চয়তা বহনেই মুনাফার উৎপত্তি।

কিন্তু, আসলে একমাত্র অনিশ্চয়তা বহনেই মুনাফার উৎপত্তি নয়। সংগঠন-কর্তার কার্যাবলী বহুবিধ, অনিশ্চয়তা বহন উহার অন্যতম। তাহা ছাড়া, শুধু অনিশ্চয়তা বহনের ভয়ে সংগঠন-কর্তার যোগান সীমিত হয় না। সংগঠন-কর্তার যোগান সীমিত হয় আরও অনেক বিষয়দ্বারা ; যেমন, সামাজিক শ্রেণী বিন্যাস (social stratification) ও পরিবেশ, অপূর্ণাংগ বাজার, মূল্যস্তর ও মুদ্রা যোগান ইত্যাদি।

দ্বিতীয়তঃ, যাহারা মুনাফার এই মতবাদে বিশ্বাসী তাঁহাদের মতে অনিশ্চয়তা বহন উৎপাদনের একটি পৃথক কারক বিশেষ। অনিশ্চয়তা বহনকে পৃথক উৎপাদক কারক ধরিলে প্রকৃত খরচ (real costs) তত্ত্বের সমর্থন করিতে হয়। আসলে অনিশ্চয়তা বহন পৃথক একটি উৎপাদক কারক নয় ; সংগঠন-কর্তার কার্যাবলীর একটি বিশেষ গুণ বা অংশ মাত্র।

পরিশেষে, উৎপাদনে অনিশ্চয়তা বহন সংগঠন-কর্তার সহজাত কর্মের একমাত্র আংগিক নহে। উৎপাদনে যাহারা পুঁজি বা মূলধন যোগায় তাহাদেরও অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়। যেখানে সংগঠন-কর্তাকে নিজের অনিশ্চয়তা বহনের সংগে মূলধন বিনিয়োগ জনিত অনিশ্চয়তা বহন করিতে হয়, সেখানে মুনাফা ছাড়া মূলধন বা পুঁজি বিনিয়োগ জনিত অনিশ্চয়তা বহনের জন্য তাহার আর একটি অর্থ-মূল্য লাভ হয় ; উহাকে অধ্যাপক মার্শাল 'খাজনা-অনুরূপ' (quasi-rent) আখ্যা দিয়াছেন।

মুনাফা ও মজুরি (Profits and Wages): অধ্যাপক টসিগ্ ও ড্যাভেনপোর্ট (Davenport) মজুরির ব্যাখ্যানদ্বারা মুনাফা বিশ্লেষণ করিয়াছেন। 'Profits are best regarded as a form of wages.' শ্রমিক মজুরি পায় শ্রমের পুরস্কার হিসাবে। সংগঠন-কর্তার কার্যাবলী মানসিক শ্রম বিশেষ ; সুতরাং, তাহার পুরস্কার মুনাফা মজুরিরই সামিল। বেতনভুক্ পরিচালকগণ আবার বিভিন্ন পর্যায়ভুক্ত—কেহ মুখ্য নির্বাহক (Chief Executive Officer), কেহ অধ্যক্ষ (Superintendent), কেহ অধি-কর্মিক (Foreman), কেহ মুখ্য-সচিব (Chief Secretary) ইত্যাদি। এই সকল বেতনজীবী

কর্মচারী এবং স্বাধীন কারবারী পরিচালকের মধ্যে বৃত্তি পরিবর্তন প্রতিনিয়তই ঘটিতেছে ও একই বিষয়দ্বারা ইহাদের বাজার যোগান নিয়মিত হইতেছে। সুতরাং বেতনজীবী এবং স্বাধীন কর্মচারী—প্রত্যেকের অর্থ-আয়ই মজুরি তত্ত্বদ্বারা ব্যাখ্যান করা চলে।

কিন্তু মজুরি তত্ত্বদ্বারা মুনাফার বৈশিষ্ট্য ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যান করা গেলেও, মুনাফা ও মজুরির মধ্যে মূলতঃ যে তফাৎ আছে তাহা নির্দেশ করা যায় না। মজুরি চুক্তিবদ্ধ নির্দিষ্ট আয়, আর মুনাফা অনিয়মিত, অনিশ্চয়তাপূর্ণ আয়। মজুর ব্যবসায়ের বা উৎপাদনের প্রকৃত ঝুঁকি একরকম বহন করে না বলিলেই চলে। সংগঠন-কর্তাকে উৎপাদনের সুরু হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত রকম ঝুঁকি বহন করিতে হয়। দ্বিতীয়তঃ, মজুরির মধ্যে শ্রমের প্রকৃত অর্থ-মূল্যই প্রধান উপাদান। কিন্তু মুনাফার মধ্যে সংগঠন কর্তার ঝুঁকি বহন ও ব্যবস্থাপনার পুরস্কার-মূল্য ছাড়াও অনেক উপাদানের প্রাধান্য দেখা যায়। অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দরুণ, কিংবা দৈবাৎ ঘটনশীল ব্যাপারের জন্য, সংগঠন-কর্তার অপ্রত্যাশিত লাভের অংক অনেক সময় তাহার ঝুঁকি বহন ও ব্যবস্থাপনার দরুণ প্রকৃত প্রাপ্য মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী হইতে পারে।

মুনাফা ও মজুরির তফাৎ

মজুরি ও মুনাফার মধ্যে এই সকল মূলগত পার্থক্য থাকায় কারভার (Carver) প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ মুনাফা ও মজুরির সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাখ্যানের প্রয়োজন আছে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন।

প্রান্তিক উৎপাদকতা ও মুনাফা (Marginal Productivity and Profit): চাহিদার দিক হইতে প্রত্যেক কারক-মূল্যপ্রান্তিক উৎপাদকতার তত্ত্বদ্বারা ব্যাখ্যান করা যায়। সংগঠন-কর্তার মুনাফা সংগঠনের প্রান্তিক উৎপাদকতার সমান হয়। সংগঠন-কর্তার সাহায্য ব্যতীত যতটা সামগ্রী উৎপন্ন হয়, তাহার চেয়ে তাহার সাহায্যদ্বারা যতটা দ্রব্য বেশী উৎপন্ন হয়, উহার বাজার দামই সংগঠনের প্রান্তিক উৎপাদকতা। কিন্তু অন্যান্য উৎপাদক কারকের প্রান্তিক উৎপাদকতা যেমন সরাসরি পরিমাপ করা যায়, সংগঠনের উৎপাদকতা সেইরূপ পরিমাপ করা যায় না। প্রান্তিক পরিবর্তকতার সূত্র প্রয়োগ দ্বারা সংগঠন-কর্তা জমি, পুঁজি ও শ্রমের প্রান্তিক উৎপাদকতা নির্ধারণ করে। কিন্তু সংগঠনের প্রান্তিক উৎপাদকতা এইরূপ ভাবে নির্ণয় করা যায় না। অন্যান্য কারকের বিভিন্ন একক যেমন অতিশয় ক্ষুদ্র হয়; সংগঠনের বিভিন্ন একক অতটা ক্ষুদ্র হইতে পারে না।

ফলে, এক একক সংগঠন অতিরিক্ত নিয়োগ করিলে, প্রতিষ্ঠানে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে; কিংবা এক একক সংগঠন ছাটাই করিলে গোটা ব্যবসায়ই ধ্বংস হইতে পারে।

শ্রীমতী রবীন্‌সন্‌ (Mrs. Robinson) এক একক সংগঠনের প্রান্তিক উৎপাদকতা নির্ধারণের জন্য একটি উপায় বাতলাইয়াছেন। সংগঠন কর্তার প্রান্তিক উৎপাদকতা দুইটি বিভিন্ন অর্থে বিশ্লেষণ করা যায়: (ক) প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ (marginal physical product) ও (খ) প্রান্তিক উৎপত্তি মূল্য (marginal value product)। অন্যান্য কারক একক বিনিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধি না করিয়া, যদি এক একক সংগঠন অতিরিক্ত নিয়োগ করা যায়, তাহা হইলে সামগ্রীর মোট উৎপন্ন পরিমাণ যতটা বাড়িবে, তাহাই সংগঠন কর্তার প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ। প্রান্তিক উৎপত্তি পরিমাণ পরিমাপ করা যায় না। কেননা, সংগঠনের এককগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকারে ভাগ করা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রান্তিক উৎপত্তি-মূল্য নির্ণয় করা যায়। একটি প্রতিষ্ঠানের মোট উৎপন্ন পণ্যমূল্য হইতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের লোকসান বাদ দিলে প্রথমোক্ত প্রতিষ্ঠানের সংগঠনের প্রান্তিক উৎপত্তি মূল্য পাওয়া যাইবে। একজন সংগঠনকর্তা (প্রান্তিক) অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইতে পারিত এমন কারকগুলির কিছু কিছু ক্রয় করিয়া বিনিয়োগ করে বলিয়া, উহাদের উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের লোকসান হয়। রবীন্‌সন্‌ বলেন, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় মুনাফা সমান হয়, সংগঠন কর্তার প্রান্তিক উৎপত্তি-মূল্যের সহিত।

মুনাফার সক্রিয় বা প্রগতি তত্ত্ব (Dynamic Theory of Profit): মার্কিন অর্থবিদ্যাবিদ্‌ ক্লার্ক (J. B. Clark) সক্রিয়তা বা প্রগতিতত্ত্ব দ্বারা মুনাফার ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মতে বর্তিষ্ণু (static) আর্থিক ব্যবস্থায় মুনাফার উৎপত্তি হইতে পারে না; কেননা, ঐ অবস্থায় অর্থ নৈতিক কোন পরিবর্তন বা প্রগতি নাই। বর্তিষ্ণু অবস্থায় মুনাফা হয়, পরিচালনার মজুরি বিশেষ (wages of management)। এই অবস্থায় কোন রকম আর্থিক পরিবর্তন ঘটে না। এই অবস্থায় জনসংখ্যার বাড়তি নাই; পুঁজি জমে না; উৎপাদন পদ্ধতির কোন অদল বদল নাই এবং ভোগকারীর চাহিদারও কোন পরিবর্তন নাই। পণ্য মূল্য এই অবস্থায় উৎপাদন খরচের সমান হয়।

প্রকৃত মুনাফা সক্রিয় আয়—প্রগতির পুরস্কার মূল্য। সংগঠনকর্তার কাজ নয় গতানুগতিক পথে চলা; সাম্যাবস্থার উৎখাৎ করিয়া আর্থিক ব্যবস্থার পরিবর্তন

আনাই তাহার সব চাইতে বড় দায়িত্ব। প্রকৃত সংগঠন কর্তা নূতন নূতন পরিবর্তনের পথিকৃৎ। দূরদৃষ্টি ও সমন্বয়ের ক্ষমতাদ্বারা সে উৎপাদন ক্ষেত্রে নূতন পথের সন্ধান দিবে, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে অসাম্য সৃষ্টি করিয়া মুনাফা শিকার করিবে। প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থায় মুনাফা হইবে অত্যন্ত অস্থির ও চঞ্চলশীল; প্রগতি ও সক্রিয়তার জন্য উহা সর্বদা পরিবর্তনশীল হইবে।

অধ্যাপক নাইট্ মুনাফার এই সক্রিয় মতবাদ অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, সকল রকম সক্রিয় পরিবর্তন বা প্রগতিতেই মুনাফার উৎপত্তি হয় না। যে সকল পরিবর্তন পূর্ব হইতে প্রকৃত ধারণা করা যায় ও যাহার উপযুক্তভাবে বীমা করা সম্ভব হয়, সেইরূপ সক্রিয়তায় মুনাফার উদ্ভব হয় না। কেবল মাত্র যে সকল পরিবর্তন পূর্ব হইতে অনুধাবন করা যায় না, উহাই মুনাফা সৃষ্টির উৎস স্বরূপ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা অনিশ্চয়তাই তাহা হইলে মূলতঃ মুনাফা সৃষ্টির কারণ।

স্বাভাবিক মুনাফা (Normal Profit) : অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ বিলাতের প্রায় সকল অর্থশাস্ত্রীগণই মুনাফাকে উদ্‌বৃত্ত আয় হিসাবে না দেখিয়া উৎপাদন খরচের একটি উপাদান বা অংশ হিসাবে দেখিয়াছেন এবং ইহা পণ্যমূল্যের মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। অধ্যাপক মার্শাল স্বাভাবিক মুনাফাকে দীর্ঘকালীন (long-period) আয় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ইহা তাঁহার প্রতিভূ প্রতিষ্ঠানের (representative firm) আয়। যে সকল শিল্পোৎপাদনে ক্রমবর্ধমান আগম বিধির প্রয়োগ হয়, মুনাফা উহাদের উৎপাদন খরচের একটি উপাদান। যে প্রতিষ্ঠান সাম্যাবস্থায় পৌঁছিয়াছে ও যাহার আর কোন সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচন প্রবণতা নাই, উহার স্বাভাবিক পুরস্কারই স্বাভাবিক মুনাফা। শ্রীমতী রবীনসন্ বলিয়াছেন যে, মুনাফা স্বাভাবিক হয় শিল্পের সেই স্তরে, যেখানে নূতন প্রতিষ্ঠানের শিল্পে প্রবেশ করিবার সম্ভাবনা নাই; কিংবা ঐ শিল্পে নিয়োজিত পুরাতন প্রতিষ্ঠানের শিল্প পরিত্যাগ করিবার সম্ভাবনা নাই। যদি বাজারে পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান থাকে এবং সমস্ত পরিবর্তন পূর্ব হইতে সম্পূর্ণভাবে ধারণা করা যায়, তাহা হইলেই স্বাভাবিক মুনাফার এই মতবাদ কল্পনা করা সম্ভব।

স্বাভাবিক মুনাফার বৈশিষ্ট্য

কিন্তু সমস্ত অর্থনৈতিক পরিবর্তন একই ধরণের নয় বলিয়া বাস্তব ক্ষেত্রে মুনাফা স্বাভাবিক হয় না। প্রকৃত মুনাফার হার কখনও স্বাভাবিক হারের চেয়ে বেশী, কখনও বা কম হয়। অত্যল্পকালীন পণ্য বাজার দর যেমন ক্ষণস্থায়ী সাম্যাবস্থা

প্রাপ্ত হয়, প্রকৃত মুনাফার হারও শিল্প প্রতিষ্ঠানের অস্থায়ী সাম্যাবস্থা নির্দেশ করে। যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক মুনাফার চাইতে অধিক হয়, তাহা হইলে নূতন প্রতিষ্ঠান শিল্পোৎপাদনে প্রবেশ করিবে, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না মুনাফার হার প্রকৃত হারে নামিয়া স্বাভাবিক হারের সংগে সমান হয়, ততক্ষণ এই প্রক্রিয়া চলিতে থাকিবে। সেইরূপ, যদি প্রকৃত মুনাফা স্বাভাবিক হারের চাইতে কম হয়, তাহা হইলে কিছু প্রতিষ্ঠান শিল্প পরিত্যাগ করিবে; ফলে, বাজার যোগান হ্রাস পাইবে ও প্রকৃত মুনাফা বৃদ্ধি পাইয়া স্বাভাবিক হারের সমান হইবে।

প্রকৃত মুনাফা

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মুনাফার সম্ভাব্য হারের উপর পণ্য উৎপাদন বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। মুনাফার হার যদি ভবিষ্যতে বাড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে, নূতন প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্পোৎপাদনে ঝুঁকিয়া পড়িবে; ফলে, ঐ শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। আবার, শিল্প মন্দার জন্য ভবিষ্যতে মুনাফার হার যদি কমিবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান ঐ শিল্প পরিত্যাগ করিবে, ফলে উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস পাইবে।

মুনাফা কি সমতা-মুখী? (Do Profits tend to equality?): বিভিন্ন শিল্পে মুনাফার হার সমান বা এক হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে, বিভিন্ন শিল্পে বিনিয়োগ জনিত ঝুঁকিবহন ও অনিশ্চয়তার পরিমাণ এক নয়। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদক কারকগণের অবাধ গতিশীলতার অভাব হেতুও, শিল্প হইতে শিল্পান্তরে মুনাফার হার তফাৎ হয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, নূতন শিল্পগুলি প্রাচীন শিল্পের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অধিক মুনাফা লাভ করে।

কিন্তু পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় একই শিল্পে নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মুনাফা সমান হইতে পারে। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় যখন একটি শিল্পের সাম্যাবস্থা স্থাপিত হয়, তখন প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রান্তিক খরচ পণ্যমূল্যের সমান হয়। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ হয় পণ্যমূল্যের সমান এবং সকল প্রতিষ্ঠানেরই গড়পড়তা খরচ হয় নিম্নতম ও পরস্পর সমান। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান যে স্বাভাবিক মুনাফা পায়, তাহা হয় পরিচালনার মজুরি বিশেষ। পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায় দীর্ঘকালীন শিল্প সাম্যাবস্থায় কোন একটি প্রতিষ্ঠান অন্য একটি প্রতিষ্ঠান হইতে কম বা বেশী মুনাফা লাভ করিতে পারে না।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে, শিল্পের সকল প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা উৎপাদন খরচ সমান

হইতে পারে না। কেননা, একই প্রকারের দক্ষতা-সম্পন্ন কারক একই বাজার দরে ক্রয় করিয়া সকল প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে না। দক্ষতম কারক কিংবা সর্বাপেক্ষা সস্তা মূল্যের কারক বিনিয়োগ করিয়া যে প্রতিষ্ঠান পণ্য উৎপাদন করে, উহার খরচ হয় সর্বনিম্ন ও মুনাফা হয় সর্বোচ্চ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের গড়পড়তা খরচ বিভিন্ন হওয়ায়, মুনাফার হার সমান হয় না।

অধ্যাপক কেয়ার্ণক্রশ মন্তব্য করিয়াছেন যে, সক্রিয় প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থায়, যেখানে অনিশ্চয়তা প্রতি পদে, সেখানে দীর্ঘকালেও (in the long run) মুনাফার হার সমান হয় না। প্রতিযোগিতার দরুণ যে সকল শিল্প বা ব্যবসায়ে অনিশ্চয়তা অত্যধিক, সেখানে মুনাফার হারও অত্যন্ত উচ্চ। যে সকল শিল্পের উৎপাদন পদ্ধতি প্রায়ই বদলায়, কিংবা যে শিল্পের সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি প্রায়ই আধুনিক-করণ ও পরিবর্তন করিতে হয়, সেখানেও মুনাফার হার অধিক হইবে। যদি বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে উৎপাদক কারকগণের গতিশীলতা অবাধ না হয়, তাহা হইলে উৎপাদকের অনিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়, মুনাফার হারও বাড়ে। কোন শিল্পে যদি উৎপাদক কারক বিশিষ্টতা (specificity) অর্জন করিয়া থাকে ও কেবল ঐ একই শিল্পে উহার বিনিয়োগ চলে, অর্থাৎ বিকল্প শিল্পে উহার ব্যবহার চলে না, সে ক্ষেত্রেও মুনাফার হার বৃদ্ধি না হইলে উৎপাদক কারক আকৃষ্ট হইবে না।

মুনাফা কি ন্যূনতম-মুখী? (Do profits tend to minimum?): সেলিগ্‌ম্যান, ক্লার্ক (Seligman, Clark) প্রমুখ মার্কিন অর্থশাস্ত্রীগণের অভিমত এই যে, পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতায়, যেখানে উৎপাদক কারক-সমূহের অবাধ গতিশীলতা বর্তমান, মুনাফার ন্যূনতম অবস্থা কল্পনা করা যায়। ইঁহাদের মতে, মুনাফা একেবারে শূন্যও হইতে পারে, যদি পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দরুণ পণ্যমূল্য ও প্রান্তিক উৎপাদন খরচ সমান হয়। ইঁহারা মুনাফাকে সংগঠনকর্তার উদ্‌বৃত্ত আয় হিসাবে দেখেন। এই আয়ের উৎপত্তি সম্ভব হয় তখনই, যখন পণ্যমূল্য উৎপাদন খরচের চাইতে অধিক হয়। তাঁহাদের মতানুসারে, শুধু সক্রিয় প্রগতিশীল অর্থব্যবস্থাতেই মুনাফার উদ্ভব সম্ভব; কেননা, কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাতেই পণ্যমূল্য ও উৎপাদন খরচের বৈষম্যের সৃষ্টি হইতে পারে। স্থির বা বর্তিষ্ণু অর্থ ব্যবস্থায় মুনাফার হার শূন্য হয়।

কিন্তু অধ্যাপক মার্শাল প্রমুখ বিলাতের অন্যান্য অর্থনীতিজ্ঞগণ মুনাফার এই মতবাদ অস্বীকার করেন। ইঁহারা বলেন, সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠানেই মুনাফার

এক একটা স্বাভাবিক হার থাকিবে। স্বাভাবিক মুনাফা উৎপাদন খরচের উপাদান বিশেষ এবং ইহা পণ্যমূল্যের মধ্যে প্রবেশ করে। মুনাফার হার বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন হয়। যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানে সংগঠন কর্তার দক্ষতার পরিমাণ ও ঝুঁকি বহনের বোঝা অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজন হয়, কিংবা যেখানে মূলধন বিনিয়োগের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজন, সেখানে মুনাফার হার অপেক্ষাকৃত অধিক হইতে বাধ্য।

মুনাফা-হিসাব (Calculation of Profit): মোট বা সাকুল্য মুনাফা হিসাব করা হয়, বিক্রয়লব্ধ অর্থ-আয় হইতে মোট উৎপাদন খরচ বাদ দিয়া। মোট মুনাফা বহু উপাদান মিশ্রিত ; উহার মধ্যে নীট মুনাফা অন্যতম। নীট মুনাফা সংগঠন কর্তার কেবলমাত্র ঝুঁকি গ্রহণ বাবদ অর্জিত আয়।

ব্যক্তিবিশেষের বা এক মালিকানা কারবারের মুনাফা হিসাব।

কোন ব্যক্তিবিশেষের, কিংবা এক মালিকানা কারবারের মুনাফা হিসাব করিতে হইলে, উহার বিক্রয়লব্ধ মোট আয় ও মোট উৎপাদন খরচ মিলাইয়া দেখিতে হয়। মোট উৎপাদন খরচের মধ্যে বহু উপাদান ভুক্ত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে ভূমির খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, ঋণকৃত মূলধনের সুদ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ও অবচয় জনিত ব্যয়, কাঁচামাল সংগ্রহের ব্যয়, পণ্য-বাজার-চালু করিবার দরুণ বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার-কার্য খাতে ব্যয়, দৈনন্দিন পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা বাবদ ব্যয় (wages of management) প্রভৃতি ধরা হইয়া থাকে। এই সকল উপাদান ছাড়া, মোট খরচের মধ্যে আরও উপাদন অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। যেমন, সংগঠনকর্তা যদি উৎপাদনে নিজের ভূমি কিংবা মূলধন বিনিয়োগ করেন, তাহা হইলে ঐ ভূমি বা মূলধনের বাজার চলিত হারে যে পরিমাণ খাজনা বা সুদ মিলিতে পারে, তাহাও উৎপাদন খরচেরই অংশ হিসাবে ধরা হইয়া থাকে। তাহার কারণ এই যে, ঐ জমি বা মূলধন যদি নিজের কারবারে না খাটাইয়া অন্যত্র বিনিয়োগ করা হইত, তাহা হইলে মালিক ঐ বাবদ আয় উপার্জন করিতে পারিত। এইরূপ ভাবে মোট খরচ নির্ণয় করিয়া উহা মোট বিক্রয়লব্ধ আয় হইতে বাদ দিতে হইবে। মোট বিক্রয়লব্ধ আয়দ্বারা কারবারী মোট উৎপাদন খরচ উশুল করিবেই ; তদুপরি, মোট আয়ের মধ্যে অন্যান্য উপাদান লাভও হইয়া থাকে। একচেটিয়া লাভ, অপ্রত্যাশিত ফালতু আয়, কিংবা মুদ্রাস্ফীতি দরুণ আয় প্রভৃতি অনেক সময় মোট বিক্রয়লব্ধ আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে। নীট মুনাফা হিসাব

করিতে মোট আয় হইতে এই সকল উপাদান বাদ দিতে হইবে। মোট আয় এইরূপ ভাবে নির্ণয় করিয়া উহা হইতে মোট খরচ বাদ দিলেই কারবারীর নীট মুনাফা পাওয়া যাইবে।

যৌথ-কারবারের বেলায় কিন্তু মুনাফা হিসাব করা হয় অন্যরূপে। যৌথ-কারবারের মোট খরচের মধ্যে ভুক্ত হয়, কারখানা গৃহ ভাড়া বাবদ খাজনা, শ্রমিকের মজুরি, কাঁচামাল সংগ্রহের মূল্য, ঋণকৃত মূলধনের সুদ, পণ্য বিক্রয় ও বিজ্ঞপ্তি বাবদ খরচ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ব্যয় (expenses of management), স্থায়ী পুঁজিপাটা অর্থাৎ যন্ত্রপাতির অবচয় খরচ (depreciation charges) ইত্যাদি। ইহা ছাড়া, সরকারকে দেয় করও মোট উৎপাদন খরচেরই একটি উপাদন বিশেষ। যৌথ-কারবারের মোট আয় বলিতে প্রধানতঃ বিক্রীত পণ্যমূল্য বুঝায়। কারবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্থাৎ ভূমি, বাড়ীঘর প্রভৃতি থাকিলে উহার আয়ও কোম্পানীর আয় ভুক্ত হইয়া থাকে। এই মোট আয় হইতে মোট খরচ বাদ দিলে যাহা উদবৃত্ত থাকে, উহাই কোম্পানীর মুনাফা। এই মোট মুনাফার একটা অংশ যৌথ-কারবারের রীতি অনুসারে অবণ্টিত অবস্থায় সংরক্ষণ তহবিলে (reserve fund) রাখিয়া, অবশিষ্ট লভ্যাংশ অংশীদারগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অংশীদারগণ কোম্পানীর যে লভ্যাংশ মুনাফারূপে পায়, তাহা প্রকৃত বা নীট মুনাফা নহে, অর্থাৎ ঝুঁকি বহনের পারিশ্রমিক নয়। কেননা, অংশীদারগণ যখন কোম্পানীর শেয়ারপত্র ক্রয় করে, তখন মূলধন বিনিয়োগের অপযোগ (disutility) বহন করিতে হয়; সুতরাং বণ্টিত লভ্যাংশের মধ্যে প্রকৃত মুনাফা ছাড়া বিনিয়োগকৃত পুঁজির অর্থ-আয় সুদও অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকে।

যৌথ-কারবারের মুনাফা হিসাব

যৌথ-কোম্পানীর মুনাফা হিসাব সম্পর্কে অধ্যাপক বোল্ডিংএর (Boulding) মতামত এখানে বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। কোম্পানীর মোট বিক্রয়লব্ধ আয়কে তিনি (ক) প্রকৃত-আয় ও (খ) কার্যফল-আয় (actual and virtual receipts)—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়াছেন। পণ্য বিক্রয়লব্ধ অর্থই প্রকৃত আয়। বৎসরের শেষে যে সম্পত্তি ও পুঁজিপাটা কোম্পানীর থাকিবে উহার অর্থমূল্যই কার্যফল-আয়। আবার কোম্পানীর মোট খরচ, (ক) প্রকৃত খরচ এবং (খ) কার্যফল খরচ (actual and virtual costs) এই দুই রকমের। প্রকৃত খরচ বলিতে, ভূমি, মূলধন ও শ্রমের পারিশ্রমিক বাবদ কোম্পানী যে

অর্থ ব্যয় করে তাহাকে বুঝায়। কার্যফল-খরচের মধ্যে ভুক্ত হয়, বৎসরের প্রথমে কোম্পানীর যে সম্পত্তি ও পুঁজিপাটা থাকে তাহার অর্থমূল্য। বৎসরের প্রারম্ভে মালিকানাস্বত্ত্ব-সম্পত্তি যেন কোম্পানী অন্যান্য সামগ্রীর ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া ক্রয় করিয়া লয়। মোট আয় ও মোট খরচ এই অর্থে ধরিলে, উহাদের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, তাহাই যৌথ-কারবারের মুনাফার পরিমাপ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফা (Profit in Socialist Economy): সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীগণ মুনাফার স্বপক্ষে কোন যৌক্তিকতা আছে বলিয়া মনে করেন না। সংগঠন কর্তা ফাট্‌কা কারবার, একচেটিয়া ব্যবসায়, কিংবা খাদক-সম্প্রদায়কে নিপীড়ন করিয়া মুনাফা লাভ করে। সংগঠন কর্তার দামদস্তুর করিবার ক্ষমতা অত্যধিক থাকার দরুণ, সে উৎপাদনে কারক নিয়োগ, বিশেষ করিয়া শ্রম নিয়োগ করে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ মজুরিতে। শ্রমিককে প্রকৃত প্রাপ্য মজুরি হইতে বঞ্চিত করিয়া সংগঠন কর্তা মুনাফার অংক বৃদ্ধি করে। মুনাফা, সমাজ-তান্ত্রিকদের মতে, একরকম চুরি করা আয় বিশেষ।

সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় সমস্ত উৎপাদন কারকের মালিকানা-স্বত্ব রাষ্ট্র নিজের হাতে গ্রহণ করে। রাষ্ট্র নিজে সংগঠনকর্তা হইয়া উৎপাদনের তদারক, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি করিয়া থাকে। উৎপন্ন পণ্যের আগম-আয় হিসাবে যাহা কিছু লাভ হয়, তাহা রাষ্ট্রই মুনাফা বলিয়া গ্রহণ করে। তবে ব্যক্তি-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংগঠন-কর্তার মুনাফা যেমন ঝুঁকি বা অনিশ্চয়তা বহনের পারিশ্রমিক স্বরূপ, রাষ্ট্রের প্রাপ্য মুনাফার বৈশিষ্ট্য অন্যরূপ। সমাজতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফার প্রধান ক্রিয়া হইল, রাষ্ট্র-চালিত বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনের উৎপাদকতা পরিমাপ করা। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে সীমিত সম্পদদ্বারা অগণিত উদ্দেশ্য মিটাইতে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের সম্ভাব্য উৎপাদকতার ভিত্তিতেই রাষ্ট্র উহার কার্যসূচী নির্ধারণ করে। মুনাফা এই উৎপাদকতা সম্পর্কে রাষ্ট্রকে ইংগিত দেয়।

অনুশীলনী

1. What are the different elements of profit ? How would you determine profit in the case of (a) individual firm and (b) joint stock companies ? (C.U. B.Com.'53,'56)

2. Distinguish between normal profit and actual profit. Show how expected profit influences production. (C. U. B. A. '52)

3. How does profit differ from other kinds of income ?
(C. U. B. Com. '54, B. A. (Hons.) '54)
4. (a) "Profits tend to equality" (b) "Profits tend to minimum".
Critically examine the views contained in these two statements. (C.U. B. A. '53)
5. Comment :
(a) "Profits originate in uncertainty". (b) "Profits are the reward for enterprise and innovation".
(C. U. B. A. Hons. '55)

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

অর্থ (Money)

মানুষের আদিম অবস্থায় অভাব যখন অত্যন্ত সীমিত ছিল, দ্রব্য বা কৃত্য বিনিময়ের যখন কোনই প্রয়োজন হয় নাই, তখন অর্থের কোনই ব্যবহার বা প্রচলন ছিল না। ধীরে ধীরে মানুষের অভাব অভিযোগ যখন বাড়িতে লাগিল, যখন ব্যক্তিগতভাবে একজনের পক্ষে আবশ্যকীয় সমুদয় দ্রব্য উৎপাদন ও সংগ্রহ করা অসম্ভব হইয়া পড়িল, তখনই বিনিময়ের আবশ্যকতা দেখা দিল। কিন্তু প্রথমেই অর্থের মাধ্যমে বিনিময় দেখা দিল না। মানব সভ্যতার বহু শতাব্দী ধরিয়া বস্তুবিনিময় ব্যবস্থা (barter) চালু ছিল,—যখন দ্রব্যের বদলে দ্রব্য বিনিময় হইত। কিন্তু কালে, বস্তু বিনিময় ব্যবস্থার অসুবিধা অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিল, তখন প্রচলন হইল অর্থের ব্যবহার। দ্রব্যের বদলে দ্রব্য, কিংবা সেবা কৃত্য বিনিময় প্রথার লোপ পাইল, তাহার স্থলে আসিল অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য বা কৃত্য বিনিময়ের যুগ।

অর্থের বিবর্তন

বস্তু-বিনিময়ের অসুবিধা (Inconveniences of Barter) : অর্থ প্রচলনের পূর্বে যে বস্তু-বিনিময় ব্যবস্থা চালু ছিল, উহার ছিল নানা অসুবিধা।

প্রথমতঃ, বস্তুবিনিময় ব্যবস্থায় বিভিন্ন সামগ্রীর আপেক্ষিক মূল্যমান সম্পর্কে ধারণা করিবার কোন উপায় ছিল না। দ্রব্য ও কৃত্যের সাধারণ পরিমাপ যন্ত্র ছিল না। উহাদের উপযুক্ত বিনিময় মাধ্যম ছিল না। ফলে, একই দ্রব্যের বহু মূল্যমান দৃষ্ট হইত ; কেননা, অন্য বহু বস্তুরবদলে উহার বিনিময় চলিত।

দ্বিতীয়তঃ, বস্তু বিনিময়ে অনেক সামগ্রী ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করা চলিত না ও আংশিকভাবে উহাদের বিনিময় সম্ভব হইত না। একটি ভেড়ার বিনিময় মূল্য যদি ১০টি টুপির সমান হইত, তাহা হইলে একটি টুপি ক্রয় করিলে ভেড়ার এক দশমাংশ বিনিময় মূল্য হিসাবে দিতে হইত। কিন্তু কার্যতঃ, ইহা একরূপ অসম্ভব ছিল ; কেননা, একটা ভেড়া দশভাগ করিলে, উহার বৃথা অপচয় হইত।

তৃতীয়তঃ, বস্তু বিনিময়ের আর একটি অসুবিধা এই ছিল যে, যদি কাহাকেও কোন দ্রব্য ক্রয় করিতে হইত, তাহা হইলে তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত, তাহার চাহিদা মাফিক দ্রব্য বিক্রয় করিতে কোথাও কেহ রাজী আছে কিনা। সংগে সংগে আবার ইহাও দেখিতে হইত যে, ঐ ব্যক্তি তাহার দ্রব্যও লইতে রাজী কিনা। এই রকম ব্যক্তি খুঁজিয়া বাহির করার যথেষ্ট অসুবিধা ছিল বলিয়া, বস্তু বিনিময় ব্যবস্থায় বিনিময়ের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত।

বস্তু বিনিময়ের এই সকল অসুবিধা ও গলদ দূর করিবার জন্যই অর্থের প্রচলন।

অর্থ কাহাকে বলে ? (What is Money ?) : অর্থের যথাযথ সংগা নির্দেশ করা কঠিন। সাধারণতঃ বলা হয় : 'Money is what money does'. যে কোন বস্তুকে অর্থ বলিয়া অভিহিত করা যায়, যদি উহা অর্থের প্রধান কাজ বিনিময়-মাধ্যমরূপে উপযোগী হয়। অধ্যাপক রবার্টসন (Robertson) বলেন যে, যদি কোন কিছু পণ্য মূল্য হিসাবে, অথবা ব্যবসায় কারবার সংক্রান্ত ঋণ বা দেনা মিটাইবার ক্ষেত্রে, সর্ব্বজন গৃহীত হয়, তাহাই অর্থ। (Anything which is widely accepted in payments of goods or in discharge of other kinds of business obligations is money.) অর্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য ইহার সর্বজন স্বীকৃতি। মানুষ অন্যান্য সামগ্রী চাহিয়া থাকে খাদন বা ব্যবহারের জন্য। কিন্তু অর্থ চাহিয়া থাকে, উহার ক্রয় ক্ষমতার জন্য। কীনস্ বলেন, অর্থের বড় গুণ, উহার তরলতা বা চল্‌তি ভাবাপন্নতা (liquidity)।

অর্থের কার্যাবলী (Functions of Money) : অর্থের প্রকৃত তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য ব্যাপকভাবে বুঝিতে হইলে, উহার বিভিন্ন ক্রিয়া াক জানা দরকার।

অর্থের **প্রথম ও প্রধান** ক্রিয়া এই যে, ইহা বিনিময়ের মাধ্যম বিশেষ।

বিনিময়ের মাধ্যম (Medium of Exchange)

বিনিময়ের বাহন হিসাবে অর্থ বস্তু-বিনিময় বা বার্টার ব্যবস্থার বহু বিধ অসুবিধা দূর করিয়াছে। অর্থ দ্রব্য ও কৃত্যের সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা বলিয়া উৎপাদক ও ভোগকারী, উভয়ের সহায়তা করে। অর্থের মাধ্যমেই উৎপন্ন সামগ্রীর বিনিময় ঘটিয়া উৎপাদকের পণ্য বাজার প্রসারিত হয়। আবার, অর্থের মাধ্যমেই ভোগকারী চাহিদানুরূপ খাদন দ্রব্য সহজেই সংগ্রহ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ দ্রব্য ও সেবাকৃত্যের পরিমাপ। বস্তু-বিনিময় যুগে দ্রব্য-কৃত্যের উপযোগ পরিমাপ করিবার কোন যন্ত্র ছিল না। সাধারণ কোন

দ্রব্য ও সেবাকৃত্যের পরিমাপ (measure of value)

পরিমাপ যন্ত্র না থাকার দরুণ, বিভিন্ন সামগ্রী বা কৃত্যের আপেক্ষিক মূলমান সম্পর্কেও কোন ধারণা করা সম্ভব হইত না। অর্থের প্রচলন হওয়ায় একদিকে যেমন দ্রব্য ও কৃত্যের উপযোগ পরিমাপ করিবার সুবিধা হইয়াছে, অন্যদিকে তেমনি দ্রব্য-কৃত্যের আপেক্ষিক মূল্যমান তুলনা করারও সুবিধা হইয়াছে। দ্রব্য বা কৃত্যের মূল্যমান, উহাদের বাজার দরের গড়পড়তা হার বিশেষ।

তৃতীয়তঃ, অর্থ ঋণ বা ভবিষ্যৎ প্রদেয়-মূল্যেরও পরিমাপ। সাধারণতঃ, আমরা ঋণকেই ভবিষ্যৎ প্রদেয়-মূল্য বলিয়া ধরিয়া থাকি। কর্জের লেন-দেন

ভবিষ্যৎ প্রদেয়-মূল্যের পরিমাপ (standard of deferred payments)

অর্থের মাধ্যমে হয় বলিয়া, উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পরের দেনা পাওনা সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা করিতে পারে। অর্থের মাধ্যমে কর্জ করিলে ও অর্থের মাধ্যমেই ঐ কর্জ শোধ করিলে, সাধারণতঃ যে পরিমাণ অর্থ-মূল্য কর্জ করা হয়, তাহাই পরিশোধ করা সম্ভব হয় ; কেননা, অন্যান্য দ্রব্যের তুলনায় অর্থের মূল্য অধিকতর স্থির।

চতুর্থতঃ, অর্থ-মূল্য দ্রব্য বা সম্পদ স্থানান্তর করিবার বাহন। মানুষ তাহার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি এক স্থানে বিক্রয় করিয়া অর্থ-মূল্য সংগ্রহ

মূল্য স্থানান্তর করিবার বাহন (means of transferring value)

করিতে পারে। ঐ অর্থ-মূল্যদ্বারা সে অন্যত্র আবার সম্পত্তি ক্রয় করিতে পারে।

মূল্য গচ্ছিত রাখিবার সহায়ক (store of value)

পরিশেষে, প্রাচীনপন্থী অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণের মতে, অর্থ মূল্য গচ্ছিত রাখিতেও সহায়তা করে। মানুষ তাহার আয়ের গোটা অংশই বর্তমান খাদনে ব্যয় করিতে নারাজ, ভবিষ্যতের জন্য কিছু গচ্ছিত রাখিতে উৎসুক। দ্রব্যের মারফৎ এইকার্য সম্ভব

হয় না ; কেননা, দ্রব্য টেকসই নয়। অর্থ অপেক্ষাকৃত স্থায়ী বলিয়া, মূল্য ভবিষ্যতের জন্য গচ্ছিত রাখিতে সহায়তা করে। আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদ্‌গণ অর্থের মূল্য গচ্ছিত রাখার তাৎপর্য অন্যভাবে ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অর্থদ্বারা মানুষ তাহার পরিসম্পৎ (resources) চল্‌তি অবস্থায় (liquid) রাখিতে পারে। চল্‌তি পরিসম্পৎ বা মুদ্রা প্রত্যেকেরই প্রয়োজন ; কেননা, মানুষের আয়-ব্যয়ের সমতা সকল সময় বজায় থাকে না। কখন কাহার কি ব্যয়ের প্রয়োজন হইবে, তাহারও স্থিরতা নাই। এই জন্য প্রত্যেকেরই চল্‌তি মুদ্রার উপর পছন্দ (liquidity preference)।

উৎকৃষ্ট মুদ্রার গুণাবলী (Qualities of Good Money) : অর্থের বা মুদ্রার বিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামগ্রীকে মুদ্রারূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। কালক্রমে আবার সামগ্রীর পরিবর্তে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রারও প্রচলন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট মুদ্রার গুণ এই দুইটি ধাতুতে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান বলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য ধাতুমুদ্রা হিসাবে আজিও চালু।

স্বর্ণ ও রৌপ্য সর্বজন গ্রহণীয় সামগ্রী। যে দ্রব্যের সর্বজন স্বীকৃতি নাই, তাহা মুদ্রার উপাদান হইতে পারে না। সর্বজন গ্রহণীয় বলিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা যে কেবল উৎকৃষ্ট মুদ্রা তৈয়ারীই করা যায় তাহা নহে ; ঐ গুণের জন্য উহারা গহনা ও অন্যান্য চারু দ্রব্য নির্মাণেও ব্যবহৃত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের বহন যোগ্যতাও (portability) অসামান্য। এই ধাতু দুইটি বহুমূল্য বলিয়া ইহাদের দ্বারা প্রচুর পরিমাণ দ্রব্যের লেন-দেন মিটাইবার সুবিধা হয়। এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পাঠাইবার খরচও তাহাতে কম পড়ে।

তৃতীয়তঃ, মুদ্রা যে ধাতুদ্বারা তৈয়ারী করা হইবে, তাহা টেকসই (durable) হওয়া চাই ; তাহা না হইলে মুদ্রার মূল্য স্থির থাকিতে পারে না। এদিক দিয়া দেখিতে গেলেও, স্বর্ণ ও রৌপ্যের গুণ অসামান্য। অন্যান্য দ্রব্য ক্ষয়িষ্ণু। কিন্তু স্বর্ণ ও রৌপ্য টেকসই বলিয়া, উহাদের দ্বারা মুদ্রা তৈয়ারী করিলে অর্থ ক্ষয় হয় না। উহার মূল্যও স্থির থাকে।

চতুর্থতঃ, যে দ্রব্য সহজে সঠিকভাবে চেনা যায়; তাহাই মুদ্রার উপাদান হওয়া প্রয়োজন। চোখে দেখিয়া, স্পর্শ করিয়া, কিংবা শব্দ শুনিয়া যে দ্রব্য আসল কি না বুঝা যায়, তাহাই মুদ্রার প্রকৃত উপাদান হওয়া উচিত। স্বর্ণ ও

রৌপ্য সহজে চেনা যায় ; এই দুইটি ধাতুকে মুদ্রার উপাদান করিলে মুদ্রা জাল হইবার ভয় কম থাকে।

পঞ্চমতঃ, বিভিন্ন একক স্বর্ণ, কিংবা বিভিন্ন একক রৌপ্যের গুণ সমজাতীয়। এই দুইটি ধাতুর এই সমজাতিত্ব আছে বলিয়াই ইহাদের দ্বারা মুদ্রা তৈয়ারী করিলে মুদ্রার মূল্য সাধারণতঃ স্থির থাকে।

ষষ্ঠতঃ, স্বর্ণ ও রৌপ্য গলাইয়া অত্যন্ত সূক্ষ্ম রেণুতে পরিণত করা চলে ও যে কোন মূল্যের মুদ্রা তৈয়ারী করা সম্ভব হয়। কিন্তু অন্য সামগ্রীদ্বারা তাহা সম্ভব হয় না। স্বর্ণ ও রৌপ্য সহজে গলান চলে বলিয়া, মুদ্রা তৈয়ারী কালে উহার উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য কিংবা নক্সা আঁকিতে কোনই অসুবিধা হয় না।

অর্থের বর্গীকরণ (Classification of Money): অর্থ বা মুদ্রাকে সাধারণতঃ দুইভাগে ভাগ করা চলে—(১) ধাতব মুদ্রা (metallic money) ও (২) কাগজী মুদ্রা (paper money)।

পূর্ণাংগ মুদ্রা ও নিদর্শক মুদ্রা (Full-bodied money and Token money)

ধাতব মুদ্রা আবার **পূর্ণাংগ** ও **নিদর্শক** মুদ্রা হইতে পারে। পূর্ণাংগ মুদ্রা বলিলে সেই মুদ্রাকে বুঝায়, যাহার বিনিময় বা লিখিত মূল্য (exchange or face value) এবং ধাতব মূল্য (metallic value) সমান। কিন্তু নিদর্শক মুদ্রার লিখিত মূল্য উহার ধাতব মূল্যের চেয়ে অধিক। যেমন, ভারতীয় টাকা ; ইহার লিখিত মূল্য ধাতব মূল্যের চেয়ে অনেক বেশী। সাধারণতঃ, নিদর্শক মুদ্রা হয় দেশের অপ্রধান অর্থ; উহা সামান্য মূল্যের লেনদেন কারবারে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন, পয়সা, এক আনা, দুই আনা, চার আনা ইত্যাদি। কিন্তু ভারতীয় টাকা নিদর্শক মুদ্রা হইলেও উহা প্রধান মুদ্রা।

সীমিত বিহিত মুদ্রা ও আমহুকুম মুদ্রা (Limited legal tender and Unlimited legal tender)

ধাতু মুদ্রাকে আবার **সীমিত বিহিত মুদ্রা** ও **আমহুকুম মুদ্রায়** ভাগ করা চলে। বিহিত মুদ্রা বলিলে সেই অর্থ বুঝায়, যাহাদ্বারা আইনতঃ ঋণদায় শোধ করা চলে। বিহিত মুদ্রা কেহ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিলে সে আইনের চক্ষে দণ্ডনীয়। ঋণদায় মিটাইতে বিহিত মুদ্রার যখন অনির্দিষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করার কোন বাধা না থাকে, তখন তাহাকে আমহুকুম মুদ্রা বলা হয়। যেমন ভারতের এক টাকার নোট, কিংবা এক টাকার মুদ্রা। যখন মুদ্রা ঋণদায় মিটাইতে আইনতঃ কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত গ্রহণীয়, তখন উহাকে সীমিত বিহিত মুদ্রা

বলে। যেমন, আমাদের দেশে আধুলির চেয়ে কম মূল্যের যে কোন মুদ্রা সীমিত বিহিত মুদ্রা। এই সকল মুদ্রা যেমন, চার আনা, দুই আনা প্রভৃতি ১০৲ টাকা পরিমাণ অবধি বিহিত মুদ্রা। ১০৲ টাকার বেশী সিকি বা দুই-আনাতে ঋণ শোধ দিতে গেলে, আইনতঃ গ্রাহ্য নয়।

দেশের সর্বপ্রধান মুদ্রাকে **মান মুদ্রা** বলা হয়। মান মুদ্রার নিরূপেই দেশের অন্যান্য মুদ্রার মূল্য পরিমাপ করা হয়। মান মুদ্রার মাধ্যমে লোকে আয়-ব্যয়ের হিসাব রাখে। মান মুদ্রার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা আমহুকুম মুদ্রা,—ঋণ বা কর্জ মিটাইতে ইহা যে কোন পরিমাণ পর্যন্ত আইনতঃ গ্রাহ্য। পরিশেষে, মান মুদ্রার লিখিত মূল্য (face value) ও অন্তর্নিহিত মূল্য (intrinsic value) সমান, অর্থাৎ উহার বাজার বিনিময় মূল্য ও উহার মুদ্রা মূল্য এক সমান। এই বাজার মূল্য ও মুদ্রা মূল্যের সমতা রক্ষিত হয় অবাধ মুদ্রাংকন ব্যবস্থা দ্বারা (free coinage)। মান মুদ্রা এক ধাতুমান (monometallism) হইতে পারে, কিংবা দ্বিধাতুমানও (bimetallism) হইতে পারে। সাধারণতঃ,. যে ব্যবস্থায় অর্থ একক নির্দিষ্ট হারে একটি মনোনীত ধাতুতে পরিবর্তিত হইতে পারে, উহাকে এক ধাতু মান মানমুদ্রা বলা হয়। যখন এই পরিবর্তনের জন্য দুইটি ধাতু মনোনীত করা হয়, তখন সেই ব্যবস্থাকে দ্বিধাতু মান বলা হয়। অনেক সময় এক দেশের মুদ্রামূল্য অন্য দেশের মুদ্রার মূল্য নিরূপে ধার্য করা হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবস্থাকে বিনিময় মুদ্রামান (Exchange Standard) বলা যায়।

মান মুদ্রা
(Standard money)

এক সময় ছিল যখন মানুষ টাকশালে ধাতু লইয়া আসিলে মুদ্রা তৈয়ারী করিয়া লইতে পারিত। ইহাকে **অবাধ মুদ্রাঙ্কণ (free coinage)** ব্যবস্থা বলা যায়। কিন্তু অধুনা মুদ্রাঙ্কণ একমাত্র সরকারী খাতে হইয়া থাকে। ইহাকে **সীমিত মুদ্রাঙ্কণ (limited coinage)** ব্যবস্থা বলে। অবাধ মুদ্রাঙ্কণ ব্যবস্থায় মুদ্রাঙ্কণ বাবদ সরকার কিছু অর্থ দাবী করিতেও পারে কিংবা একদম নাও পারে। যদি সরকার কিছুই দাবী না করে, তাহা হইলে ঐ ব্যবস্থাকে **নিঃশুল্ক মুদ্রাঙ্কণ (gratuitous coinage)** বলা যায়। যদি কেবল মুদ্রা তৈয়ারী করিবার খরচের পরিমাণ অর্থ দাবী করা হয়, তাহা হইলে উহাকে **মুদ্রা নির্মান খানি (brassage)** বলা যায়। আর সরকার যদি খরচের চেয়ে বেশী অর্থ দাবী করে, তাহা হইলে উহাকে **seigniorage** বলা হয়।

কাগজীমুদ্রা (Paper Money): কাগজী মুদ্রা বলিতে সাধারণতঃ ব্যাংক নোট (bank note) ও সরকারী নোট (government note) বুঝায়। চেক্ (cheque), বিল (bill) প্রভৃতিকে কাগজী মুদ্রা বলা চলে না; কেননা, উহাদের প্রচলন সীমিত।

কাগজী মুদ্রা দুই রকমের—**পরিবর্তনশীল** (convertible) ও **অপরিবর্তনীয়** (inconvertible)। পরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ইচ্ছা করিলে মানমুদ্রায় বিনিময় করা চলে; কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার এইরূপ পরিবর্তন চলে না। এই বিনিময় কুশলতার জন্যই কাগজী মুদ্রা সাধারণের বিশ্বাস ও আস্থা সঞ্চার করিয়া থাকে। বিনিময়ে কাগজী মুদ্রার প্রচলন (issue) সাধারণতঃ অত্যধিক হওয়ার সম্ভাবনা কম; কেননা, এই কাগজী মুদ্রা মান মুদ্রায় পরিবর্তন করিবার জন্য একটি সংরক্ষিত ভাণ্ডার রাখিতে হয়। কিন্তু অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রার অত্যধিক প্রচার হইবার সম্ভাবনা থাকে। কেননা, এইরূপ কাগজী মুদ্রার প্রচার করিতে হইলে মুদ্রা অধিকর্তার কোন সংরক্ষিত ভাণ্ডার রাখিতে হয় না। সাধারণতঃ, যুদ্ধ বিগ্রহের সময়, যখন সরকারী ব্যয়ের আত্যন্তিক চাপ পড়ে, তখনই অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা ছাপা হয়।

পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রা

অপরিবর্তনীয় কাগজী মুদ্রাকে আবার **হুকুমী কাগজী মুদ্রা** (Fiat Money) বলা চলে। রাষ্ট্রের হুকুমের জোরেই ইহার প্রচলন। ইহার মান মুদ্রায় পরিবর্তন চলে না; মুদ্রা অধিনায়ককে ইহা পরিবর্তনের জন্য কোন সংরক্ষিত ভাণ্ডার রাখিতে হয় না। তবু এই মুদ্রা চালু হয়; তাহার কারণ এই যে, জনসাধারণ সরকারের প্রতি আস্থাবান্ ও সরকার ইহার বাধ্যতা-মূলক প্রচলন ব্যবস্থা করিয়া থাকে।

হুকুমী কাগজী মুদ্রা

আর এক রকম কাগজী মুদ্রা কিছুকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চালু ছিল,—উহাকে **প্রতিনিধি-মূলক** (Representative Money) মুদ্রা বলা হইত। দেশের আসল মুদ্রার সংগে ইহার মূল্যের কোন বৈষম্য ছিল না। স্বর্ণ মুদ্রার প্রতিনিধি হিসাবে এই মুদ্রার প্রচলন হইয়াছিল। ইহাকে স্বর্ণ সার্টিফিকেট (gold certificate) বলা হইত। স্বর্ণ জমা রাখিয়া উহার পরিবর্তে এই কাগজী মুদ্রার প্রচার হইত।

প্রতিনিধি-মূলক মুদ্রা

ব্যাংক মুদ্রা (Bank Money): ইহাও এক প্রকার কাগজী মুদ্রা। ইহা ব্যাংক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পত্র। জনসাধারণ এই প্রতিশ্রুতি পত্র উপস্থিত

করিয়া চাহিবামাত্র ব্যাংক হইতে মুদ্রা গ্রহণ করিতে পারে পূর্বে যে কোন ব্যাংকই মুদ্রা প্রচার করিতে পারিত। কিন্তু তাহাতে মুদ্রার মূল্য স্থির রাখা অসুবিধা হয় বলিয়া, অধুনা কেবল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই নোট প্রচারের একমাত্র ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

কর্জমুদ্রা (**Credit Money**) : আর এক রকম মুদ্রা আছে, যাহা আসলে মুদ্রা নয়, কিন্তু মুদ্রার কাজ করে। চেক্, ব্যবসায়ী-হুণ্ডি (bill of exchange), ব্যাংকের হুণ্ডি (banker's drafts) প্রভৃতি আসলে মুদ্রা নয়; কেননা, উহাদের সর্বজন স্বীকৃতি নাই। কিন্তু, যে সকল কর্তৃপক্ষ উহাদের প্রচার করে তাহাদের উপর আস্থা সম্পন্ন জনসাধারণের মধ্যে এই সকল মুদ্রা চালু হয়। এই সকল কাগজী মুদ্রাকে কর্জ মুদ্রা বলে; প্রচারকারী কর্তৃপক্ষের উপর বিশ্বাসের জোরেই ইহাদের প্রচলন সম্ভব হইয়া থাকে।

হিসাব মুদ্রা (**Money of Account**) : হিসাব-মুদ্রা বলিতে অর্থের সেই একককে (monetary unit) বুঝায়, যাহার নিরূপে দেশের হিসাব পত্র রাখা হয় এবং ব্যবসায় কারবারের লেন-দেন স্থির হয়। হিসাব-মুদ্রাদ্বারা দেশের সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা, দাদন-কর্জ ও মূল্যস্তর প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। আমাদের দেশের হিসাব-মুদ্রা টাকা; গ্রেট ব্রিটেনের হিসাব মুদ্রা ষ্টার্লিং।

গ্রেশামের আইন (**Gresham's Law**) : ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ রাজত্ব লাভের পর দেখেন যে, অনেক নিকৃষ্ট ধাতুমুদ্রায় দেশ ছাইয়া গিয়াছে। এই মুদ্রা সংকট দূর করিবার জন্য তিনি নূতন মুদ্রা প্রচলনের আদেশ দেন। কিন্তু নূতন মুদ্রা প্রচলনের সংগে সংগে দেখা গেল যে, নিকৃষ্ট পুরাতন মুদ্রাগুলির বাজার প্রচলন বলবৎ রহিয়াছে, নূতন মুদ্রাগুলি বাজার হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। রাণীর আর্থিক পরামর্শদাতা স্যার টমাস্ গ্রেশাম নূতন মুদ্রার এই অন্তর্ধানের যে কারণ নির্দেশ করেন, তাহাই গ্রেশামের আইন বলিয়া পরিচিত।

গ্রেশামের আইনের সার মর্ম এই যে, যদি পাশাপাশি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট দুইটি মুদ্রা প্রচলিত থাকে, তাহা হইলে অল্পকালের মধ্যেই উৎকৃষ্ট মুদ্রা চল্তি বাজার হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং নিকৃষ্ট মুদ্রা চালু থাকিবে। 'Bad money tends to drive good money out of circulation when both of them are full legal tender.'

গ্রেশামের আইনটি পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা

কাহাকে বলে, আগে জানিতে হইবে। নিকৃষ্ট মুদ্রা বলিতে জাল বা কৃত্রিম মুদ্রা বুঝায়। কোন্ কোন্ বিশেষ অবস্থাতে মুদ্রা উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট হয় তাহা লক্ষণীয়।

উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা কাহাকে বলে ?

প্রথমতঃ, একই ধাতুনির্মিত সমমূল্যের দুইটি মুদ্রার মধ্যে যেটির ওজন একই থাকে, সেইটি উৎকৃষ্ট মুদ্রা; আর যেটির ওজন ব্যবহারের দরুণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইটি নিকৃষ্ট মুদ্রা।

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি সমমূল্যের কাগজী মুদ্রার মধ্যে যেটি পরিষ্কার, কড়কড়ে, সেইটি উৎকৃষ্ট মুদ্রা; আবার যেটি ব্যবহারের দরুণ ময়লা ও তৈলসিক্ত হয়, সেইটি নিকৃষ্ট মুদ্রা।

তৃতীয়তঃ, সমমূল্যের ধাতু ও কাগজী মুদ্রা পাশাপাশি প্রচলিত থাকিলে, কাগজী মুদ্রা নিকৃষ্টতা প্রবণ হয় বেশী। কর্তৃপক্ষ কাগজী মুদ্রা যদি অধিক প্রচার করে, তাহা হইলে ঐ মুদ্রামূল্য হ্রাস পায় (depreciation)। ইহার ফলে, সামগ্রী ও ধাতুমূল্য বৃদ্ধি পায়। ধাতুমূল্য বৃদ্ধির সংগে ধাতুমুদ্রা কাগজী মুদ্রার তুলনায় উৎকৃষ্টতর প্রতীয়মান হয়।

চতুর্থতঃ, যদি দ্বিধাতুমান অর্থব্যবস্থা চালু থাকে, তাহা হইলেও মুদ্রার নিকৃষ্টতা উৎকৃষ্টতা ভেদ হইয়া থাকে। যদি স্বর্ণ ও রৌপ্য অসীম বিহিত-মুদ্রা (unlimited legal tender) হয়, তাহা হইলেও উহাদের একটি উৎকৃষ্ট ও অপরটি নিকৃষ্ট মুদ্রা হইতে পারে। দ্বিধাতুমান মুদ্রার সরকারী নির্দিষ্ট অনুপাতের সহিত বাজার অনুপাত সঠিক নাও থাকতে পারে। বাজার অনুপাতের অদল বদল হইলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মূল্যের পরিবর্তন অনিবার্য হয়। সরকারী নির্দিষ্ট অনুপাতের তুলনায় স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের মূল্য অধিক হইতে পারে। যে ধাতু-মুদ্রার বাজার মূল্য সরকারী নির্দিষ্ট মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, উহাকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা বলা যায়; আর যে ধাতুমুদ্রার উপর সরকারী মূল্য অধিক আরোপিত (over-valued) হয়, উহাকে নিকৃষ্ট মুদ্রা বলা যায়।

দ্বিধাতুমান ব্যবস্থার উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা

উপরি উক্ত বিভিন্ন অবস্থাতেই গ্রেশামের আইন কার্যকরী হইয়া থাকে; অর্থাৎ দুইটি মুদ্রা পাশাপাশি চালু থাকিলে, উহাদের মধ্যে নিকৃষ্টটি উৎকৃষ্টটিকে প্রচলন হইতে বিতাড়িত করে। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইউরোপের বহু দেশে গ্রেশামের নিয়ম কার্যকরী হইয়াছিল। তখন ঐ সকল দেশে প্রচুর কাগজী মুদ্রা প্রচারের দরুণ ঐ মুদ্রামূল্যের হ্রাস হইয়াছিল। ফলে, স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলন

হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও গ্রেশামের নিয়ম **কার্যকরী হইয়াছিল।** রৌপ্য মুদ্রার চলতি মূল্য ধাতুমূল্যের চেয়ে অধিক হওয়ায়, **ইহা নিকৃষ্ট মুদ্রা** ও sovereign উৎকৃষ্ট মুদ্রা বলিয়া পরিগণিত হওয়ায়, sovereign প্রচলন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

গ্রেশামের আইন প্রয়োগ-পদ্ধতি (How Gresham's Law Operates ?): যদি উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রা পাশাপাশি চালু থাকে, তাহা হইলে মানুষ সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট মুদ্রা গলাইবে এবং নিকৃষ্ট মুদ্রাই প্রচলনে পড়িয়া থাকিবে। উৎকৃষ্ট মুদ্রাকে গলাইলে অধিক ধাতু পাওয়া যায় বলিয়া, গহনা তৈয়ারী করিবার জন্য কিংবা ধাতু বাজারে বিক্রয় করিবার জন্য লোকে উৎকৃষ্ট মুদ্রা গলানই পছন্দ করিবে। **দ্বিতীয়তঃ,** মানুষ যখন অর্থ জমা (hoard) করে, তখনও উৎকৃষ্ট মুদ্রাই জমা করিতে পছন্দ করে। তাহাতেও উৎকৃষ্ট মুদ্রা প্রচলন হইতে অন্তর্হিত হয়। **তৃতীয়তঃ,** বিদেশে যখন প্রাপ্য মিটাইতে হয়, তখনও উৎকৃষ্ট মুদ্রারই প্রয়োজন। এক দেশে অন্য দেশের স্বর্ণ মুদ্রা চালু হয় না। সুতরাং আমদানী দ্রব্যের জন্য বিদেশীদের স্বর্ণ-মুদ্রা প্রেরণ করিলে উহা তাহারা গলাইয়া লয়। উৎকৃষ্ট স্বর্ণ-মুদ্রা গলাইলে অধিক স্বর্ণ পাওয়া যায় বলিয়া, উৎকৃষ্ট মুদ্রাই বিদেশে চলিয়া যায়, নিকৃষ্ট মুদ্রা দেশে পড়িয়া থাকে।

গ্রেশামের নিয়মের প্রতিবন্ধক (Limitations of Gresham's law)

গ্রেশামের নিয়ম সকল অবস্থাতেই কার্যকরী হয় না। এই নিয়ম প্রয়োগের পথে প্রতিবন্ধক আছে। যদি কোন দেশের অর্থের চাহিদা এমন ব্যাপক হয় যে, প্রচলিত উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট মুদ্রার পরিমাণ উহা মিটাইতে পারে না, তাহা হইলে গ্রেশামের নিয়ম কার্যকরী হইবে না। এ ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট মুদ্রার মূল্য মুদ্রা হিসাবেই উহার ধাতুমূল্যের চাইতে অধিক হইবে এবং সেইজন্য প্রচলন হইতে অন্তর্হিত হইবে না। **দ্বিতীয়তঃ,** যদি গোটা দেশ নিকৃষ্ট মুদ্রা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে ও উহার প্রচলনের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলেও গ্রেশামের নিয়ম খাটে না।

অনুশীলনী

1. What is money ? Give an account of its different functions. (C. U. B. A. '53, '54)

2. Money has been classified in your text book as follows :—
(i) Standard Money (ii) Representative Money (iii) Credit Money :—(a) Token Money (b) Government Notes (c) Bank Notes. Explain and illustrate this classification. (C. U. B. A. '52)

উনত্রিংশ অধ্যায়

অর্থের মূল্য (Value of Money)

অর্থের মূল্য কি ? (What is the Value of Money ?) : সামগ্রী ও কৃত্যের যেমন মূল্য আছে, অর্থেরও সেইরূপ দাম আছে। আর অর্থের দাম মানেই ইহার বিনিময় মূল্য। এক একক অর্থের বিনিময়ে উহা কতটা সামগ্রী বা কৃত্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা রাখে, উহাই অর্থের মূল্য। অর্থের এই ক্রয় ক্ষমতা চলতি মূল্য-স্তরের উপর নির্ভর করে। মূল্য-স্তর উর্ধ্বগামী হইলে, অর্থের ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস হয় ; অর্থ তখন পূর্বের চাইতে কম পরিমাণ দ্রব্য বা কৃত্য ক্রয় করিতে পারে। আবার মূল্য-স্তর নিম্নগামী হইলে, অর্থ পূর্বের চাইতে অধিক পরিমাণ দ্রব্য বা কৃত্য ক্রয় করিতে পারে; তখন অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য-স্তরের উঠানামা আর অর্থ-মূল্যের পরিবর্তন বিপরীতমুখী (The value of money varies inversely with the changes in the price level)।

মুদ্রামূল্যের আর এক অর্থ হইতে পারে। আমরা অনেক সময় সস্তা (cheap) মুদ্রা কিংবা আক্রা (dear) মুদ্রা বলিয়া থাকি। 'সস্তা' মুদ্রার সেই অর্থ যাহা অল্প সুদে দাদন পাওয়া যায় ; আর 'আক্রা' মুদ্রার মানে সেই অর্থ, যাহা অধিক সুদে কর্জ মেলে।

অর্থের মূল্য নিরূপণ (Determination of the Value of Money) : অর্থের ক্রয় ক্ষমতা সকল সময় এক থাকে না ; কখনও হ্রাস, কখনও বৃদ্ধি পায়। অর্থমূল্যের এই হ্রাস-বৃদ্ধি আবার সাধারণ দামস্তরের (price level) সংগে সম্পর্কযুক্ত। দামস্তর বৃদ্ধি পাইলে, অর্থ-মূল্য হ্রাস পায় ; আবার দামস্তর হ্রাস হইলে, অর্থ-মূল্য বৃদ্ধি পায়। অর্থ-মূল্যের উঠা-নামা বা দামস্তরের এই পরিবর্তনের কারণ কি ?

অর্থের পরিমাণবাদ ও উহার মূল্য নিরূপণ (Quantity Theory and Determination of the Value of Money) : প্রাচীন পন্থী অর্থবিদ্যাবিদ্গণ অর্থের পরিমাণবাদ ব্যাখ্যানদ্বারা মুদ্রা-মূল্য বা দামস্তরের বিশ্লেষণ করিয়াছেন। এই তত্ত্বের অর্থ এই যে, অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে মুদ্রামূল্য হ্রাস পায়, কিংবা দামস্তর বৃদ্ধি পায়; আর অর্থের যোগান হ্রাসে মুদ্রামূল্য বৃদ্ধি পায়, কিংবা দামদস্তরের হ্রাস হয়। মুদ্রামূল্যের উঠা-নামা হয় অর্থ যোগান পরিমাণের পরিবর্তনের বিপরীত দিকে; আর দামস্তরের উঠা-নামা হয় অর্থ যোগান পরিমাণের পরিবর্তনের একই দিকে। অর্থের পরিমাণবাদ অনুসারে, অর্থের যোগান যতটা পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, মুদ্রামূল্য ঠিক একই অনুপাতে হ্রাস পাইবে, কিংবা দামস্তর ঠিক একই অনুপাতে বাড়িবে, যদি অবশ্য আর কোন কিছুর পরিবর্তন না হয়। আবার অর্থের যোগান যতটা হ্রাস হইবে, মুদ্রামূল্য সমানুপাতিক হারে বাড়িবে, কিংবা দামস্তর সমানুপতিক হারে কমিবে।

অর্থের যোগান বলিতে সেই পরিমাণ মুদ্রা বুঝায়, যাহা দ্রব্য ও কৃত্য ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়। অর্থের যোগান বলিতে কেবল ধাতুমুদ্রা, কাগজী মুদ্রা ও ব্যাংকের আমানতকেই বুঝায় না। এই সকল মুদ্রা, দ্রব্য ও কৃত্য ক্রয় করিতে কোন নির্দিষ্ট সময়ে কতবার ব্যবহৃত হয়, তাহাও অর্থ যোগান নির্ধারণে ধরিতে হইবে। কোন মুদ্রা, যেমন টাকা, যদি এক মাসে ১০ বার দ্রব্য ক্রয়ে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ঐ মুদ্রার যোগান হইবে ১৲ × ১০ = ১০৲ টাকা। কোন নির্দিষ্ট সময়ে এক একক মুদ্রা গড়পড়তা যে কয়েকবার হাত বদলায় বা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে মুদ্রার প্রচলন গতি (velocity of circulation of money) বলে।

মোট মুদ্রাকে মুদ্রার গড়পড়তা প্রচলন গতিদ্বারা গুণ করিলে মুদ্রার যোগান নির্ণয় করা যায়। অপরপক্ষে, অর্থের চাহিদা নির্ভর করে, কোন নির্দিষ্ট সময়ের লেন-দেনের পরিমাণের উপর (value of transactions)। এই লেন-দেনের পরিমাণ আবার নিভর করে বাজারে বিক্রয়ের জন্য যে পরিমাণ দ্রব্য ও কৃত্য স্থাপিত হয় তাহার উপর। অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন মুদ্রার চাহিদা নির্ধারণ করে। পরিমাণ তত্ত্বের মূল সংস্করণে অর্থের চাহিদাকে স্থির অনুমান করিয়া, অর্থ যোগানের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দামস্তরও যে একই মুখে সরাসরি পরিবর্তিত হয়, তাহাই নির্দেশ করা হইয়াছে। অর্থ যোগান বলিতে মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা এবং তাহাদের প্রচলন গতির গুণফল ধরা হইয়াছে। মূল পরিমাণবাদ অনুসারে দাম-স্তর নির্ণয়

করা যায়, মোট অর্থ যোগানকে ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তনদ্বারা ভাগ করিয়া।

$$\text{দামস্তর (P)} = \frac{\text{মোট অর্থের যোগান (M V)}}{\text{ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন (T)}}$$

অর্থের চাহিদাকে স্থির অনুমান করিলে, অর্থাৎ ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন অপরিবর্তনীয় ধরিলে, মোট অর্থের যোগান বৃদ্ধি হইলে দামস্তর সমানুপাতিক বৃদ্ধি পাইবে, বা মুদ্রামূল্য হ্রাস হইবে।

পরিমাণ-বাদের মূল সংস্করণে মোট মুদ্রা যোগানের অর্থ কেবল ধাতু মুদ্রা ও কাগজী মুদ্রা এবং তাহাদের প্রচলন গতির গুণফল ধরা হইয়াছে। কিন্তু

অধ্যাপক ফিশারের পরিমাণ বাদ সমীকরণ (Prof. Fisher's Quantity Equation)

উন্নার্গগামী সমাজে দাদন মুদ্রারও দ্রব-কৃত্য ক্রয়-বিক্রয়ে ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। ব্যাংকের আমানত ও উহার প্রচলন গতিও ব্যবসায় বাণিজ্যের লেনদেনে একটা বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। অধ্যাপক ফিশার সেই জন্য পরিমাণবাদের মূল সমীকরণের কিছুটা পরিবর্ধন করিয়া একটি নূতন তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। তাঁহার তত্ত্বের সমীকরণ এই :

$$\text{দ} = \frac{\text{অ গ} + \text{অ}' \text{ গ}'}{\text{ব}}$$

$$\left(P = \frac{M\,V + M'\,V'}{T} \right)$$

দ = দামস্তর ; ব = ব্য া বাণিজ্যের আয়তন ; অ = অর্থের পরিমাণ ; গ = অর্থের প্রচলন গতি অ′ = ক্রেডিট্ বা দাদন অর্থের পরিমাণ ; গ′ = দাদন অর্থের প্রচলন গতি।

(P = Price level ; T = Volume of trade ; M = Volume of money ; M′ = Volume of bank deposits ; V = Velocity of circulation of money ; V′ = Velocity of circulation of bank deposits.)

ফিশার তাঁহার তত্ত্বে এই অনুমান করিয়াছেন যে, স্বাভাবিক দীর্ঘ সময় মিয়াদে অর্থ যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি হইলেও, ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন (ব),

ফিশারের পরিমাণ বাদের অনুমান (Assumptions of Fisher's Theory)

অর্থের প্রচলন গতি (গ), এবং দাদন অর্থের প্রচলন গতির (গ′) কোন পরিবর্তন হয় না। ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন দেশের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের উপর নির্ভর করে। দেশের মোট উৎপন্ন নির্ভর করে আবার উৎপাদক কারকের যোগান ও প্রগুণতার উপর।

কিন্তু অর্থ যোগানের হ্রাস বৃদ্ধির সংগে ইহাদের যোগানের কোন পরিবর্তন হয় না। সেইরূপ আবার অর্থের প্রচলন গতি অর্থ যোগানদ্বারা নির্ধারিত হয় না। অর্থের প্রচলন গতি নির্ভর করে মানুষের অর্থ ব্যবহারের অভ্যাস ও ব্যবসায় পদ্ধতির উপর। অর্থ যোগানের হ্রাস বৃদ্ধিতে মানুষের অর্থ ব্যবহারের অভ্যাস ও ব্যবসায় পদ্ধতির কোন অদল বদল হয় না।

অর্থের পরিমাণবাদে যাঁহারা বিশ্বাসী, তাঁহারা বলেন যে, দামস্তরের পরিবর্তন মুদ্রা যোগান পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। তাঁহাদের মতে দামস্তরের স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, অর্থ যোগান অপরিবর্তনীয় রাখিতে হয়।

পরিমাণবাদের বিরুদ্ধে সমালোচনা (Criticism of the Quantity Theory): যে সকল অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া পরিমাণবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে, উহারা অবাস্তব। ফিশারের সমীকরণে মুদ্রার চাহিদা অপরিবর্তনীয় বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। অর্থের যোগান কিংবা দাম-স্তরের পরিবর্তনে মুদ্রার চাহিদার কোন অদল বদল হয় না, এই কল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। মুদ্রার চাহিদা ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তনের উপর নির্ভর করে। ব্যবসায় বাণিজ্যের আয়তন আবার দাম-স্তরের উঠা-নামার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। দাম-স্তরের বৃদ্ধিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের মুনাফা লাভের সম্ভাবনা দেখা যায়, ব্যবসায়ীরা তখন অধিক পরিমাণ দাদন লইয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে। তাহাতে সাধারণ উৎপাদনও কারবারের সম্প্রসারণ হয়)। ধাতু মুদ্রার ও ব্যাংকের আমানতের প্রচলন গতিও দামস্তরের হ্রাস বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে। দামস্তরের বৃদ্ধিতে ব্যবসায় বাণিজ্যের যখন সম্প্রসারণ হয়, তখন অর্থের প্রচলন গতি স্বভাবতঃই বাড়িয়া থাকে। আবার দামস্তরের হ্রাস হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের যখন মন্দা আসে, তখন অর্থের প্রচলন গতিও হ্রাস পায়। অধ্যাপক ফিশার অনুমান করেন যে, অর্থ যোগান পরিবর্তনে বা দামস্তরের পরিবর্তনের দরুণ ব্যবসায় বাণিজ্যের এবং অর্থ প্রচলন গতির পরিবর্তন স্বল্পমিয়াদে সম্ভব হইতে পারে ; কিন্তু দীর্ঘ মিয়াদে উহারা সুস্থির। কীন্‌স্‌ প্রমুখ অর্থ বিদ্যাবিদগণ কিন্তু এই অল্প মিয়াদী পরিবর্তনের উপরই বেশী জোর দেন।

পরিমাণ বাদের অনুমানগুলি বাস্তব নহে

দ্বিতীয়তঃ, ফিশারের পরিমাণবাদ দেশে পূর্ণ নিয়োগ বর্তমান, এই অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। দেশে যদি উৎপাদক কারকগণের পূর্ণ কর্ম নিয়োগ হয়, তাহা হইলে অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে সমানুপাতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে। ফিশারের

এই অনুমান দীর্ঘ মিয়াদে প্রযোজ্য হইতে পারে। কিন্তু অল্প মিয়াদে অনেক কারকেরই পূর্ণ কর্ম সংস্থান থাকে না। এ অবস্থাতে অর্থের যোগান বৃদ্ধি হইলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইবে না; অর্থের যোগান বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে ও কর্মহীন কারকের কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। অল্পমিয়াদে অর্থের যোগান ও দ্রব্য মূল্যের পরিবর্তনের সমানানুপাতিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই: যে অনুপাতে অর্থ যোগান বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই অনুপাতে দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় না; কিংবা যে অনুপাতে অর্থের যোগান হ্রাস পায়, সেই অনুপাতে মূল্যস্তর হ্রাস পায় না।

অর্থের যোগান ও দ্রব্য মূল্যের পরিবর্তনের সমানুপাতিক প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই

তৃতীয়তঃ, ফিশারের সমীকরণ অনুসারে, মূল্যস্তর দেশের মোট অর্থ পরিমাণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু তাহা সত্য নহে; কেননা, মোট অর্থের পরিমাণ দাম স্তরকে প্রভাবান্বিত করে না। যে অর্থ গচ্ছিত (hoarded) অবস্থায় থাকে, তাহা দাম স্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না; যাহা কেবল প্রচলনে আছে, তাহাই দামস্তর প্রভাবান্বিত করে।

চতুর্থতঃ, যে সকল বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়া অর্থের যোগান দ্রব্য মূল্য প্রভাবান্বিত করে, তাহার পুরাপুরি ব্যাখ্যানও ফিশারের পরিমাণবাদে পাওয়া যায় না। অর্থের যোগান সরাসরি ভাবে দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। অর্থের যোগানে প্রথম পরিবর্তন হয় সুদের হারের এবং এই সুদের হারের পরিবর্তনের মাধ্যমে দ্রব্য উৎপন্ন পরিমাণেরও দামস্তরের অদল বদল হয়।

পঞ্চমতঃ, ফিশার মুদ্রার চাহিদা যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন এবং মুদ্রার চাহিদা যেভাবে অপরিবর্তনীয় অনুমান করিয়াছেন, তাহাও গ্রহণ করা যায় না। দ্রব্য ও কৃত্যের বিক্রয় নিরিখে ফিশার মুদ্রার চাহিদা নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মুদ্রার চাহিদা চল্তি অর্থের পছন্দনীয়তার দ্বারা নির্ণয় করেন। চল্তি অর্থের পছন্দনীয়তার পরিবর্তনের সংগে সংগে মুদ্রার চাহিদাও বাস্তব জগতে স্থির থাকে না।

ষষ্ঠতঃ, ফিশারের সমীকরণের আর একটি প্রধান গলদ এই যে, ইহা কেবল সমস্ত রকম ব্যবসায় বাণিজ্যসংক্রান্ত আর্থিক লেন-দেনেরই গড়পড়তা মূল্য নির্ণয় করে। কিন্তু অর্থের ক্রয় ক্ষমতা পরিমাপ করে না। ফিশারের সমীকরণে ব্যবসায় বাণিজ্যিক লেন-দেনের কথাই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ভোগ্য দ্রব্য ও কৃত্য খরিদ করিতে অর্থের যে লেন-দেন হয়, তাহার কথা একেবারেই অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

সপ্তমতঃ, অর্থের পরিমাণবাদ দ্বারা বাণিজ্য চক্রের পূর্ণাংগ ব্যাখ্যানও সম্ভব নয়। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে যাহারা বিশ্বাসী তাঁহারা বলেন যে, বাণিজ্য চক্রের মন্দা অবস্থায় যখন দামস্তর নিম্নমুখী হয়, তখন অর্থ যোগান বৃদ্ধি করিয়া উহা রোধ করা যায়। কিন্তু বিগত পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দায় অনেক দেশই অর্থ-যোগান বৃদ্ধি করিয়াছিল, কিন্তু দামস্তরের অধোগতি প্রতিরোধ করিতে পারে নাই।

পরিশেষে, আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, অর্থের পরিমাণ মুদ্রামূল্য কিংবা দামস্তর নির্ধারক নহে। মুদ্রামূল্য কিংবা দামস্তর নির্ধারিত হয় জাতীয় আয় ও উহার ব্যয়ের দ্বারা। জাতীয় আয় বৃদ্ধি হইলে সাধারণের খাদন ব্যয় বৃদ্ধি হয়; এবং খাদন ব্যয় বৃদ্ধি হইলে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়। আবার, জাতীয় আয় হ্রাস পাইলে, সাধারণের খাদন ব্যয়ের সংকোচন হয় এবং এই খাদন ব্যয়ের সংকোচনে দামস্তরের হ্রাস হয়।

মুদ্রার প্রচলন গতি (Velocity of Circulation of Money): দ্রব্য বা কৃত্য খরিদ করিতে মুদ্রা যখন ব্যবহৃত হয়, তখন উহা বহু হাত বদলায়। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে একটি মুদ্রা গড়পড়তা যে কয়েকবার হাত বদলায়, উহাকে ঐ মুদ্রার প্রচলন গতি বলে। মুদ্রার প্রচলন গতি বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

মুদ্রার প্রচলনগতি নির্ধারক (Factors determining Velocity of Circulation of Money)

মুদ্রার প্রচলন গতি কর্জ ও বিনিয়োগের সুবিধার উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। যদি কর্জ ও বিনিয়োগ করিবার সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকে, তাহা হইলে অযথা কেহ মুদ্রা হাতে রাখিবে না। ফলে, মুদ্রার প্রচলন গতি বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল দেশে ব্যাংক কিংবা অন্যান্য আর্থিক সংস্থা সুগঠিত হইয়াছে, সেখানে অর্থ কর্জ কিংবা বিনিয়োগ করিবার কোন অসুবিধা নাই। সেখানে অর্থের প্রচলন গতিও অধিক।

দ্বিতীয়তঃ, মানুষের অর্থ-আয় যদি নিয়মিত ও সুস্থির হয়, তাহা হইলেও অর্থের প্রচলন গতি বৃদ্ধি পাইবে। আয় নিয়মিত ও সুনিশ্চিত হইলে, কেহ অযথা অধিক মুদ্রা হাতে রাখিবে না, তাহাতে মুদ্রার প্রচলন গতি বাড়িবে। ক্রয়-বিক্রয় যদি ধারে হয়, তাহা হইলেও মুদ্রার প্রচলন গতি বাড়ে।

তৃতীয়তঃ, অর্থ-আয় প্রাপ্তি ও উহার ব্যয়ের তাগিদের উপরও অর্থের প্রচলন গতি নির্ভর করে। যদি অর্থ ব্যয়ের তাগিদ খুব অধিক হয়, তাহা

হইলে অর্থের প্রচলন গতি বাড়িবে। যদি আয় প্রাপ্তি ও ব্যয়ের মধ্যে সময়ক্ষেপ অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়, তাহা হইলে লোকে খুব সামান্য অর্থই অলস অবস্থায় হাতে রাখিতে পারে। ফলে, অর্থের প্রচলন গতি বৃদ্ধি পায়।

চতুর্থতঃ, অর্থ চলাচল ও স্থানান্তরিত হইবার সুযোগ সুবিধার উপরও অর্থের প্রচলন গতি নির্ভর করে। যে দেশের মধ্যে অর্থ সত্বর স্থানান্তর করিবার যানবাহন ও পরিবহনের সুবিধা আছে, সেখানে অর্থের গতি অধিক হয়।

পঞ্চমতঃ, লোকের খাদন ও সঞ্চয় প্রবণতার উপরেও অর্থের প্রচলন গতি নির্ভর করে। যেখানে সঞ্চয় প্রবণতা বেশী, সেখানে খাদন প্রবণতা স্বভাবতঃই কম। খাদন প্রবণতা হ্রাস হইলে, অর্থের প্রচলন গতিও হ্রাস পায়। যে সমাজে ধনবৈষম্য অত্যধিক, সেখানে সঞ্চয় প্রবণতাও বেশী ; সেখানে মুদ্রার প্রচলন গতিও স্বভাবতঃ কম হইবে।

পরিশেষে, মুদ্রার প্রচলন গতি অর্থের চল্‌তি পছন্দনীয়তার (Liquidity Preference) উপরও বিশেষভাবে নির্ভর করে। সাধারণতঃ মন্দার সময় অর্থের চল্‌তি পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি পায়, খাদন ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়। ফলে, অর্থের প্রচলন গতিও হ্রাস পায়। আবার, যখন তেজী অবস্থার উদ্ভব হয়, যখন পণ্যমূল্য ও মুনাফার অংক বৃদ্ধি পাইবাব সম্ভাবনা ও লক্ষণ দেখা যায়, তখন মানুষের চলতি মুদ্রার পছন্দনীযতা হ্রাস পায় এবং খাদন ও বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ফলে, মুদ্রার প্রচলন গতিও বৃদ্ধি পায়।

কেম্‌ব্রিজ সমীকরণ বা কীনসের সূত্র (Cambridge Equation or Keynes' Formula) : কীনস্ প্রমুখ কেম্বিজের কতিপয় অর্থবিদ্যাবিদ অর্থের পরিমাণবাদের এক নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন। অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে, মুদ্রার চাহিদাকে অপরিবর্তণীয় অনুমান করিয়া, মুদ্রা যোগানের উপর কেবল জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কেম্‌ব্রিজ সমীকরণে মুদ্রার চাহিদার পরিবর্তনদ্বারা মুদ্রার মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে। মার্শাল, ক্যানান প্রভৃতির মতবাদ অনুকরণ করিয়া কীনস্ মুদ্রা-চাহিদার এক নূতন ব্যাখ্যান দিয়াছেন। মুদ্রার চাহিদার অর্থ, চল্‌তি অর্থের পছন্দনীয়তা (liquidity preference), যে মুদ্রা মানুষ নগদ বা ব্যাংকের আমানত হিসাবে তরল অবস্থায় (in liquid form) হাতে রাখতে চায়। সকলের ব্যক্তিগত চল্‌তি অর্থের পছন্দনীয়তার সমষ্টি ফলই সমাজের চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা। ধরা যাক্, কোন সমাজের চল্‌তি অর্থের যাহা পছন্দনীয়তা তাহাদ্বারা K একক দ্রব্য ক্রয় করা চলে। যদি

মূল্যস্তর হয় P, তাহা হইলে PK অর্থের চাহিদা হইবে। কিন্তু অর্থের চাহিদা আবার অর্থের যোগানের সমান। অর্থের যোগান পরিমাণ যদি M হয়, তাহা হইলে PK হইবে M এর সমান, অর্থাৎ $PK = M$, বা $P = \frac{M}{K}$

যদি অর্থের যোগান পরিমাণ (M) বৃদ্ধি পায়, আর চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা অপরিবর্তনীয় থাকে (অর্থাৎ K যদি স্থির থাকে), তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। দামস্তর উর্ধ্বমুখী হওয়াতে K একক দ্রব্যের ক্রয় মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার জন্য মুদ্রার চাহিদাও বাড়িবে। K একক দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ যখন চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা বাড়িবে, তখন যোগান বৃদ্ধির অভাবে দামস্তর নিম্নগামী হইবে। আবার যখন মুদ্রার চাহিদা হ্রাস পাইয়া চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা কমিবে, তখন দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে।

কেম্‌ব্রিজ সমীকরণের প্রধান গুণ এই যে, ইহা অর্থের পরিমাণতত্ত্ব বা সমীকরণের চাইতে অধিক বাস্তব। ইহাতে অর্থের চাহিদা স্থির অনুমান করা হয় নাই; দ্রব্য ও কৃত্য পরিমাণ ক্রয় বিক্রয়ের উপর যে মুদ্রার চাহিদা নির্ভর করে, তাহাও এই তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নাই। মুদ্রা মূল্য বা দামস্তর যে মানুষের চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তার উপর নির্ভর করে, সেই বিষয়টি এ তত্ত্বে বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই তত্ত্বের প্রধান গলদ এই যে, K র মাত্রা (magnitude) বাস্তব জীবনে সহজে নির্ণয় করা যায় না।

আয়-ব্যয়ের তত্ত্বদ্বারা দামস্তর বা মুদ্রা-মূল্য নির্ণয় (Income-Expenditure Approach to Price Level) : লর্ড কীনস্‌ তাঁহার সুবিখ্যাত পুস্তক 'General Theory of Employment, Interest and Money,' তে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, দেশের কর্ম নিয়োগ ব্যাখ্যানের ভিত্তিতে মুদ্রামূল্য বা দামস্তরের উঠানামা নির্দেশ করা যায়। সমাজে একদল লোকের যাহা অর্থব্যয় অন্যদল লোকের তাহা অর্থ আয়। মানুষের অর্থ আয়ের একটা অংশ ভোগ্য সামগ্রী খরিদ করিতে ব্যয় হয়, আর একটি অংশ সঞ্চিত হয়। এই সঞ্চিত অর্থ যদি তাড়াতাড়ি বিনিয়োগ করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদক দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে। আর উহা যদি দীর্ঘ মিয়াদে জমা (hoard) রাখা হয়, তাহা হইলে সামগ্রী উৎপাদন হ্রাস পাইবে, কর্ম নিয়োগ ও অর্থ-আয় কমিয়া যাইবে। ফলে, দামস্তর নিম্নমুখী হইবে। তবে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সস্তা মুদ্রা নীতি (Cheap Money Policy) অনুসরণ করে, তাহা হইলে বিনিয়োগ

বৃদ্ধি পাইবে, অর্থ-আয় বাড়িবে, খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে এবং দামস্তরও বৃদ্ধি পাইবে।

দামস্তরের বা মুদ্রামূল্যের উঠানামা দেশের মোট সঞ্চয় ও বিনিয়োগ পরিমাণের সম্বন্ধ দ্বারা বিশ্লেষণ করা যায়। মানুষ তাহার মোট আয় ভোগ্যদ্রব্য খাদনে ব্যয় করিতে পারে, কিংবা কিছুটা ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় ও কিছুটা সঞ্চয়ে নিযুক্ত করিতে পারে। ভোগ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া তাহার আয়ের যে উদবৃত্ত থাকে, তাহাই তাহার সঞ্চয়। সমাজের সকল ব্যক্তির সঞ্চয়ের যোগফলই সমাজের সমষ্টিগত সঞ্চয়। সমষ্টিগত সঞ্চয় যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে ভোগ্যদ্রব্য ক্রয়ে সমাজের ব্যয় অবশ্য কমিবে। সঞ্চয় বৃদ্ধির ফলে, ভোগ্যদ্রব্য ক্রয় করিবার মত অর্থের ঘাট্‌তি হইবে; ফলে,. ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর নিম্নগামী হইবে। অন্যদিকে, সমষ্টিগত সঞ্চয় হ্রাস পাইলে ভোগ্যদ্রব্যের দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, ব্যক্তিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি হইলে কিন্তু ভোগ্যদ্রব্যের মূল্য নাও কমিতে পারে। কেননা, একজনের বা কোন কারবারের সঞ্চয় বৃদ্ধি হইলেই সমষ্টিগত সঞ্চয় বৃদ্ধি হয় না। একজনের, বা কতিপয়ের সঞ্চয় বৃদ্ধির অর্থ অপর সকলের অর্থ আয়ের ঘাট্‌তি। অপর সকলের আয়ের ঘাট্‌তি অর্থই, সমাজের সমষ্টিগত সঞ্চয়ের হ্রাস।

সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্ব (Saving-Investment Theory)

অন্যদিকে, বিনিয়োগ দামস্তরকে কেমন করিয়া প্রভাবান্বিত করে, তাহা বিশ্লেষণ করা যাক্। বিনিয়োগ অর্থ, বাস্তব সকল রকম পুঁজিপাটার (physical stock of capital goods) বৃদ্ধি। দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে অলস বেকার উৎপাদক সম্পদের (idle unemployed resources) কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। কর্মনিয়োগ বৃদ্ধির অর্থই উহাদের অর্থ আয় বৃদ্ধি। অর্থ আয়ের বৃদ্ধির সংগে উহাদের ভোগদ্রব্য ক্রয় ব্যয়ও বাড়িবে। যতক্ষণ অবধি সকল বেকার উৎপাদক সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে থাকিলে উৎপন্ন দ্রব্য পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, দামস্তরের উপর তেমন প্রত্যক্ষ কোন ফল দেখা যাইবে না। যদি পূর্ণ কর্ম নিয়োগের পরও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উহা দামস্তর বৃদ্ধি করিবে। অপর পক্ষে, বিনিয়োগ সংকোচন করিলে কর্ম নিয়োগ সংকুচিত হইবে, অর্থ-আয় হ্রাস পাইবে এবং ভোগ্য দ্রব্যের উপর খরিদ ব্যয়ও কমিবে। ফলে, খাদ্যদ্রব্য শিল্পে মন্দা আসিবে এবং উহা অতিশীঘ্র উৎপাদক শিল্পকেও সংক্রামিত করিবে। তাহাতে কর্ম নিয়োগ আরও

সংকুচিত হইবে ও অর্থ আয়েরও ঘাট্‌তি হইবে। ফলে, দামস্তরের অধোমুখী গতি হইবে অনিবার্য। কীনস্‌ নিম্নলিখিত গাণিতিক সমীকরণদ্বারা সঞ্চয় বিনিয়োগ তত্ত্বের তাৎপর্য ব্যাখ্যান করিয়াছেন :

$$P=\frac{E}{O}+\frac{I-S}{O}$$

P = মোট উৎপন্নের দামস্তর ; E = মোট আয় (ভোগ্য দ্রব্য ও উৎপাদক দ্রব্য উৎপাদন হইতে) ; O = মোট উৎপন্ন ; I = উৎপাদক দ্রব্যের বিনিয়োগ এবং S = সঞ্চয়। যখন I ও S সমান হয়, তখন সমীকরণের দ্বিতীয় অংশ অন্তর্হিত হইবে এবং $P=\frac{E}{O}$ হইবে। কিন্তু যখন P ও S এর মধ্যে পার্থক্য হইবে, তখন ঐ পার্থক্যের প্রভাব দামদস্তরের উপর প্রতিফলিত হইবে, যেমন E এবং O দামস্তরকে প্রভাবান্বিত করে।

মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ (Measurement of Changes in the Value of Money) : সূচক সংখ্যা (Index Numbers) : আমরা মুদ্রা মূল্য বলিতে বুঝি, অর্থের দ্রব্য ও কৃত্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা। অর্থের মূল্য দেশের সাধারণ দামস্তরের নিরিখে নির্দেশ করা যায়। যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তখন অর্থের মূল্য কমে ; আবার, যখন দামস্তর হ্রাস পায়, তখন অর্থের মূল্য বাড়ে। অর্থ-মূল্যের এই হ্রাস-বৃদ্ধি বা পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হইলে, আমাদের সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করিতে হয়। যে পদ্ধতিতে আমরা এই পরিবর্তন পরিমাপ করি, তাহাকে স্থচক সংখ্যা (Index Numbers) প্রণয়ণ বলা হয়। স্থচক সংখ্যা রকমারি হইতে পারে। যেমন মজুরি স্তরের পরিবর্তন, বিনিযোগ পরিবর্তন, কর্ম নিয়োগ পরিবর্তন প্রভৃতি প্রত্যেকের স্থচক-সংখ্যা নির্ধারণ করা যায়। যে স্থচক সংখ্যা দ্বারা মুদ্রামূল্যের পরিবর্তন পরিমাপ করা যায়, উহাকে দামস্থচক সংখ্যা (Price Index) বলা হয়। ইহা পরিসংখ্যান সংক্রান্ত এমন একটি পদ্ধতি বা কৌশল, যাহা দ্বারা দামস্তরের গড়পড়তা হ্রাসবৃদ্ধি পরিমাপ করা যায়।

সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন পদ্ধতি (Method of Constructing Index Number) : স্থচক সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হইলে প্রথমেই একটি ভিত্তিমূলক বৎসর (base year) নির্ণয় করিতে হয়। এই বৎসরের দামস্তরের সহিত পরবর্তীকালের দামস্তরের উঠানামা হিসাব করিতে হয়। যে বৎসরটি

ভিত্তিমূলক বৎসর বলিয়া গ্রহণ করা হয়, উহা যেন খুব সমৃদ্ধশালী, কিংবা মন্দা বা সংকটময় না হয়। এই বৎসরের দামস্তর যেন অত্যন্ত ঊর্ধ্বগামী, কিংবা নিম্নগামী না হয়। সাধারণতঃ, যে বৎসরে দামস্তর মোটামুটি স্বাভাবিক থাকে, সেই বৎসরকেই ভিত্তিমূলক বৎসর মনোনীত করিতে হইবে।

ভিত্তি-মূলক বৎসর মনোনয়ন

দ্বিতীয়তঃ, ভিত্তিমূলক বৎসর ধার্য্য হইলে পর দ্রব্য মনোনয়ন করিতে হয়। দ্রব্য মনোনয়নের সময় মনে রাখিতে হইবে, কি উদ্দেশ্যে সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা হইতেছে। যদি কোন বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান সম্বন্ধে আমরা একটা ধারণা করিতে চাই, তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর ভোগ্যদ্রব্যগুলিই কেবল বাছিয়া লইব। অপর পক্ষে, সূচক সংখ্যা প্রণয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য যদি হয় সাধারণ দামস্তরের সম্পর্কে ধারণা করা, তাহা হইলে অবশ্য প্রতিনিধি মূলক (representative) দ্রব্যকৃত্য মনোনয়ন করিতে হইবে। যাহাতে উহাদের মধ্যে আবশ্যকীয় দ্রব্য ও বিলাস সমগ্রী, আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্য, কাঁচামালও উৎপন্ন সামগ্রী প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্রব্যের সংখ্যা খুব অধিক করিয়া ধরিতে হইবে, যাহাতে সূচক-সংখ্যা সাধারণ দামস্তরের একটা নির্ভর যোগ্য আলেখ্য হয়।

দ্রব্য মনোনয়ন

তৃতীয়তঃ, দ্রব্য ও কৃত্য মূল্য বিশেষ সতর্কতার সহিত সংগ্রহ করিতে হইবে। প্রথমতঃ, একটি সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করিতে বিভিন্ন বৎসরের একই রকমের দ্রব্য বা কৃত্য মূল্য সংগ্রহ করিতে হয়। এক বৎসরের খুচরা মূল্য, আর অন্য বৎসরের পাইকারী মূল্য সংগ্রহ করিলে চলিবে না। সাধারণতঃ, খুচরা মূল্যই গ্রহণ করা উচিৎ, কেননা উহাই প্রকৃত বাজার মূল্য। কিন্তু খুচরা মূল্যের বৈষম্য এক স্থান হইতে অন্যস্থানে খুব বেশী হয় বলিয়া, আমাদের পাইকারী মূল্য সংগ্রহ করাই ভাল।

দ্রব্যমূল্য সংগ্রহ

চতুর্থতঃ, ভিত্তিমূলক বৎসরে সকল দ্রব্যের মূল্য ১০০ ধরিয়া হিসাব করিতে হইবে। আর পরবর্তী যে বৎসরের সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হইবে, সেই বৎসরের দ্রব্য মূল্য ভিত্তিমূলক বৎসরের দ্রব্য মূল্যের সংগে তুলনা করিয়া শতকরা পরিবর্তন হার নির্ণয় করিতে হইবে। অতঃপর, গড়পড়তা নির্ণয় করিয়া সাধারণ সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হয়। নিম্নে ১৯৫৩ সালের একটি সাধারণ সরল সূচক সংখ্যা প্রণয়নের নমুনা দেওয়া হইল।

দ্রব্য	ভিত্তিমূলক বৎসরের মূল্য (১৯৩৯ সালের)	ভিত্তিমূলক বৎসরের সূচক সংখ্যা	১৯৫৩ সালের দ্রব্য মূল্য	১৯৫৩ সালের সূচক সংখ্যা
গম	২॥০ (মণপ্রতি)	১০০	১৫৲ (মণপ্রতি)	৬০০
ধান	৬॥০ ,,	১০০	২২৸০ ,,	৩৫০
ঘি	৪০৲ ,,	১০০	২০০৲ ,,	৫০০
চিনি	৮৲ ,,	১০০	৩২৲ ,,	৪০০
জ্বালানী কয়লা	॥০ ,,	১০০	২৲ ,,	৪০০
কাপড়	।০ (প্রতি গজ)	১০০	১৲ ,,	৪০০
		৬০০		২৬৫০
		৬০০ ÷ ৬		২৬৫০ ÷ ৬
		= ১০০		= ৪৪২·৫

উপরের উদাহরণে ১৯৫৩ সালের সূচক সংখ্যা ঃ ৪৪২·৫। এই সংখ্যা এই ইংগিত করিতেছে যে, ১৯৫৩ সালে ১৯৩৯ সালের চেয়ে দামস্তর ৩৪২·৫ বাড়িয়াছে। অর্থাৎ যাহা আগে ১০০ টাকায় ক্রয় করা যাইত তাহা, এখন ৪৪২॥০ দিয়া ক্রয় করিতে হইবে। অর্থের মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইয়াছে।

উপরের সূচক সংখ্যার উদাহরণে আমরা সকল দ্রব্যের সমান গুরুত্ব আছে ধরিয়া লইয়া হিসাব করিয়াছি। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সকল দ্রব্যের সমান গুরুত্ব থাকিতে পারে না। সাধারণ খাদকের নিকট চাউল ও ঘির সমান গুরুত্ব থাকিতে পারে না। আমরা যদি বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন রকম গুরুত্ব আছে স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে উপরের সহজ ও সরল সূচক-সংখ্যার পরিবর্তন করিতে হয়। এইরূপ বিভিন্ন দ্রব্যের বিভিন্ন পরিমাণ গুরুত্ব আরোপ করিয়া, সেই ভিত্তিতে যদি উপরের সূচক-সংখ্যাকে পরিবর্তন করা যায়, তাহা হইলে যে সূচক সংখ্যা পাওয়া যাইবে, উহাকে আমরা গুরুত্ব ভিত্তিক সূচক-সংখ্যা (Weighted Index Number) বলিতে পারি। উপরের উদাহরণে আমরা যদি ঘির চেয়ে গমের ৪ গুণ গুরুত্ব দিই, তাহা হইলে ভিত্তিমূলক বৎসরের ঘির সূচক-সংখ্যা হইবে (১০০ × ১) = ১০০ ও গমের সূচক-সংখ্যা হইবে (১০০ × ৪) = ৪০০। সেইরূপ ১৯৫৩ সালে ঘির সূচক সংখ্যা হইবে (৫০০ × ১) = ৫০০ ও

গুরুত্ব-ভিত্তিক সূচক সংখ্যা [Weighted Inde.: Number]

গমের সূচক সংখ্যা হইবে (৬০০ × ৪) = ২৪০০। এইরূপ ভাবে বিভিন্ন সামগ্রীর গুরুত্ব স্বীকার করিয়া যে সূচক সংখ্যা প্রণয়ন করা যায়, তাহা সাধারণ সরল সূচক সংখ্যার চেয়ে তফাৎ হইবে। উপরের সূচক সংখ্যাকে গুরুত্ব ভিত্তিক করিলে এই রকম দাঁড়াইবে।

দ্রব্য	ভিত্তিমূলক বৎসরের মূল্য (১৯৩৯ সালের)	ভিত্তিমূলক বৎসরের গুরুত্ব ভিত্তিক সূচক-সংখ্যা	১৯৫৩ সালের দ্রব্য মূল্য	১৯৫৩ সালের গুরুত্ব ভিত্তিক সূচক-সংখ্যা
গম	২॥০	১০০ × ৪ = ৪০০	১৫৲	৬০০ × ৪ = ২৪০০
ধান	৬॥০	১০০ × ১ = ১০০	২২৸০	৩৫০ × ১ = ৩৫০
ঘি	৪০৲	১০০ × ১ = ১০০	২০০৲	৫০০ × ১ = ৫০০
চিনি	[illegible]	১০০ × ২ = ২০০	৩২৲	৪০০ × ২ = ৮০০
জালনী-কাঠ	॥০	১০০ × ১ = ১০০	২৲	৪০০ × ১ = ৪০০
কাপড়	।০	১০০ × ১ = ১০০	১৲	৪০০ × ১ = ৪০০
		১০০০		৪৮৫০
		১০০০ ÷ ১০ = ১০০		৪৮৪০ ÷ ১০ = ৪৮৪

সূচক সংখ্যা প্রণয়নের অসুবিধা (Difficulties and Limitations in the Construction of Index Numbers) : সূচক সংখ্যা প্রণয়ণের কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে। **প্রথমতঃ,** ভিত্তিমূলক বৎসর ধার্য করা একটা কঠিন ব্যাপার। সাধারণতঃ, একটি স্বাভাবিক বৎসরকে—অর্থাৎ যে বৎসরে দামস্তব খুব উর্ধ্বে কিংবা খুব নিম্নে না থাকে—ভিত্তিমূলক বৎসর বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অনেক সময়, আবার কতিপয় বৎসরের গড় সংখ্যাকে ভিত্তি করা হয়। আবার অনেক সময় কোন নির্দিষ্ট ভিত্তি বলিয়া কিছুই গ্রহণ করা হয় না। বিগত বৎসরের সংখ্যাকে পরবর্তী বৎসরের সংখ্যা হিসাবে গ্রহণ করা হয়। এই ধরণের সূচক-সংখ্যাকে (Chain Index Number) বলা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, উপযুক্ত দ্রব্য মনোনয়ন সম্পর্কেও অসুবিধা আছে। সূচক-সংখ্যা প্রণয়ণের কি উদ্দেশ্য, তাহার ভিত্তিতে দ্রব্য মনোনয়ন করিতে হয়। সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্য যদি হয়, অর্থের সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা পরিমাপ করা, তাহা হইলে, যত অধিক সংখ্যক দ্রব্য সম্ভব, মনোনয়ন করিতে হইবে। অপরপক্ষে, সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্য যদি হয়, সমাজের কোন বিশেষ এক শ্রেণীর জীবন যাত্রার ব্যয় পরিমাপ করা, তাহা হইলে ঐ শ্রেণীর স্বাভাবিক ভোগ্যদ্রব্য মনোনয়ন করিতে হইবে। ইহারও আবার অসুবিধা আছে। কেননা, কোন শ্রেণীর ভোগ্য দ্রব্য সকল সময় এক বা সমান থাকেনা। মানুষের আয়স্তর ও পছন্দক্রমের পরিবর্তনের সংগে সংগে ভোগ্য দ্রব্যের তালিকার ও আমূল পরিবর্তন হয়।

তৃতীয়তঃ, দ্রব্য মূল্যের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা বিষয়েও সমস্যা আছে। এ ক্ষেত্রেও সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। যদি সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করা উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে দ্রব্যের পাইকারী দর গ্রহণ করিতে হইবে। আর কোন বিশেষ শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় নিরূপণ করিতে হইলে, খুচরা দ্রব্য মূল্য গ্রহণ করিতে হইবে।

চতুর্থতঃ, দ্রব্যের গুরুত্ব আরোপ করিবার ক্ষেত্রেও অসুবিধা আছে। গোটা জাতির ব্যবহারে কোন্ শ্রেণীর নিকট কোন্ দ্রব্যের গুরুত্ব কতটা, তাহা সঠিক ধারণা করা সহজ নহে। তাহা ছাড়া, কালব্যবধানে দ্রব্যের গুরুত্বও এক থাকে না। প্রামাণ্য ও সঠিক সংখ্যা-সূচক প্রণয়ণ করিতে হইলে, কালব্যবধানে দ্রব্যের গুরুত্বের তারতম্য করিতে হয়। তাহা আদৌ সহজ ব্যাপার নহে।

পরিশেষে, গড় নির্ণয়েরও বহুবিধ প্রণালী আছে। সাধারণতঃ, গড় নির্ণযের গাণিতিক পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়া থাকে, কিন্তু উহাও সব চাইতে সুষ্ঠু পদ্ধতি নহে।

উপরি উক্ত নানা অসুবিধার দরুণ আমরা এই মন্তব্য করিতে পারি যে, সংখ্যা-সূচক কেবলমাত্র মোটামুটি ভাবেই দামস্তরের উঠানামা পরিমাপ করিতে পারে। সংখ্যা-সূচক প্রণয়নের অসুবিধা সাধারণতঃ কম দেখা যায় তখনই যখন আমরা কাছাকাছি, স্বল্প সময় ব্যবধানে দামস্তরের উঠানামার তুলনা-মূলক পরিমাপ করি। অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রব্যের গুণাগুণের বড় একটা পরিবর্তন হয় না, কিংবা আমাদের ভোগ্য দ্রব্যের তালিকার অদল বদল ও বড় একটা হয় না। ফলে, অল্প সময়ের ব্যবধানে মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি সূচক-সংখ্যাদ্বারা সাধারণতঃ সঠিক ভাবেই নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সূচক-সংখ্যার উদ্দেশ্য ও উপযোগ (Purposes and Uses of Index Numbers) : আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সংখ্যা-সূচক প্রণয়ন নির্ভর করে উহার উদ্দেশ্যের উপর। উহার উদ্দেশ্য কি, তাহা দেখিয়াই, দ্রব্য মনোনয়ন, দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ প্রভৃতি বিষয় স্থির করিতে হয়। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া সংখ্যা-সূচক প্রণয়ন করা যায়। প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই অর্থের ক্রয় ক্ষমতার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করা। এইরূপ সংখ্যা-সূচক প্রণয়নে সমস্ত ভোগ্য দ্রব্য মনোনয়ন করিতে হয় এবং খাদকের অর্থ আয় অনুসারে বিভিন্ন সামগ্রীর উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়। কিন্তু এই সূচকের একটি ত্রুটী এই যে, ইহা খাদকের ব্যক্তিগত সেবাকৃত্যের উপর কোন গুরুত্বই আরোপ করে না। সাধারণ দামস্তরের বা মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার সঠিক সূচক-সংখ্যা প্রণয়ন করিতে হইলে, কার্ল সিন্ডারের (Carl Synder) মতানুসারে, চার রকম দামস্তরের সংমিশ্রণ করিতে হয় ; যথা, পাইকারী মূল্য, মজুরি, জীবন ধারণের ব্যয় ও খাজনা এবং যথাক্রমে উহাদের উপর ২, ৩½, ৩½ ও ১ মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করিতে হয়।

কোন এক বিশেষ মজুর শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে ও সংখ্যা-সূচক প্রণয়ন করা যায়। মজুরি নির্ধারণ, কিংবা মজুরির হার পরিবর্তন করিবার সময় এই ধরণের সংখ্যা-সূচক বিশেষ ভাবে কাজে আসে। এইরূপ সংখ্যা-সূচক প্রণয়ন করিতে হইলে, সাধারণতঃ মজুরদের সকল ভোগ্যদ্রব্য ও উহাদের খুচরা খরিদ মূল্য ধরিতে হইবে।

সমস্ত মজুরের গড়পড়তা অর্থআয়ের পরিবর্তনও সংখ্যা-সূচক (Earnings Standard) দ্বারা পরিমাপ করা যায়। অবশ্য, এই ধরণের সূচক প্রণয়নের পথে অনেক অসুবিধা আছে। কেননা, মজুরের মধ্যে প্রগুণতার রকম ফের আছে : মজুরের বিভিন্ন বৃত্তির মধ্যে ও যথেষ্ট পার্থক্য আছে।

খাদ্য সামগ্রী, কাঁচামাল, অর্ধ তৈয়ারী প্রভৃতি দ্রব্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করিবার জন্য অনেক সময় পাইকারী সংখ্যা-সূচক (Wholesale Index Number) প্রণয়ন করা যায়। সাধারণ দামস্তরের পরিবর্তন পরিমাপ করিবার জন্য যে সংখ্যা-সূচক প্রণয়ন করা হয়, তাহা হইতে ইহার পার্থক্য আছে। প্রথমতঃ, এই সূচকে কেবলমাত্র অর্দ্ধ তৈয়ারী দ্রব্যের মূল্য গ্রহণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সূচকের অদলবদল ও হয় খুব বেশী ; কেননা, ইহা প্রণয়নে অত্যন্ত বিশিষ্টতাসম্পন্ন দ্রব্যমূল্য (prices of highly specialised items) ব্যবহার করা হয়।

পরিশেষে, আজিকার পৃথিবীতে প্রায় প্রত্যেক দেশর পক্ষেই একটি আন্তর্জাতিক সূচক-সংখ্যা (International Index Number) প্রণয়ন করা ও অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে। এই সূচক প্রণয়ণে সাধারণতঃ সেই সকল প্রমিত দ্রব্যের বাজার মূল্য ধরা হয়, যাহাদের আন্তর্জাতিক চাহিদা আছে।

মুদ্রা স্ফীতি (Inflation): সাধারণের কাছে মুদ্রাস্ফীতির অর্থ, মুদ্রা যোগানের আত্যন্তিক সম্প্রসারণ হেতু দামস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতির প্রকৃত অর্থ তাহা নহে। কেবলমাত্র দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি হইলেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না। অনেক সময়, উৎপাদনে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধি প্রয়োগের ফলে, কিংবা একচেটিয়া কারবারে দ্রব্য .যোগান টানের জন্য ও দামস্তর ঊর্ধ্বগামী হইতে পারে। এই ধরণের দামস্তর বৃদ্ধি মুদ্রাস্ফীতি নয়। মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পাইলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটে না। যদি মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পায় এবং সংগে সংগে দ্রব্য ও কৃত্য যোগান ও বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দামস্তরের ঊর্ধ্বগতি হইতে পারে না ও মুদ্রাস্ফীতি ও ঘটে না। অর্থযোগান বৃদ্ধির সংগে সমানুপাতিক ভাবে যদি দ্রব্য ও কৃত্য যোগান বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে যে দামস্তরের বৃদ্ধি হইবে উহাই মুদ্রাস্ফীতি।

মুদ্রা-স্ফীতির অর্থ কি ?

দামস্তরের বৃদ্ধি হেতু রকমারি মুদ্রা স্ফীতি ঘটিতে পারে। বিভিন্ন কারকের অর্থ-আয় বৃদ্ধি হেতু উৎপাদন ব্যয় বাড়িয়া অনেক সময় দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়। ইহাকে **আয় স্ফীতি** বলে (Income Inflation)। অনেক সময় আবার, সঞ্চয়ের পরিমাণের চাইতে বিনিযোগ খরচ বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ দামস্তর বৃদ্ধি পায়। ইহাকে **দ্রব্য স্ফীতি** বলে (Commodity Inflation)। আবার ইহা ও দেখা যায়, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাইতেছে, কিন্তু দামস্তর স্থির আছে। ইহাকে **মুনাফা স্ফীতি** (Profit Inflation) বলে।

যুদ্ধের সময় আবার আরও রকমারি মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। যুদ্ধের বাড়্তি খরচ যোগানের জন্য সরকার নূতন মুদ্রার প্রচার করে। তাহাতে যে দামস্তরের বৃদ্ধি হয়, উহাকে **ঘাটৃতি ব্যয় ঘটিত-মুদ্রাস্ফীতি** (Deficit Budget Induced Inflation) বলা যায়। যুদ্ধের সময় দামস্তর ও জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি হওয়াতে, মজুর শ্রেণী মালিকের নিকট হইতে উচ্চ মজুরি আদায় করে। তাহাদের মজুরি বৃদ্ধির সংগে সংগে উৎপন্ন পণ্য বৃদ্ধি পায় না; ফলে যে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তাহাকে **মজুরি ঘটিত মুদ্রাস্ফীতি** (Wages Induced Inflation) বলা যায়।

অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। যখন অর্থ-আয়ের বৃদ্ধি হেতু দ্রব্য চাহিদা খুব সক্রিয় হয়, তখন দামস্তর অত্যন্ত চড়া হয়। এই পর্যায়কে **'খোলাখুলি মুদ্রাস্ফীতি'** (Open Inflation) বলে। এই অবস্থা যখন চরমে পৌঁছে, তখন হয় **'পূর্ণবেগ মুদ্রাস্ফীতি'** (Galloping Inflation)। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়, সাধারণতঃ, সরকারের অঢেল নূতন মুদ্রা প্রচারের জন্য, কিংবা মজুরির হার অস্বাভাবিক রূপে উর্ধ্বস্তরে ধার্য করিবার ফলে। সরকার আবার অনেক সময় এই চরম অবস্থার উদ্ভব প্রতিরোধ করিয়া থাকেন বিভিন্ন প্রতিরোধ মূলক নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। উচ্চতম দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ, খাদ্যবস্তু ও আবশ্যকীয় দ্রব্য যোগান নিয়ন্ত্রণ (Rationing), বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি ব্যবস্থা দ্বারা অনেক সময় দামস্তরের উর্ধ্বগতি ব্যাহত করা হয়। কিন্তু দামস্তরের নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ একেবারে মুছিয়া যায় না। সাধারণের চলতি আয় বৃদ্ধি, ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি প্রভৃতি লক্ষণ বেশ বর্তমান থাকে, যাহার ফলে দামস্তর নিম্নমুখী হইতে পারে না। এই অবস্থাকে অর্থনীতিবিদগণ **'অবনমিত মুদ্রাস্ফীতি'** (Suppressed Inflation) বলিয়া অভিহিত করেন।

অধ্যাপক পিগুর মতবাদ (Pigou's Veiws) : অধ্যাপক পিগু মুদ্রাস্ফীতি সেই অবস্থাকে বলেন, যখন অর্থের পরিমাণ আয়-অর্জনকারী ক্রিয়ার চাইতে অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পায়। 'Inflation is a situation where money income is expanding more than in proportion to income-earning activity' (Pigou) যদি দেশের মোট আয় কর্ম নিয়োগ সম্প্রসারণের সংগে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দ্রব্য ও কৃত্যের চাহিদা স্বাভাবতঃই বৃদ্ধি পাইবে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত দ্রব্য ও কৃত্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত অর্থ আয় বৃদ্ধি দামস্তরকে উর্ধ্বগামী করিতে পারে না। কিন্তু যখনই বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া দ্রব্য ও কৃত্য উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হইবে না, তখনই দামস্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। সাধারণতঃ, আয় বৃদ্ধির ফলে উৎপাদক সামগ্রীর বিনিয়োগই বৃদ্ধি পায় ও ভোগ্যবস্তু উৎপাদনে অর্থবিনিয়োগের ঘাটতি হয়। ইহাতে ভোগ্যবস্তুর যোগান হ্রাস হয় ও তাহার দরুণ দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। সুতরাং, আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে যদি সমানুপাতিক ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি না পায়, তাহা হইলেই মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবে।

লর্ড কীন্‌সের মতবাদ (Lord Keynes' Views) : কীনস্ মনে করেন, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি পূর্ণ নিয়োগ (Full employment) স্থাপিত হইবার পর

দেখা দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে অলস, কর্মহীন উৎপাদক কারক বর্তমান (idle unemployed resources), ততক্ষণ অর্থের যোগান বৃদ্ধি পাইলে, সুদের হার কমিবে। সুদের হার হ্রাস হওয়ায়, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে ও অলস বেকার কারকগুলির কর্মনিয়োগ সৃষ্টি হইবে। ফলে, অর্থ-আয় বৃদ্ধির সংগে ভোগ্যদ্রব্য ও কৃত্য উৎপাদন পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। কিন্তু, পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ স্থাপিত হইবার পর যদি অর্থ-যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে আয় বাড়িয়া মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। কেননা, সমস্ত অলস কারকের পূর্ণ-নিয়োগ হওয়ার দরুণ অর্থ-যোগান বৃদ্ধি আর নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে কিংবা নূতন আয়-উৎপাদনকারী দ্রব্য উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে অসমর্থ হইবে। পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ স্তরের পরেও যদি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদন বৃদ্ধি না হইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই দামস্তর বৃদ্ধিই **প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি**।

মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধান (Inflationary Gap) : মুদ্রাস্ফীতির গুরুত্ব দামস্তরের বৃদ্ধি দেখিয়া সংখ্যা-সূচক দ্বারা পরিমাপ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান ধারণাটি দ্বারাও মুদ্রাস্ফীতির পরিমাণ পরিমাপ করা যায়।

মনে কর, কোন সমাজের মোট উৎপন্ন পণ্যের সাম্প্রতিক বাজার মূল্য ১০,০০০ কোটী টাকা। এই মোট উৎপন্ন পণ্যের মধ্যে ১০০ কোটী টাকার পণ্য সরকার ক্রয় করিল। তাহা হইলে সাধারণ জনসাধারণের ভোগ ব্যবহারের জন্য ৯০০০ কোটী টাকার দ্রব্য বক্রি থাকিবে। যদি সমাজের মোট আয় ও ৯০০০ কোটী টাকা হয়, তাহা হইলে ঐ সমাজে কোন মুদ্রাস্ফীতি হইবে না। কিন্তু সরকার যদি আবার ২০০০ কোটী টাকার নূতন মুদ্রা প্রচার করে, তাহা হইলে ঐ ২০০০ কোটী টাকাই সম্ভাব্য মুদ্রাস্ফীতি ব্যবধানের পরিমাপ হইবে। কিন্তু এই নূতন বাড়তি মুদ্রার ৩০০ কোটী টাকা সঞ্চয়ে নিয়োগ হইতে ও ১০০ কোটী টাকা কর হিসাবে দিতে হইতে পারে। তাহা হইলে, প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতির ব্যবধান হইবে ১৬০০ কোটী টাকার পরিমাণ।

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল (Effects of Inflation) : মুদ্রাস্ফীতি সুরু হইলে দামস্তর বৃদ্ধির সকল রকম ফলাফল উৎকটভাবে দেখা দেয়। এই ফলাফল সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর উপর বিভিন্নরূপে দেখা যায়।

মুদ্রাস্ফীতির সংগে সংগে যে দামস্তর বৃদ্ধি পায়, উহাতে উৎপাদন ও কর্ম-নিয়োগের সম্প্রসারণ হয়। দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় মুনাফার অংক

বৃদ্ধি পায়; তাহাতে উৎপাদনের উৎসাহ ও উদ্যোগ বহুগুণ বাড়িয়া যায়। উৎপাদন বৃদ্ধির আর একটি কারণ এই যে, দামস্তর যখন ঊর্ধ্বগামী থাকে, তখন উৎপাদক দ্রব্য ও কৃত্য-মূল্য নিরূপে সুদ বাবদ কম অর্থমূল্য দিয়া দাদন লইয়া বিনিয়োগ করিতে পারে। ইহাতে তাহার উৎপাদন খরচ কম পড়ে। তাহা ছাড়া, মুদ্রাস্ফীতি ফাটকা কারবারের উদ্দীপনা ও আয়তন বৃদ্ধি করে। উৎপাদনের আয়তন সম্প্রসারিত হওয়ায় কর্ম-সংস্থানও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

উৎপাদক ও কর্ম-নিয়োগের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (Effects on Production and Employment)

মুদ্রাস্ফীতিতে সাধারণ দামস্তর বৃদ্ধি পায়। পূর্ণ কর্ম-নিযোগ স্থাপিত হওয়ার পরও, যদি বিনিয়োগ সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলেই প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি ঘটিয়া থাকে। এই ধরণের বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায় না, কিন্তু দামস্তর ঊর্ধ্বমুখী হয়।

দামস্তরের উপর প্রভাব (Effect on Price-level)

মুদ্রাস্ফীতির ফলে সমাজের ধনবণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। সাধারণ দাম-স্তরের বৃদ্ধিতে সমাজের ধনী শ্রেণীর চেয়ে নিম্ন আয়গ্রস্ত লোকই অধিক বিপর্যস্ত হয়। সমাজে যাহারা বাঁধাধরা মাহিনার বৃত্তি আশ্রয়ী, তাহাদের আর্থিক বিপর্যয় হয় সকলের চেয়ে বেশী। দামস্তর বৃদ্ধিতে তাহাদের জীবন-যাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তাহাদের অর্থ-আয় সেই অনুপাতে বাড়ে না; ফলে, তাহাদের সংসার যাত্রা নির্বাহ করা দুরূহ হইয়া পড়ে।

ধনবণ্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব (Effect on Distribution)

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উপর বিভিন্নভাবে আসিয়া পড়ে। মজুর শ্রেণীর উপর দামস্তরের বৃদ্ধি কুফল আনয়ন করে; অপরপক্ষে, মালিক শ্রেণীর নিকট ইহার প্রভাব অতীব কাম্য হয়। মজুরির হার সাধারণতঃ অনম্য; দামস্তর যে অনুপাতে পরিবর্তিত হয়, মজুরির হার সে অনুপাতে পরিবর্তিত হয় না। মুদ্রাস্ফীতির ফলে মজুরের জীবিকার ব্যয়-ভার যে পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তাহাদের মজুরি সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। যদিও মাগ্‌গী ভাতার বন্দোবস্ত করিয়া অর্থ-মজুরি বাড়ান হয়, তাহা হইলেও দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় তাহাদের প্রকৃত আয়ের বিশেষ কোন বাড়তি হয় না; ফলে, জীবন-যাত্রার মানেরও অধোগতি হয়।

মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেনাদারের (debtor) লাভ হয়, কিন্তু পাওনাদারের (creditor) হয় লোকসান। দেনাদার যখন উচ্চ দামস্তরের সময় ঋণ

প্রতিশোধ করে, তখন তাহাকে অপেক্ষাকৃত কম অর্থ-মূল্য দিতে হয় ; কেননা, দামস্তর বৃদ্ধির সংগে সংগে অর্থের দ্রব্য ও কৃত্য ক্রয় করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়। পাওনাদারের লোকসান হয় ; কেননা, মুদ্রাস্ফীতির সময় তাহারা ধারশোধ হিসাবে যে অর্থ ফিরিয়া পায়, দ্রব্য ও কৃত্য-মূল্যের নিরূপে তাহার অর্থ-মূল্য কম।

সরকারী আয়-সংগ্রহের দিক হইতে মুদ্রাস্ফীতি বাঞ্ছনীয় অবস্থা ; কেননা, মুদ্রাস্ফীতি একরকম গুপ্তকর (hidden tax) বিশেষ। তবে এইরূপ ধরণের কর মোটেই সমাজ কল্যাণকর নহে। কেননা, ইহার চাপ দরিদ্র শ্রেণীর উপরই অধিক আসিয়া পড়ে। যাহারা ব্যক্তিগত আয় হইতে সরকারী কর দেয়, (যেমন, আয়কর) তাহাদের পক্ষে মুদ্রাস্ফীতি অভিপ্রেত। কেননা, দ্রব্যের মূল্য নিরূপে তাহাদের কর বাবদ কম অর্থ মূল্য দিতে হয়। দামস্তর বৃদ্ধির সময়ে সরকারী ঋণভার ও হ্রাস পায় ; কেননা, অর্থমূল্য হ্রাস হওয়ার দরুণ ঋণের পরিশোধ খরচ (servicing cost) সুদ প্রভৃতি বাবদ সরকারী ব্যয় ও কম করিতে হয়।

মুদ্রাস্ফীতির সময়ে মজুর শ্রেণীর মধ্যে অসন্তোষ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে। জীবিকার ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় উহারা মজুরি বৃদ্ধির জন্য দাবী করে। তাহার ফলে অনেক সময় শ্রমিক আন্দোলন, ধর্মঘট ও অন্যান্য রকমের শ্রমিক-মালিক বিবাদ ঘটিয়া সামাজিক অশান্তির কারণ হইতে পারে।

সামাজিক ফলাফল (social effects)

মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার (Control and Remedies of Inflation) : মুদ্রাস্ফীতির দরুণ একবার দামস্তর ও উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে উহা সহজে রোধ করিয়া আয়ত্তে আনা বড়ই কঠিন ব্যাপার। তবে সময়মত উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিলে মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের মধ্যে আনিয়া উহার কুফল প্রতিরোধ করা যায়। মুদ্রাস্ফীতির নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিকার ব্যবস্থা তিন ভাগে ভাগ করা চলে। (১) আর্থিক সম্বন্ধীয় (২) রাজস্ব সম্বন্ধীয় (fiscal) ও (৩) অন্যান্য ব্যবস্থা।

মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিবার আর্থিক ব্যবস্থা নির্ধারণ করিবে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। নিম্নলিখিত মুদ্রাস্ফীতির গতি রোধ করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। **প্রথমতঃ**, ব্যাংক বাট্টা হার বাড়াইয়া দিবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টা হার বৃদ্ধি করিলে, দাদন ও কর্জ যোগান সংকুচিত

হইবে ও ফলে, ব্যবসা বাণিজ্য ও উৎপাদনে মন্দা আসিয়া দামস্তর হ্রাস পাইবে। **দ্বিতীয়তঃ,** Open Market Operations প্রক্রিয়া দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিলে, অন্যান্য সদস্য ব্যাংকের দাদন দিবার ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। তাহাতে কর্জ্জ যোগানের ঘাট্তি হইয়া উৎপাদনে মন্দা আসিবে ও মূল্যস্তর উর্ধ্বমুখী হইবে। **তৃতীয়তঃ,** কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি অন্যান্য সদস্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে অর্থ সংরক্ষণের (Cash Reserves) পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাধ্য করে, তাহা হইলেও ঐ ব্যাংকগুলির দাদন দিবার ক্ষমতা হ্রাস হইবে। তাহাতেও কর্জ যোগানের সংকোচন হইয়া উৎপাদন হ্রাস ও মূল্যস্তরের অধোগতি হইবে।

আর্থিক প্রতিকার ব্যবস্থা (Monetry remedies)

রাজস্ব সম্পর্কীয় ব্যবস্থা বলিতে সরকারের করনীতি, ব্যয় নীতি ও ঋণ নীতির যথোপযুক্ত বিধি ব্যবস্থা বুঝায়। মুদ্রাস্ফীতির গতিরোধ করিতে সরকার প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করিতে পারে। করভার বৃদ্ধি করিলে সাধারণের হাতের অনাবশ্যক ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইবে ও তাহাদের খাদন ব্যয় সংকুচিত হইবে। ইহার ফলে দামস্তর বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা ও কম হইবে। দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতির সময় সরকারের সমস্ত রকমের ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত। সরকারী ব্যয় সংকোচনের ফলে ও সাধারণের অর্থ-আয় ও ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। তাহাছাড়া সরকার এই সময়ে সাধারণের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া অনাবশ্যক অর্থ প্রচলন হইতে তুলিয়া লইতে পারে। তাহাতেও দামস্তর হ্রাস পাইয়া মুদ্রাস্ফীতি কমিবে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রতিকার ব্যবস্থা (Fiscal remedies)

অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে মজুরি নীতি এবং মূল্য নিয়ন্ত্রণ ও দ্রব্যযোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া ও মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য আয়ত্তের মধ্যে আনা যায়। মজুরির স্তর যাহাতে উর্ধ্বগামী না হয়, তাহার জন্য যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন ; কেননা, মজুরির হার বৃদ্ধি হইলে মুদ্রাস্ফীতির গতি ও উর্ধ্বগামী হয়। ইহার জন্য সরকারকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে যেন ভোগ্য দ্রব্যের বাজার দাম না বাড়ে। সরকার দ্রব্যের উচ্চতম বাজার দর নির্ধারণ করিয়া দিবে এবং যাহাতে নির্ধারিত মূল্যে বাজারে ভোগ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, তাহার সুব্যবস্থা করিবে। মূল্য নিয়ন্ত্রণেব ফলে অনেক সময় ভোগ্যদ্রব্য খোলা বাজার হইতে উধাও হইয়া কালোবাজারে চলিয়া যাইতে পারে, এবং তাহাতে

মূল্য নির্ধারণ ও দ্রব্য যোগান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা (Price control and Rationing)

দ্রব্য যোগান দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িতে পারে। যাহাতে সে অবস্থার সৃষ্টি না হয়, তাহার জন্য সরকারকে যোগান নিযন্ত্রণ করিযা খাদক শ্রেণীর মধ্যে নির্দিষ্ট মূল্যে দ্রব্য সুবণ্টনের ব্যবস্থা ও করিতে হয়। ইহাকে রেশনিং ব্যবস্থা বলে।

সংকোচন (Deflation) : মুদ্রাস্ফীতির ঠিক বিপরীত অবস্থাকেই মুদ্রা সংকোচন বলে। মুদ্রার চাহিদার তুলনায় যদি মুদ্রার যোগান টান হয়, তাহা হইলে এই অবস্থার উদ্ভব হইতে পারে। এই অবস্থায় ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদনে মন্দা আসে, কর্ম সংস্থান সংকুচিত হয় এবং সাধারণ দামস্তর নিম্নমুখী হয়।

রিফ্লেশন (Reflation) : মুদ্রা সংকোচনের শোচনীয় পরিণামের হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য, অনেক সময দামস্তর বৃদ্ধি করিয়া, উৎপাদন ব্যয়ের স্তরে তুলিযা সমান করিবার যে ব্যবস্থা করা হয়, তাহাকেই রিফ্লেশন বলা হয়। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য অর্থসংকট অবস্থা কাটাইয়া ধীরে ধীরে সমৃদ্ধির প্রথমস্তরে পৌছান।

ডিস্ইন্ফ্লেশন (Disinflation) : সাধারণতঃ, যুদ্ধের সময ও পরে দামস্তর ও উৎপাদন ব্যয় এত বৃদ্ধি পায় যে, উহাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচণীয় ভাবে দেখা দেয়। সরকার এই অবস্থাকে স্বাভাবিক করিবার জন্য আর্থিক ও রাজস্ব সম্বন্ধীয নীতির নিযন্ত্রণ ব্যবস্থা করিয়া থাকে ; দামস্তব ও উৎপাদন ব্যয সংকোচনের এই নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে disinflation বলা হয়। এই নিযন্ত্রণ দ্বারা কেবল মাত্র মূল্যস্তর ও উৎপাদন ব্যয়ই হ্রাস করা হয়, পণ্য উৎপাদন ও কর্ম সংস্থানের কোন সংকোচন করা হয় না। লক্ষ্য করিতে হইবে যে, মুদ্রা সংকোচন (deflation) ও disinflation এক নহে। মুদ্রা সংকোচনের অর্থ, উৎপন্ন দ্রব্যের তুলনায সাধারণের অর্থ আয় কমৃতি হওযা এবং উহার পরিণাম স্বরূপ দামস্তরের হ্রাস পাওয়া। মুদ্রা সংকোচনের ফলে দামস্তর হ্রাস হয় এবং উৎপন্ন পণ্য যোগান ও কর্মসংস্থানেরও হ্রাস হয়। কিন্তু disinflation দ্বারা যে দামস্তর হ্রাস করা হয়, তাহাতে পণ্য উৎপাদন ও কর্ম নিয়োগের সংকোচন হয় না।

অনুশীলনী

1. Examine the factors on which the value of money depends ? (C. U. B. A. '53, B. Com. '54.)
2. Indicate the factors that determine the purchasing power of money. (C. U. B. Com. '52,)

3. What do you understand by Index Number? What principles should be borne in mind in constructing Index Number? What is the object and importance of Index Number? (C. U. B A. '55)
4. What are the difficulties you would have to face in constructing an Index Number for measuring changes in the value of money? (C. U. B. Com. '55)
5. Define inflation and explain its effects on production and distribution of income. (C. U. B. Com. '51, '55)
6. When does inflation occur? Discuss the effects of inflation on price level, production and distribution of income. (C. U. B. Com. '52 ; '55 ,

ত্রিংশ অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থা (Monetary Systems)

যে কোন অর্থনৈতিক অবস্থার আনুষঙ্গিক হিসাবে মুদ্রা ব্যবস্থা অপরিহার্য। মুদ্রা ব্যবস্থার সৌকর্যের উপর দেশের অর্থনৈতিক অনেক সমস্যারই সুসমাধান নির্ভর করে। মুদ্রা ব্যবস্থা যদি সুসংগঠিত না হয়, তাহা হইলে ব্যবসায় বাণিজ্য ও উৎপাদনের স্থৈর্য নষ্ট হইতে বাধ্য এবং গোটা অর্থনৈতিক বুনিয়াদ ধ্বসিয়া পড়া ও অসম্ভব নয়। সুতরাং, প্রত্যেক আর্থিক ব্যবস্থাতেই উপযুক্ত মুদ্রা মান নির্ধারণ করা অতীব প্রয়োজনীয়।

ধাতু মুদ্রা মানের রকমারি ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। নিম্নে কতিপয় মুদ্রা ব্যবস্থার আলোচনা করা হইল।

একধাতুমান (Monometallism) : একটি মাত্র ধাতু যখন মূল্যের মান, তখন সেই ব্যবস্থাকে একধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থা বলা হয়। এই ব্যবস্থায় মান মুদ্রা (Standard Money) স্বর্ণ কিংবা রৌপ্য একটিমাত্র ধাতুদ্বারা তৈয়ারী। সুতরাং, একধাতুমান স্বর্ণমান, কিংবা রৌপ্যমান হইতে পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ডে স্বর্ণমান এবং চীনে রৌপ্যমান প্রচলিত ছিল।

একধাতুমান ব্যবস্থায় মুদ্রা অধিকর্তা (Monetary Authority) নির্দিষ্ট মূল্যে অপর্যাপ্ত পরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য ক্রয় বা বিক্রয় করিতে পারে। এই অর্থ

ব্যবস্থার প্রধান গুণ, ইহার সহজ কার্যকারিতা। দেশের আভ্যন্তরীণ মূল্য-সাম্যও আন্তর্জাতিক বিনিময় সাম্য একধাতুমান ব্যবস্থা যেরূপ বজায় রাখিতে সক্ষম, অন্য কোন ব্যবস্থায় তাহা সম্ভব নহে।

দ্বিধাতুমান (Bimetallism) ঃ দ্বিধাতুমান অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে সাধারণতঃ স্বর্ণ যোগানের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু। এই ব্যবস্থায় মানমুদ্রা একাধারে স্বর্ণ এবং রৌপ্য এই দুইটি ধাতু দ্বারাই তৈয়ারী। স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত দুই মুদ্রাই অসীমাবদ্ধ ভাবে বিহিত মুদ্রা (unlimited legal tender)। এই ব্যবস্থায় আর্থিক অধিকর্তা, আইন নির্দিষ্ট অনুপাত অনুসারে, স্বর্ণের পরিবর্তে রৌপ্য ও রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ অপর্য্যাপ্ত ভাবে প্রদান করিতে বাধ্য।

দ্বিধাতুমানের সুবিধা (Advantages of Bimetallism) ঃ যাঁহারা দ্বিধাতু মানের সমর্থক তাঁহারা বলেন, যে, অর্থ ব্যবস্থায় পাশাপাশি দুইটি ধাতু মুদ্রা ব্যবহৃত হইলে, মুদ্রার মূল্যমান ও দামস্তরের স্থিরতা একধাতুমান ব্যবস্থার চেয়ে অধিক বজায় থাকে। ইহার কারণ এই যে, যখন দুইটি ধাতু মুদ্রামান হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তখন মোট অর্থের পুঁজি একধাতু মানের পুঁজির চেয়ে অধিক হয়। ফলে, অর্থের যোগান যদি একটু বৃদ্ধিও পায়, তাহা হইলে মুদ্রামূল্য বা দামস্তরের উপর উহার প্রভাব বড় একটা বোঝা যায় না। তাহাছাড়া, দ্বিধাতুমান মুদ্রামূল্য বা দামস্তর অপেক্ষাকৃত অধিক স্থিতি-স্থাপক হওয়ার আর একটি কারণ এই যে, একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি বা হ্রাস হইলে, অন্য একটি ধাতুর যোগান যথাক্রমে হ্রাস বা বৃদ্ধি, দ্বারা সমতা রক্ষা করা সম্ভব হয়। কিন্তু, এই অভিমত সম্পূর্ণ স্বীকার করা যায় না; কেননা, ইহা শুধু অনুমান করে যে, অর্থের যোগান কেবলমাত্র মান ধাতুর যোগানের উপর নির্ভর করে। অর্থের যোগান দাদনের (কর্জ মুদ্রার) উপর ও যে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, তাহা এই মতবাদে অস্বীকার করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিধাতুমানের আর একটি সুবিধা এই যে, ইহা স্বর্ণমান ও রৌপ্যমানে অধিষ্ঠিত দেশগুলির মধ্যে অর্থের আন্তর্জাতিক মূল্যসাম্য প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও মূলধন বিনিয়োগের বিশেষ সহায়তা করে।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানে (International Gold Standard)র তুলনায় আন্তর্জাতিক দ্বিধাতুমানের সুবিধা অধিক; কেননা, স্বর্ণমানে যেমন একমাত্র ধাতু স্বর্ণের যোগান ঘাটতি হইবার সম্ভাবনা, ইহাতে একটি ধাতুর যোগান ঘাটতি হইলে, আর একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি করিয়া ঐ ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব হয়।

দ্বিধাতুমানের অসুবিধা (Disadvantages of Bimetallism): দ্বিধাতুমানের প্রধান অসুবিধা এই যে, শুধু একটি দেশের মুদ্রাব্যবস্থা রূপে ইহা কার্যকরী হওয়া সুকঠিন। যদি মাত্র একটী দেশে দ্বিধাতুমান মুদ্রাব্যবস্থা কার্যকরী হয়, তাহা হইলে স্বর্ণমান, কিংবা কাগজীমুদ্রামানের সমস্ত অপগুণ গুলিই উৎকট-ভাবে দেখা দিবে। যদি বিভিন্ন দেশে দুইটী ধাতুর মধ্যে একই নির্দিষ্ট অনুপাত রক্ষা করা হয়, তাহা হইলে আন্তর্জাতিক-ভিত্তিক দ্বিধাতুমান সফলতার সহিত কার্যকরী হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি দ্বিধাতুর টাকশাল নির্দিষ্ট অনুপাত ও বাজার মূল্যের অনুপাতের মধ্যে পার্থক্য দেখা দেয়, তাহা হইলেও এই মুদ্রাব্যবস্থার অসুবিধা দেখা দিবে। কেননা, সেক্ষেত্রে দেনাদার নিকৃষ্ট (depreciated) মুদ্রায় ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিবে এবং উত্তমর্ণ উৎকৃষ্ট মুদ্রায় (over-valued) ঋণ আদায় করিতে চাহিবে। ইহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের বিশেষ অব্যবস্থা হইবে। তাহাছাড়া, ইহাতে ধাতুপিণ্ড বাজারে (bullion market) ক্ষতিকর ফাটকা কারবারের ও উদ্ভব হইবে।

তৃতীয়তঃ, দ্বিধাতুমানে দামস্তরের স্থিরতা কতটা প্রতিষ্ঠা হইবে, সে সম্পর্কে ও যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটি ধাতুর যোগান দুষ্প্রাপ্য হইলে, আর একটি ধাতুর যোগান বৃদ্ধি করিয়া যে তাহা দ্বারা মুদ্রা মূল্য সাম্য বা দামস্তর সাম্য বজায় রাখা সম্ভব হয়, তাহা সঠিকভাবে বলা যায় না। তাহা ছাড়া, দুইটি ধাতুমূল্যের মধ্যে স্থায়ী নির্দিষ্ট একটি অনুপাত হার বাঁধিয়া দেওয়া ও অসম্ভব; কেননা, দুইটি ধাতুর মূল্য সম্পূর্ণ আলাদাভাবে উহাদের চাহিদা ও যোগান দ্বারা স্থির হয়। ধাতুর অনুপাত হার নির্দিষ্ট ভাবে বাধিয়া দিলে ও কোন সময়ে একটি ধাতু উৎকৃষ্ট হইতে পারে, অপর একটি ধাতু নিকৃষ্ট হইতে পারে।

দ্বিধাতুমানের ক্ষতিপূরক ক্রিয়া (Compensatory Action of Bimetallism): আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, দ্বিধাতুমান যদি আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে প্রচলিত হয়, অর্থাৎ পৃথিবীর সকল দেশেই যদি স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে একই অনুপাত হাব নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে দামস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা রক্ষার পক্ষে খুবই অনুকূল হইবে। এই অবস্থাতে একটি ধাতুমুদ্রা আর একটি ধাতুমুদ্রাকে প্রচলন হইতে বিতারণ করিবে না। পরন্তু, দ্বিধাতুমান অক্ষুণ্ণ থাকিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে সরকার নির্ধারিত অনুপাত বজায় রাখিয়া মুদ্রা ব্যবস্থা ভাল ভাবে চালু করিবে।

আমরা একটি উদাহরণ দ্বারা দ্বিধাতুমানের ক্ষতিপূরক ক্রিয়া বুঝাইতেছি। মনে কর, বিভিন্ন দেশ দ্বিধাতুমান অর্থব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে টাকশাল নির্ধারিত অনুপাত যথাক্রমে ১ : ১৫ নির্ধারিত করিয়াছে। অর্থাৎ মুদ্রার ১ আউন্স স্বর্ণ মুদ্রার ১৫ আউন্স রৌপ্যের সমান এবং বাজারে ঐ দুই ধাতুর মধ্যে অনুপাত হার ও ১ : ১৫। এখন, যদি কোন কারণের জন্য রৌপ্যের যোগান বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে রৌপ্যের বাজার দাম অবশ্য হ্রাস পাইবে। মনে কর, রৌপ্যের বাজার মূল্য হ্রাসের জন্য বিনিময় বাজারে ১৬ আউন্স রৌপ্য এক আউন্স স্বর্ণের সমান হইল। ফলে, রৌপ্যের ধাতু হিসাবে বাজার মূল্যের চেয়ে উহার মুদ্রা হিসাবে মূল্য অধিক হইবে। ইহাতে রৌপ্যের ধাতু পিণ্ড রৌপ্য মুদ্রায় রূপান্তরিত করা লাভ জনক হইবে। ঋণদাতাগণ রৌপ্যপিণ্ড মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিবে। রৌপ্যের ধাতু হিসাবে বাজার মূল্য হ্রাস পাওয়ায়ও মুদ্রামূল্য বাড়ায়, রৌপ্যের চাহিদা বাড়িবে এবং স্বর্ণের চাহিদা কমিবে। রৌপ্যের এই চাহিদা বৃদ্ধির ফলে, কিছুকাল পরেই উহার বাজার মূল্য আবার ধীরে ধীরে উর্ধ্বগতি হইবে ও স্বর্ণের মূল্য হ্রাস হইবে। ফলে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের মধ্যে ধাতুগত অনুপাত আবার পরিবর্তিত হইয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের মুদ্রাগত আইন নির্দিষ্ট অনুপাত ১ : ১৫ এর সমান পাইবে। ইহাকে দ্বিধাতুমানের ক্ষতিপূরক ক্রিয়া বলে। যখন বহু দেশ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার একই নির্ধারিত অনুপাত হার গ্রহণ করে, তখনই এই প্রক্রিয়ার সৌকার্য দেখা যায়।

স্বর্ণমান (Gold Standard) : কোন দেশ স্বর্ণমানের উপর অধিষ্ঠিত বলা যায় তখন, যখন সেই দেশের মুদ্রার মূল্যের সহিত একটা নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের মূল্যের সমতা রক্ষিত হয়। দেশের মুদ্রার এক এককের ক্রয় ক্ষমতা ও নির্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের ক্রয় ক্ষমতা যদি এক সমান হয়, তাহা হইলে আর্থিক ব্যবস্থায় স্বর্ণ মানের গোড়া পত্তন হইবে। এই ব্যবস্থাতে দেশের মুদ্রা অধিকর্তা একটা নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করিতে প্রস্তুত থাকে। স্বর্ণের এই নির্দিষ্ট মূল্য স্থানীয় মুদ্রার ভিত্তিতে স্থির করা হইয়া থাকে। স্বর্ণমানের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, স্বর্ণের রপ্তানী ও আমদানী অবাধ হইবে। স্বর্ণমানে একদিকে যেমন দেশের মুদ্রামূল্য ও স্বর্ণের ধাতু মূল্যের মধ্যে বৈষম্য ঘটিতে পারে না, অপর দিকে স্বর্ণের অবাধ চলাচলের দরুণ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দামস্তরের পার্থক্য ও থাকিতে পারে না। বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন সময়ে স্বর্ণমানের বৈশিষ্ট্য রকমারি ভাবে দেখা গিয়াছে। এই

বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান (Different Forms of Gold Standard)

বৈশিষ্ট্য গুলি অনুধাবণ করিবার জন্য নিম্নে বিভিন্ন প্রকারের স্বর্ণমান আলোচনা করা হইল।

স্বর্ণ প্রচলনমান (Gold Circulation or Currency Standard) : এই প্রকার অর্থ ব্যবস্থায় একমাত্র স্বর্ণমুদ্রাই প্রচলিত প্রধান অর্থ ; কিংবা স্বর্ণমুদ্রার সহিত নোটেরও প্রচলন থাকিতে পারে। নোট ও অন্যান্য প্রচলিত অর্থ নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণমুদ্রায় পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। অবাধ মুদ্রাঙ্কণ (free coinage) স্বর্ণের অবাধ আমদানী ও রপ্তানী, এই ব্যবস্থার আর দুইটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই ধরণের স্বর্ণমান প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে প্রচলিত ছিল।

স্বর্ণ প্রচলনমানের সুবিধা

স্বর্ণ প্রচলনমানের প্রধান সুবিধা এই যে, এই ব্যবস্থাতে কাগজী নোটের অতিমাত্রায় প্রচার হওয়ার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, মুদ্রার যোগান স্বর্ণের যোগান দ্বারা সীমিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই স্বর্ণামান স্বয়ং ক্রিয়াশীল (automatic), নিয়ন্ত্রণের বিশেষ প্রয়োজন হয় না। যদি এক দেশের দামস্তর অন্য দেশের দামস্তরের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয় দেশ হইতে প্রথম দেশটিতে স্বর্ণ-প্রবাহ চলিতে থাকিবে। ইহাতে প্রথম দেশে দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে এবং দ্বিতীয় দেশে স্বর্ণ-যোগান হ্রাস পাওয়ায়, দামস্তর হ্রাস পাইবে। এইরূপ ভাবে স্বর্ণের অবাধ চলাচলের ফলে বিভিন্ন দেশের দামস্তরের সমতা ও স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

স্বর্ণ প্রচলনমানের অসুবিধা

তবে স্বর্ণ প্রচলনমানের বড় অসুবিধা এই যে, এই ব্যবস্থা ব্যয়-সাপেক্ষ। যে দেশের স্বর্ণ-যোগান প্রতুল নয়, সে দেশের পক্ষে এই ব্যবস্থা চালু রাখা অসম্ভব। তাহা ছাড়া, এই স্বর্ণমান দেশের অর্থব্যবস্থাকেও অনম্য করিয়া থাকে। প্রকৃতিদত্ত বলিয়া স্বর্ণের যোগান অনম্য ; অনম্য স্বর্ণ-যোগান দ্বারা সীমিত বলিয়া এই ব্যবস্থা দেশের চাহিদানুরূপ অর্থ প্রচারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে সাধারণতঃ অপারগ।

স্বর্ণ পিণ্ডমান (Gold Bullion Standard) : এই মুদ্রা-ব্যবস্থায় দেশে স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন থাকে না। কাগজী মুদ্রা ও সাংকেতিক মুদ্রা প্রচলিত বিনিময় মাধ্যমরূপে কাজ করে। এই ব্যবস্থায় প্রচলিত কাগজী মুদ্রাও স্বর্ণ মুদ্রায় বিনিমেয় নহে, স্বর্ণ পিণ্ডে বিনিমেয়। দেশের মুদ্রা অধিকর্তা স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করিতে আইনতঃ বাধ্য থাকে। ইহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের রপ্তানী ও আমদানীও অবাধ। ইংলণ্ডে স্বর্ণ পিণ্ডমান অর্থ ব্যবস্থা ১৯২৫ সাল হইতে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত বলবৎ

ছিল। তখন ইংলণ্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে আইনতঃ আউন্স প্রতি ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ৯ পেন্স মূল্যে অপরিমিত স্বর্ণ ক্রয় করিতে এবং আউন্স প্রতি ৩ পাউণ্ড ১৭ শিলিং ১০½ পেন্স মূল্যে কমপক্ষে ৪০০ আউন্স স্বর্ণ বিক্রয় করিতে বাধ্যবাধকতা ছিল।

স্বর্ণ পিণ্ডমানের প্রধান গুণ এই যে, এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের ব্যবহার বিশেষ ভাবে সংক্ষেপ করা যায়। দেশের বিনিময়-মাধ্যম হিসাবে, স্বর্ণ মুদ্রার প্রচলন থাকে না বলিয়া এই ব্যবস্থা স্বর্ণ প্রচলনের চেয়ে কম ব্যয়-বহুল। স্থানীয় মুদ্রা স্বর্ণে বিনিমেয় বলিয়া বিনিময় স্থিরতা স্থাপনে এই ব্যবস্থা সক্ষম। তবে কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণ পিণ্ডে বিনিময় করিবার জন্য স্বর্ণ সংরক্ষণ (reserves) রাখিতে হয়; ইহা ব্যয় সাপেক্ষ। এই সংরক্ষিত স্বর্ণ অন্য কোন কাজে আসে না—নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে। স্বর্ণের যোগান স্থিতিশীল বলিয়া, স্থানীয় মুদ্রার মূল্য ও দামস্তর অস্বাভাবিকভাবে উঠা-নামা করিতে পারে না।

স্বর্ণ-বিনিময় মান (Gold Exchange Standard): প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশসমূহে আর এক রকমের স্বর্ণমানের প্রচলন হইয়াছিল। ইহাকে স্বর্ণ-বিনিময় মান বলা হয়। যুদ্ধের পরও স্বর্ণের ব্যবহার সংক্ষেপ করিবার জন্য অনেক দেশ এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল এই ব্যবস্থায় স্থানীয় মুদ্রা হিসাবে নিকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রার প্রচলন ছিল। কাগজী মুদ্রা এই নিকৃষ্ট ধাতু-মুদ্রায় বিনিমেয় ছিল। ভারতবর্ষের বেলায় এই ধাতু-মুদ্রা ছিল টাকা। টাকা সস্তা নিকৃষ্ট ধাতু-নির্মিত। আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য কাগজী-মুদ্রা বা ধাতু-মুদ্রা স্বর্ণে বিনিমেয় ছিল না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য স্থানীয় মুদ্রা কেবল স্বর্ণে বিনিমেয় ছিল। ভারতবর্ষে যখন এই মুদ্রা-ব্যবস্থা বর্তমান ছিল, তখন তাহাকে বিলাতে একটি স্বর্ণ-সংরক্ষণ ভাণ্ডার স্থাপিত করিতে হইয়াছিল। ১ শিলিং ৪ পেন্স হারে ভারতীয় টাকা বিলাতের স্বর্ণ-মুদ্রা ষ্টার্লিং এ বিনিময় হইত।

স্বর্ণ বিনিময় মানের গুণ ও অপগুণ

স্বর্ণ বিনিময় মানের প্রধান গুণ এই যে, এই ব্যবস্থায় আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণের কোন প্রয়োজনই হয় না। সেই জন্য এই অর্থ ব্যবস্থা মোটেই ব্যয়-বহুল নহে। সাধারণতঃ, যে সকল দেশে স্বর্ণের যোগান-পুঁজি অত্যন্ত সীমিত, যে সকল দেশ অত্যন্ত গরীব, সে সকল দেশের পক্ষে স্বর্ণ-বিনিময় মান অত্যন্ত অনুকূল ব্যবস্থা। বিনিময় ও মুদ্রা-মূল্যের স্থিরতা স্থাপনের অসুবিধা এই ব্যবস্থায়

বড় একটা হয় না ; কেননা, মুদ্রা ব্যবস্থা কার্যকরী রাখিতে অন্য দেশের মুদ্রা ও স্বর্ণের সহিত স্থানীয় মুদ্রা নিবিড়ভাবে সংযুক্ত রাখিতে হয়।

এই ব্যবস্থার অপগুণ এই যে, বিদেশে একটি সংরক্ষণ ভাণ্ডার রাখিতে হয়। ইহাতে দেশের আর্থিক স্বাধীনতা বেশ খানিকটা খর্ব হয়। তাহা ছাড়া, এ ব্যবস্থায় ঝুঁকি গ্রহণও খুব বেশী করিতে হয়। কেননা, যে দেশের স্বর্ণমুদ্রাতে স্থানীয় মুদ্রা বিনিমেয়, সে দেশ যদি স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে, কিংবা মুদ্রার মূল্য হ্রাস করে (devalue), তাহা হইলে তাহার পরিণাম স্থানীয় স্বর্ণমানের উপর অত্যন্ত ভয়াবহ হয়। এই ব্যবস্থার আর একটি অপগুণ এই যে, ইহা স্বয়ং-ক্রিয় নহে। এক স্বর্ণ ছাড়া, অন্যান্য চল্‌তি পুঁজি-সম্পদ (liquid resoures) দুই দেশের মধ্যে অবাধ চলাচল করে না। যে দেশে স্বর্ণ বিনিময় মান বর্তমান, সে দেশের মুদ্রা-যোগান প্রসার সংকোচন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কীয় উদ্বৃত্ত পাওনা দ্বারা (balance of payments) প্রভাবান্বিত হইতে পারে ; কিন্তু, তাহা বলিয়া যে দেশে স্বর্ণ-সংরক্ষণ বর্তমান, সে দেশের দামস্তরের যে কোন্ দিকে পরিবর্তন হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই।

স্বর্ণ সমতা মান (Gold Parity Standard) : এই মুদ্রা-ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডারের (International Monetary Fund) এর আওতায় কার্যকরী হইয়াছে। এই ব্যবস্থায় দেশে স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের প্রয়োজন হয় না, কিংবা স্বর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে না। স্বর্ণের একমাত্র প্রয়োজন এই যে, মুদ্রা-অধিকর্তা স্বর্ণের নিরিখে স্থানীয় মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিরতা রক্ষা করে। আন্তর্জাতিক অর্থ-ভাণ্ডার বিভিন্ন সদস্য দেশের জন্য এই ধরণের স্বর্ণমানের পক্ষে সুপারিশ করিয়াছে।

স্বর্ণমানের কার্যকারিতা (Working of the Gold Standard) : অনেকে বলিয়া থাকেন যে, স্বর্ণমান স্বয়ংক্রিয় মুদ্রা-ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থার কার্যকারিতার জন্য কোন তদারক বা নিয়ন্ত্রণ করিতে হয় না। প্রচলিত স্বর্ণ-মুদ্রার পরিমাণ দেশের স্বর্ণ-যোগানের উপর নির্ভর করে। বিনিময়ের অন্যান্য মাধ্যম,—যেমন, কাগজী নোট, ব্যাংকের আমানত পরিমাণ যথাক্রমে স্বর্ণ-সংরক্ষণ (gold resources) ও ব্যাংকের সংরক্ষণের (bank resources) দ্বারা নিয়মিত হয়। মোটামুটিভাবে দেশের মোট স্বর্ণ-সংরক্ষণের সহিত প্রচলিত অর্থ পরিমাণ সংশ্লিষ্ট। দেশে যখন স্বর্ণের আমদানী

স্বর্ণমানের স্বয়ং-ক্রিয়াশীলতা (Automaticity of Gold Standard)

বৃদ্ধি পায়, তখন দেশের সংরক্ষণও বৃদ্ধি পায়, এবং দামস্তর উর্ধ্বগামী হয়। আবার, যখন স্বর্ণ রপ্তানী হওয়ার ফলে দেশের স্বর্ণের সংরক্ষণ হ্রাস পায়, তখন দামস্তরও নিম্নমুখী হয়। স্বর্ণের এই অবাধ চলাচলের ফলে দামস্তরের যে পরিবর্তন হয়, উহাই স্বর্ণমানের স্বয়ং ক্রিয়াশীলতা। স্বর্ণের অবাধ চলাচলের ফলে, কেবল যে দেশে মূল্য স্থিরতা স্থাপিত হয় তাহা নহে ; যে সকল দেশে স্বর্ণমান ব্যবস্থা প্রচলিত, উহাদের আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের' স্থিরতাও সহজেই বজায় থাকে। দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঐ দুই মুদ্রার স্বর্ণ পরিমাণ মিলাইয়া ধার্য করা হয়। এই বিনিময় হারকে টাকশালী বিনিময় সাম্য (mint par) বলা হয়। কখন কখন দুইটি দেশের প্রকৃত মুদ্রার বিনিময় হার টাকশালী বিনিময় হারের চেয়ে কম বেশী হইতে পারে। কিন্তু, এই বৈষম্য স্বর্ণের চলাচল ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উঠা-নামার মাধ্যমে দূর হইয়া থাকে। যদি দেশের আমদানী রপ্তানীর চেয়ে অধিক হয়, ও তাহার ফলে স্বর্ণ প্রেরণের বহন খরচ যাহা পড়ে, তাহার চাইতে প্রকৃত বিনিময় হার ও টাকশালী বিনিময় মূল্য-সাম্যের মধ্যে পার্থক্য বেশী হয়, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হইতে থাকিবে। স্বর্ণ রপ্তানীর ফলে ঐ দেশের দামস্তর হ্রাস পাইবে। ইহার ফলে দেশের পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। দামস্তর হ্রাস পাওয়ায় দেশের পণ্য আমদানীও কমিবে। ইহাতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উন্নতি হইবে এবং প্রকৃত বিনিময় হার টাকশালী বিনিময় মূল্য-সাম্যের সহিত সমান হইতে থাকবে।

কিন্তু যাহারা স্বর্ণমানকে স্বয়ং-ক্রিয়াশীল অর্থব্যবস্থা বলিয়া দাবী করেন, তাহারা একটি মস্ত ভুল করেন এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ব্যতিরেকে স্বর্ণমান কার্যকরী হইতে পারে না। প্রথম যুদ্ধের পরও স্বর্ণমানের কার্যকারিতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ অত্যাবশ্যক ছিল। যুদ্ধোত্তর কালে আন্তর্জাতিক স্বল্প-মেয়াদী দাদন ভাণ্ডারের (international short loan funds) চলাচলের দরুণ, স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত দেশ সমূহের অর্থনৈতিক স্থিরতা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। তখন বাধ্য হইয়াই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে স্বর্ণের বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি (sterilisation of gold) করিতে হইত। অর্থাৎ, সরকারী সিকিউরিটি বিক্রয় দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অত্যাবশ্যক স্বর্ণ আমদানী বন্ধ করিয়া দামস্তর বৃদ্ধি রোধ করিত। অপরপক্ষে, স্বর্ণ রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া যখন দামস্তর হ্রাস হইবার উপক্রম হইত, সে অবস্থা রোধ করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সরকারী সিকিউরিটি ক্রয় করিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই

অনিবার্য ও অত্যাবশ্যকীয় নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বর্ণমানকে স্বয়ং-ক্রিয় না বলিয়া আসলে নিয়ন্ত্রিত (managed) অর্থ-ব্যবস্থা বলাই অধিক সমীচীন।

আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে স্বর্ণমানকে সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী করিতে হইলে মুদ্রা-অধিকর্তার কতকগুলি নিয়ম-কানুন পালন করা অত্যাবশ্যক। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিধিগুলি বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য।

স্বর্ণমানের নিয়ম-কানুন (Rules of the gold standard game)

প্রথমতঃ, স্বর্ণের অবাধ চলাচল। যে সকল দেশ স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত, উহাদের মধ্যে স্বর্ণের আমদানী ও রপ্তানী অবাধ হওয়া প্রয়োজন। স্বর্ণের অবাধ চলাচলের ফলে বিভিন্ন দেশে দামস্তর প্রভাবান্বিত হয়। যখন স্বর্ণ আমদানী হয়, তখন মুদ্রা ও দাদন যোগান বৃদ্ধি করিতে হয়; ফলে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। আবার যখন স্বর্ণ দেশ হইতে রপ্তানী হয়, তখন অর্থ ও দাদন-যোগান সংকোচন করিতে হয়; যাহাতে দামস্তর হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমানের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন অত্যাবশ্যক। সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন দ্বারা যদি আন্তর্জাতিক অবাধ বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে স্বর্ণমানের স্বয়ংক্রিয়া নষ্ট হইবে। উত্তমর্ণ দেশ যদি উহার রপ্তানী কেবল বাড়াইয়া যায়, আর সংরক্ষণ শুল্ক স্থাপন দ্বারা আমদানী বন্ধ করে, তাহা হইলে অধমর্ণ দেশ গুলির পক্ষে ধার শোধ করা সম্ভব হইবে না। বিভিন্ন দেশগুলির আর্থিক ও বাণিজ্যিক নীতি এমন ভাবে ধার্য করা উচিত, যাহাতে উহাদের পারস্পরিক উদ্বৃত্ত জমা ও পাওনা (balance of payments) নিয়মিত করা ও আসল দেনা পাওনা মিটাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

ইহা ছাড়া, স্বর্ণের নিরূপে মুদ্রা মূল্যের স্থিরতা স্থাপন করা স্বর্ণমানের সুষ্ঠু কার্যকারিতার আর একটা আংগিক। মুদ্রা মূল্যের স্থিরতা স্থাপন করিতে হইলে মুদ্রা অধিকর্তাকে মুদ্রার বিনিময়ে নির্দিষ্ট হারে স্বর্ণ ক্রয় ও বিক্রয় করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হয়।

স্বর্ণ মানের গুণ (Merits of Gold Standard): স্বর্ণমানের অন্যতম গুণ এই যে, এই ব্যবস্থায় মুদ্রার অতিমাত্রায় প্রচার হইবার সম্ভাবনা নাই। মুদ্রার যোগান স্বর্ণের মোট যোগানের উপর নির্ভর করে। মুদ্রা অধিকর্তা উপযুক্ত স্বর্ণ সংরক্ষণ ব্যতীত কাগজী মুদ্রার বহুল প্রচার করিতে পারে না। কিন্তু, স্বর্ণ যোগান অল্পকাল মিয়াদে সীমিত বলিয়া, অস্বাভাবিক পরিমাণ মুদ্রা প্রচার স্বর্ণমান ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। সেই জন্য স্বর্ণমানে মুদ্রাস্ফীতির ভয় কম।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমানের স্বয়ং ক্রিয়াশীলতার জন্য দামস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা সহজেই বজায় রাখা সম্ভব। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা যোগানের হ্রাসবৃদ্ধি দেশের স্বর্ণ পুঁজি হ্রাসবৃদ্ধির উপর নির্ভরশীল; কিন্তু দেশের স্বর্ণ পুঁজি মোটামুটি স্থিতিশীল, অল্পকাল মিয়াদে স্বর্ণ যোগান সীমিত। সেই জন্য মুদ্রা অধিকর্তা মুদ্রা প্রচার খুব বেশী সম্প্রসারণ বা সংকোচন করিয়া দামস্তরের বৃদ্ধি বা হ্রাস ঘটাইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার পরস্পর বিনিময় হার স্থিতিস্থাপক করিতে স্বর্ণমান সহায়তা করে। নির্দিষ্ট মূল্যে স্বর্ণের অবাধ কেনা-বেচা চলে বলিয়া, মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার খুব বেশী উঠিতে নামিতে পারে না। বিভিন্ন দেশের মধ্যে অবাধ স্বর্ণ আমদানীও রপ্তানী হওয়ার দরুণ, এই ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশের দামস্তরের মধ্যে সমতাও খুব বেশী বজায় থাকে।

চতুর্থতঃ, স্বর্ণমান দেশের কর্জ ও দাদন যোগানকেও উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত কোন দেশই কর্জ-যোগান সম্প্রসারণ বা সংকোচন নীতি অধিক দিন ব্যাপকভাবে চালাইতে পারে না। কেননা, স্বর্ণের অবাধ চলাচল ও স্বয়ংক্রিয়া এই কর্জ-যোগান সম্প্রসারণ ও সংকোচনকে রোধ করে। ইহার ফলে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রাসংকোচন—কোনটাই উৎকট আকার ধারণ করিতে পারে না।

সুতরাং, স্বর্ণমান স্বয়ং-ক্রিয়াশীল, প্রতিবন্ধকহীন, সরল অর্থব্যবস্থা। বিভিন্ন দেশের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ বণ্টনের সহায়তা করে বলিয়া, স্বর্ণমান আন্তর্জাতিক মুদ্রামান হইবার যোগ্য।

স্বর্ণমানের অপগুণ (Drawbacks of Gold Standard) : উপরে স্বর্ণমানের যে গুণগুলি আমরা নির্দেশ করিলাম, উহাদের অনেকগুলিই বাস্তব ক্ষেত্রে লাভ করা সম্ভব হয় নাই। স্বর্ণমান আসলে স্বয়ং-ক্রিয়াশীল হয় নাই। ইহার কার্যকুশলতার জন্য আনুষঙ্গিক নিয়ম-কানুনগুলিও সঠিকভাবে কখন বড় একটা পালন করা হয় নাই। প্রথম যুদ্ধের পূর্বে বা উত্তরকালে যে স্বর্ণমান বর্তমান ছিল, উহা স্বয়ং-ক্রিয়াশীল নহে; উহা নিয়ন্ত্রণাধীন মুদ্রা-ব্যবস্থা। দেশের আমদানী রপ্তানীর চেয়ে বৃদ্ধি পাওয়াতে, যখনই স্বর্ণ প্রচুর পরিমাণে দেশ হইতে বাহির হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাট্টার হার বৃদ্ধি করিয়া স্বর্ণ রপ্তানী রোধ করিতে হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বর্ণমান আভ্যন্তরীণ দামস্তরের ও বিভিন্ন মুদ্রার বিনিময় হারের স্থিতিশীলতাও প্রকৃতপক্ষে রক্ষা করিতে পারে নাই। স্বর্ণ উৎপাদনের

হ্রাস-বৃদ্ধির সংগে সংগে, দামস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধিও অনিবার্যভাবে দেখা গিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি অষ্ট্রেলিয়া ও ক্যালিফোর্ণিয়ায় স্বর্ণ আবিষ্কারের ফলে, ঐ ধাতুর যোগান যখন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তখন দামস্তরও বাড়িয়াছে। আবার, ঐ শতাব্দীরই শেষ দিকে যখন স্বর্ণের যোগান হ্রাস পাইয়াছিল, তখন দামস্তর কমিয়া যায়।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণের অবাধ চলাচলের ফলে আন্তর্জাতিক সুদের হারের অত্যন্ত পরিবর্তন ঘটে। সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধিতে আবার দেশের ব্যবসা বাণিজ্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়।

চতুর্থতঃ, স্বর্ণমান মুদ্রাস্ফীতিরও প্রতিরোধক নহে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের মূল্যের সংগে সম্পর্কযুক্ত। স্বর্ণের উৎপাদন ও যোগান বৃদ্ধির ফলে যখন স্বর্ণের বাজার-মূল্য হ্রাস পায়, দেশে দামস্তরও তখন সংগে সংগে বৃদ্ধি পায় ও মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা দেয়।

পঞ্চমতঃ, লর্ড কীনস্ মন্তব্য করিয়াছেন যে, স্বর্ণমান অর্থ-ব্যবস্থার সংকোচন (deflation) ও কর্ম নিয়োগ হ্রাস করে। যে দেশে রপ্তানীর তুলনায় অমদানী অধিক হয়, সে দেশ হইতে স্বর্ণ অত্যধিক পরিমাণ বাহির হইয়া যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টা হার বৃদ্ধি করিয়া যখন এই স্বর্ণ রপ্তানী রোধ করিতে যায়, তখন অন্যদিকে দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কর্জ ও দাদন-যোগান সংকুচিত হয়। ইহার ফলে উৎপাদন ও কর্ম-নিয়োগ হ্রাস পায় এবং অর্থ-ব্যবস্থায় সাধারণ মন্দা আসে।

পরিশেষে, স্বর্ণমানের আর একটি অপগুণ এই যে, এই মুদ্রাব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত দেশ সমূহে মুদ্রা অধিকর্তাকে স্বাধীনতা ও কর্মস্বাতন্ত্র্য অনেকটা খর্ব করিতে হয়। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমান ব্যবস্থায় বিভিন্ন দেশগুলির মুদ্রানীতি পারস্পরিক সংশ্লিষ্ট। কোন দেশই নিজের খুসী মত দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করিতে কিংবা পূর্ণকর্ম নিয়োগ সৃষ্টি করিতে স্বাধীন নীতি গ্রহণ করিতে পারে না।

স্বর্ণমান ত্যাগের কারণ (Causes of Break down of the Gold Standard): প্রথম মহাযুদ্ধ সুরু হইবার সময় হইতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থ-ব্যবস্থায় এমন বিপর্যয় অবস্থা দেখা দেয় যে, স্বর্ণমানের ক্রিয়া সম্পর্কীয় অত্যাবশ্যক নিয়ম কানুনগুলিও (rules of the gold standard game) কোন দেশই একান্ত ভাবে পালন করিতে পারে না। প্রায় কোন দেশই স্বর্ণ আমদানী ও রপ্তানীর অবাধ নীতি গ্রহণ করিতে পারে না। ফলে, অবাধ স্বর্ণ চলাচলের মাধ্যমে

যে দামস্তরের পরিবর্তন সাধন ও বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থাকে, তাহাও নষ্ট হইয়া যায়। যুদ্ধোত্তর কালে, বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক-গুলির মধ্যে সহযোগিতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত দেশগুলির আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাপারে জাতীয়তাবোধ উগ্র হইয়া উঠে। আন্তর্জাতিক স্বর্ণমানের কার্যকুশলতার মূল নীতিটি পর্যন্ত সকল দেশ অবজ্ঞা করিতে থাকে। যে দেশে স্বর্ণ আমদানী হয়, সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে কর্জ যোগান সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করিযা দামস্তর বৃদ্ধির সহায়তা করিবে, কিংবা যে দেশ হইতে স্বর্ণ রপ্তানী হয়, সে দেশে কর্জযোগান সংকোচন দ্বারা দামস্তর হ্রাস করা যে অত্যাবশ্যক স্বর্ণ মানের এই মোদ্দা নীতিটি যুদ্ধোত্তর কালে কোন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক মানিয়া চলে নাই। স্বর্ণের অবাধ চলাচল যাহাতে দেশের দামস্তরের উপর প্রভাব বিস্তার না করিতে পারে, তাহার জন্য ইংলণ্ড ও আমেরিকা খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয় করিয়া প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে।

ইংলণ্ড ১৯২৫ সালে যখন স্বর্ণমানে পুনঃ অধিষ্ঠিত হয়, তখন যুদ্ধ-পূর্ব হারেই স্বর্ণ নিরূপে ষ্টার্লিং এর মূল্য ধার্য করা হয়। কিন্তু যুদ্ধের সময় হইতে ষ্টার্লিং এর মূল্য হ্রাস সুরু হওয়ায়, যুদ্ধোত্তর কালে ষ্টার্লিং এবং নির্দিষ্ট হার অতি মূল্যকৃত (over-valued) হইল। ষ্টার্লিং এর এই অতি মূল্যকরণের ফলে, ইংলণ্ডের রপ্তানী পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইল, তাহাতে রপ্তানী পরিমাণ হ্রাস পাইয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ঘাটতি হইল। এই ঘাটতি বাণিজ্যের জন্য ইংলণ্ডের স্বর্ণ রপ্তানী বৃদ্ধি পাইল। আর এই অত্যধিক স্বর্ণ রপ্তানীর ফলে ইংলণ্ডের পক্ষে স্বর্ণমান বজায় রাখা দুষ্কর হইল।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশেব মধ্যে পৃথিবীর স্বর্ণপুজির সুবণ্টন ব্যবস্থা না হওয়ার দরুণও স্বর্ণমান বজায় রাখা অসম্ভব হইয়া পড়ে। গোটা স্বর্ণপুজির একটা মোটা অংশই আমেরিকার তহবিলে গচ্ছিত হয়। যুদ্ধঋণ ও ক্ষতিপূরণ বাবদ সমুদয় পাওনা আমেরিকা স্বর্ণে আদায় করিয়া লয়। কিন্তু স্বর্ণ আমদানী বৃদ্ধি পাইলেও আমেরিকা অর্থযোগান বা দাদন সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করে নাই। ফলে, আমেরিকাব আভ্যন্তরীণ দামস্তর ও অন্যান্য দেশের দামস্তরের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান দেখা দেয়, যাহার ফলে আমেরিকার স্বর্ণ আমদানী আরও ব্যাপক ভাবে বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া আমেরিকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংরক্ষণ নীতি অনুসবণ করে; বিদেশী মাল আমদানী বন্ধ করিবার জন্য উচ্চ আমদানী শুল্ক ধার্য করে। বিদেশে দাদন ও

লগ্নী কারবার একদম বন্ধ করে, এবং উত্তমর্ণ হিসাবে প্রাপ্য অর্থ আদায় আমদানী দ্রব্যের মাধ্যমে না করিয়া, স্বর্ণের মাধ্যমে প্রাপ্য দাবী করে।

১৯২৯ সালে অক্টোবর মাসে নিউইয়র্কের ওয়াল ষ্ট্রীটে (Wall Street) সিকুউরিটির মূল্য আচমকা হ্রাস হওয়ার ফলে যে বাণিজ্য সন্ত্রাসের সৃষ্টি হয়, তাহাতে স্বর্ণমানের নির্বাসন পর্ব আরও তাড়াতাড়ি সমাধা হয়। এযাবৎ পৃথিবীর আর্থিক স্নায়ুকেন্দ্র বলিয়া বিলাতের একটা গৌরব ছিল। পৃথিবীর অনেক দেশই বৈদেশিক স্বল্পমিয়াদি বিনিযোগের জন্য বিলাতে অর্থ ভাণ্ডার গচ্ছিত রাখিত ; ওয়াল ষ্ট্রীটের সন্ত্রাসের সংগে সংগে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের টাকার বাজার এতটা ভীতি বিহ্বল হইয়া পড়ে যে, বিলাত হইতে অনেকেই নিজেদের অর্থপুঁজি একযোগে ব্যাপক ভাবে গুটাইতে থাকে। ইহার ফলে, ইংলণ্ডের স্বর্ণপুঁজি হঠাৎ এত হ্রাস পায় যে, ১৯৩১ সালে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করা ছাড়া তাহার আর গত্যন্তর থাকে না। ইংলণ্ডের এই স্বর্ণমান নির্বাসনের সংগে সংগে অন্যান্য দেশেও এই মুদ্রাব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে।

নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা (Managed Money) : যে কোন মুদ্রাব্যবস্থাই কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ-সাপেক্ষ। এমন কি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যে স্বর্ণমান বর্তমান ছিল, তাহাও সর্বৈব স্বয়ংক্রিয় ছিল না—উহারও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ কিছুটা প্রয়োজন হইত। অধুনা নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাব্যবস্থা বলিতে আমরা সেই অর্থ ব্যবস্থাকে বুঝি, যাহাতে অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা (inconvertible paper money) প্রচলন বর্তমান। এই ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দ্বারা কার্যকরী হয়। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের উপর নির্ভরশীল নহে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের চাহিদা মাফিক অর্থের যোগান পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে ও দামস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা রক্ষা করে। মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার বৈদেশিক বিনিময়-পত্র (foreign exchange) ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থির রাখা হয়। ১৯৪৪ সালে আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার (International Monetary Fund) স্থাপিত হওয়ায় বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত পাওনা মিটাইবার ও অর্থ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার যাহাতে নির্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া উঠানামা না করে, উক্ত তহবিল তাহার ব্যবস্থা করিয়াছে। আন্তর্জাতিক উদ্বৃত্ত পাওনা মিটাইতে ও মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার নির্ধারণ করিতে স্বর্ণকে যে ভিত্তি করিতে হইবে, তাহা আন্তর্জাতিক আর্থিক ভাণ্ডার মানিয়া লইয়াছে।

কাগজী মুদ্রামানের গুণ (Merits of Paper Standard) : কাগজী মুদ্রা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল। ধাতুমুদ্রার জন্য ধাতু সংগ্রহ করিতে প্রচুর মূলধন ও শ্রম বিনিয়োগ করিতে হয়। দেশে যদি কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়, তাহা হইলে মূলধন ও শ্রম-জনিত বিনিয়োগ ব্যয়-সংক্ষেপ করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কাগজী মুদ্রাব্যবস্থায় স্বর্ণমানের মত অত্যন্ত ব্যয়বহুল স্বর্ণ-সংরক্ষণ (gold reserves) রাখিবার প্রযোজন হয় না। শুধু নিরাপত্তার জন্য ও জনসাধারণের মনে বিশ্বাস স্থাপনের জন্য সীমিত স্বর্ণসংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। ইহাতে কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় ব্যয়-সংক্ষেপ হয়।

তৃতীয়তঃ, স্বর্ণমান মূল্যবান ধাতু মুদ্রা ; অধিকদিন প্রচলনের ফলে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ; ইহাতে মুদ্রায় ব্যবহৃত ধাতুর অপচয় হয়। কাগজী মুদ্রার এইরূপ অপচয়ের সম্ভাবনা নাই।

চতুর্থতঃ, কাগজী মুদ্রার আপেক্ষিক বহন-যোগ্যতা (portability) ও বেশী। অত্যধিক পরিমাণে প্রাপ্য অর্থ কাগজী মুদ্রার মাধ্যমেই মিটান অধিক স্থবিধা। কাগজী মুদ্রার প্রেরণ বাবদ পরিবহন খরচও অপেক্ষাকৃত কম পড়ে।

পঞ্চমতঃ, প্রচার নম্যতা কাগজী মুদ্রার আর একটি বিশেষ গুণ। দেশের ব্যবসায বাণিজ্যের চাহিদা অনুসারে অর্থযোগান উপযুক্তরূপে নিয়মিত করা এই ব্যবস্থায় খুব সহজ। আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ মনে করেন যে, দেশে যদি পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে নূতন অর্থ প্রচার বৃদ্ধি দ্বারা রাষ্ট্রের ব্যয় ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ করা একান্ত প্রয়োজনীয়। আর নূতন মুদ্রা প্রচার বৃদ্ধি কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থাতে অধিক স্থগম হয়।

পরিশেষে, রাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত দিক হইতে দেখিতে গেলেও, কাগজী মুদ্রার গুণ অস্বীকার করা যায় না। অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রার প্রচার বৃদ্ধি করিয়া সরকার ইচ্ছা করিলে বর্তমান করভার হ্রাস করিতে পারে, কিংবা অনেক কর মকুব করিতে পারে। তাহা ছাড়া, কাগজী মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি করিয়া সরকারী ঋণভারও অনেকাংশে কমান সম্ভব হয়।

কাগজী মুদ্রামানের অপগুণ (Demerits of Paper Standard) : কাগজী মুদ্রার সবচাইতে বড় অপগুণ এই যে, ইহার প্রচার বৃদ্ধি স্থগম হয় বলিয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটার সম্ভাবনা এই ব্যবস্থায় অত্যন্ত বেশী। কাগজী মুদ্রার তৈয়ারী খরচ অপেক্ষাকৃত কম এবং উহার যোগান নম্যতার দরুণ মুদ্রাস্ফীতির ভয় বেশী।

দ্বিতীয়তঃ, কাগজী মুদ্রার প্রচলন সীমাবদ্ধ ; কেননা, আন্তর্জাতিক প্রাপ্য দেনা মিটাইতে ইহার কোন উপযোগ নাই।

তৃতীয়তঃ, কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থায় মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার অত্যধিক উঠানামা করে ও ফলে, দেশের বহির্বাণিজ্য বিশেষভাবে বিপর্যস্ত হয়। এই বিনিময় হারের হ্রাস বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। আর, যে কোন নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করার অর্থই, দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পরিমাণ সংকোচন করা।

কিন্তু কাগজী মুদ্রার এই সকল অপগুণ থাকা সত্বেও মোটামুটিভাবে সর্বত্রই ইহার প্রচলন।

অনুশীলনী

1. What are the essentials of the gold standard? Distinguish between different forms of gold standard.
2. Describe the advantages and disadvantages of gold standard.

একত্রিংশ অধ্যায়

কর্জ ও ব্যাংক ব্যবসায় (Credit and Banking)

শুধু নগদ টাকার মাধ্যমেই বিনিময় কার্য সমাধা হয় না। বেশীর ভাগ বিনিময় কারবার সম্পন্ন হয়, ধারে, বা কর্জের মাধ্যমে। কর্জ কারবারের ভিত্তি হইল পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা। এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে টাকা ধার দেয় এই বিশ্বাসে যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ান্তে ঋণ-গ্রহীতা ঐ টাকা প্রত্যর্পণ করিবে। কিংবা, এক ব্যক্তি যদি আর এক ব্যক্তিকে দ্রব্য বিক্রয় করে এবং ঐ দ্রব্যের মূল্য কিছুকাল পরে গ্রহণ করিতে স্বীকার করে, সেখানেও ক্রেতার সততার উপর বিক্রেতার বিশ্বাস বা আস্থা আছে বলিয়াই লেন-দেন কারবার সম্ভব হইয়া থাকে। বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া যখন কেহ তাহার দ্রব্য বা অর্থের বর্তমান মালিকানা ভবিষ্যৎ প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতিতে ত্যাগ করে, তাহাই হয় তাহার কর্জ বা দাদন যোগান। কর্জের আবার রকম ফের হইতে পারে।

কর্জ কি ?

বাণিজ্যিক কর্জ ও ব্যাংক কর্জ (Commercial Credit and Bank Credit) : কর্জ বাণিজ্যিক কিংবা ব্যাংকের হইতে পারে। বাণিজ্যিক কর্জ বলিতে সেই ধার বুঝায়, যাহা এক ব্যবসাদার অন্য ব্যবসাদারকে দেয়। যেমন, পাইকারী কারবারী খুচরা কারবারীকে ধারে সামগ্রী বিক্রয় করে ; কিংবা মাল উৎপাদনকারী আড়তদারকে ধারে পণ্য সরবরাহ করে। উভয় ক্ষেত্রেই মাল বিক্রয়কারী মাল সরবরাহ করিয়া পাওনা টাকা পাইবার জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করে ; নগদ দাবী করে না।

কিন্তু, অনেক সময় বিক্রেতা মাল বিক্রয় করিয়া পাওনা টাকার জন্য অপেক্ষা করিতে পারে না। বিক্রেতার পাওনা মিটাইবার জন্য খরিদদারকে হয় নগদ মূল্য দিতে হয় ; কিংবা ব্যাংকের নিকট হইতে ধার করিতে হয়। ব্যাংকের নিকট হইতে ধার করিয়া যখন খরিদদারকে পাওনা মিটাইতে হয়, তখন উহাকে ব্যাংক কর্জ বলে। এই ব্যাংক ঋণ বিভিন্ন কর্জ-পত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করা যায়—যথা, ব্যাংক নোট, হুণ্ডি, ব্যাংক ড্রাফ্‌ট, ধারপত্র (letter of credit), ভ্রমণকারীর চেক্‌ (travellers' cheques) ইত্যাদি। এই সকল কর্জপত্র দ্বারা যখন খরিদদার মাল বিক্রেতার পাওনা মিটায়, তখন প্রাপ্য মিটাইবার প্রতিশ্রুতি ব্যাংকের ঘাড়ে যাইয়া পড়ে। অনেক সময় আমানত ব্যবসায় করিতে ইচ্ছুক এমন মক্কেলকেও ব্যাংক দাদন দিয়া থাকে। ইহাকেও ব্যাংক কর্জ বলা হয়।

রকমারি কর্জপত্র (Different Types of Credit Instruments) : যে দলিলে কর্জগ্রহীতার ঋণ পরিশোধ করিবার অঙ্গীকার বা বাধ্যবাধকতা লিপিবদ্ধ থাকে এবং যাহার বলে নির্দিষ্ট সময়ান্তে কর্জদাতা কর্জ আদায় করিতে পারে, তাহাকে কর্জপত্র বলে। বিভিন্ন উপায়ে কর্জ যোগান দেওয়া হইয়া থাকে এবং সংগে সংগে কর্জ গ্রহীতার বাধ্যবাধকতার বিধিনিষেধও বিভিন্নরকমের হয়। ফলে, কর্জপত্রও রকমারি হয়।

প্রমিসরি নোট (Promissory Notes) : ইহা এমন একটি লিখিত অঙ্গীকার পত্র, যাহা দ্বারা ঋণ গ্রহীতা বিনা সর্তে চাহিদা মাত্র ঋণদাতাকে বা তাহার মনোনীত অন্য কোন বক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদান করিতে প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতিপত্র জনসাধারণের মধ্যে ব্যাংক, কিংবা সরকার প্রচার করিতে পারে। অধুনা যে সকল প্রমিসরি নোট কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকার দ্বারা প্রচারিত হয়, তাহাই বিহিত মুদ্রারূপে প্রচলিত।

ব্যাংক নোট (Bank Notes) : ব্যাংক নোট ব্যাংকের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পত্র। ব্যাংক এই কর্জপত্র চাহিবা মাত্র বিহিত মুদ্রায় (legal tender) বিনিময় করিতে অঙ্গীকারবদ্ধ থাকে। এই ধরণের কর্জপত্রের প্রচলন ততদিনই বলবৎ থাকে, যতদিন ব্যাংকের আর্থিক স্বচ্ছলতার উপর জনসাধারণের আস্থা থাকে। অধুনা ব্যাংকের নোট প্রচার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট-প্রচার ক্ষমতার অধিকারী।

সরকারী নোট (Government Notes) : সরকারী নোট ব্যাংক নোটেরই অনুরূপ। তবে ব্যাংক নোট কেবল মাত্র সেই সকল লোকের মধ্যে প্রচলিত, যাহাদের ব্যাংকের স্বচ্ছলতার উপর আস্থা আছে ; কিন্তু সরকারী নোট বিহিত মুদ্রা ও উহার প্রচলনও অঙ্গীকারবদ্ধ। সরকারী নোট বিনিমেয় ; জনসাধারণ ইচ্ছা করিলে উহা দেশের মুদ্রামান বা স্বর্ণে বিনিময় করিয়া লইতে পারে।

হুণ্ডি (Bill of Exchange) : এই দলিলপত্রে মাল বিক্রেতার মাল খরিদদারের উপর নির্দেশ থাকে যে, নির্দিষ্ট সময়ান্তে তাহাকে (মাল ক্রয়কারীকে) একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা পাওনা বাবদ শোধ করিতে হইবে। যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা একই দেশের মধ্যে বর্তমান ও লেন-দেন একই দেশের মধ্যে ঘটে, সেখানে দলিলপত্র হইবে দেশী হুণ্ডি (inland bill)। আর ক্রেতা ও বিক্রেতা যদি বিভিন্ন দেশের হয়, তাহা হইলে যে দলিলপত্রের মাধ্যমে দেনা পানা মেটে, তাহাকে বৈদেশিক হুণ্ডি বলে।

হুণ্ডি মাল ক্রয়কারীর সমর্থিত প্রতিশ্রুতি পত্র। সে এই দলিলপত্রে অঙ্গীকার করে যে, নির্দিষ্ট সময়ান্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ সে বিক্রেতাকে কিংবা হুণ্ডি-বাহককে প্রদান করিবে। এই দলিলপত্রে নির্দিষ্ট অর্থ সাধারণতঃ ৩০ দিন, ৬০ দিন, কিংবা ৯০ দিন বাদে মাল বিক্রেতাকে প্রদান করা হয়। আধুনিক জগতে ব্যবসায় কারবার ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পাওনা মিটাইতে হুণ্ডি বিশেষ সহায়তা করে। এই দলিলপত্র ব্যবহারের ফলে নগদ মুদ্রা ব্যয়-সংক্ষেপ করাও সম্ভব হয়।

চেক্ (Cheque) : চেক্ হুণ্ডির মতই আর একটি কর্জপত্র। তবে হুণ্ডি হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, চাহিবামাত্র চেকে লিখিত অর্থ পরিমাণ প্রদান করিতে ব্যাংকের বাধ্যবাধকতা আছে। পরস্পর পরিচিত বা আস্থা সম্পন্ন লোকের মধ্যে নগদ মুদ্রায় দেনা-পাওনা না হইয়া চেকের মারফতে কারবার চলিতে পারে। চেক্‌কে মুদ্রার পরিবর্তক (substitute) বলা যায়।

ব্যাংক ড্রাফ্‌ট (Banker's Draft) : যে কর্জপত্রের মারফৎ একটি ব্যাংক আর একটি ব্যাংকের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করে, তাহাকে ব্যাংক ড্রাফ্‌ট বলে। সাধারণতঃ, কোন ব্যাংকের যখন আর্থিক কৃচ্ছ্রতা চরমে পৌঁছে, তখনই উহা এইরূপ দলিল পত্রের মারফৎ অর্থকর্জ গ্রহণ করিয়া থাকে।

নোট ও চেকের মধ্যে পার্থক্য (Differences between Notes and Cheques) : সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দ্বারা প্রচারিত নোট বিহিত মুদ্রা ; কিন্তু চেক্ বিহিত মুদ্রা নয়। চেকের সীমিত প্রচলন, উহা পরস্পর পরিচিত ও আস্থাসম্পন্ন লোকের মধেই কেবল চালু হইয়া থাকে। সরকারী বা কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রচারিত নোট আসলে মুদ্রা এবং মুদ্রার মতই উহা সর্বজন গৃহিতব্য। কিন্তু চেক্ হইল মুদ্রার পরিবর্তক বিশেষ। চেক্ গ্রহনীয় কি না, তাহা নির্ভর করে চেক্ যে ইস্যু করিতেছে তাহার উপর, গ্রহীতার আস্থা।

নোটের দ্বারা যদি ঋণ পরিশোধ করা হয় কিংবা মাল ক্রয় বাবদ মূল্য প্রদান করা হয়, তাহা হইলে ঋণদাতা ও মাল বিক্রয়কারী উহা গ্রহণ করিতে বাধ্য। কিন্তু চেকের মাধ্যমে পাওনা পরিশোধ অগ্রাহ্য হইতে পারে। চেক আইনতঃ চালু নহে ; কিন্তু নোট আইন-সম্মত কর্জপত্র। চেকের আদান প্রদান পরস্পর পরিচিত বক্তির মধ্যে সীমায়িত। তাহা ছাড়া, চেকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত লেন-দেন কারবার সম্পূর্ণভাবে সমাধা হয় না। নোটের যেমন লেন-দেন কারবার সমাধা করিবার ক্ষমতা (liquidating power) আছে, চেকের তাহা নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কিংবা সরকার প্রচারিত নোট ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অর্থ পরিমাণের হইয়া থাকে ; কিন্তু চেক ব্যাংকের আমানতের পরিমাণ অনুযায়ী যে কোন অর্থ পরিমাণের কাটা যায়। নোট প্রচারের জন্য দেশের আইন অনুসারে সংরক্ষণ রাখিতে হয়। কিন্তু চেক নগদ মুদ্রায় পরিবর্তন করিতে ব্যাংকের যে সংরক্ষণ পুঁজি প্রয়োজন, তাহা প্রত্যেক ব্যাংকের স্বকীয় মত অনুসারে সংরক্ষিত হয়। অবশ্য এ বিষয়েও দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক সম্পর্কীয় প্রচলিত সাধারণ আইন অবজ্ঞা করা চলে না।

কর্জ কি মূলধন ? (Is Credit Capital ?) : মূলধন বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি উৎপাদনের পুঁজিপাতি অর্থাৎ কল-কব্জা, যন্ত্রপাতি, সাজ-সরঞ্জাম প্রভৃতি উৎপাদক দ্রব্য। এই অর্থে কর্জকে মূলধন বলা যায় না। কিন্তু কর্জ উৎপাদক দ্রব্য না হইলেও উৎপাদক দ্রব্য ক্রয় করিতে সহায়তা করে। কর্জ বা অর্থ দাদন দ্বারা উৎপাদক বা ব্যবসায়ী কারবারী উৎপাদনের বিভিন্ন

পুঁজিপাতি সংগ্রহ করিতে পারে। কর্জ মূলধন নয় বটে, কিন্তু ইহাদ্বারা মূলধনের মালিকানা বা স্বত্ব অর্জন করা যায়। সেই হিসাবে দেখিতে গেলে মূলধন বা উৎপাদক দ্রব্যের গুণ কর্জের আছে। ইহা অবশ্য সত্য যে, কর্জ যোগান সম্প্রসারণের দ্বারা কোন দেশের মোট মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায় না। তবে কর্জ যোগান দ্বারা ব্যাংক মূলধন হস্তান্তরিত করিতে পারে। কর্জ যখন এই মূলধন হস্তান্তরিত করিতে সহায়তা করে, তখন উহাকে দাদন মূলধন (Loan Capital) বলা চলে।

কর্জ ব্যবস্থার গুণ (Merits of the Credit System) : কর্জ ব্যবস্থার প্রধান গুণ এই যে, ইহাতে পারস্পরিক দেনা পানা নগদ মূল্যের মাধ্যমে না হওয়ায়, মুদ্রা ব্যবহার সংক্ষেপ করা সম্ভব হয়। কর্জ পত্রের মাধ্যমে, দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক দেনা পাওনা পরিশোধ করা সহজ ও সুবিধা হয়। বিশেষ করিয়া, যে ক্ষেত্রে মোটা টাকা পরিশোধ করিতে হয়, সেখানে কর্জ পত্র দ্বারা প্রাপ্য অর্থ আদান প্রদান করা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়-সাপেক্ষ।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত পাওনা মিটাইতে যখন কর্জপত্র ব্যবহার করা হয়, তখন একদেশ হইতে অন্য দেশে মূল্যবান ধাতু, বিশেষ করিয়া স্বর্ণ প্রেরণের প্রয়োজন হয় না। মূল্যবান্ ধাতু প্রেরণ করিতে যে ঝুঁকি বহন করিতে হয় ও ব্যয় বাহুল্য ঘটে, কর্জপত্র ব্যবহারে তাহা হইতে রেহাই পাওয়া যায়।

কর্জ ব্যবস্থা দেশের উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া থাকে। দাদন ব্যবস্থার মাধ্যমেই যাহারা ঝুঁকি বহুল বিনিয়োগ করিতে অনিচ্ছুক, তাহাদের হাত হইতে যাহারা বিনিয়োগ করিতে ইচ্ছুক, তাহাদের হাতে মূলধন আসিয়া পড়ে।

পরিশেষে, আধুনিক দেশ সমূহে কারবার ও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত দেনা পানার মোটা অংশই কর্জপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। ফলে, দেশের দাদন যোগান দেশের দামস্তরকে বিশেষ ভাবে প্রভাবান্বিত করে। এই দাদন যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা দেশের মুদ্রা অধিকর্তা যথাযথ ভাবে দামস্তর নিয়মিত করিতে পারে।

কর্জ ব্যবস্থার অপগুণ (Demerits of the Credit System) : কর্জ ব্যবস্থার বহু গুণ থাকা সত্বে ও, উহার কতকগুলি অপগুণ অস্বীকার করা যায় না।

কর্জ যোগান যদি আত্যন্তিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে দেশে অর্থের প্রচলন বৃদ্ধি পাইবে। এই মুদ্রা সম্প্রসারণের ফলে, দামস্তর অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি পাইয়া সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে।

দ্বিতীয়তঃ, কর্জ ব্যবস্থা সম্প্রসারণের ফলে ষ্টক ও শেয়ার বাজারে ফাট্‌কা কারবার বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে শেয়ার ও ষ্টকের মূল্য অস্বাভাবিক রূপে উঠানামা করে। ইহাতে শেয়ার ও ষ্টক বাজারে মূলধন বিনিয়োগ করিবার ঝোঁক বাড়ে।

তাহা ছাড়া, দাদন যোগান যদি আত্যন্তিক সম্প্রসারিত হয়, তাহা হইলে এক চেটিয়া জোট ব্যবসায়ের উদ্ভব ও সহজ সাধ্য হয় ; কেননা, অর্থপুঁজি যোগানের তখন কোনই অভাব হয় না।

নোট প্রচারের নীতি (Principles of Note-issue) : কাগজী নোট প্রচারের নীতি সম্পর্কে দুইটি বিরুদ্ধ নীতি আছে : একটি **মুদ্রা নীতি** (Currency Principle) আর একটি **ব্যাংকিং নীতি** (Banking Principle)। যাহারা প্রথম নীতির সমর্থক তাহারা বলেন, কাগজী মুদ্রা স্বর্ণ মুদ্রারই সত্তা পরিবর্তক বিশেষ। কাগজী মুদ্রাকে স্বর্ণ মুদ্রায় বিনিময় করিবার জন্য, মুদ্রা অধিকর্তা যত মূল্যের কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবে, ঠিক তত মূল্যের স্বর্ণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। যদি প্রচারিত কাগজী নোটের মূল্যের সমান স্বর্ণ সংরক্ষিত না হয়, তাহা হইলে কাগজী নোটের বিনিময় সমস্যা দেখা দিতে পারে ও মুদ্রা ব্যবস্থার উপর সাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

মুদ্রা নীতি (Currency Principle)

মুদ্রা নীতির একটি বড় গুণ এই যে, এই ব্যবস্থাতে মুদ্রা অধিকর্তা নিজের খাম খেয়াল অনুসারে নোটের প্রচার হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে পারে না। নোটের যোগান নির্ভর করে স্বর্ণ সংরক্ষেণের উপর ; ফলে, স্বর্ণ যোগানের হ্রাস-বৃদ্ধি দেশের মুদ্রা ব্যবস্থাকে নিযমিত করে। তবে এই ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে, ইহা দেশের মুদ্রা যোগানকে অনম্য করিয়া তোলে। কেননা, স্বর্ণ প্রাকৃতিক দান ; ইহার যোগান সীমিত ও অনম্য।

ব্যাংকিং পদ্ধতির পৃষ্ঠপোষক যাহারা তাহারা বলেন যে, মোট প্রচারিত কাগজী নোটের কিছুটা পরিমাণ স্বর্ণ মুদ্রাতে বিনিময়ের জন্য তাগিদ আসে বটে, কিন্তু প্রচলিত সমস্ত কাগজী মুদ্রা এক সংগে বিনিময়ের জন্য মুদ্রা অধিকর্তার নিকট উপস্থাপিত হয় না। সুতরাং, প্রচারিত কাগজী নোটের মোট মূল্যের শতকরা কিছুটা অংশ, অর্থাৎ প্রচারিত নোটের মোট মূল্যের একটা অনুপাত যদি সংরক্ষণ হিসাবে রাখা হয়, তাহা হইলেই বিনিময়ের কোন অসুবিধা হয় না। বিনিময়ের

ব্যাংকিং নীতি (Banking Principle)

তাগিদ দেখিয়াই সংরক্ষণের এই শতকরা হার কিংবা অনুপাত ব্যাংককে ধার্য করিতে হয়।

ব্যাংকিং পদ্ধতিতে নোট প্রচারের সুবিধা এই যে, ইহা মুদ্রা ব্যবস্থাকে নম্য করে। সমাজের চাহিদা মাফিক অর্থ যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি করা এই ব্যবস্থায় সম্ভব হয়। তাহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত কম সংরক্ষণ রাখিতে হয় বলিয়া ইহা ব্যয় বহুলও নয়। তবে এই ব্যবস্থায় যে ব্যাংক নোট প্রচার করে, উহার দায়িত্ব খুব বেশী। দেশের প্রয়োজনানুসারে উহাকে কাগজী মুদ্রা প্রচার, সম্প্রসারণ ও সংকোচন করিয়া দামস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা বজায় রাখিতে হয়।

নোট প্রচার নিয়মিত করিবার রকমারি পদ্ধতি (Methods of Regulating Note-issue) : সংরক্ষণ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া কাগজী মুদ্রার প্রচার নিয়মিত করিতে হয়। সংরক্ষণ পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের আবার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। আমরা এই বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করিতেছি।

(১) স্থির ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি (Fixed Fiduciary System) : এই ব্যবস্থায় একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্য্যন্ত কাগজী নোট প্রচারের জন্য কোনই সংরক্ষণ প্রয়োজন হয় না। এই নির্দিষ্ট পরিমাণকে ফিডিউশিয়ারী সীমা (fiduciary limit) বলা হয়। এই নির্দিষ্ট সীমার চেয়ে যত বেশী পরিমাণ কাগজী মুদ্রা প্রচার করা হইবে, উহার জন্য ঠিক তত মূল্যের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইংলণ্ডে ১৮৪৪ সাল হইতে এই পদ্ধতি বলবৎ রহিয়াছে, অন্যত্রও ইহার প্রচলন আছে।

তবে এই পদ্ধতির অসুবিধা এই যে, ইহাতে অযথা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় অনেকটা পরিমাণ ধাতু সংরক্ষণ রাখিতে হয়; সেই জন্য এই ব্যবস্থা ব্যয় বহুল। তাহা ছাড়া, ইহা দেশের অর্থ-যোগানকে অনম্য করিয়া থাকে। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য সম্প্রসারণের সংগে সংগে, প্রয়োজন বোধে এই পদ্ধতির পরিমার্জন অনিবার্য হইয়া পড়ে। ইংলণ্ডেই কয়েকবার ফিডিউশিয়ারী সীমা বাড়াইয়া দিয়া, দেশের চাহিদা অনুসারে কাগজী মুদ্রার প্রচার বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে।

(২) চরম ফিডিউশিয়ারী পদ্ধতি (Maximum Fiduciary System) : এই ব্যবস্থাতে দেশের আইন নির্ধারণ করিয়া দেয়, উচ্চতম কতটা পরিমাণ পর্য্যন্ত কাগজী নোট কোন স্বর্ণ সংরক্ষণ ব্যতীত প্রচার করা চলিবে। সাধারণতঃ, স্বাভাবিক অবস্থায় এই নোটের পরিমাণ ধার্য করা হয়, গড়পড়তা বাৎসরিক

প্রচলিত নোটের পরিমাণের চেয়ে অনেক বেশী; প্রয়োজন হইলে নোটের উচ্চতম পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

এই ব্যবস্থার বড় গুণ এই যে, ইহা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা যতটা সম্ভব অর্পণ করে। ইহাতে অযথা স্বর্ণ সংরক্ষণের প্রয়োজন হয় না; আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যথেচ্ছাচার ভাবে নোটের প্রচার বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতিও ঘটাইতে পারে না; কেননা, নোটের সর্বোচ্চ ফিডিউশিয়ারী সরকারী আইন ধার্য করিয়া দেয়। ফ্রান্সে এই ব্যবস্থা ১৯২৮ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।

(৩) আনুপাতিক সংরক্ষণ ব্যবস্থা (Proportional Reserve System): এই ব্যবস্থায় প্রচারিত মোট নোটের, কিছুটা স্বর্ণ সংরক্ষণ প্রয়োজন হয়। এই স্বর্ণ সংরক্ষণের অনুপাত দেশের আইন নির্দেশ করিয়া দেয় এবং উহা শতকরা ২৫ হইতে ৪০ এর মধ্যে উঠানামা করে। এই ব্যবস্থাটি প্রথম মহাযুদ্ধের পর বিশেষ কদর লাভ করিয়াছিল। Hilton Young কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ভারতীয় Reserve Bank ও মুদ্রা প্রচারের এই নীতি বা পদ্ধতি গ্রহণ করিয়াছে।

এই ব্যবস্থার গুণ হইল, ইহা মুদ্রা প্রচার সম্প্রসারণের অনুকূল; কিন্তু ইহার বড় অপগুণ এই যে, মুদ্রা যোগান সংকোচনের পক্ষে ইহা একান্ত অনুপযোগী। সংরক্ষিত স্বর্ণ মুদ্রা কমাইয়া লইলে, প্রচারিত নোটের পরিমাণ অনেকটা সংকোচন করিতে হয়। তাহাতে প্রচলিত মুদ্রা যোগানের পরিমাণ আত্যন্তিক ভাবে হ্রাস পায়। ইহা ছাড়া, এই ব্যবস্থায়ও অনেকটা পরিমাণ স্বর্ণ অনাবশ্যক-ভাবে আটক করিয়া রাখিতে হয়।

(৪) আনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতি: একটু মার্জিত সংস্করণ হিসাবে আর একটি মুদ্রা ব্যবস্থা সম্ভব হইতে পারে। কীনসের বিনিময় নিয়ন্ত্রণের (Exchange management) সহিত ইহার সাদৃশ্য দেখা যায়। অনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতিতে কাগজী মুদ্রা প্রচারের জন্য শতকরা যে পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণ রাখিতে হয়, এ ব্যবস্থাতে ঐ সংরক্ষণের মোট বা কিছুটা স্বর্ণরূপে না রাখিলেও চলে। কিছুটা সংরক্ষণ বিল (bill), কিংবা নগদ টাকায় বৈদেশিক ব্যাংকে রাখা যাইতে পারে। অবশ্য, বিদেশের অর্থ ব্যবস্থা স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত থাকা চাই।

এই ব্যবস্থাতে স্বর্ণের ব্যবহার কম লাগে সত্য, কিন্তু ইহা মুদ্রা ব্যবস্থাকে

সুঠাম করিতে পারে না। কেননা, বিদেশের মুদ্রার প্রচার বৃদ্ধির সংগে যখন ঐ মুদ্রা মূল্য হ্রাস পায়, তখন বিদেশে মুদ্রার কুফল সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মুদ্রা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে। তাহা ছাড়া, অনুপাতিক সংরক্ষণ পদ্ধতির অন্যান্য অপগুণগুলিও এ অর্থ ব্যবস্থায় একইভাবে বর্তমান দেখা যায়।

নোট প্রচারের প্রকৃত নীতি কি? (Right Principle of Note Regulation?): আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত এই যে, কোন ধরাবাঁধা আইন দ্বারা নোটের প্রচার পরিমাণ ও স্বর্ণ সংরক্ষণ পরিমাণের মধ্যে একটা সম্বন্ধ নির্দেশ করিয়া দিয়া, মুদ্রা অধিকর্তার অর্থ যোগান নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সীমিত না করা। অধুনা একমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই কাগজী মুদ্রা প্রচারের ক্ষমতা অর্পণ করা হইয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রচারিত নোট আভ্যন্তরীণ ব্যবহারের জন্য স্বর্ণপিণ্ডে বিনিমেয় নহে। কাগজী মুদ্রার পিছনে বিনিময়ের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণ আছে, কিংবা নাই, সে বিষয়ে জনসাধারণ সম্পূর্ণ উদাসীন থাকে। যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের অর্থ জন সাধারণ স্বীকৃতি পাইয়া অবাধ প্রচলিত থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুদ্রা ব্যবস্থার উপর জন সাধারণের আস্থাবান থাকে। তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যাহাতে ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা অতিরিক্ত মুদ্রা প্রচার করিয়া মুদ্রাস্ফীতি না ঘটায়, সেই চরম অবস্থার প্রতিবন্ধক হিসাবে ব্যাংকের প্রয়োজন, নিম্নতম কিছুটা পরিমাণ স্বর্ণ সংরক্ষণ মজুত রাখা। নিম্নতম স্বর্ণ সংরক্ষণের আর ও প্রয়োজন আছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কীয় প্রাপ্য দাবী পরিশোধের জন্য। দেশের বহির্বাণিজ্যের পরিমাণ যত বিস্তৃতি লাভ করিবে, কিংবা আন্তর্জাতিক ঋণ যত বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণ সংরক্ষণ পরিমাণ ও তত বেশী বৃদ্ধি করিতে হইবে।

তবে আইন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বর্ণ সংরক্ষণ পরিমাণ ধার্য করিয়া দিয়া মুদ্রা প্রচার নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা প্রবর্তন করা, আর্থিক অপচয় ও খামখেয়ালীর নামান্তর মাত্র। 'Not only is a minimum of gold reserve a wasteful way regulating the volume of currency, it is also a most capricious one'. আইন নির্দিষ্ট স্বর্ণ সংরক্ষণ অচল অলস, অবস্থায় নিষ্ক্রিয় পড়িয়া থাকে। অথচ আইন নির্ধারিত সংরক্ষণ না রাখিতে হইলে, ঐ স্বর্ণ দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময়ের ব্যবস্থাও ঋণ পরিশোধের আয়োজন অনায়াসে করিতে পারে। তাহা ছাড়া, আইন নির্দিষ্ট নিম্নতম স্বর্ণ সংরক্ষণ বজায় রাখিলেই অর্থের মূল্য বা দামস্তরের স্থিতি স্থাপকতা রক্ষা করা যায় না। অর্থের মূল্য

বা দামস্তরের স্থিতি-সাম্য স্থাপন করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে নোট প্রচার সম্পর্কে অসীমিত ক্ষমতা প্রদান করিতেই হইবে।

অনুশীলনী

1. Distinguish between bank credit and commercial credit. Show how they serve our society.
   (C. U. B. A. '53)
2. Point out the influence of credit on production.
   (C. U. B A. '54)
3. Distinguish between notes and cheques. Is credit capital?
4. What principles should govern note-issue?

দ্বিত্রিংশ অধ্যায়

ব্যাংকিং (Banking)

ব্যাংকিং এর ব্যাপক মানে, অর্থ সংক্রান্ত লেনদেন কারবার। ব্যাংক বলিলে এমন একটি সংস্থা বুঝায়, যাহা সাধারণের নিকট হইতে অর্থ আমানত গ্রহণ করে ও সাধারণের প্রয়োজনানুসারে অর্থ দাদন বা কর্জ দেয়। ব্যাংকের প্রধান কার্য হইল, কর্জ সংক্রান্ত লেনদেন কারবার চালান। 'A Banker is a dealer in debt, his own and other peoples'. (Crowther) A bank is a "financial intermediary, a dealer in loans and in debts."

ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Bank): আধুনিক জগতে রকমারি ব্যাংকের উদ্ভব হইয়াছে। এক এক রকম ব্যাংকের আবার এক এক ধরণের কারবার করিতে হয়। কিন্তু কতকগুলি কাজ সাধারণ ভাবে সকল ব্যাংককেই করিতে হয়। ব্যাংকের এই সাধারণ কার্যাবলী কি তাহাই আমরা আলোচনা করিতেছি।

ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ, সাধারণের হাতের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করা। এই আমানত সাধারণতঃ দুই পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়।

প্রথমতঃ, জনসাধারণ বিহিত মুদ্রা ব্যাংকে জমা দিতে পারে। ব্যাংক ঐ টাকা আমানত হিসাবে গ্রহণ করিয়া আমনতকারীকে চেক্ দ্বারা ঐ টাকা তুলিয়া লইবার সুযোগ দেয়। **দ্বিতীয়তঃ**, ব্যাংক উহার মক্কেলকে অর্থদাদন দিয়া আমানত সৃষ্টি করিতে পারে। ঋণ গ্রহীতার নামে তখন একটি আমানত হিসাব খোলা হয় এবং সে প্রয়োজন অনুপাতে ঐ আমানতী অর্থ ব্যবহার করিতে পারে। ব্যাংকের আমানত **চল্‌তি** (current) ও **স্থায়ী** (fixed), দুই রকম হইতে পারে। চল্‌তি আগানতের টাকা যখন খুসী তুলিয়া লওয়া যায় ; আর স্থায়ী আমানতেব টাকা নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তুলিয়া লওযা চলে। যে কোন আমানতই ব্যাংক গৃহীত ঋণ ও ব্যাংকের দায় (liability)।

সাধারণের হাতের উদ্বৃত্ত অর্থ আমানত হিসাবে গ্রহণ করা

ব্যাংকের **দ্বিতীয় ক্রিয়া** অর্থ আগাম দেওয়া বা দাদন দেওযা। ব্যাংকের মোট আমানত টাকা আমানতকারীরা এক সংগে তুলিয়া লয় না। অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাংক বুঝিতে পারে, মোট আমানতের কতটা অনুপাত আমানতকারীরা তুলিয়া লইতে পারে। সেই অনুপাতের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ী বা কারবারীকে আগাম ও দাদন দিয়া থাকে। ব্যাংক বিল ভাঙ্গান দ্বারা অর্থ অগ্রিম দিতে পারে ; কিংবা উপযুক্ত জামিনপত্র, ষ্টক্, শেয়ার পত্র, জমানত সামগ্রী, কিংবা ঋণ গ্রহীতার স্বীকৃতি পত্র প্রভৃতির বিনিময়ে দাদন দিয়া থাকে।

অর্থ আগাম ও দাদন দেওয়া

ব্যাংকের **আর একটি প্রধান কাজ**, নোট, চেকপত্র প্রভৃতি প্রচার কবিয়া উহাদের দ্বারা বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা। আমানত গ্রহণ করিযা ব্যাংক যে স্বীকৃতি পত্র দিয়া থাকে, উহা কাগজী মুদ্রার মত প্রচলিত হয। অধুনা অবশ্য দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকই নোট বা কাগজী মুদ্রা প্রচার করিবার একমাত্র অধিকর্তা। অন্যান্য ব্যাংক নোটের পরিবর্তে চেক পত্র প্রচার করিয়া বিনিময়ের সুবিধা সৃষ্টি করে। ব্যাংক প্রচারিত চেকপত্র নোটের মতই বিনিময় মাধ্যম ; নোটের মত উহা ভাঙ্গানও চলে।

বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করা

উপরি উক্ত তিনটি প্রধান কাজ ছাড়া, ব্যাংক **আরও ছোট খাটো কাজ** করিয়া থাকে। গ্রাহক বা মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংক অনেক কাজ করিয়া থাকে। মক্কেলের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যাংক চেকপত্র, হুণ্ডি, বিল, লভ্যাংশ, বীমার কিস্তির টাকা (premium) প্রভৃতি সংগ্রহ করে এবং মক্কেলের হইয়া মিটাইয়া থাকে। গ্রাহকের হইয়া

অন্যান্য কার্যাবলী

ব্যাংক শেয়ার পত্র ও সিকিউরিটি পত্র ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। দেশের বহির্বাণিজ্য সংক্রান্ত দেনাপানাও ব্যাংকের মাধ্যমেই হইয়া থাকে। বিনিময় বিলপত্র সংগ্রহ ও স্বীকার করিয়া, ব্যাংক আন্তর্জাতিক কারবারীকে অর্থ আগাম বা দাদন দিয়া থাকে। ব্যাংক মক্কেলের মূল্যবান পুঁজিপাতি, শেযারপত্র, সম্পত্তির দালল, দস্তাবেদ প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং বিভিন্ন ধরণের কর্জ পত্র প্রচার করিয়া গ্রাহকের লেন দেনের সুযোগ ও সহায়তা করিয়া থাকে। গোটা অর্থ ব্যবস্থার দিক হইতে দেখিতে গেলে বলা যায় যে, ব্যাংক চল্‌তি বা নগদ মুদ্রা সরবরাহের সংস্থা বিশেষ। জন সাধারণের আমানত সংগ্রহ করিযা, তাহা দ্বারা দেশের অর্থ ব্যবস্থাকে চল্‌তি টাকা যোগান দেওয়া ব্যাংকের অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উপরি উক্ত কার্যাবলী দেশের সকল ব্যাংকই যে সম্পন্ন করে, তাহা নহে। দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকই সাধারণতঃ ঐ কাজগুলি করিয়া থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের স্থিতি পত্র (Balance Sheet of a Commercial Bank) : ব্যাংকের কার্যবলী সম্পর্কে আর ও সুস্পষ্ট ধারণা ও জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, ব্যাংকের স্থিতিপত্র বিশ্লেষণ করিতে হয়। ব্যাংকের মোট দেনা (liabilities) ও পরিসম্পৎ (assets) সম্পর্কীয় বিজ্ঞপ্তিই উহার স্থিতিপত্র। ব্যাংকের দেনা বলিতে আমরা বুঝি, ব্যাংকের নিকট অপরের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ। আর পরিসম্পৎ বলিতে বুঝি, অপরের কাছে আইনতঃ ব্যাংকের প্রাপ্য অর্থ পরিমাণ ও মালিকানা স্বত্ব পুঁজি। সাধারণতঃ, যে সকল ব্যাংক অল্প-মেয়াদী ব্যবসায় কারবার সংক্রান্ত লেনদেন ব্যাপারে নিযুক্ত, উহারা উহাদের পরিসম্পৎ চল্‌তি অর্থেই জমা রাখে, যাহাতে ঐ জমা সম্পৎ হইতে সহজেই নগদ টাকা তুলিতে পারে। ব্যাংকের মোট দেনার খাতে কি কি বিষয় ধরা হয়, আর পরিসম্পতের খাতেই বা কি কি বিষয় ধরা হয়, আমরা তাহা বিশদভাবে আলোচনা করিতেছি।

ব্যাংকের দেনার খাতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ধরা হয়।

১) আদায়ী মূলধন (Paid-up capital)

২) সংরক্ষিত তহবিল (Reserve funds)

৩) অবণ্টিত লভ্যাংশ (Undivided profits)

৪) চল্‌তি আমানত (Current deposits)

৫) সাকরাণ (Acceptances) প্রভৃতি।

(১) ব্যাংকের পুঁজি-সম্পত্তি সংগ্রহ করা হয় কিছুটা অংশীদারদের নিকট হইতে, আর কিছুটা আমানতকারীদের নিকট হইতে। যে পুঁজি বা মূলধন অংশীদারদের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হয়, উহাকে আদায়ী মূলধন বলে। এই আদায়ী মূলধন ব্যাংকের দেনা বিশেষ।

(২) ব্যাংকের লভ্যাংশের যে অংশটা বণ্টিত হয় না, তাহা হইতে ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিলের জন্ম। বিপদ কালে অর্থকৃচ্ছতার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য এই তহবিলের প্রয়োজন। এই সংরক্ষিত তহবিল ও অংশীদারদের নিকট ব্যাংকের দেনা বিশেষ।

(৩) অবণ্টিত মুনাফা, অর্থাৎ যাহা লভ্যাংশ হিসাবে পরে অংশীদারদের মধ্যে বণ্টন করা হয়, তাহাও অংশীদারদের নিকট ব্যাংকের দায়।

(৪) ব্যাংকের মোট দেনার একটা মোটা অংশ, ইহার আমানত। আমানত আবার চল্‌তি (current), কিংবা স্থায়ী (fixed) হইতে পারে। চল্‌তি আমানতের জন্য সাধারণতঃ ব্যাংককে কোন সুদ দিতে হয় না : আমানত কারী উহা চাহিবা মাত্র চেক দ্বারা ব্যাংক হইতে তুলিয়া লইতে পারে। ভারতবর্ষে অবশ্য চলতি আমানতের জন্য ও সামান্য সুদ দেওয়া হইয়া থাকে। স্থায়ী আমানতের জন্য ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। আমানতকারী উহা চাহিবা মাত্র চেক্ দ্বারা তুলিয়া লইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়া এই আমানতের টাকা তুলিতে হয়। অনেক দেশে (যেমন, মার্কিণ দেশে) আমানতকে মেয়াদা-জমা বলে (time-deposits)। ইহা ছাড়া, ব্যাংক অনেক সময় মক্কেলের হইয়া হুণ্ডি বা বিলপত্র স্বীকার করিয়া লয়। ইহাকে সাকরাণ বলে। হুণ্ডি বা বিলপত্রের সাকরাণ অর্থই, উহাতে যে টাকার পরিমাণ লিখিত থাকে তাহা মক্কেল নির্দিষ্ট সময়ে না দিতে পারিলে ব্যাংকের দায় হইয়া পড়ে। এই ধরণের সাকরাণকে ব্যাংকের সম্ভাব্য দায় (contingent liabilities) বলা হইয়া থাকে।

ব্যাংকের পরিসম্পৎ বলিতে, অংশীদারের আদায়ী মূলধন ও আমানতকারীর আমানত টাকার রকমারি বিনিয়োগ ও ক্রিয়া বুঝাইয়া থাকে। ব্যাংকের পরিসম্পতের খাতে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত বিষয় গুলি ধরা হয়।

১) হাতের নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত জমা (Cash in hand and balances with the Central Bank)

২) চলমান চেকপত্র (Cheques in course of collection on other banks)

৩) তলবমাত্র দেয় ও স্বল্প মিযাদী বিজ্ঞপ্তিতে দেয় অর্থ (Money at call and short notice)

৪) আগাম দাদন ও কর্জ (Advances and loans)

৫) বাট্টাকৃত বিল (Bills discounted)

৬) বিনিয়োগ (Investments)

৭) সাকরাণ বাবদ গ্রাহকের দায় (Liabilities of customers for acceptances)

৮) বাড়ীঘর (Premises)

(১) ব্যাংকের সব চাইতে বড় দেনা আমানতকারীর নিকট। আনামতকারী যে কোন সময় টাকা তুলিযা লইতে পারে। ইহার জন্য ব্যাংককে কিছু নগদ টাকা হাতে রাখিতে হয়। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা হইতে ব্যাংক ঠিক করে, কতটা নগদ মুদ্রা ইহা আমানতকারীর প্রতিগ্রহ (withdrawal) খাতে সংরক্ষণ রাখিবে। আমানতকারীর নিকট মোট দেনার একটা অনুপাত নগদ টাকায় ব্যাংকে সংরক্ষিত হইযা থাকে। ব্যাংকের আমানত ও টাকা সংরক্ষণের মধ্যে যে অনুপাত রক্ষা করা হয়, উহাকে নগদ অনুপাত (cash-ratio) বলা হয়। আমানতের দায়ের খাতে যে নগদ টাকা সংরক্ষিত হয়, উহাই ব্যাংকের প্রথম রক্ষা কবচ। এই সংরক্ষিত নগদ টাকা ছাড়া, ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কাছে অর্থ সংরক্ষণ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট এই সংরক্ষিত অর্থ ও নগদ টাকার সামিল। যখন আমানতকারীরা চেক দ্বারা হঠাৎ খুব বেশী টাকা তুলিতে থাকে, তখন এই সংরক্ষিত অর্থ ব্যবহৃত হয়।

ব্যাংকের স্থিতি পত্রে সংরক্ষিত নগদ অর্থ-সম্পদের মধ্যে, ব্যাংকের হাতের নগদ টাকা ও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট সংরক্ষিত টাকা এক সংগে দেখান হয়।

(২) যে সকল চেকপত্র চলমান, অর্থাৎ অন্য ব্যাংকের উপর পাওনা, সেগুলির খাতে যে অর্থ সংগ্রহ হয় তাহা ও ব্যাংকের পরিসম্পৎ বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) তলবমাত্র দেয় ও স্বল্প-মিয়াদী বিজ্ঞপ্তিতে দেয় অর্থ বলিতে ব্যাংকের সেই সকল দাদন বা কর্জের টাকা বুঝায়, যাহা চাহিবা মাত্র বা স্বল্প মিয়াদে দাদনকারী পরিশোধ করে। যথা, ষ্টক বাজারের দালালকে যে দাদন দেওয়া হয়। এই খাতে ব্যাংকের যে পরিসম্পৎ, উহাকে দ্বিতীয় রক্ষা কবচ বলা যায়। যখন

ব্যাংকের সংরক্ষিত অর্থ অস্বাভাবিক রূপে নিঃশেষিত হয়, তখন এই অল্প মেয়াদী ও তলপমাত্র দেয় দাদনের অর্থ ব্যাংকের আশ্রয়স্থল হয়।

(৪) উপযুক্ত জামিনে ব্যবসায়ী বা কারবারী গ্রাহককে যে স্বল্পমিয়াদী অর্থ আগাম ও দাদন ব্যাংক দিয়া থাকে, উহা ও ব্যাংকের পরিসম্পৎ। যে সকল উৎস হইতে ব্যাংকের মুনাফা লাভ হয়, তাহাব মধ্যে এই অর্থ আগাম অন্যতম। সাধারণতঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিল ভাঙ্গাইবার বাট্টাহার যাহা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের বাট্টা হার তাহার চেয়ে অধিক হয় বলিয়া, এই খাতে ব্যাংকের বেশ অর্থ আগম হইয়া থাকে।

(৫) ব্যবসায়ী হুণ্ডি (Bills of exchange) ভাঙ্গাইয়া দাদন যোগান ব্যবস্থা করা, ব্যাংকের আর এক রকম স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ ও পারসম্পৎ। এই সকল হুণ্ডি বা বিল পত্রের মিয়াদ পূর্তি হয় সাধারনতঃ ৩ মাসের মধ্যে। সেইজন্য উহাদের বাজার মূল্য হ্রাসের সম্ভাবনা খুব কম থাকে। ইহার জন্য স্বল্পমিয়াদী বিনিযোগ হিসাবে হুণ্ডি পত্র ক্রয় করা ব্যাংকের পক্ষে খুব লাভ জনক। ব্যবসায়ী হুণ্ডিতে বিনিয়োগের পরিমাণ সাধারণতঃ ব্যাংকের হাতে নগদ টাকার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। সাধারণতঃ, ব্যাংক যদি হাতে নগদ টাকা অধিক রাখিতে চায়, তাহা হইলে ব্যবসায়ী হুণ্ডিতে বিনিয়োগ পরিমাণ কমাইতে হয়। ব্যাংক হুণ্ডি পত্র এমন ভাবে হিসাব করিয়া ক্রয় করে, যাহাতে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই নিযমিত ভাবে কিছু না কিছু বিলের মিয়াদ পূর্তি হয় এবং অধিক সংখ্যক বিলের মিযাদ পূর্তি হয় বৎসরের সেই সময়, যখন ব্যাংকের উপর নগদ টাকার দাবী আসে খুব বেশী।

(৬) ইহা ছাড়া, সরকারী সিকিউরিটি, শিল্প কারবারের শেয়ার পত্র প্রভৃতিতে বিনিয়োগ কৃত অর্থ ব্যাংকের পরিসম্পদের একটা মোটা অংশ। এই ধরণের বিনিয়োগ দ্বারা যদি ও ব্যাংক যথারীতি একটা নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত আয় উপার্জন করিয়া থাকে, তথাপি এই বিনিয়োগ পত্রগুলি দীর্ঘ মিয়াদী বলিয়া সহজে নগদ টাকায় (liquid money) পরিণত করা যায় না। স্বাভাবিক সময়ে অবশ্য প্রয়োজন হইলে, এই বিনিয়োগ পত্র গুলি বিক্রয় করা চলে; কিন্তু মন্দার সময় এই সকল ঋণ-পত্রের বাজার দর অত্যন্ত হ্রাস পায়, এবং ফলে, ব্যাংকের ক্ষতির কারণ হইয়া থাকে।

(৭) ব্যাংক গ্রাহকের হইয়া হুণ্ডি পত্র স্বীকার করে। ঐ সাকরাণ বাবদ গ্রাহককে ব্যাংকের নিকট যে অর্থ দায় মিটাইতে হয় তাহা ও ব্যাংকের সম্পদ।

(৮) পরিশেষে, ঘর বাড়ী, আসবাব ও অন্যান্য তৈজসপত্র প্রভৃতির সম্ভাব্য মূল্য ও ব্যাংকের সম্পদ বলিয়া ধরা হয়। অবশ্য, এই ধরণের সম্পদ হইতে ব্যাংক কোন মুনাফা বা সুদ লাভ করে না।

ব্যাংকের কর্জ যোগান (**Creation of Credit by Bank**) : সাধারণ বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্যতম প্রধান কাজ, দাদন বা কর্জ যোগান দেওয়া। ব্যাংকের দাদন বা কর্জ যোগানের প্রক্রিয়া আমানতের সৃষ্টি করে।

ব্যাংকের আমানত সৃষ্টি দুইটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে সম্ভব হইতে পারে। সাধারণতঃ, জনসাধারণ মুদ্রা আনিয়া ব্যাংকে জমা রাখিতে পারে। ইহাতে যে আমানতের সৃষ্টি হয়, উহাকে **নিষ্ক্রিয় আমানত** (passive deposits) বলা হয় ; কেননা, এই আমানত সৃষ্টির কারবারে ব্যাংকের নিজের কোন প্রাধান্য নাই—গ্রাহকের উদ্‌যোগই প্রধান। আর এক রকমে আমানত সৃষ্টি হইতে পারে, যে প্রক্রিয়ায় ব্যাংকই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাকে **সক্রিয় আমানত** (active deposits) সৃষ্টি বলা হয়। এই প্রক্রিয়ায় কোন গ্রাহক নগদ টাকা ব্যাংকে জমা না রাখা সত্ত্বেও, ব্যাংক তাহার নামে হিসাব খুলিয়া আমানত সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাধারণতঃ, ব্যাংক যখন কোন গ্রাহককে ঋণ বা দাদন দিতে স্বীকার করে, তখন তাহাকে নগদ মুদ্রা কর্জ না দিয়া তাহার নামে ব্যাংকে একটি আমানত হিসাব খোলে। গ্রাহক ব্যাংক সৃষ্ট ঐ আমানতের উপর চেক কাটিয়া, নিজ পাওনাদারদের দাবী মিটাইতে পারে। এইরূপ আমানত সৃষ্টির ফলে দেশে মুদ্রার সম্প্রসারণ হয়।

বাস্তবতঃ, কি প্রক্রিয়ায় দাদন যোগান আমানতের সৃষ্টি করে, তাহা একটু বিশদ্‌ভাবে আলোচনা করা যাক্। মনে করা যাক্, কোন এক ব্যক্তির সততার উপর ব্যাংকের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, কিংবা সে উপযুক্ত জামিন পত্র দিতে সক্ষম। এইরূপ গ্রাহককে ব্যাংক নিরাপত্তার সংগে ঋণ বা দাদন দিতে পারে। মনে কর, এইরূপ এক গ্রাহককে ব্যাংক ৫০০০৲ টাকা কর্জ দিল। এই কর্জের টাকা কিন্তু ব্যাংক গ্রাহককে নগদ টাকায় প্রদান করে না। ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে একটি আমানত হিসাব খুলিয়া এই টাকার অংক লিখিয়া রাখে। এই আমানত টাকা ব্যাংকের দেনার (liability) খাতে লিখা হইয়া থাকে। আবার, এই টাকার অংক ব্যাংকের পরিসম্পতের খাতে ও দাদন হিসাবে দেখান হয়। এই দাদন বা কর্জ অর্থই

কর্জ বা দাদন যোগান কি প্রক্রিয়ায় আমানত সৃষ্টি করে ? (How loans creates deposits ?)

আমানত সৃষ্টি করে। এবং এইরূপ আমানত সৃষ্টির ফলে মুদ্রার পরিমাণ বিস্তৃতি লাভ করে। কেননা, এই আমানতের উপর ঋণগ্রহীতা চেক কাটিয়া তাহার প্রাপকদের দায়দেনা মিটাইতে পারে। যাহারা চেকের মারফতে তাহাদের পাওনা পায়, তাহারাও যদি ঐ একই ব্যাংকের গ্রাহক হয়, তাহা হইলে তাহারা নিজেদের জমা আমানত হিসাবে ঐ চেক ঐ ব্যাংকে জমা দিবে। ফলে, প্রথমোক্ত ঋণ গ্রহীতার ব্যাংক-আমানত হ্রাস পাইবে বটে, কিন্তু দ্বিতীযোক্ত গ্রাহকগণের আমানত বৃদ্ধি পাইবে। আর এই গ্রাহকগণ যদি অন্য ব্যাংকের খরিদ্দার হয়, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ঋণ গ্রহীতার ব্যাংকের আমানত কমিবে বটে, কিন্তু গ্রাহকগণের ব্যাংকে চেক জমা পড়ার ফলে ঐ সকল ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি পাইবে। এইরূপ ভাবে দেশের সকল ব্যাংক গুলির আমানতের পরিমাণ সামগ্রিকভাবে বৃদ্ধি পায়। এই গোটা আমানত বৃদ্ধির কারণ এই যে ঋণগ্রহীতা চেক দ্বারা পাওনাদারের দেনা মিটাইয়া থাকে। আর এই চেক হইল ব্যাংকেরই আমানতমুদ্রা বিশেষ (deposit, money)। সুতরাং, ব্যাংক ঋণগ্রহীতার নামে আমানত সৃষ্টি করিয়া কর্জ বা দাদন যোগানের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ব্যাংক যখন এইরূপ আমানত সৃষ্টি করিয়া দাদনের ব্যবস্থা করে, তখন দেশের ব্যাংক মুদ্রারযোগান ও সম্প্রসারিত হয়।

উইদার্স (Withers) প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত এই যে, এই দাদন সৃষ্টি ব্যাপারে ব্যাংকেরই উৎযোগ (initiative) আমানতকারীর চেয়ে অধিক। ব্যাংকের উৎযোগে দাদন যোগান ব্যবস্থার এই প্রক্রিয়ার ফলে আমানতের সৃষ্টি হয় (Loans Create Deposits)।

কিন্তু লিফ্ (Leaf), ক্যানান্ প্রভৃতি অর্থশাস্ত্রীগণ ব্যাংকের এই দাদন সৃষ্টির উদ্‌যোগের উপর মোটেই গুরুত্ব দেন নাই; তাঁহারা বলেন, এই দাদন সৃষ্টির ব্যাপারে ব্যাংকের কোন ক্ষমতা বা সক্রিয়তা নাই; আসল উদ্‌যোগ আমানতকারীদের নিজের। তাঁহারা বলেন: আমানতকারী তাহাদের অর্থপুঁজি ব্যাংকে জমা রাখে; কিন্তু এই আমানতী অর্থ একযোগে তুলিয়া লয় না। আমানতের যে অংশটা অপ্রতিগ্রহ অবস্থায় (unwithdrawn) ব্যাংকে থাকে, সেই অর্থ অংকটাই ব্যাংক অন্যান্য ঋণগ্রহীতাকে কর্জ বা দাদন দিতে পারে। যে অর্থ ব্যাংক আমানতকারীর নিকট হইতে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করে সেই অর্থই উহা ঋণগ্রহীতাকে দাদনরূপে প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং ব্যাংক আমানতকারী এবং ঋণ গ্রহীতা, এই দুইএর মধ্যে মধ্যগ বা ফাড়িয়া বিশেষ (middleman)।

উপরি উক্ত বিরোধী মতবাদ দুইটিরই কিছু কিছু সত্য। আসলে যে প্রক্রিয়ায় কর্জ বা দাদন সৃষ্টি হয়, তাহা এইরূপ: কোন গ্রাহক যদি ব্যাংকে ১০০০৲ টাকা আমানত রাখে, তাহা হইলে ঐ আমানতের জন্য ব্যাংককে সুদ দিতে হয়। ব্যাংক এই আমানতী মোট টাকাটা অন্য গ্রাহককে না দিয়া সংরক্ষণ হিসাবে রাখে। ব্যাংক নিজের অভিজ্ঞতা হইতে যদি বুঝিতে পারে যে, উহার দায়ের (liabilities) জন্য শতকরা ২০৲ টাকা নগদ সংরক্ষণ রাখিলে চলে, তাহা হইলে ব্যাংক ১০০০৲ আমানত জমা রাখিয়া ৫০০০৲ দাদন দিতে সমর্থ হইবে। এই দাদন ঋণগ্রহীতাকে নগদ টাকায় দেওয়া হয় না, ঋণগ্রহীতার নামে আমানত হিসাব খুলিয়া ঐ টাকাটা তাহার নামে জমা করা হয়। এই দাদন যোগান প্রক্রিয়া কিন্তু এখানেই শেষ হয় না। কেননা, বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলি নগদ টাকার কিছুটা সাধারণতঃ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট জমা রাখে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক আবার এই আমানতী টাকার ভিত্তিতে একই প্রক্রিয়ায় দাদন যোগান ব্যবস্থা করে। ফলে, কর্জ সৃষ্টির প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে।

কর্জসৃষ্টির প্রতিবন্ধক ও ব্যত্যয় (Limitations of Credit Creation) : কর্জসৃষ্টি দ্বারা ব্যাংকের বেশ মুনাফা লাভ হয়; কেননা, নগদ টাকা দাদন না দিয়া ব্যাংক কর্জ যোগান ব্যবস্থা করে ও তাহার জন্য সুদ ও পায়। কিন্তু মুনাফা লাভের লোভে ব্যাংক অনির্দিষ্ট ভাবে কর্জ যোগান বাড়াইয়া যাইতে পারে না। কেননা, অবাধ কর্জসৃষ্টি সম্প্রসারণের পথে ব্যাংককে বাঁধা, প্রতিবন্ধকের সম্মুখীন হইতে হয়।

ব্যাংকের নিজের কাছে নগদ টাকা কতটা সংরক্ষিত আছে, তাহা কর্জ সৃষ্টির পরিমাণকে বিশেষ ভাবে নিয়মিত করে।

কর্জ সৃষ্টি অর্থই ব্যাংকের দায় বৃদ্ধি। ব্যাংকের মোট দায় যদি ও একই সময় পরিশোধ করিতে হয় না, তবু মোট দায়ের একটা অনুপাত নগদ টাকায় ব্যাংককে সংরক্ষণ হিসাবে রাখিতে হয়। সংরক্ষণের এই অনুপাত হার বজায় রাখিয়া ব্যাংককে কর্জ সৃষ্টি করিতে হয়। অধিক পরিমাণ কর্জ সৃষ্টি করিতে হইলেই ব্যাংকের নগদ টাকার সংরক্ষণ ও বাড়াইতে হয়। ব্যাংকের দাদন যোগান হ্রাস-বৃদ্ধি শুধু একটি ব্যাংকের নগদ টাকা সংরক্ষণের উপরই নির্ভর করে না, দেশের সমস্ত ব্যাংকের সংরক্ষণ পরিমাণ কর্জ সৃষ্টির চরম নিয়ামক।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যাংকগুলির মোট সংরক্ষণ পরিমাণ আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্জ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সীমিত। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ওপেন মার্কেট কারবার (open

market operations) দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষণ পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সিকিউরিটি পত্র খোলা বাজারে বিক্রি করে, তাহা হইলে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ পরিমাণ হ্রাস পাইবে। আবার, যখন উহা সিকিউরিটি ক্রয় করে, তখন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষণ পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয়তঃ, জনসাধারণ নগদ টাকা কতটা পরিমাণ হাতে রাখিতে চায়, তাহা ও ব্যাংকের দাদন সৃষ্টি সীমিত করিয়া থাকে। যদি জনসাধারণের নগদ টাকার চাহিদা কম হয়, তাহা হইলে ব্যাংক উহার নির্দিষ্ট সংরক্ষণ অনুপাত বজায় রাখিয়া আমানত বৃদ্ধি করিতে পারে।

ব্যাংক ব্যবসায়ের পরিচালনা নীতি (Principles of Banking) : বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির ব্যবসায় সুষ্ঠু ভাবে চালাইতে হইলে কতকগুলি সাধারণ নীতি পালন করিতে হয়।

ব্যাংকের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত, জনসাধারণের আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করা। এই আস্থা ও বিশ্বাস অর্জন করিতে হইলেই ব্যাংককে উপযুক্ত অর্থ সংরক্ষণ রাখিতে হয়। উপযুক্ত সংরক্ষণ বজায় না রাখিলে ব্যাংক আমানত-কারীর দেনা চাহিদা মাত্র, কিংবা অল্প সময়ের মধ্যে মিটাইতে পারে না।

বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির আমানত প্রধানতঃ অল্প-মিয়াদী। সেই কারণে দীর্ঘমিয়াদী ঋণ বা দাদন যোগান দেওয়া ইহাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ইহাদের দাদন স্বল্পমিয়াদী হওয়ায় ফাট্‌কা কারবারে বিনিয়োগ করা চলে না।

ব্যাংকের বিনিয়োগ মনোনয়ন ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হয়। বাজারে বিনিয়োগদ্বারা অর্থ আয় লাভ কি করিয়া অধিক হয়, কেবল মাত্র তাহা দেখিলেই চলে না। একদিকে যেমন অর্থ আয়ের সম্ভাব্য অংকের কথা ভাবিতে হইবে, অন্যদিকে তেমনি যে সকল পরিসম্পৎ সহজে স্বল্পমিয়াদে নগদ মুদ্রায় বিনিময় করা চলে, বাছিয়া বাছিয়া তাহাতেই শুধু ব্যাংককে অর্থ বিনিয়োগ করিতে হয়। যেমন, বিনিময় হুণ্ডি পত্রে, কিংবা সরকারী সিকিউরিটিতে যদি ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগ করে, তাহা হইলে প্রয়োজন হইলে তাড়াতাড়ি, অতি সহজেই ঐ বিল ভাঙ্গাইয়া নগদ টাকা সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু জমি বা বাড়ীঘর বন্ধক রাখিয়া ব্যাংক যে অর্থ দাদন দিয়া থাকে, উহা নিকৃষ্ট বিনিয়োগ ; কেননা, বন্ধকী সম্পত্তি স্বল্প মিয়াদে নগদ টাকায় রূপান্তরিত করা যায় না। ব্যাংক বিনিয়োগ ব্যাপারে একদিকে যেমন

বিনিয়োগ মনোনয়ন

সম্ভাব্য আয়ের অংকটা দেখিবে, অন্য দিকে তেমনি বিনিয়োগের নিরাপত্তা ও ঐ বিনিয়োগ কৃত পরিসম্পতের নগদ টাকাতে বিনিময় প্রবণতা (liquidity) কতটা, সে দিকে ও বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিবে।

পরিশেষে, ব্যাংক ব্যবসায়ের সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে উহার সংরক্ষণের উপযুক্ত তদারকের উপর। 'Successful banking depends largely on the management of the reserves.' দেখিতে হইবে যে সংরক্ষণ পরিমাণ যেন খুব বেশী ও রাখা না হয়, কিংবা খুব কম ও রাখা না হয়।

সংরক্ষণ তদারক

খুব বেশী সংরক্ষণ রাখিলে, অযথা টাকা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে। উহা ব্যাংকের পক্ষে লোকসান। আবার, সংরক্ষণ অর্থ খুব সামান্য রাখিলে, ব্যাংকের স্বচ্ছলতা বজায় রাখাই কঠিন হইবে। কতটা পরিমাণ সংরক্ষণ ব্যাংকের পক্ষে বজায় রাখা প্রয়োজন, তাহা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, ব্যাংকের গ্রাহকগণ কি ধরণের ব্যবসা চালাইবার জন্য অর্থ দাদন গ্রহণ করে, তাহার উপর। যদি ব্যাংকের আমানতকারীরা সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্য করে, তাহা হইলে তাহাদের ঘন ঘন, অধিক পরিমাণ টাকা তুলিয়া লওয়ার প্রয়োজন হয়। অবশ্য, ব্যাংকের টাকা তোলার হিড়িক যে সকল সময়েই নিয়মমাফিক পড়ে, তাহার কোন স্থিরতা নাই। অনেক সময় আন্তর্জাতিক সমস্যার দরুণ ও ব্যাংকের উপর অর্থ দাবীর চাপ বেশী পড়িতে পারে। ব্যাংকের সংরক্ষণ পরিমাণ কিন্তু আবার উহার বিনিয়োগ কৃত পরিসম্পতের তরলতার (liquidity) উপর ও নির্ভর করিয়া থাকে। ব্যাংকের বিনিয়োগ কৃত পরিসম্পতের নগদ টাকায় বিনিময় প্রবণতা যদি অধিক থাকে, তাহা হইলে সংরক্ষণের পরিমাণ হ্রাস করা চলে।

ক্লিয়ারিং হাউস ও উহার কার্যাবলী (Clearing House and Its Functions) : ব্যাংক কেবল মাত্র নগদ টাকায় আমানত গ্রহণ করে না। অনেক সময় গ্রাহকের আমানত চেকে পাইয়া থাকে। খরিদ্দারের নামে দেওয়া চেক হয়ত যে ব্যাংকে আমানত করা হয়, তাহারই উপর উহা কাটা হইয়া থাকিতে পারে। এ ক্ষেত্রে চেকে নির্দিষ্ট টাকা ব্যাংক ঐ খরিদ্দারের নামে আমানত হিসাবে জমা করিয়া লয়। আর যে ব্যক্তি ব্যাংকের চেক কাটে (drawer) তাহার আমানত হইতে ব্যাংক ঐ চেকে নির্দিষ্ট অর্থের পরিমাণ কমাইয়া দেয়। সুতরাং, যে ব্যক্তি চেক কাটে এবং যাহার নামে চেক কাটা হয়, উহারা যদি একই ব্যাংকের খরিদ্দার হয়, তাহা হইলে নগদ মুদ্রার স্থানান্তর প্রয়োজন হয় না;

ব্যাংক কেবল প্রথম ব্যক্তির আমানত কমাইয়া ও দ্বিতীয় ব্যক্তির আমানত বৃদ্ধি করিয়া খাতায় হিসাব ঠিক রাখে।

কিন্তু, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ব্যাংক আমানত হিসাবে উহার খরিদ্দারের নামে যে চেক পাইয়া থাকে, তাহা অন্যান্য ব্যাংকের উপর কাটা। কোন ব্যক্তির নামে যদি বহু সংখ্যক চেক বিভিন্ন ব্যাংকের উপর কাটা হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন ব্যাংকে যাইয়া চেক ভাঙ্গান সম্ভব হয় না। ঐ ব্যক্তি নিজে চেক না ভাঙ্গাইয়া চেকগুলি আমানত হিসাবে নিজের ব্যাংকে জমা দেয়। এইরূপভাবে দেশের প্রত্যেক ব্যাংকই উহার খরিদ্দারের নিকট হইতে বিভিন্ন ব্যাংকের উপর কাটা প্রচুর চেক আমানত হিসাবে পাইয়া থাকে।

চেক সম্পর্কীয় দাবী দাওয়া মিটাইবার একটি উপায় এই যে, প্রত্যেক ব্যাংক, উহার ভার প্রাপ্ত কর্মচারীকে ব্যাংকের নিকট পাঠাইয়া, যে ব্যাংকের উপর কাটা চেক উহা আমানত হিসাবে পাইয়াছে, তাহা ভাঙ্গানো। সাধারণতঃ, এই পদ্ধতি ছোট জায়গায় কার্যকরী হয় না। ছোট জায়গায় ব্যাংকের সংখ্যা অল্প এবং চেক ও অতি অল্প সংখ্যক কাটা হইয়া থাকে। কিন্তু, বড় সহরে, যেখানে প্রত্যেকটি ব্যাংক প্রতিদিন প্রচুর সংখ্যক চেক আমানত হিসাবে পাইয়া থাকে, কর্মচারী পাঠাইয়া তাহার মারফৎ চেকের টাকা সংগ্রহ করা স্থবিধা হয় না। এইরূপ অবস্থায় বিভিন্ন ব্যাংকের পরস্পর দাবী দাওয়া মিটান হয় ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে। বিভিন্ন সদস্য ব্যাংকের প্রতিনিধি প্রত্যেক কার্যকরী দিনে একটি নির্দিষ্ট সময়ে একটি নির্দিষ্ট কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়া পরস্পরের দাবী মিটমাট করিয়া লয়। এই কেন্দ্রীয় সংস্থাকেই ক্লিয়ারিং হাউস বলে। এই সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যাংকের পরস্পরের দাবীদাওয়া অনেকটা এইরূপ ভাবে কাটাকুটি যায়ঃ ধরা যাক্ সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ইণ্ডিয়া, ইউনাইটেড ব্যাংক অব ইণ্ডিয়ার উপর কাটা চেক আমানত হিসাবে পাইয়াছে। এ মতাবস্থায় উভয় ব্যাংকের কেরাণী পরস্পর তাহাদের দাবী পেশ করিয়া উভয়ের দাবীদাওয়া খাতায় কাটাকুটি করিয়া লয়। উভয়ের দাবী দাওয়া কাটাকাটি হইবার পর যদি কাহার ও দাবী থাকিয়া যায়, তাহা হইলে উহা শোধ করা হয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকে রক্ষিত আমানতের উপর চেক কাটিয়া। স্থতরাং ক্লিয়ারিং হাউসের মাধ্যমে ব্যাংকের দাবীদাওয়ার যে মিটমাট হয়, তাহাতে নগদ টাকার দেনাপানার

ক্লিয়ারিং প্রক্রিয়া

কোনই প্রয়োজন হয় না। অধ্যাপক সেয়ার্স (sayers) বলেন: "The entire process is a transfer having no monetary significance."

ক্লিয়ারিং পদ্ধতির সুবিধা (Advantages of Clearing System): দেশের ব্যাংক ব্যবসায়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে, ক্লিয়ারিং পদ্ধতির উপযোগিতা অনস্বীকার্য। **প্রথমতঃ**, এই পদ্ধতিতে চেকের টাকা সংগ্রহ করিবার জন্য কোন ব্যাংককে অন্যান্য ব্যাংকের নিকট ছুটিয়া যাইতে হয় না। বিভিন্ন ব্যাংকের প্রতিনিধি একটি নির্দিষ্ট স্থানে, দিনের নির্দিষ্ট সময়ে সমবেত হইয়া পরস্পরের দাবীদাওয়া মিটাইয়া লইতে পারে। **দ্বিতীয়তঃ**, এই ব্যবস্থায় নগদ টাকার ব্যয় সংকোচন করা সম্ভব হয়। **তৃতীয়তঃ**, ক্লিয়ারিং হাউসের প্রবর্তনে চেক ব্যবহারের বহুল প্রচলন সম্ভব হইয়াছে। ইহা দেশের ব্যাংক প্রথা গড়িয়া তুলিতে ও লোকের বিনিয়োগ অভ্যাস উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করিতেও সহায়তা করে।

অনুশীলনী

1. Describe the services rendered to a country by its banking system.
2. Explain how a bank creates credit. Is there any limitation on the power of a bank to create credit ?
3. Indicate the importance of Clearing House System in modern banking. (C. U. B. A. '51, '53)

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায়

কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং (Central Banking)

যদিও দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্জ ও দাদন যোগান দিয়া থাকে, তথাপি অর্থ ও দাদন সরবরাহের চরম অধিনায়ক ও নিয়ামক হইল দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থ-বাজারের চরম নিয়ন্ত্রণ কর্তা ও অভিভাবক হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতেই দেশের গোটা অর্থ-নীতির চাবিকাঠি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ অংশীদারের মালিকাধীনে সংগঠিত ও চালিত হইতে পারে,

কিংবা রাষ্ট্রের মালিকানায়ও নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে। আধুনিক প্রায় সকল কেন্দ্রীয় ব্যাংকই রাষ্ট্রীয় মালিকানায় চালিত। রাষ্ট্রায়ত্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বপক্ষে বড় যুক্তি এই যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক সে সকল কার্যাবলী তদারক করিয়া থাকে, তাহা গোটা জাতিস্বার্থ সম্বলিত। কি বিশেষ বিশেষ কার্যক্রম তদারকও সম্পাদন দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ-বাজারে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে, তাহাই এখন আলোচনা করিব।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী (Functions of Central Banks): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে দেশের কাগজী নোট প্রচারের একচেটিয়া অধিকার। নোট প্রচারের একচেটিয়া অধিকর্তা হিসাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের মুদ্রা যোগান নিয়ন্ত্রণ করে। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্তৃত্বে দেশের অন্যান্য আনুষঙ্গিক মুদ্রা (Subsidiary coins) বা হীন মুদ্রারও প্রচার হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক কাগজী নোট প্রচারের একচেটিয়া চরম অধিকর্তা

দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নোট ও অন্যান্য হীন মুদ্রা প্রচারের এই অধিকার একান্ত প্রয়োজন। অন্যান্য ব্যাংক যখন দাদন যোগান দেয়, তখন ঐ দাদনের খাতে উহাদের নগদ মুদ্রা, বিশেষ করিয়া কাগজী নোট, সংরক্ষণ হিসাবে রাখিতে হয়। নোটের প্রচার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংরক্ষণ প্রভাবান্বিত করিয়া, উহার যোগান নিয়মিত করিয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকগুলির ব্যাংক হিসাবে কাজ করে। দেশের অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহিত লেন-দেনের আর্থিক হিসাব রাখিতে হয়। উহাদের আমানতের একটা অংশ প্রত্যেকেই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে সংরক্ষণ হিসাবে রাখিয়া থাকে। যেমন, আমাদের দেশে তপশীলভুক্ত ব্যাংকগুলিকে (scheduled banks) চলতি আমানতের ৫% ও মেয়াদী জমার ২% রিসার্ভ ব্যাংকে সংরক্ষণ হিসাবে রাখিতে হয়।

ইহা অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে (It is the banker's bank)

গোটা দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার দরুণ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দাদন যোগান, তথা দেশের ব্যাংক ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চরম অভিভাবক ও নিয়ামক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দাদন যোগানের চরম আশ্রয় স্থল। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলি যখন আর্থিক সংকটে পড়ে, তখন প্রথমে স্বল্প মেয়াদী বিনিয়োগ-

কৃত অর্থ তুলিয়া নগদ টাকা হাতে করে। এই নগদ টাকায়ও যখন সংকট কালের চাহিদা মেটে না, তখন উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত নগদ টাকার জন্য দাদন গ্রহণ করিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংক গৃহীত সাধারণ হুণ্ডি পত্র ও অন্যান্য উপযুক্ত জামিন পত্র মিয়াদ পূর্ত্তির পূর্বে ভাঙ্গাইয়া দিয়া (rediscounting) উহাদিগকে অর্থ আগাম দিয়া থাকে।

দাদন যোগানের চরম আশ্রয় স্থল (It is the lender of the last resort)

কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের ব্যাংক হিসাবেও কাজ করিয়া থাকে। সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করে, তখন দেশে অর্থের যোগান হ্রাস পায়। আবার যখন ব্যয় করিয়া থাকে, তখন অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। অর্থের যোগানের আত্যন্তিক হ্রাস-বৃদ্ধি দেশের আর্থিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত আয়-ব্যয়ের নিয়ন্ত্রণ এমনভাবে তদারক করিয়া থাকে, যাহাতে আর্থিক বাজারে কোন অপচয় বা টান সৃষ্টি হয় না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের হিসাবপত্র তদারক করে, সরকারের তহবিল বিনা সুদে রক্ষণাবেক্ষণ করে। ইহা সরকারের হইয়া পাওনা আদায় করে ও সরকারের হইয়া উহার দেনা শোধ করে। ইহা সরকারের হইয়া ঋণপত্র ইস্যু করে ও ঐ ঋণ পরিশোধের বন্দোবস্ত করে।

ইহা সরকারের ব্যাংক হিসাবে কাজ করে

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দামস্তরের স্থিরতা (stability) স্থাপনে সহায়তা করে। দেশের মুদ্রা ও দাদন যোগান সম্প্রসারণের ফলে দামস্তর উধ্ব‍র্গামী হয়; আবার মুদ্রা ও দাদন যোগান সংকোচনের ফলে দামস্তর নিম্নগামী হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রা ও দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ দ্বারা মূল্যস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা স্থাপন করে। এই দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য ইহাকে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে হয়। আমরা পরে এই উপায়গুলি ব্যাপকভাবে আলোচনা করিব।

ইহা দামস্তর স্থিতিশীল করিতে সহায়তা করে

দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের সাম্য (stability in the external value of currency) স্থাপন করিতেও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গুরুত্ব কম নহে। মুদ্রার এই মূল্য সাম্যের উপর দেশের বহির্বাণিজ্যের উত্থান-পতন বিশেষভাবে নির্ভর করে। যে সকল দেশ স্বর্ণ-মানে অধিষ্ঠিত, উহাদের মধ্যে মুদ্রা বিনিময় হার কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করে। কাগজী মুদ্রায় অধিষ্ঠিত দেশসমূহের আন্তর্জাতিক বিনিময় কারবার তদারক করিতে এবং

ইহা মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের স্থিতিশীলতা রক্ষা করে

মুদ্রা-বিনিময় হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা করিতেও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে অংশ গ্রহণ করিতে হয়।

পরিশেষে, বিভিন্ন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে যে চেক ও কর্জ-পত্রের দাবী দেনা কাটাকুটি ও মিটমাট করিতে হয়, তাহার জন্য ক্লিয়ারিং হাউসের সংগঠন ও সকল রকম ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রীয় ব্যাংককেই করিতে হয়।

ইহা ক্লিয়ারিং ব্যবস্থা তদারক করিয়া থাকে

দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি (Methods of Credit Control): কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী আলোচনা প্রসংগে আমরা দেখিয়াছি যে, উহা অন্যান্য ব্যাংকের কর্জ যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেশের দাদন যোগান অত্যধিক সম্প্রসারণ কিংবা সংকোচন ব্যাহত করিতে পারে। আজিকার দিনে প্রত্যেক দেশের অর্থযোগানের একটী মোটা অংশই দাদন মুদ্রা। অত্যধিক দাদন যোগান সম্প্রসারণের ফলে দেশের দামস্তর বৃদ্ধি পায়, ব্যবসায় বাণিজ্য ফাঁপিয়া উঠে; দেশের আমদানী বৃদ্ধি পায় ও বৈদেশিক জমা উদ্বৃত হ্রাস পায় (imbalance in foreign payments)। আবার, দাদন যোগান সংকোচনের ফলে মূল্য স্তর কমিয়া যায়, ব্যবসায় বাণিজ্যে মন্দা আসে; রপ্তানী বৃদ্ধি পায় ও বৈদেশিক জমা উদ্বৃত্ত বাড়িয়া যায়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া মূল্যস্তরের স্থিতি স্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করে, অর্থের বৈদেশিক বিনিময় হারের সাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং ব্যবসায় বাণিজ্যের তেজী ও মন্দা ভাব প্রতিরোধ করিয়া, দেশে পূর্ণ কর্ম নিয়োগ স্থাপনের সহায়তা করে।

দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক রকমারি উপায় অবলম্বন করে। **প্রথমতঃ,** বাট্টার হার অদল বদল (changing the bank rate) করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টার হার বলিতে আইন নির্দিষ্ট সেই নিম্নতম হার বুঝায়, যে হারে ব্যাংক প্রথম শ্রেণীর বিলপত্র ভাঙ্গাইয়া থাকে, অথবা উপযুক্ত জামিনপত্রের বিনিময়ে অর্থ দাদন দিয়া থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাট্টার হার বৃদ্ধি করে, তখন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির উপর। এই ব্যাংক গুলি তখন অল্পসংখ্যক বিলপত্র ভাঙ্গায় কিংবা অল্প পরিমাণ ঋণ গ্রহণ করে। ফলে, উহাদের অর্থ-সম্পদ হ্রাস পায়, এবং উহারাও দাদনের বাজার বাট্টা হার বৃদ্ধি করে।

বাট্টার হার অদলবদল

ইহাতে স্বভাবতঃই কর্জযোগান সংকুচিত হইবে। ব্যাংকের দাদন যোগান হ্রাসের ফলে ব্যবসায়ী, আড়ৎদার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ মাল মজুত করিবে। তাহাতে উৎপাদন হ্রাস পাইয়া জাতীয় অর্থআয় কমিয়া যায়। আর অর্থ আয়ের ঘাটতির সংগে দামস্তরও হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন উহার বাট্টার হার হ্রাস করে, তখন দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিও দাদন যোগানের বাজার বাট্টা হার হ্রাস করিবে। ইহাতে কর্জ যোগানের সম্প্রসারণ হয়। সস্তায় কর্জ গ্রহণ করিয়া আড়ৎদার, ব্যবসায়ী প্রভৃতি অধিকমাল মজুত করে। ইহাতে উৎপাদনের আয়তনবৃদ্ধি পাইয়া জাতীয় অর্থআয়ও বৃদ্ধি পায়। জাতীয় অর্থ আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে দামস্তরও বাড়ে।

দামস্তরের উপর বাট্টাহার পরিবর্তণের ফলাফল

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার বৃদ্ধির ফলে, দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার ও বৃদ্ধি পায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বাট্টা হার বৃদ্ধি করে, তখন ঐ দেশে সুদের বাজার হার বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক বিনিয়োগকারীরা ইহাতে আকৃষ্ট হইয়া ঐ দেশে আরও অর্থ বিনিয়োগ করিতে থাকিবে। বৈদেশিক মূলধন ঐ দেশে পাঠাইবার জন্য বিদেশীর নিকট ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে ও ঐ মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য বাড়িবে। তাহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার বৃদ্ধির ফলে দেশের মধ্যেও অর্থের প্রচলন সংকুচিত হওয়ায়,দামস্তর হ্রাস পাইবে। ইহাতে বৈদেশিক পণ্য আমদানী হ্রাস পাইবে ও দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (balance of trade) বৃদ্ধি পাইবে।

বৈদেশিক বিনিময়ের উপর বাট্টাহার পরিবর্তণের ফলাফল

দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের দ্বিতীয় পদ্ধতি হইল, **ওপেন মার্কেট অপারেশন**। এই প্রক্রিয়া দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের গরজে খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় ও বিক্রয় করিয়া থাকে। কেন্দ্রীর ব্যাংক যখন দাদন যোগান সম্প্রসারণ করিতে চায়, তখন খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করে। সিকিউরিটি বিক্রয়কারীগণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে যে বিক্রয়লব্ধ অর্থ লাভ করে, তাহা বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিতে জমা দেয়। ইহাতে এই ব্যাংক গুলির অর্থপুঁজি বৃদ্ধি পায়; আর তাহার ফলে ইহারা দাদন যোগানও বৃদ্ধি করিতে পারে। অপরপক্ষে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি দাদন যোগান সংকোচন করিতে চায়, তাহা হইলে খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিবে। সিকিউরিটি খরিদ্দারগণ বাণিজ্যিক ব্যাংকে তাহাদের আমানতী

ওপেন মার্কেট অপারেশন (Open marketing operation)

যে অর্থ আছে উহার উপর চেক কাটিয়া সিকিউরিটির মূল্য কেন্দ্রীয় ব্যাংককে পরিশোধ করিবে। ঐ চেক ভাঙ্গানের সংগে সংগে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অর্থপুঁজি হ্রাস পাইবে ও উহারা কর্জযোগান সংকোচন করিতে বাধ্য হইবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ওপেন মার্কট অপারেশন' প্রক্রিয়া দ্বারা দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের সাফল্য উহার বাট্টাহার অদলের বদলের ক্রিয়ার উপর বিশেষ ভাবে নির্ভয় করে। মনে কর, কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া দাদন যোগান সংকোচন করিতে চায়। এই পদ্ধতি মোটেই সাফল্যের সংগে কার্যকরী হইতে পারেনা, যদি সংগে সংগে কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার বাট্টার হারও বৃদ্ধি না করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি শুধু সিকিউরিটি বিক্রয় করে, আর বাট্টার হার বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে ওপেন মার্কেট প্রক্রিয়ার দরুণ যে বাণিজ্যিক ব্যাংক গুলির যে অর্থপুঁজির ঘাটতি হয়, তাহা কেন্দ্রীয় ব্যাংক হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প বাট্টাহারে বিল ভাঙ্গাইয়া উহারা সহজেই মিটাইতে পারে।

বাট্টাহার পরিবর্তন ও ওপেন মার্কেট অপারেশনের সম্পর্ক

'ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়া' বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে দেখা যায়। ইংলণ্ডের অর্থ বাজারের প্রথা এই যে, যৌথ কারবারী ব্যাংকগুলি সরাসরি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করিতে কিংবা হুণ্ডিপত্র পুনঃ ভাঙ্গাইতে পারে না। ফলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন সিকিউরিটি খোলা বাজারে বিক্রয় করে ও তাহার দরুণ যৌথ কারবারী ব্যাংগুলির অর্থপুঁজি হ্রাস পায়, তখন উহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে দাদন গ্রহণ করিয়া কিংবা বিলপত্র ভাঙ্গাইয়া ঘাটতি অর্থপুঁজি বৃদ্ধি করিতে পারে না। অপরপক্ষে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে কিন্তু সদস্য ব্যাংকগুলি রিসার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ধার করিতে কিংবা বিল পুনঃ ভাঙ্গাইতে পারে। ফলে, ফেডারেল রিসার্ভ বোর্ড যখন সিকিউরিটি বিক্রয় করে ও তাহার দরুণ সদস্য ব্যাংকগুলির অর্থপুজি হ্রাস পায়, তখন উহারা রিসার্ভ ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়া, কিংবা বিল পুনঃ ভাঙ্গাইয়া উহাদের ঘাটতি অর্থপুজি বৃদ্ধি করিতে পারে। ইহাতে 'মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে' ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য অনেকটা ব্যাহত হইয়া থাকে। অধুনা অবশ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রেও সদস্য ব্যাংক কতটা পরিমাণ ঋণ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিবে তাহা ধার্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ফলে, ফেডারেল রিসার্ভ বোর্ড সিকিউরিটি

ইংলণ্ডে ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়ার তফাৎ

বিক্রয় করিলে, সদস্য ব্যাংকগুলি তক্ষুণই ঋণপত্র ভাঙ্গাইয়া অর্থপুজি বৃদ্ধি করিতে পারে না ; কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিকিউরিটি বিক্রয়ের ফলে উহাদের অর্থপুজি ও দাদন যোগান সংকুচিত হইতে বাধ্য হয়। ফলে, 'ওপেন মার্কেট অপারেশন' প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যও অনেকটা সাফল হয়।

বাট্টাহার পরিবর্তন ও ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়া, একটা অন্যটার অনুপূরক হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। সাধারণতঃ, অর্থব্যবস্থার অস্থায়ী ও অল্প মেয়াদী অসাম্যাবস্থা দূরীকরণের জন্য ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়া বাট্টাহার নিয়ন্ত্রণের চাইতে অধিক কার্যকরী হইয়া থাকে। বাট্টাহার পরিবর্তনের ফলাফল দীর্ঘমিয়াদে বুঝা যায় ; সেইজন্য স্থায়ী অসাম্য অবস্থা প্রতিকারের জন্য ইহা অধিক উপযোগী।

সদস্য ব্যাংকের সংরক্ষণ অনুপাত পরিবর্তন (Variation in Reserve Ratios of Member Banks): অনেক সময় সিকিউরিটির দুষ্প্রাপ্যতার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে উহা বেচাকেনা করিয়া দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয় না। এই অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক সদস্য ব্যাংকগুলিকে উহাদের সংরক্ষিত অর্থপুজির অনুপাত বাড়াইতে বা কমাইতে বলিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সদস্য ব্যাংকগুলিকে সংরক্ষণের অনুপাত অধিক রাখিতে নির্দেশ দেয়, তাহা হইলে সদস্য ব্যাংকগুলির অর্থসম্পদ হ্রাস পাইবে ও উহারা কর্জ যোগান সংকোচন করিতে বাধ্য হইবে। আবার, কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি সদস্য ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ অনুপাত হ্রাস করিবার নির্দেশ দেয়, তাহা হইলে সদস্য ব্যাংকগুলির অর্থপুঁজি বৃদ্ধি পাইবে এবং ফলে, উহারা কর্জ যোগান সম্প্রসারণ কবিতে পারিবে। ইংলণ্ডের সদস্য ব্যাংকগুলি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট যে নগদ টাকার সংরক্ষণ রাখে, উহা দেশের প্রথা অনুযায়ী ধার্য করা হয়। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে সদস্য ব্যাংকগুলির নগদ টাকার সংরক্ষণ অনুপাত আইন দ্বারা নির্দিষ্ট। ভারতবর্ষের তপশীলী ব্যাংকগুলি উহাদের অল্প মিয়াদী আমানতের জন্য ৫%, ও দীর্ঘমেয়াদী আমানতের জন্য ২% নগদ টাকার সংরক্ষণ রিসার্ভ ব্যাংকের কাছে জমা রাখে।

সদস্য ব্যাংকের নগদ মুদ্রার সংরক্ষণ অনুপাত পরিবর্তন

দাদনের রেশনিং (Rationing of Credit): উপরি উক্ত তিনটি পদ্ধতি-দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাদন যোগান পরিমাণ নিয়মিত করে। কিন্তু যে উদ্দেশ্যের জন্য দাদন সরবরাহ হয়, তাহা নিয়ন্ত্রন করা হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন রেশনিং

ব্যবস্থা দ্বারা। এই ব্যবস্থা দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনভিপ্রেত দাদন যোগান সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করিতে পারে। সদস্য ব্যাংকগুলি অনেক সময় ফাটকা কারবারীকে প্রচুর দাদন দিয়া ঋণ পত্র গ্রহণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই ফাটকা কারবারের অস্বাভাবিক প্রসার যদি অনভিপ্রেত মনে করে, তাহা হইলে সদস্য ব্যাংক গৃহীত ঋণপত্রগুলি ভাঙ্গাইতে অস্বীকার করিবে।

অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক শাস্তিমূলক 'প্রত্যক্ষ ক্রিয়ার' (direct action) আশ্রয় লইয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির দাদন নীতি যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট কল্যাণধর্মী মনে না হয়, তাহা হইলে উহা ঐ সকল ব্যাংকের ঋণপত্র পুনঃ ভাঙ্গান একদম বন্ধ করিয়া দেয়।

অবশ্য দাদনের রেশনিং, কিংবা শাস্তিমূলক 'প্রত্যক্ষ ক্রিয়া' প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সফলতার সহিত বড় একটা কার্যকরী হয় না।

নৈতিক উপরোধ (Moral Persuasion) : কেন্দ্রীয় ব্যাংক নৈতিক চাপ দিয়াও বাণিজ্যিক সদস্য ব্যাংকগুলিকে উহার নিজের অনুসৃত নীতি অনুসরণ করিতে বাধ্য করিতে পারে। যদি সদস্য ব্যাংকগুলি অল্পসংখ্যক হয় এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে আস্থাবান থাকে, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিজের অনুসৃত নীতির সার্থকতা উহাদের বুঝাইয়া দিয়া, ঐ নীতি অনুসরণ করিতে উহাদিগকে আবেদন করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই আবেদনের ফল সদস্য ব্যাংকগুলির কার্য্যকলাপে অপ্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়।

দাদন-নিয়ন্ত্রণের ব্যত্যয় ও প্রতিবন্ধক (Limits of Credit Control) : কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে দাদন নিয়ন্ত্রণের যে সকল অস্ত্র আছে উহারা সম্পূর্ণ অব্যর্থ নহে। দাদন নিয়ন্ত্রণের যে সকল পদ্ধতি কেন্দ্রীয় ব্যাংক গ্রহণ করিতে পারে, উহার প্রত্যেকটারই কোন না কোন ব্যত্যয় বা প্রতিবন্ধক আছে।

গোটা অর্থ-বাজারের (money market) সহিত যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্পর্কযুক্ত থাকে, তাহা হইলে উহা সুষ্ঠুভাবে কর্জ নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু দেশের অর্থ-বাজারে এমন অনেক প্রতিষ্ঠান থাকিতে পারে, যাহার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সহিত মোটেই যোগসূত্র নাই, এই সকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন নিয়ন্ত্রণ নীতি বানচাল করিয়া দেয়।

বাট্টাহার অদলবদল করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকে, তাহারও অনেক প্রতিবন্ধক আছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক উহার

বাট্টাহার যে দিকে পরিবর্তন করে, ঋণের বাজার-হার ও যদি ঠিক সেই দিকেই পরিবর্তিত না হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন নিয়ন্ত্রণ নীতি সাফল্য লাভ করিবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাট্টাহার বৃদ্ধি করে, আর দেশের বাণিজ্যিক সদস্য ব্যাংকগুলি যদি তাহাদের কর্জ যোগানের বাজার হার একই রাখে ; তাহা হইলে বাট্টাহার বৃদ্ধি দ্বারা কেন্দ্রীয় ব্যাংক দাদন যোগান সংকোচন করিতে পারিবে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন সংকোচন নীতি এ ক্ষেত্রে সদস্য ব্যাংকগুলির কর্জ সম্প্রসারণ দ্বারা বানচাল হইয়া যাইবে।

বাট্টাহার অদলবদল দ্বারা দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করার প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয়তঃ, অর্থ-ব্যবস্থার তেজী অবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার পরিবর্তন নীতি মোটেই কার্যকরী হয় না। এই সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাট্টাহার বৃদ্ধি করে ও সংগে সংগে সদস্য ব্যাংকগুলিও উহাদের কর্জের হার বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে এই উচ্চ বাজার হারেও দাদন গ্রহণের পরিমাণ হ্রাস পায় না। তেজী অবস্থায় সম্ভাব্য মুনাফা হার উচ্চ হয় বলিয়া, উৎপাদক শ্রেণী বেশী সুদের হারেও অর্থ কর্জ গ্রহণ করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। ফলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন সংকোচন নীতি ব্যহত হয়।

তৃতীয়তঃ, ব্যবসায় বাণিজ্যের মন্দা অবস্থায় বাট্টাহার হ্রাস করিয়া দাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলেও, উৎপাদক শ্রেণীর তরফ হইতে সস্তা ঋণ গ্রহণ দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধির কোন উৎসাহ দেখা যায় না। কেননা, এই সময়ে মুনাফা লাভের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম হয়। বিগত পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দার সময়, অনেক দেশেরই কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টাহার হ্রাস করিয়া দাদন যোগান সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে সদস্য ব্যাংকগুলির তরফ হইতে কর্জ গ্রহণ মোটেই বৃদ্ধি পায় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার অদলবদলের দ্বারা দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হয় তখন, যখন গোটা অর্থ-ব্যবস্থা সংকোচন-প্রসারণ প্রবণ হয়, অর্থাৎ দাদন যোগানের পরিবর্তনের সংগে সংগে যখন দেশের দামস্তর মজুরি, খাজনা, ব্যবসায়-বাণিজ্য উৎপাদন ইত্যাদির ও পরিবর্তন হয়।

বিগত আর্থিক মন্দার সময় হইতেই দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি হিসাবে বাট্টাহারের গুরুত্ব বিশেষভাবে হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কারণ এই যে, দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির প্রবর্তন হইয়াছে এবং সরকারও সস্তা মুদ্রানীতি (cheap money policy) অনুসরণ করিয়া আসিতেছেন।

‘ওপেন মার্কেট অপারেশন’ প্রক্রিয়া দ্বারা দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ করিতে

ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক সকল সময় সফলকাম হয় না। এই পদ্ধতির কার্যকারিতা ও কতকগুলি প্রতিবন্ধক দ্বারা ব্যাহত হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা-বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় বা বিক্রয় করিলেই যে দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির নগদ টাকার পুঁজি যথাক্রমে বৃদ্ধি বা হ্রাস হইবে, তাহার কোনই স্থিরতা নাই। অনেক সময় দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সিকিউরিটি ক্রয়ের দরুণ সদস্য ব্যাংকের যে নগদ টাকার পুঁজি বৃদ্ধি হইল উহা দাদন যোগান সম্প্রসারণের উৎস না হইয়া ব্যাংকের নগদ টাকার সংরক্ষণ বৃদ্ধি করিতে কিংবা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করিতে ব্যয়িত হয়।

'ওপেন মার্কেট অপারেশন' প্রক্রিয়ার প্রতিবন্ধক

দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হাতে সিকিউরিটির পরিমাণ কম থাকার দরুণ ও ওপেন মার্কেট অপারেশন প্রক্রিয়া দ্বারা দাদন যোগান নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব হইয়া পড়ে।

পরিশেষে, এই পদ্ধতি দাদন যোগান সংকোচন করিতে যতটা সহায়তা করে, দাদন যোগান সম্প্রসারণ ততটা সহজে করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলা-বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির অর্থপুঁজি বৃদ্ধি করিয়া দিলেও, দেশে দাদন যোগান বৃদ্ধি পায় না, যদি ঐ ব্যাংকগুলির নিকট হইতে কর্জ গ্রহণ করিবার মত যথেষ্ট আড়ৎদার ব্যবসায়ী প্রভৃতি দেশে না থাকে।

সস্তা মুদ্রা নীতি (Cheap Money Policy) : বিগত মহাযুদ্ধের পর হইতে অনেক দেশেই কেন্দ্রীয় ব্যাংক সস্তা মুদ্রা নীতি প্রবর্তন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার হ্রাস, খোলা-বাজারে সিকিউরিটি ক্রয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ পরিমাণ হ্রাস প্রভৃতি পদ্ধতি দ্বারা বাণিজ্যিক ব্যাংকের দাদন যোগান বৃদ্ধি করাই এই সস্তা মুদ্রা নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই সস্তা মুদ্রা নীতির আসল উদ্দেশ্য হইল বাণিজ্যিক ব্যাংকের দাদন যোগানের সম্প্রসারণ দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া যুদ্ধ কবলিত দেশগুলিতে অর্থ-নৈতিক সংস্কার ও পূর্ণ-কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা।

এই সস্তা মুদ্রা নীতির স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি সাধারণতঃ দেওয়া হয়, তাহা এইরূপ :

সস্তা মুদ্রা নীতির স্বপক্ষে যুক্তি

প্রথমতঃ, সস্তা সুদের হারে দাদন যোগান বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়। সুদের হার সস্তা হওয়া অর্থ ই, বিনিয়োগ হইতে সম্ভাব্য মুনাফা লাভের অংক বৃদ্ধি ; আর সম্ভাব্য মুনাফা লাভের অংক বৃদ্ধি অর্থই, বিনিয়োগের আয়তন বৃদ্ধি ও কর্ম-সংস্থান সম্প্রসারণ।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ণ কর্ম নিয়োগ স্থাপন করিতে হইলে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হয়। বিশেষ করিয়া যখন বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ (private investment) হ্রাস পায়, তখন সরকারকে ঋণ করিয়া ঘাটতি বাজেট ব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হয়। সুদের হার কম হইলে সরকারের পক্ষে ঋণ করিয়া ব্যাপকভাবে ঘাটতি ব্যয় করার সুবিধা হয়।

তৃতীয়তঃ, সুদের হার কম থাকিলে, দেশের সঞ্চয় অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া দেশের বিনিযোগের পরিমাণ ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। ধনতান্ত্রিক যে সকল দেশ অতিমাত্রায় উন্নতিশীল, সেখানে সঞ্চয় প্রবণতা এত অধিক যে সুদের হার বৃদ্ধি করা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। সুদের হার হ্রাস দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ও সঞ্চয় কমানই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমীচীন মুদ্রা নীতি।

পরিশেষে, দেশের বেকার সমস্যার সমাধান অর্থ-মজুরির হার হ্রাস দ্বারা হয় না। এই সমস্যা সমাধানের প্রধান উপায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। আর বিনিয়োগ বৃদ্ধি বিশেষ করিয়া নির্ভর করে সুদের হারের হ্রাসের উপর।

সস্তা মুদ্রা নীতির বিপক্ষে যুক্তি

কিন্তু সুদের হার হ্রাস করিয়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সস্তা মুদ্রা নীতি অনুসরণ করিতে পারে, তাহা সকল সময় যুক্তিযুক্ত নয়। সুদের হার অত্যন্ত হ্রাস পাইলে সঞ্চয় বৃদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে, তাহাতে ব্যবসায় বাণিজ্যের ঊর্ধ্বগতি ব্যাহত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সুদের হার হ্রাস হওয়ায় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির সুদজনিত প্রাপ্য আয় কমিয়া যায়। ফলে, উহারা ঝুঁকি বহুল অন্যান্য ধরণের বিনিয়োগে মূলধন ফেলে ; তাহাতে অনেক সময় লোকসান হয়।

তৃতীয়তঃ, সস্তা মুদ্রা নীতি ফাটকা কারবারের জন্য কর্জ গ্রহণ করিতে বিশেষভাবে উৎসাহিত করে।

পরিশেষে, সস্তা মুদ্রা নীতির সবচেয়ে বড় বিপদ হইল, মুদ্রাস্ফীতির ভয়। সুদের হারের হ্রাসের ফলে যে পরিমাণ দাদন যোগান সম্প্রসারিত হয়, সেই পরিমাণে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি না হয়, তাহা হইলে দামস্তর বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রাস্ফীতির আনুষঙ্গিক কুফল দেখা দেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় করণ (Nationalisation of the Central Bank) : আধুনিক অর্থ-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয়করণ অপরিহার্য বলিয়া মনে হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয়করণের স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হয়, সাম্প্রতিক অর্থ-ব্যবস্থায় উহারা সাধারণতঃ অকাট্য।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমের উদ্দেশ্য জাতীয় কল্যাণ সাধন। জাতীয় কল্যাণ সাধন যে সংস্থার প্রধান লক্ষ্য উহার ব্যক্তিগত বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণ মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। জাতীয় সংস্থা হিসাবে ইহার রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকা প্রয়োজন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় করণের পক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যক্তিগত, বে-সরকারী মালিকানায় থাকিলে, উহার অধিকাংশ শেয়ার পত্র অতি অল্প সংখ্যক অংশীদার ক্রয় করিয়া লইবে এবং এই অল্প-সংখ্যক লোকই আসলে ইহার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা তদারক করিবে। বিশেষ কতিপয় অংশীদারের নিয়ন্ত্রণাধীনে যাহাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক না আসে, তাহার জন্যও উহার রাষ্ট্রীয় করণ যুক্তিযুক্ত।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয়করণের ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে দেশের অর্থনীতির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া সহযোগিতা করিতে পারে। আধুনিক রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক দায়িত্ব অনেক। রাষ্ট্রের অর্থ-নৈতিক কোন পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুসৃত মুদ্রা নীতির পূর্ণ সহযোগিতা প্রয়োজন। আবার কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও উহার মুদ্রা নীতি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা এককভাবে বাণিজ্য-চক্র সংক্রান্ত মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা-সংকোচন উপশম করিতে পারে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই মুদ্রা নীতির সহিত রাষ্ট্রের রাজস্ব নীতির সহযোগিতা একান্তভাবে প্রয়োজন হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় করণ দেশের মুদ্রা-ব্যবস্থার ও রাজস্ব নীতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা স্থাপনের বিশেষ সহায়তা করে।

চতুর্থতঃ, আধুনিক রাষ্ট্র দেশে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে বদ্ধপরিকর। এই পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রকে অনেক সময় ঘাটতি ব্যয় করিতে হয়। সরকার যখন এই প্রক্রিয়া গ্রহণ করে, তখন দেশে সুদের হার যাহাতে বৃদ্ধি না পায়, তাহা লক্ষ্য করা একান্ত প্রয়োজন। দেশের সুদের হারের চরম নিয়ন্ত্রণ কর্তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি রাষ্ট্রায়ত্ত করা হয়, তাহা হইলেই কেবলমাত্র সরকারের নির্দেশ মত উহা সুদের হার নিম্নস্তরে ধার্য করিয়া রাখিতে পারে এবং সরকার ঘাটতি ব্যয় প্রক্রিয়া দ্বারা পূর্ণ কর্ম-নিয়োগের পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রাষ্ট্রীয় করণের বিপক্ষে যুক্তি

কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় ব্যাংক জাতীয় করণের ফলেই যে দেশের মুদ্রা ও রাজস্ব নীতির মধ্যে অধিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা স্থাপিত হয়, তাহা সত্য নহে। রাষ্ট্রায়ত্ত হইবার পূর্বে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন বে-সরকারী, ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল, তখনও

উহার নীতি সরকারের ইচ্ছা ও নির্দেশ অনুসারে নির্ধারিত ও কার্যকরী হইত।

অনেকে বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের জাতীয়করণের ফলে, উহার উপর রাষ্ট্রের অস্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণ চাপ পড়িবার সম্ভাবনা। রাষ্ট্র নিজের চাহিদা অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে চাপ দিয়া, আত্যন্তিক ভাবে অর্থ প্রচার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি পর্য্যন্ত ঘটাইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মসূচী ও কার্যকারিতা অনেক সময় রাজনৈতিক দলের নেতাদের হস্তক্ষেপে প্রভাবান্বিত হইতে পারে।

পরিশেষে, জাতীয়করণের ফলে ব্যাংকের পরিচালনা ও দৈনন্দিন কার্যক্রমের প্রগুণতা ক্ষুন্ন হয়। সরকারী কর্মচারিদের কর্মে উৎসাহ ও তৎপরতা অপেক্ষাকৃত কম। সরকারী লাল ফিতার চাপে কার্যক্রমের গতি ও স্বভাবতঃই মন্থর হয়।

রকমারি মুদ্রানীতি ও উহাদের উদ্দেশ্য (Monetary Policies and their Objectives) : দেশ ও কাল ভেদে মুদ্রানীতি ও উহার উদ্দেশ্যের তারতম্য হইয়া থাকে। আমরা নিম্নে কতিপয় সম্ভাব্য মুদ্রানীতি ও উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

(১) আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের স্থিতিস্থাপকতা (Stability of External Value) : প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে যখন স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, তখন মুদ্রা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যই ছিল, কি করিয়া মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করা যায়। যদি কখন ও দেশের মোট রপ্তানী মূল্য ও মোট আমদানী মূল্যের মধ্যে বৈষম্য ঘটিয়া, মুদ্রার বাহ্যিক বিনিময় হারের হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা দিত, তাহা হইলে অবাধ স্বর্ণ চলাচলের মাধ্যমে ঐ বিনিময় হারের স্থৈর্য্য স্থাপিত হইত। যুদ্ধোত্তর (প্রথম যুদ্ধ) কালেও মুদ্রার এই বাহ্যিক বিনিময় হারের স্থিরতা প্রতিষ্ঠা করা মুদ্রানীতির একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

কিন্তু মুদ্রার বাহ্যিক বিনিময় হার স্থির প্রতিষ্ঠা করাই কোন মুদ্রানীতির একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত নহে। মুদ্রার আভ্যন্তরীণ বিনিময় হারের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করাও কম গুরুত্বপূর্ণ নহে। মুদ্রানীতির প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, মুদ্রার বাহ্যিক বিনিময় হার ও আভ্যন্তরীণ বিনিময় হার যতটা সম্ভব স্থির রাখিয়া, দেশের প্রয়োজন মাফিক উহার যোগান সামান্য অদল বদল করা।

(২) মৃদু নিম্নগামী দামস্তর (A Gently Falling Price-Level) : অনেকের মতে, মুদ্রা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য এই হওয়া উচিত যে, দেশের দামস্তর

মৃদু নিম্নগামী হয়। দামস্তর মৃদু নিম্নগামী হইলে, দেশের শ্রমিক শ্রেণী ও যে সকল লোকের আয় অপরিবর্তনীয় ও স্থির, তাহারাই বিশেষ করিয়া আর্থিক উন্নতির **সুবিধা গ্রহণ করিতে** পারে। সাধারণতঃ, উৎপাদন ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রণালী **প্রবর্তনের** ফলে, গোটা আর্থিক ব্যবস্থার উন্নতি বৃদ্ধি পায়, এবং এই উন্নতির সমানুপাতিক দামস্তর ও হ্রাস পাইয়া থাকে।

কিন্তু, এই নীতি গ্রহণের ও ব্যবহারিক অসুবিধা আছে। **প্রথমতঃ**, কি **হারে আর্থিক** ব্যবস্থার উন্নতি বৃদ্ধি পায়, তাহা বাস্তবতঃ না দেখিলে সঠিক পরিমাপ করা যায় না। তাহা ছাড়া, একচেটিয়া কারবার, অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা **প্রভৃতির** উদ্ভব হেতু সময় ব্যবধানে দামস্তর কতটা নিম্নমুখী হয়, তাহা ও নির্ধারণ করা সহজ নহে। **দ্বিতীয়তঃ**, মুদ্রাসংকোচন দ্বারা জোর করিয়া দামস্তর নিম্নগামী করা মোটেই সমর্থন করা যায় না। কেননা, এই অস্বাভাবিক নীতি অবলম্বন করিলে, দেশের উৎপাদন পরিমাণ, কর্ম নিয়োগ, জাতীয় আয় প্রভৃতি সংকুচিত হয়।

(৬) মৃদু উর্ধ্বগামী দামস্তর (A Gently Rising Price-Level) : **অনেক অর্থবিদ্যাবিদ** মন্তব্য করেন যে, দেশের মুদ্রানীতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, যাহাতে দামস্তর ধীরে ধীরে উচ্চগামী হয় এবং তাহার ফলে ব্যবসায়ী ও উৎপাদক শ্রেণী উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে উৎসাহিত হয়। দামস্তর বৃদ্ধির ফলে যখন উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তখন দেশের মোট সম্পদের পূর্ণ নিয়োগ ও ব্যবহার সম্ভব হয়। দামস্তর উর্ধ্বগামী হইলে দেশের জাতীয় ঋণের বোঝা ও অনেক হ্রাস পায়।

কিন্তু, মুদ্রা নিয়ন্ত্রণের এ নীতির ও অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। **প্রথমতঃ**, উৎপাদন বৃদ্ধির উর্ধ্বগামী দামস্তরের উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত নহে। সংগঠনকর্তার স্বাভাবিক মুনাফাই উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে যথেষ্ট উৎসাহ যোগাইয়া থাকে। **দ্বিতীয়তঃ**, দামস্তর উর্ধ্বগামী হইলে অনেক সময় অনেক অকর্মণ্য উৎপাদকও উৎপাদন কার্যে ঢুকিয়া পড়ে। ইহা দেশের সমষ্টিগত অর্থনৈতিক কল্যাণের দিক হইতে সমীচীন নহে। **তৃতীয়তঃ**, দামস্তর উর্ধ্বগামী হইলে মুনাফার অংক বৃদ্ধির আশায়, ফাটকাবাজ কারবারে নামিয়া পড়ে ; তাহার ফলে, ব্যবসায় বাণিজ্য অস্বাভাবিক তেজী ভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। **পরিশেষে,** উর্ধ্বগামী দামস্তরের ফলে, শ্রমিক শ্রেণী ও যাহাদের আয় অপরিবর্তনীয়, তাহারা বিশেষ ভাবে বিপর্যস্ত হয়।

স্থির দামস্তর (Stable Price-level) : অনেকে আবার বলেন যে, যেহেতু মৃদু নিম্নগামী দামস্তর ও মৃদু উর্ধ্বগামী দামস্তর, উভয়েরই অসুবিধা ও অপগুণ

বর্তমান, সেই হেতু মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, দামস্তরের স্থিতি-স্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা। মুদ্রার একটি অন্যতম প্রধান ক্রিয়া, দ্রব্য বা কৃত্য মূল্য পরিমাপ করা। দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতার দ্বারাই মুদ্রার পরিমাপ ক্রিয়া ও ক্রয় ক্ষমতা যথাযথ বজায় থাকে। দামস্তরের স্থিরতা প্রতিষ্ঠা হইলে, অর্থব্যবস্থায় কোন বিশেষ শ্রেণীর উপর অযথা চাপ পড়ে না ; নিম্নমুখী বা ঊর্ধ্বমুখী দামস্তরের অসংলগ্নতা ও বিপর্যয় অবস্থা দূর হয় ; এবং বাণিজ্য চক্রের অপগুণ বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। তাহাছাড়া, দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা শ্রেণীগত আয়-বৈষম্য দূর করিয়া, ন্যায়ের ভিত্তিতে সমাজ-ব্যবস্থা গঠন করিতে সহায়তা করে।

কিন্তু, দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা, সাধারণতঃ, ব্যবসায় ও উৎপাদনে উৎসাহ যোগায় না। তাহাছাড়া, দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করার পথেও অনেক বাধাবিপত্তি আছে। প্রথম ও প্রধান সমস্যাই, কোন্ দামস্তরের—খুচরা না পাইকারী—স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আমরা যে কোন দামস্তরের স্থিরতাই প্রতিষ্ঠা করি না কেন, সূচক-সংখ্যা (index number) দ্বারা উহা নির্ধারণ করিতে হইবে। কিন্তু, সূচক-সংখ্যা নির্ণয় করার আবার বহু অসুবিধা আছে। সুতরাং, সূচক-সংখ্যা নির্ণয়ের সকল গলদ ও অসুবিধাগুলিই দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠার পথে বাধাস্বরূপ।

দ্বিতীয়তঃ, দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করিলেই যে মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচন আবির্ভাব হইবে না, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। যদি নূতন আবিষ্কার ও কারিগরি উন্নতির ফলে, উৎপাদন খরচ হ্রাস পায়, তাহা হইলে দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা সত্ত্বেও, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী প্রভৃতি অস্বাভাবিক মুনাফা লাভ করিবে। এই অস্বাভাবিক মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ব্যবসায় বাণিজ্যের তেজী ভাব আনয়ন করে।

তৃতীয়তঃ, পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ স্থাপিত হওয়ার পূর্বেই যদি দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা থাকিয়াই যাইবে।

চতুর্থতঃ, যদি কাঁচামাল ও উৎপাদক দ্রব্য চড়া মূল্যে আমদানী করিয়া উৎপাদনে নিয়োগ করিতে হয়, তাহা হইলে উৎপাদন খরচ অবশ্যই বৃদ্ধি পাইবে। এই অবস্থাতে দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা অর্থ, স্বাভাবিক মুনাফার হ্রাস পাওয়া ও উৎপাদন ব্যাহত হওয়া।

অতএব, সকল অবস্থাতে দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা বাঞ্ছনীয় নহে।

(৫) **নিরপেক্ষ মুদ্রা (Neutral Money) :** হায়েক (Hayek) প্রমুখ অনেক অর্থবিদ্যাবিদ মনে করেন যে, অর্থ-ব্যবস্থার যত বিপর্যয়, তাহার বেশীর ভাগই ঘটে মুদ্রা-যোগান পরিবর্তনের ফলে। সুতরাং, মুদ্রার যোগান পরিমাণ এমনভাবে ধার্য করা উচিত যে, দেশের অর্থ-ব্যবস্থার উপর উহার কোন প্রভাবই অনুভূত না হয়। তাঁহারা মনে করেন যে, নিরপেক্ষ মুদ্রা ব্যবস্থাতে অর্থ-যোগানের হ্রাস বৃদ্ধি দামস্তরের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিবে না। মুদ্রার নিরপেক্ষতা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহারা যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :

ব্যাংক মোট কার্যকরী অর্থ ও দাদন পরিমাণ এমনভাবে অপরিবর্তনীয় রাখিবে যে, অর্থ-নৈতিক উন্নতিও প্রগতির ফলে গড়পড়তা উৎপাদন খরচ যতটা হ্রাস পায়, দামস্তরও ঠিক সমানুপাতিক হ্রাস হইবে। অর্থাৎ দ্রব্য যোগান পরিবর্তনের সংগে সংগে, মুদ্রা-যোগান পরিমাণের কোনই পরিবর্তন হইবে না ; কিন্তু দ্রব্য-যোগানের বাড়তি ও কম্‌তির সংগে সংগে দামস্তর আপনা আপনি যথাক্রমে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইবে। অতএব, দাম-স্তরের পরিবর্তন হইবে উৎপাদন প্রগতির বিপরীত মুখী ; উৎপাদনের উন্নতি হইলে, দামস্তর হ্রাস পাইবে, আর উৎপাদনের মন্দা অবস্থায়, দামস্তর উর্ধ্বগামী হইবে। তবে অবশ্য সকল অবস্থাতেই মুদ্রার যোগান ধরাবাধাভাবে স্থায়ী রাখা সমীচীন হইবে না। যদি লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পায়, কিংবা মুদ্রার প্রচলন গতির হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে মুদ্রার যোগান পরিমাণের পরিবর্তন করিতে হইবে, যাহাতে কার্যকরী (effective) মুদ্রার যোগান স্থির থাকে।

নিরপেক্ষ মুদ্রা নীতিরও কতকগুলি বাস্তব অসুবিধা আছে। কার্যকরী মুদ্রা-যোগান স্থির রাখিতে হইলে, মুদ্রার প্রচলন গতির পরিবর্তনের সংগে সংগে, কিংবা উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন স্তরে ভাগ হইবার সংগে সংগে, মুদ্রার যোগান পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষে এই সকল পরিবর্তন সঠিক ভাবে অবগত হওয়া সহজ নহে। **দ্বিতীয়তঃ,** সাধারণ অর্থনৈতিক উন্নতি ও কারিগরি প্রক্রিয়ার প্রগতির ফলে উৎপাদন খরচ হ্রাস হইলেই যে দামস্তর হ্রাস পাইবে, তাহার কোন বাধ্যবাধকতা নাই। একচেটিয়া কারবার ও অপূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার ফলে, বাজারে অনেক দ্রব্যের মূল্য এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতে পারে যে, উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রবর্তনে উৎপাদন খরচ হ্রাস হইলেও ঐ সকল দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পায় না। ইহার ফলে, অন্যান্য দ্রব্যের মূল্য অধিক পরিমাণে কমিবে এবং উৎপাদনের প্রগুণতার ফল সকল শিল্প ব্যবসায়ের মধ্যে

সমানভাবে বণ্টিত হইবে না। আধুনিক অনেক অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করেন যে, দেশের অর্থব্যবস্থা প্রভাবান্বিত করিতে মুদ্রা যোগানই প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে। দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি নির্ভর করে, একদিকে সুদের হারের উপর, আর একদিকে সম্ভাব্য মুনাফা লাভের উপর। সুদের হার আবার নির্ভর করে মুদ্রা যোগানের উপর। মুদ্রা যোগান বৃদ্ধি পাইলে, সুদের হার হ্রাস পায়, এবং সুদের হার হ্রাস পাইলে দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, কর্মনিয়োগের সম্প্রসারণ হয় ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

(৬) পূর্ণ নিয়োগ ও সর্বোচ্চ উৎপাদন পরিমাণ (Full Employment and Maximum Output) : কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ দেশের মুদ্রা নীতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে নারাজ। তাঁহারা মনে করেন, দেশের মুদ্রা নীতির চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল (Economics) অর্থনীতি এবং মুদ্রানীতি অর্থনীতিরই বশংবদ। দেশের অর্থনীতির উদ্দেশ্য, পূর্ণ কর্ম নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত করা। দেশে পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হইলেই সর্বোচ্চ উৎপাদন সম্ভব হইবে। কীনস্ মনে করেন যে, এই পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে মুদ্রানীতির উপযোগিতা অত্যন্ত সীমিত। সেইজন্য সরকারকে রাজস্ব সম্বন্ধীয় (fiscal) নীতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এই নীতির মূলসূত্র হইল, নয়া মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। এইরূপ সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে, ব্যক্তিগত বিনিয়োগের দৈন্য দূর হইয়া পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

অনুশীলনী

1. Discuss the functions of Central Banks.
(C. U. B. A. '56)
2. Enumerate the functions of Central Banks. What methods do they adopt to control credit ?
(C. U. B. Com '56)
3. Discuss the main devices by which a modern Central Bank regulates the volume of credit in a community.
(C. U. Hons. '53)
3. How can you make a case for nationalisation of Central Banks ?
5. What should be the objectives of monetary policies ?

চতুঃত্রিংশ অধ্যায়

বৃত্তিহীনতা (Unemployment)

ধনতন্ত্রবাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা হইল, বেকার সমস্যা বা বৃত্তিহীনতার সমস্যা। অনেকে মনে করেন, বৃত্তিহীনতা একটি নৈতিক সমস্যা ; মানুষের ব্যক্তিগত ক্রটী-বিচ্যুতিতে ইহার গোড়া পত্তন হয় এবং মানুষের প্রচেষ্টাতেই ইহার প্রতিকার সম্ভব। অবশ্য, একথা সত্য যে, কিছু বৃত্তিহীনতা মজুর শ্রেণীর অলসতা প্রসূত ও স্বেচ্ছাকৃত (voluntary)। কিন্তু বৃত্তিহীনতার অধিকাংশ পরিমাণই অনিচ্ছাকৃত (involuntary)। মজুর কর্ম বা বৃত্তি গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও, সাম্প্রতিক মজুরি হারে কর্ম নিয়োগ মেলে না। বৃত্তিহীনতার কারণ মজুরের অলসপ্রিয়তা নহে, কর্মনিয়োগের সুযোগের অভাব। "It is not love of idleness but lack of opportunity to work which is the main cause of unemployment."

রকমারি বৃত্তিহীনতা (Different Forms of Unemployment) : বিভিন্ন কারণের জন্য বিভিন্ন আকারের বৃত্তিহীনতা দেখা দিতে পারে।

(১) ইচ্ছাকৃত বৃত্তিহীনতা (Voluntary Unemployment) : কর্ম-নিয়োগের সুযোগ সুবিধা বর্তমান থাকা সত্ত্বেও, যদি লোকে অলস প্রিয়তার জন্য কোন বৃত্তি গ্রহণ না করে, তাহা হইলে উহাকে ইচ্ছাকৃত বৃত্তিহীনতা বলা হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত বেকার পর-আয়পুষ্ট ও পর-গলগ্রহ জীব বিশেষ। তবে এই ধরণের বৃত্তিহীনতা অতি সামান্য ; অধিকাংশ বৃত্তিহীনতা অনিচ্ছাকৃত।

(২) স্বাভাবিক বা অবশিষ্টাংশ বৃত্তিহীনতা (Normal or Residual Unemployment) : শ্রমিকের চাহিদা প্রবল হইলেও, বেকারত্ব একেবারে মুছিয়া যায় না। যে সকল পেশা সাময়িক (seasonal occupation), উহাতে শ্রমিকের চাহিদা বা কর্ম-নিয়োগ গোটা বৎসর ব্যাপী থাকে না। যেমন, জেটিতে যে সকল মজুর কাজ করে, উহাদের নিয়োগ বৎসর ব্যাপী নহে। বৎসরের যে সময় জাহাজে মাল তুলিতে হয়, কিংবা নামাইতে হয়, কেবল-মাত্র সেই সময়ের জন্য তাহাদের নিয়োগ হইয়া থাকে। জলবায়ু, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সংগে, মানুষের রুচি ও আচার ব্যবহারের পরিবর্তনের সংগে, শ্রমিকের চাহিদার অনিয়মিতভাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে। যেমন, কৃষি-কার্যের চাষাবাদের সময় দিনমজুরের চাহিদা বাড়ে ; আবার যখন কৃষি-

কার্যের কোন চাপ থাকে না, তখন কৃষাণগণ একরূপ বেকার বসিয়া থাকে। অনেক সময় এক বৃত্তি হইতে বৃত্তান্তর গ্রহণের জন্য, কিংবা শিক্ষানবিশী থাকার দরুণ, শ্রমিকের সাময়িকভাবে কোন কর্ম-নিয়োগ থাকে না। ইহাকে frictional unemployment বলা হয়।

(৩) গাঠনিক বৃত্তিহীনতা (Structural Unemployment): শিল্প সংগঠনের আমূল পরিবর্তনের ফলে, কিংবা প্রধান প্রধান শিল্পের ধ্বংসের ফলে, কিংবা শিল্প স্থানান্তরিত হইলে, শ্রমিকের যে বেকারত্ব ঘটে, উহাকে গাঠনিক বৃত্তিহীনতা বলে। নূতন আবিষ্কারের ফলে, উৎপাদনে নূতন কারিগরি পদ্ধতির যখন প্রবর্তন হয়, কিংবা কোন বিশিষ্টতা সম্পন্ন যন্ত্রের প্রচলন হয়, তখন যে শ্রমিক নিয়োগ সংকুচিত হয়, তাহাকেও গাঠনিক বৃত্তিহীনতা বলা হয়। শিল্প-সংস্কারের (rationalisation) পরিকল্পনা কার্যকরী হইলে, যে শ্রমিক নিয়োগ সংক্ষেপ করিতে হয়, তাহার ফলেও এই ধরণের বেকারত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই ধরণের বৃত্তিহীনতা সাময়িক নহে; কেননা, কর্ম-নিয়োগের সুযোগ একমাত্র স্থায়ীভাবে সংকুচিত হইলেই ইহার আবির্ভাব হয়।

চাক্রিক বৃত্তিহীনতা (Cyclical Unemployment): ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি সাবলীল নহে; চক্রবৎ পরিবর্তিত হয়। কখনও বাণিজ্য চক্র সমৃদ্ধির উর্ধ্ব শিখরে আরোহন করে, যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়, উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ও কর্ম-নিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। আবার কখনও বা বাণিজ্যের গতি নিম্নমুখী হয়, যখন দামস্তর হ্রাস পায়, উৎপাদন হ্রাস পায় ও কর্ম-নিয়োগ অত্যন্ত সংকুচিত হয়। "The trade cycle is primarily an employment cycle." বাণিজ্য চক্রের সংকট বা মন্দাবস্থায় যে বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হয়, উহাকে চাক্রিক বৃত্তিহীনতা বলে।

বৃত্তিহীনতার কারণ (Causes of Unemployment): বৃত্তিহীনতার কারণ বিশ্লেষণ ব্যাপারে অর্থনীতিজ্ঞদের মধ্যে মত বিরোধিতা দেখা যায়। ক্লাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণ বৃত্তিহীনতার যে কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, কীনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ সে ব্যাখ্যান অস্বীকার করেন।

ক্লাসিক্যাল ব্যাখ্যান

ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদগণ অনুমান করেন যে, পূর্ণ নিযোগই অর্থব্যবস্থার স্বাভাবিক অবস্থা। প্রতিযোগিতা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা এত সংকোচন-প্রসারণ সাপেক্ষ (elastic) যে, দ্রব্যের যোগানই উহার চাহিদার সৃষ্টি করে; এবং মানুষের আয় এমনভাবে স্বতঃব্যয়িত

হয় যে, দীর্ঘকালে দেশের উৎপাদক সম্পদের বেকারত্ব ঘুচিয়া পূর্ণনিয়োগ সম্ভব হইয়া থাকে।

তবে অল্পকালীন মিয়াদে যে বৃত্তিহীনতার উদ্ভব হয়, তাহার জন্য দায়ী মজুররা নিজে। মজুরশ্রেণী এমনভাবে সংঘবদ্ধ যে, মালিক শ্রেণী কিছুতেই মজুরির হার হ্রাস করিতে পারে না। এমন কি, যখন পণ্যমূল্যের নিম্নগতি দেখা যায়, তখনও শ্রমিক সংঘের জোটবন্দি দামদস্তুর ও প্রতিরোধ ক্ষমতার প্রাবল্য অবজ্ঞা করিয়া মালিক শ্রেণী মজুরির হার হ্রাস করিতে সক্ষম হয় না। ফলে, তাহারা শ্রমিক ছাটাই করিতে বাধ্য হয়। ক্লাসিক্যাল লেখকগণের মতে, শ্রমিক নিম্নহারে মজুরি গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেই যেন বৃত্তিহীনতার সমস্যা আর দেখা দিতে পারে না। তাঁহাদের মতে, বৃত্তিহীনতা যেন শ্রমিকের স্বেচ্ছাকৃত কর্মফল।

লর্ড কীনসের ব্যাখ্যান

লর্ড কীনস্ বৃত্তিহীনতার এই ব্যাখ্যান সমর্থন করেন না। তাঁহার মতে, বৃত্তিহীনতা শ্রমিকের সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত; এবং যে সকল কারণ ও ঘটনা পরম্পরায় ইহার উৎপত্তি, উহার উপর শ্রমিকের কোনই হাত নাই। কর্ম-নিয়োগের সাধারণ এক তত্ত্ব দ্বারা কীনস্ বৃত্তিহীনতার ব্যাখ্যান করিয়াছেন। দেশের কর্ম-নিয়োগ প্রধানতঃ নির্ভর করে দেশের মোট কার্যকরী চাহিদার (effective demand) উপর, শ্রমিকের উচ্চ মজুরি দাবীর ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপর নহে। শ্রমিকের কার্যকরী চাহিদা আবার, সমাজের মোট খাদন ব্যয় (consumption expenditure) ও বিনিয়োগ ব্যয়ের (investment expenditure) উপর নির্ভর করে। মোট খাদন ব্যয় নির্ধারিত হয়, সমাজের আয় ও সঞ্চয় পরিমাণের সম্বন্ধ দ্বারা। সাধারণ মনোস্তাত্ত্বিক নিয়ম এই যে, যে পরিমাণে মানুষের আয় বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই অনুপাতে খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় না। আর্থিক উন্মার্গগামী দেশে, খাদন প্রবণতা অপেক্ষাকৃত স্বল্প, সঞ্চয় প্রবণতা অধিক। ইহার ফলে ভোগ্যবস্তুর উপর ব্যয় কার্পণ্য ঘটিয়া থাকে। এই খাদন ব্যয় কার্পণ্য, যদি বিনিয়োগ ব্যয় বৃদ্ধি দ্বারা পূরণ করা না হয়, তাহা হইলেই কার্যকরী চাহিদার হ্রাস হইয়া কর্ম-নিয়োগ সংকুচিত হইবে। অপরপক্ষে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি নির্ভর করে, পুঁজির ভবিষ্যৎ মুনাফা লাভের সম্ভাবনা ও সুদের হারের সম্পর্কের উপর। উন্নত অর্থ-ব্যবস্থায় মুনাফা লাভের সম্ভাবনা সীমিত বলিয়া, বিনিয়োগ বৃদ্ধির সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং সেই কারণবৃত্তিহীনতাও কালস্থায়ী (chronic) ব্যাধিস্বরূপ দেখা যায়। (কর্মনিয়োগ ও বৃত্তিহীনতার আরও ব্যাপক বিশ্লেষণ পরে দ্রষ্টব্য।)

প্রতিকার (Remedies) : বৃত্তিহীনতা ধনতান্ত্রিক অর্থ-ব্যবস্থার অন্যতম সহজাত গলদ। উহা সম্পূর্ণ উৎখাত করা সম্ভব নয়। তবে উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা দ্বারা সমস্যা আয়ত্বে আনিয়া উহার গুরুত্ব হ্রাস করা যায়। সাময়িক বৃত্তিহীনতা ঘুচাইতে হইলে এমনভাবে পরিকল্পনা করিতে হইবে যে, অনিয়মিত সাময়িক পেশাতে নিয়োজিত শ্রমিক বেকার অবস্থায় বিকল্প কর্ম গ্রহণ করিতে পারে।

কারিগরি বৃত্তিহীনতা ঘুচাইতে হইলে শ্রমিকের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া উহার গতিশীলতা বৃদ্ধি করিতে হয়।

চাক্রিক বৃত্তিহীনতা প্রতিরোধ করিতে হইলে ব্যবসায় বাণিজ্যের মন্দার গতি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অপরিহার্য। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কার্যকরী করিতে হইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রা সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করিতে হয়। বাট্টাহার হ্রাস করিয়া, খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া, কিংবা সদস্য ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ অনুপাত কমাইয়া দিয়া, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিনিয়োগ বৃদ্ধির সহায়তা করিয়া কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতে পারে।

সমাজের খাদন ব্যয় বৃদ্ধি দ্বারা ও কর্ম নিয়োগ সম্প্রসারণ করা যায়। এই খাদন ব্যয় বৃদ্ধি নির্ভর করে, জাতীয় আয় বণ্টনের বৈষম্য দূরীকরণের উপর। সমাজের আয় বৈষম্য যত বেশী দূর করা যায়, তত বেশী খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সরকার ক্রমবর্ধমান কর ব্যবস্থা (progressive taxation) প্রবর্তন করিয়া, সমাজের আয় বণ্টনের বৈষম্য অনেকটা দূর করিতে পারে। যদি উচ্চ আয়স্তরে অধিষ্ঠিত শ্রেণীর উপর অধিক করভার চাপান হয়, আর নিম্ন আয়স্তরে অধিষ্ঠিত শ্রেণীর উপর করভার হাল্‌কা বা একেবারে মকুব করা যায়, তাহা হইলে অনেকটা আয় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং ফলে, সমাজের খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়া কর্মনিয়োগ সম্প্রসারিত হইবে।

কর ব্যবস্থা ছাড়া, আর একটি রাজস্ব সম্পর্কীয় নীতি কার্যকরী করিয়া পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠার পথে সরকার যথেষ্ট সহায়তা করিতে পারে। সরকার জনহিতকর, উন্মার্গগামী নির্মাণ কার্যের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়া বিপুল ব্যয় পর্ব সুরু করিবে। সরকারী এই ব্যয় নীতিকে **পরিপূরক ব্যয়** (compensatory spending) বলা হয়। এই ব্যয় কার্য দ্বারা যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, তাহাতে কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। নূতন করভার চাপাইয়া এই বিপুল ব্যয় নির্বাহ করা সম্ভব নয়। ঋণ গ্রহণ ও নয়া মুদ্রার সৃষ্টি করিয়া, ঘাটতি ব্যয়ের

দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতঃ, সরকার আর্থিক মন্দা রোধ ও নূতন কর্ম নিয়োগ সৃষ্টির সহায়তা করিতে পারে।

জাতীয় আয় ও কর্ম নিয়োগের আর ও ব্যাপক বিশ্লেষণ (Further Income-Employment Analysis): কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে, একমাত্র কর্ম নিয়োগ দেখিয়াই দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে চলিতেছে কিনা সাব্যস্ত করা যায়। কর্ম নিয়োগ পরিমাণ দ্বারা, তথা জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ধারণা করিতে পারি, মানুষের জীবন যাত্রার মান কি। কর্ম নিয়োগ সংকুচিত ও জাতীয় আয় হ্রাস হইলেই, মানুষের আর্থিক দুর্দ্দশার ইংগিত পাওয়া যায়; আবার কর্ম নিয়োগ সম্প্রসারিত ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইলেই, মানুষের আর্থিক স্বচ্ছলতার সংকেত পাওয়া যায়।

জাতীয় আয় ও কর্ম নিয়োগের নির্ধারক (Income-Employment Determinants): কর্ম নিয়োগেব আয়তন ও জাতীয় আয়ের স্তর নির্ভর করে, আর্থিক ব্যবস্থার মোট চাহিদার উপর। উৎপাদনের পরিমাণ আবার কর্ম নিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয়। নিয়োগের যদি সম্প্রসারণ হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে।

গোটা সমাজের চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধিতেই উৎপাদনের ও কর্ম নিয়োগের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। সমাজের চাহিদা বৃদ্ধি হইলে, উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে; উৎপাদন বৃদ্ধি পাইলে, অধিক লোকের কর্ম নিয়োগ হইবে। সমাজের কার্যকরী চাহিদা আবার নির্ভর করে, গোটা সমাজের ব্যয়ের উপর। গোটা সামাজিক ব্যয় হয়, খাদন দ্রব্যের উপর ও বিনিয়োগে।

খাদন প্রবণতা ও উহার নির্ধারক (Propensity to Consume and Its Determinants): মানুষের খাদন ব্যয় বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে, তাহার মধ্যে আয়স্তর অন্যতম। আয়স্তরের বৃদ্ধির সংগে খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পায় বটে; কিন্তু, আয়স্তর যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, খাদন ব্যয় একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না। খাদকের বাড়্তি আয়ের কতটা অনুপাত সে খাদনে ব্যয় করিবে, তাহা নির্ধারিত হয় তাহার খাদন প্রবণতা দ্বারা। খাদন প্রবণতা, তাহার আয় ও খাদনের মধ্যে যে সম্বন্ধ, উহার অনুপাতের পরিমাপ। মোট খাদন ব্যয়কে মোট আয়দ্বারা ভাগ করিলেই খাদন প্রবণতা পরিমাপ করা যায়।

খাদন প্রবণতা একদিকে যেমন আয়ের উপর নির্ভর করে, অন্যদিকে আবার আয় বণ্টনের উপর ও বিশেষ ভাবে নির্ভর করে। যাহারা উচ্চ আয়স্তরে অধিষ্ঠিত,

তাহাদের খাদন প্রবণতা কম; আর যাহারা নিম্ন আয়স্তরে অধিষ্ঠিত, তাহাদের খাদন প্রবণতা বেশী। যে সমাজে আয় বৈষম্য কম, সেখানে খাদন প্রবণতা বেশী। **দ্বিতীয়তঃ**, খাদন প্রবণতা দেশের কর ব্যবস্থার উপর ও নির্ভরশীল। সাধারণতঃ, করভার যত অধিক হইবে, আয়স্তর তত হ্রাস পাইবে এবং খাদন প্রবণতা ও কম হইবে। অনেক অপ্রত্যক্ষ কর আছে, যেমন, বিক্রয় কর, আবগারী কর প্রভৃতি, যাহার চাপ ধনীর চেয়ে গরীবের উপরই বেশী পড়ে। এই সকল কর আয় বৈষম্য বৃদ্ধি করিয়া খাদন প্রবণতা হ্রাস করে। **তৃতীয়তঃ**, খাদন প্রবণতা বাজারে সুদের হারের উপর ও নির্ভর করে। সুদের হার যদি বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে মানুষের সঞ্চয় বৃদ্ধি হইবে, নগদ টাকার পরিমাণ হাতে কম রাখিবে এবং খাদন ব্যয় হ্রাস পাইবে। **চতুর্থতঃ**, খাদন প্রবণতা ভবিষ্যৎ দামস্তরের উঠানামা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। যেমন, মানুষ যদি ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এমন অনুমান করে, তাহা হইলে তাহার সাম্প্রতিক খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইবে। ইহা ছাড়া, খাদকের হাতে দ্রব্যের বর্তমান পুঁজি, অন্য দেশের সংগে তাহার দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্ক প্রভৃতি, তাহার খাদন প্রবণতা প্রভাবান্বিত করিয়া থাকে। তবে, খাদন প্রবণতার উপর এই সকল নির্ধারকের প্রভাব অস্বাভাবিক অবস্থায় দেখা যায়। সাধারণতঃ, খাদন প্রবণতা আয়ের অনুপাতে স্থিতিশীল।

বিনিয়োগ ও ইহার নির্ধারক (Investment and its Determinants): আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, সমাজের মোট আয়ের একটা অংশ খাদনে ও আর একটা অংশ বিনিয়োগে ব্যয়িত হয়। কিন্তু খাদন ব্যয় সাধারণতঃ স্থিতিশীল; সেইজন্য বিনিয়োগ ব্যয়ের হ্রাস-বৃদ্ধিই জাতীয় আয় ও কর্মনিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধির প্রধান নির্ধারক।

বিনিয়োগ বেসরকারী (private), সরকারী (public) এবং বৈদেশিক (foreign) হইতে পারে। ব্যক্তিগত বে-সরকারী বিনিয়োগ দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: (১) পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা (marginal efficiency of capital) ও (২) সুদের হার। পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা অর্থ, বর্তমানে পুঁজিপাটি বিনিয়োগ করিয়া যে খরচ করা হয়, তাহার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ আগম। যদি সুদের হার একই থাকে, তাহা হইলে মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা বৃদ্ধির সংগে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে। আবার, মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা একই থাকিলে, সুদের হারের বৃদ্ধির সংগে ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে।

যতক্ষণ মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা সুদের হারের চেয়ে বেশী থাকবে, ততক্ষণ ব্যক্তিগত বে-সরকারী বিনিয়োগ বাড়িতেই থাকবে। মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা ও সুদের হার এক সমান হইলেই, বিনিয়োগ বৃদ্ধি বন্ধ হইবে।

মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা ও ইহার নির্ধারক (Marginal Efficiency of Capital and its Determinants) : মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে। উৎপন্ন পণ্যের সাম্প্রতিক ও ভবিষ্যৎ চাহিদা মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতাকে প্রভাবান্বিত করে। বর্দ্ধিষ্ণু জনসংখ্যা পণ্য চাহিদা বিস্তৃত করিয়া মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা বৃদ্ধি করে। উৎপাদকের হাতে দ্রব্যের বর্তমান পুঁজি যদি অধিক থাকে, তাহা হইলে মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা হ্রাস পাইবে। উৎপাদন পদ্ধতির ও কারিগরি প্রথার যদি উন্নয়ন হয়, তাহা হইলে ও মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা বৃদ্ধি পায়। ইহা ছাড়া, দেশের কর ব্যবস্থা, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আত্মনির্ভরতা প্রভৃতি ও মূলধনের প্রগুণতাকে প্রভাবান্বিত করে। যদি করভার অধিক হয়, তাহা হইলে মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা হ্রাস পাইবে। যদি ব্যবসায় বাণিজ্য ক্ষেত্রে শুভ ইংগিত পাওয়া যায় এবং ফলে, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের আত্ম নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলেও মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা বৃদ্ধি পাইয়া বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে।

সুদের হার ও ইহার নির্ধারক (Rate of Interest and Its Determinants) : সুদের হার বৃদ্ধি পাইলে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে ও তাহার ফলে ব্যক্তিগত বে-সরকারী বিনিয়োগের পরিমাণ হ্রাস পাইবে। উচ্চ সুদের হার সিকিউরিটির মূল্য মন্দা করে, এবং তাহার ফলেও বিনিয়োগ হ্রাস পায়। কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করেন যে, বিনিয়োগের উপর সুদের হারের প্রভাব ধর্তব্যের মধ্যে নহে ; তাঁহাদের মতে, মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতার উপরই বিনিয়োগ বিশেষভাবে নির্ভর করে। ইহা অবশ্য সত্য যে, ঝুঁকি-বহুল বিনিয়োগ বৃদ্ধি সুদের হারের হ্রাস-বৃদ্ধির উপর নির্ভর করে না ; এক্ষেত্রে মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতাই প্রধান নির্ধারক। কিন্তু ব্যবসায়ীর প্রান্তিক বিনিয়োগ প্রভাবান্বিত করিতে সুদের হারের হ্রাস প্রধান নির্ধারক।

সুদের হার নির্ভর করে মুদ্রার চাহিদা ও মুদ্রা যোগানের উপর। মুদ্রার চাহিদা নির্ধারিত হয়, নগদ মুদ্রার পছন্দনীয়তার (liquidity preference) দ্বারা ; মুদ্রার যোগান ধার্য হয় দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতি দ্বারা। (ব্যাপক বিশ্লেষণের জন্য কীনসের সুদ তত্ত্ব দ্রষ্টব্য।)

বিনিয়োগ ও আয়ের সম্পর্ক : গুণনীয়ক তত্ত্ব (Relationship between Investment and Income : Multiplier Concept) : কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মন্তব্য করেন যে, যখন ব্যক্তিগত বে-সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না, (যেমন আর্থিক মন্দার সময়) তখন সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে হয়। মন্দার সময় যখন বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় না, তখন সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে কর্মসংস্থান সম্প্রসারিত হইয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়। সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে যে অনুপাতে আয় বৃদ্ধি পায়, সেই সম্পর্ক বুঝাইতে কীনস্ বিনিয়োগ গুণনীয়ক (Investment Multiplier) ধারণার অবতারণা করিয়াছেন। কীনসের মতে, সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পাইবেই। বিনিয়োগ যদি I হয়, Y যদি আয় হয়, আর k যদি গুণনীয়ক হয়, তাহা হইলে I বৃদ্ধি করিলে Y বৃদ্ধি হইবে বিনিয়োগের k গুণ। অর্থাৎ Y বৃদ্ধি = k × I বৃদ্ধি।

কীনসের গুণনীয়ক তত্ত্ব বুঝিতে হইলে, খাদন প্রবণতা ধারণাটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। আমরা জানি, কোন আয়ের কিছুটা অনুপাত খাদনে ও কিছুটা অনুপাত বিনিয়োগে ব্যয়িত হয়। যেমন, যদি আয় বৃদ্ধি পায় ১০৲ তাহা হইলে ৯ খাদনে ও ১ বিনিয়োগে ব্যয়িত হইতে পারে। যদি উহাদের অনুপাত ও সম্পর্ক না বদলায়, তাহা হইলে বিনিয়োগ ১ বৃদ্ধি পাইলে খাদন বৃদ্ধি পাইবে ৯ ও আয় বৃদ্ধি পাইবে ১০। বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে, আয় বৃদ্ধি পাইবে ঠিক কতটা, তাহা আমরা সঠিক বাহির করিতে পারি, যদি খাদন প্রবণতা জানা থাকে। এই ক্ষেত্রে $k = \frac{১০}{১}$ অথবা $k = \frac{\Delta y}{\Delta I}$

মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন বিনিয়োগ ও আয়স্তরে, বিভিন্ন গুণনীয়ক হয় ; কেননা, আয়স্তর পরিবর্তনের সংগে সংগে খাদন প্রবণতারও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

বাস্তব ক্ষেত্রে গুণনীয়ক ধারণাটির সার্থকতা কি? খাদন প্রবণতার বিশেষ অবস্থায় সরকার বিনিয়োগে ব্যয় করিলে, আয়স্তর ও কর্ম-নিয়োগের উপর উহার ফলাফল দেখা যায়? সরকার বিনিয়োগে অর্থ ব্যয় করিলে, কর্ম-নিয়োগের সম্প্রসারণ ও আয় বৃদ্ধি হয়। ইহাকে প্রাথমিক কর্ম-নিয়োগ বলে (primary employment)। বর্দ্ধিত আয়ের কিছুটা অন্ততঃ খাদনে ব্যয়

হয়। এই খাদন ব্যয়ের ফলে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পে আবার কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ইহাকে দ্বিতীয় নিয়োগ (secondary employment) বলা যায়। এই দ্বিতীয় নিয়োগের ফলেও আবার আয় বৃদ্ধি হয়। নিয়োগ বৃদ্ধি ও আয় বৃদ্ধির প্রক্রিয়া এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে, অবশ্য বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমিয়া আসে। কীনসের গুণনীয়ক তত্ত্ব দ্বারা আমরা জানিতে পারি, কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে, মোট আয় ও কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি কতটা পরিমাণ হয়।

কীনসের বিনিয়োগ গুণনীয়ক তত্ত্বের সারমর্ম আমরা আলোচনা করিয়াছি। ক্যান্ (Kahn) সাহেব নিয়োগ গুণনীয়ক (Employment Multiplier) বাচক আর একটি ধারণা ব্যাখ্যান করিয়াছেন। সরকারী শিল্প বিনিয়োগের দ্বারা প্রাথমিক কর্মনিয়োগ বৃদ্ধি হইলে, তাহার ফলে যে অনুপাতে মোট কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, তাহাকে ক্যান্ **নিয়োগ গুণনীয়ক** আখ্যা দিয়াছেন। বিনিয়োগ দ্বারা সরকার যখন জনহিতকর কিংবা উন্নয়ন কার্য স্বুরু করে, তাহার ফলে প্রাথমিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ শুধু প্রাথমিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করিয়াই নিঃশেষ হয় না। সরকারী শিল্প বিনিয়োগের ফলে প্রাথমিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হইলে, প্রতিক্রিয়া হিসাবে ভোগ্যদ্রব্য শিল্পেও আবার কর্ম-নিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। প্রাথমিক কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধির ফলে মোট কর্ম-নিয়োগ যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, উহাই নিয়োগ গুণনীয়ক।

বেগবর্ধন নীতি (Accleration Principle) : কীনসের গুণনীয়ক তত্ত্বে আমরা দেখিয়াছি, কেমন করিয়া সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি খাদন ব্যয়ের বৃদ্ধিসাধন করিয়া তাহার মাধ্যমে জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করে। কিন্তু সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে খাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইলে, আর একটি প্রতিক্রিয়া বা ফল দেখা দিতে পারে। খাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, আবার বে-সরকারী বিনিয়োগও বৃদ্ধি পাইতে পারে। খাদন ব্যয় বৃদ্ধির ফলে, যে অনুপাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়. বেগবর্ধন নীতি উহাই ইংগিত করে।

সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির সমষ্টিগত ফলাফল (leverage effects) জাতীয় আয়ের উপর কি হয়, তাহা জানিতে হইলে বিনিয়োগ গুণনীয়ক ধারণা ও বেগবর্ধন নীতির প্রাতিক্রিয়া সম্মিলিতভাবে লক্ষ্য করিতে হয়। সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে, গুণনীয়ক ও বেগবর্ধনের সম্মিলিত প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল দেখা যায়। সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে, জাতীয়, আয় কোন্

স্তরে বৃদ্ধি পাইবে, তাহা গুণনীয়ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। জাতীয় আয় বৃদ্ধি আবার বে-সরকারী বিনিয়োগ সম্প্রসারণে উৎসাহ যোগায়। এই বিনিয়োগ সম্প্রসারণ আবার গুণনীয়ক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সক্রিয় হইয়া আয় বৃদ্ধি করিতে থাকে। এই আয় বৃদ্ধিতে আবার বিনিযোগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে, যতক্ষণ না পূর্ণ নিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

পূর্ণ নিয়োগ ধারণা (Concept of Full Employment) : পূর্ণ নিয়োগ ধারণাটি অর্থশাস্ত্রে প্রথম আমদানী করিযাছেন লর্ড কীনস্ ও তাঁহার শিষ্য-স্থানীয় অন্যান্য অনুগামী অর্থবিদ্যাবিদগণ। পূর্ণনিয়োগ বলিতে এমন এক অর্থব্যবস্থাকে বুঝায়, যাহাতে বৃত্তিহীনতার পরিমাণ অবম (minimum)। পূর্ণ নিযোগ অর্থ এই নয় যে, এই ব্যবস্থায় কেহই বেকার নহে। অর্থ-ব্যবস্থায় পূর্ণ নিযোগ স্থাপিত হইলেও, কিছু না কিছু লোক বৃত্তিহীন অবস্থায় থাকে। যেমন, অলস ধনিকশ্রেণী, স্বেচ্ছাকৃত বৃত্তিহীন। জরা, পীড়াগ্রস্ত লোক বৃত্তি গ্রহণের অযোগ্য। দেশের আচার-ব্যবহার ও আইন কানুনের জন্য কিছু লোক বেকার থাকে। যেমন, নির্দিষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে, শিশুরা কোন বিশেষ বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে না। ইহা ছাড়া, শ্রমিক যখন এক বৃত্তি হইতে বৃত্ত্যান্তর গ্রহণ করে, কিংবা শিক্ষা গ্রহণের জন্য নিযুক্ত হয়, তখন কিছু সমযের জন্য উহারা সাময়িকভাবে বৃত্তিহীন (frictional unemployment) হয়। পূর্ণ নিযোগ ধারণাটির আসল তাৎপর্য এই যে, ইহা সেই অর্থব্যবস্থায় বর্তমান, যেখানে সকল কর্মক্ষম বক্তিই উপযুক্ত মজুরিতে নিয়োগ পাইতে সমর্থ হয়।

বিগত বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দার সময় দেখা গিয়াছে যে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবলমাত্র মুদ্রানীতি নিযন্ত্রণদ্বারা বাণিজ্য-চক্রের গতি প্রতিরোধ করিয়া পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে অপারগ। পূর্ণ নিয়োগ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইলে রাজস্ব সম্বন্ধীয় নীতি নিয়ন্ত্রণ করা সরকারের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। সরকারের কর ব্যবস্থা, ঋণ নীতি ও ব্যয় ব্যবস্থা এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ ও তদারক করা উচিত, যাহাতে দেশে কোন অনাবশ্যক বৃত্তিহীন কারক বর্তমান না থাকে। পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে সরকারের রাজস্ব সংক্রান্ত যে সকল নীতি কার্যকরী করা উচিত, তাহার ব্যাপক আলোচনা আমরা পরে করিব।

মজুরি ও কর্ম নিয়োগের মধ্যে সম্বন্ধ (Relation between Wages and Employment) : মজুরির হার ও কর্ম-নিয়োগের মধ্যে সম্পর্ক অতি

জটিল। মজুরির হার হ্রাস পাইলে, কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়, না হ্রাস হয়, তাহা সঠিকভাবে কেহই বলিতে পারে না।

মজুরি ও কর্ম-নিয়োগের সহজ সম্বন্ধ এইরূপ: মজুরির হার বৃদ্ধির ফলে কর্ম-নিয়োগ হ্রাস পায়; আবার মজুরির হার হ্রাস পাইলে, কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। কোন একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে শ্রমিকের মজুরি হ্রাসের ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ব্যয় সংকোচ হয়। আবার উৎপাদন ব্যয় সংক্ষেপের দরুণ, প্রতিষ্ঠানের বিক্রির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। ফলে, প্রতিষ্ঠান শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করিতে পারে।

কিন্তু দেশের সমস্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের মজুরির হার হ্রাস হইলে কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে না। সাধারণ মজুরি ছাটাই হইলে শ্রমিকের অর্থ-আয় হ্রাস পাইবে এবং শিল্প-দ্রব্যের মোট চাহিদা কমিবে। তাহাতে কর্ম-নিয়োগ সংকুচিত হইবে। কিন্তু মজুরি ছাটাই দ্বারা সমাজের মোট চাহিদা কমিলে, পরোক্ষভাবে আবার কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধিও পাইতে পারে। সমাজের মোট চাহিদা কমিলে, ব্যবসায় কারবার সংকুচিত হয়। ব্যবসায় কারবার সংকোচনের ফলে, অর্থের চাহিদা হ্রাস পায়; তাহার ফলে সুদের হার হ্রাস পায়। সুদের হার হ্রাস পাইলে, বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে কর্ম-সংস্থানও বৃদ্ধি পায়। তাহা ছাড়া, মজুরির সাধারণ হারের ছাটাই হইলে, কারবারী প্রতিষ্ঠান অন্যান্য কারকের পরিবর্তে অতিরিক্ত পরিমাণ শ্রম পরিবর্তক হিসাবে নিয়োগ করে। তাহাতেও কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। তবে মজুরি হারের হ্রাসের সংগে সংগে, যদি অন্যান্য কারকমূল্যও হ্রাস পায়, তাহা হইলে অতিরিক্ত শ্রম অন্যান্য কারকের পরিবর্তক হিসাবে নিয়োগ করিয়া কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না। সাধারণ মজুরি ছাটাইএর ফলে, দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াও কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে। যদি কোন দেশে মজুরির সাধারণ হার ছাটাই করা হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের রপ্তানী দ্রব্য বৈদেশিক বাজারে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যে বিক্রিত হইবে এবং ঐ দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত লাভ অপ্রতিকূল হইবে। ইহাতে ঐ দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া, কর্ম-নিয়োগ সম্প্রসারিত হইবে।

সাধারণ মজুরীর হার ছাটাইএর ফলে কর্ম নিয়োগ সংকোচন ও সম্প্রসারণ

মজুরি ছাটাইএর ফলে, কেবল যে বিনিয়োগের হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়াই কর্ম-নিয়োগ প্রভাবান্বিত হয়, তাহা নহে। মজুরি ছাটাইএর ফলে, দেশের খাদন

প্রবণতার পরিবর্তন ঘটিয়াও, কর্ম-নিয়োগের সংকোচন-প্রসারণ হইতে পারে। মজুরি ছাটাই নীতির ফলে, শ্রমিকের অর্থ-আয় হ্রাস পাইয়া সমাজের খাদন প্রবণতা সংকুচিত হয়। ইহার ফলে কর্ম-সংস্থান সংকুচিত হয়। আবার, পরোক্ষভাবে মজুরি ছাটাইএর ফলে খাদন-প্রবণতা বৃদ্ধি পাইতে পারে। মজুরি ছাটাইএর দরুণ শ্রমিকের অর্থ-আয় হ্রাস পাইয়া দামস্তরও হ্রাস পায়। দামস্তরের হ্রাসের ফলে, মানুষের নগদ সম্পত্তি ও সঞ্চয়ের মূল্য বৃদ্ধি পায়। তাহার ফলে তাহারা খাদন ব্যয় বৃদ্ধি করিতে পারে। এইরূপ খাদন ব্যয় বৃদ্ধিতে কর্ম-নিয়োগ সম্প্রসারিত হয়।

অনুশীলনী

1. What are the different types of unemployment that occur in a modern society? How should we try to cure the evil? (C. U. B. A. '52)
2. Analyse the different types of unemployment. What are the causes of unemployment? (C, U. B. A. '55)
3. Classify the principal types of unemployment and suggest some possible remedies. (C. U. B. Com '53)
4. Examine how far a reduction of wage rates is effective in reducing unemployment? (C. U. Hons. '49)

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়

বাণিজ্য চক্র (Trade or Business Cycles)

অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি সাবলীল নহে; বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মুখী। কখন ও উহাদের গতি উর্ধ্বমুখী, কখন ও বা নিম্নগামী। অর্থনৈতিক কার্যক্রম ও ব্যবসায় বাণিজ্যের এই বিভিন্নমুখী গতিকে বাণিজ্য-চক্র বলা হয়। এই গতির দুইটি ভিন্নমুখী পর্যায় আছে: এক, তেজী অবস্থা, আর এক, মন্দা অবস্থা। দুইটি পর্যায়ের অভ্যুত্থান হয় চক্রবৎ। তেজী অবস্থার পর মন্দা আসে, আবার মন্দার পর তেজী অবস্থার সূচনা হয়। তেজী অবস্থায় ব্যবসায় বাণিজ্য অত্যন্ত ফাঁপিয়া উঠে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধি পায় ও কর্ম নিয়োগ

সম্প্রসারিত হয়। মন্দা অবস্থায় ব্যবসায় বাণিজ্যের ঘাটতি হয়, পণ্যমূল্যের নিম্নগতি হয়, ও বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। "The cyclical fluctuations are composed of periods of good trade characterised by rising prices and low unemployment percentages, alternating with periods of bad trade characterised by falling prices and high unemployment percentages."

বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় (Course or Different Phases of Trade Cycles): স্বাভাবিক বাণিজ্য-চক্রের চারটি বিভিন্ন পর্যায় আছে। আমরা এই পর্যায়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে আলোচনা করিতেছি।

পুনরভ্যুদয় (Revival or, Recovery)

অতি মন্দা অবস্থার মধ্য হইতে যে স্তরের সুরু, উহাকে **পুনরভ্যুদয়** পর্যায় বলে। এই পর্যায়ের মিয়াদ বা কার্যকাল ততদিন পর্যন্ত, যতদিন না ব্যবসায়ী কারবারী ও উৎপাদক শ্রেণীর মনে আত্মনির্ভরতা ও দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিয়া আসে। মন্দা অবস্থা কিছুদিন যাবৎ চলার পর, ব্যবসায় বাণিজ্যে ক্ষীণ আশার আলো দেখা যায়। মন্দার মধ্যেই যেন পুনরভ্যুদয়ের বীজ উপ্ত আছে। আর্থিক মন্দায় পণ্যমূল্য যেমন হ্রাস পায়, উৎপাদন খরচ ও তেমনি কমিয়া যায়। উৎপাদন খরচ এত হ্রাস পায় যে, উহা পণ্য মূল্যের ও নীচে নামে। ফলে, মুনাফা লাভের সুযোগ উপস্থিত হয়। এই মুনাফা লাভের সম্ভাবনাই নূতন বিনিয়োগ ও উৎপাদনের উৎসাহ ও প্রেরণা যোগায়। সংগে সংগে পুঁজি ও যন্ত্রপাতির আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণ সুরু হয়; শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি পায় এবং তাহাদের মজুরির হার বৃদ্ধি পায়। এই শ্রমিক বেতন বৃদ্ধি খাদন বৃদ্ধির সহায়তা করে এবং খাদন বৃদ্ধি আবার উৎপাদন বৃদ্ধির উৎসাহ যোগায়।

পুনরভ্যুদয় একবার সুরু হইলে আরও শক্তি সঞ্চয় করে। এক শিল্পে পুনর্বিনিয়োগ সুরু হইলে অন্য শিল্পে ও পুনর্বিনিয়োগ আরম্ভ হয়। শিল্প বিনিয়োগ বৃদ্ধির সংগে সংগে কর্মনিয়োগ সম্প্রসারিত হয় ও শ্রমিক বেতন ও বৃদ্ধি পায়। শ্রমিক বেতনের বৃদ্ধির অর্থই, শিল্পপণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি। এই চাহিদা বৃদ্ধিতে পণ্য মূল্য উর্ধ্বগামী হয় ও বিনিয়োগকারীর মুনাফার অংক বৃদ্ধি পায়।

তেজী অবস্থা বা সমৃদ্ধি (Prosperity)

এই মুনাফা স্ফীতি দেখিয়া ব্যাংক দাদন যোগান বৃদ্ধি করে; ফলে, ব্যবসায় বাণিজ্যের আত্যন্তিক সম্প্রসারণ হয়। বাণিজ্য চক্রের এই স্তরকে **তেজী অবস্থা বা সমৃদ্ধি বলে (Boom or Prosperity)**।

এই তেজী অবস্থা আবার অধিক দিন টিকিয়া থাকে না। ব্যবসায়, বাণিজ্যের সমৃদ্ধির সংগে কর্ম সংস্থান এত সম্প্রসারিত হয় যে, অপ্রগুণ শ্রমিককে অত্যধিক মজুরিতে নিয়োগ করিতে হয়। ফলে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় এবং মুনাফার হার কমিয়া আসে। তখন উৎপাদনের উন্মার্গগতি একেবারে বিপরীতগামী হয়; বিনিয়োগ হ্রাস পাইতে থাকে। কারক আয়, বিশেষ করিয়া শ্রমিকের মজুরি হ্রাস পায় এবং পণ্যমূল্য কমিতে থাকে। বাণিজ্য চক্রের এই পর্যায়কে **পশ্চাদ্‌পসরণ** বা **প্রতিনিবৃত্তি** (**Recession**) বলে।

পশ্চাদপসরণ বা প্রতিনিবৃত্তি (Recession)

বাণিজ্য চক্রের শেষ পর্যায়ে **সংকট** (Depression or Crisis) দেখা দেয়। এই স্তরে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ব্যাপক মন্দা দেখা দেয়। মুনাফা লাভের সম্ভাবনা একদম চলিয়া যায়, নূতন বিনিয়োগ ও উৎপাদন প্রচেষ্টা স্থিতিশীল অবস্থায় আসে, বেকারত্বের সমস্যা চরমে পৌছে এবং মূল্যস্তর অত্যন্ত নিম্নগামী হয়। সাধারণের অর্থ-আয় হ্রাস পায় এবং চলতি মুদ্রার পছন্দনীয়তা (liquidity preference) বাড়িয়া যায়। খাদন, বিনিয়োগ ও মূল্যস্তর, তিনই অত্যন্ত হ্রাস পায়।

বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Trade Cycles): স্বাভাবিক বাণিজ্য চক্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দেখা যায়।

প্রথমতঃ, প্রত্যেক বাণিজ্য চক্রেরই নির্ধারিত কাল-ব্যবধান (periodicity) আছে। ব্যবসায় বাণিজ্যের ঊর্ধ্বগতি ও নিম্নগতি নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে দেখা দেয়। এই কাল-ব্যবধান যথাযথ সঠিক না হইলেও, চক্রের গতি ঠিক নিয়ম মাফিক। অর্থবিদ্যাবিদগণের সাধারণ ধারণা এই যে, একটি স্বাভাবিক চক্রের পুরাপুরি সংঘটন কাল সাত হইতে দশ বৎসর ব্যাপী হইতে পারে। ইহার মধ্যে কত বৎসর ব্যাপী তেজী অবস্থা বজায় থাকিবে, এবং কত বৎসর মন্দা অবস্থা তিষ্টিবে, সে সম্পর্কে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নাই। তবে মন্দার পর তেজী অবস্থা ও তেজী অবস্থার পর আবার যে মন্দা সুরু হয়, তাহা সুনিশ্চিত।

নির্ধারিত কাল-ব্যবধান

দ্বিতীয়তঃ, বাণিজ্য-চক্রের পরিব্যাপ্তি সর্বত্র (synchronic) পৃথিবীময়। সমৃদ্ধি কিংবা মন্দা মোটামুটিভাবে সকল শিল্পে প্রায় একই সময় ঘটে। গোটা পৃথিবীর অর্থনীতি আজ এমন নিবিড়ভাবে সুসংবদ্ধ যে, যখন একটি শিল্পে সমৃদ্ধি আসে, তখন অন্য শিল্পের ও তেজী অবস্থা সূচিত হয়; আবার, একটি শিল্পে মন্দা দেখা

সর্বত্র পরিব্যাপ্তি

দিলে, উহা অন্য শিল্পেও সংক্রামিত হয়। আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময় ব্যবস্থা উন্নয়নের সংগে সংগে, বাণিজ্য-চক্রের পরিব্যাপ্তি ও আন্তর্জাতিক হইতে বাধ্য হইয়াছে।

বাণিজ্য চক্রের কারণ (Causes of Trade Cycles): অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে বাণিজ্য চক্রের কারণ নির্ধারণ সম্পর্কে যেরূপ মতানৈক্য, অন্য আর কোন বিষয়ে তত নহে।

এ যাবৎ বহু অর্থশাস্ত্রী বাণিজ্য চক্রের কারণ বিশ্লেষণ করিতে যাইয়া বহু তত্ত্ব খাড়া করিয়াছেন। এই সকল তত্ত্বের কোন একটি এককভাবে বাণিজ্য চক্রের পূর্ণ ব্যাখ্যান করিতে পারে না। প্রত্যেকটি তত্ত্বই বাণিজ্য চক্রের কোন না কোন একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়া আলোচনা। সেইদিক হইতে প্রধান প্রধান কতিপয় তত্ত্বের বিশ্লেষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

জলবায়ুর তত্ত্ব (Climatic Theory): জেভনস্ (Jevons) প্রমুখ প্রাচীনপন্থী অর্থশাস্ত্রীগণ শস্যের ঘাট্‌তি বা বাড়্‌তির উপর (harvest fluctuations) বাণিজ্য চক্র নির্ভরশীল বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। শস্যের ঘাট্‌তি বা বাড়্‌তি নির্ভর করে, সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্নের (sun-spots) উপর। সূর্য্যের কলঙ্ক চিহ্ন সাধারণতঃ ১০ বৎসরের ব্যবধানে দেখা যায। এই কলঙ্ক চিহ্ন দেখা যাইবার সময় হইতে সূর্য্য ক্রমাগত স্বল্প তাপ বিকীর্ণ করে। ফলে, শস্যহানি হয়। কৃষি শস্যের হানি আবার শিল্পোৎপাদন হ্রাসের কারণ হয় এবং পরিণামে সাধারণ মন্দা অবস্থার সৃষ্টি করে।

জলবায়ুর তত্ত্ব বাণিজ্য চক্রের উর্ধ্ব ও নিম্নগতির সময় নির্দেশ করিতে পারে বটে,—কখন তেজী অবস্থা, কখন মন্দা আবির্ভাব হইবে, তাহার ইংগিত দিতে পারে সত্য; কিন্তু কি বিশিষ্ট্য কারণে চক্রের সংঘটন হয়, তাহার ব্যাখ্যান করিতে পারে না।

অতি-সঞ্চয় বা অব-খাদন তত্ত্ব (Over-saving or Under-Consumption Theory): কার্ল মার্ক্সের চিন্তাবাদের উপর ভিত্তি করিয়া সমাজতন্ত্রী অর্থবিদ্যাবিদ্ হব্‌সন (Hobson) নির্দেশ করিয়াছেন যে, আর্থিক মন্দা অতি সঞ্চয় বা অব-খাদনের পরিণাম বিশেষ। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় আয়-বৈষম্য অত্যন্ত উৎকট। জাতীয় আয়ের মোটা অংশই দেশের অতি অল্প সংখ্যক লোকের হাতে। কিন্তু, এই অল্প সংখ্যক ধনিক শ্রেণী তাহাদের আয়ের অতি সামান্য অংশই খাদন-ব্যয়ে ব্যবহার করে; বেশী পরিমাণ আয়ই

বিনিয়োগ হয় উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনে। ফলে, ভোগ্যবস্তু ক্রয়ের অর্থ ঘাট্তি পড়ে ও ভোগ্যবস্তু শিল্পে মন্দা আসে। অতএব, খাদন ব্যয়ের সংকোচন অথবা অতি মাত্র সঞ্চয় বা দীর্ঘমিয়াদী বিনিয়োগই আর্থিক সংকটের কারণ। মন্দা একবার ভোগ্যবস্তু শিল্পে উপস্থিত হইলে, অন্য শিল্পেও সংক্রামিত হয়।

অধ্যাপক হব্‌সনের এই তত্ত্ব বাণিজ্য চক্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যান নহে; ইহা আর্থিক মন্দার কেমন করিয়া পত্তন হয়, তাহাই নির্দেশ কারতে পারে। বাণিজ্য সমৃদ্ধি কেমন কবিযা আসে, তাহার কারণ নির্ধারণ করিতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্বের আর একটি গলদ এই যে, এই তত্ত্বে অনুমান করা হয়, মন্দা ও মূল্য কৃচ্ছ্রতা প্রথম ভোগ্যবস্তু শিল্পে দেখা দেয়। কিন্তু তাহাও সঠিক নহে। বাস্তবতঃ, আর্থিক সংকট উৎপাদক দ্রব্যের মূল্য অবনতির সংগেও দেখা যায়।

তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বে যে অনুমান করা হয যে, ধনিক শ্রেণীর সঞ্চিত অর্থ উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদনে অনিবার্যভাবে বিনিযোগ করা হয়, তাহাও সত্য নহে।

আর্থিক তত্ত্ব (Monetary Theory): অধ্যাপক হট্রে (Hawtrey) বাণিজ্য চক্রকে সম্পূর্ণভাবে অর্থ সম্বন্ধীয় ব্যাপার বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। 'Trade cycle is a purely monetary phenomenon'. দেশের দাদন ব্যবস্থা মুখ্যতঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতির উপর নির্ভরশীল। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বিল ভাঙ্গাইবার বাট্টাহার (bank rate or discount rate) হ্রাস করে, তাহা হইলে আমানতকারী, সওদাগর প্রভৃতি দাদন গ্রহণের অধিক সুবিধা পাইবে। ফলে, তাহারা দাদন গ্রহণ বৃদ্ধি করিযা মাল বাঁধাই বৃদ্ধি করিতে থাকিবে। আমানতকারীর মাল বাঁধাই বৃদ্ধির ফলে উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে সাধারণের অর্থ-আয বৃদ্ধি পায় ও পণ্য মূল্য উর্ধ্ব-গতি লাভ করে। কিন্তু, অতিরিক্ত দাদন যোগানের ফলে, ব্যাংকের সংরক্ষিত তহবিল কমিয়া আসিবে, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিল ভাঙ্গাইবার বাট্টাহার বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইবে। ইহাতে দাদন যোগান সংকুচিত হইবে, উৎপাদন হ্রাস পাইবে, অর্থ-আয় কমিবে এবং পণ্য-মূল্য হ্রাস পাওয়াতে মন্দার সূচনা দেখা দিবে। অতএব, হট্রের মত অনুসারে, বাণিজ্য-চক্র, 'দাদন যোগান সম্প্রসারণ ও সংকোচনের প্রত্যক্ষ পরিণাম। তিনি মনে করেন, বাণিজ্য চক্র নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায় হইল, কর্জ বা দাদন যোগান নিয়মিত করা। এই দাদন অর্থের

যোগান নিয়মিত করিতে হইলে, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বাট্টাহার ও ওপেন মার্কেট অপারেশন যথা সময়ে নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়।

আধুনিক অনেক অর্থবিদ্যাবিদই বাণিজ্য চক্রের এই ব্যাখ্যান অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের নিম্ন ও উর্ধ্বগতি কেবলমাত্র দাদন যোগান সংকোচন ও সম্প্রসারণের উপরই নির্ভর করে না। কেবলমাত্র দাদন যোগান সম্প্রসারিত হইলেই, যে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া ব্যবসায় বাণিজ্যের উর্ধ্বগতি হইবে, তাহা সত্য নহে। বিগত আর্থিক মন্দার সময়, অনেক দেশ দাদন যোগান বৃদ্ধির সুব্যবস্থা করিয়াও, সংকট প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হয় নাই। পৃথিবীব্যাপী আর্থিক মন্দা শুধু একটি বিশিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দাদন যোগান ব্যবস্থার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয় না। আরও অনেক কারণ আছে, যাহার জন্য আর্থিক সংকটের উদ্ভব হইয়া থাকে।

মনোস্তাত্বিক তত্ত্ব (Psychological Theory): অধ্যাপক পিগু প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ বাণিজ্য চক্রের কারণ নির্ধারণে মনোস্তত্ত্বের গুরুত্ব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। পিগু বলেন: ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অর্থ-নৈতিক কার্যক্রমকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। ব্যবসায়ীদের মনোস্তাত্বিক অবস্থা সকল সময় এক থাকে না। কখন তাহারা শুভদর্শী (optimist) হয়, কখনও আবার মন্দদর্শী (pessimist)। কখন তাহারা অনুমান করে যে, তাহাদের সম্ভাব্য মুনাফা লাভ প্রচুর হইবে। এই শুভদর্শিতা তাহাদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করে। ফলে, উৎপাদন আত্যন্তিকভাবে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, যখন উৎপাদন অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়া এমন অবস্থায় আসে যে, মুনাফাতে পণ্য বিক্রয় করা আর সম্ভব হয় না, তখনই ব্যবসায়ীদের মন্দদর্শিতা দেখা দেয়। নিরুৎসাহ হইয়া তখন তাহারা উৎপাদনের গতি মন্থর করে। ব্যবসায়ে অতিমাত্রায় শুভদর্শিতা ও মন্দদর্শিতা, দুইই সংক্রামক ব্যাধি বিশেষ।

মনোস্তাত্বিক তত্ত্ব দ্বারা ক্রম-বর্ধনশীল বাণিজ্য চক্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখান করা যায় বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা শুভদর্শিতার পর মন্দাদর্শিতার উদ্ভব কেন হয়, তাহার বিশ্লেষণ করা যায় না। নির্দিষ্ট কাল-ব্যবধানে বাণিজ্য চক্রের কেন আবির্ভাব হয়, তাহার ব্যাখানও এই তত্ত্বে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অতি-বিনিয়োগ তত্ত্ব (Over-investment Theory): ডাঃ হায়েক্ (Dr. Hayek) বলেন, মন্দার উৎপত্তি হয়, অস্বাভাবিক রকম সুদ হ্রাস দ্বারা দাদন যোগান সম্প্রসারণের ফলে। তাহার মতে, অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা নির্ভর

করে, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমতার উপর। এই সঞ্চয় ও বিনিয়োগ সমতা রক্ষা করে সুদের স্বাভাবিক হার (natural rate of interest)। কিন্তু অর্থনৈতিক সাম্যাবস্থা রদবদল হয়, যখন ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতির দ্বারা জোর করিয়া সঞ্চয় সৃষ্টি বৃদ্ধি করে। যখন ব্যাংক দাদন সম্প্রসারণের উদার নীতির অনুবর্তী হয়, তখন সুদের বাজার হার স্বাভাবিক হারের চেয়ে কম হয়। ইহাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায়, উৎপাদক দ্রব্য শিল্প ফাঁপিয়া উঠে ও উৎপাদন মিয়াদ বৃদ্ধি পায়। উৎপাদক কারকগণের আয় বৃদ্ধি পাইয়া খাদক শ্রেণীর ক্রয় ক্ষমতা ও বাড়ে। ইহার ফলে ভোগ্য দ্রব্যের বাজার মূল্য বৃদ্ধি পায়; কারক সম্পদগুলি (resources) উৎপাদনের প্রথম দিক হইতে শেষ স্তরে ব্যবহৃত হইতে থাকে। কিন্তু ব্যাংক স্বার্থের খাতিরে দাদন সম্প্রসারণ নীতি অধিকদিন কার্যকরী রাখিতে পারে না; ফলে, উৎপাদনের প্রাথমিক স্তর অক্ষুণ্ণ ভাবে চালু থাকিতে পারে না, এবং সমৃদ্ধির ও শেষ হইয়া আসে। যদি ভোগ্যবস্তুর চাহিদা বৃদ্ধির সংগে সংগে, ব্যাংকের দাদন যোগান সম্প্রসারণ দ্বারা উৎপাদনের সমস্ত স্তর অক্ষুন্ন ভাবে চালু রাখা সম্ভব হইত, তাহা হইলে মন্দা রোধ করিবার কোনই অসুবিধা থাকিত না।

যে অনুমানের উপর ভিত্তি করিয়া হায়েক্ তাহার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তাহা কীনস্ প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ অবাস্তব বলিয়া মনে করেন। হায়েক্ সঞ্চয়-বিনিয়োগ সাম্য (saving-investment equilibrium) কল্পনা করেন এবং ব্যাংকের নীতি এই সাম্য নষ্ট করে বলিয়া অনুমান করেন। কীনস্ ইহা অস্বীকার করেন। **দ্বিতীয়তঃ,** ভোগ্য দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধিতে উৎপাদক সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি হয় না—হায়েকের এই মতবাদ বাস্তবতঃ সত্য নয়। **তৃতীয়তঃ,** সকল অবস্থাতে দাদন যোগান বৃদ্ধির ফলে মন্দার সৃষ্টি হয় না। ব্যাংকের নীতি এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাইতে পারে, যাহাতে মন্দা অবস্থার মধ্যে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া, আবার পুনরভ্যুদয় হইতে পারে।

কীনসের বাণিজ্য চক্র তত্ত্ব (Keynes' Theory of Trade Cycles) : কীনস্ তাঁহার Treatise of Money গ্রন্থে বাণিজ্য চক্রের কারণ নির্দেশ করিয়াছেন, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ অসাম্যের ভিত্তিতে। যদি বিনিয়োগ সঞ্চয়ের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে তেজী অবস্থার উৎপত্তি হয়; আবার, সঞ্চয় যদি বিনিয়োগের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে মন্দা অবস্থার সৃষ্টি হয়। যদি সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সমতা রক্ষা করা যায়, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না, ও মূল্যস্তরের পরিবর্তন হয় না।

কিন্তু তাঁহার General Theory of Employment, Interest and Money গ্রন্থে কীনস্‌ তাঁহার মতবাদ পরিবর্তন করিয়াছেন। এই কেতাবে বাণিজ্য-চক্রের যে ব্যাখ্যান তিনি দিয়াছেন, উহা তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ কর্ম নিয়োগ তত্ত্বকে (theory of employment) কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মতে, বাণিজ্য চক্র বহুবিধ জটিল অবস্থার পরিণাম—যথা, খাদন প্রবণতার হ্রাস বৃদ্ধি (fluctuations in the propensity to consume), চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা (state of liquidity preference), পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা (marginal efficiency of capital)। ইহাদের মধ্যে পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতাই সব চাইতে অধিক সক্রিয়।

কোন আর্থিক কার্যক্রম ও নিয়োগ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: (১) খাদন প্রবণতা, (২) পুঁজি বা মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা এবং (৩) সুদের হার। ইহাদের মধ্যে খাদন প্রবণতা স্বভাবতঃ অল্পমিয়াদে স্থিতিস্থাপক ; আর্থিক কার্যক্রম বা বাণিজ্য চক্রের নির্ধারক হিসাবে ইহার প্রাধান্য সামান্য। বাণিজ্য চক্র প্রধানতঃ নির্ভর করে বিনিয়োগ হারের পরিবর্তনের উপর। বিনিয়োগ হার আবার নির্ভর করে, মূলধনের প্রান্তিক প্রগুণতা ও সুদের হারের উপর। কীনসের ব্যাখ্যানে, বিনিয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি করিতে, সুদের হারের প্রভাব সীমিত। সুতরাং বিনিয়োগ হারের হ্রাস-বৃদ্ধির প্রধান নির্ধারক পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা। পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা অর্থ, উৎপাদক সামগ্রীর ভবিষ্যৎ আগম সম্পর্কে বর্তমান অনুমান। পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা যদি সুদের হারের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইবে, ও বাণিজ্য চক্র সমৃদ্ধ পর্যায়ে পৌছিবে।

মনে রাখিতে হইবে যে, পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা ততক্ষণ অবধি অধিক থাকে, যতক্ষণ ব্যবসায়ীদের পূর্ণ আত্ম নির্ভরতা বজায় থাকে। কিন্তু, ক্রমাগত বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা হ্রাস হইতে বাধ্য। কেননা, কাঁচামাল ও শ্রমের দুষ্প্রাপ্যতা হেতু নূতন পুঁজি বিনিয়োগ দ্বারা উৎপাদন করিতে গেলে, উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়। দ্বিতীয়তঃ, পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে, সম্ভাব্য মুনাফার অংক ও সংকীর্ণ হইয়া পড়ে। ফলে, ব্যবসায়ীদের আত্ম নির্ভরতা ও হ্রাস পাইতে থাকে। অতএব ; তেজী অবস্থা হইতে মন্দার সুরু হয়, পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা হ্রাসের সংগে সংগে। পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতার হ্রাসের সংগে সংগে, বিনিয়োগ হ্রাস পায়, কর্মনিয়োগ সংকুচিত হয়, খাদন প্রবণতা ক্ষুন্ন হয়, চল্‌তি মুদ্রার পছন্দনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং সুদের হারও

অসম্ভবরূপ বাড়িয়া যায়। আমরা তখন আর্থিক মন্দার সকল বৈশিষ্ট্যই দেখিতে পাই।

প্রতিকার (Remedies) : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় বাণিজ্যচক্র একেবারে নির্মূল করা অসম্ভব। তবে সময়োপযুক্ত প্রতিকার ব্যবস্থা দ্বারা ইহাকে আয়ত্তের মধ্যে আনিযা, ইহার গলদ ও কুফল দূর করা যায়। বাণিজ্যচক্রের পত্তন হয় নানা কারণে ; ইহার প্রতিকার মূলক ব্যবস্থা ও সেইজন্য বিভিন্নমুখী হইতে বাধ্য।

যাঁহারা বাণিজ্যচক্রের আর্থিক ব্যাখ্যান দেন, তাঁহারা আর্থিক প্রতিকারের পক্ষে ওকালতি করেন। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই আর্থিক ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র ও নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তা। যখন ব্যবসায় বাণিজ্যের তেজী অবস্থা, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টা হার বাড়াইয়া, খোলা বাজারে সিকিউরিটি বিক্রয় করিয়া, কিংবা দেশের বাণিজ্যিক সদস্য ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া দেশের দাদন যোগান সংকোচন করিবে। আবার, যখন ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টাহার হ্রাস করিয়া, খোলা বাজারে সিকিউরিটি ক্রয় করিয়া, কিংবা সদস্য ব্যাংকগুলির সংরক্ষণ পরিমাণ কমাইয়া, দেশে দাদন যোগান সম্প্রসারণ করিবে।

আর্থিক প্রতিকার

হবসন্ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রীগণ আর্থিক মন্দার প্রাতিকার কল্পে সমাজের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেন। এই খাদন প্রবণতা বৃদ্ধির জন্য প্রযোজন, সমাজের শ্রেণীগত আয় বৈষম্য দূরকরা। সমাজের আয় বৈষম্য দূর করার সংগে সংগে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, ও বাণিজ্য চক্রের মন্দা অবস্থাব উদ্ভব হইতে পারে না।

সমাজ তান্ত্রিক প্রতিকার

লর্ড কীনস্ বাণিজ্যচক্রের প্রতিকার কল্পে রাজস্ব সম্বন্ধীয় ব্যবস্থার উপর জোর দিয়াছেন। এই সকল ব্যবস্থাকে তিনি contra-cyclical fiscal নীতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সরকারী কর ব্যবস্থা, ঋণনীতি ও ব্যয়ব্যবস্থা সময়োপযোগী এমন ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় যে, উহারা বাণিজ্য চক্রের তেজী বা মন্দা অবস্থার উপযুক্ত প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করিতে পারে।

রাজস্ব সম্বন্ধীয় প্রতিকার মুলক ব্যবস্থা (Fiscal remedies)

বাণিজ্য চক্র যখন সমৃদ্ধ পর্যায়ে পৌছায়, তখন সরকারের উচিত প্রত্যক্ষ করের হার বৃদ্ধি করা, ও ঋণপত্র বিক্রয় করা। সরকারী কর-ব্যবস্থা ও ঋণনীতি এই ভাবে নির্ধারিত করিলে, সমৃদ্ধ পর্যায়ের উদবৃত্ত মুদ্রা প্রচলন হইতে উঠিয়া আসিবে। ফলে, তেজী অবস্থার মুদ্রাস্ফীতি আয়ত্তের

মধ্যে আসিবে। এই সময়ে সরকারী নির্মাণ কার্য ও জনহিতকর সেবাকৃত্য বাবদ সকল প্রকার ব্যয় সংক্ষেপ করিতে, এমন কি প্রয়োজন হইলে, একদম বন্ধ করিতে হইবে। কেননা, সরকার যদি এই সময়ে কোন ব্যয় কার্য নির্বাহ করে, তাহা হইলে নূতন আয় সৃষ্টি হইয়া মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পাইবে ও তেজী অবস্থা আরও উৎকট আকার ধারণ করিবে।

আবার, বাণিজ্য চক্র যখন মন্দা পর্যায়ে পৌছায়, তখন জাতীয় আয় ও খাদন প্রবণতা বাড়াইবার জন্য সরকার করভার হ্রাস করিবে, এমন কি প্রয়োজন হইলে গরীব শ্রেণীর উপর সমস্ত ধার্য কর মকুব করিয়া দিবে। এই সময় জন সাধারণের নিকট হইতে সরকারী ঋণ গ্রহণ একেবারে পরিত্যজ্য। কেননা, সরকার যদি ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সঞ্চয় হ্রাস পাইয়া ব্যাক্তিগত বিনিয়োগ আর ও অধিক সংকুচিত হইবে। মন্দার সময় সরকারের কার্যকরী নীতি হইবে ব্যাপক ব্যয়ের পরিকল্পনা গ্রহণ। সরকার ব্যাপক ভাবে অর্থব্যয় করিয়া সরকারী বিনিয়োগ সম্প্রসারণ দ্বারা অতিরিক্ত কর্ম নিয়োগ ও জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিবে। সমাজ কল্যাণধর্মী ত্রাণকার্য ও উন্মার্গগামী নির্ম্মাণ কার্যের ব্যাপক কার্যসূচীর সমস্ত ব্যয় ভারের ব্যবস্থা করিয়া, সরকার মন্দার সময় যে ব্যক্তিগত বিনিয়োগের স্বাভাবিক ঘাট্‌তি হয়, তাহা পূরণ করিবে। সরকারের পক্ষে নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া ঘাট্‌তি ব্যয় (deficit spending) দ্বারা এই ব্যাপক ব্যয়ভার মিটানো যুক্তিযুক্ত। সরকার মন্দার সময় যদি এইরূপ ঘাট্‌তি ব্যয় করিয়া বিনিয়োগ ও খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি না করে, তাহা হইলে গোটা ব্যক্তি-ভিত্তিক অর্থব্যবস্থাই অনিবার্য ভাবে ধ্বসিয়া পড়িবে।

অনুশীলনী

1 Describe the different phases of a typical business cycle, What remedial measures would you suggest for controlling these cycles ? (C. U. B.Com. '55)

2. Examine the main features of business cycles and mention some measures that may be adopted to control these cycles. (C. U. B. Com. '52)

3. Explain what is meant by 'Trade Cycles' and describe the different phases of trade cycles. (C. U. B. A. '56)

4. What is a business cycle? Indicate its causes. Account for the periodicity of business cycles. (C.U. B.A. '53)
5. Critically examine the monetary theory of trade cycles. (C. U. B. A. Hons. '55)

ষড়ত্রিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায় বাণিজ্যের ভিত্তি যেমন মানুষের কর্ম বিভাগে ও বিশেষত্ব সাধনে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের গোড়াপত্তন ও সেইরূপ বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সামগ্রী উৎপাদনের বিশিষ্টতায়। প্রত্যেক মানুষ যেমন নিজের অভিরুচি ও প্রকৃতিদত্ত গুণ অনুসারে কোন বিশেষ বৃত্তি মনোনয়ন করিয়া তাহাতে বিশিষ্টতা অর্জন করে, প্রত্যেক দেশ ও সেইরূপ কেবলমাত্র সেই সকল দ্রব্য উৎপাদন করিতে ব্রতী হয়, যাহাতে উহার আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা স্বভাবতঃ অধিক। অন্যান্য দ্রব্যের জন্য উহা অন্য দেশের মুখাপেক্ষী হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তিই ভৌগলিক কর্ম বিভাগে বা শিল্প একদেশতায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পার্থক্য (Difference between International Trade and Internal Trade) : আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি এক। উভয়েই ভৌগলিক শ্রম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং উভয়েই শিল্প একদেশতার সকল রকম সুযোগ সুবিধা লাভ করিয়া থাকে। সেইজন্য অনেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের মধ্যে নীতিগত কোন পার্থক্যই দেখিতে পান না।

কিন্তু নীতিগত সাদৃশ্য থাকিলে ও, আসলে কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের তফাৎ অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যানের পৃথক তত্ত্ব অবতারণা করিতে হয়। একই দেশের মধ্যে শ্রম ও মূলধনের গতিশীলতা সম্পূর্ণ অবাধ নয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে শ্রমের ও মূলধনের অবাধ গতিশীলতা আর ও সীমিত। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাষাগত, ধর্মগত, জাতিগত পার্থক্য এবং আচার ব্যবহার, কৃষ্টি, ঐতিহ্য, আর্থিক সংগঠন

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাখ্যানের পৃথক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা

প্রভৃতির তারতম্য এত বেশী যে, মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উৎপাদক সম্পদগুলি একদেশ হইতে অন্য দেশে সহজে চলাচল করিতে পারে না। প্রত্যেক দেশেরই একটা নিজস্ব মূলধনের বাজার আছে ; প্রত্যেক দেশে মুদ্রানীতি, ব্যাংক ব্যবসায় ও রাজস্ব ব্যবস্থা পৃথক, যাহার জন্য শ্রম ও মূলধনের গতিবিধি এক দেশ হইতে দেশান্তরে অবাধ হইতে পারে না। সেইজন্য প্রত্যেক দেশ কেবলমাত্র সেই সকল দ্রব্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে, যে ক্ষেত্রে উহার নিজস্ব মূলধন, শ্রম প্রভৃতি উৎপাদক সম্পদ অপেক্ষাকৃত অধিক। দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদক সম্পদ গুলির চলাচল অপেক্ষাকৃত অবাধ বলিয়া দামস্তর ও উৎপাদন খরচের মধ্যে সাম্যাবস্থা প্রতিষ্ঠা দীর্ঘকাল মিয়াদে অবশ্যম্ভাবী হয়। কিন্তু, দুইটি দেশের মধ্যে উৎপাদক সম্পদগুলির গতিশীলতা অবাধ না হওয়ার দরুণ, দামস্তর ও উৎপাদন খরচের তারতম্য থাকিয়াই যাইতে পারে। তাহাছাড়া, বিভিন্ন দেশের আপেক্ষিক প্রাকৃতিক সুযোগ-সুবিধা ও এক নয়। পরিশেষে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে যখন দ্রব্য ও কৃত্য বিনিময় ঘটে, তখন প্রত্যেক রাষ্ট্র স্ব স্ব স্বাধীন বাণিজ্য নীতি ধার্য করিতে পারে। প্রত্যেক 'রাষ্ট্র স্বকীয় স্বার্থ প্রণোদিত হইয়া বহির্বাণিজ্যের উপর রকমারি প্রতিরোধক মূলক বাধা নিষেধ স্থাপন করিতে পারে। কিন্তু একটি দেশের মধ্যে, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য-মূলক বিভিন্ন বাধা নিষেধ দেখা যায় না। এই সকল বিশিষ্টতার জন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ব্যাখ্যান করিতে পৃথক তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ভিত্তি : আপেক্ষিক খরচের তত্ত্ব (Basis of International Trade : Theory of Comparative Costs) : সমস্ত রকম ব্যবসায় বাণিজ্যেরই পত্তন হয় উৎপাদন খরচের পার্থক্যের ভিত্তিতে। একই দেশের অভ্যন্তরে যখন ব্যবসায় বাণিজ্য চলে, তখন বিভিন্ন ব্যবসায়ের আপেক্ষিক খরচের তারতম্য বড় বিশেষ একটা থাকে না। কেননা, দেশের মধ্যে উৎপাদন কারকগণের গতিশীলতা স্বভাবতঃ অবাধ ; উহারা এক বিনিয়োগ হইতে অন্য বিনিয়োগে অতি সহজে চলাচল করিতে পারে। কিন্তু, বিভিন্ন দেশের মধ্যে কারকগণের এই গতিশীলতা মোটেই অবাধ নয়। সেইজন্য বিভিন্ন দেশের মধ্যে আপেক্ষিক উৎপাদন খরচ স্থায়ী ভাবে পৃথক হয় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য লাভজনক কারবার হইয়া থাকে। প্রত্যেক দেশেরই অন্য দেশের তুলনায় দ্রব্য উৎপাদনের কতকগুলি আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা অধিক থাকে। যে দেশের যে

যে দ্রব্য উৎপাদনের আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা অধিক, সেই দেশের পক্ষে সেই সেই দ্রব্য উৎপাদন করিয়া বিদেশে প্রেরণ করা লাভজনক; কেননা, ঐ ঐ ক্ষেত্রে ঐ দেশের আপেক্ষিক খরচ কম। অপর পক্ষে, যে যে দ্রব্য উৎপাদন করিতে আপেক্ষিক অসুবিধা অধিক, সেই সেই দ্রব্য ঐ দেশের পক্ষে নিজে উৎপাদন না করিয়া, অন্য দেশ হইতে আমদানী করা লাভজনক।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য তত্ত্ব ব্যাখানে আপেক্ষিক খরচ বিধির প্রয়োগ প্রথম করেন ড্যাভিড রিকার্ডো। আধুনিক ব্যাখ্যান একটু আধটু অদল বদল হইলেও মূলতঃ রিকার্ডোর বিশ্লেষণেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিক্যাল অর্থনীতিজ্ঞগণ আপেক্ষিক উৎপাদন খরচ শ্রমিকের পরিশ্রমের মিয়াদের ভিত্তিতে পরিমাপ করিতেন। কিন্তু আধুনিকেরা প্রান্তিক খরচের নিরিখে খরচতত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়া থাকেন। এই প্রান্তিক খরচই বিভিন্ন উৎপাদক কারকের আপেক্ষিক দুষ্প্রাপ্যতার পরিমাপ নির্দেশ করে। দ্বিতীয়তঃ, রিকার্ডো অনুমান করেন যে, উৎপাদন সম-আগম বিধির অধীন। কিন্তু আধুনিকেরা উৎপাদনে ক্রমবর্ধমান ও ক্রম হ্রাসমান আগম বিধির প্রবর্তন করিয়া আপেক্ষিক খরচ তত্ত্বের ব্যাখ্যানকে জটিল করিয়াছেন। তাঁহারা মন্তব্য করেন যে, যখন ক্রম-বর্ধমান আগম বিধির প্রযোগ হয়, তখন গড়পড়তা খরচ হ্রাস পাইয়া উৎপাদনের আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আবার, যখন ক্রম-হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ হয়, তখন উৎপাদন বৃদ্ধির সংগে গড়পড়তা খরচ বৃদ্ধি পাইয়া উৎপাদনের সুযোগ সুবিধা হ্রাস পায়।

আপেক্ষিক খরচ তত্ত্বের ক্লাসিক্যাল ও আধুনিক অনুমান

বিভিন্ন দেশের উৎপাদন খরচের পার্থক্য তিন ধরণের হইতে পারে: (১) খরচের চূড়ান্ত পার্থক্য (Absolute differences in costs); (২) খরচের সমান পার্থক্য (Equal differences in costs); এবং (৩) খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য (Comparative differences in costs); নিম্নে উদাহরণ দ্বারা খরচের এই তিন রকম ধরণের পার্থক্য বুঝান গেল।

খরচের চূড়ান্ত পার্থক্য (Absolute Differences in Costs):

'ক' দেশে	গম	উৎপাদনের প্রান্তিক খরচ মণ প্রতি	৫৲ টাকা।
	ধান	„ „ „ „ „	১০৲ টাকা।
'খ' দেশে	গম	„ „ „ „ „	১০৲ টাকা।
	ধান	„ „ „ „ „	৫৲ টাকা।

বাজার দাম প্রান্তিক খরচের সমান হয় বলিয়া, 'ক' দেশে ১ মণ গম ১/২ মণ ধান্যের সংগে বিনিমেয়। আবার 'খ' দেশে ১ মণ গম ২ মণ ধান্যের সহিত বিনিমেয়। অর্থাৎ 'ক' দেশে : ১ মণ গম = ১/২ মণ ধান।

'খ' দেশে : ১ মণ গম = ২ মণ ধান।

দুইটি দেশের উৎপাদন খরচের অনুপাত হইবে :

'ক' দেশে—১ : ২

'খ' দেশে—১ : ১/২

খরচের অনুপাত হার হইতে দেখা যায় যে 'ক' দেশের গম উৎপাদনের চূড়ান্ত সুবিধা বর্তমান; আর 'খ' দেশের ধান উৎপাদনের চূড়ান্ত সুবিধা বর্তমান। এমতাবস্থায় 'ক' দেশের পক্ষে গম উৎপাদন ও 'খ' দেশের পক্ষে ধান উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করা লাভ-জনক। 'ক' দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য করা লাভ জনক হইবে ততক্ষণ, যতক্ষণ পর্যন্ত ১ মণ গমের বিনিময়ে উহা ১/২ মণের অধিক ধান পাইবে। আর 'খ' দেশের পক্ষে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ততক্ষণ লাভ-জনক হইবে, যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ দেশ ২ মণ ধানের কমে বিনিময়ে ১ মণ গম পাইবে। ১ মণ গমের বিনিময়ের অনুপাত হার ১/২ মণ এবং ২ মণ ধানের অনুপাতের মধ্যে কোথাও নির্ধারিত হইবে। প্রকৃত বিনিময় হার অবশ্য দুইটি দেশের দ্রব্যের চাহিদার আপেক্ষিক নম্যতার উপর নির্ভরশীল।

(২) **খরচের সমান পার্থক্য (Equal Differences in Costs) :** যখন দুইটি দেশের উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা ও আনুষঙ্গিক খরচ সমান, তখন উহাদের মধ্যে দ্রব্য-বিনিময় ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায় বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেমন :—

'ক' দেশে	গম	উৎপাদনের	প্রান্তিক	খরচ	মণ	প্রতি	৫৲	টাকা।
	ধান	"	"	"	"	"	১০৲	"
'খ' দেশে	গম	"	"	"	"	"	৪৲	"
	ধান	"	"	"	"	"	৮৲	"

এক্ষেত্রে 'ক' দেশের খরচের অনুপাত ১ : ২ ; আবার 'খ' দেশের খরচের অনুপাত ১ : ২। এক্ষেত্রে কোন দেশই কোন একটি বিশিষ্ট দ্রব্য উৎপাদন করিতে উৎসাহিত হইবে না। কেননা, 'ক' দেশ যদি 'গম' উৎপাদনে

বিশিষ্টতা অর্জন করে আর 'খ' দেশ 'ধান' উৎপাদন করিতে বিশিষ্টতা অর্জন করে, তাহা হইলে 'ক' দেশের পক্ষে তখনই লাভ-জনক হইবে যদি সে ১ মণ গমের বিনিময়ে $\frac{১}{২}$ মণের চেয়ে অধিক ধান পায়। কিন্তু 'খ' দেশ ১ মণ গমের বদলে $\frac{১}{২}$ মণের চেয়ে অধিক ধান বিনিময় করিবে না; কেননা, ঐ দেশের পক্ষে তাহার চেয়ে গম উৎপাদনে উৎপাদক কারক বিনিয়োগ করাই লাভ-জনক হইবে।

খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য (Comparative Differences in Costs) : কিন্তু দুই দেশের মধ্যে যখন সুযোগ সুবিধা ও খরচের আপেক্ষিক পার্থক্য হইবে, তখন উহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকে। যেমন ঃ

'ক' দেশে	গম	প্রান্তিক	উৎপাদন	খরচ	মণ	প্রতি	৭৲ টাকা।
	ধান	"	"	"	"	"	১৪৲ টাকা।
'খ' দেশে	গম	"	"	"	"	"	৫৲ টাকা।
	ধান	"	"	"	"	"	৭৲ টাকা।

এক্ষেত্রে, 'ক' দেশে ১ মণ গম $=\frac{১}{২}$ মণ ধান

'খ' দেশে ১ মণ গম $=\frac{৫}{৭}$ মণ ধান

খরচের অনুপাত নির্দেশ করিলে এই দাঁড়ায় ঃ 'ক' দেশে—১ ঃ ২

'খ' দেশে—১ ঃ ১$\frac{২}{৫}$

এ ক্ষেত্রে 'খ' দেশের পক্ষে ধান উৎপাদনে এবং 'ক' দেশের পক্ষে গম উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করা লাভ-জনক। মনে রাখিতে হইবে, যখন আমরা আপেক্ষিক খরচ তুলনা করি, তখন আমরা একই দ্রব্যের দুইটি বিভিন্ন দেশের খরচ তুলনা করি না; কিন্তু একই দেশের মধ্যে দুইটি দ্রব্যের যে আপেক্ষিক খরচ, তাহাই তুলনা করিয়া থাকি। ইহা অবশ্য আদৌ সত্য নয় যে, একটি দেশে কেবলমাত্র একটি মাত্র দ্রব্যই উৎপাদন হইয়া থাকে। অপর-পক্ষে, একই সামগ্রী বহু দেশে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তবে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে উহাদের উৎপাদনের আপেক্ষিক খরচ পার্থক্য হইয়া থাকে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান ভিত্তিই খরচের এই পার্থক্য। অনেক সময় দেখা যায়, কোন একটি দেশ অপর একটি দেশ অপেক্ষা একাধিক সামগ্রী কম খরচে উৎপাদন করিতে পারে। কিন্তু কার্যতঃ, ঐ দেশ সকল সামগ্রী গুলি স্বয়ং উৎপাদন না করিয়া, উহাদের মধ্যে দুই একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদন করিয়া থাকে ও বাকীগুলি অপর দেশ হইতে আমদানী করে। ইহার কারণ এই যে, ঐ

দুই একটি বিশেষ সামগ্রী উৎপাদনে আলোচ্য দেশের আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা সর্বাধিক এবং আপেক্ষিক উৎপাদন খরচ সর্বনিম্ন।

আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্বঃ বিনিময় হার (International Values : Terms of Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও কৃত্য বিনিময় হয়। এক দেশে উৎপাদিত দ্রব্য অপর দেশে উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে বিনিময়ের কি অনুপাত হার তাহাই আন্তর্জাতিক মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যান করে। কি হারে এক দেশ ইহার নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের বিনিময়ে বিদেশের দ্রব্য আমদানী করিতে পারে, উহাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বিনিময় হার (Terms of Trade)। বাণিজ্যের এই বিনিময় হার নির্ধারণই আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্বের গোড়ার কথা। একটি দেশ যখন দ্রব্য আমদানী করে, তখন উহার মূল্য দিতে হয়; আবার, যখন দ্রব্য রপ্তানী করে, তখন উহা বিদেশ হইতে উহার মূল্য পাইয়া থাকে। দ্রব্য আমদানীর মূল্য বাবদ একটি দেশকে যে অর্থ মূল্য রপ্তানী দ্রব্য হিসাবে দিতে হয়, উহাই বাণিজ্যের বিনিময় হার।

বিনিময় হার (Terms of Trade)

আমরা পূর্বে ব্যাখ্যান করিয়াছি যে, যে সকল দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে, উহারা আপেক্ষিক খরচ তত্ত্বের ভিত্তিতে উহাদের কারবার ধার্য করে। অর্থাৎ যে সকল সামগ্রী দেশের উৎপাদনে আপেক্ষিক সুযোগ সুবিধা অধিক, সেই সকল সামগ্রী উৎপাদনে প্রত্যেক দেশ বিশিষ্টতা অর্জন করে এবং একে অন্যের সহিত দ্রব্য বিনিময় করে। আপেক্ষিক খরচ দ্বারা যে দুই সীমা নির্ধারিত হয়, ঐ সীমার মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের একাধিক হার সম্ভব হইতে পারে। আসল বিনিময় হার ধার্য হয়, আপেক্ষিক খরচ দ্বারা নির্ধারিত দুই সীমার মধ্যে, উভয় দেশের পারস্পরিক দ্রব্য চাহিদার নম্যতার দ্বারা। যেমন, ভারতবর্ষে একই খরচে ১০ মণ ধান ও ১০ মণ গম উৎপন্ন হয়। আবার পাকিস্থানে একই খরচে ১০ মণ ধান ও ১৫ মণ গম উৎপন্ন হয়। এই দুইটি দেশ যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে, তখন ভারতবর্ষ ১০ মণ ধানের বিনিময়ে ১০ মণের চেয়ে কম গম গ্রহণ করিবে না এবং পাকিস্থানও ১০ মণ ধানের বিনিময়ে ১৫ মণের চেয়ে অধিক গম দিবে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে চাহিদা ও নম্যতার গুরুত্ব

দুই দেশের মধ্যে দ্রব্য বিনিময়ের সীমা দুই দেশের আপেক্ষিক খরচ দ্বারা নির্দিষ্ট হয়।. আপেক্ষিক খরচ দ্বারা নির্দিষ্ট দুই সীমার মধ্যে, আসল বিনিময় হার নিরূপিত হয়, দুইটি দেশের আপেক্ষিক চাহিদা নম্যতা দ্বারা। যদি ভারতবর্ষের গমের চাহিদা পাকিস্থানের ধানের চাহিদা হইতে অধিক তীব্র হয়, তাহা হইলে বিনিময় হার ১০ : ১০ অনুপাতের কাছাকাছি হইবে। আবার, পাকিস্থানের ধানের চাহিদা যদি ভারতবর্ষের গমের চাহিদা হইতে অপেক্ষাকৃত অধিক হয়, তাহা হইলে বিনিময় হার ১০ : ১৫ অনুপাতের কাছাকাছি হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এক দেশের দ্রব্যের জন্য যদি আর একটি দেশের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়োক্ত দেশটির বিনিময় হার উহার বিপক্ষে যাইবে ; অর্থাৎ ঐ দেশটিকে বিনিময়ে বেশী সামগ্রী দিতে হইবে।

পারস্পরিক আপেক্ষিক চাহিদা তত্ত্ব দ্বারা আন্তর্জাতিক মূল্যতত্ত্বের যে ব্যাখ্যান মার্শাল, টসিগ্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ করিয়াছেন, তাহা কেবল সমপর্যায়ে উন্মার্গগামী দেশের মধ্যে বিনিময় হার নিরূপনে প্রয়োগ করা চলে। কিন্তু, যখন একটি অনুন্নত ও আর একটি উন্নত দেশের মধ্যে আন্তর্জাতিক দ্রব্য বিনিময় হয়, তখন কেবল আপেক্ষিক চাহিদা তত্ত্ব প্রয়োগ দ্বারা বিনিময় হার ধার্য করা চলে না। কেননা, এ রকম ক্ষেত্রে অনুন্নত দেশের মোট উৎপন্ন দ্রব্য উন্নত দেশের গোটা চাহিদা মোটেই মিটাইতে পারে না।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ (Gains from International Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ উদ্ভব হয়, ভৌগলিক কর্ম বিভাগের সুযোগ-সুবিধা হইতে। যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে দেশের আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা অধিক, সেই সকল সামগ্রী উৎপাদন ও রপ্তানী করিয়া এবং যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে আপেক্ষিক অসুবিধা অধিক, সেই সকল সামগ্রী অন্য দেশ হইতে আমদানী করিয়া একটি দেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে লাভবান্ হইতে পারে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ বাস্তব পরিমাণ (objective quantity) বিশেষ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা যে দ্রব্য আমদানী করা যায় এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যতিরেকে যে দ্রব্যের যোগান সম্ভব—এই দুইএর পার্থক্য দ্বারাই আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের বাস্তব পরিমাণ পরিমাপ করা যায়। "The gain from international trade is an objective quantity which can be measured by the difference between the amount of

goods obtained with trade and the amount which would have been available without trade". আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ অবশ্য বিভিন্ন বিষয়ের উপর নির্ভর করে।

প্রথমতঃ, বিনিময় হারের (Terms of Trade) উপর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ বিশেষভাবে নির্ভর করে। ভারতবর্ষের এক একক ধানের বিনিময়ে যদি পাকিস্থানের গমের একাধিক একক পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা লাভ বাড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, দুইটি দেশের আপেক্ষিক চাহিদা নম্যতা-অনম্যতাও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আয়তন হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যদি ভারতীয় ধানের চাহিদা পাকিস্থানের নিকট অনম্য হয়, আর পাকিস্থানী গমের চাহিদা ভারতের নিকট নম্য হয়, তাহা হইলে ভারতের পক্ষে বিনিময় হার অনুকূল হইবে ও পাকিস্থানের নিকট ঐ হার প্রতিকূল হইবে। যে দেশের পক্ষে বাণিজ্যের বিনিময় হার অনুকূল হইবে, সে দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণও অধিক হইবে। যে দেশের পণ্যের চাহিদা বৈদেশিক বাজারে অনম্য, সে দেশের লোকের অর্থআয়ন্তর ও বৃদ্ধি পায়। বৈদেশিক দ্রব্য নিম্ন মূল্যে খরিদ করিতে পারে বলিয়া ঐ দেশের খাদক শ্রেণী লাভবান হয়। অপরপক্ষে, বৈদেশিক দ্রব্যের চাহিদা যদি কোন দেশের নিকট অনম্য হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের অর্থআয় হ্রাস পাইবে। ঐ দেশের খাদক শ্রেণী অধিক মূল্যে বিদেশী দ্রব্য ক্রয় করিয়া লোকসান গ্রস্ত হইবে।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের পরিমাণ দুইটি দেশের খরচের অনুপাত তারতম্যের উপর ও বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল। যদি আপেক্ষিক উৎপাদন খরচের তারতম্য, কিংবা চূড়ান্ত খরচের তারতম্য দুইটি দেশের মধ্যে দেখা যায়, তাহা হইলেই কেবল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ অর্জন করা সম্ভব হয়।

মনে রাখিতে হইবে যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কল্পিত লাভ আসলে অর্জন করা তখনই সম্ভব হয়, যখন দুইটি দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য বর্তমান থাকে ও একদেশ হইতে অপর দেশে মাল চলাচলের কোনরূপ বাধা নিষেধ বা প্রতিবন্ধক না থাকে। বাস্তব পরিনাণ পরিমাপের ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভের যে ব্যাখ্যান ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ করিয়া থাকেন, তাহা ভাইনার (Viner) প্রমুখ আধুনিক অর্থশাস্ত্রীগণ অগ্রাহ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে,

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে বিভিন্ন দেশের আয়স্তরের পরিবর্তন হয় এবং গোটা সমাজের নিরপেক্ষ চক্র রেখার (indifference curve) ও অদলবদল হয়। তাহার ফলে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের লাভ দ্বারা কোন দেশের আর্থিক কল্যাণ কতটা হয়, তাহা সঠিক ধার্য করা সম্ভব নয়। কিন্তু স্যামুয়েলসন্ (Samuelson) এই মতের প্রতিবাদ করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা দেশের লাভের পরিমাণ কতটা হয়, তাহা সঠিক পরিমাপ করা যায় না সত্য, কিন্তু ইহার মাধ্যমে অল্প খরচে যে বেশী মাল আমদানী করা সম্ভব হয়, তাহাই নির্দেশ করে যে, এইরূপ বাণিজ্যে আর্থিক কল্যাণ বৃদ্ধি পায়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুবিধা (Advantages of International Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ভৌগলিক বা আঞ্চলিক কর্ম বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেইজন্য আঞ্চলিক কর্মবিভাগের সকল গুণাবলীই বৈদেশিক বাণিজ্যের মারফৎ পাওয়া যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রত্যেক দেশ বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদনে বিশিষ্টতা অর্জন করে। প্রত্যেক দেশ উহার উৎপাদক সম্পদ সেই সকল উৎপাদন কার্যে বিনিয়োগ করে, যে ক্ষেত্রে উহার আপেক্ষিক সুযোগ-সুবিধা অধিক। ইহার ফলে, গোটা পৃথিবীতে উৎপাদক সম্পদের উৎকৃষ্ট বণ্টন ও বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ ঘটে।

দ্বিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে পৃথিবীর সকল খাদক শ্রেণীরই উপকার হয়; কেননা, তাহারা নিম্নতম মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার বিস্তৃতি ঘটে। এই বাজার বিস্তৃতির ফলে বিভিন্ন দেশ আপন আপন প্রাকৃত সম্পদ পূর্ণ বিনিয়োগ ও ব্যবহার করিতে পারে।

চতুর্থতঃ, যে দেশ কোন দ্রব্য একেবারেই উৎপাদন করিতে পারে না, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দ্বারা ঐ দেশ ঐ সামগ্রী অপর দেশ হইতে আমদানী করিতে পারে।

পরিশেষে, বৈদেশিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয়, পারস্পরিক অর্থনৈতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়, জ্ঞান ও কৃষ্টির বিনিময় হয় এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিদ্বেষ দূর হইয়া আন্তর্জাতিক শান্তি ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠা সুগম হয়।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অসুবিধা (Disadvantages of International Trade) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অপগুণ ও যথেষ্ট আছে। কোন দ্রব্য

উৎপাদনে কোন দেশের পক্ষে বিশিষ্টতা অর্জন করা অর্থ ই, অন্য দ্রব্যের জন্য অপর দেশের মুখাপেক্ষী হওয়া। এই পর মুখাপেক্ষিতা (বিশেষ করিয়া, তাহা যদি অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের জন্য হয়) যে কোন দেশের পক্ষেই বিশেষ বিপজ্জনক। যুদ্ধের সময় ত বটেই।

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় দেশজ শিল্প ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সস্তা আমদানী দ্রব্যের প্রতিযোগিতার মুখে দেশের শিল্প অনেক সময় টিকিয়া থাকিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ফলে অনেক সময় এমন দ্রব্য আমদানী হয়, যাহাতে দেশের লোকের স্বাস্থ্য হানি ও নৈতিক আদর্শ ক্ষুন্ন হইতে পারে।

চতুর্থতঃ, অনেক সময় বৈদেশিক বাণিজ্য দ্বারা লাভ অর্জনের স্পৃহা এত বলবতী হয়, যে বিদেশের বাজারে কাঁচামাল দেশ হইতে উজার করিয়া পাঠান হয়, কিংবা দেশজ প্রাকৃত সম্পদ অতিমাত্রায় ব্যয়িত হয়। ইহাতে দেশী শিল্পের উন্নয়ন বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইতে পারে।

পঞ্চমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে এক দেশ অন্যদেশে নিজের স্বার্থ কায়েমী করিতে সুযোগ পায়। ফলে, স্বার্থের সংঘাত ও হানাহানিতে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ ও রেষারেষির সূত্রপাত হইযা যুদ্ধ পর্য্যন্ত সুরু হইতে পারে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এক রকম বস্তু বিনিময় (International trade is a kind of barter): দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বস্তু বিনিময় অর্থাৎ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্য বিনিময়ের আজকাল প্রচলন নাই। দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় মুদ্রার মাধ্যমে সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংক্রান্ত দেনাপানা ব্যাপারে একদেশের মুদ্রা অপর দেশে অচল; সেইজন্য এক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বস্তু বিনিময় ঘটিয়া থাকে। যদি একদেশ অপর দেশ হইতে মাল আমদানী করে, তাহা হইলে আমদানীকারীকে ঐ মালের প্রাপ্য মূল্য বিনিময় ব্যাংকের নিকট নিজের দেশের মুদ্রায় জমা দিতে হয়। বিনিময় ব্যাংক এই মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরিত করিয়া পাওনা মিটাইবার ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক দেশেই বহু সংখ্যক বৈদেশিক মালের খরিদ্দার আছে; আবার, দেশের মাল বিদেশে বিক্রয়কারী ও আছে। বৈদেশিক মালের খরিদ্দার অর্থাৎ আমদানীকারীরা মাল আমদানীর জন্য যে পাওনা মূল্য বিনিময় ব্যাংকে জমা দেয়, উহা আবার রপ্তানী মালের পাওনা মূল্য বাবদ বিদেশের বাজারে মাল বিক্রয়কারীদের হাতে আসে। অর্থাৎ একই দেশের মধ্যে আমদানীকারীরা

বৈদেশিক দ্রব্যের ক্রয় মূল্য রপ্তানীকারীদের বিক্রয় মূল্যরূপে দিয়া থাকে। ফলে, একদেশ হইতে অপর দেশে মুদ্রা চলাচলের প্রয়োজনই হয় না; কেবলমাত্র দ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে।

জমা উদ্বৃত্ত (Balance of Payments): প্রত্যেক দেশই কতকগুলি দ্রব্য রপ্তানী, আবার কতকগুলি দ্রব্য আমদানী করিয়া থাকে। দেশের মোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ও মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য হয়, উহাকে বাণিজ্য উদ্বৃত্ত (Balance of Trade) বলে। যদি কোন দেশের মোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্য হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে ঐদেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হইয়াছে (favourable trade balance) বলা যায়। অপর পক্ষে, দেশের মোট আমদানী দ্রব্যের মূল্য যদি মোট রপ্তানী দ্রব্যের মূল্যের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে দেশের বাণিজ্য উদবৃত্ত প্রতিকূল (unfavourable trade balance) হইয়াছে বলা যায়। কিন্তু, এইভাবে অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও প্রতিকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্তের তত্ত্ব দ্বারা কোন দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা করা যায় না। কোন দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হইলেই যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আর্থিক উন্নয়ন ব্যাপারে উহার অবস্থা ভাল হয়, তাহার কোন স্থিরতা নাই; আবার কোন দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হইলেই যে উহার আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাহাও সঠিক করিয়া বলা যায় না। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য দ্বারা কোন দেশের প্রকৃত সুবিধা লাভ ঘটে কিনা, তাহার সম্যক্ ধারণা করিতে হইলে দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত না দেখিয়া দেশের জমা উদ্বৃত্ত (Balance of Payments) দেখিতে হয়। জমা উদ্বৃত্ত বলিতে, শুধু দেশের রপ্তানী ও আমদানী সামগ্রীর মূল্যই ধরা হয় না; দেশের বিভিন্ন কৃত্য রপ্তানী ও কৃত্য আমদানীর মূল্যও জমা উদ্বৃত্ত ভুক্তি হয়। এই সকল কৃত্য রপ্তানীও কৃত্য আমদানীকে যথাক্রমে অবাস্তব রপ্তানী ও অবাস্তব আমদানী (invisible items of exports and invisible items of imports) বলা হয়।

বাণিজ্য উদ্বৃত্ত ও জমা উদ্বৃত্ত (Balance of trade and balance of paymant)

দেশের মোট জমা উদ্বৃত্তের উপাদান হিসাবে বাস্তব রপ্তানী ও বাস্তব আমদানী সামগ্রী (visible items of exports and imports) ধরা হয়। ইহা ছাড়া, নিম্নলিখিত অবাস্তব রপ্তানী ও অবাস্তব আমদানীর উপাদানগুলিও (invisible items of exports and imports) ভুক্তি করা হয়।

জমা উদ্বৃত্তের উপাদন (Items included in balance of payments)

(১) বৈদেশিক ব্যাংক, বীমা কোম্পানী, জাহাজী পরিবহন কোম্পানীর সেবাকৃত্য ঃ যদি বিদেশের ব্যাংক, বীমা ও জাহাজী কোম্পানী আমাদের দেশে কাজ করে, তাহা হইলে উহাদের সেবাকৃত্য আমাদের অবাস্তব আমদানীর উপাদান হিসাবে ধরিতে হইবে এবং ঐ খাতে হিসাব উদ্বৃত্তের ডেবিট খরচ দেখাইতে হইবে। অপর পক্ষে, আমাদের ব্যাংক, বীমা কোম্পানী প্রভৃতি যদি বিদেশে সেবাকৃত্য যোগায়, তাহা হইলে ঐ সেবাকৃত্য আমাদের অবাস্তব রপ্তানীর উপাদান হিসাবে ধরিয়া, ঐ খাতে হিসাব উদ্বৃত্তের জমা ধরিতে হইবে।

(২) বৈদেশিক বিনিয়োগের সুদ ও মুনাফা ঃ যদি আমরা বিদেশের মূলধন আমদানী করি, তাহা হইলে ঐ বিনিয়োগকৃত মূলধনের সুদ ও মুনাফা বাবদ আমাদের যে দাবী মিটাইতে হইবে, উহা আমাদের অবাস্তব আমদানীর উপাদান বিশেষ। আবার, আমরা যদি বিদেশে মূলধন বিনিয়োগ করি, তাহা হইলে বিদেশ হইতে পাওনা সুদ ও মুনাফা আমাদের অবাস্তব রপ্তানীর উপাদান হইবে।

(৩) ভ্রমণকারীদের খরচ, বৈদেশিক শিক্ষার ব্যয়, আন্তর্জাতিক দাতব্য খরচ প্রভৃতি ঃ যদি বৈদেশিক ভ্রমণকারীরা আমাদের দেশ পরিদর্শন করে, তাহা হইলে তাহারা যে অর্থ এখানে আসিয়া ব্যয় করিবে, তাহাতে আমাদের হিসাব উদ্বৃত্তের জমা বৃদ্ধি পাইবে। আবার, আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা যদি বিদেশে যাইয়া পড়াশুনা করে ও সেই দরুণ অর্থব্যয় করে, তাহা হইলে আমাদের হিসাব উদ্বৃত্তের ডেবিট খরচ হইবে। সেইরূপ, আমরা যদি অন্য দেশকে দাতব্য স্বরূপ অর্থ দান করি, উহা আমাদের অবাস্তব আমদানীর উপাদান হইবে ও হিসাব উদ্বৃত্তের খরচ ভুক্তি হইবে।

(৪) রাষ্ট্র সংক্রান্ত খরচ ঃ প্রত্যেক দেশকেই অন্যদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠাইতে হয় ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্কীয় অনেক বিষয় তদারকের জন্য বিদেশে কূটনৈতিক সংস্থা ও দূতাবাস (embassies and legations) স্থাপন ও ভরণ-পোষণ করিতে হয়। দেশকে এই খাতে যে খরচ বহন করিতে হয়, তাহা ও ইহার অবাস্তব আমদানীরই একটি উপাদান বিশেষ ও হিসাব উদ্বৃত্তের খরচ ভুক্তি হইয়া থাকে।

অতএব, কোন দেশের হিসাব উদ্বৃত্ত নির্ণয় করিতে হইলে, একদিকে দেশের সমস্ত বাস্তব রপ্তানী দ্রব্য ও অবাস্তব রপ্তানী সেবাকৃত্য ধরিতে হইবে। এইগুলি

দেশের জমার খাতে অন্তর্ভূক্ত করিতে হয়। অন্যদিকে সকল বাস্তব আমদানী সামগ্রী ও অবাস্তব আমদানী সামগ্রী ধরিতে হইবে। এইগুলি দেশের ডেবিট খরচের হিসাবে অন্তর্ভূক্ত করিয়া যদি দেখা যায় যে, খরচের তুলনায় জমার পরিমাণ বেশী,তাহা হইলেই দেশের জমা উদ্বৃত্ত বা প্রকৃত বাণিজ্য উদ্বৃত্ত হইয়াছে বলা যায়।

রপ্তানী ও আমদানী সাম্য (Exports tend to equal Imports) : স্বল্প কাল মিয়াদে কম বেশী হইলেও, দেশের রপ্তানী ও আমদানী দীর্ঘমিয়াদে সমান হয়। ইহার অর্থ এই না যে, দেশের রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য ও আমদানী দ্রব্যের মূল্য সমান হইবে। কিন্তু, রপ্তানী ও আমদানীর যদি ব্যাপক অর্থ ধরা যায়, তাহা হইলে দীর্ঘকালে দেশের রপ্তানী আমদানীকে পোষাইয়া লইবে। রপ্তানীর ব্যাপক অর্থ বলিতে, উহার মধ্যে সকল বাস্তব দ্রব্য ও অবাস্তব সেবাকৃত্যের মূল্য ধরিতে হইবে। সেইরূপ, আমদানীর ব্যাপক অর্থ বলিতে, সকল বাস্তব দ্রব্য ও অবাস্তব সেবাকৃত্যের মূল্য ভুক্তি করিতে হইবে।

কি প্রক্রিয়া দ্বারা দীর্ঘকালে দেশের রপ্তানী ও আমদানী সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত এই যে, দেশের মুদ্রাব্যবস্থার মাধ্যমে রপ্তানী ও আমদানী সমান হইয়া থাকে। যদি কোন দেশের আমদানী ঐ দেশের রপ্তানী হইতে অধিক হয়, তাহা হইলে উদ্বৃত্ত আমদানীর জন্য ঐ দেশ হইতে স্বর্ণ চলিয়া যাইবে। তাহাতে ঐ দেশে অর্থ যোগান সংকুচিত হইবে, আর যে দেশে স্বর্ণ চলিয়া যাইবে, সেখানে অর্থ যোগান বৃদ্ধি পাইবে। ফলে, প্রথমোক্ত দেশে দামস্তর ও উৎপাদন খরচ হ্রাস পাইবে ও দ্বিতীয়োক্ত দেশে দামস্তর ও উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাইবে। ইহাতে প্রথম দেশটির রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে ও আমদানী হ্রাস পাইবে ; আর, দ্বিতীয় দেশটির রপ্তানী হ্রাস পাইবে ও আমদানী বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়া ততক্ষণ অবধি চলিতে থাকিবে, যতক্ষণ না দুইটি দেশেরই ডেবিট্ খরচ ও জমা সমান হয়।

রপ্তানী আমদানী সাম্যের প্রক্রিয়া

লর্ড কীনস্, শ্রীমতি রবীন্‌সন, হ্যারোড্ (Harrod) প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা জমা উদ্বৃত্ত তত্ত্বের ব্যাখান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, কর্ম নিয়োগের পরিবর্তন ও আয়স্তরের উঠা নামার মাধ্যমেই রপ্তানী ও

আমদানীর সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি দুইটি দেশ 'ক' ও 'খ' এর মধ্যে 'ক' এর আমদানী রপ্তানীর চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে 'ক' এর জমা উদ্বৃত্তের ঘাটতি কিছুটা অবশ্য স্বর্ণ রপ্তানীর দ্বারা ঘুচিবে। 'ক' হইতে 'খ' তে স্বর্ণ রপ্তানীর ফলে, 'খ' তে অর্থ যোগান সম্প্রসারিত হইয়া, রপ্তানী শিল্পে নিয়োগ ও কারক আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই আয় বৃদ্ধির দরুণ দেশের আন্তশিল্প দ্রব্যের চাহিদা ও বাড়িবে ও ফলে কর্মনিয়োগ ও আয় বৃদ্ধির গুননীয়ক (multiplier) ফলাফল (পরে দ্রষ্টব্য) দেখা দিবে। ইহাতে 'খ' দেশে 'ক' দেশ হইতে দ্রব্য আমদানী বৃদ্ধি পাইবে এবং 'খ' এর জমা উদ্বৃত্ত কমিয়া দুই দেশের রপ্তানী ও আমদানী সমান হইবে।

লক্ষ্য করিতে হইবে যে, অনেক সময় আয়স্তরের উঠানামার প্রক্রিয়া দ্বারা দেশের রপ্তানী ও আমদানীর সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নাও হইতে পারে। তখন সরাসরি বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ও অর্থের আন্তর্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস-বৃদ্ধি দ্বারা দেশের রপ্তানী ও আমদানীর সমতা প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

রপ্তানী-আমদানীর কম-বেশীর প্রতিকার (Correction of an excess of either imports or exports): দীর্ঘকাল ব্যাপী কোন দেশেরই রপ্তানীর আধিক্য, কিংবা আমদানীর আধিক্য থাকিতে পারে না। দেশের রপ্তানী-আমদানীর বৈষম্য দুইটি বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা দূর হইতে পারে।

স্বর্ণমানের স্বয়ং ক্রিয়াশীলতা দ্বারা রপ্তানী-আমদানীর বৈষম্য দূরীকরণ

দুইটি দেশ যদি স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে ঐ মুদ্রাব্যবস্থার স্বয়ংক্রিয়াশীলতা দ্বারা রপ্তানী-আমদানীর বৈষম্য দূর হইতে পারে! 'ক' ও 'খ', এই দুই দেশের মধ্যে 'ক' দেশটি যদি রপ্তানীর চেয়ে 'খ' দেশ হইতে আমদানী বেশী করে, তাহা হইলে 'খ' তে স্বর্ণ প্রবাহ ধাবিত হয়। ইহাতে 'খ' তে অর্থ-যোগান বৃদ্ধি পাইয়া দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে। এই দামস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায়, 'খ' র রপ্তানী হ্রাস পাইবে। আবার 'ক' হইতে স্বর্ণ চলিয়া যাওয়ায় অর্থ-যোগান হ্রাস পাইবে। এই অর্থ-যোগান হ্রাসের ফলে ঐ দেশে দামস্তর হ্রাস পাইবে ও রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে। এই প্রক্রিয়াতে রপ্তানী ও আমদানী সমান হইবে।

স্বর্ণমানের নির্বাসনের সংগে সংগে, উপরি উক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রপ্তানী-আমদানীর বৈষম্য দূরীকরণ অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ফলে, রপ্তানী আমদানীর বৈষম্য দূর হয় দুইটি দেশের আয় ও দামস্তরের উঠা-নামার

মাধ্যমে। যে দেশের আমদানীর চেয়ে রপ্তানী অধিক, সে দেশের অর্থ-আয় ও দামস্তর বৃদ্ধি পায়। অর্থ-আয় বৃদ্ধির ফলে সে দেশে আমদানী বৃদ্ধি পায়; আর দামস্তর বৃদ্ধির ফলে সে দেশের রপ্তানী হ্রাস পায়। আবার, যে দেশের রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বেশী, সে দেশে অর্থ-আয় ও দামস্তর হ্রাস পায়। অর্থ-আয় হ্রাসের ফলে সে দেশের আমদানী হ্রাস পায়, আর দামস্তর হ্রাসের ফলে সে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। এইরূপে, আয় ও দামস্তরের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে রপ্তানী ও আমদানী সমান হয়। অনেক সময় এই প্রক্রিয়াও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় না। তখন প্রতিকার-মূলক অন্যান্য ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়।

আয় ও দামস্তরের উঠা-নামার মাধ্যমে রপ্তানী-আমদানীর বৈষম্য দূরীকরণ

রপ্তানী-আমদানী বৈষম্য দূরীকরণের অন্যান্য প্রতিকার-মূলক ব্যবস্থা

যখন রপ্তানীর তুলনায়, কোন দেশে আমদানী অধিক হয় ও তাহার ফলে, ঐ দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত প্রতিকূল হয়, তখন প্রতিকার হিসাবে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বন করা যাইতে পারে।

দেশের আমদানী-সংকোচন ও রপ্তানী-প্রসারণ দ্বারা বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত ঘাট্‌তি ঘুচান যায়। আমদানী-সংকোচন করা যায় নানা উপায়ে। যথা, বিদেশী মাল খরিদ একদম নিষিদ্ধ (total prohibition) ঘোষণা করিয়া, কিংবা উচ্চ আমদানী শুল্ক চাপাইয়া, কিংবা আমদানীর বরাদ্দ (quota system) ধার্য করিয়া দিয়া। সেইরূপ, দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও রপ্তানীকারীদের রাজবৃত্তি (bounty) বা অর্থ সাহায্য দিয়া রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধির সহায়তা করা যায়।

আমদানী-সংকোচন ও রপ্তানী-প্রসারণ

মুদ্রা-মূল্য হ্রাস (depreciation of currency) করিলেও দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। কোন দেশের মুদ্রা-মূল্য হ্রাস করিলে, ঐ দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হার হ্রাস পাইবে। তাহার অর্থ এই যে, বিদেশীরা পূর্বের চাইতে তাহাদের মুদ্রা কম দিয়া একই পরিমাণ দ্রব্য ঐ দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিবে; কিংবা বিদেশীরা একই পরিমাণ অর্থ দ্বারা অধিক দ্রব্য ঐ দেশ হইতে ক্রয় করিতে পারিবে। ফলে, ঐ দেশের রপ্তানীর চাহিদা বিদেশে বাড়িবে ও ঐ দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হইবে।

মুদ্রা-মূল্য হ্রাস

মুদ্রা-সংকোচন (deflation of currency) দ্বারাও দেশের বাণিজ্য

উদ্বৃত্তের ঘাটতি ঘুচান যায়। মুদ্রা-সংকোচনের ফলে, মুদ্রা-মূল্য বৃদ্ধি পায় ও দামস্তর হ্রাস পায়। দেশের দামস্তর হ্রাস হইলে, ঐ দেশে আমদানী আকৃষ্ট হয় না ; বরঞ্চ, ঐ দেশের রপ্তানীই বৃদ্ধি পায়। ফলে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের বাণিজ্য উদ্বৃত্ত অনুকূল হয়।

মুদ্রা-সংকোচন

মানমুদ্রার ধাতু উপাদান কমাইয়া দিয়াও (devaluation) দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের উদবৃত্ত ঘাটতি ঘুচান যায়। মানমুদ্রার ধাতু উপাদান (metallic content) হ্রাস করিলে ঐ মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাস পাইবে। তাহার ফলে বিদেশীরা ঐ দেশ হইতে কম অর্থ দিয়া একই পরিমাণ দ্রব্য বা সেবাকৃত্য ক্রয় করিতে পারিবে। ইহাতে ঐ দেশের রপ্তানী বাড়িবে ও আমদানী কমিবে।

মানমুদ্রার ধাতু উপাদান হ্রাস

কিন্তু যখন এই সকল ব্যবস্থাও কার্যকরী হয় না, কিংবা উহাদের অপগুণ ও কুফল দেখা দেয়, তখন বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (exchange control) ব্যবস্থার প্রবর্তন করিতে হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা দেশের সকল রপ্তানীকারীগণ বিদেশী মুদ্রার উপর তাহাদের পাওনা দাবী বিদেশী বিনিময় (foreign exchange claims) দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট ছাড়িয়া দিবে এবং বিনিময়ে তাহাদিগকে দেশের মুদ্রা দেওয়া হইবে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই পাওনা বিদেশী বিনিময় (foreign exchange) কেবলমাত্র ভারপ্রাপ্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যের আমদানীকারীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবে। ফলে, আমদানীর পরিমাণ দেশের বর্তমান পাওনা বিদেশী বিনিময় পরিমাণ দ্বারাই সীমিত থাকিবে এবং আমদানী রপ্তানীর চেয়ে বাড়িতে পারিবে না।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

অবাধ বাণিজ্যঃ ইহার গুণ ও অপগুণ (Free Trade : Its Advantages and Disadvantages) : আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের কুফল নির্ভর করে আঞ্চলিক কর্ম বিভাগের কার্যকারিতার উপর। আঞ্চলিক কর্ম বিভাগ পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে কার্যকরী হয় তখনই, যখন এক দেশ ও অপর দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলাচলের কোনই বাধা নিষেধ বা প্রতিবন্ধক থাকে না।

ডেভিড্ রিকার্ডো প্রমুখ ক্ল্যাসিকাল অর্থবিদ্যাবিদগণ অবাধ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের পূর্ণ সমর্থক ছিলেন। অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে তাঁহারা নিম্নলিখিত গুণাবলী দাবী করেন।

অবাধ বাণিজ্যের গুণাবলী

প্রথমতঃ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অবাধ হইলেই আঞ্চলিক কর্ম বিভাগ

নীতিটির পূর্ণ কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায়। আর আঞ্চলিক কর্ম বিভাগ নীতিটি কার্যকরী হইলেই, বিভিন্ন দেশের মধ্যে উৎপাদক সম্পদগুলির সুবণ্টনও বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ সম্ভব হয়। উৎপাদক সম্পদগুলির এই সুবণ্টন ও বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ যেমন পৃথকভাবে প্রত্যেক দেশের আর্থিক উন্নতির সহায়ক, অপর দিকে গোটা পৃথিবীর সমৃদ্ধি সুসমঞ্জস করিতেও সহায়শীল।

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্যেব ফলে দামস্তর সকল দেশেই সমান হয় ও হ্রাস পায়। তাহাছাড়া, বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগতার দরুণ উৎপন্ন দ্রব্যের উৎকর্ষতা লাভ ও বৃদ্ধি পায়। অবাধ বাণিজ্যের দৌলতে খাদক শ্রেণী উন্নত ধরণের মাল অপেক্ষাকৃত সস্তামূল্যে ক্রয় করিতে পারে। ফলে, সাধারণের জীবন যাত্রার মান উন্নীত হয়।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য অবাধ হইলে বিভিন্ন উৎপাদক কারকগণের আয় ও বৃদ্ধি পায়। উহারা যে দেশে কর্ম নিযোগ সর্বাপেক্ষা লাভ জনক সেখানে বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু, অবাধ বাণিজ্যের এই সকল সুফল থাকা সত্বেও, আধুনিক অর্থবিদ্যা-বিদগণ এই বাণিজ্য নীতি সমর্থন করেন না।

অবাধ বাণিজ্যেব ফলে আর্থিক অনুন্নত দেশ গুলি উন্নত দেশগুলির সংগে প্রতিযোগিতায় টিকিয়া থাকিতে পারে না। অনুন্নত দেশ সমূহের শিশুশিল্পগুলিকে রক্ষা ও উন্মার্গগামী করিতে হইলে বিদেশাগত সস্তা দ্রব্যের উপর আমদানী শুল্ক চাপাইয়া অবাধ বাণিজ্য প্রতিরোধ করিতে হয়।

অবাধ বাণিজ্যের অপগুণ

দ্বিতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্যের ফলে, অনেক সময় সমাজস্বার্থ হানিকর দ্রব্য দেশে আমদানী হইতে পারে। তাহা মোটেই অভিপ্রেত নহে।

তৃতীয়তঃ, অবাধ বাণিজ্যের প্রচলন থাকিলে বিদেশীরা অন্য দেশে সস্তায় মাল ঢালিয়া (dumping) ঐ দেশে নিজেদের অর্থ নৈতিক স্বার্থ কায়েমী করিতে পারে। ঐ দেশের পক্ষ হইতে তাহা মোটে ও বাঞ্চনীয় নহে। এই সকল অপগুণের জন্য অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রায় সকল দেশেই পরিহার করিয়াছে এবং তাহার পরিবর্তে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যক্ষেত্রে সংরক্ষণ (protection) নীতি প্রসার লাভ করিয়াছে।

সংরক্ষণ (Protection) : বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্পগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণদ্বারা রক্ষার যে ব্যবস্থা, উহাকে শিল্প-

সংরক্ষণ বলে। সংরক্ষণের ব্যবস্থা নানা ভাবে করা যায়। উহার মধ্যে দুইটি ব্যবস্থা সাধরণতঃ অধিক প্রচলিত : (১) বৈদেশিক দ্রব্যের উপর আমদনী শুল্ক ধার্য করা এবং (২) আন্তঃ শিল্পগুলিকে রাজবৃত্তি (bounty) বা সরকারী অর্থসাহায্য দেওয়া। আমদানী শুল্ক সরকারী আযের উৎস বটে, কিন্তু দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়া ইহা খাদক শ্রেণীকে বিপর্যস্ত করে। রাজবৃত্তির সুবিধা এই যে, ইহাতে দ্রব্যমূল্য বাড়িতে পারে না ; কিন্তু ইহার গলদ এই যে, ইহা সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করে এবং এই ব্যয়ের বোঝা দেশের কর প্রদানকারীদের বহন করিতে হয়।

সংরক্ষণের স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of protection) : সংরক্ষণের স্বপক্ষে অনেক যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে। ঐ সকল যুক্তি কি, এবং উহাদের সারবত্তাই বা কতটা, নিম্নে আমরা তাহার আলোচনা করিলাম।

(১) শিশুশিল্প যুক্তি (Infant industries argument) : সংরক্ষণের পক্ষে প্রথম ও প্রধানতম যুক্তি হইল, শিশুশিল্প যুক্তি। প্রত্যেক দেশেই বিশেষ বিশেষ শিল্প উন্নয়নের পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল প্রাকৃত সম্পদ থাকিতে পারে। কিন্তু বৈদেশিক শিল্পের তীব্র প্রতিযোগিতার মুখে ঐ সকল শিল্প শিশুঅবস্থা হইতে গড়িয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নিজপাযে দাড়াইতে পারে না। এই অবস্থায় দেশের সরকার যদি উহাদিগকে বৈদেশিক প্রতিযোগিতাব হাত হইতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে তাহা হইলে উহারা বয়ঃপ্রাপ্ত ও উন্মার্গগামী হইযা পৃথিবীর বাজারে অন্যান্য শিল্পের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে সক্ষম হইবে। "Nurse the baby, protect the child, free the adult"—এই বাণীটির মধ্য দিয়া সংরক্ষণের স্বপক্ষ যুক্তির মূলসূত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণতঃ, যে সকল দেশ অনুন্নত তাহাদের যদি শিল্পোন্নয়ন কার্যে অগ্রসর লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করা সর্বৈব যুক্তিযুক্ত। কিন্তু অনুন্নত ও শিশুশিল্প যুক্তির অজুহাতে সংরক্ষণ নীতি স্থায়ীভাবে কোন দেশের পক্ষে কায়েমী করা উচিত নহে। শিশুশিল্প যুক্তির বিপদ এই যে, ইহার সুযোগ লইয়া শিল্প শিশুঅবস্থা অতিক্রম করিয়া কখনও বয়ঃপ্রাপ্ত ও আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চাহে না।

(২) অর্থ দেশে রাখার যুক্তি (Keeping money at home argument) : সংরক্ষণের স্বপক্ষে আর একটি সাধারণ যুক্তি এই যে, এই নীতি কার্যকরী হইলে দেশের টাকা দেশে থাকে। সংরক্ষণ দ্বারা যদি দেশের শিল্প উন্নত করা যায়, তাহা হইলে দেশের লোক ঐ শিল্পোৎপাদিত দ্রব্যই ক্রয় করিতে পারে। ফলে, দেশের অর্থ দেশে থাকে। বৈদেশিক দ্রব্য ক্রয় করিতে হয় না বলিয়া দেশের

অর্থ বিদেশে চলিয়া যায় না। কিন্তু এ যুক্তি ও অকাট্য নয়। কেননা, খাদক শ্রেণীর সস্তা মাল ক্রয়ের দিকেই ঝোঁক বেশী। তাহারা সংরক্ষিত দেশী শিল্পজাত দ্রব্য অধিক মূল্যে না কিনিয়া সস্তায় বিদেশী দ্রব্য কিনিতে আকৃষ্ট হইতে পারে। দেশী খাদক শ্রেণী অধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া যদি লোকসান গ্রস্ত হইতে রাজী হয়, তাহা হইলেই সংরক্ষণ নীতি দ্বারা দেশের অর্থ দেশে রাখা সম্ভব হয়।

(৩) বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের যুক্তি (Balance of trade argument): দেশের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত অনুকূল করিতে হইলে সংরক্ষণের সহায়তায় দেশের শিল্পোন্নয়ন করা যুক্তি-যুক্ত। দেশের শিল্প উন্নয়ন না করিয়া যদি কেবল বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানীর উপর নির্ভর করা যায়, তাহা হইলে দেশ হইতে স্বর্ণ বাহির হইয়া যাইবে এবং দেশের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত প্রতিকূল হইবে। সুতরাং, সংরক্ষণের সহায়তার দেশজ শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া দেশের রপ্তানী সম্প্রসারণ করা উচিত। এইরূপ রপ্তানী বৃদ্ধি দ্বারাই দেশে স্বর্ণ আমদানী বাড়ে ও দেশের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্ত অনুকূল হয়। কিন্তু, বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের যুক্তি ও বেশী দূর টানা যায় না; কেননা, প্রত্যেক দেশই যদি স্বর্ণ আমদানীর আশায় দ্রব্য রপ্তানী সম্প্রসারণ করিতে থাকে, তাহা হইলে শেষটায় দ্রব্য কে খরিদ করিবে? তাহাছাড়া, কেবলমাত্র দ্রব্য রপ্তানী বৃদ্ধি দ্বারা স্বর্ণ আমদানী বাড়াইয়া, কোন দেশ বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের প্রকৃত অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করিতে পারে না। পরন্তু, একমাত্র বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের অনুকূল অবস্থা কোন দেশের অর্থ নৈতিক উন্নতির আসল পরিচায়ক নহে।

(৪) আন্তঃবাজার যুক্তি (Home market argument): সরকারী সংরক্ষণের ফলে যখন দেশজ শিল্পের উন্নয়ন হয়, তখন ঐ শিল্পায়নে বহু লোকের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি হয়। এই কর্ম নিয়োগ সম্প্রসারণের ফলে সাধারণ ক্রয় ক্ষমতা বাড়ে এবং তাহাতে অন্যান্য অসংরক্ষিত শিল্পের বিক্রয় বাজার বিস্তৃতি লাভ করে। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, সরকারী সংরক্ষণের ফলে দেশে আমদানী দ্রব্যের হ্রাস পায়। ইহাতে আবার দেশের রপ্তানীরও সংকোচন ঘটে। দেশের রপ্তানী হ্রাস হইলে স্বভাবতঃই যে সকল শিল্প রপ্তানী দ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত তাহাদের আন্তর্জাতিক বাজার সংকীর্ণ হয়। সুতরাং, সংরক্ষণের ফলে একদিকে যেমন আন্তঃবাজারের বিস্তৃতি লাভ ঘটে, অন্যদিকে তেমনি বহির্বাজার সীমিত হয়।

(৫) **মজুরি যুক্তি (Wages argument)** : যে দেশে মজুরি হার অপেক্ষাকৃত অধিক, সরকারী সংরক্ষণ দ্বারা সেই দেশকে, যে দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত কম, সেই দেশের প্রতিযোগতার বিরুদ্ধে রক্ষা করিতে হয়। ইহার কারণ এই যে, যে দেশে মজুরির হার অধিক, সেখানে উৎপাদন খরচ ও দামস্তরই দুইই অধিক। ঐ দেশের শিল্পগুলি অপেক্ষাকৃত স্বল্প মজুরি বর্তমান দেশগুলির সংগে টিকিয়া উঠিতে পারে না। কিন্তু, এ যুক্তিও অকাট্য নহে। কেননা, মজুরির হার বৃদ্ধিতেই সকল সময় উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায় না। শ্রমিকের উৎপাদকতা বৃদ্ধির দরুণ যদি মজুরির হার বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে গড়পড়তা উৎপাদন খরচ না বাড়িয়া, বরংচ হ্রাসই পাইবে। সুতরাং, যে দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত অধিক, সে দেশ, যে দেশে মজুরির হার অপেক্ষাকৃত অল্প, সে দেশের সংগে প্রতিযোগিতায় বিক্রয় বাজার হইতে উঠিয়া যায় না।

সংরক্ষণের স্বপক্ষে আর একটা যুক্তি এই যে, ইহার সহায়তায দেশে মজুরির হার বৃদ্ধি পায়। সংরক্ষণের ফলে যখন নূতন শিল্পের উদ্ভব হয়, তখন অধিক শ্রমিকের কর্ম নিযোগ হয় ও উহাদের অর্থমজুরিও বাড়ে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, অর্থমজুরি বৃদ্ধির সংগে দামস্তরও বৃদ্ধি পায়, এবং দামস্তরের বৃদ্ধির ফলে, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হ্রাস পাইয়া থাকে। মজুরির হার বৃদ্ধি শিল্প-সংরক্ষণের ফলে হয় না, শ্রমিকের উৎপাদকতা বৃদ্ধির ফলে হয। শিল্প সংরক্ষণের ফলে শ্রম ও মূলধন সর্বোচ্চ মুনাফা-সম্বলিত বিনিয়োগে আকৃষ্ট হইতে পারে না ; ফলে, সাধারণ উৎপাদকতা, সাধারণ উন্নতি ও সাধারণ মজুরির হার হ্রাস পায়।

(৬) **সরকারী আয়ের যুক্তি (Government revenue argument) :** অনেকে সংরক্ষণের পক্ষে এই যুক্তি দেন যে, এই নীতি দ্বারা বেশ কিছু পরিমাণ সরকারী আয় লাভ হয়। যেমন, আমাদের দেশে আমদানী শুল্ক সরকারের প্রচুর আযের উৎস। কিন্তু, আমরা যদি একটু বিবেচনা করিয়া দেখি, তাহা হইলে বুঝিতে পারিব যে, সরকার যদি পুরাদস্তুর সংরক্ষণ নীতি অনুসরণ করে, তাহা হইলে বিদেশের কোন দ্রব্যই আমদানী হইবে না ; এবং বিদেশের দ্রব্য আমদানী না হইলে, সরকার ঐ দ্রব্যের উপর কোন কর আদায় করিতেও পারিবে না।

(৭) **শিল্প বিভিন্নমুখীকরণ যুক্তি (Diversification of industries argument) :** দেশের শিল্প বিভিন্নমুখীকরণে সংরক্ষণ নীতি অনেক সময়

সহায়তা করিয়া থাকে। জাতীয় আত্মনির্ভরতার জন্য, দেশের সকল উৎপাদক সম্পদের পূর্ণ বিনিয়োগের জন্য, এবং এক বা কতিপয় শিল্পের উপর নির্ভরতার বিপদ ও অনিশ্চয়তার হাত হইতে রেহাই পাইবার জন্য, সংরক্ষণ দ্বারা দেশের বিভিন্ন রকমের শিল্প-উন্নয়ন করা যুক্তিযুক্ত। কিন্তু, সংরক্ষণের স্বপক্ষে এই যুক্তি ও অকাট্য নয়। কেননা, সংরক্ষণ দ্বারা দেশের কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পাইতে পারে সত্য, কিন্তু কেবল নিয়োগ বৃদ্ধিতেই দেশের আর্থিক উন্নতি ঘটে না। সংরক্ষণ নীতি দেশের উৎপাদক সম্পদকে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মুনাফা-সম্বলিত বিনিয়োগে স্থাপিত করিয়া সাধারণ আর্থিক উন্নতি ব্যাহত করে।

(৮) **বিদেশে সস্তা মাল ঢালার যুক্তি (Dumping argument)**: বিদেশীরা যখন সস্তায় কোন দেশে মাল ঢালে, তখন ঐ দেশের আন্তঃ-শিল্প বাণিজ্যের পক্ষে যথেষ্ট হানিকর হয়। সংরক্ষণ নীতি দ্বারা সস্তা বিদেশী মালের আমদানী বন্ধ করিয়া দেওয়া প্রায় সকলেই সমর্থন করিয়া থাকেন। তবে মনে রাখিতে হইবে, বিদেশীরা অন্য দেশে যে অতি সস্তায় মাল ঢালে, তাহা স্বল্প-মিয়াদি অস্থায়ী প্রক্রিয়া বিশেষ। সেই জন্য সংরক্ষণী আমদানী শুল্ক স্থাপনও করিতে হইবে অস্থায়ীভাবে। কিন্তু, সংরক্ষণের একটি বড় গলদ এই যে, সরকার একবার আমদানী শুল্ক স্থাপন করিলে সহজে তাহা প্রত্যাহার করিতে পারে না।

(৯) **কর্ম-নিয়োগ যুক্তি (Employment argument)**: দেশের কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধির অজুহাতে ও সংরক্ষণ নীতি সমর্থন করা হইয়া থাকে। সংরক্ষণের ফলে দেশজ শিল্পের উন্নয়ন ঘটে, তাহাতে দেশের কর্ম-সংস্থান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু, মনে রাখিতে হইবে যে, সংরক্ষণের ফলে যখন আমদানী হ্রাস পায়, তাহাতে দেশের রপ্তানীও হ্রাস পাইবে। সুতরাং, সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিলে, সংরক্ষিত শিল্পে কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি পায় বটে, কিন্তু তাহাতে রপ্তানী শিল্পে কর্ম-নিয়োগ সংকুচিত হয়।

লর্ড কীনস্ মন্তব্য করেন যে, সংরক্ষণ নীতি দ্বারা কর্ম-নিয়োগ বৃদ্ধি সম্ভব হয় তখনই, যখন ঐ নীতি অবলম্বনের ফলে দেশের রপ্তানীর পরিমাণ হ্রাস না পায়। দেশের রপ্তানীর আয়তন যাহাতে একই থাকে, তাঁহার জন্য কীনস দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রথমতঃ, যে দেশ সংরক্ষণ নীতি অবলম্বন করিয়াছে, উহাকে বিদেশে অধিক পরিমাণ ঋণ যোগাইতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, আমদানী শুল্ক হইতে যে অর্থ-আয় হইবে, তাহার একটি মোটা অংশ রপ্তানী শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করিতে হইবে। প্রথম উপায় অবলম্বন করিলে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া রপ্তানী শিল্পে কর্ম নিযোগ বৃদ্ধি পাইবে বটে ; কিন্তু, বিদেশে ঋণ যোগানের ফলে দেশের আন্তঃ বিনিয়োগ হ্রাস পাইবে।

তৃতীয়তঃ, সরকার যদি রপ্তানী শিল্প উন্নযনেব জন্য সাধারণ রাজবৃত্তি (bounty) বা ঢালা অর্থ সাহায্য বাড়াইয়া দেয়, তাহা হইলে বিদেশীরাও নিষ্ক্রিয় হইয়া বসিয়া থাকিবে না ; তাহারাও প্রতিহিংসার বশবর্তী হইয়া dumping প্রতিরোধ মূলক উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রবর্তন করিবে।

সংরক্ষণ নীতির বিপদ ও ব্যত্যয় (Dangers and limitations of a policy of protection) : আমরা দেখিয়াছি যে, যে সকল যুক্তির উপর সংরক্ষণ নীতি প্রতিষ্ঠিত, তাহার প্রত্যেকটির প্রতিবাদ করা চলে। সুতরাং, সংরক্ষণের স্বপক্ষে কোন অকাট্য যুক্তি দেওয়া চলেনা। তাহাছাড়া, অবাধ সংরক্ষণ নীতির সমূহ বিপদ ও ব্যত্যয়ও আছে।

প্রথমতঃ, সংরক্ষণ নীতির ফলে দেশের আমদানী কমিয়া সরকারী আয় হ্রাস পায়।

দ্বিতীয়তঃ, সংরক্ষণ দ্বারা যখন বহিঃ প্রতিযোগিতা রোধ করা হয়, তখন আন্তঃশিল্পোৎপাদনের উৎসাহ ও উদ্যম অনেক কমিযা যায়, শিল্পোন্নয়নের গতি স্তিমিত হয ও দ্রব্যের উৎকর্ষতা ও হীন হইয়া পড়ে।

তৃতীয়তঃ, সংরক্ষণের বড় গলদ আসিযা পড়ে খাদক শ্রেণীর উপর। সংরক্ষণের ফলে তাহাদের অধিক মূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিতে হয।

চতুর্থতঃ, সংরক্ষণ নীতির ফলে যদি উচ্চ আমদানী শুল্ক ধার্য হয, তাহা হইলে দেশের মধ্যে জোট কারবারেব অভ্যুত্থান সম্ভব। ইহার ফলে, আভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতা ব্যাহত হইযা নানা রকম কুফল দেখা দিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, সংরক্ষণ নীতি বৈদেশিক প্রতিযোগিতা দূর করিযা দেশের মধ্যে অনেক অকুশলী উৎপাদককে শিল্পায়নে সহায়তা করে। ইহাতে উৎপাদন ক্ষেত্রে আর্থিক অপচয় ঘটে।

ষষ্ঠতঃ, সংরক্ষণ নীতি দেশের উৎপাদক সম্পদকে বাধাধরা নির্দিষ্ট বিনিয়োগে জোর করিয়া স্থাপন করে। ইহার ফলে, উৎপাদনে সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ সম্ভব হয় না।

পরিশেষে, সংরক্ষণ নীতি একবার কার্যকরী হইলে, উহা সহজে

পরিহার করা যায় না। দেশের শিল্পগুলি নিজস্ব স্বার্থে সংরক্ষণের সুবিধা কায়েমীভাবে আদায় করে।

অনুশীলনী

1. Discuss the basis of international trade. (C.U. B.A. '53)

2. How would you estimate the gains a country derives from its international trade? (C.U. B.A. '54)

3. In what sense is it true to say that a country's exports pay for its imports? How is a difference between its values of exports and imports corrected? (C.U. B.Com. '52)

4. "Our imports are paid for by our exports"—Elucidate. What are the methods that are usually adopted for correcting an adverse balance of payments? (C.U. B.Com. '56)

5. Show how an excess of imports or exports tends to correct itself. (C.U. B.A. 53, B.Com. '54)

6. Examine the principle of comparative costs as an explanation of international trade. (C.U. B A. '50)

7. Examine the meaning of the concept "Terms of Trade" and point out the repercussions of change in the terms of trade on the economy of a country. (C.U.B.A. '54)

8. Examine the validity of the different arguments that have been advanced in favour of the policy of protection. (C.U. B.Com. '55)

9. In what circumstances and for how long should protection be given to an industry? Give reasons for your answer. (C.U. B.A. '52)

সপ্তত্রিংশ অধ্যায়

বৈদেশিক বিনিময় (Foreign Exchange)

ব্যাপক অর্থে বৈদেশিক বিনিময় সেই ব্যবসায় প্রক্রিয়া বা কারবারকে বুঝায়, যাহার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দেনাপানা মিটাইতে এক দেশের মুদ্রা অন্য দেশের মুদ্রায় রূপান্তর ঘটে। বাস্তবতঃ, যে হারে একদেশের মুদ্রা অন্যদেশের মুদ্রায় বিনিময় হয়, তাহাকে আমরা বৈদেশিক বিনিময় বলিয়া থাকি। আসলে কিন্তু, কোন দেশের মুদ্রারই ক্রয় বিক্রয় হয় না। আন্তর্জাতিক বিনিময় বাজারে বৈদেশিক হুণ্ডির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। সুতরাং, যে হারে কোন দেশের বৈদেশিক হুণ্ডির কেনা বেচা হয়, সেই দরকে বিনিময় হার বলা যায়।

বৈদেশিক বিনিময় হার নিরূপণ (Determination of the Rate of Exchange) : কি হারে এক দেশের মুদ্রা অপর এক দেশের মুদ্রায় বিনিময় হয়, তাহা নির্ণয় করিতে হইলে, দুইটি দেশের প্রচলিত মুদ্রাব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি কি তাহা জানা দরকার। যদি দুইটি দেশ স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে এক রকম ভাবে মুদ্রার বিনিময় হার ধার্য হয়; আবার, দুইটি দেশে যদি অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন থাকে, তাহা হইলে বিনিময় হার সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাবে নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন মুদ্রা ব্যবস্থায় বিনিময় হার কি রকম বিভিন্ন হয়, তাহা নিম্নে পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল।

যখন দুইটি দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত থাকে, তখন বৈদেশিক হুণ্ডি বিনিময়ের অভাবে, উহাদের মধ্যে দেনাপানা স্বর্ণ রপ্তানী ও স্বর্ণ আমদানীর মাধ্যমে মেটে। দুইটি দেশে স্বর্ণমান বর্তমান থাকিলে, ঐ দুই দেশেই মুদ্রার টাকশালী দুইটি নির্দিষ্ট স্বর্ণমূল্য থাকিবে। দুই দেশের স্বর্ণ মুদ্রায় কতটুকু পরিমাণ খাঁটি স্বর্ণধাতু বিদ্যমান, তাহা তুলনা করিয়া দুই দেশের মধ্যে মুদ্রার স্বাভাবিক বিনিময় অনুপাত ধার্য করিতে হয়। এই বিনিময় অনুপাতকে টাকশালী বিনিময় সাম্য (Mint par of exchange) বলা হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত ছিল,

টাকশালী বিনিময় সাম্য (Mint par of exchange)

তখন ইংলণ্ডের মানমুদ্রা পাউণ্ড (sovereign) দ্বারা যে পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করা

যাইত, যুক্তরাষ্ট্রের মানমুদ্রা ৪.৮৬৬ ডলার দ্বারা ও ঠিক একই পরিমাণ স্বর্ণ ক্রয় করা সম্ভব হইত। তখন এই দুইটি দেশের মুদ্রার বিনিময় অনুপাত ছিল, ১ পাউণ্ড = ৪.৮৬৬ ডলার। অতএব, আমরা দেখি যে স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত দুইটি দেশের মধ্যে যখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চলিতে থাকে, যখন প্রত্যেক দেশের মোট রপ্তানীর দাম ও মোট আমদানীর দাম সমান হয় এবং আর সকল আর্থিক অবস্থা অপরিবর্তনীয় থাকে, তখন দুইটি দেশের মুদ্রার স্বাভাবিক বিনিময় মূল্যসাম্য (normal rate of exchange) টাকশালী বিনিময় সাম্যের সমান হয়।

কিন্তু প্রকৃত বিনিময় মূল্য (actual rate of exchange) টাকশালী বিনিময় মূল্য সাম্যের চেয়ে কম বেশী হইতে পারে। প্রকৃত বিনিময় মূল্য দেশের বৈদেশিক মুদ্রা বা হুণ্ডির চাহিদা ও যোগান পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যদি দেশের আমদানী রপ্তানীর চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে বৈদেশিক মুদ্রা বা হুণ্ডির যোগান উহার চাহিদার তুলনায় কম হইবে। ফলে, বৈদেশিক মুদ্রা বা হুণ্ডির মূল্য বাড়িবে, এবং দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার হ্রাস পাইবে। কিন্তু, একটা নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্তই বৈদেশিক মুদ্রা বা হুণ্ডির মূল্য চড়িতে পারে ; কেননা, হুণ্ডির মূল্য যদি খুব বাড়ে এবং দেশের মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার খুব হ্রাস পায় এবং আমদানীকারীরা যদি মনে করে যে, আমদানী দ্রব্যের জন্য হুণ্ডি ক্রয় না করিয়া দেশ হইতে স্বর্ণ পাঠাইয়া পাওনা মিটান অপেক্ষাকৃত লাভ জনক, তাহা হইলে তাহারা তাহাই করিবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার বিনিময় মূল্য সাম্য হইতে বাড়িয়া স্বর্ণরপ্তানী বিন্দু (gold export point) পর্যন্ত পৌছিতে পারে। এই স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু ধার্য করা হয়, টাকশালী বিনিময় হারের সংগে স্বর্ণ রপ্তানীর খরচ যোগ করিয়া। যখন বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দুর চেয়ে অধিক হয়, সে ক্ষেত্রে আমদানীকারীরা বিদেশী মুদ্রা বা হুণ্ডি ক্রয় না করিয়া, স্বর্ণ বিদেশে প্রেরণ করিবে।

স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু (Gold export point)

অপরপক্ষে, যখন কোন দেশ আমদানীর চেয়ে রপ্তানী অধিক করে, তখন বৈদেশিক হুণ্ডির চাহিদার তুলনায় যোগান বেশী হইবে। ইহাতে বৈদেশিক হুণ্ডির দাম হ্রাস পাইবে এবং বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে। বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার কমিয়া স্বর্ণ আমদানী বিন্দু (gold import point) অবধি পৌছিতে পারে। যদি বৈদেশিক মুদ্রার

বিনিময় হার স্বর্ণ আমদানী বিন্দুর চেয়েও কম হয়, সেক্ষেত্রে রপ্তানীকারীরা রপ্তানী দ্রব্যের মূল্য হিসাবে স্বর্ণই আমদানী করিবে। এই স্বর্ণ আমদানী বিন্দু স্থির হয়, টাকশালী বিনিময় হার হইতে স্বর্ণের পারবহন খরচ বাদ দিয়া।

স্বর্ণ আমদানী বিন্দু (Gold import point)

দুইটি দেশ যখন স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত, তখন উহাদের মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হারের উঠানামা স্বভাবতঃ স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু ও স্বর্ণ আমদানী বিন্দু, এই দুই সীমারেখা দ্বারা সীমিত। কিন্তু যদি স্বর্ণ রপ্তানীর জন্য দেশে স্বর্ণ পিণ্ডের অভাব হয়, কিংবা স্বর্ণ চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা (embargo) থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত বিনিময় হার বাড়িয়া স্বর্ণ-রপ্তানী বিন্দুর উপরে যাইতে পারে। সেইরূপ, যদি স্বর্ণের অবাধ আমদানীর প্রতিবন্ধক থাকে, তাহা হইলে প্রকৃত মুদ্রার বিনিময় হার কমিয়া স্বর্ণ আমদানী বিন্দুর নীচে নামিতে পারে। তবে সাধারণ অবস্থায় মুদ্রার প্রকৃত বিনিময় হার টাকশালী বিনিময় হারের আশে পাশে উঠা-নামা করে।

অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রার বিনিময় হার : ক্রয় শক্তি সমতা তত্ত্ব (Rate of Exchange under Inconvertible Paper Standard : Purchasing Power Parity Theory) : দুইটি দেশ যদি স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত না থাকিয়া অবিনিমেয় কাগজী মুদ্রায় অধিষ্ঠিত থাকে, এবং উহারা যদি নিজেদের ইচ্ছামত মুদ্রাস্ফীতি ঘটাইতে পারে, তাহা হইলে টাকশালী বিনিময় সাম্য বলিয়া, কিংবা স্বর্ণ রপ্তানী বিন্দু ও স্বর্ণ আমদানী বিন্দু বলিয়া কিছু ভাবা যায় না। তখন স্বর্ণের নিরিখে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার পরিমাপ করা চলে না। তখন বৈদেশিক বিনিময় হার ঐ দুই দেশের মুদ্রার পারস্পরিক ক্রয় শক্তি দ্বারা নির্ণয় করিতে হয়। সুইজারল্যাণ্ড দেশের বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ ক্যাসেল্ (Cassel) এই মতবাদের আবিষ্কারক। সহজ কথায় তাঁহার তত্ত্বের সারমর্ম এই যে, দুইটি দেশের মুদ্রা অবিনিমেয় হইলে, উহাদের বিনিময় হার দুই দেশের দামস্তরের সম্পর্ক দ্বারা নির্ধারিত হয়। ১ পাউণ্ড মুদ্রা দ্বারা ইংলণ্ডে যে পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা যায়, ৫৲ টাকা খরচ করিলে ভারতবর্ষেও যদি একই পরিমাণ দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডের ও ভারতবর্ষের মুদ্রার বিনিময় হার হইবে, ১ পাউণ্ড : ১৫৲ টাকা। যদি ভারতবর্ষে দামস্তর হ্রাস পায়, অর্থাৎ টাকার যদি ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং ইংলণ্ডে দামস্তর অপরিবর্তনীয় থাকে, তাহা হইলে ১ পাউণ্ড ক্রয় করিতে কম টাকা লাগিবে ; অর্থাৎ, ১পাউণ্ডের বিনিময়ে ১৫৲টাকার চেয়ে কম দিতে হইবে।

যদি ভারতবর্ষে দামস্তরের সূচক-সংখ্যা শতকরা ৫০ কমে এবং ইংলণ্ডের দামস্তর যদি স্থির থাকে, তাহা হইলে বিনিময় হার কমিয়া হইবে : $\frac{১৫ \times ৫০}{১০০}$

অর্থাৎ, ১ পাউণ্ড : ৭৷৷০ টাকা। দুই দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা দ্বারা যে বিনিময় মূল্য নির্ধারিত হয় উহার স্থিরস্থাপকতা নাই ; কেননা, মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার উঠা-নামার সংগে উহার ও পরিবর্তন হইয়া থাকে।

স্থির অবস্থাতে দুইটি দেশের মুদ্রার পারস্পরিক ক্রয় ক্ষমতার অনুপাতকে স্বাভাবিক বিনিময় হার বলে। এই স্বাভাবিক বিনিময় হার বিনিময়ের সমমূল্য দর (Par of exchange)। যদি বাস্তব বিনিময় হার সমমূল্য দরের বেশী হয়, অর্থাৎ একটি দেশ যদি উহার কিছু মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা বা দ্রব্য পূর্বের চেয়ে অধিক পায়, তাহা হইলে ঐ দেশ বিদেশ হইতে অধিক মাল আমদানী করিতে থাকিবে। ইহাতে দেশের আমদানী বাড়িবে, ও রপ্তানী কমিবে। ফলে, বিদেশের মুদ্রার জন্য চাহিদা বাড়িবে এবং দেশী মুদ্রার বিনিময়ে বিদেশী মুদ্রা আগের চেয়ে কম পাওয়া যাইবে। ইহাতে বাস্তব বিনিময় হার কমিয়া আবার স্বাভাবিক বিনিময় হারের সমান হইবে। অপর পক্ষে, যদি বাস্তব বিনিময় হার সমমূল্য দরের কম হয়, তাহা হইলে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে ও আমদানী কমিবে। ইহার ফলে ও বিনিময় হার বাড়িয়া স্বাভাবিক বিনিময় হারের সমান হইবে।

ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বটির বিরুদ্ধে বহু প্রতিকূল সমালোচনা হইয়াছে। কীনস্ প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই তত্ত্বে কেবল দীর্ঘমিয়াদী মুদ্রাবিনিময় হার নিরূপণের একটি মাত্র নির্ধারকের কথাই বলা হইয়াছে। প্রকৃত মুদ্রা বিনিময় হার যে বহু বিষয় দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহার পূর্ণ ব্যাখ্যান এ তত্ত্বে মেলে না। সেইজন্য বাস্তব ক্ষেত্রে ইহার উপযোগিতার সীমিত। এই তত্ত্বের যে, বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে, তাহার মধ্যে নিম্ন লিখিতগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ক্রয় ক্ষমতা সমতা তত্ত্বের বিরুদ্ধে সমালোচনা

প্রথমতঃ, এই তত্ত্বটি দুইটি দেশের সূচক-সংখ্যার তুলনার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সূচক-সংখ্যা দেশের মূল্য স্তরের প্রকৃত নির্ভরযোগ্য প্রতিচ্ছবি নহে। সূচক-সংখ্যা মূল্য স্তরের উঠানামার একটি মোটামুটি পরিমাপ বলিয়া, উহার উপর ভিত্তি করিয়া সঠিক মুদ্রা বিনিময় হার নির্ধারণ করা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই তত্ত্ব দুইটি দেশের সাধারণ দামস্তরের তুলনার ভিত্তির উপর

প্রতিষ্ঠিত। দুইটি দেশের যে সকল সামগ্রী কেবল মাত্র রপ্তানী ও আমদানী হয় (internationally traded goods), উহাদের দামস্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু, আসলে দেখা যায়, দেশের যে সকল দ্রব্য খাদনে ব্যবহৃত হয়, আর যে সকল দ্রব্য আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবেশ করে, উহাদের দামের গতি একই দিকে উঠানামা করে না, কিংবা উহাদের দাম একই পরিমাণে হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। দেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে প্রবিষ্ট দ্রব্যের দামস্তরের প্ররিপ্রেক্ষিতে যদি কোন দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা নিরূপিত হয়, তাহা হইলে এই তত্ত্বটি বাস্তবতঃ সত্য হইত। কিন্তু, এই তত্ত্বে সাধারণ দ্রব্যের দামস্তরের ভিত্তিতে দেশের মুদ্রায় ক্রয় ক্ষমতা ধার্য হয় বলিয়া, ইহা অবাস্তব তত্ত্ব।

তৃতীয়তঃ, এই তত্ত্বে অনুমিত হয় যে, দুইটি দেশের মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতা তুলনা করিতে আমরা উভয় দেশে সমশ্রেণীর দ্রব্যের মূল্যস্তর হিসাবের মধ্যে ধরিয়া থাকি। কিন্তু এ অনুমান ও বাস্তবতঃ সত্য নহে।

চতুর্থতঃ, দুই দেশের মুদ্রার বাস্তব বিনিময় হার খুব ক্বচিৎই ঐ দুইটি মুদ্রার আপেক্ষিক ক্রয় ক্ষমতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, দেশের সরকার দেশের দামস্তর বা অর্থের বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে, কিংবা দেশের অবাধ রপ্তানী আমদানীর উপর নানারকম বাঁধা নিষেধ আরোপ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, এই তত্ত্বটি বর্ত্তিষ্ণু অর্থ ব্যবস্থায় খাটে, বর্দ্ধিষ্ণু ব্যবস্থায় অচল। দুইটি দেশের মধ্যে যদি মূলধনের চলাচল না থাকে, কিংবা ঋণ লেনদেন কারবার না থাকে, কিংবা উৎপাদনের কারিগরি অবস্থায় কোন অদল বদল না হয়, কিংবা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হার (terms of trade) না বদলায়, তাহা হইলে এই তত্ত্ব কার্যকরী হইতে পারে। কিন্তু সদা পরিবর্তশীল বাস্তব অবস্থায় উহা সম্ভব নহে। বাস্তবক্ষেত্রে, বিভিন্ন কারণের জন্য মুদ্রা ব্যবস্থা ও দামস্তরের এত পরিবর্তন ঘটে যে, দুইটি মুদ্রার ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে উহাদের বিনিময় মূল্য সাম্য ধার্য করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার ব্যাখ্যান করেন বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান তত্ত্ব দ্বারা। কোন দেশের বিদেশী মুদ্রার

মুদ্রা বিনিময় হার নিরূপণের আধুনিক তত্ত্ব:

চাহিদা পরিমাণ সমান হয়, দেশে দ্রব্য ও কৃত্য আমদানীর পাওনা শোধ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ ও ঋণ প্রদানের জন্য যে পরিমাণ অর্থ প্রয়োজন হয়, তাহার সমষ্টির সহিত। সেইরূপ, কোন দেশের বিদেশী

মুদ্রার যোগান সমান হয়, যতটা পরিমাণ দ্রব্য ও কৃত্য বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, তাহার দাম এবং যে অর্থ বিনিয়োগ ও ঋণ বিদেশ হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সমষ্টির সহিত। কোন এক নির্দিষ্ট সময়ে, দেশের মুদ্রার বিনিময় হার এমন হারে ধার্য হয় যে ঐ দেশের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান সমান হইবে।

মুদ্রা বিনিময় হারের উঠানামার কারণ (Causes of fluctuations in Rates of Exchange) : আমরা দেখিয়াছি যে কোন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঐ দেশের বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান পরিমাণের উপর নির্ভর করে। যে সকল কারণে বিদেশী মুদ্রাব চাহিদা ও যোগান পরিবর্তিত হয়, উহারাই আবার মুদ্রা বিনিময় হারেরও উঠা নামার কারণ। এই কারণগুলি আমরা একে একে আলোচনা করিতেছি।

(১) বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের অবস্থা (Balance of Trade) : কোন দেশের রপ্তানী যদি ঐ দেশের আমদানীর চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে। ইহার কারণ এই যে, যে দেশের রপ্তানী আমদানীর অনুপাতে বেশী, বিদেশীরা সেই দেশের মুদ্রা অপেক্ষাকৃত বেশী চাহিবে, যে অনুপাতে ঐ দেশ বিদেশীদের মুদ্রা চাহিবে। অপর পক্ষে, যখন দেশের রপ্তানীর অনুপাতে আমদানী অধিক হয়, তখন দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায়।

(২) মূলধনের চলাচল (Movements of Capital) : যদি বিদেশে বিনিয়োগের জন্য কোন দেশ মূলধন প্রেরণ করে, কিংবা কোন দেশ যদি বিদেশে ঋণ দান করে, তাহা হইলে ঐ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা যোগানের তুলনায় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে এবং ফলে, দেশের মুদ্রা বিনিময় হার হ্রাস পাইবে। অপরপক্ষে, অপর দেশ যদি ঐ দেশকে ঋণ পরিশোধ, কিংবা ঋণের সুদ পরিশোধ করে, তাহা হইলে অপর দেশের ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা উহার যোগানের তুলনায় বাড়িবে এবং ফলে, ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ও বৃদ্ধি পাইবে।

(৩) ফাট্‌কা কারবার (Speculative Activities) : যদি বিদেশীরা আমাদের দেশে ষ্টক্, সিকিউরিটি প্রভৃতি জামিন পত্র ক্রয় করে, তাহা হইলে বিদেশীদের আমাদের মুদ্রার চাহিদা বাড়িবে। ফলে, আমাদের টাকার বিনিময় হারও বৃদ্ধি পাইবে। ফাট্‌কা কারবারের প্রভাব সাধারণতঃ দেশের রাজনৈতিক

অবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট। কোন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যদি অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়, তাহা হইলে ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা কমিয়া যাইবে; ফলে, ঐ মুদ্রার বিনিময় হারও হ্রাস পাইবে।

(৪) **মুদ্রা সম্পর্কীয় প্রভাব** (**Monetary Influences**): দেশের মুদ্রা সংকোচন বা মুদ্রাস্ফীতিও মুদ্রাবিনিময় হারের পরিবর্তন ঘটাইয়া থাকে। দেশের মুদ্রা সংকোচন (deflation) হইলে দামস্তর হ্রাস পায়। তাহাতে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রার বিনিময় হারও বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, দেশে যদি মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তাহা হইলে মূল্যস্তর বাড়ে। দেশের মূল্যস্তর বৃদ্ধিতে রপ্তানীর অনুপাতে আমদানী বৃদ্ধি পাইয়া মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাইবে। দেশের মুদ্রামূল্য যদি হ্রাস করা হয় (depreciation of currency), তাহা হইলেও বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে দেশের মুদ্রার মূল্য অপেক্ষাকৃত হ্রাস পায়। বিদেশীরা তখন এই দেশ হইতে পূর্বাপেক্ষা বেশী দ্রব্য ক্রয় করিবে। ফলে, দেশের মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) **বাট্টাহার পরিবর্তন** (**Changes in Bank Rates**): দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার পরিবর্তনের ফলেও, মুদ্রার বিনিময় হার উঠানামা করিতে পারে। যখন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাট্টাহার বৃদ্ধি করে, তখন বিদেশীরা ঐ দেশে অধিক সুদ লাভের আশায় অর্থবিনিয়োগ করিতে আকৃষ্ট হয়। ফলে, ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা বাড়াতে, মুদ্রার বিনিময় হার বৃদ্ধি পায়। অপরপক্ষে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক যদি বাট্টার হার হ্রাস করে, তাহা হইলে বিদেশীরা বিনিয়োগকৃত মূলধন ঐ দেশ হইতে গুটাইয়া লইবে; ইহাতে ঐ দেশের মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পাইবে।

(৬) **রাজনৈতিক অবস্থা** (**Political Conditions**): দেশের রাজনৈতিক অবস্থাও মুদ্রার বিনিময় হারকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা যদি অনিশ্চয়তাপূর্ণ হয়, যদি দেশে আসন্ন কোন বিপ্লবের সম্ভাবনা দেখা যায়, তাহা হইলে ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা স্বভাবতঃই কমিবে। ঐ দেশের মুদ্রার চাহিদা কমিয়া যাওয়ার ফলে, উহার বিনিময় হার হ্রাস পাইবে।

ভাবি বিনিময় (**Forward Exchange**): আমরা দেখিয়াছি যে, যখন দুইটি দেশ স্বর্ণমানে অধিষ্ঠিত থাকে, তখন উহাদের মুদ্রার বিনিময় হার দুই স্বর্ণবিন্দুর সীমার মধ্যে উঠানামা করে। কিন্তু, যখন দুইটি দেশে অবিনিমেয় কাগজীমুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত, তখন মুদ্রার বিনিময় হারের উঠানামার কোন

নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকে না। বিনিময় হারের এই সীমাহীন উঠানামার দরুণ, কি রপ্তানীকারী, কি আমদানীকারী, দুই এরই প্রচুর লোকসান হইতে পারে। এই লোকসানের ঝুঁকি হইতে রেহাই পাইবার জন্য রপ্তানীকারীও আমদানীকারী বরাবর ব্যাংকের সাহত অগ্রিম সওদার (forward contract) চুক্তি আবদ্ধ হইয়া থাকে। এই চুক্তি অনুসারে বিনিময় ব্যাংক কোন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট হারে বিদেশী মুদ্রা ক্রয় বা বিক্রয় করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়া থাকে। যদি বিনিময় ব্যাংক অনুমান করে যে, চুক্তির দিন ও প্রাপ্য মিটাইবার দিনের মধ্যে বিদেশী মুদ্রার দাম বাড়িবে, তাহা হইলে তাহারা স্থানিক হার (spot rate), (অর্থাৎ, চুক্তির দিনে যে বিনিময় হার বর্তমান), এর উপর বাট্টা ব্যাজ (discount) দাবী করিবে। অপরপক্ষে, বিনিময় ব্যাংক যদি অনুমান করে যে, দেশের মুদ্রার দাম কমিবে, তাহা হইলে তাহারা স্থানিক হারের উপর প্রিমিয়াম (premium) দাবী করিবে এবং দেশের মুদ্রার পরিবর্তে আপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ বিদেশী মুদ্রা বিনিময় করিতে স্বীকার করিবে।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভাবি বিনিময় হার বিদেশের সুদের হারের উপর নির্ভরশীল এবং উহা বিদেশী মুদ্রার চাহিদা ও যোগান দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণ (Exchange Control) : যখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত ছিল, তখন মুদ্রার বিনিময় হার স্বর্ণবিন্দুব দুই সীমারেখার মধ্যে উঠানামা করিত এবং বিনিময় হার আপনা আপনি নিয়ন্ত্রিত হইত। কিন্তু স্বর্ণমানের নির্বাসনের সংগে সংগে, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের উঠানামা এত বেশী হইতে সুরু করে যে, উহা নিয়ন্ত্রণের জন্য বহুবিধ উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয। যেমন, ১৯৩২ সালে ইংলণ্ডে একটি বিনিময় সমানকরণ তহবিল (Exchange Equalistion Fund) খোলা হইয়াছিল এবং ঐ দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ তহবিলের সাহায্যে মুদ্রার বিনিময় হারের অস্বাভাবিক উঠানামার স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। ব্যাপক অর্থে ধরিতে গেলে, বিনিময় সমানকরণ তহবিল ও একরকম বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া বিশেষ।

কিন্তু, অধুনা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আমরা সীমিত অর্থে বুঝিয়া থাকি। বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বলিতে দেশের গোটা বৈদেশিক বিনিময় কারবারে উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একচেটিয়া তদারক ও পরিচালনা বুঝায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে এই অর্থে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সকল দেশেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই দেশের জমা উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা দূর করা। অবশ্য, জমা উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা যদি অল্পমিয়াদী হয়, তাহা হইলে বিনিময় হারের পরিবর্তন স্বর্ণের চলাচল এবং বিভিন্ন দেশের দামস্তরের পরিবর্তন প্রভৃতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়। কিন্তু, কোন দেশের জমা উদ্বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা যদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে মুদ্রা অধিকর্তার সরাসরি হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে উহা সংশোধন করা সম্ভব হয় না।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য

দ্বিতীয়তঃ, বৈদেশিক প্রতিযোগিতার হাত হইতে দেশের শিশুশিল্প সংরক্ষণের জন্য ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন হইতে পারে। দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিদেশী দ্রব্য আমদানীর জন্য যে বৈদেশিক বিনিময়ের প্রয়োজন হয়, তাহা আমদানীকারীদের দিতে অস্বীকার করিয়া দেশজ শিল্প উন্নয়ন উৎসাহিত করিতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অনেক সময় বৈদেশিক মুদ্রাসম্পদ মজুত করিবার জন্য (to conserve foreign resources) বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হইতে পারে। যেমন, আমরা যদি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্রব্য রপ্তানী করিয়া ডলার সম্পদ আয় করি ও বিশেষ কোন অবশ্যকীয় দ্রব্য সেই ডলার সম্পদ জমা রাখিতে চাই তাহা হইলে বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আবশ্যক হয়।

ইহা ছাড়া, কোন দেশ হইতে আমরা যদি আমদানী বন্ধ করিয়া, অপর কোন দেশ হইতে আমদানী বৃদ্ধি করিতে চাই, কিংবা রাজবৃত্তি দ্বারা কোন দ্রব্যের আমদানী বা রপ্তানী বৃদ্ধি করিতে চাই, তাহা হইলে ও বিনিময় নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। এই ধরণের বিনিময় নিয়ন্ত্রণ জাতীয় পরিকল্পনা ও নির্মাণকার্যকে সাফল্য মণ্ডিত করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের সাধারণ পদ্ধতি হইল, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বাধীনে বৈদেশিক বিনিময় কারবার চালান। কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের সকল রপ্তানীকারীদের সমস্ত পাওনা বৈদেশিক বিনিময় (foreign exchange) নিজের কাছে সমর্পন করিতে বাধ্য করিবে।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি (Methods of exchange control)

দ্বিতীয়তঃ, বে-সরকারী ভিত্তিতে ব্যাক্তিগত খাতে স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি মূল্যবান ধাতুর রপ্তানী ও আমদানী একেবারে বন্ধ করিতে হইবে। কেননা, ইহা যদি না করা যায়, তাহা হইলে দেশের দ্রব্য রপ্তানীকারীগণ বৈদেশিক বিনিময়

মুদ্রার বদলে (যাহা তাহারা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট বিক্রয় করিয়াছে) স্বর্ণ দ্বারা তাহাদের রপ্তানী দ্রব্যের বাবদ পাওনা বুঝিয়া লইবে। ফলে, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ একেবারে নিরর্থক হইবে।

তৃতীয়তঃ, বে-সরকারী ভিত্তিতে ব্যক্তিগত খাতে সরকারী সিকিউরিটি রপ্তানী ও আমদানী ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে। কেননা, সরকারী সিকিউরিটি রপ্তানী দ্বারা যদি বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ থাকে, কিংবা বিদেশী বিনিয়োগের পাওনা আয় বৈদেশিক সরকারেব সিকিউরিটি মারফৎ পাওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বানচাল হইয়া যাইতে পারে।

তাহাছাড়া, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ফাঁকি দিবার জন্য যাহাতে দেশের রপ্তানীকারীদের বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ অধিক মুনাফা সম্বলিত বিদেশী সিকিউরিটি বা কোম্পানীর শেয়ার পত্রে রূপান্তরিত হইয়া না যায়, তাহাব জন্য বিদেশী ষ্টক বাজারের কারবারের উপর উপযুক্ত নিষেধাজ্ঞা জারী করিতে হয়।

বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য আরও ছোটখাট আনুষঙ্গিক দুই একটি ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়। যেমন, অনুজ্ঞা পত্র দ্বারা (licence) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে হয়। অনুজ্ঞাপত্র ছাড়া বে-সরকারী খাতে ব্যাক্তিগত রপ্তানী কিংবা আমদানী একদম বন্ধ রাখা হয়। অনুজ্ঞা পত্রেই রপ্তানী বা আমদানীর পরিমাণ ও গতিবিধি নির্দিষ্ট থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের জন্য বিদেশী পাওনা অনেক সময় **অবরুদ্ধ রাখিতে** (blocked) প্রয়োজন হইতে পারে। বিদেশী পাওনা যখন অবরুদ্ধ থাকে, তখন পাওনাদাররা ঐ পাওনা অর্থের বিনিমেয় দ্রব্য আমদানী করিতে পারে না, কিংবা উহা ভাঙ্গাইয়া অন্য কোন দেশের মুদ্রায় রূপান্তরিত করিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বিনিময় নিয়ন্ত্রণের আর একটি আনুষঙ্গিক হইল, **নিকাশ চুক্তি** (clearing agreements)। অনেক সময় দেখা যায় যে কোন দেশের রপ্তানীকারীদের পাওনা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছে, এমন এক দেশে অবরুদ্ধ অবস্থায় আছে ; কিন্তু দুইটি দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলিতেছে। মনে কর যে, বিনিময় নিয়ন্ত্রিত দেশের রপ্তানী যে দেশের পাওনা অবরুদ্ধ আছে, সে দেশের রপ্তানীর চেয়ে অধিক হইল ; এবং প্রথম দেশটির পাওনা দ্বিতীয় দেশের পাওনা হইতে বাড়িল। এ ক্ষেত্রে যে দেশের পাওনা অবরুদ্ধ আছে সেই দেশ পাওনা পরিষ্কার করিয়া দিবার জন্য তাগিদ দিতে পারে। নিকাশ চুক্তি দ্বারা এই তাগিদ মিটাইবার ব্যবস্থা করা হয়। বিনিময় নিয়ন্ত্রিত দেশে অমাদানীকারীদের আমদানী দ্রব্যমুল্য দেশের

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা দিতে হয়। এই জমা অর্থের তহবিল হইতে যে দেশের পাওনা অবরোধ করা হইয়াছিল উহার দাবী মিটান হয়।

চতুর্থতঃ, বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় আর এক রকম চুক্তির প্রবর্তন সম্ভব। উহাকে **প্রাপ্য মিটানো চুক্তি** (payments argeements) বলে। সাধারণতঃ, যে দেশ বিনিময় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, সে দেশকে অপরাপর দেশ সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। অপরাপর দেশ সেইজন্য ঐ দেশে দ্রব্য রপ্তানী করিতে চাহেনা। কিন্তু, ঐ দেশ যদি অপরাপর দেশের নিকট হইতে মাল আমদানী করিতে একান্তই ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে ঐ দেশকে প্রাপ্য মিটানো চুক্তির ব্যবস্থা করিতে হয়। এই ধরণের চুক্তির নজির দেখা যায় ইংলণ্ড ও জার্মানীতে। প্রাপ্য মিটানো এক চুক্তি দ্বারা জার্মানী ইংলণ্ড হইতে মাল আমদানীর অধিকার লাভ করিয়াছিল।

বহিঃ বিনিময় মূল্য হ্রাস (Exchange Depreciation): কোন দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য যদি হ্রাস হয়, তাহা হইলে বিদেশীরা অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে ঐ দেশের দ্রব্য খরিদ করিতে পারে! ইহাব ফলে ঐ দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায়। সুতরাং আমরা বলিতে পারি যে, মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্যের হ্রাসেরও যাহা ফল, দেশের রপ্তানী শিল্পকে রাজবৃত্তি দানেব (bounty) ফলও তাহাই।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে, সকল অবস্থাতেই দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় না। যদি মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাসের সংগে সংগে, রপ্তানী শিল্পোৎপাদনের খরচও একই অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পাইবে না। অনেক সময় মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাসের আগেই আভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাস হয়। মুদ্রায় অভ্যন্তরীণ মূল্য হ্রাসের ফলে দেশের দামস্তর, মজুরির হার প্রভৃতি বাড়িয়া উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়। ফলে, দেশের রপ্তানী দ্রব্যের পরিমাণও সংকুচিত হয়।

মুদ্রার বহির্বিনিময় মূল্য হ্রাসের ফলে রপ্তানীকারীদের লাভের পরিমাণ কতটা হইবে, তাহা বিশেষভাবে নির্ভর করে বিদেশে ঐ রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা নম্যতা অনম্যতার উপর। যদি রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা বিদেশে অনম্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রা বিনিময় মূল্য হ্রাসের দ্বারা দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি করা যায়। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, কোন দেশ এই নীতিদ্বারা অনুকূল বাণিজ্য উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করিতে উৎসাহী হইলে, অপরাপর দেশ নিরুদ্যম হইয়া বসিয়া থাকিবে না।

তাহারা ও এইরূপ তাহাদের মুদ্রার বহির্বিনিময় হার হ্রাস করিয়া, কিংবা আমদানী শুল্ক বৃদ্ধি করিয়া প্রতিহিংসামূলক নীতি গ্রহণ করিতে পারে।

মুদ্রার মূল্য হ্রাস (Devaluation): Devaluation ও Exchange Depreciation—এই দুইটি শব্দের অর্থে মূলতঃ কোন পার্থক্য নাই। বিদেশী মুদ্রার অনুপাতে যখন কোন্ দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য সরকারী আদেশে হ্রাস করা হয়, তাহাকে Devaluation বলা হয়। Exchange Depreciation এর অর্থও দেশের মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় মূল্য হ্রাস। কিন্তু এই মুদ্রা মূল্য হ্রাসের পিছনে সরকারী কোন আদেশ থাকে না। ইহা ঘটে আন্তর্জাতিক বাজারে দেশের বিনিময় ঘাটতির দরুণ।

কোন দেশের মুদ্রার মূল্য হ্রাস (Devaluation) করিলে, বিদেশী দ্রব্য ঐ দেশকে অপেক্ষাকৃত অধিক অর্থমূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয়; কারণ ঐ দেশের দ্রব্য বিদেশীরা অপেক্ষাকৃত কম অর্থমূল্যে ক্রয় করিতে পারে। অর্থাৎ মুদ্রার মূল্য হ্রাসের নিশ্চিত ফল, দেশের আমদানী হ্রাস ও রপ্তানী বৃদ্ধি। তবে আমদানী দ্রব্য যদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী হয়, তাহা হইলে মুদ্রার মূল্য হ্রাস সত্ত্বেও উহাদের আমদানী কমিবে না; কেননা, এই সকল দ্রব্যের চাহিদা অনম্য। অপরপক্ষে, বিদেশে যদি রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করা সত্ত্বেও রপ্তানীর পরিমাণ তেমন বাড়িবে না। তবে দেশের মোট রপ্তানী ও মোট আমদানীর মধ্যে অনেক দ্রব্যের চাহিদাই সাধারণতঃ নম্য হয়। সেই কারণে মুদ্রা মূল্য হ্রাস করিলে দেশের রপ্তানী বৃদ্ধি পায় ও আমদানী হ্রাস পায়। মুদ্রা মূল্য হ্রাসকে বাণিজ্য উদ্বৃত্তের অবিরাম প্রতিকূল অবস্থা সংশোধনের প্রমিত প্রতিকার বলিয়া গ্রহণ করা যায়। অন্য দেশের উপর টেক্কা দিবার জন্য এই নীতিদ্বারা অনেক সময় দেশের রপ্তানী অত্যধিক সম্প্রসারণ করা হয়। ইহার অনিবার্য ফল হয়, অন্য দেশের পক্ষে রপ্তানী হ্রাস ও দারিদ্র্য বরণ। কিন্তু প্রতিক্রিয়া হিসাবে ঐ সকল দেশ ও আবার তাহাদের মুদ্রার মূল্য হ্রাস করিতে পারে। তাহাতে মুদ্রামূল্য হ্রাসের সুফল কোন দেশই কার্যতঃ গ্রহণ করিতে পারে না।

অনুশীলনী

1. Explain how foreign exchange rates are determined.
2. Show how the foreign rate of exchange is

determined under a system of inconvertible paper currencies. (C.U. B.A. '51)

3. Explain how foreign exchange rates are determined between two countries with inconvertible paper currencies. (C.U. B.Com. '53, '56)
4. Account for the causes of fluctuations in Foreign Exchange rates.
5. Discuss the effects of a change in the rate of exchange of a country on (a) its balance of payments, (b) terms of trade, and (c) its internal price level. (C.U. Hons. '54)

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা (International Monetary Institutions)

বিগত বিশ্বব্যাপী মন্দার সময় হইতেই বিভিন্ন দেশের পক্ষে মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের স্থিতিস্থাপকতা রক্ষা করা এক মহা সমস্যার ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বর্ণমান নির্বাসনের সংগে সংগে বিনিময় হারের আত্যন্তিক উঠা-নামা সুরু হইয়াছে। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বহির্বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা এত প্রবল যে, মুদ্রা সংক্রান্ত ব্যাপারে উহারা বিভিন্ন আঞ্চলিক দলে বিভিক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এইরূপে ডলার অঞ্চল (Dollar area) ষ্টার্লিং অঞ্চল (Sterling area) প্রভৃতি বিভিন্ন মুদ্রার আঞ্চলিক গোষ্ঠীর উৎপত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বিভিন্ন দেশ মুদ্রার আন্তর্জাতিক বিনিময় হারের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে। এই উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কতিপয় আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা সৃষ্টি করে। ইহাদের মধ্যে আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল (International monetary fund) এবং পুর্ণগঠন-উন্নয়ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) অন্যতম।

আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল (International Monetary Fund) : আন্তর্জাতিক বিনিময় ক্ষেত্রে, মুদ্রাবিনিময় সংক্রান্ত ব্যাপারে বিভিন্ন দেশের

সহযোগিতা স্থাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৪৪ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে Bretton Woods-এ এক অর্থনৈতিক ও রাজস্ব সংক্রান্ত বৈঠক বসে। এই বৈঠকে আলাপ আলোচনা দ্বারা আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল (IMF) এর পরিকল্পনা গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ হইতে এই তহবিলের কার্যকাল স্থুরু হইয়াছে।

তহবিলের গঠন ও পরিচালনা (Structure and Organisation of the Fund) : এই তহবিলের মোট অর্থ পরিমাণ ৮·৮ বিলিয়ন (billion) ডলার। এই অর্থ সংগৃহীত হয় বিভিন্ন সদস্য দেশের নিকট হইতে আদায়ীকৃত চাঁদা হইতে। প্রত্যেক সদস্য দেশের চাঁদার বরাদ্দ (quota) ধার্য করা আছে। সদস্য দেশগুলির ভোটাধিকার তাহাদের প্রত্যেকের চাঁদার বরাদ্দের উপর নির্ভর করে। প্রত্যেক সদস্য দেশকে বরাদ্দ চাঁদার ২৫%, কিংবা উহার জমায়েত সোনার (holding of gold) ও ডলারের ১০%—এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম হয়, তাহা সোনায় ও ডলারে দিতে হইবে। ইহা ছাড়া, আর বক্রী চাঁদা দিতে হইবে সদস্য দেশের মুদ্রায়। প্রধান প্রধান সদস্য দেশগুলির চাঁদার বরাদ্দ নিম্নলিখিত হারে ধার্য করা হইয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২৭৫০ মিলিয়ন ডলার (million dollar)
গ্রেট বৃটেন	১৩০০ … …
রাশিয়া	১২০০ … …
চীন	৫৫০ … …
ফ্রান্স	৪৫০ … …
ভারতবর্ষ	৪০০ … …

সোভিয়েট ইউনিয়ন এই তহবিলের সদস্য হয় নাই ; অনেক ছোট ছোট দেশও উহাদের বরাদ্দ চাঁদা পুরাপূরি পরিশোধ করে নাই। এই তহবিলের সদস্য হইবার পূর্বে প্রত্যেক দেশকে উহার মুদ্রার মুল্য সোনা অথবা মার্কিণ ডলারে নির্দেশ করিতে হইবে। দেশের মুদ্রার বিনিময় মুল্য সাম্য (par value) বিশেষ বিশেষ অবস্থায় অদল বদল করা চলিতে পারে। তহবিলের অনুমতি লইয়া সদস্য দেশ কিছু কিছু অন্যান্য দেশের মুদ্রাও ক্রয় করিতে পারে। তবে কোন দেশই নির্দিষ্ট বরাদ্দের ২৫% এর অধিক অপর মুদ্রা বৎসরে ক্রয় করিতে পারে না। তহবিলে বিভিন্ন দেশের মুদ্রা জমা হয় বলিয়া, কোন সদস্য দেশের পক্ষে নির্দিষ্ট হারে অন্য দেশের মুদ্রা পাইতে কোন বেগ

পাইতে হয় না। ফলে; আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল বিভিন্ন মুদ্রায় বিনিময় (multilateral convertibility) সুগম করিয়া পৃথিবীতে বিভিন্ন আঞ্চলিক আর্থিক দলের উদ্ভব প্রতিরোধ করে। যদি তহবিল কোন সদস্যের বরাদ্দের অধিক চাঁদা গ্রহণ করে, তাহা হইলে বরাদ্দের উদবৃত্ত পরিমাণ ও মিয়াদ অনুসারে সুদ দিতে হয়। তহবিল কোন সদস্য দেশের মুদ্রা যোগান টান হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে। সে ক্ষেত্রে ঐ দেশকে তহবিল সোনার বিনিময়ে মুদ্রা বিক্রয় করিতে কিংবা ধার দিতে অনুরোধ করিতে পারে।

এই তহবিলের মূল সভ্য সংখ্যা ৪০ জন। তহবিলের অনুজ্ঞা অনুসারে অন্যান্য দেশ ও সদস্য হইতে পারে। তহবিলের সর্বোচ্চ পরিচালনা সভাকে বলা হয় Board of Governors। প্রত্যেক সদস্য দেশ সর্বোচ্চ পরিচালনা সভায় একজন মাত্র Governor নিয়োগ করিতে পারে। দৈনন্দিন কার্যব্যবস্থা নির্বাহ করে তহবিলের Executive Directors গণ। তাহাদের সংখ্যা কমপক্ষে ১২ জন হওয়া চাই। তহবিলের বড় পাঁচটি চাঁদা প্রদানকারী দেশ (রাশিয়া সভ্য না হওয়ায়, ভারতবর্ষ মোটা চাঁদা প্রদানকারী দেশ সমূহের মধ্যে পঞ্চম) প্রত্যেকে একজন ডিরেক্টর নিযোগ করে। লাটিন আমেরিকার গণতান্ত্রিক দেশগুলি সকলে মিলিয়া তুইজন ডিরেক্টার নির্বাচন করে এবং আর পাঁচজন অন্যান্য সদস্য দেশগুলি দ্বারা নির্বাচিত হয়।

তহবিলের উদ্দেশ্য (Aims and Objects of the Fund) : এই তহবিলের সাধারণ উদ্দেশ্য হইল; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও কর্মনিযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সহযোগিতা ও সৌহার্দ্য স্থাপন করা। সাধারণ উদ্দেশ্য ছাড়াও এই তহবিলের বিশেষ কতকগুলি লক্ষ্য আছে। যেমন—

ক) মুদ্রা ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা স্থাপন।

খ) আর্থিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি দ্বারা এবং মুদ্রা সম্পর্কীয় অসুবিধা দূর করিয়া আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সুপ্রতিষ্ঠা ও সম্প্রসারণ।

গ) আন্তর্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা ও মুদ্রা বিনিময় মূল্য হ্রাসের প্রতিরোধ।

ঘ) বহু মুদ্রায় বিনিময় (multilateral convertibility) ব্যবস্থার প্রবর্তন।

ঙ) সদস্য দেশগুলির জমা উদবৃত্তের অস্থায়ী প্রতিকূল অবস্থার (temporary maladjustment in balance of payments) সংশোধন ব্যবস্থাপনা।

তহবিলের কার্যক্রম (Functions of the Fund) : স্বল্প মেয়াদী দাদন যোগান সংস্থা হিসাবে এই তহবিলের বিশেষ গুরুত্ব আছে। অস্থায়ী জমা উদ্‌বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা (temporary disequilibrium in the balance of payments) সংশোধনের জন্য যে কোন সদস্য দেশ এই তহবিল হইতে অর্থ কর্জ করিতে পারে। অবশ্য, স্বাভাবিক বিনিময়ের জন্য প্রত্যেক সদস্যদের স্ব স্ব মুদ্রা ও বৈদেশিক বিনিময় সংরক্ষণ করিতে হয়। তহবিল কোন দেশকেই বৈদেশিক বিনিময়ের জন্য অফুরন্ত দাদন যোগান দিবে না। দেশের চাঁদার বরাদ্দর চেয়ে দাদন যোগান পরিমাণ কখনও অধিক হইবে না ; এবং কোন এক বৎসরে দাদনের পরিমাণ চাঁদার বরাদ্দের এক চতুর্থাংশের বেশী হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ, যখন বিনিময়ের জন্য কোন দেশের মুদ্রার যোগান টানা হয়, তখন তহবিল স্বর্ণের বিনিময়ে ঐ দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ঐ দেশ হইতে কিংবা অন্যান্য সদস্যের নিকট হইতে ক্রয় করে কিংবা ধার করে। বিভিন্ন সদস্যদের চাহিদার অনুপাতে ঐ 'টান' মুদ্রার বণ্টন ব্যবস্থা তহবিলই নির্ধারণ করে।

তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন দেশের মুদ্রার বিনিময় হারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা দ্বারা তহবিল দীর্ঘমেয়াদী উদ্‌বৃত্ত জমার (balance of accounts) অনুকূল অবস্থা প্রতিষ্ঠা করিতে ও বিশেষ সহায়তা করিয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে তহবিল কোন সদস্য দেশকে দায়িত্বহীন ও প্রতিযোগিতাময় বিনিময় মূল্য হ্রাস (competitive exchange depreciation) নীতি অনুসরণ করিতে দেয় না। যখন কোন সদস্য দেশের মুদ্রার বিনিময় হার ঐ দেশের অর্থব্যবস্থার পরিপন্থী হয়, তখন তহবিলের নির্দেশমত ঐ বিনিময় হার অদলবদল করা চলে।

চতুর্থতঃ, শুধু পরিবর্তন সংক্রান্ত কাল ব্যতীত (trasitional period) অন্য সময়ে তহবিল সদস্য দেশসমূহের বিনিময় সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ এবং তারতম্য মূলক মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন প্রভৃতি একদম বানচাল করিয়া থাকে। পরিশেষে, সুদ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঋণভার হ্রাসের বাবদ, কিংবা পুনর্গঠনের জন্যও কোনরূপ অর্থসাহায্যর বন্দোবস্ত এই তহবিল করে না।

মোটামুটিভাবে আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিল যুদ্ধোত্তর কালে বিশেষ গুরুত্ব পূর্ণ কাজ করিয়াছে। ইহা সদস্য দেশ সমূহকে কাঁচা মুদ্রা (hard currency) যোগাইয়া উহাদের বিনিময়ের ঘাটতি পূরণ করিতে সহায়তা করিয়াছে। তবে তহবিলের অন্যান্য উদ্দেশ্য এখনও সিদ্ধ হয় নাই। বহুমুদ্রায় অবাধ বিনিময় (multilateral convertibility) ব্যবস্থা এখনও কার্যকরী হয় নাই।

বিভিন্ন সদস্য দেশের বাণিজ্য সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও পূর্বের মতই বলবৎ রহিয়াছে।

পুনর্গঠন-উন্নয়ন মূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development) : যুদ্ধ অধ্যুষিত ও অনুন্নত দেশ সমূহকে দীর্ঘমিয়াদী দাদন যোগানের উদ্দেশ্যে পুনর্গঠন-উন্নয়ন মূলক আন্তর্জাতিক ব্যাংকের সৃষ্টি। এই ব্যাংককে বিশ্বব্যাংক ও (World Bank) বলা হয়। ইহার অনুমোদিত মূলধন ১০ মিলিয়ন (million) ডলার ; ১০০,০০০টি শেয়ারপত্রে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শেয়ার পত্রের মূল্য ১০০,০০০ ডলার। এই ব্যাংকের অংশীদারগণ সকলেই আন্তর্জাতিক তহবিলেরও সদস্য। প্রতি শেয়ার পত্রের মূল্য ২% স্বর্ণে কিংবা ডলারে দেয় ও ১৮% সদস্য দেশের নিজ মুদ্রায় দেয়। বক্রি ৮০% গ্যারান্টি তহবিল (guarantee fund) হিসাবে থাকিবে—প্রয়োজন অনুসারে ব্যাংক উহা তলব করিয়া লইবে। প্রধান প্রধান দেশগুলির চাদার পরিমাণ নিম্নে দেওয়া গেল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	—৩১৭৫	মিলিয়ন ডলার (million dollar)
গ্রেটবৃটেন	—১৩০০	,,
চীন	—৬০০	,,
ফ্রান্স	—৫২৫	,,
ভারতবর্ষ	—৪০০	,,

এই ব্যাংক যে কোন সরকারকে কিংবা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিতে পারে। বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ঋণ পাইতে হইলে দেশের সরকারকে গ্যারান্টি দিতে হইবে। যখন কোন প্রতিষ্ঠান বা সরকার অন্যত্র ঋণ গ্রহণে অসমর্থ হয় তখন এই ব্যাংক দাদন যোগান দিয়া থাকে। কিংবা, যখন ব্যাংক খোঁজ খবর লইয়া বুঝিতে পারে যে, উহারা কেবল উৎপাদক ঋণ (productive loans) গ্রহণ করিতে চায়, তখন ব্যাংক কর্জ দিয়া থাকে। ব্যাংক নিজে ও অর্থ কর্জ করিতে পারে। অনেক সময় ব্যাংক অন্য প্রদত্ত ঋণের গ্যারাণ্টর (guarantor) হিসাবে কাজ করে।

এই ব্যাংকের পরিচালনা পদ্ধতি আন্তর্জাতিক আর্থিক তহবিলেরই অনুরূপ। তহবিলের মত Board of Directors ও Executive Directors আছে। প্রধান Executive কে সভাপতি বলা হয়। ব্যাংকের প্রধান আফিস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। ১৮৪৭ সালের মে মাস হইতে ব্যাংকের কার্যক্রম সুরু হইয়াছে।

এই ব্যাংক পত্তনের পর হইতে এ যাবৎ যে পরিমাণ ঋণ ইহা যোগাইয়াছে, গোড়ার দিকে উহার অধিকাংশই যুদ্ধ অধ্যুষিত ইউরোপ দেশ সমূহের পুনর্গঠন ব্যবস্থার সাহায্যের জন্য দেওয়া হইযাছে। পরের দিকে অবশ্য, ভারতবর্ষ ও অন্যান্য অনুন্নত দেশ সমূহের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন কল্পেও ব্যাংক ঋণ সরবরাহ করিয়াছে। বেসরকারী দাদন প্রতিষ্ঠানের (credit institution) উচ্ছেদ করা এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য নয়। বেসরকারী ঋণ যোগানের ব্যবস্থা যাহাতে অধিকতর সুষ্ঠু ও সুদৃঢ় হয়, এই ব্যাংক একদিকে যেমন তাহার সহায়তা করে, অপরদিকে, যুদ্ধ বিপর্যস্ত ও অনুন্নত দেশসমূহ যাহাতে তাড়াতাড়ি আর্থিক পুনর্বিন্যাস ও উন্নযন দ্বারা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থ নৈতিক স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে, সেজন্য উপযুক্ত পরিমাণ সরাসরি ঋণ যোগানের ব্যবস্থাও করে।

অনেকে অবশ্য বলিয়া থাকেন যে, এই ব্যাংকের ক্রিয়ার মাধ্যমে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহার উদবৃত্ত মূলধনের আন্তর্জাতিক বিনিযোগের সুরাহা ও সুবন্দোবস্ত করিযাছে।

অনুশীলনী

1. How and, to what extent, can the International Monetary Fund assist a member country in solving its balance of payments difficulties ? (C. U. Hons. '54)

উনচত্বারিংশ অধ্যায়

সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্র (Public Finance)

সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রের বিষয়বস্তু ও উপযোগিতা (Subject matter and Importance of Public Finance) : সরকারী আয়-ব্যযেব তথ্য ব্যাখ্যান ও উহাদের সমন্বয় ধার্য করা এই শাস্ত্রের উপজীব্য বিষয়-বস্তু। ইহা সরকারী ব্যয়ের কি ফলাফল তাহা যেমন একদিকে নির্দেশ করে, তেমনি ঐ ব্যয় নির্বাহের জন্য যে কর ব্যবস্থা, ঋণনীতি ও নূতন মুদ্রার প্রচলন তদারক করা প্রয়োজন হয়, তাহাও ইহার আলোচ্য বিষয়।

অর্থবিদ্যার শাখা হিসাবে সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রের পঠন পাঠন ও গুরুত্ব অধুনা

বিশেষভাবে স্বীকৃতি পাইয়াছে। সরকারী করব্যবস্থা, ঋণনীতি ও ব্যয় নির্বাহ দেশের আর্থিক ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। অন্যান্য কল্যাণধর্মী সমাজ বিজ্ঞানের মত সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রের ও উদ্দেশ্য সর্বোচ্চ আর্থিক কল্যাণ-সাধন ও সমাজ উন্নয়ন। বিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীর সম্প্রসারণের সংগে সংগে, সরকারী ব্যয়ভার বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে আয়ের উৎস বিস্তৃতি ও অনিবার্য হইয়া পড়িয়াছে। কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রে রাজস্ব শাস্ত্র দেশের অর্থনীতি ও সমাজ কল্যাণের চাবিকাঠি স্বরূপ।

সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রকে মোটামুটি চারিভাগে বিভক্ত করা চলে: সরকারী ব্যয়; করব্যবস্থা, ঋণ ও রাজস্ব-শাসনপদ্ধতি। সরকারের স্বাভাবিক আয় সংগ্রহ হয় কর হইতে। ঋণ করিয়া কিংবা নূতন মুদ্রা প্রচার করিয়া ও সরকার অস্বাভাবিকরূপে আয় সংগ্রহ করিয়া থাকে। সাধারণ ব্যয় ছাড়াও, ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারী ব্যয় প্রয়োজন হয়। রাজস্ব শাসন পদ্ধতি বাস্তবতঃ ব্যবহারিক বিষয় সম্পর্কীয়। তত্ত্বগত উপযোগিতা হিসাবে ইহার পঠন পাঠনের কোনই মূল্য নাই।

সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রের ও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয়ের পার্থক্য (Difference between Public Finance and Private Finance): সাধারণতঃ ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয় একই নীতিদ্বারা চালিত হয়। দুই এরই লক্ষ্য কি করিয়া নিম্নতম খরচে সর্বাধিক উপযোগ ও সুবিধা লাভ করা যায়।

কিন্তু সাধারণ নীতি এক হইলেও ব্যক্তিগত আয়-ব্যয় ও সরকারী আয়-ব্যয়ের মধ্যে মূলগত পার্থক্য আছে। ব্যক্তি তাহার আয়ের পরিমাপে ব্যয় ধার্য করে; কিন্তু সরকার ব্যয়ের পরিমাপে আয় নির্ধারণ করে। ব্যক্তি আয় বুঝিয়া ব্যয় করে; সাধারণতঃ, আয়ের চেয়ে সে ব্যয় বেশী করে না। কিন্তু সরকার প্রথমতঃ, ব্যয়ের বিভিন্ন খাত ধার্য করিয়া সেই অনুপাতে আয় সংগ্রহের ব্যবস্থা করে। কিন্তু এই পার্থক্য সকল সময় খাটে না। অনেক সময় ব্যক্তি বিশেষকেও ব্যয়ের অনুপাতে আয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির যদি বৃহৎ পরিবারের চাপ ঘাড়ে পড়ে, তাহা হইলে তাহারও ব্যয় স্বাভাবিক আয়ের চেয়ে বাড়িয়া যায়। এই বর্ধিত ব্যয়ভার মিটাইতে তাহাকে খাটিয়া অতিরিক্ত আয়ের ব্যবস্থা করিতে হয়। ব্যাক্তগত আয়ের উৎস ও রাষ্ট্রের আয়ের উৎস ও এক নয়। সরকার দেশের আভ্যন্তরীণ ঋণ কিংবা বৈদেশিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে কিংবা নূতন মুদ্রা প্রচার করিয়া বর্ধিত ব্যয়ভার বহন কারতে পারে। কিন্তু,

ব্যক্তিগত আয়ের উৎস সীমিত ; সে কেবল বাহ্যিক উৎস হইতে ঋণ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ব্যয়ের উদ্দেশ্য কোন বিশেষ বিশেষ স্বার্থ পরিপূরণ করা। কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যয়-ব্যবস্থা নির্বাহ হয় জনসাধারণের স্বার্থ পূরণের নিমিত্ত ; কোন বিশেষ ব্যক্তিকে অর্থ সাহায্য বা কৃত্য যোগান দেওয়া সরকারী ব্যয়ের লক্ষ্য নহে।

তৃতীয়তঃ, অনেকে বলেন যে, ব্যক্তি যেমন তাহার খাদনের বিভিন্ন খাতে অর্থব্যয় করিয়া সকল খাতে সমপরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করে, সেইরূপ সরকার ও ব্যয়ের বিভিন্ন খাত হইতে সমপরিমাণ প্রান্তিক উপযোগ লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু, বাস্তবক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ব্যয়ব্যবস্থায় কিংবা সরকারী ব্যয় ব্যবস্থায় কোথাও এই সম-প্রান্তিক উপযোগ বিধির পুরাপুরি প্রয়োগ হয় না। প্রত্যেক রাষ্ট্রই কোন না কোন স্বার্থশ্রয়ী, প্রত্যেক রাষ্ট্রের ব্যয় ব্যবস্থাই কোন না কোন স্বার্থ প্রণোদিত। ধনীর স্বার্থভিত্তিক রাষ্ট্র ধনিক স্বার্থের উদেশ্যেই অধিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকে, সেখানে সম পরিমাণ উপযোগ বিধির ভিত্তিতে সরকারী ব্যয় ব্যবস্থা ধার্য হয় না।

পরিশেষে, বে-সরকারী ব্যক্তিগত ব্যয় ব্যক্তিগত সাম্প্রতিক আয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই বাঞ্ছণীয়। ঋণ করিয়া ব্যয় ভার মিটানো ব্যক্তির পক্ষে অভিপ্রেত নয়; কিন্তু, রাষ্ট্রের পক্ষে ঋণ করিয়া ঘাটতি ব্যয় করা সকল সময় অবাঞ্ছণীয় নয়। সরকারী অনেক ব্যয় আছে, যাহা জাতীয় আয় সৃষ্টি করিতে সহায়তা করে। আর্থিক মন্দার সময় ঋণ করিযা ঘাটতি ব্যয় করা ও নূতন আয় সৃষ্টির সহায়তা করা সরকারের পক্ষে খুবই বাঞ্ছণীয়। ব্যক্তিগত ব্যয়ের তুলনায় সরকারী ব্যয়ের ফলাফল ও অধিক ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রের লক্ষ্য : সর্বোচ্চ সামাজিক সুবিধার নীতি (Aims of Public Finance : Principle of Maximum Social Advantage) : ক্ল্যাসিক্যাল অর্থবিদ্যাবিদগণের মতে সরকারী সেই পরিকল্পনাই সর্বশ্রেষ্ঠ, যাহাতে সরকারী আয়-ব্যয় সর্বনিম্ন থাকে। ব্যক্তিতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী এই বিশেষজ্ঞগণ মনে করিতেন যে, সরকারী আয়-ব্যয় বৃদ্ধি করার কোন সামাজিক কল্যাণ বা সার্থকতা নাই।

কিন্তু রাজস্ব সংক্রান্ত এই মতবাদের কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই। সরকারী প্রত্যেকটি করই ক্ষতিকর নহে ; কিংবা প্রত্যেকটি সরকারী ব্যয় ও অবাঞ্ছণীয়

নহে। অনেক কর আছে, যাহা ধার্য করায় সমাজের কল্যাণই হইয়া থাকে। যেমন, মদের উপর কর ধার্য করিলে, মদ্যপান হ্রাস হইয়া সামাজিক কল্যাণ সাধিত হয়। আবার, সরকারী অনেক ব্যয় আছে, যাহা দ্বারা সামাজিক উৎপাদন প্রগুণতা বৃদ্ধি পায়। যেমন, শিক্ষা বিস্তারের জন্য ব্যয়।

সরকারী কর, ঋণ ও ব্যয় ব্যবস্থা তদারক অর্থই, ক্রয় ক্ষমতার হস্তান্তর প্রক্রিয়া ধার্য করা। সরকার কর ও ঋণের দ্বারা ক্রয় ক্ষমতা লাভ করে, আবার ব্যয়ের দ্বারা ক্রয় ক্ষমতা ত্যাগ করে। সরকারী রাজস্ব তদারকি অর্থই, সমাজের এক শ্রেণীর হাত হইতে আর এক শ্রেণীর হাতে ক্রয় ক্ষমতার যে হস্তান্তর ঘটে, তাহার দেখাশুনা বা বিধিব্যবস্থা। বৃহত্তম সমাজ কল্যাণের দিক হইতে ক্রয় ক্ষমতার এই হস্তান্তরতা তদারকি করাই রাজস্ব শাস্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট নীতি। সমাজ কল্যাণের দুইটি প্রধান আংগিক হইল, উৎপাদনের উৎকর্ষতা ও ধন বণ্টনের উৎকর্ষতা। রাজস্ব শাস্ত্রের আসল উদ্দেশ্য করব্যবস্থা, ঋণনীতি ও ব্যযনির্বাহ এমন ভাবে ধার্য করা, যাহাতে উৎপাদন ও ধন বণ্টনের উৎকর্ষতা লাভ হয়।

আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ সরকারী আয়-ব্যয় শাস্ত্রকে সক্রিয় বিজ্ঞান (functional science) বলিয়া অভিহিত করেন। তাঁহাদের মতে, সরকারী আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, দেশে পূর্ণাংগ নিয়োগ প্রতিষ্ঠা দ্বারা গোটা অর্থব্যবস্থাকে প্রগুণতা সম্পন্ন করিয়া তোলা।

অনুশীলনী

1. Examine the points of differences between private and public finance.
2. Discuss the aims of Public Finance.

চত্বারিংশ অধ্যায়

সরকারী ব্যয় (Public Expenditure)

সরকারী ব্যয়ের বর্গীকরণ (Classification of Public Expenditure): সরকারী ব্যয় দেশের আর্থিক উন্নতি ও সমাজ কল্যাণের পরিমাপ যন্ত্র বিশেষ। কিন্তু এই ব্যয়ের বর্গীকরণ সম্পর্কে অর্থবিদ্যাবিদগণের মধ্যে যথেষ্ট মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

সরকারী কতকগুলি ব্যয় আছে, যাহার উপকার দেশের বিশেষ বিশেষ লোক কিংবা শ্রেণী লাভ করিয়া থাকে। যেমন, সরকারী কর্মচারীদের পেন্‌সন্ বাবদ

যে ব্যয় করা হয়, তাহার সুবিধা কেবল সরকারী কর্মচারীগণ কার্য হইতে অবসর প্রাপ্তির পর লাভ করিয়া থাকে। আবার, কতকগুলি ব্যয় আছে, যাহার সুবিধা জনসাধারণের সকলেই লাভ করিয়া থাকে। যেমন, বহিঃশত্রুর হাত হইতে দেশরক্ষার বাবদ যে ব্যয় করা হয়, উহার সুবিধা গোটা দেশের অধিবাসী লাভ করে। আবার, কতকগুলি ব্যয় আছে, যাহার সুবিধা আংশিক জনসাধারণে ও লাভ করে, আবার আংশিক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা সম্প্রদায় লাভ করে। যেমন, বিচার কার্যের পরিচালনার জন্য সরকার যে ব্যয় করে।

সরকারী ব্যয় আবার **উৎপাদক** এবং **অনুৎপাদক** ও হইতে পারে। যে ব্যয় জাতীয় আয় বৃদ্ধির সহায়ক, উহাকে উৎপাদক ব্যয় বলা হয়। যেমন, শিক্ষাবিস্তারের জন্য যে ব্যয়। আবার, ধ্বংসমূলক যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যে ব্যয়, কিংবা দেশের স্বাভাবিক অবস্থায় অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের জন্য যে ব্যয়, উহাকে অনুৎপাদক ব্যয় বলা চলে।

ডাল্টন (Dalton) সরকারী ব্যয়কে চারিভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) সমাজিক জীবন ও নিরাপত্তা রক্ষণের বাবদ ব্যয়; (২) সামাজিক জীবন উন্নয়নের বাবদ ব্যয়: (৩) আর্থিক সাহায্য (grant) বাবদ ব্যয়। যেমন, অবসর প্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীদের পেনসন বাবদ ব্যয়। (৪) ক্রয়-মূল্য (purchase price) বাবদ ব্যয়। যেমন, সৈনিকের সেবাকৃত্য ক্রয়ের জন্য মাহিনা বাবদ যে অর্থ ব্যয়।

পিগু সরকারী ব্যয়কে দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। যথা, (১) **প্রকৃত ব্যয়** (real expenditure) ও (২) **হস্তান্তর ব্যয়** (transfer expenditure)। যে ব্যয় দ্বারা দ্রব্য ও কৃত্য বাস্তবিক পক্ষে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রকৃত ব্যয় বলে। যেমন, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণের বাবদ ব্যয়। হস্তান্তর ব্যয় দ্বারা ক্রয় ক্ষমতা বা অর্থ সমাজের এক শ্রেণীর নিকট হইতে অন্য শ্রেণীর নিকট হাস্তান্তরিত হয় মাত্র। যেমন, আভ্যন্তরীণ ঋণ পরিশোধের জন্য সরকারী ব্যয়।

উৎপাদনের উপর সরকারী ব্যয়ের ফলাফল (Effects of Public Expenditure on Production): সরকারী ব্যয় উৎপাদনকে তিন রকম ভাবে প্রভাবান্বিত করিতে পারে: প্রথমতঃ, মানুষের কার্য ও সঞ্চয় করিবার শক্তিকে প্রভাবান্বিত করিয়া। দ্বিতীয়তঃ, তাহার কর্ম ও সঞ্চয় করিবার ইচ্ছাকে প্রভাবান্বিত করিয়া এবং তৃতীয়তঃ, বিভিন্ন কর্ম নিয়োগ ও স্থানের মধ্যে উৎপাদক সম্পদগুলির বণ্টনের সহায়তা করিয়া।

সমাজ কল্যাণধর্মী উন্নয়নমূলক বাঞ্ছনীয় সরকারী ব্যয় লোকের উৎপাদন ও সঞ্চয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

লোকের উৎপাদন ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা বিশেষ ভাবে নির্ভর করে সরকারী ব্যয়ের প্রকৃতি ও সরকারী নীতির উপর। সরকার যদি বিনা সর্তে ব্যয় করে, তাহা হইলে ঐ ব্যয় উদ্ভূত উপকার ও সুযোগের সম্ভাবনা মানুষের কর্ম ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস করিয়া দেয়। বার্ধক্যের ভাতা কিংবা ব্যারামপীড়া ও বেকারত্বের বীমা বাবদ সর্তহীন সরকারী ব্যয় মানুষকে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদাসীন করে ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা নষ্ট করে।

সরকারী ব্যয় দ্বারা যদি দেশের উৎপাদক সম্পদের পূর্ণকর্ম নিয়োগ প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহা দেশের উৎপাদনের পক্ষে অনুকূল। সরকারী ব্যয়ের দৌলতে অনেক সময় উৎপাদক সম্পদের ঝুকিবহুল নূতন শিল্পে বিনিয়োগ ঘাট। এমন অনেক শিল্পোৎপাদন আছে যেখানে বে-সরকারী বিনিয়োগ বড় একটা আকৃষ্ট হয় না। যেমন, কোন নূতন স্থানে রেলওয়ে পরিবহন শিল্প বে-সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা গড়িয়া উঠে না। এইরূপ ঝুঁকি বহুল, অনিশ্চয়তা পূর্ণ শিল্পে সরকারী ব্যয় দ্বারা উৎপাদক সম্পদের বিনিয়োগ ঘটে ও দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সেইরূপ, সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে অনুন্নত স্থানেও সম্পদ বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া, উৎপাদন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে, সরকারী ব্যয় যদি সর্বোচ্চ সমাজ-কল্যাণ নীতির আদর্শ অনুযায়ী নির্বাহ করা হয়, তাহা হইলে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধিই পাইয়া থাকে।

ধনবণ্টনের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effects of Public Expenditure on Distribution) : দেশের বণ্টন ব্যবস্থার দিক হইতে সেই সরকারী ব্যয়ই সর্বোৎকৃষ্ট, যাহা সমাজের আয় বৈষম্য হ্রাস করে। সরকারী কতকগুলি ব্যয় আছে, ব্যক্তি বিশেষের উপকার করে, আর কতকগুলি ব্যয় আছে যাহা গোটা সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের সহায়তা করে। সরকার যদি অবৈতনিক শিক্ষা, চিকিৎসার ও ব্যয় বহন করে, তাহা হইলে ধনীর চেয়ে দরিদ্রের উপকারই হয় বেশী। কিংবা, সরকার যদি ক্রমবর্ধমান আয়কর হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া, দরিদ্রের বার্দ্ধক্য ভাতা বাবদ সেই অর্থ ব্যয় করে, তাহা হইলে সমাজের ধনী শ্রেণীর নিকট হইতে দরিদ্র শ্রেণীর নিকট আয় হস্তান্তরিত হইবে। এইরূপ সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে যদি দরিদ্র শ্রেণী অপেক্ষাকৃত অধিক

উপকার ও অর্থ আয় লাভ করে, তাহা হইতে সমাজের ধনবণ্টনের বৈষম্য অনেকটা দূর হয়। সরকারী আর কতকগুলি ব্যয় আছে, যাহা দ্বারা গোটা সমাজ সামগ্রিক ভাবে উপকৃত হয। যেমন, ভাল রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য যদি সরকার ব্যয় করে, তাহা হইলে গোটা সমাজের সমষ্টিগত কল্যাণ হয়।

তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সরকারী ব্যয় ব্যবস্থা দেশের সঞ্চয়ের পরিপন্থী স্বরূপ না হয়। সরকারী ব্যয় নির্বাহের জন্য যদি উচ্চ করভার স্থাপন করিতে হয়, তাহা হইলে সঞ্চয়ের ব্যাঘাত হইতে পারে। সেইরূপ সর্তহীন সরকারী ব্যয়ের মাধ্যমে যাহারা উপকার লাভ করে, তাহাদের সঞ্চয় প্রবণতা ও ক্ষুন্ন হইতে পারে।

কর্ম নিয়োগের উপর সরকারী ব্যয়ের প্রভাব (Effects of Public Expenditure on Employment) : আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের ধারণা এই যে, সরকারী পরিকল্পনা দ্বারা যদি ব্যয ব্যবস্থা উপযুক্ত ভাবে নির্বাহ করা যায়, তাহা হইলে দেশে কর্ম নিয়োগ সৃষ্টি দ্বারা গোটা অর্থ ব্যবস্থার স্থিতি স্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

কোন দেশের নিযোগ পরিমাণ ঐ দেশের কার্যকরী চাহিদার (effective demand) উপর নির্ভর করে। এই কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে, সমাজের মোট ব্যয়ের উপর। মোট ব্যয় নির্ভর করে, সমাজের খাদন প্রবণতা ও বিনিয়োগের উপর। উন্মার্গগামী অর্থব্যবস্থায় খাদন প্রবণতা স্বভাবতঃই কম ; কেননা, ঐ ব্যবস্থায় ধনবণ্টনের বৈষম্য হেতু অতিসঞ্চয় বা অব-খাদন (under consumption) অত্যধিক। খাদন প্রবণতার এই ঘাটতি বে-সরকারী বিনিয়োগ দ্বারা ঘুচান সম্ভব হয় না। উন্নত অর্থব্যবস্থায় পুঁজির প্রান্তিক প্রগুণতা (marginal efficiency of capital) কম বলিযা নূতন বিনিযোগের ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জল নহে। যেখানে ধন-বণ্টন বৈষম্য উৎকট, এবং নূতন বিনিয়োগের সম্ভাবনা অত্যন্ত সীমিত, যেখানে জাতীয আয় উপযুক্তভাবে ব্যয় দ্বারা খাদন ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে।

খাদন ব্যয় ও বে-সরকারী বিনিয়োগের এইরূপ অপ্রগুণ অবস্থাতে সরকারী ব্যয়ের প্রবর্তন অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। এই সরকারী ব্যয় দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া বেসরকারী বিনিযোগের ঘাটতি ঘুচান যায় ও কর্মনিয়োগ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়। সরকারী বিনিযোগের ফলে জাতীয় আয় বাড়িয়া সমাজের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ; খাদন ব্যযের বৃদ্ধির ফলে, আবার কর্ম সংস্থান সম্প্রসারিত হয়।

পরিপূরক ব্যয় (Compensatory Spending) : বে-সরকারী ব্যয়ের

ঘাটতি ও অপ্রগুণতা ঘুচাইবার জন্য সরকার যখন ব্যয় করে, উহাকে পরিপূরক ব্যয় বলে। বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে পরিপূরক ব্যয়ের স্বরূপও বিভিন্ন হয়।

বাণিজ্য চক্রের মন্দাবস্থায় বে-সরকারী খাদন ও বিনিয়োগ ব্যয় হ্রাস পায়, জাতীয় আয় ও কর্মনিয়োগ সংকুচিত হয়। এই অবস্থাতে সরকারী ব্যয় দ্বারা বে-সরকারী ব্যয়ের ঘাটতি পরিপূরণ না করিলে, গোটা আর্থিক ব্যবস্থাই ধ্বসিয়া পড়িতে পারে। এই ব্যয় দ্বারা সরকার অতিরিক্ত অর্থ আয় সৃষ্টি করিয়া বে-সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিতে পারে।

সরকার বিভিন্ন রকম ত্রাণ কার্য ও সমাজ উন্নয়ন কার্যের মাধ্যমে পরিপূরক ব্যয় ব্যবস্থা ধার্য করিতে পারে। এই ব্যয় ভার সাধারণ কর হইতে সংগৃহীত অর্থ আয় দ্বারা বহন করা সম্ভব হয় না ; কেননা, বাণিজ্য চক্রের মন্দাবস্থায় অতিরিক্ত করভার চাপাইলে বে-সরকারী খাদন ও বিনিয়োগ ব্যয় আরও হ্রাস পায়। এই ব্যয় ভার সরকারকে ঋণ দ্বারা বহন করিতে হয়। এই ঋণ আবার জনসাধারণের নিকট হইতে গ্রহণ করা চলে না। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নূতন প্রচারিত অর্থ-ঋণ দ্বারা এই ব্যয় ব্যবস্থা নির্বাহ করিতে হয়। এই ধরণের ঘাটতি ব্যয় দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ এমন ভাবে পরিকল্পনা ও কার্যকরী করিতে হয় যাহাতে এই বিনিয়োগ বে-সরকারী বিনিয়োগের সহিত প্রতিযোগিতা না করে। সরকারী ঘাটতি ব্যয় প্রক্রিয়া এমন ভাবে চালু করিতে হয়, যাহাতে ঐ ব্যয় দ্বারা সৃষ্ট নূতন অর্থ আয় সমাজের সেই শ্রেণীর হাতে পড়ে, যাহারা উহা সঞ্চয় না করিয়া পুণঃ ব্যয় করে।

অপরপক্ষে, বাণিজ্য চক্র যখন সমৃদ্ধির শিখরে, তখন সরকারী পরিপূরক ব্যয় সংকোচন করিতে হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যের তেজী অবস্থায় বে-সরকারী বিনিয়োগ ও খাদন প্রবণতা অত্যধিক থাকে ; কর্ম নিয়োগ এবং জাতীয় আয় ও সম্প্রসারিত হয়। এই সময়ে সরকারী ব্যয় সংকোচন দ্বারা বে-সরকারী ব্যয় ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি উৎসাহিত করিতে হয়। বে-সরকারী অর্থ ব্যবস্থা যদি পূর্ণ কর্ম নিয়োগে অধিষ্ঠিত থাকে, তাহা হইলে সরকারী পরিপূরক ব্যয় একেবারে বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

অনুশীলনী

1. Examine the effects of government expenditure on production.
2. How can public expenditure affect distribution.
3. Write a short note on : Compensatory spending.

একচত্বারিংশ অধ্যায়

সরকারী আয় (Public Income)

সরকারী আয়ের উৎস (Sources of Public Income) : স্বাভাবিক অবস্থায় সরকারী আয় সংগ্রহ করা হয় কর হইতে এবং কর বহিভূর্ত অর্থ আয়ের উৎস (non-tax resources) হইতে। তবে সরকারী আয়ের মোটা অংশই কর হইতে সংগৃহীত হয়।

কর

ব্যক্তিগত সম্পদের উপর বাধ্যতামূলক ভাবে সরকার যে অর্থ আদায় করে উহাকে **কর** (tax) বলে। করের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা বাধ্যতামূলক প্রাপ্য মিটান, যাহার বিনিময়ে সরকারের নিকট হইতে উপযুক্ত উপকার প্রাপ্তি ঘটে না। সরকারের নিকট হইতে কোন বিশেষ উপকার লাভের বিনিময়ে কর প্রদান করা হয় না। কর হইতে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকার সর্ব সাধারণের উপকার করিয়া থাকে, নির্দিষ্ট কর প্রদানকারীর বিশেষ কোন উপকার করে না।

কর বহিভূর্ত অর্থ আয়ের উৎস সাধারণতঃ তিনটি : (১) **মাশুল** বা পারিশ্রমিক (fees) ; (২) **বিক্রয় মূল্য** (prices) এবং (৩) **বিশেষ (কর) নির্ধারণ** (special assessment)। বিশেষ উপকারের বিনিময়ের যে প্রাপ্য মিটান হয় উহাকে মাশুল বলে। যেমন, ডাক মাশুল। সাধারণতঃ, এই প্রাপ্য মিটান মাশুল প্রদানকারীর উপকার প্রাপ্তির আনুপতিক হইয়া থাকে। রাষ্ট্র উৎপাদিত

মাশুল, বিক্রয় মূল্য ও বিশেষ নির্ধারণ

দ্রব্য বা সেবাকৃত্য বিক্রয় দ্বারা যে অর্থ আয় সংগ্রহ হয়, উহাকে বিক্রয় মূল্য বলে। অনেকে এই বিক্রয় মূল্যকে **বাণিজ্যিক আয়** (commercial revenue) বলেন। ইহা বাধ্যতা মূলক অর্থ আয় নহে। সরকার যদি ভূমি বা বাড়ী ঘরের অনুপার্জিত আয়ের (unearned increment) একটি অংশ কর হিসাবে আদায় করে, তাহা হইলে উহাকে বিশেষ নির্ধারণ বলে। করের মত ইহা ও বাধ্যতা মূলক প্রাপ্য মিটান। কিন্তু, কর হইতে ইহার পার্থক্য এই যে, ইহা বিশিষ্ট উপকার প্রাপ্তির বিনিময়ের আনুপাতিক প্রাপ্য মিটান। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কলিকাতা ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাষ্টের উন্নতি বিধানের ফলে, সহরের জমির মূল্য বৃদ্ধি

পাইয়াছে। যদি জমির এই বর্দ্ধিত মূল্যের জন্য ঐ সংস্থা জমির মালিকের উপর কর চাপায়, তাহা হইলে উহাকে বিশেষ নির্দ্ধারণ বলা হইবে।

উপরি উক্ত আয়ের উৎস ছাড়াও, সরকার বিপদকালে প্রয়োজন হইলে আরও দুইটি উৎস হইতে আয় সংগ্রহ করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে সরকার নিজ নাগরিকদের নিকট হইতে, কিংবা বিদেশ হইতে **ঋণ** গ্রহণ করিয়া এবং **মুদ্রাস্ফীতি** দ্বারাও অর্থআয় বৃদ্ধি করিতে পারে।

করনীতির উদ্দেশ্য (Objectives of Taxation) : করনীতির গতানুগতিক উদ্দেশ্য সরকারের আয় সংগ্রহ করা। কিন্তু আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ সরকারী করনীতিকে কেবল আয়ের উৎস হিসাবেই দেখেন না। তাহাদের নিকট করনীতি দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের সক্রিয় একটি বিশেষ কার্যকরী যন্ত্রও বটে। করনীতি উপযুক্ত ভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ দ্বারা সরকার দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা নিয়মিত কবিতে পারে। যেমন, সরকার যদি বিদেশী আমদানী দ্রব্যের উপর সংরক্ষণ কর চাপায়, তাহা হইলে দেশের শিশুশিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে। করধার্য করিয়া দেশের খাদন স্তর ও নিয়মিত করা যায়। অনেক ভোগ্য দ্রব্য আছে, যাহার খাদন দেশের জনস্বাস্থ্য ও নৈতিক কল্যাণের দিক হইতে অনভিপ্রেত। যেমন, মদ্যপান। সরকার যদি এইরূপ দ্রব্যের উপর কর চাপায় তাহা হইলে এই সকল দ্রব্যের খাদন হ্রাস পাইবে। উপযুক্ত করনীতি দ্বারা সরকার দেশের আয় বণ্টন ব্যবস্থাও নিয়ন্ত্রণ করিতে পারে। সরকার যদি ধনিক শ্রেণীর উপর অধিক হারে কর ভার চাপায়, আর গরীব শ্রেণীর উপর কর ভার লঘু করে, কিংবা একেবারেই মকুব করে, তাহা হইলে দেশের আয় বণ্টনের বৈষম্য অনেকটা দূর হইবে। পরিশেষে, করনীতি দেশের জাতীয় আয় ও কর্ম নিয়োগ হ্রাস-বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়া বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধ অবস্থা কিংবা মন্দা অবস্থা প্রতিরোধ করিতে পারে। যখন বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধি দেখা যায়, তখন অধিক হারে কর চাপাইলে, আর যখন মন্দাবস্থা আসে, তখন করভার হ্রাস করিলে, বাণিজ্য চক্রের উঠানামা রোধ ও আর্থিক স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা যায়।

করনীতির সূত্রাবলী (Canons of Taxation) : দেশের করনীতি কি ভাবে ধার্য ও পরিচালিত হওয়া উচিত, সে সম্পর্কে আডম্ স্মিত (Adam Smith) চারিটি সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আডম্ স্মিতের প্রথম সূত্র হইল, সামর্থ্য বা সমতা সূত্র। এই সূত্রের

অর্থ এই যে, রাষ্ট্রের প্রত্যেক প্রজা সরকারী ব্যয়-ভার বহনের জন্য যতটা সম্ভব প্রত্যেকের আয়ের অনুপাতে কর প্রদান করিবে। এই সূত্রের সাধারণ তাৎপর্য্য এই যে, ন্যায়তঃ প্রত্যেকে তাহার সামর্থ্য অনুসারে করভার বহন করিবে। কর প্রদানের ভিত্তি এই হওয়া উচিত যে, করভার বহন দ্বারা নাগরিকদের যে ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, ঐ ত্যাগ স্বীকার যেন সকলের পক্ষে সমান হয়। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় ক্রম বর্ধমান (progressive) করনীতি ধার্য করা। এই করনীতির সারমর্ম এই যে ধনীরা সরকারী ব্যয় ভার যোগাইতে কেবলমাত্র তাহাদের আয়ের সমানুপাতিক কর প্রদান না করিয়া, আয়ের অনুপাতের চেয়ে অধিক পরিমাণে কর প্রদান করিবে।

সামর্থ্য বা সমতা সূত্র (Canon of Ability or Equality)

দ্বিতীয়তঃ, দেশের করনীতি সুনিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। করের পরিমাণ, উহা সংগ্রহের সময় ও পদ্ধতি সম্পর্কে করপ্রদানকারী এবং সরকার, উভয়েই সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। করপ্রদানকারীর ধারণা থাকা প্রয়োজন এই জন্য যে, উহার ভিত্তিতে সে তাহার দৈনন্দিন খাদনব্যয় ব্যবস্থা নিয়মিত করিতে পারে। সরকারের ধারণা থাকা প্রয়োজন এই হিসাবে যে, উহার ভিত্তিতে সরকার ব্যয়ের বাজেট প্রস্তুত করিতে পারে।

নিশ্চয়তা সূত্র (Canon of Certainity)

তৃতীয়তঃ, করনীতির সুবিধা সূত্র দ্বারা আডম্ স্মিত এই নির্দেশ করেন যে, প্রত্যেক কর এরূপভাবে ধার্য করা উচিত যাহাতে উহা সংগ্রহের সময় করপ্রদানকারীর কোনরূপ অসুবিধার কারণ না হয়। যেমন, ভারতবর্ষে কৃষাণদের পক্ষে ভূমি রাজস্ব প্রদান করার সব চাইতে অনুকূল সময় কৃষি শস্য আহরণের পর।

সুবিধা সূত্র (Canon of Convenience)

চতুর্থতঃ, আডমের মতে, সেই সকল করই দেশের পক্ষে উপযোগী ও গ্রহণীয় যাহাদের, সংগ্রহের খরচ করের আয়ের অনুপাতে স্বল্প। কিন্তু, কেবল মাত্র কর সংগ্রহের খরচ স্বল্প হইলেই যে তাহা দেশের পক্ষে উপযোগী, তাহা বলা যায় না। অনেক কর আছে যাহা ধার্য করিলে সংগ্রহ বাবদ খরচ খুব কম পড়ে, অথচ উহারা দেশের উৎপাদন ব্যহত করিয়া, কিংবা ধনবণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করিয়া দেশের অর্থব্যবস্থায় ব্যয়-বহুল হইয়া পড়ে।

ব্যয়-সংকোচ সূত্র (Canon of Economy)

করনীতির এই চারিটি সূত্রের অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা হইয়াছে। এই

চারিটি সূত্রের মধ্যে প্রথমটি করনীতির সাধারণ একটি নিয়ম বিশেষ; উহা যে কোন দেশের কর ব্যবস্থার পক্ষে সাধারণ ভাবে খাটে। কিন্তু আর তিনটি সূত্র মুখ্যতঃ, কর ব্যবস্থা তদারক ও পরিচালনার নিয়ম-কানুন। **দ্বিতীয়তঃ**, সামর্থ্যের সূত্রটি একদিকে যেমন কর ব্যবস্থার ন্যায় অন্যায় নির্দেশ করে, অন্যদিকে ইহার আবার অর্থ-নৈতিক গুরুত্ব ও আছে; কেননা ইহা কর প্রদানকারীর, আর্থিক সামর্থ্যের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। তবে, এই সূত্র খুব সুস্পষ্ট নয়; কেননা করপ্রদানকারীর সামর্থ্য পরিমাপ করিবার কোন নির্দিষ্ট মান নাই। **তৃতীয়তঃ**, আধুনিক কর ব্যবস্থায় নিশ্চয়তা ও সুবিধা সূত্রের গুরুত্ব খুবই অল্প; কারণ, এই দুইটি সূত্র অবজ্ঞা করিয়া কোন কর ব্যবস্থাই ধার্য করা চলে না। **পরিশেষে**, ব্যয়-সংকোচ সূত্রটি ও আডম্ স্মিত ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেন নাই। এমন অনেক কর আছে, যাহাদের সংগ্রহ খরচ খুব অল্প, কিন্তু দেশের গোটা অর্থব্যবস্থার দিক হইতে উহারা অত্যন্ত ব্যয়-বহুল হইতে পারে।

আডম্ স্মিতের সূত্রাবলীর বিরুদ্ধ সমালোচনা

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ আডম্ স্মিতের চারটি সূত্রের সংগে আর ও দুইটি অতিরিক্ত সূত্র যোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, করের (ক) উৎপাদকতা (productivity) ও (খ) নম্যতা (elasticity) এই দুইটি গুণ অবশ্য থাকা প্রয়োজন। প্রথমতঃ, সরকারের কর ব্যবস্থা এমন ভাবে ধার্য করা উচিত, যাহাতে উহা দ্বারা সরকারী কোষাধ্যক্ষে প্রচুর আয় লাভ ঘটে এবং ঐ আয় সংগ্রহের খরচ ও তেমন না বেশী পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের করব্যবস্থা এমন নমনীয় হওয়া উচিত, যাহাতে সরকারী চাহিদা মাফিক তাড়াতাড়ি উহার সংকোচন ও প্রসারণ সম্ভব হয়। অধুনা নয়া অর্থনীতিতে, কর নীতির নিয়ন্ত্রণ ক্রিয়ার (regulatory function) উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে কীনস্, হ্যান্‌সেন্ (Hansen), লার্‌নার (Lerner) প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করেন যে, দেশের করনীতি সাব্যস্ত করিবার সময় সর্বাগ্রে দেখিতে হইবে, উহা দেশের উৎপাদন, খাদন, ধনবণ্টন, জাতীয় আয়, কর্মনিয়োগ প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রণের কতটা সহায়তা করিতে পারে।

করের উৎপাদকতা ও নম্যতা

করভার বণ্টন (Distribution of Tax Burden): করভার দেশের বিভিন্ন আয়স্তরের লোকের মধ্যে কোন্ নীতির ভিত্তিতে ন্যায় সঙ্গত ভাবে বণ্টিত হওয়া উচিত, ইহা প্রধানতঃ নৈতিক সমস্যা। কিন্তু, এই সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান

করিতে হইলে, আর্থিক ও রাজস্ব সম্পর্কীয় যুক্তি ও মতবাদের ও গুরুত্ব আছে। করভার সুবণ্টনের তিনটি প্রধান বিকল্প নীতি আছে।

(১) **সেবাকৃত্য যোগানের খরচ নীতি (The cost of service principle) :** এই নীতির অর্থ এই যে, দেশের নাগরিকদের কল্যাণার্থ সেবাকৃত্য বাবদ সরকার যে খরচ করে, তাহা কর উদ্ভূত আয় দ্বারা মিটান উচিত। কিন্তু, এই নীতি বাস্তব বলিয়া গ্রহণ যোগ্য নহে। কেননা, সরকার সেবাকৃত্য বাবদ যে ব্যয় নির্বাহ করে, তাহার সহিত বিভিন্ন করের কোন সংযোগ নাই। সরকার একই খরচে যে সাধারণ সেবাকৃত্য সরবরাহ করে, তাহার সুবিধা ও উপকার সর্ব সাধারণে ভোগ করে। জন সাধারণের প্রত্যেকে উহার কতটা উপকার লাভ করে ও তাহার যোগান দিতে সরকারী খরচই বা কত পড়ে তাহা, সঠিক নির্ধারণ করিয়া, সেই অনুপাতে প্রত্যেকের ঘাড়ে করভার চাপান যায় না।

(২) **সেবাকৃত্য যোগানের উপকার নীতি (The benefit of service principle) :** এই নীতির সারমর্ম এই যে, ন্যায়ের ভিত্তিতে করব্যবস্থা ধার্য করিতে হইলে, প্রত্যেক করপ্রদানীকারী সরকারী উপকার যতটা লাভ করিবে, সেই অনুপাতে করভার ও ঘাড়ে লইবে। এই মতবাদের ও যথেষ্ট গলদ আছে। প্রথমতঃ, সরকারী উপকার বাস্তবতঃ গরীব ও দুঃস্থ ব্যক্তিরাই অধিক ভোগ করিয়া থাকে ; কিন্তু তাহাদের কর বহন করিবার শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। উপকারের অনুপাতে কর ভার স্থাপন করিতে হইলে, গরীবদের উপরই অধিক চাপ পড়িবে, তাহা মোটে ও ন্যায সংগত নহে। দ্বিতীয়তঃ, কর প্রদানের বিনিময়ে যে সরকারী উপকার লাভ করা যায় ; তাহা ব্যক্তি বিশেষের ভোগের জন্য নহে। সরকার কর সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সর্ব সাধারণের জন্য যে উপকার ও সুবিধা প্রদান করে, তাহা হইতে ব্যক্তি বিশেষের সুবিধা পৃথক করা যায় না।

(৩) **কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি (The principle of ability to pay) :** কর ভার সুবণ্টনের সর্বজন সম্মত মতবাদ হইল, কর প্রদানের ক্ষমতার নীতি। কর প্রদানের ক্ষমতা বিভিন্ন অর্থে ধরা যাইতে পারে। মিল (Mill) এই নীতির তাৎপর্য বুঝাইতে গিয়া সম ত্যাগের মতবাদ (doctrine of equality of sacrifice) খাড়া করিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে, কর প্রদান জনিত ত্যাগ সকল নাগরিকের পক্ষে সমানুপাতিক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, কর প্রদান করিবার পর করপ্রদানীকারীদের আপেক্ষিক আর্থিক অবস্থা একই থাকিবে, যেমনটি ছিল কর প্রদানের আগে। মিল্ তাঁহার

সম ত্যাগের মতবাদ

তত্ত্বের দ্বারা এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, কোন করভার এমন ভাবে চাপান উচিত যাহাতে উহা সকল করপ্রদানকারীর আয়ের প্রাপ্তিক উপযোগকে সমান ভাবে প্রভাবান্বিত করে। কিন্তু মিলের এই তত্ত্বের গলদ এই যে, ইহা বর্তমান ধনবণ্টনকে ন্যায় সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লয় এবং সেই ভিত্তিতে করপ্রদানকারীর সমানুপাতিক ত্যাগ স্বীকার করা উচিত, এই নীতি প্রতিষ্ঠা করে।

অধ্যাপক পিগু এই মতবাদ গ্রহণ না করিয়া অবম (অল্পতম) মোট ত্যাগের নীতি (principle of least or minimum aggregate sacrifice) প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সর্বোচ্চ সমাজকল্যাণের দিক হইতে কর ব্যবস্থা এমন ভাবে ধার্য হওয়া উচিত যে, কর প্রদানজনিত ত্যাগস্বীকার গোটা সমাজের পক্ষে হয় অল্পতম। এই নীতি অনুসারে সমাজের সকলকেই কর প্রদান করিবার প্রয়োজন হয় না। যাহাদের আয় অধিক, তাহাদের উপর কর ভার অধিক চাপাইয়া, যাহারা গরীব তাহাদের উপর কর একদম মকুব করা চলে। তবে এই নীতির অসুবিধা এই যে, ইহা সঞ্চয় ব্যহত করিয়া লোকের কর্মোৎসাহ হ্রাস করে।

অবম মোট ত্যাগের নীতি

করপ্রদানের ক্ষমতা সাধারণঃ তিনটি সম্ভাব্য উপায়ে পরিমাপ করা যায়। **প্রথমতঃ,** লোকের সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিতে। কিন্তু সম্পত্তির মালিকানা ভিত্তিতে কর প্রদানের ক্ষমতা পরিমাপ করিবার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, এই ব্যবস্থায় মানুষের অর্থ আয় সম্পূর্ণভাবে করভার স্পর্শ মুক্ত হয়। অনেক মানুষের কোনই সম্পত্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সমাধিক আয় থাকিলে তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা যে যথেষ্ট আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। **দ্বিতীয়তঃ,** অনেকে বলেন, লোকের খাদন ব্যয়ের পরিমাণ দেখিয়া কর প্রদানের ক্ষমতা পরিমাপ করা চলে। যাহারা ভোগ্য দ্রব্যের উপর অধিক ব্যয় করে, তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতাও অপেক্ষাকৃত অধিক। কিন্তু, ইহাও পরিমাপের ঠিক সন্তোষজনক ভিত্তি নহে। কোন লোকের সংসারে গলগ্রহ ব্যক্তির সংখ্যা যদি অধিক থাকে, তাহা হইলে তাহার খাদন ব্যয় স্বভাবতঃই অধিক হইবে। কিন্তু এইরূপ, মানুষের কর প্রদান ক্ষমতা কম বই, বেশী হইতে পারে না। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তির কোন পরিবার নাই, তাহার খাদন ব্যয় কম বলিয়া কর প্রদানের ক্ষমতাও প্রকৃত অধিক। কর প্রদানের ক্ষমতা সঠিক পরিমাপ করিতে হয়, মানুষের অর্থ আয়ের ভিত্তিতে। ইহাই মানুষেরই কর প্রদান ক্ষমতা পরিমাপের তৃতীয়

কর প্রদানে ক্ষমতার পরিমাপ

উপায়। মানুষের অর্থ আয় সম্পর্কেও আবার বিশেষ করিয়া দেখিতে হয়, কতটা আয় কোন্ বিশেষ সময়ের মধ্যে মানুষ উপার্জন করে, এই আয়ের মধ্যে মূলধনের আগম মিশ্রিত আছে কিনা, আয়ের মধ্যে অনিশ্চয়তার উপাদান কতটা এবং ঐ আয় সে একাই ভোগ করে, না অপরেরও উহার উপর দাবী আছে।

সমানুপাতিক ও ক্রমবর্ধমান করনীতি (Proportional and Progressive Taxation) : সমানুপাতিক এবং ক্রমবর্ধমান করের বর্গীকরণ করা হইয়া থাকে, বিভিন্ন করপ্রদানকারীর মধ্যে করভার বণ্টনের ভিত্তিতে।

সমানুপাতিক কর ব্যবস্থায়, করপ্রদানকারীর অর্থআয় যাহাই হউক না কেন, তাহাদের প্রত্যেককেই এক নির্দিষ্ট হারে কর প্রদান করিতে হয়। যেমন, করের নির্দিষ্ট হার যদি ৫% হয়, তাহা হইলে যাহার বার্ষিক আয় ১ লক্ষ টাকা তাহাকেও যেমন শতকরা ৫৲ হারে ঐ আয়ের উপর কর দিতে হইবে, আবার যাহার আয় ১০০০৲ টাকা তাহাকেও ঐ শতকরা ৫৲ টাকা হিসাবেই কর প্রদান করিতে হয়। সমানুপাতিক করনীতি বর্তমান ধনবণ্টন ব্যবস্থা ন্যায় সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লয়। কিন্তু, ন্যায়ের দিক হইতে এই করনীতিকে সমর্থন করা যায় না। কেননা, মানুষের অর্থ আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে কর প্রদানের আপেক্ষিক ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত অধিক বাড়িয়া থাকে। ক্রমবর্ধমান করনীতি এই দিক হইতে দেখিতে গেলে অধিক সমর্থন যোগ্য।

ক্রমবর্ধমান করব্যবস্থায়, করের শতকরা হার আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে বাড়িয়া থাকে। যেমন, যাহাদের আয় ৩০০০৲ ও ৫০০০৲ টাকার মধ্যে, তাহারা শতকরা একহারে কর দিয়া থাকে; আবার যাহাদের আয় ৫০০০৲ ও ৭৫০০০৲ টাকার মধ্যে, তাহারা শতকরা অধিক হারে কর প্রদান করিয়া থাকে।

করনীতি আবার Regressive ও Degressive ও হইতে পারে। যে কর ব্যবস্থায় করপ্রদানকারীর আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে, করের হার হ্রাস হয়, তাহাকে regressive কর বলে। এই ব্যবস্থায় করভার অধিক পড়ে দরিদ্র শ্রেণীর উপর। Degressive কর ব্যবস্থায়, আয়ের একটা সীমা পর্যন্ত করব্যবস্থা ক্রমবর্ধমান হয়, তাহার পর সমানুপাতিক।

ক্রমবর্ধমাণ করনীতির স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Progressive Taxation) : আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণের অভিমত এই যে, ন্যায়ের দিক হইতে দেখিতে গেলে ক্রমবর্ধমান করনীতিই সমানুপাতিক করনীতির

চেয়ে অধিক সমর্থন যোগ্য। কি কি কারণে ক্রমবর্ধমান কর অপেক্ষাকৃত অধিক সমর্থন যোগ্য, তাহা নিম্নে বিশ্লেষণ করা গেল।

প্রথমতঃ, আডম্ স্মিতের সামর্থ্যের সূত্র ক্রমবর্ধমান করনীতিরই পৃষ্ঠ পোষক।

ইহা সামর্থ্যের সূত্রানুযায়ী সমর্থন যোগ্য

মানুষের আয় যে অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার কর প্রদানের ক্ষমতা তাহার চেয়ে অধিক অনুপাতে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। সেই জন্য ন্যায়তঃ ধনীরা গরীবের চাইতে অধিক অনুপাতে কর প্রদান করিতে পারে।

অধ্যাপক পিগু ক্রম-বর্ধমান করনীতিকে আংশিক অল্পতম মোট ত্যাগ তত্ত্ব (least aggregate sacrifice theory) এবং আংশিক সম ত্যাগ তত্ত্বের (equal sacrifice theory) ভিত্তিতে সমর্থন করিয়াছেন। সকল মানুষের নিকট

ইহা অল্পতম মোট ত্যাগ ও সম ত্যাগ তত্ত্বের ভিত্তিতে সমর্থন যোগ্য

অর্থ বা আয়ের সমান প্রান্তিক উপযোগ থাকে না। সেইজন্য যে লোকের আয় মাসিক ৫০০৲, সে তাহার আয় হইতে ১০৲ যত সহজে দিতে পারে, যে ব্যক্তির মাসিক আয় ৫০৲ তাহার পক্ষে ১৲ দেওয়া ও তত সহজ নহে। মানুষের আয় বৃদ্ধির সংগে সংগে তাহার নিকট অর্থের প্রান্তিক উপযোগ ও হ্রাস পাইয়া থাকে। সেইজন্য গরীব ব্যক্তির চাইতে ধনী ব্যক্তি অনেক বেশী অর্থ কর হিসাবে দিতে পারে। যে ব্যক্তির মাসিক আয় ১০০৲, সে যদি কর হিসাবে ৫৲ প্রদান করে, তাহা হইলে যে লোকের মাসিক আয় ১০০১৲, সে অনায়াসে ৫০৲ টাকার চেয়ে ও বেশী কর দিতে পারে।

অধ্যাপক মার্শাল দেশে ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনের সহায়ক হিসাবে ক্রম বর্ধমান করব্যবস্থাকে যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এই করব্যবস্থায়

ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধনে সহায়ক

যাহারা উচ্চ আয় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাহাদের অপেক্ষাকৃত অধিক হারে করপ্রদান করিতে হয়; আর যাহারা নিম্ন আয় স্তরে অধিষ্ঠিত, তাহাদের অপেক্ষাকৃত কম হারে কর দিতে হয়। ফলে, ধনিক ও গরীব শ্রেণীর মধ্যে আয় বৈষম্য হ্রাস পাইয়া দেশের ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উন্নতি হয়। ধন-বণ্টন ব্যবস্থার উৎকর্ষতা সাধন দ্বারা ক্রম-বর্ধমান করব্যবস্থা সামাজিক সাম্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থশাস্ত্রী অধ্যাপক হব্‌সন্ (Hobson) ক্রম-বর্ধমান করনীতিকে এই বলিয়া সমর্থন করেন যে, ইহা আয়ের উদ্‌বৃত্তের উপর কর

(taxation of surplus)। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের আয়ের মধ্যে দুইটি উপাদান বর্তমান। একটি খরচ উপাদান (cost element) আর একটি উদ্‌বৃত্ত উপাদান (surplus element)। যে আয় সামান্য, তাহার মধ্যে খরচ উপাদানই প্রধান থাকে, উদ্‌বৃত্ত উপাদান নগণ্য। অপরপক্ষে, যে আয় অত্যধিক, তাহার মধ্যে উদ্‌বৃত্ত উপাদানই প্রধান থাকে, খরচ উপাদান নগণ্য। গরীব ব্যক্তির সামান্য আয়ের উপর যদি কর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে উহা খরচ উপাদান বৃদ্ধি করিয়া, তাহার আয় উৎপাদন পরিমাণ হ্রাস করে। সেইজন্য ধনী ব্যক্তির আয়ের উপর অধিক কর স্থাপন করাই সমীচীন ; কেননা, তাহাতে তাহার আয় উৎপত্তির ব্যাঘাত হয় না, কর হিসাবে তাহাকে আয়ের উদ্‌বৃত্ত উপাদান মাত্র দিতে হয়।

ইহা আয়ের উদ্‌বৃত্ত উপাদানের উপর কর

লর্ড কীনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ দেশে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ স্থাপন ও কায়েমী করিতে, ক্রম-বর্ধমান করনীতির গুরুত্ব আছে বলিয়া দাবী করেন। তাঁহারা বলেন যে, পূর্ণ নিয়োগ সৃষ্টির জন্য চাই সমাজের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি, কিংবা বিনিয়োগ বৃদ্ধি। খাদন প্রবণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, তাহার মধ্যে দেশের ধন-বণ্টন ব্যবস্থা অন্যতম। যে সমাজে ধন-বণ্টনের বৈষম্য উৎকট সেখানে জাতীয় আয়ের মোটা অংশই গুটিকতক ধনিকের কুক্ষিগত। ধনিক শ্রেণীর আয় বৃদ্ধি মানেই, তাহাদের সঞ্চয় প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া, বা খাদন প্রবণতা হ্রাস হওয়া। ক্রম-বর্ধমান করব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া ধনবণ্টনের বৈষম্য খানিকটা দূর করা যায়। ক্রম-বর্ধমান কর স্থাপনের ফলে ধন-বণ্টনের বৈষম্য খানিকটা দূর হইলে সমাজের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পাইবে ও কর্ম নিয়োগের সম্প্রসারণ হইবে।

এই পূর্ণ কর্ম নিয়োগ স্থাপনে সহায়ক

ক্রম-বর্ধমান করনীতির বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Progressive Taxation) : ক্রম-বর্ধমান করব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা এই যে, মানুষের আয় বৃদ্ধির সংগে, কি হারে করবৃদ্ধি করিতে হইবে, সে সম্পর্কে কোন সহজ বাঁধাধরা নিয়ম নির্ধারণ করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ক্রম-বর্ধমান করনীতি লোকের সঞ্চয় প্রবণতা হ্রাস করে। সে হিসাবে ইহা মূলধন বৃদ্ধির পরিপন্থী। তৃতীয়তঃ, এই ব্যবস্থায়, করের হার বৃদ্ধির ফলে মুনাফার অংক সংকুচিত হয় বলিয়া, ইহা দেশের উৎপাদন ও ব্যাহত করে। তাহা ছাড়া, ক্রম-বর্ধমান করের হার যদি

খুব উচ্চ হয়, তাহা হইলে কর ফাঁকি দিবার নানা অসদুপায় অবলম্বন করিতে ও করপ্রদানকারীরা পশ্চাৎপদ হয় না।

করের পশ্চাদভার (**Incidence of Taxation**): যখন একটি কর স্থাপন করা হয়, উহার প্রাথমিক বোঝাকে অগ্রভার (impact) বলে। যেমন, চিনির উপর কর স্থাপন করিলে ঐ করের অগ্রভার পড়ে চিনি ব্যবসায়ীদের উপর। কিন্তু, ঐ বোঝা স্কন্ধ বদলাইয়া পরে খাদক শ্রেণীর ঘাড়ে আসে। যে প্রক্রিয়ায় কর এক ব্যক্তির ঘাড় হইতে অপর ব্যক্তির ঘাড়ে যাইয়া পড়ে, উহাকে shifting বলে। এই shifting প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই করের পশ্চাদভার আসিয়া পড়ে। করের পশ্চাদভার আসিয়া পড়ে তাহার স্কন্ধে, যাহাকে শেষকালে কর বাবদ অর্থ প্রদান করিতে হয়। যেমন, চিনির উপর কর ধার্য করিলে, উহার পশ্চাদভার পড়িবে যাইয়া খাদক শ্রেণীর ঘাড়ে।

করের পশ্চাদভার নিরূপণের নীতি (**Principles Governing Incidence of Taxation**): এক হিসাবে দেখিতে গেলে, করের পশ্চাদভার নীতি সাধারণ মূল্য তত্ত্বেরই নামান্তর মাত্র। যখন কোন দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা যায়, তখন উহার পশ্চাদ অর্থভার দেখা দেয়, ঐ দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে।

করের পশ্চাদভার নিরূপণের সাধারণ নীতি হিসাবে ডাল্টন্ (Dalton) দুইটি নিয়ম নির্দেশ করিয়াছেন ঃ

প্রথমতঃ, যদি অন্যান্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন না হয়, তাহা হইলে কর কবলিত দ্রব্যের চাহিদা যত বেশী নম্য হইবে, তত বেশী করের পশ্চাদভার বিক্রেতার উপর পড়িবে।

দ্বিতীয়তঃ, যদি অন্যান্য বিষয়ের কোন পরিবর্তন না হয়, কর-কবলিত দ্রব্যের যোগান যত বেশী নম্য হইবে, ততবেশী করের পশ্চাদভার ক্রেতার উপর পড়িবে। যে দ্রব্যের চাহিদা নম্য, উহার উপর কর চাপার দরুণ বাজার দর বৃদ্ধি পাইলেই, দ্রব্যের খাদন হ্রাস পাইবে এবং ফলে করের পশ্চাদভার বিক্রেতার কাঁধে পড়িবে। কিন্তু, যদি দ্রব্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা করের পশ্চাদভার ক্রেতার কাঁধে চাপাইয়া দিতে পারে, কেননা, এক্ষেত্রে কর কবলিত দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পাইলেও খাদন হ্রাস হইবে না। অপরপক্ষে দ্রব্যের যোগান যদি নম্য হয়, তাহা হইলে করের দরুণ দ্রব্য যোগান সংকুচিত হইবে; কেননা, কর প্রদানের জন্য দ্রব্য উৎপাদনের খরচ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং, আমরা দেখি যে, বিক্রেতারা দ্রব্যের যোগান সংকোচন করিয়া করের

পশ্চাদভার খরিদ্দারের ঘাড়ে চাপাইতে চেষ্টা করে, আর খরিদদারেরা দ্রব্যের চাহিদা সংকোচন করিয়া, করের অর্থ ভার বিক্রেতাদের ঘাড়ে চাপাইতে চাহে। এই দুই দলের আপেক্ষিক ক্ষমতার ভিত্তিতেই করের পশ্চাদভার বাস্তবতঃ নিরূপিত হয়।

করের পশ্চাদভার নিরূপণে সময় মিয়াদের গুরুত্ব স্বীকার করিতে হয়। অল্প মিয়াদে দ্রব্য যোগান সাধারণতঃ অনম্য হয়। কিন্তু, দীর্ঘ মিয়াদে দ্রব্যযোগান নম্য হয়। সেইজন্য অল্প সময় মিযাদে করের পশ্চাদভার বিক্রেতাদেব উপর, আর দীর্ঘমিযাদে ক্রেতাদের উপর যাইয়া পড়ে।

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কর (Direct and Indirect Tax) : প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের পার্থক্য বুঝিতে হইলে, করের অগ্রভার (impact) ও পশ্চাদভারের (incidence) অর্থ কি, তাহা স্পষ্ট জানা দরকার। প্রত্যক্ষ করের অগ্রভার ও পশ্চাদ্‌ভার একই ব্যক্তির ঘাড়ে চাপে। প্রত্যক্ষ করের বেলায়, করের প্রাথমিক বোঝা যে ঘাড়ে নেয, তাহাকেই পশ্চাদ্‌ বোঝা ও গ্রহণ করিতে হয়। যেমন, আয় কর। আয়করের অগ্রভার যাহার ঘাড়ে পড়ে, পশ্চাদ্‌ভার ও তাহাকেই বহন করিতে হয়। অপরপক্ষে, অপ্রত্যক্ষ করের বেলায় অগ্রভার এক ব্যক্তির ঘাড়ে, আর পশ্চাদভার অপর ব্যক্তির ঘাড়ে পড়ে। যেমন, চিনির উপর কর। এই করের অগ্রভার চিনি ব্যবসায়ীর উপর পড়ে ; কিন্তু পশ্চাদ্‌ভার পড়ে চিনি খাদকের উপর।

প্রত্যক্ষ করের গুণ (Merits of Direct Tax) : প্রত্যক্ষ করের প্রধান গুণ এই যে, ইহাকে ক্রমবর্ধমান নীতির ভিত্তিতে আদায় করা যায়। ইহা আডম্‌ স্মিতের প্রথম সূত্র, অর্থাৎ করপ্রদানকারীর সামর্থ্য অনুসারে ধার্য করা যায়। করের হার এমন ভাবে ধার্য করা যায়, যাহাতে উহার চাপ অধিক পড়ে ধনিক শ্রেণীর উপর, আর কম পড়ে গরীব শ্রেণীর উপর। প্রত্যক্ষ কর আডম্‌ স্মিতের নিশ্চয়তা ও ব্যয় সংকোচ সূত্রাবলীর ও সমর্থক। এই ব্যবস্থায় করপ্রদানকারীরা সঠিক জানে কি পরিমাণ কর তাহাদিগকে প্রদান করিতে হইবে, এবং সরকার ও সঠিক জানিতে পারে, কোন কর হইতে কতটা আয় পাওয়া যাইবে। প্রত্যক্ষ করের বেলায় করপ্রদানকারীরা কর ফাঁকি ও কম দিতে পারে ; কেননা, এই কর উৎস স্থানে আদায় করা হয়। সে হিসাবে ইহার উৎপাদকতা ও অপেক্ষাকৃত অধিক। তাহাছাড়া, প্রত্যক্ষ করের নম্যতা ও বেশী। সরকারের প্রয়োজনানুসারে এই করের হার সহজেই সংকোচন ও প্রসারণ করা যায়।

প্রত্যক্ষ করের অপগুণ (Demerits of Direct Tax) : প্রত্যক্ষ করের প্রথম অসুবিধা এই যে, ইহা অপ্রত্যক্ষ করের চাইতে কম জনপ্রিয় ; ইহা সরাসরি প্রদান করিতে হয় বলিয়া, ইহার চাপ অধিক অনুভূত হয়। ফলে, এই কর ফাঁকি দিবার জন্য করপ্রদানকারীরা অনেক সময় সরকারকে তাহাদের আয় সম্পর্কে মিথ্যা হিসাব দাখিল করিয়া থাকে। তাহাছাড়া, করের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করার ব্যাপারেও সরকারের পক্ষে ন্যায় ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সকল সময় সম্ভব হয় না।

অপ্রত্যক্ষ করের গুণ (Merits of Indirect Tax) : অপ্রত্যক্ষ করের জনপ্রিয়তা অপেক্ষাকৃত অধিক ; কেননা, ইহার আর্থিক চাপ সরাসরি ভাবে প্রাথমিক করপ্রদানকারীকে বহন করিতে হয় না। করের অগ্রভার ও পশ্চাতভার বিভিন্ন ব্যক্তির ঘাড়ে পড়ে বলিয়া, ইহার চাপ তত ভারী মনে হয় না। **দ্বিতীয়তঃ,** অপ্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় সরকারের আয়ের উৎস বিস্তৃতি লাভ করে। কেননা, এই করের মাধ্যমে সরকার গরীব শ্রেণীর নিকট হইতে ও আয় সংগ্রহ করিতে পারে। **তৃতীয়তঃ,** সহজেই এই কর সংকোচন-প্রসারণ সাপেক্ষ এবং করপ্রদানকারীরা ইহা ফাঁকি ও কম দিতে পারে ; কারণ, এই কর অল্পে অল্পে সংগ্রহ করা হইয়া থাকে। এক হিসাবে এই কর ন্যায়—সঙ্গত ; কেননা, এই ব্যবস্থায় সকলকেই কর প্রদান করিতে হয়। যাহাদের প্রত্যক্ষ কর আদৌ দিতে হয় না সেইরূপ গরীবের ও অপ্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দিবার উপায় নাই। **পরিশেষে,** অনেক ক্ষতিকর বিলাস সামগ্রী ও পাণীয় দ্রব্য আছে, যাহার উপর অপ্রত্যক্ষ কর স্থাপন করিলে সমাজের কল্যাণ হয়। যেমন, মদ্য প্রভৃতি পাণীয়ের উপর অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করিলে উহার খাদন হ্রাস পাইবে।

অপ্রত্যক্ষ করের অপগুণ (Demerits of Indirect Tax) : অপ্রত্যক্ষ করের প্রধান অপগুণ দেখা যায় তখন, যখন উহা নিত্যব্যবহার্য, অতি আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর স্থাপন করা হয়। নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর উপর কর বসাইলে তাহার চাপ অধিক পড়ে দরিদ্র শ্রেণীর উপর। তাহা ছাড়া, প্রত্যক্ষ করের হার ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী করপ্রদানকারীর সামর্থ্যের ভিত্তিতে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। কিন্তু, অপ্রত্যক্ষ কর একই হারে সকলের উপর ধার্য করা হয় বলিয়া উহার চাপ দরিদ্রের উপর গিয়া পড়ে অপেক্ষাকৃত অধিক। **দ্বিতীয়তঃ,** সরকারের দিক হইতে দেখিতে গেলে, অপ্রত্যক্ষ কর উদ্ভূত আয় অনিশ্চিত। এই ব্যবস্থায় কর সংগ্রহের খরচ ও অপেক্ষাকৃত অধিক পড়ে। **পরিশেষে,** অপ্রত্যক্ষ কর

ব্যবস্থায় রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে করপ্রদানকারীদের উৎসাহ ও খুব কম থাকে। অপরপক্ষে, যাহারা প্রত্যক্ষ কর দেয়, তাহারা রাষ্ট্রের রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব নিবিড় ভাবে অংশ ও গ্রহণ করিয়া থাকে ও উৎসাহ প্রকাশ করে।

কর ব্যবস্থার ফলাফল (**Effects of Taxation**) : কর ব্যবস্থার ফলাফল অর্থ, উহার পশ্চাদভারের (incidence) সমস্যা নহে। উহার প্রতিক্রিয়া ও পরিণাম কি ভাবে উৎপাদন, ধনবণ্টন ও কর্মনিয়োগ প্রভৃতি প্রভাবান্বিত করে, তাহাই করব্যবস্থার ফলাফল। কর ব্যবস্থার ফলাফল সুবিধা মত তিন ভাগে বিশ্লেষণ করা যায় :—(১) উৎপাদনের উপর ফলাফল (২) ধনবণ্টনের উপর ফলাফল এবং (৩) কর্ম নিযোগের উপর ফলাফল।

উৎপাদনের উপর ফলাফল (**Effects on Production**) : কর ব্যবস্থার ফলাফল উৎপাদনের উপর তিন ভাবে দেখা দিতে পারে।

প্রথমতঃ, কর ব্যবস্থা মানুষের কার্য ও সঞ্চয় ক্ষমতা প্রভাবান্বিত করিয়া উৎপাদনের হ্রাস বা বৃদ্ধি করিতে পারে। যদি মানুষের নিত্যব্যবহার্য অতি, আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর কর স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে মানুষের, বিশেষ করিয়া গরীব শ্রেণীকে, বাধ্য হইয়া অনেক আবশ্যকীয় দ্রব্যের খাদন পরিহার করিতে. হইবে। ফলে, তাহাদের কর্ম প্রগুণতা ক্ষুন্ন হইয়া উৎপাদন ব্যাহত হইবে। যদি প্রান্তিক আয় বিশিষ্ট লোকের উপর সুউচ্চ কর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে তাহাদের সঞ্চয় ক্ষমতাও হ্রাস পাইবে।

দ্বিতীয়তঃ, কর ব্যবস্থা মানুষের কার্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা প্রভাবান্বিত করিয়া উৎপাদন প্রসারণ বা সংকোচন করিতে পারে। যদি কোন কর অল্পমিয়াদী হয়, কিংবা কোন বিপদত্রাণের জন্য (যেমন যুদ্ধকালে) ধার্য করা হয়, তাহা হইলে উহা মানুষের কার্য ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা হ্রাস করে না। মানুষের আয় উপার্জনের প্রচেষ্টা ও ত্যাগ স্বীকারের পরিপ্রেক্ষিতে, তাহার আয়ের চাহিদা যদি অনম্য হয়, তাহা হইলে কর স্থাপন করিলেও মানুষের কার্য ও সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি হ্রাস পায় না। যেমন, যে সকল ব্যক্তিকে বিরাট পরিবার পালন করিতে হয়, কিংবা বৃদ্ধ বয়সের জন্য কিছু সঞ্চয় অবশ্য রাখিতে হয়, তাহাদের আয়ের চাহিদা সাধারণতঃ অনম্য। তাহাদের উপর করের চাপ পড়িলেও, তাহাদের কর্ম ও সঞ্চয়ের ইচ্ছা ক্ষুন্ন হইয়া উৎপাদন ব্যাহত হয় না। কিন্তু, পরিবারবিহীন দায়মুক্ত ব্যক্তির আয়ের চাহিদা সাধারণতঃ নম্য। তাহার উপর কর স্থাপনের ফল এই হইবে যে, তাহার কর্ম ও সঞ্চযের ইচ্ছা কমিয়া উৎপাদন সংকুচিত হইবে।

তৃতীয়তঃ, কর ব্যবস্থা দেশের উৎপাদক সম্পদকে এক কর্মনিয়োগ হইতে অন্য কর্মনিয়োগে, বা একস্থান হইতে স্থানান্তরে বিনিয়োগে সহায়তা করে। যেমন, মদ্যের উপর যদি কর বসান হয়, তাহা হইলে মদ্যখাদন হ্রাস পাইবে এবং মদ্য উৎপাদনে নিয়োজিত উৎপাদক সম্পদ অপর শিল্পে বিনিয়োগের জন্য ধাবিত হইবে। সাধারণতঃ, যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে ক্রম হ্রাসমান আগম বিধির প্রয়োগ, সেই সকল শিল্প দ্রব্যের উপর করস্থাপন করিলে দেশের উৎপাদনের সহায়তা হইবে। কেননা, উৎপাদক সম্পদ তখন লাভজনক বিনিয়োগে ধাবিত হইবে। তবে খাদ্যবস্তু বা অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের বেলায় এই নিয়ম খাটে না। অনেক কর আছে, যাহা উচ্চ হারে স্থাপন করিলে, দেশের উৎপাদক সম্পদ দেশান্তরে চলিয়া যায় ও প্রথমোক্ত দেশের উৎপাদন ব্যাহত হয়। যেমন, কোন দেশে আয়কর যদি উচ্চ হারে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে ঐ দেশ হইতে মূলধন বিদেশে চলিয়া যাইবে; ফলে, ঐ দেশের উৎপাদন সংকুচিত হইবে।

ধনবণ্টনের উপর ফলাফল (Effects on Distribution) : কর ব্যবস্থার ফলাফল দেশের ধনবণ্টনের উপরও দেখা যায়। সরকার যদি আয়কর, মৃত্যুকর প্রভৃতি ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী ধার্য করে, তাহা হইলে ধনিক শ্রেণী অপেক্ষাকৃত অধিক কর কবলিত হইবে, আর গরীব শ্রেণীর উপর করভার অপেক্ষাকৃত লঘু হইবে। ইহাতে সমাজে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আয় বৈষম্য অনেকটা হ্রাস পাইবে। তবে মনে রাখিবে হইবে যে, ক্রমবর্ধমান করের হার যদি খুব উচ্চে ধার্য করা হয়, তাহা হইলে সঞ্চয় হ্রাস পাইয়া উৎপাদন ব্যাহত হইতে পারে। কিন্তু, নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপর যদি কর চাপান হয়, তাহা হইলে উহার ভার নিম্নআয়স্তরের লোকের উপর অপেক্ষাকৃত অধিক পড়িবে এবং ফলে সমাজের আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে।

কর্মনিয়োগের উপর ফলাফল (Effects on Employment) : কর ব্যবস্থার ফলাফল দেশের কর্মনিয়োগের উপর ও দেখা যায়। দেশের কর্ম নিয়োগ নির্ভর করে, একদিকে সমাজের খাদন প্রবণতা, আর একদিকে বিনিয়োগ পরিমাণের উপর।

খাদন প্রবণতা বহু বিষয়ের উপর নির্ভর করে, উহার মধ্যে দেশের আয় বণ্টন অন্যতম। দেশের আয় বণ্টনের বৈষম্য যেখানে কম, সেখানে খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ও কর্মনিয়োগও সম্প্রসারিত হয়। দেশের আয় বণ্টনের বৈষম্য

হ্রাস করিতে আবার ক্রমবর্ধমান করনীতি বিশেষ ভাবে সহায়তা করে। অতএব, করব্যবস্থা যদি ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী ধার্য করা যায়, তাহা হইলে উহা সমাজের আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিয়া খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি করিবে এবং তাহার ফলে কর্মনিয়োগ সম্প্রসারিত হয়। অপর পক্ষে, দেশের কর ব্যবস্থা যদি ধন-বণ্টন বৈষম্যকে বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে উহা খাদন প্রবণতা হ্রাস করিয়া কর্মনিয়োগ সংকোচন করে।

উপযুক্ত কর ব্যবস্থা দ্বারা দেশের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়াও কর্মনিয়োগ সম্প্রসারণ করা যায়। সরকার যদি আয়কর, অতিরিক্ত মুনাফাকর প্রভৃতির হার হ্রাস করিয়া দেয়, কিংবা কিছুকালের জন্য কর একদম মকুব করিয়া দেয়, তাহা হইলে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম নিয়োগ বাড়িতে পারে। তাহা ছাড়া, সরকার যদি কর সংগৃহীত অর্থ আয়-উৎপাদনকারী বিনিয়োগে ব্যবহার করে, তাহা হইলেও দেশের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পাইয়া কর্মনিয়োগ সম্প্রসারিত হইতে পারে।

করভার সহন শক্তি (Taxable Capacity): করভার সহনশক্তি ধারণাটি দ্বারা আমরা স্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারি, কোন্ দেশের লোকের কর বহন করিবার ক্ষমতা কতটা। করভার সহনশক্তি চূড়ান্ত হইতে পারে (Absolute taxable capacity), কিংবা আপেক্ষিক (Relative) হইতে পারে। চূড়ান্ত করভার সহন শক্তির অর্থ, কর ব্যবস্থা দ্বারা দেশের লোক কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া ভোগ না করিয়া, কতটা পরিমাণ কর বহন করিতে সমর্থ। আর আপেক্ষিক করভার সহনশক্তির অর্থ, একই ব্যয়ভার মিটাইতে, দুই বা ততোধিক অঞ্চলের যথাক্রমে যে পরিমাণ কর প্রদান করা উচিত। (Relative taxable capacity means the respective contribution which the two communities should make towards a common expenditure.) যেমন, কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ের জন্য বিভিন্ন রাজসরকারের দেয় করের পরিমাণ।

করভার সহন শক্তি সাধারণতঃ পরিমাপ করা হয়, দেশের মোট উৎপন্ন অর্থ মূল্য হইতে দেশের লোকের জীবন ধারণের মোট খরচ বাদ দিয়া। কিন্তু, এই পদ্ধতি দ্বারা করভার সহনশক্তি পরিমাপ করার অসুবিধা আছে। কেননা, মোট উৎপন্নের অর্থ-মূল্য হইতে জীবনধারণের মোট খরচ বাদ দিয়া যে উদ্বৃত্ত থাকে, তাহার গোটাটাই যদি সরকার কর হিসাবে বাজেয়াপ্ত করে, তাহা হইলে দেশের ভবিষ্যৎ উৎপাদন ব্যাহত হইয়া কর প্রদানের ক্ষমতাও ক্ষুন্ন হইতে পারে। তাহা ছাড়া, বিভিন্ন সমাজে লোকের জীবনধারণের খরচ ও বিভিন্ন হয়—তাহা নির্ধারণ

করা ও সহজ নহে। ড্যঃ ডাল্টন্ চূড়ান্ত করভার সহন শক্তি ধারণাটি একেবারে বর্জন করিবার পক্ষপাতী। তাঁহার মতে, আপেক্ষিক করভার সহনশক্তি ধারণাটীর ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যান ও বোধগম্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা একরূপ অসম্ভব। ইহা বহু বিষয়ের উপর নির্ভরশীল; তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত নির্ধারকগুলি উল্লেখ যোগ্য।

(১) **লোকের জীবনযাত্রার মান:** যে দেশের লোকের জীবনযাত্রার মান উচ্চ, সে দেশের মানুষের কর্ম প্রগুণতা বজায় রাখিবার জন্য, দেশের মোট উৎপন্ন অর্থমূল্য বা জাতীয় আয় হইতে খরচ বাবদ অধিক পরিমাণ বাদ দিতে হয়। ফলে, সে দেশে করভার সহনশক্তি কম হয়।

(২) **দেশের শিল্প সংগঠনের প্রকৃতি:** যে দেশের শিল্প সংগঠন উন্মার্গ-গামী, স্বভাবতঃই সেখানে জাতীয় আয় উচ্চ হইবে এবং করভার সহনশক্তি অধিক হইবে।

(৩) **কর-ব্যবস্থা:** নিত্যব্যবহার্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর অপ্রত্যক্ষ কর ধার্য করিলে, করভার সহনশক্তি হ্রাস পায়। অপরপক্ষে, প্রত্যক্ষ কর দেশের উৎপাদন ব্যাহত না করিয়া সরকারের আয় বৃদ্ধির সহায়তা করে।

(৪) **জাতীয় আয় বণ্টন ব্যবস্থা:** জাতীয় আয় বণ্টনের বৈষম্য যত অধিক হইবে, করভার সহনশক্তি তত বৃদ্ধি পাইবে।

(৫) **লোক সংখ্যা:** দেশের লোক সংখ্যার অনুপাত যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাতের চেয়ে অধিক বাড়ে, তাহা হইলে লোকের মাথাপিছু আয় হ্রাস পাইবে ও করভার সহনশক্তি ও কমিবে।

(৬) **সরকারী ব্যয়:** সরকাব যদি জনসাধারণের কর্ম প্রগুণতা বৃদ্ধির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করে, তাহা হইলে তাহাদের কর প্রদানের ক্ষমতা স্বভাবতঃই বাড়িবে।

(৭) **লোকের মনোস্তাত্ত্বিক অবস্থা:** জাতীয় যুদ্ধের সময় মানুষের মনোবৃত্তি এমন হয় যে, তাহারা উচ্চ হারে কর দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। সেইজন্য এই সময় মানুষের করভার সহনশক্তি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

করনীতি ও মুদ্রাস্ফীতি (Taxation and Inflation): সরকারী আয়ের সাধারণ উৎস কর ব্যবস্থা। যদি কর দ্বারা সরকারী ব্যয়ভার না মেটে, তাহা হইলে ঋণ করিতে হয়। আবার, সরকারী ব্যয় যদি এত অধিক হয় যে, স্বাভাবিক প্রচলিত কর ও ঋণ দ্বারাও উহা সংকুলান না হয়, তাহা হইলে

সরকারকে নূতন মুদ্রা সৃষ্টি করিয়া ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে হয়। মুদ্রাস্ফীতি সরকারী আয়ের চরম উৎস।

অনেকে মনে করেন যে, মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা সরকার যখন আয় সংগ্রহ করিয়া ব্যয়-নির্বাহ করে, তখন দেশের লোককে করভারে জর্জরিত হইতে হয় না। কেননা, মুদ্রাস্ফীতি দ্বারা সরকার এত অর্থআয়ের অধিকারী হয়, যে সাধারণ লোকের ঘাড়ে উচ্চ করভার চাপানের প্রয়োজন হয় না। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতি ছদ্মবেশী কর। (Inflation is a hidden tax.) কর ধার্য করিলে লোকের আয় হ্রাস পায় ও তাহার ফলে, তাহারা পূর্বের চেয়ে কম দ্রব্য ও সেবাকৃত্য ক্রয় করিতে পারে। যখন মুদ্রাস্ফীতি ঘটে, তখনও ফলাফল এইরূপ একই হয়। মুদ্রাস্ফীতির সংগে সংগে দামস্তর বৃদ্ধি পায়। দামস্তরের বৃদ্ধি অর্থই, লোকের অর্থআয়ের কম্‌তি হওয়া। এবং লোকের অর্থআয় হ্রাস পাইলেই, দ্রব্য ও সেবাকৃত্য ক্রয়ের ক্ষমতাও হ্রাস পায়।

কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতি ছদ্মবেশী কর হইলেও, উহাদের উভয়ের চরম ফলাফল কার্যতঃ এক নহে। করব্যবস্থা যদি ক্রমবর্ধমান নীতি অনুযায়ী ধার্য করা হয়, তাহা হইলে কার্যতঃ সুফলই পাওয়া যায়। তাহাতে ধনিক শ্রেণীর অর্থ-আয় কমিতে পারে এবং ফলে, তাহারা কিছু কিছু বিলাস সামগ্রী খাদন সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু, মুদ্রাস্ফীতির দরুণ যখন দামস্তর বৃদ্ধি পায়, তাহার ফলে নিম্নস্তরের লোকদের অর্থ আয় এমন ভাবে হ্রাস পায় যে, তাহারা নিত্যব্যবহার্য, আবশ্যকীয় দ্রব্য পর্যন্ত ক্রয় সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হয়। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতির পরিণাম করনীতির পরিণামের চেয়ে অধিক পীড়াদায়ক। মুদ্রা-স্ফীতির সব চেয়ে নির্মম পরিণাম এই যে, ইহা সমাজে ধনবণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করিতে সহায়তা করিয়া, নিম্ন আয়স্তরের লোকের খাদন সংক্ষেপ ও জীবন-যাত্রার মান অবনত করে।

পরিপূরক কর নীতি (Compensatory Taxation) : কীনস্, হ্যান্‌সেন, লার্নার প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ করনীতিকে শুধু সরকারী আয়ের উৎস স্বরূপ মনে করেন না। উপযুক্তরূপে ধার্য ও নিয়মিত করিলে, ইহা দেশের অর্থব্যবস্থাকে চালু ও চাঙ্গা রাখিতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। সরকারী করনীতির সংকোচন ও প্রসারণ দ্বারা বাণিজ্য-চক্রের তেজী ও মন্দাভাব প্রতিকার করিয়া পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়।

পরিপূরক করনীতির সারমর্ম এই যে, যখন বাণিজ্য-চক্র সমৃদ্ধির উচ্চ-শিখরে, তখন সরকারকে নূতন নূতন কর স্থাপন ও বর্তমান করের হার

বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করিতে হয়। আবার, যখন বাণিজ্য চক্র মন্দা পর্যায়ে, তখন সরকার করভার লাঘব কিংবা কোন কোন কর একেবারে মকুব করিয়া সংকট অবস্থা রোধ করিবে। বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধির সময়ে লোকের হাতে অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা থাকার দরুণ, দামস্তরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। সরকার এই অবস্থায় নূতন নূতন কর ধার্য করিয়া কিংবা করের হার বৃদ্ধি করিয়া, লোকের হাতের অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা টানিয়া লইতে পারে। অপর পক্ষে, যখন আর্থিক মন্দা দেখা দেয় এবং লোকের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাওয়ার ফলে খাদন ও বিনিয়োগ হ্রাস পায়, তখন সরকার করভার হ্রাস করিলে, কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে একেবারে মকুব করিলে, লোকের অর্থ আয় অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইয়া সংকট চরমে পৌঁছিতে পারে না।

তবে মনে রাখিতে হইবে যে, কেবল কর বৃদ্ধি বা নূতন কর স্থাপনেই মুদ্রাস্ফীতি বা বাণিজ্য চক্রের তেজী ভাব প্রতিরোধ করা যায় না; কিংবা, কেবল কর হ্রাস দ্বারাই আর্থিক মন্দা দূর করা যায় না। সরকারী অর্থ-ব্যয় সংক্রান্ত নীতির (fiscal policy) সহিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারিত মুদ্রানীতির ও পূর্ণ সহযোগিতা থাকা দরকার।

কতিপয় কর ও উহাদের বৈশিষ্ট্য (Some Taxes and their Characteristics) : আয়কর (Income Tax) : অধুনা প্রত্যেক দেশের কর ব্যবস্থাতেই আয়কর আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। ইহা একদিকে যেমন সংকোচন-প্রসারণ সাপেক্ষ, অন্যদিকে ইহার হার ব্যক্তিগত আয়ের ভিত্তিতে ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসারে হ্রাস-বৃদ্ধি করা যায়। এই কর ক্রমবর্ধমান নীতির ভিত্তিতে স্থাপন করা যায় বলিয়া, ইহা ধনবণ্টন বৈষম্য হ্রাস করিতে ও সক্ষম। প্রত্যক্ষ কর হিসাবে ইহার আয় উৎপাদকতা যথেষ্ট এবং সংগ্রহ করার খরচ ও অপেক্ষাকৃত স্বল্প। তাহা ছাড়া, ইহাকে পরিপূরক কর হিসাবে ব্যবহার করার ও উপযোগিতা যথেষ্ট আছে। ইহার হার বৃদ্ধি করিয়া মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য রোধ করা যায়, আবার ইহার হার হ্রাস করিয়া আর্থিক মন্দার চরম অবস্থা উপশম করা চলে।

প্রত্যেক দেশেরই আয় কর ব্যবস্থায়, স্বল্প আয়গ্রস্ত ব্যক্তিকে এই করভার হইতে সম্পূর্ণ ভাবে রেহাই দেওয়া হয়। সাধারণতঃ, ইহা প্রত্যক্ষ কর বলিয়া ইহার অর্থভার আয় উপার্জনকারীদেরই ঘাড়ে পড়ে; করভার সহজে অন্যের ঘাড়ে চাপান যায় না।

এই করের হার যদি খুব উচ্চে স্থাপন করা হয়, তাহা হইলে লোকের সঞ্চয় হ্রাস পাইবে। তবে সরকার যদি এই কর উদ্ভূত আয় দ্বারা দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে, আর তাহার ফলে নূতন অর্থআয়ের সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে সেই আয় কর সঞ্চয়ের পরিপন্থী হয় না। এই করের হার বৃদ্ধিতে মুনাফার অংক সংকুচিত হয়, তাহাতে দেশের উৎপাদনের উদ্যম নিরুৎসাহ হইতে পারে। পরিশেষে, আয় কর উচ্চ হারে স্থাপিত হইলে, দেশের মূলধন বিদেশ চলিয়া যাইতে পারে ও দেশের বিনিয়োগ সংকুচিত হইতে পারে।

বিশুদ্ধ আয়করের সহিত অনেক সময় অন্যান্য কর ও সংমিশ্রিত অবস্থায় দেখা যায়। ঐ সকল কর ও আয়ের ভিত্তিতেই ধার্য করা হয়। যেমন, অতিরিক্ত কর (Super tax), কারবারী মুনাফা কর (Business Profits Tax), অতিরিক্ত মুনাফা কর (Excess Profits Tax), যৌথকারবারী কর (Corporation Tax) ও উত্তরাধিকার কর (Inheritance Tax) ইত্যাদি।

মৃত্যু কর (Death Duty) : মালিকের মৃত্যুতে সম্পত্তি যখন উত্তরাধিকারীর হাতে যায়, তখন উহার উপর যে কর স্থাপন ও আদায় করা যায়, উহাকে মৃত্যু ও উত্তরাধিকার কর বলে। অল্প মূল্যের সম্পত্তি এই করের আওতায় পড়ে না। আয়করের ন্যায় এই কর ও ক্রমবর্ধমান নীতির ভিত্তিতে ধার্য করা হয়। করের হার, হয় সম্পত্তির মোট মূল্যের ভিত্তিতে ধার্য করা হয়, নতুবা মৃত মালিক ও সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর মধ্যে আত্মীয়তার দূরত্ব দেখিয়া নির্ধারণ করা হয়। সাধারণতঃ, আত্মীয়তার দূরত্ব যত অধিক হয়, করের হার ও তত অধিক হইবে। করের হার যখন আত্মীয়তার দূরত্ব বুঝিয়া ধার্য করা হয়, তখন উহার পশ্চাদভার সম্পত্তির উত্তরাধিকারীর উপর চাপে। আর করের হ্রাস-বৃদ্ধি যখন সম্পত্তির মোট মূল্য দেখিয়া নির্ধারণ করিতে হয়, তখন করের ভার খানিকটা পড়ে মৃত মালিকের উপর, খানিকটা পড়ে উত্তরাধিকারীর উপর।

আয়করের সহিত তুলনা করিতে গেলে, এই করভার মানুষের সঞ্চয়কে অপেক্ষাকৃত কম হ্রাস করিয়া থাকে। এই কর উদ্ভূত আয় যদি সরকার খরচ করে, তাহা হইলে দেশে বিনিয়োগ বাড়িয়া আয় ও বৃদ্ধি পাইবে। এই আয় বৃদ্ধিতে দেশের সঞ্চয় বাড়িবে বই কমিবে না।

একাধিক কারণে মৃত্যুকর সমর্থন করা যায়। **প্রথমতঃ,** এই কর সামর্থ্যসূত্র অনুযায়ী স্থাপন করা চলে। **দ্বিতীয়তঃ,** এই কর সাধারণতঃ ক্রমবর্ধমান নীতি অনুসারে ধার্য করা হয় বলিয়া ইহা সমাজের ধনবণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিতে

সক্ষম। **তৃতীয়তঃ,** সম্পত্তির মালিকরা যে কর জীবদ্দশায় ফাঁকি দিয়া থাকে, তাহা মৃত্যুর পর মৃত্যুকর হিসাবে আদায় করা যায়। **চতুর্থতঃ,** মৃত্যুকর হইতে সরকার প্রচুর আয় সংগ্রহ করিয়া, উহা দ্বারা ব্যয়-বহুল নির্মাণ কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারে। **পরিশেষে,** দেশের সামগ্রিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিতে ও মৃত্যুকর সহায়তা করে। এই করের মারফৎ দেশের ধনবণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে সমাজের খাদন প্রবণতা বৃদ্ধি পায়—এবং খাদন প্রবণতার বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মৃত্যুকরের সমর্থন যুক্তি

আমদানী-রপ্তানী শুল্ক (**Import and Export Duties**)**:** দেশের আমদানী ও রপ্তানী দ্রব্যের উপর যে সকল কর আদায় করা হয়, উহাদিগকে যথাক্রমে আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক বলা হয়। এই সকল শুল্ক মূল্যানুযায়ী (ad valorem) ধার্য হইতে পারে, কিংবা দ্রব্য ওজন অনুসারে (specific) ধার্য করা যাইতে পারে। আমদানী শুল্কের পশ্চাদভার সাধারণতঃ যে দেশে দ্রব্য আমদানী করা হয়, সেই দেশের খাদক শ্রেণীর উপর পড়ে। কিন্তু, আমদানী দ্রব্যের চাহিদা যদি নম্য হয় এবং ঐ সকল দ্রব্যের যোগান বিদেশে অনম্য হয়, এবং দ্রব্য বিক্রয় করিবার আর বিকল্প বাজার না থাকে, তাহা হইলে আমদানী শুল্কের ভার কিছুটা দ্রব্যের উৎপাদক শ্রেণীর উপর পড়িবে। কিন্তু, রপ্তানী করের পশ্চাদভার রপ্তানীকারীদের নিজের ঘাড়ে চাপে ; কেননা, তাহারা রপ্তানী দ্রব্যের দর বাড়াইয়া আন্তর্জাতিক বাজারের দর নির্ধারণ করিতে পারে না। তবে রপ্তানীকারী যদি একচেটিয়া কারবারী হয়, এবং বিদেশে রপ্তানী দ্রব্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে রপ্তানী শুল্কের চাপ খানিকটা বিদেশী খাদক শ্রেণীর উপর পড়িবে।

আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক, দুইই অতিশয় আয় উৎপাদক ও সংকোচন-প্রসারণ সাপেক্ষ কর। এই দুইটি কর ধার্য করার উদ্দেশ্য শুধু সরকারী আয় বৃদ্ধি নহে, দেশের শিশু শিল্প সংরক্ষণের জন্য ও ইহারা স্থাপিত হয়।

বিক্রয় কর (**Sales Tax**)**:** অধুনা সরকারী আয়ের আর একটি অন্যতম প্রধান উৎস বিক্রয় কর। বিক্রয় কর খাদন-কর। সেই হিসাবে ইহার চাপ খাদক শ্রেণীর উপর পড়ে। বিক্রয় কর যদি নিত্য ব্যবহার্য, আবশ্যকীয় দ্রব্যের উপর স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে এই করের চাপ অধিক পড়িবে দরিদ্র শ্রেণীর উপর। এই কর সমাজের ধনবন্টন বৈষম্য বৃদ্ধি করে। যদি

দ্রব্যের চাহিদা অনম্য হয়, তাহা হইলে এই করের গোটা পশ্চাদভার খাদক শ্রেণীর উপর চাপে। কিন্তু দ্রব্যের চাহিদা যদি নম্য হয়, তাহা হইলে করের চাপ কিছুটা পড়িবে বিক্রয়কারীদের উপর, আর কিছুটা পড়িবে খাদক শ্রেণীর উপর।

অধ্যাপক টেলর (Taylor) বিক্রয় করের সমর্থনে একাধিক যুক্তি নির্দেশ করিয়াছেন। **প্রথমতঃ,** আয়করের চেয়ে বিক্রয় কর হইতে গৃহীত আয়ের স্থিতিস্থাপকতা অধিক। ইহার কারণ এই যে, মানুষের আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধি যেমন আত্যন্তিক, মানুষের খাদন স্তর মোটামুটি স্থিতিশীল। বিক্রয় কর মানুষের স্থিতিশীল খাদন স্তরের উপর ধার্য হয় বলিয়া ইহার আয় মোটামুটি স্থিতিশীল। **দ্বিতীয়তঃ,** বিক্রয় কর আদায় করিবার খরচ ও অপেক্ষাকৃত অল্প। **তৃতীয়তঃ,** এই কর ধার্য করিবার অল্প সময়ের মধ্যেই ইহা হইতে আয় উদ্ভূত হয়। **চতুর্থতঃ,** অনেক সময় মানুষের ক্রয় ক্ষমতার আধিক্য ও দ্রব্য যোগান দুষ্প্রাপ্যতা হেতু, নিয়ন্ত্রণ দ্বারা খাদন হ্রাস করা প্রযোজন হয় (যেমন, যুদ্ধের সময়)। তখন বিক্রয় কর ধার্য করিলে, দামস্তর বৃদ্ধি পাইবে ও খাদন সংকোচন সম্ভব হইবে। কিন্তু এই যুক্তির সারবত্তা সম্পর্কে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। **পরিশেষে,** পরিপূরক কর হিসাবে ও বিক্রয় করের অনেক উপযোগিতা আছে। বাণিজ্য চক্রের তেজী অবস্থা আয়ত্তে আনিতে ও মুদ্রাস্ফীতির প্রাবল্য হ্রাস করিতেও বিক্রয় কর সহায়তা করিয়া থাকে।

বিক্রয় করের সমর্থনে যুক্তি

তবে এই করের প্রধান গলদ এই যে, খাদন কর হিসাবে ইহার চাপ অধিক পড়ে নিম্ন আয়স্তরের লোকের উপর। ফলে, ইহা দেশের ধন-বণ্টন ব্যবস্থার বৈষম্য অধিকতর বৃদ্ধি করে।

অনুশীলনী

1. Enunciate the principles that should guide the system of taxation. (C.U. B.A. '54)
2. What are taxes ? Discuss the principles that underlie the system of modern taxation. (C.U. B.A. '53)
3. Examine the limitations of raising revenue by indirect taxes, (C.U. B.A. '52)

4. How would you justify the principle of progressive taxation ? (C.U. B. Com. '55)
5. On what grounds can you justify the principle of progressive taxation ? (C.U. B.Com. '53)
6. Write short notes on : (a) Incidence of a tax, (b) Taxable capacity. (C.U. B.A. '56)
7. Discuss the economic effects of income tax and sales tax.
8. Write a note on 'compensatory taxation.'

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

জাতীয় বা সরকারী ঋণ (Public Debts)

সরকারী আয়ের আর একটি উৎস জাতীয় ঋণ। জনসাধারণের হইয়া সরকার ঋণ গ্রহণ করে বলিয়া, ইহাকে জাতীয় ঋণ বলা হয়। বে-সরকারী ব্যক্তিগত ঋণের সহিত জাতীয় ঋণের পার্থক্য আছে। বে-সরকারী ব্যক্তিগত ঋণ, দাতার উপর জোর করিয়া গ্রহণ করা চলে না—কিন্তু সরকার চাপ দিয়া নাগরিকদের নিকট হইতে জাতীয় ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ঋণ নির্দিষ্ট সময়-মিয়াদী ; কিন্তু, জাতীয় ঋণ সাধারণতঃ অনির্দিষ্টকাল মিয়াদী। তৃতীয়তঃ, ব্যক্তিগত ঋণ গ্রহণের উৎস সীমিত, ব্যক্তি কেবল বাহ্যিক ঋণ গ্রহণ করিতে পারে ; সরকার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক (internal and external), দুই রকম ঋণই গ্রহণ করে।

জাতীয় ঋণের বিভিন্ন আকার (Forms of Public Debts) : শ্রীমতী হিকস্ জাতীয় ঋণের তিন রকম শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। (১) **স্থিতি সাম্যভার ঋণ** (dead-weight debt)। (২) **নিষ্ক্রিয় ঋণ** (passive debt) ও (৩) **সক্রিয় ঋণ** (active debt)। স্থিতি সাম্যভার ঋণ গ্রহণ করা হয় সরকারের সেই সকল ব্যয়ভার মিটাইবার জন্য, যাহা দ্বারা দেশের উৎপাদক শক্তি আদৌ বৃদ্ধি পায় না ; যেমন, যুদ্ধ ঋণ। নিষ্ক্রিয় ঋণ গ্রহণ করা হয় সেই সকল

বিনিয়োগের জন্য, যাহা হইতে উপযোগ লাভ হয় বটে; কিন্তু অর্থআয় অর্জন করা যায় না। সক্রিয়. ঋণ সেই সকল বিনিয়োগের জন্য গ্রহণ করা হয়, যাহা হইতে সরকারের অর্থআয় লাভ হইয়া থাকে।

আডম্ স্মিত জাতীয় ঋণকে **স্থায়ী** (funded) ও **স্বল্পমেয়াদী** (floating), এই দুইভাগে ভাগ করিয়াছেন। স্থায়ী ঋণ দীর্ঘ মিয়াদ ব্যবধানে পরিশোধ করা হয়; আর স্বল্প মিয়াদী ঋণ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যেই পরিশোধ করা হয়। স্থায়ী ঋণের বেলায় ঋণের মূল টাকা পরিশোধের কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না; শুধু সুদ প্রদানের বাধ্যবাধকতা থাকে। কিন্তু, স্বল্পমিয়াদী ঋণের বেলায় মূল টাকা নির্দিষ্ট তারিখে অবশ্য পরিশোধ করিতে হয়।

সরকারী ঋণকে **আন্তঃঋণ** (internal) ও **বহিঃঋণ** (external), এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায়। আন্তঃ বা আভ্যন্তরীণ ঋণ সরকার গ্রহণ করে নিজ দেশের নাগরিকদের নিকট হইতে। বহিঃ ঋণ গ্রহণ করা হয় বিদেশ হইতে।

ঋণ গ্রহণের সঙ্গত উদ্দেশ্য (Legitimate Purposes of Loans) : অধুনা সরকারের বহুবিধ ব্যয় কার্য নির্বাহ করিতে হয়। কতকগুলি আবশ্যক কাজের জন্য সরকারকে নিয়মিত ব্যয় করিতে হয়; ইহাকে **স্বাভাবিক আবর্তক ব্যয়** (normal recurring expenses) বলে। এই ব্যয়ের পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ব হইতেই অনুমান করা যায় ও ইহা নিয়মিতভাবে মিটাইতে হয়। এই স্বাভাবিক আবর্তক ব্যয়, সরকার স্বাভাবিক আয় হইতে মিটাইয়া থাকে। স্বাভাবিক আবর্তক ব্যয় মিটাইতে সরকারের ঋণ গ্রহণ করা সমীচীন নহে।

তবে স্বাভাবিক আবর্তক ব্যয়ের আধিক্য হেতু, উহা যদি সাময়িকভাবে স্বাভাবিক আয় হইতে মিটানো সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ঐ সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারের ঋণ গ্রহণ সমর্থন যোগ্য। সরকারের আয় যদি বিভিন্ন উৎস হইতে সময়মত যথারীতি আদায় না হয়, তাহা হইলেই সাময়িকভাবে উহার বাজেট ঘাটতি হইতে পারে। এই সাময়িক ঘাটতি পূরণের জন্য সরকারী ঋণ গ্রহণ সমর্থন করা চলে।

রাষ্ট্রের সাময়িক ঘাটতি মিটানো

দ্বিতীয়তঃ, সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয় বরাদ্দ কার্যতঃ সঠিক নাও হইতে পারে। অনুমিত আয়ের পরিমাণ বাস্তব উপার্জন বা প্রকৃত আয় হইতে

কম হইতে পারে। কিংবা, বাস্তব ব্যয়ভার অনুমিত ব্যয়ের চেয়ে অধিক হইতে পারে। এইরূপ বাস্তব আয়ের হ্রাস, কিংবা ব্যয়ের আধিক্য, সরকার কর হার বৃদ্ধি করিয়া, কিংবা নূতন করভার চাপাইয়া পূরণ করিতে পারে না। এইরূপ ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষে স্বল্প মিয়াদী ঋণ গ্রহণ করা বিধেয়।

অনুমিত আয়-ব্যয় বরাদ্দ ও বাস্তব আয়-ব্যয়ের বৈষম্য দূরীকরণ

তৃতীয়তঃ, অনেক অস্বাভাবিক অবস্থাতে, স্বাভাবিক বরাদ্দ ব্যয়ের চেয়ে সরকারকে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে হয়। এই অস্বাভাবিক ব্যয় সরকারের স্বাভাবিক আয় হইতে মিটানো সম্ভব হয় না। যেমন, দেশ যখন বাণিজ্য-চক্রের মন্দা পর্যায়ে বিপর্যস্ত, তখন সরকারী ব্যয় অস্বাভাবিক রূপে বৃদ্ধি দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও সমাজের মোট ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে হয়। সরকারী এই পরিপূরক ব্যয় (compensatory spending) স্বাভাবিক আয় বা কর দ্বারা মিটানো সম্ভব নয়। এই অবস্থাতে সরকারকে ঘাট্‌তি ব্যয় করিতে হয়। এই ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ গ্রহণ করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

বাণিজ্য-চক্রের মন্দা অবস্থা প্রতিরোধ ব্যবস্থা

চতুর্থতঃ, সরকারের অনেক বিপদকাল আসিতে পারে, যখন সত্বর অর্থ-ব্যয়ের প্রয়োজন হয়। কিন্তু, কর হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতে বেশ কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়। এই অবস্থাতেও সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত। যুদ্ধকালে সরকারী ব্যয় যখন বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন ঋণ গ্রহণ ছাড়া সরকারের পক্ষে ঐ বহুল ব্যয়ভার মিটানো অসম্ভব। এই অবস্থায় করভার অধিক চাপাইলে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হইতে পারে। অনেকে অবশ্য বলেন যে, যুদ্ধব্যয় কর বৃদ্ধি দ্বারা মিটানোই অধিক সমীচীন ; কেননা, যুদ্ধের সময় জনসাধারণের দেশপ্রীতি অধিক জাগরিত হয় বলিয়া, তাহারা বর্দ্ধিত হারে কর প্রদান করিতে রাজী হয়। তাহাছাড়া, ঋণ গ্রহণ দ্বারা যুদ্ধ ব্যয় মিটাইতে গেলে মুদ্রাস্ফীতি ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

বিপদকালের অস্বাভাবিক ব্যয়ভার বহন

পঞ্চমতঃ, সমাজ কল্যাণধর্মী, উন্মার্গগামী অর্থ-নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্মাণ কার্য নির্বাহ করিতে সরকারের যে অর্থ খরচ (capital outlay) হয়, তাহার জন্যও ঋণ গ্রহণ করা যুক্তিসংগত। এই ধরণের খরচ এত অধিক যে, উহা সরকারী সাধারণ আয় দ্বারা মিটানো সম্ভব নয়। অথচ এই ধরণের ব্যয় উৎপাদনধর্মী—যে সকল উন্নয়ন কার্যের বাবদ এই ধরণের ব্যয় নির্বাহ করা হয়, সেইগুলি

উন্মার্গগামী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও নির্মাণ কার্য নির্বাহ

হইতে অল্পকাল মধ্যেই সরকারের আয় লাভ হইতে সুরু হয়। এই আয় দ্বারাই সরকার অর্থ পুঁজি খরচ বাবদ কৃতঋণের সুদ ও আসল টাকা পরিশোধ করিতে পারে। যেমন, দেশের মধ্যে পরিবহন শিল্প নির্মাণ, নদী-উপত্যকা পরিকল্পনা গ্রহণ প্রভৃতি উন্নয়ন কার্য নির্বাহ করিলে, উহারা কিছু কালের মধ্যে সরকারী আয়ের উৎস হইবে। এই ধরণের কার্য নির্বাহের জন্য প্রচুর অর্থ পুঁজি খরচ প্রয়োজন, যাহা ঋণ গ্রহণ ছাড়া সংগ্রহ করা সম্ভব নহে। এইরূপ উন্মার্গগামী উৎপাদন কার্যের সুফল শুধু বর্তমান দেশবাসীই অর্জন করে না, ভবিষ্যৎ দেশবাসী ও লাভ করিয়া থাকে। এই ধরণের কার্যের জন্য ঋণ গ্রহণ করিবার আর একটি সঙ্গত কারণ এই যে, ঋণের ভার ভবিষ্যৎ দেশবাসী ও খানিকটা বহন করিতে পারে।

ষষ্ঠতঃ, সরকারকে আর ও কতকগুলি খাতে ব্যয় কার্য করিতে হয়, যাহার সুফল অল্পকালের মধ্যে প্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায় না। অথচ এই সকল খাতে ব্যয় দ্বারা যে কার্য-কৃত্য সরকার সরবরাহ করে, তাহা কর্ম প্রগুণতা বৃদ্ধি করিয়া দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির সহায়তা করে। যেমন, জনস্বাস্থ্যরক্ষা, শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতির বাবদ ব্যয়। এইরূপ ব্যয়-ভার নির্বাহ করিতে ও সরকারের ঋণ গ্রহণ করা যুক্তসঙ্গত।

দেশের কর্ম প্রগুণতা ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি

পরিশেষে, কীনস্ প্রমুখ আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ দেশে পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিবার সহায়ক হিসাবে সরকারী ঋণ গ্রহণের যৌক্তিকতা সমর্থন করেন। দেশের কর্মনিয়োগ নির্ভর করে, কার্যকরী চাহিদার (effective demand) উপর। কার্যকরী চাহিদা নির্ভর করে, দেশের মোট ব্যয়ের উপর। সাধারণতঃ, বাণিজ্য চক্রের মন্দাবস্থায় সমাজের খাদন ব্যয় ও বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ব্যয় আত্যন্তিক ভাবে হ্রাস পায়। ফলে, কর্ম সংস্থান ও সংকুচিত হয়। এই অবস্থার প্রতিকার করিয়া, পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠার পথে চলিতে হইলে, পরিপূরক ব্যয় নির্বাহ দ্বারা সরকারী বিনিয়োগ সম্প্রসারণ করিতে হয়। এই পরিপূরক ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য ও সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা ন্যায় সঙ্গত ও আবশ্যক।

পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ প্রতিষ্ঠা

সরকারী ঋণের বোঝা (Burden of Public Debts): সরকার ঋণ গ্রহণ করিলে তাহার বোঝা অনিবার্য ভাবে গোটা দেশের উপরে আসিয়া পড়ে। ঋণের সুদ ও আসল পরিশোধ করিবার দায় দেশের আর্থিক ও সামাজিক জীবনের উপর কতকগুলি অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ও পরিণামের সৃষ্টি করে। এই সকল প্রতিক্রিয়া ও পরিণামের পরিমাপই জাতীয় ঋণের বোঝা। এই বোঝা আভ্যন্তরীণ

ও বাহ্যিক, দুই প্রকার ঋণ করিলেই বহন করিতে হয়। তবে আভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা ও বাহ্যিক ঋণের বোঝার মধ্যে গুণানুসার (qualitative) পার্থক্য আছে।

সরকার যখন আভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণ করে, (অর্থাৎ দেশের মধ্যে নাগরিকদের নিকট হইতে ঋণ করে) তখন সেই ঋণের বাবদ যে আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ করিতে হয়, তাহাতে ক্রয় ক্ষমতা দেশের মধ্যেই একশ্রেণী লোকের হাত হইতে অন্য শ্রেণীর হাতে চলিয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের দরুণ, সামগ্রিক ভাবে দেশের ক্রয় ক্ষমতার কোনই কম্‌তি হয় না, কিংবা বৈদেশিক ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য যেমন দেশের রপ্তানীর পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহার ও কোন প্রয়োজন হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া, আভ্যন্তরীণ ঋণের যে একেবারে কোনই বোঝা নাই, তাহা সত্য নহে। সরকার সাধারণতঃ দেশের ধনিক শ্রেণীর নিকট কর্জ পত্র বিক্রয় করিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সরকার যদি জনসাধারণের উপর কর স্থাপন করে, তাহা হইলেই সরকারী ঋণের বোঝা গোটা সমাজের উপর পড়িবে। কেননা, সরকারী ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য সমাজের সকলকেই কর প্রদান করিতে হইবে; অথচ ঐ কর হইতে যে অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহা কতিপয় ধনিক নাগরিক সরকারী ঋণ পত্রের আয় স্বরূপ সুদ হিসাবে অর্জন করিবে। ইহাতে সমাজের মধ্যে ধনবণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে। ইহাই আভ্যন্তরীণ ঋণের প্রকৃত বোঝা। তবে ঋণের এই বোঝা অনেকটা লঘু হইতে পারে, যদি সরকারী ঋণপত্র গ্রহীতারা সরকারের নিকট হইতে ঐ ঋণ পত্রের পাওনা আয় লাভ করিয়া, উহা উৎপাদনে বিনিয়োগ করে ও দেশের কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি করে।

আভ্যন্তরীণ ঋণের বোঝা

অপরপক্ষে, বাহ্যিক ঋণ পরিশোধের দ্বারা দেশের জাতীয় আয়ের সংকোচন হয়। বাহ্যিক ঋণের সুদ ও আসল বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিতে হয়, সেই পরিমাণে অধমর্ণ দেশের অর্থ ব্যবস্থা পঙ্গু হইয়া থাকে। বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের জন্য দেশের দ্রব্য ও কৃত্য রপ্তানী বৃদ্ধি আবশ্যক হয়, এবং যে পরিমাণে দ্রব্য ও কৃত্য রপ্তানী প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণে দেশকে দারিদ্র্য বরণ করিতে হয়। বহুল পরিমাণ দ্রব্য ও কৃত্য রপ্তানী করিতে হয় বলিয়া, দেশের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস হয়। দ্বিতীয়তঃ, ঋণ পরিশোধ বাবদ দ্রব্য ও কৃত্য রপ্তানী করিতে হয়

বাহ্যিক ঋণের বোঝা

বলিয়া, উন্নয়ন ও সংগঠন কার্যের বাবদ সরকারী ব্যয় ঐ দেশে বিশেষ সংক্ষেপ করিতে হয়।

বাহ্যিক ঋণের প্রকৃত প্রত্যক্ষ বোঝা অবশ্য নির্ভর করে, ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যে কর ব্যবস্থা ধার্য করা হয়, তাহার উপর। সরকার যদি করব্যবস্থা এমন ভাবে ধার্য করে যে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে উহা সুবণ্টিত হয়, অর্থাৎ করভারের মোটা চাপ ধনিকশ্রেণীর উপর পড়ে, তাহা হইলে বাহ্যিক ঋণের প্রকৃত বোঝা লঘু হইবে।

সরকারী ঋণের অর্থনৈতিক ফলাফল (Economic Effects of Public Debts): সরকারী ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ প্রক্রিয়ার বহুবিধ ফলাফল লক্ষ্য করা যায়। **প্রথমতঃ,** সরকারী ঋণ গ্রহণে দেশের মুদ্রা যোগান প্রভাবান্বিত হয়। সরকার যদি ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ করে, তাহা হইলে ব্যাংক ঐ সরকারী কর্জ পত্রের জোরে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঐ কর্জপত্রকে সংরক্ষণ রাখিয়া কাগজীমুদ্রার প্রচার বৃদ্ধি করিতে পারে। সরকারী ঋণ গ্রহণের ফলে মুদ্রাস্ফীতির উদ্ভব ও দামস্তর বৃদ্ধি সহজ হইতে পারে। আবার, সরকার যদি ব্যক্তি বিশেষের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে দেশে মুদ্রাসংকোচন ও ঘটিতে পারে। কেননা, ঋণপত্র ক্রয়ের ফলে ব্যক্তিগত অর্থ আয় হ্রাস পায় ও খাদন ব্যয় সংকুচিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় দামস্তর ও হ্রাস পায়। **দ্বিতীয়তঃ,** সরকারী ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়া সুদের হার ও প্রভাবান্বিত করিতে পারে। কেননা, দাদন বাজারে সরকারই অন্যতম প্রধান ঋণ গ্রহীতা। **তৃতীয়তঃ,** সরকারী ঋণ গ্রহণ ও ঋণ পরিশোধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের উৎপাদক সম্পদ বিনিয়োগের অদল বদল হয়। সরকার সংগৃহীত ঋণের অর্থ জনকল্যাণকামী সেবা ও আর্থিক উন্নয়ন কার্যে বিনিয়োগ করিতে পারে। **পরিশেষে,** সরকারী ঋণ নীতির প্রভাব দেশের আয় বণ্টনের উপর ও দেখা যায়। সরকারী ঋণ পত্র যদি দেশের কতিপয় ধনী ব্যক্তি ক্রয় করে, আর ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যদি সরকার সর্বসাধারণের উপর কর স্থাপন করে, তাহা হইলে দেশের ধন-বণ্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পাইবে। তবে ঋণ সংগৃহীত অর্থ সরকার যদি এমন সকল সেবাকার্যে ব্যয় করে, যাহার সুযোগ সুবিধা কেবলমাত্র নিম্নআয়স্তরের ব্যক্তিগণই লাভ করে, তাহা হইলে সমাজে আয়ের বৈষম্য হ্রাস পাইতে পারে।

ঋণ পরিশোধের উপায় (Methods of Debt Repayment or Redemption): ঋণ পরিশোধের জন্য সরকার বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিতে পারে।

অস্বীকৃতি দ্বারা (repudiation) সরকার ঋণের বোঝা লাঘব করিতে পারে। এই অস্বীকৃতির অর্থ, গৃহীত ঋণের আসল টাকা ও সুদ পরিশোধ সরকার একদম বন্ধ করে। কিন্তু ঋণ পরিশোধের ইহা ন্যায় সংগত পদ্ধতি নহে; কেননা, অস্বীকৃতির অর্থ, ঋণ গ্রহীতার এক তরফা চুক্তি ভঙ্গ। তাহাছাড়া, কোন সরকার যদি এই পদ্ধতি দ্বারা ঋণের বোঝা লাঘব করে, তাহা হইলে সরকারের পক্ষে ভবিষ্যতে ঋণ পাওয়াও অসুবিধা হইবে; কেননা, সরকারের উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট হইয়া যাইবে।

অস্বীকৃতি
(Repudiation)

দ্বিতীয়তঃ, মুদ্রাস্ফীতির দ্বারাও সরকারী ঋণের ভার লঘু করা যায়। কিন্তু এই পদ্ধতি দেশে ধনবণ্টনের বৈষম্য বৃদ্ধি করিয়া অর্থ-ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করিয়া থাকে।

মুদ্রাস্ফীতি

তৃতীয়তঃ, সরকারী ঋণের ভার লাঘব করিবার আর একটি উপায় হইল, কর্জ রূপান্তর (conversion) প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার তাৎপর্য হইল, অপেক্ষাকৃত উচ্চ সুদ বিশিষ্ট ঋণকে অপেক্ষাকৃত অল্প সুদ বিশিষ্ট ঋণে পরিবর্তন করা। সরকার যখন ঋণ গ্রহণ করে, তখন দামস্তর সাধারণতঃ উচ্চ থাকে ও সেই জন্য সুদের হারও উচ্চ থাকে। কিন্তু, স্বাভাবিক সময়ে যখন সুদের হার অল্প হয়, সরকার তখন অল্প হারে আবার ঋণ গ্রহণ করিয়া পুরাণ ঋণভার লঘু করিয়া দিতে পারে। সরকার অল্প সুদ বিশিষ্ট সিকিউরিটি পত্র অতি সহজেই বিক্রয় করিয়া, সেই অর্থ দ্বারা পুরাণ ঋণের বোঝা হাল্কা করিতে পারে।

কর্জ রূপান্তর
(Conversion of loans)

তবে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, কর্জ রূপান্তর প্রক্রিয়া দ্বারা কেবল বার্ষিক সুদের পরিমাণই হ্রাস করা সম্ভব, ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করা সম্ভব হয় না। তাহাছাড়া, এই প্রক্রিয়া দ্বারা সুদেব পরিমাণ হ্রাস করার আর একটি গলদ এই যে, ইহাতে সরকারী ঋণপত্র গ্রহীতাদের অর্থ আয় হ্রাস পায় এবং সেই কারণে সরকারও আয়ের দিক হইতে লোকসান গ্রস্থ হয়।

চতুর্থতঃ, সরকারী ঋণের ভার নিয়মিত লাঘব করিবার আর একটি উপায়, কর্জ শোধ তহবিল (sinking fund) গঠন ও উহার কার্য ব্যবস্থা চালু রাখা। এই কর্জ শোধ তহবিল গঠন করা হয়, প্রতি বৎসর সরকারী রাজস্ব হইতে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পৃথকভাবে গ্রহণ করিয়া। গোড়াতে এই

তহবিল ঋণের মিয়াদ অবধি বৃদ্ধি পাইত, এবং মিয়াদ পুর্ত্তি হইলে ঐ মোট তহবিল ঋণের আসল টাকা পরিশোধ করিতে ব্যয় করা হইত। কিন্তু, অধুনা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় কর্জ শোধ তহবিল দ্বারা ঋণের বোঝা লাঘব করা হইয়া থাকে। তহবিলের কিছুটা পরিমাণ অর্থ দ্বারা প্রত্যেক বৎসর ঋণের আসল টাকা শোধ করা হয়। ইহাতে ঋণের আসল টাকার পরিমাণ প্রতি বৎসরই ক্রমাগত হ্রাস পাইতে থাকে এবং তাহার সংগে যথাক্রমে ঋণের বাবদ দেয় সুদের পরিমাণও হ্রাস হইতে থাকে। ফলে, ক্রমাগত অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণ অর্থ ঋণের ভার লাঘব করিতে ব্যয় করা চলে।

কর্জ শোধ তহবিল
(Sinking fund)

তবে অনেক সময় এই পদ্ধতির অপব্যবহার করা হইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া সরকারের স্বাভাবিক রাজস্ব যদি স্বল্প হয়, তাহা হইলে কর্জ শোধ তহবিলের উপর অস্বাভাবিক চাপ পড়ে। তাহা ছাড়া, যে দেশ অত্যধিক করভারে পীড়িত, সে দেশে এই পদ্ধতি দ্বারা ঋণভার লাঘব করার সম্ভাবনা খুবই কম।

পরিশেষে, সত্বর ঋণভার লাঘব করিবার আর একটি অস্বাভাবিক উপায় হইল সম্পত্তি-কর (capital levy) আদায় করা। এই কর মানুষের সাধারণ উপার্জনের উপর ধার্য করা হয় না। ইহা স্থাপন করা হয়, মানুষের পুঁজি বা সম্পত্তির উপর। যে সকল পুঁজি বা সম্পত্তি মানুষ যুদ্ধ বা উচ্চ দামস্তরের সুযোগ লইয়া অর্জন করে, যুদ্ধ বিরতির পর সেই সম্পত্তির উপর কর ধার্য করা যুক্তিযুক্ত। এই কর ব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সুবিধা এই যে, এই খাতে সরকারী আয় একযোগে অনেক সংগ্রহ করা যায় এবং ফলে, তাহাদ্বারা একযোগে দ্রুত ঋণ পরিশোধও সম্ভব হয়। এই কর ধার্য করিলে, ঋণ পরিশোধের জন্য প্রতি বৎসরের স্বাভাবিক আয় উদ্বৃত অর্থ সরকারকে ব্যয় করিতে হয় না। তাহাছাড়া, সরকার যখন যুদ্ধকালীন ঋণ গ্রহণ করে, তখন দামস্তর উচ্চ থাকে। যুদ্ধোত্তর কালে যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসে ও দামস্তর হ্রাস পায়, তখন ঐ ঋণের বোঝা আরও ভারী হয়। সম্পত্তি-কর দ্বারা দ্রুত ঋণের ভার শোধ করা যায় বলিয়া ঋণের বোঝা সহজেই লঘু হয়। পরন্তু, সম্পত্তি-কর সমাজের ধন-বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিতে ও বিশেষ সহায়তা করে।

সম্পত্তি-কর
(Capital levy)

তবে সম্পত্তি-কর দ্বারা ঋণের ভার লাঘব করিবার অসুবিধা ও গলদ আছে। প্রথম ও প্রধানতম বাস্তব অসুবিধা হইল, সঠিকভাবে করের ভিত্তি নির্ধারণ করা

সম্পর্কে। **দ্বিতীয়তঃ,** সরকারী ঋণ হইল জাতীয় ঋণ ; উহার বোঝা দেশের সকল লোককেই বহন করিতে হয়। শুধু একমাত্র যাহারা সম্পত্তির অধিকারী, তাহাদের উপর ঋণ পরিশোধের বোঝা চাপান ন্যায় সঙ্গত নহে। **তৃতীয়তঃ,** এই কর ব্যবস্থায়, যাহারা ব্যয় সম্পর্কে মিতাচারী, তাহাদেরই অধিক ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়। যাহারা কায়ক্লেশে জীবন ধারণ করিয়া সঞ্চয় করে ও সম্পত্তির অধিকারী হয়, তাহাদের উপরই বোঝা পড়ে অধিক। অনেকে এমনও মনে করেন যে, এই কর ধার্য করার ফলে, দেশের সঞ্চয়, উৎপাদন, ব্যবসায়, বাণিজ্য, কর্মনিয়োগ প্রভৃতি ব্যাহত হইয়া থাকে। সুতরাং, কেবলমাত্র বিশেষ অবস্থাতেই সম্পত্তি-কর ধার্য করিয়া জাতীয় ঋণের বোঝা লাঘব করা সংগত। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে যখন অর্থ-নৈতিক অবস্থা তেজী ভাবাপন্ন থাকে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও পুঁজির পরিমাণও বৃদ্ধি পায়, সেই অনুকূল মনোস্তাত্ত্বিক আবহাওয়ায় এই প্রক্রিয়া দ্বারা জাতীয় ঋণের বোঝা লাঘব করা ফলযুক্ত হয়।

সম্পত্তি-কর দ্বারা ঋণ-ভার লাঘব করিবার অসুবিধা

অনুশীলনী

1. What are Public Debts? How do they affect our economic life? (C.U. B.A. '53)
2. What are Public Debts? Discuss the ways in which their burden can be diminished? (C.U. B.A. '51)
3. Discuss the purposes for which public debts may be legitimately incurred by the government. (C.U. B. Com. '54, '56)
4. Distinguish between the burden of an internal and external loan.

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়

আয়-ব্যয় বরাদ্দ (Budget)

দেশের আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ জাতীয় স্থিতিপত্র (balance sheet) বিশেষ। এই স্থিতিপত্রে, একদিকে যেমন প্রাক্তন আর্থিক বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব বা বিবরণ পাওয়া যায়, অপর দিকে তেমনি পরবর্তী বৎসরের সম্ভাব্য ব্যয় এবং প্রস্তাবিত কর ও ঋণের অনুমানিক ইংগিত বা নির্দেশও থাকে।

যদি কোন্ বৎসরে সরকারী আয় সরকারী ব্যয়ের চেয়ে কম বা বেশী না হয়, তাহা হইলে দেশের আয়-ব্যয় বরাদ্দ সমান (balanced budget) হইয়াছে বলা হয়। আবার, যদি আয় ব্যয়ের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে উদ্‌বৃত্ত (surplus budget) বাজেট্ এবং যদি ব্যয় আয়ের চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে ঘাট্‌তি বাজেট (deficit budget) হইয়াছে বলা হয়।

গতানুগতিক আয়-ব্যয়ের তত্ত্ব অনুযায়ী, ঘাটতি বাজেট ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় নহে। দেশের আয়-ব্যয়ের ববাদ্দ সমান হয়, কিংবা আয় ব্যয়ের চেয়ে উদ্‌বৃত্ত হয়, ইহাই অভিপ্রেত।

কিন্তু কীনস্ এবং নয়া অর্থবিদ্যার অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকগণ আয়-ব্যয়ের বরাদ্দ সম্পর্কীয় এই চল্‌তি মতবাদ বাস্তবতার দিক হইতে অগ্রাহ্য বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন। তাঁহারা মনে করেন, সরকারের নীতি যদি হয়, সকল সময় আয ব্যযের বরাদ্দ সমান রাখা, তাহা হইলে বাণিজ্য চক্রের মন্দা অবস্থার প্রতিকার, কিংবা কর্মনিয়োগ সম্প্রসারণের কোনই সম্ভাবনা ও কল্যাণধর্মী উন্নয়ন কার্যের বিস্তৃতি লাভ ঘটিতে পারে না। অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিরোধ, কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি, ও উন্মার্গগামী উৎপাদন সংগঠন প্রভৃতি করিতে হইলে, সরকারকে উহার স্বাভাবিক আযের চেয়ে ব্যয় বৃদ্ধি করিতে হয়। এই সকল কার্য সমাধা করিতে হইলে ঘাটতি বাজেট ব্যবস্থা ছাড়া সরকারের উপায়ন্তর নাই। সুতরাং, ঘাট্‌তি বাজেট ব্যবস্থা সকল সময় অবাঞ্ছনীয় নহে। তাহাছাড়া, আধুনিক অর্থনীতি-বিদ্‌গণ মনে করেন যে, ব্যাপক বাজেট ব্যবস্থায় আয়-ব্যয়ের হিসাব কোন এক বিশেষ বৎসরকে কেন্দ্র করিয়া নির্ধারণ করা উচিত নহে। হিসাবের সময় মিয়াদ বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের নিরিখে ধার্য করা উচিত। তেজী অবস্থায়

উদ্‌বৃত্ত বাজেট ব্যবস্থা ধার্য্য করা উচিত, যাহাতে ঐ উদ্‌বৃত্ত দ্বারা মন্দাবস্থায় গৃহীত ঋণের ভার হ্রাস করা চলে ; আর মন্দাবস্থায় মুদ্রাস্ফীতিদ্বারা ঋণ করিয়াও ঘাট্‌তি বাজেট রচনা করা উচিত। বাৎসরিক বাজেট (annual budget) প্রণয়নের পরিবর্তে তাঁহারা নানার্থক বাজেট্ (multiple budget) রচনার পক্ষপাতী।

ঘাট্‌তি বাজেট ব্যবস্থা (Deficit Budgeting) : ঘাট্‌তি বাজেট ব্যবস্থার অর্থ, সরকারের আয়ের চেয়ে ব্যয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া, মোট জাতীয় ব্যয়ের সরাসরি সম্প্রসারণ। সরকার বিভিন্ন খাতে যে মোট আয় সংগ্রহ করে, তাহার চেয়ে উহার মোট ব্যয় যদি অধিক হয়, তাহা হইলেই ঘাট্‌তি বাজেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হইবে। ইহাকে ঘাট্‌তি ব্যয় (deficit spending), কিংবা ঘাট্‌তি রাজস্ব ব্যবস্থা (deficit financing) ও বলা যায়। "The term deficit financing is used to denote the direct addition to gross national expenditure through budget deficits whether the deficits are on revenue or on capital account. The essence of such a policy lies in goverment spending in excess of the revenue it receives."

ঘাট্‌তি ব্যয় কাহাকে বলে ?

ঘাট্‌তি ব্যয়ের উদ্দেশ্য, জাতীয় ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। নূতন মুদ্রার প্রচার দ্বারা এই ব্যয়ভার নির্বাহ করিতে হয়। কীনস্ ও তৎপরবর্ত্তী অর্থবিদ্যাবিদগণ অর্থনৈতিক মন্দার প্রতিকার ও উন্মার্গগামী নির্মাণকার্যের জন্য পাকাপাকি ভাবে ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি অনুসরণের জন্য সুপারিশ করিয়াছেন। এই নীতির স্বপক্ষে তাঁহারা সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তি প্রদান করিয়াছেন।

প্রথমতঃ, দেশের পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী যে ব্যয়ের (effective spending) প্রয়োজন, তাহা কেবল বে-সরকারী ব্যক্তিগত ব্যয় দ্বারা সম্ভব হয় না। বে-সকারী ব্যয়ের পরিপূরক হিসাবে ঘাট্‌তি ব্যয় দেশের মোট কার্যকরী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণ কর্ম নিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তা করিতে পারে।

ঘাট্‌তি ব্যয়নীতির স্বপক্ষে যুক্তি

দ্বিতীয়তঃ, আর্থিক মন্দার সময় যখন দামস্তর অত্যন্ত হ্রাস পায় ও বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ স্তিমিত অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তখন সরকার ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা দেশের উৎপাদক সম্পদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করিয়া জাতীয় আয় বৃদ্ধি কারতে পারে।

তৃতীয়তঃ, অনুন্নত অর্থ ব্যবস্থায় উন্মার্গগামী নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করিতে

হইলে কর, কিংবা ঋণ দ্বারা ব্যয় ভার মিটানো সম্ভব হয় না। এ ক্ষেত্রেও ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি কার্যকরী করিতে হয়।

কিন্তু সরকারী ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি সকল অবস্থাতে ও সকল পরিবেশে সমভাবে অনুসরণ করা বিধেয় নহে। অনেক সময়, অনেক অবস্থাতে এ নীতি সমূহ অসুবিধা ও বিপদের কারণ হইতে পারে।

ঘাট্‌তি ব্যয় নীতির অসুবিধা ও বিপদ.

দেশের তেজী অর্থনৈতিক অবস্থায় যখন বে-সরকারী বিনিয়োগ ও জাতীয় আয় অধিক থাকে, সেই অবস্থায় ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি অনুসরণ করিলে মুদ্রা-স্ফীতির লক্ষণ ও দামস্তর বৃদ্ধি দেখা দেয়। দেশের মন্দা অবস্থায় যখন জাতীয় আয় অত্যন্ত অল্প ও দামস্তর নিম্ন থাকে, সেই অবস্থায় ঘাট্‌তি ব্যয় করিলে মুদ্রাস্ফীতির কুফল দেখা দেয় না। ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা যদি সরকার উৎপাদন বৃদ্ধি-মূলক কার্যে নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে উৎপাদক সামগ্রী উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া গড়পড়তা উৎপাদন খরচ হ্রাস হইবে। ইহাতে ঘাট্‌তি ব্যয়ের দরুণ যে দামস্তর বৃদ্ধির আশংকা থাকে, তাহা পরে আর থাকে না। তবে ঘাট্‌তি ব্যয়ের দরুণ প্রথম পর্যায়ে যে দামস্তর বৃদ্ধি পায় এবং শেষস্তরে উৎপাদক দ্রব্য বৃদ্ধির দরুণ যে দামস্তর হ্রাস হয়—এই দুইএর মধ্যে বেশ সময় ব্যবধান (time-lag) দেখা যায়। সুতরাং, ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি কার্যকরী করিতে হইলে সরকারকে দেশের বর্তমান উৎপাদক সম্পদের নিয়োগের অবস্থা দেখিতে হয়। দেশে পূর্ণ কর্ম-নিয়োগ বর্তমান থাকিলে ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি কার্যকরী করিলে মুদ্রাস্ফীতি অবশ্যম্ভাবী। অপর পক্ষে, দেশের উৎপাদক সম্পদ যদি কর্মহীন অবস্থায় অলস থাকে, তাহা হইলে ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা উহাদের কর্ম-নিয়োগ সৃষ্টি করা যায়। এবং তাহাতে মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ দেখা যায় না। বিশেষ করিয়া অনুন্নত অর্থ-ব্যবস্থায় একমাত্র ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি অনুসরণ করাই সরকারের পক্ষে যথেষ্ট নহে; ঐ ঘাট্‌তি ব্যয়ের ফলে যাহাতে দেশের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়, তাহাও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়।

দ্বিতীয়তঃ, ঘাট্‌তি ব্যয় নীতির আর একটি বিশেষ গলদ দেখা দিতে পারে, যদি উহাদ্বারা সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ হ্রাস পায়। সেইজন্য ঘাট্‌তি ব্যয় নীতি কার্যকরী করিবার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হয়, তাহা দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ হিসাবে সংগ্রহ

করা উচিত নহে। সরকার যদি দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ব্যক্তিগত সঞ্চয় হ্রাস পাইবে এবং বে-সরকারী খাতে মূলধনের যোগান দুষ্প্রাপ্যতা হেতু বিনিয়োগ ও হ্রাস পাইবে। সেইজন্য অর্থবিদ্যাবিদগণ মনে করেন যে, ঘাট্‌তি ব্যয় নীতির কার্যকারিতার জন্য নূতন মুদ্রা সৃষ্টি দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করাই সরকারের পক্ষে সমীচীন।

তৃতীয়তঃ, ঘাট্‌তি বায় নীতির আর একটি অসুবিধা দেখা দিতে পারে, যদি সরকার উহার কার্যকারিতার জন্য অস্বাভাবিক পরিমাণে ঋণ গ্রহণ করে। সরকারী ব্যয় নীতির এই আদর্শ হওয়া উচিত যে, ব্যবসায় বাণিজ্যের তেজী অবস্থায় অতিরিক্ত কর আদায় দ্বারা সরকার যে উদ্‌বৃত্ত জমা সৃষ্টি করিবে, তাহাদ্বারাই আর্থিক সংকটের সময় ঘাট্‌তি ব্যযভার নির্বাহের জন্য যে ঋণ গ্রহণ করিবে, তাহার দেনা পরিশোধ করিবে। ঘাট্‌তি ব্যযের কার্যকারিতার দরুণ সরকার যদি অস্বাভাবিক রকম ঋণ করিয়া বসে, তাহা হইলে ঐ ঋণের চাপ দেশের জনসাধারণকে বহু বৎসর অবধি ভোগ করিতে হয়।

পরিশেষে, ঘাট্‌তি ব্যয নীতির সাফল্য অনেক সময় দেশের বাণিজ্য উদ্‌বৃত্তের প্রতিকূল অবস্থা দ্বারাও ব্যাহত হইয়া থাকে। যদি সরকার কোন বিশেষ সময় মিয়াদে ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা অতিরিক্ত ক্রয় ক্ষমতা বা অর্থ-আয় সৃষ্টি করে এবং সেই একই সময়ে, দেশের আমদানী রপ্তানীর চেয়ে অধিক হয়, তাহা হইলে ঐ অতিরিক্ত আমদানীর বাবদ যে দেনা শোধ করিতে হয়, তাহাতে ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত অর্থ-আয়ের কতকটা খরচ হইয়া যায়। সেইরূপ ঘাট্‌তি ব্যয় দ্বারা সৃষ্ট অতিরিক্ত অর্থের কতকটা যদি ধনী ব্যক্তিরা সঞ্চয করে, কিংবা বিদেশে বিনিয়োগ হয়, তাহা হইলেও ঐ নীতির দ্বারা ঈপ্সিত সাফল্য লাভ করা যায় না।

পূর্ণ নিয়োগ ও আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় নীতি (Full Employment and Fiscal Policy) : নয়া অর্থবিদ্যায় পূর্ণনিয়োগ ধারণাটি বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে। অর্থ ব্যবস্থার সকল রকম পুনর্বিন্যাস ও উন্নয়নের চরম উদ্দেশ্যই যেন পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা ও কায়েমী করা। এই পূর্ণনিয়োগ ধারণাটির অর্থ কি তাহা আমরা পূর্বেই ব্যাখ্যান করিয়াছি।

বিগত আর্থিক মন্দার পূর্বাবধি, অর্থবিদ্যাবিদগণের এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক কেবলমাত্র মুদ্রাব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ দ্বারাই বাণিজ্য

চক্রের উর্ধ্ব ও অধোগতি প্রতিরোধ করিয়া কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। কিন্তু, আর্থিক মন্দার সময় দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র মুদ্রাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা সম্ভব নহে। অনেকে দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাট্টাহার হ্রাসের ফলে দাদন যোগানের সুদের হার অস্বাভাবিকরূপে হ্রাস পাইয়াছিল, কিন্তু তাহা সত্বেও, বে-সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি পায় নাই। সেইজন্য কীনস্ প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ দেশে পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠার জন্য মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের সংগে সরকারী আয়-ব্যয় সংক্রান্তনীতি নিয়ন্ত্রণের উপর অধিক জোর দিয়াছেন। পূর্ণ কর্মনিয়োগ অবস্থায় পৌছিতে রাজস্ব সম্বন্ধীয় তিনটি বিভিন্ন পথের মাধ্যম তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেনঃ (১) করনীতি (২) ঋণনীতি ও (৩) ব্যয় নীতি।

সরকারী করনীতি ও পূর্ণ কর্মনিয়োগ

সরকার করনীতি নিয়ন্ত্রণ দ্বারা আর্থিক মন্দার সময় বে-সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সমৃদ্ধির সময় বে-সরকারী বিনিয়োগ হ্রাস করিয়া পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠার সহায়তা করিতে পারে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য হ্যান্‌সেন প্রমুখ অর্থশাস্ত্রীগণ পরিবর্তনশীল (flexible and fluctuating) করনীতির স্বপক্ষে ওকালতি করিয়াছেন। মন্দার সময় যদি করের হার হ্রাস করা যায়, আর সমৃদ্ধির সময় করভার বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে বে-সরকারী বিনিয়োগ যথাক্রমে বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইবে। বে-সরকারী বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা পূর্ণ নিয়োগ প্রতিষ্ঠার পক্ষে আয় কর ও বিক্রয় করের উপযোগিতা সম্পর্কে হ্যান্‌সেন্ বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তবে কেবলমাত্র করনীতি নিযন্ত্রণ দ্বারা বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও পূর্ণনিয়োগ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। শুধু মাত্র এই নীতি দ্বারা দেশের গোটা অর্থব্যবস্থার কোন বিশেষ পর্যায়ে বে-সরকারী বিনিয়োগ ইচ্ছানুযায়ী বৃদ্ধি বা হ্রাস করা চলে না।

পূর্ণনিয়োগ পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে বাণিজ্য চক্রের সমৃদ্ধি ও মন্দা প্রতিরোধ-মূলক ব্যয় নীতি ও (contra-cyclical spending policy) অনুসরণ করিতে হয়।

ব্যয় নীতি ও পূর্ণ কর্মনিয়োগ

যখন বাণিজ্য চক্র সমৃদ্ধির পর্যাযে ও কর্মনিয়োগও পূর্ণ বা পূর্ণাধিক, সেই অবস্থায় সরকারী সকল ব্যয় বন্ধ রাখিতে হইবে। আবার আর্থিক মন্দায়, যখন বে-সরকারী বিনিয়োগ পূর্ণনিয়োগের চেয়ে ন্যূন হয়, সেই অবস্থায় সরকারী ব্যয় বৃদ্ধি করিয়া কর্মনিয়োগ সম্প্রসারণ করা সম্ভব হয়। সরকারী ব্যয় সেই সকল ত্রাণমূলক সেবাকার্য ও সরকারী নির্মাণ কার্যে (public works) নির্বাহ হওয়া

উচিত, যাহাতে কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি পাইয়া নূতন অর্থ আয় সৃষ্টি হয় এবং ঐ আয় পুনঃ ব্যায়ত হইয়া গুণনীয়ক (multiplier) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রমাগত নিযোগ ও আয় বৃদ্ধি করিতে থাকে। সরকারী ব্যয়ের ও বিনিয়োগের দরুণ প্রাথমিক কর্ম নিয়োগ বৃদ্ধি পাইলে, বে-সরকারী খাতে ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাইযা দেশের মোট কর্মনিয়োগ সম্প্রসারিত হইতে পারে।

পূর্ণকর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা করিতে যে সরকারী ব্যয় নীতি গ্রহণ করিতে হয়, উহা ঘাটতি ব্যয় নীতি। এই ঘাটতি ব্যয় নীতির সারমর্ম এই যে, সরকারী ব্যয়ের বরাদ্দ স্বাভাবিক আয়ের চেয়ে অধিক পরিমাণ ধার্য করিতে হয়। এই অতিরিক্ত ব্যয় ভার নির্বাহ করিতে হয় সরকারকে ঋণ গ্রহণ করিয়া। সরকারী ঘাটতি ব্যয় নীতির আদর্শ এই হওয়া উচিত যে, আর্থিক সমৃদ্ধির কালে অতিরিক্ত কর স্থাপনদ্বারা আদায়ীকৃত অর্থ উদবৃত্ত যাহা হইবে তাহা দ্বারা মন্দাবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় জনিত যে ঋণ ভার হইবে, তাহা পরিশোধ করিতে হইবে। ঘাটতি ব্যয় নীতি সম্পর্কে আর একটি সর্তকতা মুলক ব্যবস্থা এই করিতে হইবে যে, সরকারের পক্ষে দেশের জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করা মোটেই সমীচীন হইবে না। জনসাধারণের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিলে ব্যক্তিগত সঞ্চয় হ্রাস পাইয়া বে-সরকারী খাতে বিনিয়োগ সংকুচিত হইবে। উহা পূর্ণ কর্মনিয়োগের পথে বাঁধা স্বরূপ হইতে পারে। সেইজন্য, দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হইতে দাদন লইয়া, কিংবা নূতন মুদ্রা সৃষ্টি দ্বারা সরকারকে ঘাটতি ব্যয় নীতি কাযকরী ও পূর্ণনিযোগ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়।

ঋণ নীতি ও পূর্ণ কর্ম নিয়োগ

অনুশীলনী

1. Is unbalanced budget always unsound ?

2. What is deficit financing ? Does it lead to inflation ? (C. U. B. A. '56.)

3. Explain the importance of fiscal policy in attaining full employment in a country.

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়

আর্থিক ব্যবস্থা (Economic Systems)

আমরা যে আর্থিক ব্যবস্থার তত্ত্ব ও বিধি সম্পর্কে এ যাবৎ আলোচনা করিলাম, উহাকে ধনতন্ত্র (Capitalism) বলে। ধনতান্ত্রিক আর্থিক ব্যবস্থা ছাড়া ও সমাজতন্ত্র (Socialism), মিশ্র আর্থিকতন্ত্র (Mixed economy) প্রভৃতি আর ও ব্যবস্থার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। মোটামুটি ভাবে বলিতে গেলে প্রাচ্য ইউরোপ, সোবিয়েত রাশিয়া ও চীন ব্যতীত, আর পৃথিবীর সর্বত্রই ধনতন্ত্র অর্থনীতি বর্তমান। ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই এই আর্থিক ব্যবস্থার সব চাইতে বড় পীঠস্থান।

ধনতন্ত্র ও উহার বৈশিষ্ট্য (Capitalism and its Characteristic Features) : ধনতন্ত্র বলিতে সেই অর্থব্যবস্থাকে বুঝায়, যাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি মুনাফা লাভের লোভে উৎপাদক সম্পদের মালিকানা স্বত্ব অর্জন ও উহার ইচ্ছানুযায়ী বিনিয়োগ করিতে পারে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির ইচ্ছানুরূপ বৃত্তি গ্রহণ ও চুক্তিপত্র গ্রহণের পূর্ণ অধিকার মানিয়া লওয়া হইয়াছে। এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যই ধনতন্ত্রের প্রাণধর্ম প্রতিযোগিতাকে পূর্ণাংগ ও অবাধ করিতে সহায়তা করে। সুবিখ্যাত লেখক ডি, এ, রাইট (Wright) ধনতন্ত্রের এই সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : Capitalism is a system in which, on average, much the greater portion of economic life and particularly of net new investment is carried on by private units under conditions of active and substantially free competition and avowedly at the least under the incentive of a hope for profit." এই আর্থিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখিতে পাওয়া যায় :

(১) ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা (Private Ownership of Property) : ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় সকল কর্মের উৎস ও প্রেরণাই আসে সম্পত্তির মালিকানা বোধ হইতে। সম্পত্তির মালিকানা ও স্বত্বাধিকার মানুষকে উৎপাদনে নিয়োজিত করে এবং ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক ভাবে দেশের উৎপাদক সম্পদ বিনিয়োগ উৎসাহিত করিয়া পূর্ণ আগম লাভের সহায়তা করে।

(২) **খাদকের সার্বভৌম ক্ষমতা** (**Consumer's Sovereignty**): ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় খাদকই রাজা, অর্থাৎ প্রত্যেক খাদক বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য খাদনের উপর ব্যয় কিংবা বিনিযোগ ব্যাপারে খরচ সম্পর্কে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী। খাদকের এই স্বাধীন ব্যয় ক্ষমতাই দামস্তরে প্রতিফলিত হয় এবং দামস্তরের উপরই মুনাফা ও উৎপাদনের পরিমাণ নির্ভর করে। অবাধ দামস্তরের মাধ্যমেই উৎপাদনের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৩) **উদ্যম ও বিনিয়োগের অধিকার** (**Freedom of Enterprise and Investment**): কোন বৃত্তি গ্রহণ, কিংবা কোন মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে এই ব্যবস্থায় কোন বাধা নিষেধ নাই। খাদকের চাহিদা অনুসারে ও দামস্তরের ভিত্তিতে উৎপাদক যে কোন বৃত্তি গ্রহণ, কিংবা যে কোন দ্রব্য উৎপাদনের পরিমাণ নির্ধারণ করিতে পারে।

(৪) **চুক্তির অধিকার** (**Freedom of Contract**): এই ব্যবস্থায় যে কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন ব্যক্তির সহিত চুক্তি আবদ্ধ হইতে পারে। চুক্তির সর্ত সম্পর্কে রাষ্ট্র কোনরূপ হস্তক্ষেপ করে না।

(৫) **পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা** (**Perfect Competition**): ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার হইতেই প্রতিযোগিতার পত্তন হয় এবং প্রতিযোগিতার কার্যকারিতার দরুণ চাহিদা ও যোগানের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৬) **দামস্তর ও মুনাফার কার্যকারিতা** (**Price-Profit Mechanism**): ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় সকল রকম অর্থনৈতিক প্রচেষ্টা ও উৎপাদনের প্রেরণা আসে মুনাফা শিকারের উদ্দেশ্য হইতে। মুনাফা আবার নির্ভর করে, দামস্তরের উঠানামার উপর। দামস্তরের বৃদ্ধিতে মুনাফার অংক যেমন একদিকে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে পরিমাণ ও বিনিয়োগ উৎপাদন ও সম্প্রসারণ হইয়া থাকে। দামস্তর ও মুনাফার ভিত্তিতেই দেশের সকল উৎপাদক সম্পদের বিভিন্ন শিল্পোৎপাদনে বিনিয়োগ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ধনতন্ত্রের সুফল (**Merits of Capitalism**): যাহারা ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক তাহারা মনে করেন যে, কেবলমাত্র এই ব্যবস্থাই অর্থনৈতিক উন্নতির প্রাণ কেন্দ্র। অবাধ ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতার দরুণ, উৎপাদন ক্ষেত্রে কেবলমাত্র প্রগুণতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই টিকিয়া থাকে। তাহাতে একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন দ্রব্য উৎপাদন সম্ভব হয়, অন্যদিকে তেমনি গড়পড়তা উৎপাদন খরচ ও স্বভাবতঃ নিম্নগামী হয়। মুনাফা শিকারের লোভ উৎপাদনের বিভিন্ন

ক্ষেত্রে ঝুঁকি বহনের উৎসাহ যোগায়, তাহাতে নূতন নূতন বহুবিধ দ্রব্য ও সেবাকৃত্য সরবরাহ সম্ভব হইয়া মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সুগম হয়। **দ্বিতীয়তঃ,** এই ব্যবস্থায় খাদকের পছন্দক্রম অনুসারে দ্রব্য ও কৃত্য উৎপন্ন হয় বলিয়া সর্বোচ্চ উপযোগ ভোগ করা সম্ভব হয়। **তৃতীয়তঃ,** ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় দামস্তরের মাধ্যমে ও কার্যকারিতায় উৎপাদক সম্পদের সুনির্দিষ্ট সুবিনিয়োগ সম্ভব হয়। **পরিশেষে,** মুনাফা শিকারের লোভে উৎপাদন নির্ধারিত হয় বলিয়া, এই ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যে সকল প্রতিষ্ঠান প্রতিযোগিতার ঝুঁকি বহনে অসমর্থ, উহারা সহজেই উৎখাৎ হয়, যাহারা উপযুক্ত তাহারাই কেবল টিকিয়া থাকে।

ধনতন্ত্রের কুফল (Evils of Capitalism) : কিন্তু সুফলের চেয়ে এই ব্যবস্থার কুফলই অধিক প্রকট।

প্রথমতঃ, এই ব্যবস্থায় অবাধ ও পূর্ণাংগ প্রতিযোগিতা বর্তমান হেতু স্বল্প পুঁজিপতি উৎপাদক উৎপাদন ক্ষেত্র হইতে শীঘ্রই উৎখাৎ হইয়া যায়। ধনতন্ত্রের উন্মার্গগামী অবস্থায় কেবলমাত্র গুটিকতক উৎপাদক একচেটিয়া কারবারী হইয়া বসে। **দ্বিতীয়তঃ,** এই ব্যবস্থায় ধনবণ্টন বৈষম্য বৃদ্ধি পায়। ধনিক শ্রেণী অধিকতর ধনী হইতে থাকে, এবং নিম্ন আয়গ্রস্ত শ্রেণী অধিকতর গরীব হয়। ইহার ফলে, জনসাধারণের মধ্যে সুযোগ সুবিধার তারতম্য ঘটে এবং উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে শ্রেণী বিভেদ ও বিভিন্ন ধরণের শ্রেণী সংঘর্ষ অনিবার্য হইয়া পড়ে। **তৃতীয়তঃ,** ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকগণ যে দাবী করেন যে, এই ব্যবস্থায় খাদকশ্রেণী সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং উৎপাদন খাদকের পছন্দক্রম অনুসারে নির্ধারিত হয়, তাহা আদৌ সত্য নহে। উৎপাদন ক্ষেত্রে অবাধ প্রতিযোগিতা হেতু, একচেটিয়া প্রতিষ্ঠান ও জোট কারবারীর অভ্যুত্থান হয়। ইহারা জোর প্রচার কার্য ও বিজ্ঞপ্তি দ্বারা খাদক শ্রেণীর পছন্দক্রম নির্দেশ করিয়া থাকে; বাস্তবতঃ খাদকের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কোন ক্ষমতাই কার্যকরী হয় না। **চতুর্থতঃ,** প্রতিযোগিতা, ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সমাজের সর্বোচ্চ উপযোগ ভোগেরও সহায়তা করে না। প্রতিযোগিতা মূলক উৎপাদনের ফলে কখন অতি উৎপাদন (over-production), কখন ও বা অব-উৎপাদনে (under-production) দোষ ঘটে, যাহার ফলে বাণিজ্যচক্র, দামস্তরের অস্বাভাবিক উঠানামা প্রভৃতি অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়। **পরিশেষে,** প্রতিযোগিতা মূলক উৎপাদনে আর্থিক অপচয় ও যথেষ্ট ঘটে। বিজ্ঞপ্তি ও প্রচার কার্যের

থাতে প্রত্যেক উৎপাদক প্রতিষ্ঠানকে বহু অনাবশ্যক অর্থ ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়।

ধনতন্ত্রের উপরি উক্ত কুফলের দরুণ সর্বত্র ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়াছে। অনেক দেশে এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া এত বিপ্লবাত্মক হইয়াছে যে, উহারা এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করিয়া, ইহার স্থলে সম্পূর্ণ নূতন এক অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। যেমন সোবিয়েত রাশিয়া ও চীন। বেশীর ভাগ দেশেই এই ব্যবস্থার আমূল উৎপাটন না করিয়া পরিমার্জন ও পরিবর্ধন দ্বারা ইহার অনেক কুফল ও অপগুণ দূর করা হইয়তেছে। আজিকার পৃথিবীর কোন দেশেই পুরাপুরি ষোল আনা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা বর্তমান দেখা যায় না।

সমাজতন্ত্র (Socialism) : ধনতন্ত্রের অপগুণ ও কুফলের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া পৃথিবীর সকল দেশেই দেখা দিয়াছে। এই ব্যবস্থার বিবিধ গলদ ও কুফল দূর করিয়া, ইহাকে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত অবস্থায় সংগঠন করিবার প্রচেষ্টা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে দেখা দিয়াছে। ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থার এই সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস করিবার বহুমুখী আন্দোলন ও প্রচেষ্টাকে সাধারণতঃ 'সমাজতন্ত্র' এই আখ্যা দেওয়া হইয়া থাকে।

সমাজতন্ত্রের অর্থ কি ?

সমাজতন্ত্রের প্রকৃত অর্থনৈতিক সংজ্ঞা নির্দেশ করা বড় সুকঠিন ব্যাপার। ব্যক্তি-সর্বস্ব অর্থব্যবস্থার বিনিময়ে ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিকানা স্বত্বের পরিবর্তে, ভূমি ও মূলধনের উপর সামাজিক মালিকানা স্বত্বের প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠার পক্ষে যে সুপারিশ, উহাই সমাজতন্ত্রের সারমর্ম। বারট্র্যাণ্ড রাসেলের কথায় : "Socialism is the advocacy of communal ownership of land and capital in place of the present capitalist system based upon individualism and private property." মূলতঃ, ধনতন্ত্রবাদের বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হিসাবেই সমাজতন্ত্রের জন্ম। আবার তত্ত্ব ও আন্দোলন হিসাবে, ইহার অপর উদ্দেশ্য উৎপাদক সম্পদ ও বিনিময়ের উপর সামাজিক মালিকানা স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপন ও কায়েমী করা। অধ্যাপক পিগু সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থার দুইটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করিয়াছেন : (১) **প্রথমতঃ,** ব্যক্তিগত মুনাফা লাভের ভিত্তিতে অর্থ ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা বানচাল করা এবং (২) **দ্বিতীয়তঃ,** উৎপাদক কারক ও সম্পদের উপর সমষ্টিগত মালিকানার অধিকার কায়েমী করা। অধ্যাপক

ডিকিন্‌সন্ (H.D. Dickinson) সমাজতন্ত্রের যে ব্যাপক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য : "Socialism is an economic organisation of society in which the material means of production are owned by the whole community and operated by organs representative of and responsible to the community according to a general economic plan, all members of the community being entitled to benefit from the results of such socialized planned production on the basis of equal rights." সমাজতন্ত্র একদিকে যেমন বর্তমান ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার গলদ ও কুফল সাধারণ্যে উৎঘাটন করে, অন্যদিকে আবার এমন এক নূতন অর্থব্যবস্থার সৃষ্টির পক্ষে সুপারিশ করে, যেখানে ব্যক্তিতান্ত্রিক মালিকানা ও মুনাফাসর্বস্ব উৎপাদনের পরিবর্তে, রাষ্ট্র মালিকানায় কল্যাণ-ধর্মী উৎপাদন ব্যবস্থার প্রবর্তন হইবে। রাষ্ট্রের স্বত্বাধিকারে দেশের উৎপাদক সম্পদের বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ সম্ভব হইবে এবং খাদকের পছন্দক্রম অনুযায়ী উপযুক্ত পরিমাণ ও গুণবিশিষ্ট দ্রব্য সরবরাহ হইবে। এই নূতন অর্থ ব্যবস্থায় অতি-উৎপ্পাদন বা অব-উৎপাদন দোষের উৎপত্তি হইয়া বাণিজ্য চক্রের যথাক্রমে মন্দা ও তেজী অবস্থার উদ্ভব হইবে না। সরকারী মালিকানায় যেমন পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হইবে, তেমনি ন্যায়ের ভিত্তিতে প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় আয়ের সুবণ্টন ব্যবস্থা সম্ভব হইবে।

সমাজতন্ত্রের বিভিন্নরূপ (Forms of Socialism) : সমাজতন্ত্রের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সর্বত্র এক হইলেও, ইহার আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন অর্থবিজ্ঞানীর মধ্যে বিশেষ মতবিরোধিতা দেখা যায়। মোটামুটিভাবে সমাজ তন্ত্রীগণ দুইটি বিভিন্ন মতাবলম্বী : একদল বিপ্লবাত্মক (revolutionary), আর একদল নরমপন্থী (evolutionary)। প্রথমোক্ত দল বিশ্বাস করেন যে, বিদ্রোহ ও রক্তপাতের মধ্যদিয়াই সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা সম্ভব। অপরপক্ষে, দ্বিতীয় দল মনে করেন যে, শান্তিমূলক বিবর্তনের মধ্য দিয়া এই ব্যবস্থার পত্তন হইবে। নিম্নে বিভিন্ন সমাজতন্ত্রীদলের বিভিন্ন মতবাদ বিশ্লেষণ করা হইল।

(১) রাষ্টিক সমাজতন্ত্র (State Socialism): এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র ধনোৎপাদনে ও উহার বণ্টন কার্যে নিয়োজিত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা ও পরিচালনার স্থান এই অর্থব্যবস্থায় অস্বীকার করা হয়। তবে অবশ্য ধনতন্ত্রের বিনিময় পদ্ধতি যথা, পণ্যমূল্য ও কারক মূল্য নির্ধারনের প্রক্রিয়া এই ব্যবস্থায়ও বলবতী ও

কার্যকরী থাকে। রাজনৈতিক সমাজতন্ত্রীগণ একদিকে যেমন সমস্ত উৎপাদক সম্পদের জাতীয়করণের পক্ষপাতী, অন্য দিকে তেমনি রাজনৈতিক ব্যাপারে সংসদের শাসন প্রণালীতে বিশ্বাসী।

(২) **গিল্ড সমাজতন্ত্র (Guild Socialism) :** গিল্ড সমাজতন্ত্রীগণ অবশ্য উৎপাদক সম্পদের মালিকানা ব্যাপারে রাষ্ট্রের ষোলআনা অধিকারের গুরুত্ব ও উপযোগিতায় বিশ্বাস করেন না। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের চরম ও আত্যন্তিক কেন্দ্রীয়করণের তাহারা পক্ষপাতী নহেন। তাহারা অর্থব্যবস্থার বিকেন্দ্রীয় করণের সমর্থক। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্র শুধু সাধারণ পরিদর্শন সংস্থারূপে কার্য করে। রাষ্ট্র খাদকশ্রেণীর প্রতিনিধি স্বরূপ দ্রব্যমূল্য ধার্য করিবে, দ্রব্যের গুণানুসারে মান বজায় রাখিতে নির্দেশ দিবে, কিন্তু উৎপাদক সম্পদের প্রকৃত মালিকানা ন্যস্ত থাকিবে মজুর শ্রেণীর হাতে। গিল্ড সমাজতন্ত্রীগণ এই বিশ্বাস করেন যে, ধনিকশ্রেণী ধ্বংস ও শিল্পায়নে স্বায়ত্বশাসন আনিতে হইলে উৎপাদক সম্পদের মালিকানা ও বিনিয়োগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা মজুর সংঘের (guilds) হস্তে অর্পণ করিতে হইবে।

(৩) **ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্র (Fabian Socialism) :** উনবিংশ শতাব্দীর শেষ নাগাদ বিলাতে একদল মনিষী এই মতবাদ প্রচার করেন যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক প্রচার দ্বারা, শান্তিমূলক বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হইতে পারে। বিদ্রোহ, বিপ্লব ও রক্তপাতের প্রত্যক্ষ সরাসরি পথে সমাজতন্ত্র স্থাপনের পক্ষপাতী তাঁহারা আদৌ নন। শ, বার্ণাড ওয়েলস্, ওয়েবস্ দম্পতি প্রমুখ অনেক আদর্শবাদী পণ্ডিত ফেবিয়ান্ সমাজতন্ত্রী-দলের সভ্য।

সিন্‌ডিকেলিসম্ (Syndicalism) : ফ্রান্সে শ্রমিক সংঘের বিপ্লবাত্মক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন হিসাবে সিন্‌ডিকেলিসমের গোড়াপত্তন। এই মতবাদে যাহারা বিশ্বাসী, তাহারা রাষ্ট্রের উপযোগিতায় আদৌ বিশ্বাস করেন না। রাষ্ট্র ও সরকারী কর্মচারিগণ বুর্জোয়া মনোবৃত্তি সম্পন্ন—তাহারা শ্রমিক স্বার্থের ঘোর বিরোধী। অর্থনৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের মালিকানা সিন্‌ডিকেলিষ্টগণ মোটেই বরদাস্ত করেন না; ধর্মঘট ও অন্যান্য ধ্বংসমূলক উপায়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রের পতন তাহারা কামনা করেন। তাহারা শিল্পায়নে বিভক্ত মালিকানা তত্ত্বে (divided ownership) বিশ্বাসী। তাহারা স্থানীয় শিল্প স্থানিক সিন্‌ডিকেটের হাতে এবং জাতীয় শিল্প জাতীয় সিন্‌ডিকেটের হাতে ন্যস্ত করার পক্ষপাতী।

বিকেন্দ্রীক শিল্প সিন্ডিকেট গুলির প্রত্যেকের স্ব স্ব স্বাধীনতা বলবৎ থাকায় রাষ্ট্র কেবলমাত্র উহাদের সাধারণ পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করিবে, সিন্ডিকেলিষ্টগণ সেই নির্দেশ দিয়া থাকেন।

কমিউনিজম (Communism) : কমিউনিজমের মূল তত্ত্বগুলি কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলসের লেখায় পাওয়া যায়। তাঁহারাই প্রথমতঃ ও প্রধানতঃ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহারা হিংসামূলক নীতি ও বিপ্লবাত্মক কার্য প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী। কমিউনিজমের বৈশিষ্ট্য গুলি বিশ্লেষণ করিলে নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলির সন্ধান পাওয়া যায়।

(১) মার্কসের উদ্‌বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব (Marxist Theory of Surplus Value) : মার্কস ও তাঁহার মতাবলম্বী অন্যান্য লেখকগণ বিশ্বাস করেন যে, শ্রমই সকল দ্রব্যমূল্যের উৎস। এমন কি, মূলধন ও লুণ্ঠিত শ্রমেরই নামান্তর মাত্র। শ্রমিক যে দ্রব্যমূল্য উৎপন্ন করে, তাহার সবটাই তাহারা মজুরি হিসাবে লাভ করে না। দ্রব্যমূল্য হইতে যে প্রকৃত মজুরি তাহারা পাইয়া থাকে, তাহার উপর যে উদ্‌বৃত্ত থাকে, তাহা ন্যায়তঃ শ্রমিকেরই প্রাপ্য ; কিন্তু পুঁজিপতিরা শ্রমিককে বঞ্চনা করিয়া ঐ উদ্‌বৃত্ত নিজেরা আত্মসাৎ করিয়া থাকে।

(২) শ্রেণী সংগ্রামের তত্ত্ব (Doctrine of Class War) : দ্রব্য মূল্যের ন্যায়-সংগত উদ্‌বৃত্ত প্রাপ্য অংশ হইতে শ্রমিকেরা যতই বঞ্চিত হইতে থাকে, ততই শ্রমিক ও ধনিক শ্রেণীর মধ্যে বৈষম্য ও বিভেদ উৎকট হয়। ধনতন্ত্র যতই উন্মার্গগামী হইতে থাকে, ততই শ্রেণী সংগ্রাম ও প্রবল আকার ধারণ করে।

(৩) মজুরের সার্বভৌম নায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat) : ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার শেষ অবস্থায় শ্রমিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া এত শক্তি সঞ্চয় করে যে, তাহা দ্বারা ধনিক শ্রেণীর ধ্বংস অনিবার্য হইয়া পড়িবে। ধনিকশ্রেণীর ধ্বংসের সংগে সংগে মজুরের সার্বভৌম নায়কত্ব স্থাপিত হইবে। তখন রাষ্ট্রদেহ আপনা হইতেই বিলীন হইয়া যাইবে ; কেননা, তখন ধনিকশ্রেণীর স্বার্থ কায়েমী রাখিবার জন্য রাষ্ট্রের কোন প্রয়োজনই হইবে না। ধনতন্ত্রের ধ্বংসের পর যে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অভ্যুত্থান হইবে, তাহাতে প্রত্যেকে নিজের দক্ষতা ও নিজের প্রয়োজন অনুসারে আয় উপার্জনে সমর্থ হইবে।

সোবিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের অভিজ্ঞতা (Communist Experiment in Soviet Russia) : ১৯১৭ সালের বিপ্লবের পর সোবিয়েত রাশিয়ায় যখন নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা স্থাপিত হয়, তখন হইতেই কমিউনিজমের প্রক্রিয়া

ঐ দেশে কার্যকরী হইতে সুরু হইয়াছে। এই নূতন ব্যবস্থার পত্তন হইবার পর হইতে রাশিয়াতে একদিকে যেমন সামাজিক ও আর্থিক জীবনের বিভিন্ন দিকে বিপ্লবাত্তক ধ্বংস মূলক পরিবর্তন সুরু হয়, অপরদিকে তেমনি আবার গঠনমূলক নির্মাণ কার্যের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। একদিকে জারের আমলাতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র ও তদানুষঙ্গিক বুর্জোয়া ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উচ্ছেদ হইযাছে, অপরদিকে, সামাজিক বিদ্রোহ ও রক্তপাতের মধ্য দিয়া বলশেভিক পার্টির এক নায়কত্ব স্থাপিত হইয়াছে। এই পার্টির এক নায়কত্ব একদিকে মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেক দিক আত্যন্তিক ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে, অপর দিকে ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থার বহু সংস্কার সাধন করিয়া উহার শেষ চিহ্ন পর্যন্ত নির্মূল করিয়াছে।

গঠনমূলক নির্মাণ কার্যের দিক হইতে দেখিতে গেলে বলা যায় যে, রাশিয়া পৃথিবীর সম্মুখে এক নূতন অর্থব্যবস্থার আদর্শ ও প্রক্রিয়া স্থাপিত করিয়াছে। গোড়াতেই সমাজতন্ত্রের ব্যাপক ও আত্যন্তিক বিস্তৃতির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। ১৯২৭ সাল হইতে সুরু করিয়া রাশিয়া ক্রমাগত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কার্যকরী করিয়া আসিতেছে। ফলে জীবনের প্রত্যেকটি দিকই আজ পরিকল্পনাবহুল ও সুসংবদ্ধ। রাষ্ট্র দেশের সকল রকম বৃহদায়তন শিল্প, ব্যাংক, জনহিতকর প্রতিষ্ঠান এবং অস্ত্র-শিল্পাগার প্রভৃতির মালিকানা ও নিযন্ত্রণাধিকার অর্জন করিয়াছে। সকল রকম ব্যবসায় বাণিজ্য রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হইয়াছে। উৎপাদন খরচের ভিত্তিতে শিল্প দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ রাষ্ট্র দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র শিল্পোৎপাদনে বে-সরকারী ব্যক্তিগত মালিকানা যে স্বীকৃত হয় নাই তাহা নহে ; কিন্তু এক্ষেত্রে ও মজুরির হার, মজুরের কার্যমিয়াদ দ্রব্যমূল্য নির্ণয় প্রভৃতি ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিযন্ত্রণ অত্যন্ত বলবৎ। দেশে বার্ষিক কি পরিমাণ ও কি বিশিষ্ট মানের দ্রব্য ও সেবাকৃত্য উৎপন্ন হইবে তাহা, রাষ্ট্র নির্ধারণ করিয়া থাকে। দেশের উৎপাদক সম্পদের বিনিয়োগ ব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সম্পর্কীয় সমস্ত বিষয় রাষ্ট্র ধার্য করে। যৌথ খামার (collective farms) সংগঠন দ্বারা রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীনে নূতন রকম কৃষি কার্যের প্রচলন হইয়াছে। কৃষাণেরা মজুরি হিসাবে উৎপন্ন দ্রব্যমূল্যের একটা অংশ পায় বটে, কিন্তু রাষ্ট্রই জমির একমাত্র মালিক। শ্রমিকের অর্থমজুরি নির্ধারণ ও অন্যান্য সুখ স্বাচ্ছন্দ্য তদারক রাষ্ট্রই করিয়া থাকে। তাহাদের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র নানা রকম উৎসাহ মূলক পুরস্কার ও পারিতোষিকের

গঠনমূলক সংস্কার ও নির্মাণ কায

ব্যবস্থা করিয়া থাকে। দেশের গোটা ব্যাংকিং ব্যবস্থাই রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণাধীনে। দ্রব্য ও কৃত্য বিনিময়ের মাধ্যম দেশের কাগজী মুদ্রা রুবল (Rouble)। দেশের অন্তঃ ব্যবহারের জন্য ইহা অবিনিমেয় মুদ্রা।

সোবিয়েত রাশিয়ায় কমিউনিজমের যে প্রক্রিয়া চলিয়াছে, তাহা ষোলআনা মার্কসীয় কমিউনিজম নহে। কিন্তু কিছু তারতম্য ও বিচ্যুতি লক্ষ্যনীয়। মার্কসীয় কমিউনিজম যেমন আন্তর্জাতিক, সোবিয়েত রাশিযার কমিউনিজমের উদ্দেশ্য ও কার্যকারিতা তত ব্যাপক নহে। রাশিয়া যে প্রক্রিয়া সুরু করিয়াছে, তাহা শুধু ঐ দেশের সমাজব্যবস্থা সংস্কারের জন্য। **দ্বিতীয়তঃ,** রাশিয়ায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার কিছু পরিমাণ স্বীকৃতি পাইয়াছে, কিন্তু মার্কসীয় দর্শনবাদে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার একেবারেই কোন স্থান পায় নাই। ষ্টালিন্ সংবিধান অনুসারে, সোবিয়েত রাশিয়ায় কৃষিকার্যে, ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে ও ভোগ্যদ্রব্য উৎপাদনে কতকটা ব্যক্তিগত মালিকানা স্বত্ব মানিয়া লওয়া হইয়াছে। **তৃতীয়তঃ,** রাশিয়ায় মার্কসীয় মূল্যতত্ত্ব ও প্রয়োগ করা হয় নাই : মূল্যের শ্রমতত্ত্ব সেখানে বাস্তবতঃ কার্যকরী হয় নাই। দ্রব্যমূল্য সেখানে রাষ্ট্র ধার্য করিয়া থাকে। **পরিশেষে,** রাশিয়ায় ধন-বণ্টন বৈষম্য ও বিদ্যমান ; সেখানে শ্রমিকের কার্য দক্ষতায় তারতম্যানুসারে মজুরির হার ধার্য করা হয়। ব্যক্তিগত আয়ের একটা অংশ সঞ্চয় করা চলে, কিংবা রাষ্ট্রকে ধার দেওয়া চলে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে মুদ্রার প্রচলন এখনও বলবৎ। রাষ্ট্রীয় কার্যের যে কোন বিভাগের উপর শক্তিশালী আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও প্রবল।

মার্কসীয় ও সোবিয়েত কমিউনিজমের তফাৎ

সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা (Charges against Socialism) : সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সব চাইতে বড় অভিযোগ এই যে, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার ন্যায় ইহাতে আত্মনিয়ন্ত্রণশীল (self adjusting) দামস্তরের কার্যকারিতা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় খাদকের পছন্দ ক্রম অনুসারে দামস্তর ও মুনাফার অবাধ কার্যকারিতার মাধ্যমে বাঞ্ছনীয় সম্পদ বণ্টন ও উৎপাদনক্রম নির্ধারিত হইয়া থাকে। অবাধ দামস্তরের কার্যকারিতার মাধ্যমে উৎপাদন-খাদন সমন্বয় ও চাহিদা-যোগান সাম্য স্থাপিত হইয়া সর্বোচ্চ উপযোগ লাভের সুযোগ হয়। কিন্তু, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় সমস্ত উৎপাদক সম্পদ রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ও নিয়ন্ত্রণাধীনে আসায়, বিভিন্ন কারকের অবাধ বিনিময় বাজারে থাকিতে পারে না। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বাজারে অবাধ দামস্তরের কার্যকারিতার অভাবে, ন্যায়সঙ্গত-

ভাবে (rational) উৎপাদন খরচ ও বাজার মূল্য নির্ধারণ করা, কিংবা উৎপাদক সম্পদ বিনিয়োগ দ্বারা সর্বোচ্চ উপযোগ ভোগ করা অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সমালোচকেরা দাবী করেন যে, খাদকের সার্বভৌম ক্ষমতা ও সমাজতন্ত্রের চেয়ে ধনতন্ত্রের মধ্যেই অধিক ব্যাপক। সমাজতন্ত্রে কি দ্রব্য, কি পরিমাণে উৎপন্ন হইবে, তাহা রাষ্ট্র নির্দেশ করে। রাষ্ট্র নির্দেশে যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই খাদককে বিনা বিচারে গ্রহণ করিতে হয়।

তৃতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অবাধ দামস্তর ও মুনাফার কার্যকারিতার অভাবে, উৎপাদক শ্রেণীরও কার্যে উদ্যম ও উন্নয়নের প্রেরণা শিথিল হইয়া পড়ে। বৃত্তি নির্বাচনের অবাধ ক্ষমতা ও কর্মের উৎসাহ নষ্ট হইয়া যায়, সাধারণ ব্যক্তিস্বাধীনতা ক্ষুন্ন হয় এবং সকল রকম অর্থনৈতিক উন্নতির অবসান হয়। জনসাধারণ সকলেই শ্রমজীবী হইয়া পড়ে এবং পরিকল্পনা অধিকর্তার অনুজ্ঞা ছাড়া নিজেদের বৃত্তি বা পেশা মনোনয়ন বা পরিবর্তন করিতে পারে না।

পরিশেষে, সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আব একটি অভিযোগ এই যে, ইহাতে গোটা অর্থব্যবস্থাই আমলাতান্ত্রিক হইয়া পড়ে। আমলাতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা দৈনন্দিন গতানুগতিক কার্যের পক্ষে অনুকূল সত্য ; কিন্তু উৎপাদন ক্ষেত্রে,—যেখানে পদে পদে দূরদৃষ্টি, উদ্যম, কর্মকুশলতা ও ঝুঁকি বহন একান্ত প্রয়োজন—রাষ্ট্রীয় আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা ও তদারক কার্য অনুপযুক্ত ও অপ্রগুণ হইযা পড়ে।

সমাজতন্ত্র ব্যবস্থার সুফল (Merits of Socialism) : ক্ল্যাসিকাল অর্থনীতিবিদগণ সর্বোচ্চ উপযোগ তত্ত্বের যে জয়গান করিয়াছেন, তাহা আধুনিক অর্থবিদ্যাবিদগণ অবাস্তব, ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণ করিয়াছেন। ধনতন্ত্র অর্থব্যবস্থার মূল্যসাম্য সর্বদা সর্বোচ্চ উপযোগ লাভ বা উৎপন্ন পণ্য উৎপাদন নির্দেশ করে না। দামস্তরই সর্বদা উৎপাদন ক্রমের সঠিক নির্ধারক নহে। খাদকের চাহিদা দামস্তর প্রভাবান্বিত করিয়া, উৎপাদন ক্রম ও আয়তন নির্ধারণ করে। খাদকের চাহিদা আবার নিভর করে, তাহার অর্থ আয়ের উপর। কিন্তু, ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় খাদকের অর্থআয়ের সু-বণ্টন না হওয়ায়, এই ব্যবস্থায মূল্য সাম্যের অর্থ, মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তির ভোগের যথেচ্ছাচার, ও অগণিত জনসাধারণের অনাহার ও দারিদ্র্য বরণ। বাস্তবক্ষেত্রে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একচেটিয়া জোট কারবারের অভ্যুত্থান, দামস্তরের অবাধ কার্যকারিতাকে প্রতিরোধ করিয়া, উৎপাদক সম্পদের বাঞ্ছনীয় বণ্টন ও বিনিয়োগ প্রতিহত করে। দ্রব্য যোগানের

অস্বাভাবিক দুষ্প্রাপ্যতা সৃষ্টি করিয়া এবং তারতম্যমূলক (disoriminatory) দাম নির্ধারণ দ্বারা, ধনতান্ত্রিক জোট ব্যবসায় খাদক শ্রেণীকে বিশেষভাবে বিপর্যস্ত করে। ডিকিন্‌সন্ (Dickinson), ল্যাংগ (Lange), ডার্‌বিন (Durbin) প্রমুখ অর্থবিদ্যাবিদগণ মন্তব্য করেন যে, দামস্তরের উপরি উক্ত ক্রিয়া ও আনুষঙ্গিক অপগুণগুলি সমাজতন্ত্রে দেখা যায় না। পরন্তু, সমাজতন্ত্রে দামস্তরের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করা চলে না। সমাজতন্ত্রে উৎপাদক সম্পদ বিনিয়োগের হিসাব সূত্ররূপে (accounting principles) মূল্যস্তরের উপযোগিতা আছে। পরীক্ষামূলক ভুলভ্রান্তি ও সংশোধনের (trial and error) মধ্য দিয়া, পরিকল্পনা অধিকর্তা এই ব্যবস্থায় মূল্য সাম্য প্রতিষ্ঠা দ্বারা দ্রব্য চাহিদা ও যোগানের সমন্বয় করিতে পারে।

সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা প্রতিযোগিতামূলক ব্যবস্থার অপচয় প্রতিরোধ করিতে সক্ষম। উৎপাদক সম্পদের বণ্টন ও বিনিয়োগ সমাজ কল্যাণের ভিত্তিতে নিরূপিত হয়—খাদকের যথেচ্ছাচার চাহিদা দ্বারা নির্ধারিত হয় না। দীর্ঘমেয়াদী সুপরিকল্পনা দ্বারা সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা বাণিজ্য চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ের অস্বাভাবিক উঠানামা নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ করিয়া, প্রতিযোগিতাপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা দূর করিতে পারে।

জাতীয় আয় বণ্টনের দিক হইতে সমাজতন্ত্র ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের চেয়ে বাস্তবিকই শ্রেয়ঃতর। সমাজতন্ত্রে জাতীয় আয়ের অধিক সু-বণ্টন সম্ভব হয় বলিয়া, সমাজের সর্বোচ্চ সামগ্রিক উপযোগ বা কল্যাণ অর্জনও সুগম হয়। একথা অবশ্য সত্য যে, সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থায় সকলের অর্থআয় সমান হইতে পারে না। কিন্তু, সকলের সমান সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করিয়া ইহা প্রত্যেকের পূর্ণ-বিকাশ ও উন্নয়নের সহাযতা করিতে পারে। বেকার সমস্যা সমাধান ও ব্যবসা বাণিজ্যের উত্থান-পতন নিয়ন্ত্রণ করিতে সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা বিশেষ ভাবে ধনতন্ত্রের চেয়ে শ্রেয়ঃতর।

পরিশেষে, সমাজতন্ত্রে অর্থব্যবস্থার উপর আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের চাপ যে অত্যধিক বলিয়া প্রচার করা হয়, তাহা ও সত্য নহে। বে-সরকারী কোম্পানী পরিচালনাও গতানুগতিক লালফিতার কবল হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত নহে। অতএব সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সকল যুক্তিই অসার ও অবাস্তব। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র অর্থব্যবস্থার মধ্যে পছন্দ করিতে হইলে, মানুষের পক্ষপাতিত্ব স্বভাবতঃই সমাজতন্ত্রের দিকেই যায়।

মিশ্র আর্থিক ব্যবস্থা (Mixed Economy) : গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় দ্বারা আর এক অর্থব্যবস্থার সৃষ্টি ও প্রচলন অধুনা জনপ্রিয় হইয়াছে। উহাকে মিশ্র-আর্থিক ব্যবস্থা বলা যায়। এই ব্যবস্থায় একদিকে যেমন ধনতন্ত্রের সুযোগ সুবিধা গুলি লাভের নিশ্চয়তা আছে, অন্যদিকে তেমনি সমাজতন্ত্রের সুফলগুলি অর্জন করিবার সুযোগ ঘটিযা থাকে। সাধারণ উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির উৎকর্ষতা সাধন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার উপযোগিতা অস্বীকার করা যায় না। আবার জাতীয় আয় বণ্টনের বৈষম্য হ্রাস করিতে, বাণিজ্য চক্রের উর্ধ্ব ও অধোগতি প্রতিরোধ করিতে, ব্যক্তিগত মালিকানা ও অবাধ প্রতিযোগিতার কুফল প্রভৃতি দূর করিতে, রাষ্ট্রীয মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ও অনস্বীকার্য। ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার সকল রকম কুফল ও অপগুণ দূর করিয়া সমাজতন্ত্রের সুফল পূর্ণমাত্রায় অর্থব্যবস্থায় প্রবর্তন করা, মিশ্র-অর্থব্যবস্থার আসল উদ্দেশ্য।

মিশ্র-অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার ও বে-সরকারী মূলধন বিনিয়োগ যেমন বলবৎ থাকে, অন্যদিকে আবার পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ পর্ব অর্থব্যবস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার্যকরী দেখা যায়। এই রাষ্ট্রীয় মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন আকারে দেখা যায়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ, দেশের প্রধান প্রধান মূল শিল্পের জাতীয়করণ ক্রমবর্ধমান করব্যবস্থার দ্বারা ধনবণ্টন বৈষম্য দূরীকরণ, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অপব্যবহার প্রতিরোধ, পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কার্যসূচী, রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়া ব্যক্তি-ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বহু গলদ ও আর্থিক অপচয় দূর করিতে সহায়তা করে।

ইংলণ্ড, মার্কিনযুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য অনেক ইউরোপীয় দেশ মিশ্র-অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন দ্বারা এক ধনতান্ত্রিকব্যবস্থার অনেক অপগুণ দূর করিতে সক্ষম হইয়াছে। ভারতবর্ষে ও স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার মিশ্র-আর্থিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করিবার নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে।

অনুশীলনী

1. What is wrong with Capitalism? How would you propose to remove the defects? (C. U. B. A. '51)
2. What is Socialism? Briefly discuss its aims and purposes. (C. U. B. A. '50)

3. Bring out the distinction between capitalism, socialism and communism. (C. U. B. A. '55)
4. Point out the main features of the Communist experiment in Soviet Russia. In what important respects does it deviate from Marxian Socialism ? (C. U. B. A. '48)

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়

রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক কার্যাবলী (State and Economic Activities)

বিংশ শতাব্দীতে প্রায় সকল সভ্য দেশেই অর্থব্যবস্থা সমাজতন্ত্রধর্মী হওয়ার ফলে, রাষ্ট্র দেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়া কলাপে বিভিন্নরূপে হস্তক্ষেপ করিয়াছে। কোন শিল্পের বা ব্যবসায় কারবারের জাতীয়করণ, আর্থিক ব্যবস্থার উপর রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপেরই এক বিশেষ পর্যায়।

জাতীয়করণ (Nationalisation) : কোন শিল্প বা কারবারের উপর রাষ্ট্রের মালিকানা স্বত্ব ও নিয়ন্ত্রণ অধিকার স্থাপিত হইলে,ঐ শিল্পের বা কারবারের জাতীয়করণ বলে। প্রকৃত সমাজতন্ত্রীগণ, উৎপাদক দেশের সম্পদ, বিনিময় ও ধনবণ্টনের জাতীয়করণের স্বপক্ষেই সুপারিশ করেন। মিশ্র-অর্থব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকগণ গোটা অর্থব্যবস্থার জাতীয়করণের পক্ষে সুপারিশ করেন না বটে, কিন্তু তাহারা অর্থনীতির ক্ষেত্র বিশেষে রাষ্ট্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী।

জাতীয় করণের পক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Nationalisation) : শিল্প বা কারবার জাতীয়করণের স্বপক্ষে সাধারণতঃ নিম্নলিখিত যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রথমতঃ, জাতীয়করণের দ্বারা প্রতিযোগিতা মূলক উৎপাদনের অনাবশ্যক আর্থিক অপচয় প্রতিরোধ করিয়া উৎপাদন খরচ হ্রাস করা সম্ভব হয়। ইহার ফলে, অপেক্ষাকৃত কম বাজার মূল্যে দ্রব্য বা কৃত্য বিক্রয় হইতে পারে। জাতীয়করণের দ্বারা শিল্প জোট কারবারের সকল রকম সুযোগ সুবিধা ও লাভ করিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, বে-সরকারী ব্যক্তিতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদন যেমন মুনাফা-ভিত্তিক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারবার তেমন মুনাফা-ভিত্তিক নয়। সমাজকল্যাণধর্মী বলিয়া

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প খাদকের জন্য উপযুক্ত গুণ সম্পন্ন দ্রব্যও উপযুক্ত পরিমাণে স্বল্প মূল্যে সরবরাহ করিয়া থাকে। তাহাতে খাদকের সাধারণ জীবন যাত্রার মান উন্নীত হয়।

তৃতীয়তঃ, দেশে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে হইলে, দেশের প্রধান প্রধান মূল শিল্পগুলির উপর পরিকল্পনা অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা কায়েমী করা একান্ত প্রয়োজন। প্রধান প্রধান মূল শিল্পগুলির জাতীয়করণ দ্বারাই ইহা একমাত্র সম্ভব।

চতুর্থতঃ, শিল্প জাতীয়করণ দ্বারা দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করিতেও সরকার সহায়তা করিতে পারে। দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা আবার ব্যবসা বাণিজ্যের আকস্মিক ও আত্যন্তিক উত্থান-পতন প্রতিরোধ করিতে পারে।

পঞ্চমতঃ, শিল্প জাতীয়করণের ফলে শ্রমিকের উপর নিষ্পেষণ ও পীড়ণও হ্রাস পায়। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে কল্যাণধর্মী উৎপাদন ব্যবস্থায়, শ্রমিকের মজুরি ও স্বাচ্ছন্দ্য স্বভাবতঃই অধিক হইতে বাধ্য।

ষষ্ঠতঃ, অনেক শিল্প ব্যবসায় আছে, যাহাতে প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগ ও ঝুঁকি বহন এত অধিক প্রয়োজন হয় যে, বে-সরকারী ব্যক্তিগত কারবারীকে উহা মোটেই আকৃষ্ট করে না। যেমন, রেল পরিবহন, ডাক বিভাগ, টেলিফোন প্রভৃতি শিল্প। জনসাধারণের আনুকূল্যে এই সকল শিল্পের জাতীয়করণ একান্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে, শিল্প জাতীয়করণ দ্বারা সরকারী আয়ের পথ সুগম ও সুবিস্তৃত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ও কারবারের দ্রব্য বিক্রয় দ্বারা সরকারী আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

জাতীয়করণের বিপক্ষে যুক্তি (Arguments against Nationalisation): জাতীয়করণের বিপক্ষে যে সকল যুক্তি দেওয়া হইয়া থাকে উহা এইরূপ :

প্রথমতঃ, সরকারী পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ বে-সরকারী নিয়ন্ত্রণ অপেক্ষা অনিপুণ। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সংগঠন কর্তার সজাগ দৃষ্টি যেমন সর্বত্র, সরকারী কারবারে সেরূপ প্রখর সজাগতার ও অভাব। ফলে, সরকারী প্রতিষ্ঠানের অপচয় অধিক হইতে বাধ্য।

দ্বিতীয়তঃ, বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে সংগঠন কর্তার যে উদ্যম ও কর্মোৎসাহ দেখা যায়, সরকারী পরিচালনায় ও নিয়ন্ত্রণে তাহা প্রায়ই দেখা যায় না। বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মচারিদের উন্নতি ও পুরস্কার প্রাপ্তি নির্ভর করে, প্রধানতঃ তাহাদের

কর্মপ্রগুণতার উপর। কিন্তু, সরকারী কর্মচারিদের পদোন্নতি হয় গতানুগতিক ধরাবাধা পথে। ফলে, তাহাদের কর্ম প্রগুণতার বড় বিশেষ একটা পরিচয় পাওয়া যায় না।

তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারবারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্ম পরিচালনা গতানুগতিক লাল-ফিতা কবলিত। আত্যন্তিক কেন্দ্রীভূত ও সুবিস্তৃত সংগঠন যন্ত্রের ক্রিয়াশক্তি ও তৎপরতা অপেক্ষাকৃত কম। সত্বর কোন নীতি নির্ধারিণ করা, কিংবা কার্যক্রম নির্বাহ করা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারবারের পক্ষে সম্ভব নহে।

চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প যদি জোট কারবারে পর্যবসিত হয়, তাহা হইলে খাদক শ্রেণী, দ্রব্য যোগান দুষ্প্রাপ্যতা ও দামস্তরের বৃদ্ধি হেতু, বিপর্যস্ত হইতে পারে।

পরিশেষে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নিয়ন্ত্রণ রাজনৈতিকদলের প্রভাবমুক্ত নহে। সরকার অনেক সময় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক সংঘকে তোষামোদ করিয়া নির্বাচন জয়ের চেষ্টা করে। সরকারী কর্মচারিগণের তাবেদারিতে অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার ও ঘুষ গ্রহণের সুযোগ অধিক মাত্রা থাকার দরুণ, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প নিয়ন্ত্রণ অনেক সময়ই সুষ্ঠু ও প্রগুণতা সম্পন্ন হইতে পারে না।

জাতীয়করণের উপরি উক্ত কুফল ও অপগুণগুলির জন্য অর্থনীতিবিদগণ মন্তব্য করেন যে, রাষ্ট্র মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ শুধু সেই সকল শিল্প কারবারে প্রতিষ্ঠা করা উচিত, যে সকল ক্ষেত্রে বে-সরকারী বিনিযোগ সহজে আকৃষ্ট হয় না, কিংবা যে শিল্প কারবারে প্রাথমিক বিনিয়োগ খরচ ও ঝুঁকি গ্রহণ প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজন হয়।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংগঠন (Organisation of a Nationalised Industry) : রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারবার রকমারি ভাবে সংগঠিত হইতে পারে।

(১) **প্রথমতঃ,** ইহা পুরাপুরি সরকারী একটি বিভাগের মত চালু ও কার্যকরী হইতে পারে। যেমন, ডাক বিভাগের সংগঠন। কিন্তু, এইরূপ পুরাপুরি সরকারী বিভাগের মত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের সংগঠন ব্যবস্থার অসুবিধা এই যে, ইহা সঠিক বাণিজ্য নীতি অনুমোদিত পদ্ধতিতে কার্যপটু হইতে পারে না। তাহাছাড়া, এই ধরণের রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প ব্যবসায়ের আয় ও হিসাবপত্র সরকারী সাধারণ আয় ও হিসাব পত্রের সহিত মিশিয়া অনেক জটিলতার সৃষ্টি করে।

(২) **দ্বিতীয়তঃ,** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পসংগঠনের জন্য অনেক সময় সরকারী আইন পাশ করিয়া বিশেষ সংস্থার (Statutory Corporation) সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। এই সংস্থার হাতে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ দায়িত্ব ও কার্যভার

ন্যস্ত করা হয়। সরকার শিল্পের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার জন্য সাধারণ নীতি নির্ধারণ করিয়া দেয়, প্রাথমিক মূলধন বিনিয়োগ করে, কিংবা আগাম দাদন দেয়। অনেক সময় প্রাথমিক মূলধন শেয়ারপত্র বিক্রয় করিয়া তোলা হয়; অবশ্য, সরকার পরে ঐ সকল শেয়ারপত্র ক্রয় করিয়া লইতে পারে। আইন অনুমোদিত সংস্থার দ্বারা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কারবার নিয়ন্ত্রণের মস্ত-বড় সুবিধা এই যে, কোন রকম রাজনৈতিক দলীয় স্বার্থ বা প্রভাব ইহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই সংস্থার হিসাব পত্র সরকারী নিরীক্ষাধীন নয় বলিয়া, দেশের আইন পরিষদ ইহার কার্যকারিতার উপর কোনও কর্তৃত্ব করিতে পারে না। আমাদের Damodar Valley Corporation, Industrial Finance Corporation প্রভৃতি আইন অনুমোদিত এইরূপ বিশেষ সংস্থা।

(৩) **তৃতীয়তঃ,** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প আবার অনেক সময় যৌথকারবারের ভিত্তিতেও সংগঠিত হইয়া থাকে। এক্ষেত্রে সকল কিংবা অধিকাংশ শেয়ারপত্রই সরকার ক্রয় করিয়া লয়। এইরূপ শিল্প সংগঠনের জন্য কোন বিশেষ আইন পাশ করিতে হয় না। ভারতেব Sindhri Fertiliser Works এই ধরণের রাষ্ট্রায়ত্ত সংগঠিত শিল্প।

(৪) **পরিশেষে,** রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প অনেক সময় যুগ্ম নিয়ন্ত্রণাধীনে ও সংগঠিত হইতে পারে। মালিকানা স্বত্ব ও পরিচালনা ব্যবস্থা সরকারী ও বে সরকারী খাতে ভাগাভাগি ভাবে অর্পিত হইতে পারে।

রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পকারবারের মূল্যনীতি (Price Policy of a Nationalised Industry) : বে-সরকারী খাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান যে নীতিতে দ্রব্যমূল্য নির্ধারিন করে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মূল্যনীতি ধার্য সেইরূপে হয় না। বে-সরকারী খাতে মুনাফার ভিত্তিতে দ্রব্যমূল্য নিরূপিত হয়। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দ্রবমূল্য ধার্য করা হয় জনকল্যাণের ভিত্তিতে।

অর্থবিদ্যাবিদগণ সাধারণতঃ এই মন্তব্য করেন যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ উহাদের উৎপাদন খরচের সমান হওয়া উচিত। দ্রব্যমূল্য যদি উৎপাদন খরচের চেয়ে অধিক, কিংবা কম করিয়া ধার্য করা হয়, তাহা হইলে দেশের উৎপাদক সম্পদের বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ সম্ভব হয় না। মূল্য যদি খরচের চেয়ে কম হয়, তাহ হইলে দ্রব্য বিক্রয় হ্রাস পাইয়া শিল্পের অতিসংকোচন ঘটিবে। আবার, মূল্য যদি খরচের চেয়ে বেশী হয়, তাহা হইলে দ্রব্য বিক্রয় বৃদ্ধি পাইয়া শিল্পের অতিসম্প্রসারণ ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, খরচের চেয়ে যদি

মূল্য কম হয়, তাহার অর্থ, খাদকশ্রেণীর অর্থ সাশ্রয়। আবার, খরচের চেয়ে মূল্য যদি অধিক হয়, তাহার অর্থ খাদক শ্রেণীর অর্থআয়ের হ্রাস ঘটা। সুতরাং, খরচের চেয়ে মূল্য কম, কি বেশী হওয়া মানেই, অন্যায় তারতম্য মূলক মূল্যনীতি ধার্য করা। তৃতীয়তঃ, মূল্য যদি খরচের চেয়ে কম হয়, তাহা হইলে সরকারী আয়ের হ্রাস হইয়া থাকে। এই আয়ের হ্রাস পূরণের জন্য সরকারকে ঘাটতি ব্যয় নীতি অনুসরণ করিতে হইতে পারে। কিন্তু, ঘাটতি ব্যয়নীতি মুদ্রাস্ফীতি ও দামস্তর বৃদ্ধির সহায়তা করে।

অনেক সময় অবশ্য সরকারকে সাধারণ মূল্যনীতির অদল বদল করিতে হয়। যেমন, সরকারকে যদি মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ-মূলক ব্যবস্থা করিতে হয়, কিংবা কোন্ ক্ষতিকর দ্রব্যের খাদন বন্ধ বা হ্রাস করিতে হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া জনকল্যাণের খাতিরে মূল্য খরচের চেয়ে উচ্চস্তরে ধার্য করিতে হয়। আবার, সমাজকল্যাণের খাতিরেই, অনেক দ্রব্যের প্রচলন বা খাদন বৃদ্ধির জন্য, সরকারকে খরচের চেয়ে কম বাজার মূল্যে উহাদের বিক্রয় ব্যবস্থা করিতে হয়।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা (Economic Planning) : পূর্ণাংগ বা নিখুঁত ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কোন স্থান বা গুরুত্ব নাই। তাহার কারণ এই যে, কোনরূপ পরিকল্পনা ব্যবস্থার অর্থই, অর্থনৈতিক ক্রিয়া-কলাপে রাষ্ট্রের কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রন। রাষ্ট্রের এই হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার অবাধ প্রতিযোগিতা মূলক কার্যকারিতার ঘোর বিরোধী। পরিকল্পনায় ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রধান তিনটি বৈশিষ্টের যথা, খাদকের সার্বভৌম অধিকার, দামস্তরের অবাধ ক্রিয়াশীলতা ও ব্যক্তিগত মুনাফা শিকারের—কোন স্থান নাই। অধুনা অর্থব্যবস্থা কোথাও পূর্ণাংগ ধনতান্ত্রিক নয়। রাশিয়া, নয়া চীনও প্রাচ্য ইউরোপের কতিপয় দেশ ছাড়া, প্রায় সর্বত্র মিশ্র অর্থব্যবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এবং পরিকল্পনাও অর্থব্যবস্থার অনিবার্য ও অতি গুরুত্বপূর্ণ আংগিক হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

পরিকল্পনার অর্থ কি ? (What is Planning ?) : কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য মাফিক দেশের উৎপাদক সম্পদের বাঞ্ছনীয় বিনিয়োগ ও সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, অর্থনৈতিক পরিকল্পনার প্রাণধর্ম। হায়েক্ (Hayek) অর্থনৈতিক পরিকল্পনার অতি সহজ, কিন্তু অর্থপূর্ণ এক সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : Economic Planning means "the direction of productive activity by a central authority." ডিকিন্সন্ (H. D.

Dickinson) পরিকল্পনার আর ও ব্যাপক সংজ্ঞা ধার্য করিয়াছেন : "Economic planning is the making of major economic decisions—what and how much is to be produced and to whom it is to be allocated by the conscious decision of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic system as a whole."

লুইস্ লোরউইন (Lewis Lorwin) ও পরিকল্পনার অনুরূপ একটি সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : "Planning is a scheme of economic organisation in which individual and separate plans, enterprises and industries are treated as co-ordinate units of one single system for the purpose of utilising all available resources to achieve the maximum satisfaction of the people's needs within a given time." সুতরাং, মোটামুটি ভাবে, দেশের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রিক অধিকর্তার নির্দেশে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে, কোন নির্দিষ্ট সময় মিয়াদে, কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের উৎপাদক সম্পদের সুবিনিয়োগ ও সুষ্ঠু ব্যবহার ব্যবস্থাকেই, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলা চলে।

পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য (Aims and Characteristics of Planning) : অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে। তবে ঐ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সকল দেশে এক নহে। যে দেশে রাষ্ট্র অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সার্বভৌম, সে দেশে, পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, এবং যে দেশে তথা কথিত ধনতান্ত্রিক গণতন্ত্র শাসন, সে দেশের পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এক হইতে পারে না। আবার, উন্নার্গগামী ধনতান্ত্রিক দেশেব পরিকল্পনার স্বরূপ অনুন্নত দেশের পরিকল্পনার স্বরূপ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইতে বাধ্য। সোবিয়েত রাশিয়ার মত রাষ্ট্রকেন্দ্রীক অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য, শ্রমিকের আর্থিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের মান উন্নয়ন ও সামাজিক শক্তি বৃদ্ধি দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখা। উন্নার্গগামী ধনতান্ত্রিক দেশে পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্য, অর্থব্যবস্থার গলদ ও অপগুণ দূর করা ও পূর্ণ কর্মনিয়োগ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সামাজিক ও আর্থিক নিরাপত্তা স্থাপনের ব্যবস্থা করা। অনুন্নত অর্থব্যবস্থায় পরিকল্পনার উদ্দেশ্য, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সংগঠন দ্বারা বে-সরকারী খাতে বিনিয়োগের অপ্রগুণতা ও অনিশ্চয়তা দূর করা এবং অর্থনৈতিক প্রগতি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠাদ্বারা দেশের ও জাতির

কল্যাণ সাধন করা। অনেক সময় আবার যুদ্ধ অধ্যুষিত দেশের আর্থিক ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস এবং উন্নয়ন, পরিকল্পনার লক্ষ্য হইতে পারে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে, পরিকল্পনার কার্যসূচী হইবে, দেশের অর্থব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী লক্ষ্য ধার্য করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে, ঐ লক্ষ্য কার্যকরী করিবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল রকম উপায় উদ্ভাবন ও ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা করা। উদ্দেশ্য-মূলক সরকারী প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াকলাপ সঠিক ও সুষ্ঠু ভাবে সমাধা করিতে হইলে, প্রথমতঃ প্রয়োজন হয়, দেশের বর্তমান উৎপাদক সম্পদ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করা। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অধিকর্তাকে দেশের বে-সরকারী ব্যক্তিগত বিনিয়োগ, স্থানীয় সরকারের খাতে গৃহীত পৃথক পৃথক পরিকল্পনা এবং জাতীয় সরকারের সাধারণ আর্থিক ক্রিয়া কলাপের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন ও সমন্বয় বিধান করিতে হয়।

সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সমন্বয় ও সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রত্যেক দেশেই প্রয়োজন হয়, একটি অবিভক্ত কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা অধিকর্তার ব্যাপক ও একক নিয়ন্ত্রণ। অর্থনৈতিক পরিকল্পনা জাতীয় জীবনের কোন বিশেষ অংগকে আশ্রয় করিয়া গ্রহণ করা হয় না; দেশের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহার ব্যাপক বিস্তৃতি বাঞ্ছনীয়। দেশের বর্তমান সমস্ত উৎপাদক সম্পদের পূর্ণ বিনিয়োগ ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবহার দ্বারা, যাহাতে জনসাধারণের আর্থিক জীবন-যাত্রার মান উন্নীত ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধিত হয়, তাহাই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য।

পরিকল্পনার স্বপক্ষে যুক্তি (Arguments in favour of Planning) : অর্থনৈতিক পরিকল্পনার স্বপক্ষে প্রধান যুক্তি এই যে, ইহা দ্বারা দেশের উৎপাদক সম্পদের বিনিয়োগ ও সুসমঞ্জস উন্নয়নকার্য সম্পন্ন করিয়া, অত্যন্ত অল্প সময় মিয়াদে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধনই পরিকল্পনার প্রধান গুণ। ইহার সহায়তায় প্রতিযোগিতা ভিত্তিক ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার প্রধান প্রধান অপগুণ দূর করিয়া, দেশের উৎপাদন ও খাদনের সাম্য এবং দামস্তরের স্থিতিস্থাপকতা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। ফলে, বৃত্তিহীনতা, কিংবা অতি কর্মনিয়োগ সমস্যার উদ্ভব হইয়া অনাবশ্যক আর্থিক অপচয় ঘটিতে পারে না। তাহাছাড়া, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দ্বারা ধনবণ্টন বৈষম্য হ্রাস করিয়া শ্রেণী সংঘর্ষ দূর ও সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করা ও সম্ভব হইয়া থাকে। পরিশেষে, অনুন্নত অর্থব্যবস্থায়—যেখানে উপযুক্ত পুঁজি, যন্ত্রপাতি ও সংগঠনের একান্ত অভাব,—একমাত্র পরিকল্পনার সাহায্যেই আর্থিক উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণধর্মী নির্মাণকার্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে।

পরিকল্পনার বিরুদ্ধ সমালোচনা (Arguments against Planning) : অর্থনৈতিক পরিকল্পনার বহু গুণ ও সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, বিভিন্ন দিক হইতে ইহার বিরুদ্ধ সমালোচনা হইযাছে।

পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সাধারণ অভিযোগ এই যে, আনুষঙ্গিক রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ দেশের অবাধ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু, এই যুক্তির কোন্ সারবত্তা নাই ; কেননা, পরিকল্পনাধর্মী রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবাধ অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অপগুণ দূর করিবার জন্যই গ্রহণ করা হয়।

অনেকে মনে করেন, যে কোন ধরণের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাই ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাধীনতার পরিপন্থী। পরিকল্পনা প্রসূত রাষ্ট্রিক নিযন্ত্রণ উৎপাদক সম্পদের বিনিয়োগ স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করে, মানুষের বৃত্তি ও নিয়োগ নির্বাচন সীমিত করে এবং খাদ্যদ্রব্য মনোনয়ন ব্যাপারে খাদকের পছন্দক্রম সংকুচিত করে। কিন্তু, এ যুক্তির বিরুদ্ধে ও বলা যায় যে, কারক বিনিযোগ, বৃত্তি নির্বাচন ও খাদন প্রভৃতি ক্ষেত্রে এই রাষ্ট্রিক নিযন্ত্রণ বাঞ্ছনীয উপযোগ ভোগ ও সর্বোচ্চ সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করিতে সহায়তাই করে।

অনেকে পরিকল্পনার মধ্যে আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রিক নিয়ন্ত্রণ ও শাসনের অপগুণ বর্তমান বলিয়া দোষারোপ করিয়া থাকেন। তাহারা মনে করেন যে, আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণের উন্মার্গ গতি মন্থর ও ব্যাহত করিয়া থাকে। কিন্তু, এই বিরুদ্ধ যুক্তির কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। যদি পরিকল্পনার কার্যকরীভার সুদক্ষ ও সং সরকারী কর্মচারির হস্তে ন্যস্ত করা হয়, তাহা হইলে আমলাতন্ত্রের অপগুণ পরিকল্পনার কার্যসূচী ও ক্রিয়াকলাপে সংক্রামিত হইতে পারে না। পরিকল্পনার সাফল্য বিশেষ ভাবে নির্ভর করে, পরিকল্পনা অধিকর্তার দূরদৃষ্টি ও কর্ম প্রগুণতার উপর।

পরিকল্পনার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ ও প্রতিকূল সমালোচনা করা হইয়া থাকে, উহা প্রায়ই বাস্তবতঃ ভিত্তিহীন ও অসার। উপযুক্ত ব্যবস্থা ও সুদক্ষ পরিচালনা দ্বারা পরিকল্পনার তথাকথিত অপগুণগুলি অনায়াসেই দূর করা যায়।

অনুশীলনী

1. Examine the economic effects of nationalisation.
2. What is economic planning? Discuss its aims and purposes.
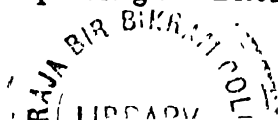
3. Account for the growth of state interference in the field of industry. In what cases is it desirable for the state to engage directly in production?

(C. U. B. Com. '50)

4. In what circumstances, if any, would you advocate state interference with production and distribution?

(C. U. B. Com '44)